(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১১শ বর্ষ—২য় খণ্ড

(ভাদ্র—মাঘ, ১৩২৬)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট্-ল

কলিকাতা

১৪-এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস"

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৬

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(ভাদ্র—মাঘ ১৩২৬)

বিষয়-সূচী

লেখক-সূচী

চিত্রসূচী (পূর্ণপৃষ্ঠা)

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

ভাদ্র ১৩২৬ সাল

২য় খণ্ড
১ম সংখ্যা

বালী-বধে রামের কলঙ্ক

প্রাচীনকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদিগের মধ্যে যদি কেহ একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন, তবে তিনি রাজা, সম্রাট্, বিরাট, স্বরাট্ বা ভোজ উপাধি গ্রহণ করিতেন। কুরু, পাঞ্চাল ও মধ্য-দেশের রাজা হইলে রাজা, পূর্ব্বদেশের হইলে সম্রাট্, পশ্চিম দেশের হইলে স্বরাট্, উত্তর দেশের হইলে বিরাট এবং দক্ষিণ দেশের হইলে তিনি ভোজ উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই বিষয়টি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আমরা অবগত হই। মহর্ষি বাল্মীকি দশরথকে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে বর্ণনা করিলেও, তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইহার কারণ, অযোধ্যা মধ্যদেশের অন্তর্গত ছিল।

মহর্ষি বাল্মীকি নিম্নলিখিত স্থলে দশরথকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথ এবং কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যও যে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজাদিগের অধীন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা দশরথ পুত্রলাভ কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার অধীন নৃপতিবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করেন। দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত যে তাঁহার অধীন ছিল তাহা এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। (১) পুনরায় রাম-রাজ্যাভিষেক সংবাদে ক্রুদ্ধা কৈকেয়ীকে তুষ্ট করিবার জন্য দশরথ আপন সাম্রাজ্যের বিশালত্বের আভাস তাঁহাকে প্রদান করেন। এই বর্ণনা মধ্যেও দক্ষিণাপথের নাম প্রাপ্ত হই। (২) আবার শরবিদ্ধ হইয়া শায়িত বালীর নিকট রামচন্দ্র প্রকাশ করেন যে শৈল বন কানন সমন্বিত কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যও ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের অধীন। (৩)

রাজা দশরথ, রাণী কৈকেয়ীর কোন কার্য্যে তুষ্ট হইয়া

---

(১) আদিকাণ্ড, ১৩শ সর্গ, ২০-২৮ শ্লোক।

(২) অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ, ৩৬ ও ৩৭।

(৩) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৮শ সর্গ, ৬।

তাঁহাকে দুইটি বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সময় বুঝিয়া রাম-রাজ্যাভিষেক কালে কৈকেয়ী ঐ দুই বর প্রার্থনা করেন। প্রথম বরে রামের পরিবর্ত্তে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও দ্বিতীয় বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা ছিল। দ্বিতীয় বর অনুসারে রামচন্দ্রকে বনে গমন করিতে হয়। ভরত তখন উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সকল সংবাদ অবগত হইলেন, তখন তিনি স্বীয় মাতার কার্য্য সমর্থন করিলেন না। রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া রাজসিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রজাপুঞ্জ, অমাত্য, মন্ত্রিকুল, পুরোহিত বশিষ্ঠ, জাবালি প্রভৃতি ঋষি ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন। রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুনয় বিনয় প্রার্থনা ও নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া অবশেষে ভরত বলিলেন, "আমি পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, মাতাকেও তাহার জন্য অনুরোধ করি নাই এবং পরম ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য রামের বনবাসের জন্যও সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই। (১) আমি এই সুমহৎ রাজ্য রক্ষা করিতে এবং পুরবাসী, জনপদবাসী অনুরক্তজনগণকে সন্তুষ্ট করিতে উৎসাহান্বিত হইতেছি না। হে মহাপ্রাজ্ঞ, হে কাকুস্থ, আপনি এই রাজ্যভার গ্রহণ করুন। আপনি যাহার প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তিই প্রজাপলেন করিতে পারিবে।" (২) ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং "হে রাম," "হে রাম" বলিয়া এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহাতেও রাম পিতৃসত্য-পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিয়া নিজে কোন প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণে অণুমাত্র ইচ্ছা প্রদর্শন করিলেন না। তখন ভরত পাদুকাযুগল তাঁহার নিকট স্থাপন করিয়া উহাতে চরণ অর্পণ করিতে প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন যে এই পাদুকাযুগলই সমস্ত লোকের যোগ-ক্ষেম বিধান করিবে। রামচন্দ্র পাদুকাদ্বয়ে পদসংযোগ পূর্ব্বক তাহা মোচন করিয়া ভরতকে প্রদান করিলেন। (৩) বাল্মীকির এই বর্ণনা হইতে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, রামচন্দ্র যদিও চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের সত্য পালন করিবেন, কিন্তু তিনিই প্রকৃতপক্ষে সম্রাট্ হইলেন; এবং ভরত, রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যপালন করিবার ভার তাঁহার নিকট হইতে পাদুকাযুগল-রূপ রাজশাসন-পত্র দ্বারা লাভ করিলেন।

পরাক্রান্ত রাক্ষসরাজ রাবণ যখন তাঁহার পত্নী হরণ করে, তখনই রামচন্দ্রের সম্রাটোচিত তেজ ও রাজশাসন-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। তিনি পত্নীবিরহে প্রথমে অত্যন্ত বিকল হইয়া পড়েন সত্য। ইহাতে তাঁহার পত্নীপ্রেমের গভীরতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার নিকট অবস্থিতা পত্নীকে হরণ করায় তাঁহার নামে যে কলঙ্ক হইয়াছে এবং তাঁহার পবিত্র ও উচ্চ কুল যে ইহাতে দুষ্ট হইয়াছে, এ জ্ঞানও তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। সীতাকে উদ্ধার করিয়া এই কলঙ্ক ক্ষালন করিবার নিমিত্ত কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত, সুগ্রীবের সহিত তাঁহর বন্ধুত্ব স্থাপন। এই কার্য্যে রাম-চরিত্রের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও অসাধারণ ধর্ম্ম-পরায়ণতা বিদ্যমান। কারণ এই বিপদের সময়ও তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া, কাহার সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে ভুলেন নাই। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে এই বিপদকালে বালীর সাহায্য গ্রহণ করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত। কারণ তিনি কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা, অতিশয় বলবান ও বীর। তাঁহার ভয়ে তাঁহার ভ্রাতা সুগ্রীব স্বল্পমাত্র বন্ধু ও অনুচর বেষ্টিত হইয়া ঋষ্যমুক পর্ব্বতে অতি সঙ্গোপনে বাস করিতেছে। সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট সুগ্রীবের এই হীন

(১) অযোধ্যাকাণ্ড, ১১১ম সর্গ, ২৪ ও ২৫ শ্লোক।

(২) ঐ, ১১২ম সর্গ, ১০ হইতে ১৩।

(৩) অযোধ্যাকাণ্ড, ১১২ম সর্গ, ২১—২২।

অবস্থার কথা অবগত হইয়াছিলেন। হনুমান্ তাঁহা-দিগকে জানাইয়াছিলেন—"সুগ্রীব নামক এক ধর্ম্মাত্মা বীর বানরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া দুঃখিত চিত্তে জগন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। (১) ভ্রাতা বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছে।" (২) কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা গ্রহণ করায় বালী যে পাপলিপ্ত ও দণ্ডার্হ হইয়াছে, তাহা রামের মত ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদের জানিতে বাকি রহিল না। অতএব এ স্থলে সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন এবং বালীকে পরিহার করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

অগ্নি সাক্ষী করিয়া রাম সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সুগ্রীব তখন রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ রাঘব, আমি শত্রু কর্তৃক নিগৃহীত ও হৃতদার এবং শত্রুর ভয়ে ভীত হইয়া তাহার অগম্য এই বন আশ্রয় করিয়াও সভয়ে বিচরণ করিয়া থাকি।" রাম ইহার উত্তরে বলিলেন, "হে কপিশ্রেষ্ঠ, পরস্পর উপকার করাই যে মিত্রতার ফল, ইহা আমি বিদিত আছি; আমি তোমার পত্নী-হরণকারী বালীকে নিশ্চয় বধ করিব।" (৩) পরদিবস পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠভ্রাতাদ্বারা আপন ভার্য্যা হরণের কথা সুগ্রীব রামকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। রামও বালী-বধ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে রাম সুগ্রীবকে বলিলেন, "হে বানর শ্রেষ্ঠ, বালীর সহিত তোমার শত্রুতা জন্মিয়াছে কেন, তাহা আমি যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি বালীর সহিত তোমার শত্রুতা জন্মিবার কারণ শুনিয়া, কোন্ কার্য্য গুরু ও কোন কার্য্য লঘু তাহা স্থির করতঃ যাহাতে তোমার সুখ হয় তাহাই করিব।" (৪) তখন লক্ষ্মণ ও হনুমানের সমক্ষে রামচন্দ্রের সন্নিধানে সুগ্রীব সমস্ত যথাযথ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার উক্তি হইতে আমরা জানিতেছি যে, সুগ্রীবকে কোন বিবর-দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ করিয়া বালী তাহার মধ্যে এক শত্রুর পশ্চাৎ ধাবিত হয়। কিছুকাল পরে ঐ বিবর-দ্বারপথে রক্ত বাহির হইতে দেখিয়া সুগ্রীব মনে করে, বালী শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছে। তখন সে ঐ পথ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে, অমাত্যবর্গ অরাজকতার ভয়ে সুগ্রীবকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করে। কিছু দিন পরে বালী দেশে প্রত্যাগমন করতঃ সুগ্রীবকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, দেশ হইতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং তাহার পত্নীকে গ্রহণ করে। (৫)

উপরে বর্ণিত চিত্র দ্বারা মহর্ষি কি দেখাইলেন? দেখাইলেন, বিচারাসনে অধিষ্ঠিত রামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বালীর কোন্ দোষের কি দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণে নিযুক্ত। এরূপ বিচার করিবার ক্ষমতা যে রামচন্দ্রের অনধিকার চর্চ্চা নহে, তাহা আমরা প্রমাণ করিয়াছি। রামচন্দ্রও প্রকৃত বিচারকের মত হনুমান প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের সমক্ষে তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে বলিলেন। এই বিচারের ফলেই বালী যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল তাহা তিনি শর-বিদ্ধ বালীকে জানাইয়াছিলেন।

বৈদিক যুগ হইতে আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে এই নিয়ম বিধি-বদ্ধ ছিল যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী দেবরকে শয্যায় গ্রহণ করিতে পারিতেন। বৈদিক 'দেবর' শব্দের অর্থ দ্বিতীয় বর; উক্ত প্রথা এই শব্দই নির্দ্দেশ করি-তেছে। ইহার বিপরীত প্রথা, অর্থাৎ অগ্রজ দ্বারা অনুজের স্ত্রী-গ্রহণ প্রচলিত ছিল না। কেহ এরূপ করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা যাহাতে লোকে

(১) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩য় সর্গ, ২০ শ্লোক।
(২) ঐ, ৪র্থ সর্গ, ২১।
(৩) ঐ, ১৮শ সর্গ, ২৯।
(৪) ঐ, ৮ম সর্গ, ৪১-৪২।

(৫) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৯ম সর্গ।

মানিয়া চলে, তাহা দেখার ভার রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। যদি কোন রাজা ঐ সকল বিধি অমান্য দোষে দুষ্ট হইতেন, তবে তাঁহাকে শাসন করিবার ভার সম্রাটের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইত। মৃত্যুশয্যাশায়িত শরবিদ্ধ বালী যখন রামচন্দ্রকে তাঁহার কার্য্যের জন্য ভর্ৎসনা করেন, তখন তিনি আর্য্য বিধি-নিষেধের এবং কোন পাপে দূষিত হইলে লোকে প্রাণদণ্ডার্হ হয় তাহারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। (১) ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজও আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও পালন করিতেন।

যখন হনুমান, রাম ও লক্ষ্মণের নিকট সুগ্রীবের চররূপে গমন করেন, তখন তাঁহার ভাষা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। "হে সুমিত্রানন্দন অরিন্দম লক্ষ্মণ,…ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও ও সামবেদজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইহার দ্বারা সমগ্র ব্যাকরণ অনেক বার শ্রুত, এবং বহুবার ব্যবহার করার দ্বারা একটীও অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারিত হয় নাই।" (২) ইহাতেও প্রকাশ পাইতেছে যে বানররাজের অমাত্যবর্গকে আর্য্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে হইত।

বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে যেরূপ শত্রুতা ছিল, তাহাতে একজন অপরকে পাইলে যে প্রাণ সংহার করিতে প্রস্তুত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুগ্রীব রামচন্দ্রের নিকট পুনঃপুনঃ এই প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন তিনি বালী-বধ করেন। বালী-বধ করিবার উপযুক্ত শক্তি, রামের আছে কি না, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিতেও, সুগ্রীব ছাড়েন নাই। (৩) সুগ্রীবের এই পরীক্ষা গ্রহণ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি মনে করিয়াছিলেন রামচন্দ্র নিজে বালীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিবেন। পুরুষোত্তম রামচন্দ্র সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বালীকে দণ্ডার্হ বলিয়া স্থির করিলেন। এক্ষেত্রে তিনি শুধু সুগ্রীবের মিত্র বলিয়া যে বালী-বধ করিবেন, তাহা নয়; বালী তাঁহার অধীন রাজা হইয়া যে প্রাণদণ্ডার্হ পাপে লিপ্ত হইয়াছে, তাহার শাস্তি দেওয়াই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। এই দণ্ডের কথা রামচন্দ্র বালীকে পরে বুঝাইয়া দেন। (৪)

প্রাচীন যুগে লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, রাজা বা তাঁহার প্রতিনিধি, পাপী ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে, সে নিষ্পাপ হয়। ইহা আমরা রামচন্দ্রের বাক্য হইতেও অবগত হই। তিনি বালীকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার প্রদত্ত দণ্ড, রাজদণ্ডরূপে গ্রহণ করা তাহার কর্ত্তব্য এবং তদ্দ্বারা সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। (৫)

রামচন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বিচার দ্বারা যখন বালীকে পাপী বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাহার বধদণ্ড নির্দ্ধারণ করিলেন, তখন কি উপায়ে তাহাকে এই দণ্ড প্রদান করিবেন তাহাও স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সুগ্রীবকে বলিলেন যে, তুমি বালীকে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী হইতে যুদ্ধচ্ছলে আনয়ন করিয়া যখন তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে, তখন অন্তরাল হইতে বাণ-

(১) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৭শ সর্গ, ১৪, ৩৬, ৩৭ শ্লোক।

(২) ঐ, ৩য় সর্গ, ২৭, ৩৩।

(৩) ঐ ১১শ ও ১২শ সর্গ।

(৪) তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ১৮
অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্ম্মকৃৎ॥ ১৯
ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ।
প্রচরেত নরং কামার্ত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ॥ ২২

হে বালি, যে জন্য তুমি আমার দ্বারা হত হইয়াছ তাহার কারণ এই দেখ, সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রাতার ভার্য্যায় বাস করিতেছ। হে পাপকৃৎ, এই (তোমার) কনিষ্ঠ সহোদর মহাত্মা সুগ্রীবের পত্নী পুত্রবধূতুল্যা রুমাতে তুমি কামভাবে আচরণ করিতেছ। যে সহোদরা ভগিনী কিম্বা অনুজের ভার্য্যাতে গমন করে, সেই কামার্ত্ত নরের বধদণ্ড স্মৃতি-সম্মত।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৮শ সর্গ।

(৫) মানব সকল পাপকার্য্য করিয়া রাজাদিগের দ্বারা

বিদ্ধ করিয়া তাহাকে আমি সংহার করিব। (১) এই বধোপায় অবলম্বন করায়, রামচন্দ্রের চরিত্র পণ্ডিত কৃত্তিবাস হইতে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন পর্য্যন্ত কোমল হৃদয় বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের দ্বারা কলঙ্কিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সকলে জানেন বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই। প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী ঐ সকল পণ্ডিতদিগের পশ্চাদনুসরণ করতঃ এ বিষয়ে একই মত পোষণ করেন দেখিতে পাই। এই উপায় অবলম্বন জন্য রামচন্দ্রের চরিত্রে অণুমাত্র কলঙ্কও স্পর্শ করিয়াছে কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে আমরা প্রবৃত্ত হইব।

অনেকে মনে করেন, বালী একজন মহাবীর পুরুষ ছিলেন, অতএব তাঁহাকে বধ করিতে হইলে রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সম্মুখ সমর করিয়া বধ করিলেই প্রকৃত বীরের মত কার্য্য করিতেন। লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাকে বধ করায় রামচন্দ্র কাপুরুষের মত কার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের সাম্রাজ্যে যদি কোন সামন্তরাজা প্রাণদণ্ডার্হ পাপে দুষ্ট হন, তাঁহাকে কি সম্রাট্ বা তাঁহার প্রতিনিধি, বীরপুরুষ বলিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতঃ বধদণ্ড প্রদান করিবেন? এবং তাহা না করিয়া, যদি ছলে বা বলে তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণদণ্ড প্রদান করেন, তাহা হইলে সম্রাট্ বা রাজপুরুষদিগকে তাঁহারা কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিবেন?

সম্মুখ-সমরে বধার্হ কে? যে পাপী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, কখনই সে নয়। সম্মুখ-সমর বিপক্ষ স্বাধীন রাজার সহিত হইতে পারে। রাজা বা প্রজা বিদ্রোহী হইলে যুদ্ধ সম্ভব বটে। কিন্তু তাহারা বিদ্রোহী হওয়ায় বধদণ্ডার্হ হইয়া থাকে। লঙ্কেশ্বর রাবণ ইক্ষ্বাকু বংশের অধীন নরপতি ছিলেন না। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, লঙ্কাদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধেও রামচন্দ্র অজ্ঞ ছিলেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতা শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করায় রাবণের সহিত বিবাদের সূত্রপাত। এই কারণে সীতাহরণ করিয়া রাবণ শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। সীতা উদ্ধার করিবার জন্য রাম তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান ও সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু বালীর সহিত তাঁহার সম্মুখ যুদ্ধ হইতে পারে না। এখন যেমন ব্রিটিশ রাজের পুলিশ কর্ম্মচারী ছল বল ও কৌশলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ধরিয়া দণ্ড প্রদান করেন, তাহাতে কোনও নিন্দা হয় না, রামচন্দ্রও সেইরূপ তাঁহার অধীন সুগ্রীবের দ্বারা ছলে দণ্ডার্হ বালীকে নিজ সুদৃঢ় নগরী হইতে বাহিরে আনিয়া সংহার করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বজন সমক্ষে অনুজ ভ্রাতার জীবিতকালেই তাহার পত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহাকে পশুর মত বধ করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহাকে বীরের সম্মানজনক মৃত্যু প্রদান করেন নাই বলিয়া রামচরিত্রে কাপুরুষতার কলঙ্ক কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

বালী ও রামের মধ্যে উত্তর ও প্রত্যুত্তরের অবতারণা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি রামচরিত্রের মহত্ত্ব ও বালী চরিত্রের হীনত্ব যে সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, তাহা পাঠকদিগের নিকট উপস্থাপিত করিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালী রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করে:—

১ম। অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবার সময় রামচন্দ্র তাহাকে নিহত করিয়াছেন। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে হত্যা করায় রামচন্দ্র যশস্বী হন নাই (২)।

২য়। এরূপ অবস্থায় রাম যে তাহাকে আঘাত করিবেন, সে তাহা কখন ভাবিতেও পারে নাই। (৩)

প্রদত্ত দণ্ড গ্রহণ করিলে নির্ম্মল হইয়া সুকৃতকারিগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। চোর প্রভৃতি রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত বা মুক্ত হইলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। রাজা কিন্তু অশাসন জন্য সেই পাপভাগী হন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৮ সর্গ, ৩১ হইতে ৩২ শ্লোক।

১। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১২শ সর্গ, ১২—১৫।

২। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৭শ সর্গ, ১৬ শ্লোক।

৩। ঐ ঐ ২১

৩য়। বালী রামচন্দ্রের রাজ্য বা নগরে কোন পাপাচরণ করে নাই বা রামের অবমাননা করে নাই। (১)

৪র্থ। ব্রাহ্মণঘাতী, রাজঘাতী প্রভৃতি লোকগণ পাপাত্মা, বালী তাহাদের মত নহে। (২)

৫ম। বানরের মাংস অভক্ষ্য; অস্থি, চর্ম্ম ও লোম অব্যবহার্য্য। তাহাকে বধ করিয়া রামের কোন লাভ ছিল না। (৩)

৬ষ্ঠ। যেমন গাঢ়নিদ্রিত ব্যক্তি সর্প কর্ত্তৃক অলক্ষ্য ভাবে নিহত হয়, সেইরূপ বালী অলক্ষ্যভাবে বিনষ্ট হইয়াছে (৪)। অতএব রামচন্দ্র সর্পসদৃশ ক্রূর।

৭ম। বালীকে যদি সীতা উদ্ধার কার্য্যে রাম নিয়োগ করিতেন, তবে সে এক দিবসের মধ্যে রাবণকে গলদেশে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আনিতে সমর্থ হইত। (৫)

বালী এই সকল অভিযোগের উত্তর প্রার্থনা করিলে রামচন্দ্র তাহাকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

"পর্ব্বত, বন ও কানন সমন্বিত এই ভূমি ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজাদিগের এবং তাঁহারা ইহাতে অবস্থিত মৃগ পক্ষী মনুষ্যাদিগের শাসন করিবার অধিকারী। ধর্ম্মাত্মা সরলচিত্ত সত্যনিরত ভরত তাঁহাকে পালন করিতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মযুক্ত আদেশক্রমে আমরা ও অন্য পার্থিব-সকল ধর্ম্মবিস্তার ইচ্ছা করিয়া সমগ্র বসুধা ভ্রমণ করিতেছি।

"আমরা ভরতের আদেশক্রমে স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মপথচ্যুত ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড করিয়া থাকি। তুমিও রাজার কর্ত্তব্য ধর্ম্মপথে অবস্থিত নহ। কামচারী হইয়া অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম্মের পীড়াদায়ক হইয়াছ।...আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিয়াছি, তাহা এই; তুমি সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে অভিগমন করিয়াছ। সেই অপরাধে আমি তোমার দণ্ডবিধান করিয়াছি। এ পাপের বধদণ্ড। আর্য্য মান্ধাতাও এইরূপ পাপকর্ম্মের বধদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন।" (৬)

বালীর ৫ম অভিযোগের উত্তরে তিনি এইরূপ বলিলেন:—"মৃগয়া করাকে ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিরা পাপজনক বলিয়া স্বীকার করেন না। তুমি শাখামৃগ বলিয়া তোমাকে যুদ্ধে বা অযুদ্ধে নিহত করায় দোষ নাই। সেই জন্য তোমার অপরের সহিত যুদ্ধকালে বাণের দ্বারা বধ করায় আমার কোন দোষ হয় নাই।" (৭)

বালী আপনাকে শাখামৃগ বলিয়া অবধ্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করায় রামচন্দ্র এই উত্তর প্রদান করেন। রাম তাহার বধদণ্ডের প্রকৃত কারণ প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন। বালী না তুলিলে রামের এ উত্তর দিবার আবশ্যকতা ছিল না। মহর্ষি বাল্মীকি যে আদর্শ চরিত্র জগৎবাসীর সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তাহা 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র' আদর্শের বিপরীত। এ মহদাদর্শ বুঝিবার শক্তি ভারত হইতে বহুকাল লোপ পাইয়াছে। তাই ভারতের আর্য্যসন্তান জগতের মধ্যে আত্ম হীন ও কাপুরুষ হইয়া অবস্থিত। তাহারা ন্যায় ও সত্যকে পদদলিত করিয়া, রামচরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতে সাহসী হইয়া আপনাদিগকে শুধু হাস্যাস্পদ করিয়াছে।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

১। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৭শ সর্গ, ২৪ শ্লোক।
২। ঐ ঐ ৩৬—৩৭।
৩। ঐ ঐ ৩৮—৪০।
৪। ঐ ঐ ৪৮।
৫। ঐ ঐ ৪৯—৫০।
৬। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৮শ সর্গ, ৬, ৭, ৯—১২ ১৮, ২০ ২২, ৩৩।
৭। ঐ ঐ ৪২।

ব্রহ্মশাপ

হাজার মুদ্রা কর্জ্জ করিয়া
দিলেনাকো শোধ অর্থ,
আদালতে গেল হারি ব্রাহ্মণ,
খরচ হইল ব্যর্থ।
খাতক, সাক্ষী—উভয় সমান
দেনা লেনা কিছু হলনা প্রমাণ ;
বাতিল হইয়া গেল খত্‌খান
বর্ত্ত হল না সর্ত্ত।

আপীলে আজিকে লভিয়া ডিক্রি
সুদ ও খরচ শুদ্ধ,
খাতকে তাহার নিকটে ডাকিয়া
বলে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ :—
"সত্যের জয়ে লভিনু হরষ,
তোর পাপ টাকা করিনে পরশ ;
শুধু আমি তোর স্বরগের পথ
করে দেব অবরুদ্ধ।

"পাপিষ্ঠ তুই, মিথ্যা সাক্ষ্যে
জীবন করিলি নষ্ট,
মরণেতে তুই পাবিনে গঙ্গা
বলিয়া দিতেছি পষ্ট।"
উকীল, আমলা আদালত ভরি
শুনি অভিশাপ হেসে গড়াগড়ি ;
বুঝিল, খাতক সহজে সহিবে
শাপের এ লঘু কষ্ট।

অর্থের দায়ে রেহাই লভিয়া
অন্তরে পাপী তুষ্ট,
ভালই হ'ল যে নিলেনা অর্থ
হয়ে ব্রাহ্মণ রুষ্ট।
গঙ্গা না মেলে ক্ষতি নাহি তায়,
পেলে সে মুক্তি অর্থের দায় ;—
তবু ভাণ করে' টাকা দিতে চায়,
কাঁদে ছল করে' দুষ্ট।

বয়স যখন পড়িতে লাগিল,
শিথিল হইল চর্ম্ম,
নিশিতে দারুণ পীড়িতে লাগিল
অতীতের দুষ্কর্ম্ম।
"পাবনা গঙ্গা, পাব নাক আমি ?"
শুধু বার বার বলে দিবা-যামি ;
আজি যেন শত বিষ-বৃশ্চিকে
বিঁধিছে তাহার মর্ম্ম !

জনে জনে ডাকি বলে, "শুন ভাই,
মোর মরণের অন্তে,
গঙ্গার জলে দিও দেহখান—
মাগি তৃণ কাটি দন্তে।"
বলে সবে, "ত্যজ বৃথা হাহুতাশ,
দিব গঙ্গায় দিনু আশ্বাস,
দুই ক্রোশ দূরে বহে জাহ্নবী
কোন বাধা নাই পন্থে।"

বৃদ্ধ তাহার পূর্ব্বের ঋণ
শোধ করি দিল তীর্থে,
করিল সে দান সুদের অর্থ
দেবতা-পিতৃ-কৃত্যে।
তবু সে দিনের ভীম অভিশাপ
হৃদয় মাঝারে দিয়েছে যে ছাপ,
মোছেনা কিছুতে, রয়ে রয়ে শুধু
অনিবার জাগে চিত্তে !

যেদিন তাহার মরণ হইল
সচকিতে শ্বাসভঙ্গে,
তখন অজয় প্রলয়-প্লাবনে
নৃত্য করিছে রঙ্গে!

ব্যস্ত সবাই লয়ে নিজ প্রাণ,
ভাসাইল জলে মৃতদেহখান।
জানিনে তাহার হল কি না দেখা
জাহ্নবী ধারা সঙ্গে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বৌদ্ধসঙ্ঘ ও জগন্নাথদেব

যাবতীয় সৃষ্ট জীবই যে মানুষের নিকট একটা স-সম্মান করুণার দাবীর অধিকারী, এই মহামন্ত্রের বাণী শুনাইয়া বুদ্ধদেব পুণ্য-ভূমি বিহারকে পুণ্যতর করিয়াছিলেন। বিহারের প্রত্যেক ধূলিকণা তাঁহার চরণস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। কুলুকুলু স্বরে যে স্রোতস্বিনী একান্ত সঙ্কোচে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার কূলে বসিয়া এক সময় হয়তো তিনি কতই কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছিলেন। সংক্ষুব্ধ উর্ম্মিরাশির ঘাতসংঘাত-জনিত ভীষণ শব্দে গম্ভীর অরণ্যানীর নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করিয়া দুকূলপ্লাবী যে নদ দৃপ্ত তুরঙ্গমের মত ছুটিয়া চলিয়াছে, একদিন তাঁহার পদস্পর্শে রুদ্রভাব সংযত করিয়া তাহা শান্ত হইয়াছিল। (১) উষর পর্ব্বতের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া কখনও বা তিনি গম্ভীর মন্দ্রে ধর্ম্মের অববাদ করিয়াছেন, আর মুণ্ডিতশীর্ষ পীতকাষায়ধারী ভিক্ষুগণ তন্ময় হইয়া তাহাই শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। (২) এক শুভদিনের প্রথম প্রভাতে করুণার প্রতিমূর্ত্তি সিদ্ধার্থ রাজগৃহে আসিয়াছেন—সুনীল আকাশতলে, যতদূর চক্ষু যায়, শুভ্র অহিফেনপুষ্প থরে থরে সজ্জিত হইয়া দিগ্‌বলয় পর্য্যন্ত যেন একটা বিরাট নীলপ্রান্তবিশিষ্ট গালিচা রচনা করিয়া দিয়াছে। রাজা বিম্বিসারের যজ্ঞীয় বলি—সহস্র সহস্র নিরীহ ছাগমেষ সারি বাঁধিয়া হোমভূমির দিকে নীত হইতেছে। উষ্ণরক্তস্রাবী ছিন্নমুণ্ড বিগতজীবন সহস্র প্রাণীর বীভৎস ছবি তাঁহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। নির্ব্বাক সহস্র জীবের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয়ে করুণার উৎস ছুটিল। তিনি একটি খঞ্জ মেষকে অংসদেশে স্থাপন করিয়া বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ প্রাণ বিনিময়ে তাহাদের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। সে আজ কতদিনের কথা! বুদ্ধদেবের জীবনে আরও কত ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই সব ঘটনা ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাহার বেশীর ভাগই গিয়াছে, অল্প আছে। এখনও বিহারের গ্রামে গ্রামে প্রচুর বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। কোন দিন হয়ত সহস্রাধিক বর্ষের কোন মূর্ত্তির ভগ্নাংশ অথবা চিহ্নবিশেষ বিহারী কৃষকের হলাগ্রে উঠিয়া পড়ে! ভগিনী নিবেদিতা বলেন, এখনও নানাস্থানে রাজপথপার্শ্বে গাছের কিংবা ঝোপের নীচে পাশাপাশি তিনটি মাটীর ঢিবি দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাই বিশ্বের পতি জগন্নাথের মন্দির সূচিত

১। সাঁচি স্তূপের তোরণ স্তম্ভে এই দৃশ্যটি প্রতিফলিত হইয়াছে। Cf. Marshall's Guide to Sanchi.

২। Fire-Sermon at Gaya-Sisa.

করিতেছে জগন্নাথ স্বয়ং বুদ্ধদেবেরই নাম ও চিহ্ন স্বরূপ। (১)

জানি না কি মনে করিয়া নিবেদিতা এই পংক্তিগুলি লিখিয়াছিলেন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে আজ শ্রীক্ষেত্রের পুরীধামে যে জগন্নাথ দেবের পূজা হয়, তাহা বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি রত্নত্রয়—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পূজা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া কালবশে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে ইহার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে—ইহাই হইতেছে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমাবনতি ও পতনের ইতিহাস। মনে রাখিতে হইবে যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার হিন্দুধর্ম্মেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেব কত স্থানে যে শিব হইয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। (২) এমন কি স্তূপগুলিরও যে কত অচিন্ত্যপূর্ব্ব রূপান্তর হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সেগুলি কোথাও ব্রহ্মা, কোথাও বা মহাদেব হইয়া অন্য হিন্দু দেবতার মত সমারোহে দিব্য ষোড়শোপচারে পূজা গ্রহণ করিতেছে। শিশুগৌতমোৎসঙ্গা মায়াদেবী—গণেশজননী পার্ব্বতীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন! বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারিত বিশ্বপ্রীতি, জীবে দয়া, ধর্ম্মান্তর-সহিষ্ণুতা, পরোপকার-প্রবণতা, অহিংসা, এমন কি গণতন্ত্রমূলক জাতিভেদ বর্জ্জন, সাম্য ও মৈত্রী বৈষ্ণবধর্ম্মে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবদিগের জগন্নাথও যিনি, তিনিই স্বয়ং বুদ্ধদেব; বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের দশ অবতারের মধ্যে অন্যতম অবতার। যে তিনটা কদাকার দারুমূর্ত্তি আছে, অবশ্য হিন্দুরা তাহাকে স্বয়ং জগন্নাথ, তাঁহার ভ্রাতা বলভদ্র ও তাঁহার ভগিনী সুভদ্রার মূর্ত্তি বলিয়া এবং সমীপস্থ চক্রকে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র বলিয়া পরিচয় দেন। এই বিচিত্র মতবাদের পোষক-স্বরূপ একটা পুরাণেরও সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্ত নীলাম্বু সাগরের কূলে কূলে গভীর বনাভ্যন্তরে ভগবান নীলমাধব অনার্য্য শবরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া মধ্যভারতের প্রতাপবান নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তাঁহার সন্ধান লইতে বলেন। ধৃষ্ট রাজপুরুষদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভগবান অন্তর্হিত হন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন বহুযুগ ধরিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবশেষে ভগবান প্রীত হইয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন—"বৎস, তোমার পূজায় আমি প্রীত হইয়াছি, সমুদ্রের তরঙ্গচূড়ায় যে দারুখণ্ড দেখিতে পাইবে তাহা আমারই মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে।" অনন্তর দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সেই পবিত্র দারুখণ্ড অবলম্বন করিয়া তিনটি মূর্ত্তি গঠন করেন। কথিত আছে যে জগন্নাথের দারুমূর্ত্তির অভ্যন্তরে বিষ্ণুপঞ্জর নিহিত আছে। এখনও যখন মূর্ত্তি পুরাতন হইয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং নূতন মূর্ত্তি গড়িবার প্রয়োজন হয়, তখন পতিবংশের সুলক্ষণযুক্ত কোনও বালকের চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়, পরে ঐ বালক জীর্ণ দারুমূর্ত্তির বক্ষস্থল হইতে ধাতুগর্ভ ক্ষুদ্র একটী পেটিকা উন্মোচন করিয়া নূতন মূর্ত্তির বক্ষস্থলে স্থাপিত করে। (৩)

১। "And under trees and bushes along the high road one notes the three little heaps of mud standing side by side, that indicate a shrine of Jagannath the Lord of the Universe, the name and symbol of Buddha himself."---Sister Nivodita, Footfalls of Indian History.

২। "কেবল শ্রীক্ষেত্রে বলিয়া নহে, কি পুষ্কর, কি গয়া, কি বিন্ধ্যাচল, কি কাশী সর্ব্বত্র হিন্দুদের বর্ত্তমান দেবীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত পুরুষ বুদ্ধমূর্ত্তি। পুষ্করের সাবিত্রীগয়ার সর্ব্বমঙ্গলা শৈলশিখরস্থিত বিন্ধ্যবাসিনীর গিরিকক্ষে এখনও বুদ্ধমূর্ত্তি। বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম, বিশেষতঃ অহিংসা মূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল সেশ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্মমাত্র।"—নবীন সেন। "আমার জীবন", তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮।

"আমার জীবন", তৃতীয় ভাগ, মগধরাজ্য ও তীর্থদর্শন ৩৩৮, ৩৪৮ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

৩। নবীন বাবু "আমার জীবন" তৃতীয় ভাগে (পৃঃ ১৬ ১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন :—"জগন্নাথদেব যখন নীলমাধবরূপে বনে লুক্কায়িত ছিলেন, সে সময়ে তিনি এক সম্প্রদায় অনার্য্য জাতির অধিকারে ছিলেন। ইহাদেরই নাম দৈতা। তাহারা জগন্নাথের আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে পরিগণিত। জগন্নাথ কলেবর

এই প্রকার অস্থি অথবা ধাতু সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান হিন্দুদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, কিন্তু বৌদ্ধদের ধর্ম্মাচরণের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে বেদপন্থী হিন্দুগণ কখনও মৃতের অস্থি রক্ষা করিয়া তাহার পূজা করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৌদ্ধদের মৃতের অস্থি অথবা অন্য কোন ধাতু (relic) পূজা একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। তাহাদের স্তূপও (ব্রহ্ম, শ্যাম ও সিংহলদেশে) ডাগব (ধাতুগর্ভ cf. Fergusson's History of Eastern Architecture) ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পরই এই ধাতু পূজার উৎপত্তি হয়। আমরা মহাপরিনিব্বান সুত্তে পাঠ করি যে, বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিবার পর, তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষ তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় সেই ধাতুলাভেচ্ছু প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা সাঁচিস্তূপের ভাস্কর তোরণস্তম্ভে অতি নিপুণ ভাবেই খোদিত করিয়াছেন। সুত্তে লিখিত আছে,—"বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের কথা পরে রাজা অজাতশত্রুকে, বেসালীর লিচ্ছবিদিগকে, কপিলবত্থুর সাক্যদিগকে, অল্লকপ্পের বুলিদিগকে, রামগামের কোলিয়দিগকে ও বেদদীপের ব্রাহ্মণগকে জ্ঞাপিত করা হইলে, তাঁহারা কুশীনারের মল্লদিগের সহিত তথাগতের দেহাবশেষ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা যে সেই পবিত্র ধাতুর উপরে স্তূপ স্থাপন করিয়া তাহার পূজা করেন। (১)

বুদ্ধদেবের দন্তপূজার কথা অনেকেই অবগত আছেন। (কুমার স্বামীর দাঠাবংস দ্রষ্টব্য) জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অব্রাহ্মণ ব্যাপার, হিন্দুদের ভিতর কোথাও রথযাত্রা করিয়া দেবপূজার বিধি নাই। বুদ্ধদেবের দন্তধাতুর পূজোপলক্ষে যে শোভাযাত্রা হইত, রথযাত্রাতেই তাহার স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে কুমার সিদ্ধার্থ যে মহাভিনিষ্ক্রমণ (মহাভিনেক্খনম্) করিয়াছিলেন, এই রথযাত্রাই তাহার পরিচায়ক। চীন পরিব্রাজকগণের (২) গ্রন্থে মধ্য-এসিয়ায় যে এইরূপ রথ যাত্রা হইত তাহার ভূরি উল্লেখ আছে।

অশোকের গিরিলিপিতে দেখিতে পাই (Asoka's Rock Edict V)—"ভেরীঘোষো অহো ধম্মঘোষো বিমানদসনা চ।" বিশেষজ্ঞের মত এই যে, ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠানের নিবিড় ছদ্মবেশে আবৃত হইয়া বৌদ্ধদের একটা বিশিষ্ট পূজা জগন্নাথের পূজা বলিয়া পরিচিত হইয়াআসিতেছে।

জগন্নাথদেবের পূজায় যদি বাস্তবিকই বৌদ্ধদের পূজা হয়, তাহা হইলে ঐ দারুমূর্ত্তিত্রয় কাহার? কানিংহাম সাহেব বলেন, (Ancient Geography of India) – জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম হইতেছেন বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ। মধ্যেকার মূর্ত্তিটি "ধর্ম্মের"। কালবশে ধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়া মহাযানতন্ত্রোল্লিখিত "প্রজ্ঞা"য় পরিণত হয়। প্রজ্ঞার স্ত্রীমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল। (৩) বোধি ও প্রজ্ঞা (Reason or understanding) বলিয়া তাঁহার অপর নাম তথাগতগর্ভ। তিনি বুদ্ধদেবের জননী। হিন্দুগণ যেমন "শক্তি", "প্রকৃতি ও "মায়া"র উপাসনা করেন, মহাযানীরা সেইরূপ প্রজ্ঞার উপাসনা করেন। সুভদ্রা-রহস্যের ত এখন মীমাংসা হইল? বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন চক্র।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে স্বয়ং বুদ্ধদেবও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের

ত্যাগ করিলে তাহারা অশৌচ গ্রহণ করে, ও পুরাতন মূর্ত্তির বক্ষ হইতে অমৃত পদার্থ চোখ বাঁধা অবস্থায় বাহির করিয়া নূতন মূর্ত্তির বক্ষে স্থাপন করে। সে অমৃত পদার্থ কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রত্নবিদেরা মনে করেন উহা বুদ্ধদেবের শরীরের অংশ বিশেষ।...তাহারা ভিন্ন অন্যে মূর্ত্তিত্রয় স্পর্শ করিতে পারে না। অনার্য্য জাতির সঙ্গে এ সম্পর্কও জগন্নাথদেবের বৌদ্ধত্বের আর এক প্রমাণ।"

১। Coomarswami,—"Buddha and the Gospel of Buddha." p. 89.

২। যথা ফা হিয়ান।

৩। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তের বিচিত্র প্রসঙ্গ, পৃঃ ৯, ৬৪।

পার্শ্বে স্থাপিত হইয়া, তাহাদের সহিত পূজিত হইয়া সর্ব্ব বৌদ্ধদের নিকট এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আজিও সুবর্ণভূমি ব্রহ্মদেশে ও নীলাম্বুবেষ্টিত তাম্রপর্ণী দ্বীপে "উপসম্পদা" বা প্রথম দীক্ষা গ্রহণের সময় হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বরে উদ্গীত হইয়া সেই উপাধিবিনাশী পাপসন্তাপহারী ত্রিপদ মন্ত্র আকাশমণ্ডল ধ্বনিত করে—

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

জন্ম-অপরাধী

(উপন্যাস)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অপেরা যে নিতান্তই পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীর সুখ সন্তোষ শান্তি ধ্বংস ক'রবার জন্য একান্তই অন্যায়রূপে কেবল মাত্র জবরদস্তি করিয়া গায়ের জোরে বাঁচিয়া আছে—সে কথাটা তাহার আশাবিশ্বাসহত ভগ্ন মনের উপর খুবই সুস্পষ্ট তীব্ররূপে আজ কাল বারবার অনুভূত হইতে লাগিল। যতই সময় যাইতে লাগিল, মস্তিষ্ক যতই সবল হইয়া উঠিতে লাগিল, যতই সে জীবনের আদ্যোপান্ত ত্রুটি অপরাধগুলার স্মৃতি পুনঃ-পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার এই অকিঞ্চিৎকর নারী-জীবনটার উপর একটা নিগূঢ় দুর্জ্জয় অভিমানের উদয় হইতে লাগিল! ছি ছি ছিঃ, এমন নির্লজ্জ এমন নিঘৃণ্য জীবন কি বহিতে আছে? জীবনের পঁচিশটা বছর ত কাটিয়া আসিল, ইহার মধ্যে কোনদিকে কতটুকু সার্থকতা পাইল? যিনি আত্মার নিকটতম আত্মীয়, যাঁহার সহিত অভেদাত্মা হইয়াই গার্হস্থ্যাশ্রমের মহৎ ব্রত পালন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া শুনিয়াছে, সে অভেদের মধ্যে এত বিরাট ভেদ—এত কঠিন প্রতিবন্ধক—সৃষ্টি হইয়া আছে যে, শুধু একটা জন্মে কেন, জন্মজন্মান্তরের তপস্যায়ও তাহা বুঝি ঘুচিবার নয়। শুধু পশুবৃত্তির উত্তেজনায় যে ক্ষণিক আকর্ষণ, ক্ষণিক সম্মিলন—তাহাই কি দাম্পত্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা? ধিক্, এত বড় সাংঘাতিক প্রবঞ্চনা, এত বড় মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা মানুষের জীবনে যে আর নাই! গলিত কুষ্ঠের উপর স্বর্গের পারিজাত আনিয়া ঢাকিয়া দাও, ভিতরে কিন্তু যে গলিত কুষ্ঠ সেই গলিত কুষ্ঠই অবিকৃত থাকিবে! তাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। হায় রে, তবু মানুষ নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিকে সামলাইতে পারে না বলিয়া উহারই চরণে দাসখৎ লিখিয়া, আসল সত্যটার সম্বন্ধে সজোরে চোখ বুজিয়া উদাস আরামে দিন কাটাইয়া দিতেছে। ধিক্!

দিনের পর দিনগুলা নিঃশব্দে কাটিয়া চলিল। অপেরার এক রোখা ভাবনা চিন্তাগুলা ক্রমাগতই তীব্র ঘৃণায় শানাইয়া শানাইয়া তাহাকে কেমন একটা ধিক্কারময় নৈরাশ্যের মধ্যে টানিয়া ধরিয়া, তাহার আঁজরে পাঁজরে নির্য্যাতনের ছুরি হানিতে লাগিল। কি করিতে সে বাঁচিয়া আছে? কিছুই কায নাই, শুধু বসিয়া বসিয়া বিদ্বেষ-অবজ্ঞা-প্রদত্ত অশ্রদ্ধার অন্নমুষ্টিতে উদর পূর্ণ করিতে, আর সেই জন্য নিমিত্তের হেতু হইয়া পরম হিতাকাঙ্ক্ষী গুটিকতক স্নেহশীল আত্মীয়ের মর্ম্মভেদী অপমান লাঞ্ছনার কারণ হইতে? ধিক্, এই

জীবন কি এতই প্রার্থনীয়? এইরূপে বাঁচিয়া থাকাই কি এত স্বাভাবিক? এর চেয়ে যে কোন অস্বাভাবিক মৃত্যু হউক না—আত্মহত্যা—অপঘাত, তবু সে যে শতগুণে শ্রেয়, সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।

নিজের চিন্তায় অপেরা নিজেই শিহরিয়া উঠিল! ছি, ছি, এতদিনের পর শেষে এইরূপে লোক হাসাইবে? নাঃ, আর ও চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাহার ভগ্ন দুর্ব্বল মনকে আর বিশ্বাস করিবার নয়!

তৃতীয় প্রহরের খর রৌদ্র-তেজকে নিবাইয়া, দূর দিগন্ত কোলে পশ্চিমাকাশে মেঘের পরে মেঘ জমিয়া আসিতেছিল, অপেরা এক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া কত-কি ভাবিতে লাগিল। সত্য সত্যই সে অবশ্য আত্মহত্যা করিতেছে না, কিন্তু যদি করে, তবে পৃথিবীর মানুষগুলি তাহাতে কি বলিবে? কি বলিবে তাহা ত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যাঁহারা তাহার লেখাপড়ার উপর আন্তরিক চটা—তাঁহারা ত আগেই তাহার সেই ক্ষুদ্র বিদ্যাটুকুকেই সব দোষের মূল সাব্যস্ত করিয়া—তাহার অন্যায় মূর্খতায় চটিয়া গিয়া প্রাণ ভরিয়া গালাগালি শূলোশূলি সুরু করিবেন। তারপর, অবসর সময়ে বন্ধু বান্ধবদের ডাকিয়া আড্ডা জমাইয়া, তর্ক যুক্তির ঝুলি ঝাড়িয়া, চড়া গলায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন, অন্যথা স্মৃতিশাস্ত্রের পাতা উল্টাইয়া, এই ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান খুঁজিবেন। তা খুঁজুন তাঁহারা—অপেরার অবশ্য তাহাতে তখন কোন আপত্তি থাকিবে না,—ইহলোকে নিজের প্রাক্তন লইয়া চিরদিন যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল; পরলোকে গিয়া না হয় একটু বেশী করিয়া যন্ত্রণা পাইবে, তা—তাহাতেই বা দুঃখ কি? সে যন্ত্রণা আর যতই কঠোর হউক,—অপেরাকে যাহারা আন্তরিক স্নেহ করেন,—দিদি ও জামাইবাবুর ত তাহার সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তাহাদের ত কেহ মর্ম্ম-ভেদী অপমানে অপমানিত করিতে যাইবে না—তবে আর ভয় কি? অপেরা মরিয়া গেলে এ পক্ষের সংশ্রব চিরদিনের মত ছিন্ন হইবে, দিদি ও জামাইবাবু তাহার জন্য মনস্তাপ পাইবার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইবেন, ওঃ সে কি আনন্দময় মুক্তি!

তারপর, বাহিরের মানুষগুলির রসনা-ঝঙ্কার চলুক চলুক, যত জোরে খুসী ওগুলো চলুক,—কি যায় আসে?—নিরুপায় নির্য্যাতন পীড়িত দুঃস্থ মানুষের হৃদয়ভেদী সমস্যা,—সে কি উহারা কেহ দয়া করিয়া একটিবারের জন্য, মানুষের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া,—পরে, তাহার কার্য্যের দোষগুণের হিসাব নিকাশের অঙ্ক কসিবেন? কি গরজ তাঁহাদের? অত অবসর তাঁহাদের নাই! হুজুগ লইয়া মাতামাতি করিবার জন্য তাঁহারা হুজুগ খুঁজিয়া বেড়ান, মানুষের সুখ দুঃখ খুঁজিবার জন্য নয়। যাঁহারা পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীর সহস্র আশা আসক্তির বন্ধনে যাঁহারা পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধা, তাঁহারা কেমন করিয়া সেই—সর্ব্বহারা ক্ষতি—আর বিশ্বদাহী অনুতাপের পরিমাণ বুঝিবেন? তাঁহারা কেমন করিয়া বুঝিবেন, কত বড় যন্ত্রণার আঘাত খাইয়া মানুষের প্রাণ আত্মহত্যার উত্তেজনায় উন্মাদ হইয়া উঠে;—কত বড় অসহনীয় দুঃখের দংশন হইতে পরিত্রাণের আশায় মানুষ অমন ঘৃণিত দুঃখময় আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের ফুরসুৎ কম, চোখ চাহিয়া সকল দিক দেখিয়া মানুষের প্রাণ লইয়া, দুঃখীর ব্যথা অনুভব করিবার সময় তাঁহাদের নাই—হৃদয় ত নাই ই।—তাঁহারা শুধু নিজের সাধুত্ব ফলাইবার জন্য অতি ব্যস্ত। তাঁহারা চোখ বুজিয়া বিচার করিবেন, দাঁত খিঁচাইয়া বিরক্তি জানাইয়া ধিক্কার দিবেন, আর চক্ষু লজ্জার দায়ে ঠেকিয়া বড় জোর দুই চারি বার 'আহা—উহু' করিবেন, তারপর খাইয়া দাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গাঢ় নিদ্রায় শরীর ঢালিয়া দিবেন, কেমন এই ত? তবে?—মানুষের সুস্থ সবল মনটা কেমন করিয়া কত ঘা খাইয়া, কোথা হইতে যে কোথায় আসিয়া দাঁড়ায়,—মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলা কেমন করিয়া স্বাভাবিক পরিণতির পথে, কঠোর প্রতিবন্ধকতা পাইয়া, উপায়হীন হইয়া অস্বাভাবিক বিকৃতির বিষাক্ত—সংঘর্ষে শেষে উন্মত্ত হইয়া উঠে,

তাহা উহারা কেমন করিয়া বুঝিবেন? কেমন করিয়া বুঝিবেন—মানব জীবনে অবস্থা-বিপর্য্যয়-দ্বন্দ্ব বলিয়া যে একটা কথা আছে, সেটার মাত্রানুসারে—মানুষের ধৈর্য্যশক্তিও সময় সময় কিরূপ উৎকট মাত্রায় ভীষণ হইয়া উঠে। তখন অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণাও সবলে বরণ করিয়া লইবার জন্য মানুষ কেমন করিয়া অধৈর্য্য উন্মাদনায় মাতিয়া উঠে। হায় গো বিধাতা, তোমার সুপবিত্র বিধানের নিকট সশ্রদ্ধ সম্মানে মাথা নোয়াইয়া হাসিমুখে যেখানে আত্মোৎসর্গ করিয়া চলাই নারী-হৃদয়ের স্বভাব-ধর্ম্ম—সেখানে কেনই যে এমন অস্বাভাবিক অধর্ম্মের উত্তেজনায় বর্ব্বর-নৃশংসতা জাগিয়া ওঠে, সে প্রশ্নের উত্তর তুমিই জান নারায়ণ?

অকস্মাৎ বজ্র-চমকের ন্যায় পিয়ারীদের কথা অপেরার মনে পড়িয়া গেল।—সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে সহসা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া তাহার সমস্ত চিত্ত ভরা উগ্র-চিন্তার দ্বন্দ্ব, এক নিমেষে সশব্দে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল।—ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে অপেরা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিতেই চাকর বলিল, "মাইজি ধাবি আয়া।"

অপেরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এই যে এস, ময়লা কাপড় দিচ্ছি।"—যেন সে ময়লা কাপড় দিবার জন্যই অত ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিতেছিল!

ঘরে গিয়া স্বামীর কাপড় চোপড় জড় করিতে করিতে বিছানার জন্য ঝিকে ও পোষাকের জন্য চাকরকে বকিতে সুরু করিয়া দিল,—অপেরাই না হয় মরিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সবাই ত সুস্থ ছিল, এই যে তোয়ালেটায় এত দাগ ধরিয়া গিয়াছে, এই যে এতগুলা ময়লা রুমাল জড়ো হইয়া, এই যে মাথার বালিশটা এত কুৎসিত হইয়া গিয়াছে, এ গুলো দেখিতে নাই! চাকরটা ময়লা পোষাকের পকেট ঝাড়িয়া কাগজ পত্র গুলা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে আরম্ভ করিল; তখন হঠাৎ টেবিলের উপরকার চিঠির গোছার উপর অপেরার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, উপরের চিঠিখানা তাহারই নাম লেখা খামে রহিয়াছে।

টপ্ করিয়া চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া অপেরা ক্ষিপ্র-হস্তে খুলিয়া ফেলিল! শিশিরের চিঠি,—একমাস আগের তারিখে লেখা। খামের মুখ ছিঁড়িয়া চিঠিখানা ইতি-পূর্ব্বেই বাহির করিয়া পড়া হইয়াছে।

অপেরার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। অধীর কম্পিত করে সমস্ত কাগজগুলা উল্টাইয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেখিতে লাগিল,—হাঁ, এই যে আরও দুইখানা পত্র রহিয়াছে, একখানা কুমুদের অন্যখানা শিশিরের।—শিশিরের এই পত্রখানা দুই তিন দিন পূর্ব্বে আসিয়াছে। কুমুদের চিঠিখানা পনের দিন পূর্ব্বের অর্থাৎ এখান হইতে গিয়াই সে পৌছন সংবাদ দিয়াছে।

কুমুদের পোষ্ট কার্ডের সংক্ষিপ্ত লেখা কয়টার উপর সংক্ষেপে চোখ বুলাইয়া, অপেরা স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল, বাকী পত্র দুখানা পড়িবার সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ দেখা গেল না। চিঠি পড়িয়া তাহার যে সাক্ষাৎ স্বর্গ লাভ হইবে না, তাহা ত অকাট্য সত্য,—কিন্তু এই যে স্বামীর সুমধুর প্রকৃতির অপূর্ব্ব সুন্দর মহত্ত্ব বিকাশের পরিচয়গুলা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাহার চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে —ইহাকে ঠেকাইয়া রাখে কিসে?

চুপ করিয়া অপেরা দাঁড়াইয়া আছে। ধোপার হিসাব লেখা হইতেছে না, চাকরটা ইতস্তত করিয়া ডাকিল, "মাইজি হিসাভ লে—"

অকস্মাৎ তীব্র বিরক্তির স্বরে অপেরা বলিয়া উঠিল, "আমি পারবো না, পারবো না—তুমি এখন একটা ফ্লাস্ কাগজে হিন্দীতে টুকে রাখো, তোমার বাবু এলে বলো, তিনিই খাতায় হিসেব টুকে নেবেন।"

নিজের চিঠিখানা লইয়া অপেরা দ্রুতপদে পাশের ঘরে আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল। জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিল, পশ্চিমাকাশে ঘন-সঞ্চিত মেঘের মাঝে তখন বিদ্যুৎ চমকিতে সুরু হইয়াছে।

অপেরা চুপ করিয়া বসিয়া সেই দিকে চাহিয়া

রহিল। যে সুগভীর ক্ষত-ব্যথার মুখে সে জোর করিয়া বিস্মৃতি-আরামের আবরণ টানিয়া ব্যথার মুখ ঢাকাইয়া দিতে গিয়াছিল, এই এক নিমেষের সামান্য রূঢ় সংঘর্ষে তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, পূর্ব্বের সমস্ত স্মৃতি জাগিয়া ক্ষত মুখটা বিস্তৃত হইয়া, অসহ্য ব্যথায় ভিতরটা অধীর হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়দিন নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। অপেরা সংসারের কাযকর্ম্ম দেখে, তারপর নিজের ঘরে আসিয়া পড়িয়া পড়িয়া সেই এক ভাবনাই ভাবে। বিনোদ চাকরী করেন, বাড়ী আসেন, খান, ঘুমান, চাকরদের বকেন, তারপর যথাসময়ে বেড়াইতে বাহির হইয়া যান।

দিনগুলা একই ভাবে কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন ডাক্তারের বিল আসায়—অপরাধিনী অপেরার উদ্দেশে বিনোদ খুব রাগিয়া ঝাঁজিয়া রাঙা মুখের বাণী শুনাইয়া দিলেন, তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। সে কথাটা মর্ম্মভেদী কঠোর ভাষায় শুনাইয়া, তীব্রস্বরে অপেরাকে জানাইয়া গেলেন—অপেরা যে ঢং করিয়া সেই অসুখটা করিয়াছিল, এবং তাহার পেয়ারের লক্কা সেই ডেঁপো ছোকরাটা আসিয়া যেরূপ জবরদস্তি করিয়া সেই সব সাহেব ডাক্তার, মেম-ডাক্তারের হুড়াহুড়ি বাধাইয়াছিল, তাহার খরচ জুটাইতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বিনোদ অপেরার সমস্ত গহনা বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে, যে হেতু অত খরচ সে পাইবে কোথা?—এইবার তাহার এই তালপাতার ছায়া চাকরীটুকুর মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে—এইবার যখন সে ঐ হতভাগিনী মাগীটাকে হাতে খোলা দিয়া গাছের তলায় বসাইয়া রাখিয়া, যেদিকে খুসী চম্পট দিবে, তখন ঐ পাপীয়সী বুঝিবে, তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে!

অপেরা ঘরের মধ্যে পড়িয়া নীরবে সব শুনিল। তাহার অসুস্থতার জন্য সে যে একান্তই অপরাধিনী, তাহার কোনই সন্দেহ নাই! কিন্তু স্বামীর এই অর্থ-সঙ্কটের কোন প্রতীকার ত তাহার হাতে নাই, কাযেই নিজের জীবনের উপর ধিক্কারের উত্তাপটা কয়েক ডিগ্রি উপরে উঠা ছাড়া—অপেরার দ্বারা আর বেশী কিছু হইল না।

সেদিন সকাল বেলা স্নানের পর অপেরা ছাদে চুল শুকাইতে গিয়াছিল, বামুন চাকরেরা সবাই নীচে কায করিতেছিল। অপেরার হাতে, ৺বিবেকানন্দ স্বামীর "ভাব্‌বার কথা" নামক বইখানা ছিল, সে পা ছড়াইয়া বসিয়া হেঁট হইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বইখানা পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে অপেরা এক যায়গায় আসিয়া পৌঁছিল, সেখানে লেখা রহিয়াছে—

'সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হোতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সুয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচো দেবতা ষষ্ঠী মাকাল প্রভৃতি—নাই কি? আর বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে ত ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশকোটী লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হোল, আমিও ছুটলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি একি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, একশ হাত, দুশ পেট, পাঁচশ ঠ্যাঙ-ওয়ালা মূর্ত্তি খাড়া, সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেল্লেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে!—আর ঐ যে বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পাল্‌তে হবে এঁর হুকুম! তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি?—উত্তর এলো, এঁর নাম লোকাচার!"

হঠাৎ অপেরা বই বন্ধ করিয়া তীরবেগে উঠিয়া

দাঁড়াইল। তাহার মুখে একটা উগ্র উত্তেজনার দীপ্তি ঝলমল্ করিয়া উঠিল,—অত্যন্ত অসহিষ্ণু ব্যাকুল ভাবে সে ছাদের এধারে ও ধারে পায়চারি করিতে লাগিল, তাহার ভিতরে কতকগুলা পরস্পর-বিরোধী জটিল চিন্তার মধ্যে কঠোর সংঘর্ষ বাধিয়া গেল!—অপেরা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, তাহার উত্তেজিত হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে সশব্দে স্পন্দিত হইয়া যেন তালে তালে বলিতেছে—"সত্য, সত্য, সত্য—নিদারুণ সত্য! সত্য শাস্ত্রে, সত্য ধর্ম্মে কাহারও বিন্দুমাত্র আস্থা নাই! পূজা করিতেছে মানুষ সকল বিষয়েই শুধু—সেই 'পঞ্চাশ মুণ্ড একশো হাত দুশো পেট পাঁচশো ঠ্যাঙ্গওয়ালা,'—লোকাচার মহাপ্রভুর!—নচেৎ যে দাম্পত্য ধর্ম্মকে, শাস্ত্র এত বড় উচ্চ আধ্যাত্মিকতার উপর শ্রদ্ধাভরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—সেই দাম্পত্য বিধিকে মানুষ সকল দিক হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া—আধিভৌতিকতার সর্ব্বনিম্নস্তরে দুর্গন্ধ পঙ্কিল আঁস্তাকুড়ে নামাইয়া, তাহার উপর সকৌতুকে ভাল্লুক নাচের প্রহসন সুরু করিয়াছে কোন প্রাণে?—কোন মনুষ্যত্বের প্রভাবে এমন হৃদয়হীন পাশবিক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে, সে প্রশ্নের উত্তর ধর্ম্ম দিতে পারিবেন না, সত্য-শাস্ত্র দিতে পারিবেন না,—দিতে পারিবেন শুধু—ঐ পাঁচশ ঠ্যাঙ্গওয়ালা লোকাচার মহাপ্রভু!—"

অপেরা আরও কত কি কথা ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে—দূরে—সহরের রাস্তায় বিনোদের টম্‌টম্ দেখিতে পাওয়া গেল। আজ সকাল বেলা উঠিয়াই তিনি কি কাযের জন্য সহরে গিয়াছিলেন, এখন ফিরিয়া আসিতেছেন। টমটমে সহিস্ বা অন্য কেহ নাই, বিনোদ একাই টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আসিতেছেন।

উপর্য্যুপরি চাবুক খাইয়া, তেজস্বী ঘোড়াটা সজোরে লাফাইতে লাফাইতে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া আসিতেছে। নির্জ্জন পথে জনপ্রাণীর গমনাগমন নাই, বিনোদ নিতান্তই অসংযত-বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে! ঘোড়ার সেই ছুট্ দেখিয়া অপেরা কেমন ভয়-সঙ্কুচিত হইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমেই গাড়ীখানা কাছাকাছি আসিয়া পড়িল, অশ্বের গমন-বেগও মন্দীভূত হইয়া আসিল, অপেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল ; যাক্‌ আর ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন!

ছুটন্ত ঘোড়াটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ অপেরার একটু হাসি পাইল! লোহা চামড়ার সাজ-সজ্জায় সুশোভিত হইয়া, পিঠের উপর সুতীব্র চাবুকের উপর্য্যুপরি আঘাত সহিয়া জন্তুটি দিব্য ত 'কর্ত্তব্য পালন' করিয়া চলিতেছে!—সে প্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সুদৃঢ় পেশী-সমূহ সমন্বিত শক্তি-বিক্রম-দর্পিত বলিষ্ঠ দেহকে, উপযুক্ত ব্যায়াম চর্চ্চায় খাটাইয়া, নিজের স্বাস্থ্যের আনুকূল্য সম্পাদন করিতেছে,—অথবা মনের অনিচ্ছা গোপন করিয়া বিরক্তিকর-বাধ্যতা-দাসত্বে শৃঙ্খলিত হইয়া, লাগামের হ্যাঁচকান্ ও চাবুকের সশব্দ সংঘাত মহিমায় অভিভূত হইয়া অনিচ্ছা-কাতর চিত্তে সভয়ে কর্ত্তব্য পালন করিতেছে,—সে সংবাদ কে জানিতে চাহে?—তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছা আনন্দ নিরানন্দের সংবাদ মানুষ জানিতে চাহে না, মানুষ শুধু হিসাব কসিয়া বুঝিয়া লইতে চায়,—ঐ মূক জন্তুটা দানা ঘাসের বিনিময়ে তাহার ন্যায্যকর্ত্তব্য—অর্থাৎ মানুষের ন্যায্য পাওনাটা ঠিক নিয়মিত রূপে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে কি না—মানুষের ষোল আনা খাইয়া সে যে সামর্থ্যের অভাবে পনের আনা সাড়ে তিনপাই শোধ দিয়া জুয়াচুরী করিবে—সে ক্ষতি মানুষ সহিতে প্রস্তুত নয়, তাই ত চাবুকের জোর অত!—আহা রে! অপেরা ও যদি ঐ ঘোড়াটার ছুটের তালে নিজের মনোবৃত্তি গুলাকে তালিম দিয়া লইতে পারিত!…সংসারের কাছে অশান্তির চাবুক খাইয়া, সমস্ত ইচ্ছা শক্তিকে যদি অমনি ভাবে—উন্মাদ বেগে শান্তিময়ের উদ্দেশে ছুটাইয়া দিতে পারিত,—তাহা হইলে, আঃ!…বন্ধন ও বাধ্যতা-বহনে সবই কাঁটায় কাঁটায় সমান আছে,—ঘোড়ার বন্ধন—মুখে লোহা চামড়ার শোভন-সজ্জা,—আর অপেরার বন্ধন,…

গাড়ীখানা ক্রমে খুবই কাছে আসিয়া পড়িল। অপেরা ঘুলঘুলির ভিতর হইতে অলস উদাস দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।—ছোট বাবুর বাড়ীর কাছাকাছি হইয়া হঠাৎ বিনোদ ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিল। পরক্ষণে কেমন এক অস্বাভাবিক ব্যগ্র চকিত নয়নে এদিক ওদিকে চাহিয়া, পথে কেহ নাই দেখিয়া, হঠাৎ হাতের চাবুক উঠাইয়া, ডান দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া,—রঙ্গভরে হাসিতে হাসিতে কৃত্রিম কোপে, সশব্দে চাবুক আস্ফালন করিয়া কাহাকে যেন ভয় দেখাইল। অপেরা কৌতূহলে উঠিয়া ঘুলঘুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দেখিল, পরক্ষণেই—গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া,—শিকার-সন্ধান-লুব্ধ ব্যাধের তীব্র কটাক্ষ হানিয়া, পিয়ারী অসঙ্কোচ পরিহাসে কি একটা ইঙ্গিত করিয়া, সগর্ব্ব হাস্যে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল! গাড়ীর উপর হইতে বিনোদ কি একটা কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—পিয়ারী ভাল করিয়া উত্তর দিল না। বিনোদ গাড়ী হইতে নামিয়া ছুটিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল, পাঁচিলের আড়ালে মুহূর্ত্তের জন্য অদৃশ্য হইয়া,—তখনই আবার হাসিতে হাসিতে পিছন দিকে চাহিয়া কি কথা বলিতে বলিতে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

হঠাৎ সেই সময় ছাদে অপেরার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল!—এক মুহূর্ত্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংসা-উন্মত্ত উত্তেজনার জ্বালা তাহার চোখে জ্বলিয়া উঠিল, লাগাম হাতে লইয়া সে সশব্দে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিল!

অপেরা যেন পাথর হইয়া গেল!—স্বামী তাহার দুশ্চরিত্র তাহা সে জানে,—তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান নাই! কিন্তু অপেরা এ কি দেখিল! স্বামী যদি একটা ক্রোধোন্মত্তা বিকট-দর্শনা পিশাচী কিংবা প্রেতিনীর সহিত অমন ভাবে রঙ্গ রহস্য করিতেন, তাহাতে অপেরার পক্ষে বিস্মিত হওয়া অসম্ভব ছিল, কিন্তু এ যে তাহা নয়,—ঐ সদ্য বিধবা, গৃহস্থ ঘরের—ও যে তাহাদের গৃহের কন্যা হতভাগিনী পিয়ারী! ওঃ কি ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি! হা ভগবান,—অপেরার স্বামীর এতদূর অধঃপতন ঘটাইলে!

সহসা অপেরার ঘাড় হইতে কপাল পর্য্যন্ত, মাথার এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত অবধি, চড়াক্ করিয়া সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া, যেন ব্রহ্মাণ্ড-ধ্বংসী গর্জ্জনে একটা বিকট বজ্রস্ফোটন হইয়া গেল! তাহার কাণে তালা ধরিল,—দৃষ্টি শক্তিহীন হইয়া গেল। অপেরা কাঁদিতে গেল, কণ্ঠস্বর তখন রুদ্ধ অসাড়!—শুধু চোখ দিয়া নিঃশব্দে—উষ্ণ রক্ত টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল—অশ্রু বাহির হইল না!

পৈশাচিক উন্মাদনায়, দানব-দম্ভে লাফাইতে লাফাইতে বিনোদ চাবুক হাতে লইয়া ছাদে উঠিল। দেখিল, অপেরা উষ্ণ তপ্ত ছাদের শাণের উপর নিস্পন্দ আড়ষ্ট ভাবে লুটাইয়া পড়িয়া আছে, তাহার বক্ষ-স্পন্দন সম্পূর্ণ রুদ্ধ! ঊর্দ্ধে, রৌদ্রকরোজ্জল নীল আকাশের দিকে—তাহার স্থির শান্ত সুবিস্তৃত চক্ষু-তারকা দুইটি বিস্ফারিত ভাবে চাহিয়া আছে,—আর তাহারই পাশ বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া টাট্‌কা রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে!

বিনোদের দানবীয় উন্মাদনা এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল! চাবুক ফেলিয়া বসিয়া পড়িয়া, স্ত্রীর মাথা ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া ডাকিল—"অপেরা, অপেরা—"

অপেরা নিরুত্তর!—আজ সে তাঁহার শাসন বাধ্যতার আইনের কবল চিরদিনের মত এড়াইয়া নির্ভয়ে অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আজ সে আর উত্তর দিবে না!—শুধু মাথাটা ঝাঁকানি পাওয়ায়, অপেরার নাক কাণের পথ দিয়া, দর্ দর্ করিয়া উষ্ণ রক্ত-স্রোত—ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত বেগে ছুটিয়া আসিয়া বিনোদের দুই হাত শোণিতপ্লাবিত করিয়া দিল!

সমাপ্ত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পদাতিক সৈন্য ও তাহাদের যুদ্ধপ্রণালী

(১)

এক হাজার হইতে স্নরশত দলবদ্ধ সৈন্য সমষ্টির নাম 'পল্টন' (Battalion or Regiment)। পল্টন চারিটী 'কোম্পানি'তে, কোম্পানি চারিটী 'প্লেটুনে', এবং 'প্লেটুন' চারিটী 'সেক্সনে' বিভক্ত। একটি সেক্সনের অধিনায়ক (Commander) ল্যান্স-নায়েক, নায়েক কিংবা হাবিলদার ; প্লেটুনের অধিনায়ক জমাদার অথবা সুবাদার; কোম্পানীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন অথবা একটী কোম্পানির মেজর। পল্টনের প্রধান অধিনায়ক (Officer Commanding) একজন মেজর,লেপ্টেনেন্ট-কর্ণেল অথবা কর্ণেল। ইঁহার সহকারী মেজর অথবা ক্যাপ্টেন ইঁহার অনুপস্থিতিতে সে স্থান গ্রহণ করেন। পল্টনের সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্তের জন্য ইঁহার আরও দুইজন সহকারী থাকেন ; যথা এড্‌জুটেণ্ট ও কোয়ার্টার মাষ্টার। প্রথমোক্ত, সৈন্যগণের রীতি নীতি ও শৃঙ্খলাদি (discipline) এবং কুৎকাওয়াজাদির (parade) জন্য দায়ী। শেষোক্ত, সৈন্যগণের বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা, সুখ স্বচ্ছন্দতা, পোষাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাদির জন্য দায়ী—অর্থাৎ বাসস্থানের যাবতীয় সুবন্দোবস্তের কর্ত্তা।

একটী পল্টন গঠন করিবার জন্য যে সকল নূতন লোককে সৈন্যদলভুক্ত করা হয় তাহাদিগকে রংরুট (recruit) বলা হয়। ইহারা ছয় মাস শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া একটী চাঁদমারি (target) পরীক্ষা দিয়া সিপাহী শ্রেণিভুক্ত হয়। রংরুট ও সিপাহীগণ প্রাতে অর্দ্ধঘণ্টা ব্যায়াম করিয়া, একঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় দেড়ঘণ্টা কুৎকাওয়াজ করে। সায়াহ্নেও দেড়ঘণ্টা কুৎকাওয়াজ করিতে হয়। ঐ সময়ের মধ্যেই তাহাদিগকে বন্দুক (Rifle) ছুড়িবার নিয়মাদি (Musketry) এবং সঙ্গিন্ যুদ্ধ (Bayonet fighting) শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপে ছয়মাস শিক্ষা লাভ করিয়া টারগেট দাগিয়া যখন তাহারা সিপাহী শ্রেণিভুক্ত হয়, তখন তাহাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া নানা শ্রেণীতে বিভিন্ন কার্য্য, যথা সাঙ্কেতিক সংবাদপ্রেরণ প্রণালী (Signalling), বোমা নিক্ষেপ প্রণালী, কলের কামান (Machine gun) চালাইবার প্রণালী এবং গুপ্তচরের কার্য্যাদি (Scouting) শিক্ষা দেওয়া হয়। পল্টনের সমস্ত সৈন্যকেই সিপাহী শ্রেণিভুক্ত হইবার পর যুদ্ধ-প্রণালী (field practice) ও পরিখাদি খনন (trench digging) শিক্ষা দেওয়া হয়। যখন তাহারা সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া নানাবিধ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখন তাহাদিগকে সম্মুখ সমরে প্রেরণ করা হয়।

দেশে যখন শান্তি বিরাজ করে তখন সিপাহীগণের কোন কষ্টই নাই ; সপ্তাহে দুই এক দিন কুৎ-কাওয়াজ করিয়াই বিশ্রাম। রংরুটগণকে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সিপাহী শ্রেণিভুক্ত হইতে হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সকল সৈন্যকে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এমন কায নাই যাহা তাহাদিগকে করিতে হয় না।

পদাতিক সৈন্যের রাইফেলই প্রধান অস্ত্র। তাহা ছাড়া 'মেসিন গান্' বা 'লুইজ্ অটোমেটিক্ গান্' (কলের কামান), বোমা, রিভলবার ও সঙ্গিনাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সৈন্যগণ এই দুই প্রকার রাইফেল ব্যবহার করিয়া থাকে ; যথা—

(১) লি, এণ্ড এন্‌ফিল্ড, মার্ক ৩, .৩০৩। এই রাইফেলই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ভিতর এক সঙ্গে দশটি গুলি ভরা যায় এবং বোল্ট টানিয়া একটি একটি করিয়া ছুড়া যায়।

(২) এন্‌ফিল্ড, প্যাটার্ণ ১৯১৪, ৩০৩। ইহার মধ্যে এক সঙ্গে পাঁচটি গুলি ভরা যায়।

পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত পল্টনেই মেসিন গান ব্যবহৃত

হইত কিন্তু উহা অত্যন্ত ভারী ও ব্যবহারে নানা অসুবিধা বলিয়া আজকাল উহা চালনার জন্য স্বতন্ত্র 'কোর' (Corps) হইয়াছে। উহার পরিবর্ত্তে আজকাল প্রত্যেক পল্টনেই লিউইজ্ অটোমেটিক্ '৩০৩ গান্ ব্যবহৃত হয়। ইহা বিজ্ঞানের একটি চমৎকার আবিষ্কার। এই বন্দুক খুব হাল্কা ও যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। চালকের পারদর্শিতা ও ক্ষিপ্রকারিতা অনুসারে মিনিটে চারি শত হইতে পাঁচ শত কিংবা আরও বেশী গুলি ছুড়া যায়। এই সকল মেসিন্‌গান দেখিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে,আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সত্যসত্যই চক্ষের নিমেষে সহস্র বাণ ত্যাগ করিতেন। এই 'লিউইজ-গানের' ভিতরে এক সঙ্গে ৪৭টী গুলি ভরা যায় এবং উহা ছুড়িতে ২।৩ সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগে না। পুনরায় গুলি ভরিতেই যা সময় নষ্ট হয়। চালকের পার্শ্বেই একজন সাহায্যকারী থাকে, সে তাহাকে পূর্ণ 'মেগাজিন্' যোগাইতে থাকে এবং চালক উহা উপযুক্ত স্থানে ভরিয়া গুলি ছুড়িতে থাকে। একটা পল্টনে আজ্‌কাল এই কামান আটটা হইতে ষোলটা থাকে। কালে আরও কত হইবে কে বলিতে পারে! পল্টনের প্রায় দুই শত লোককে ইহা চালাইবার প্রণালী শিক্ষা করিতে হয়। প্রত্যেক প্লেটুনেই একটা করিয়া 'মেসিন গান' সেক্সন থাকে। এই সকল "গানার" (কামান চালক)কে রিভলবার ও বোমা ছুড়িবার প্রণালী এবং সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ প্রণালী ও গুপ্তচরের কার্য্যাদিও শিক্ষা করিতে হয়। ইহারাই পল্টনের সেরা সিপাই। তাহা ছাড়া বোমা, সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ ও গুপ্তচরাদির বিভিন্ন সেক্সন্ থাকে।

পল্টনের রীতি নীতি (discipline) এমনি সুশৃঙ্খলিত যে, সৈন্যগণকে বাধ্য হইয়া সংযত, স্বাবলম্বী, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী হইতে হয়। প্রত্যেক সৈন্যকেই আপন স্বাস্থ্যের জন্য যত্ন লইতে হয়। যদি কোন সৈন্য তাহার নিজ ত্রুটিতে কোনপ্রকার রোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সময় সময় অবস্থা বিশেষে সে জন্য শাস্তি পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়। প্রত্যেক পল্টনেই একটা করিয়া স্বতন্ত্র হাসপাতাল থাকে (অবশ্য যুদ্ধের সময় পল্টন যখন রণক্ষেত্রে অবস্থান করে)। প্রায়ই সৈন্যগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইয়া থাকে।

(২)

পূর্ব্বকালের মত বাহুবলের যুদ্ধ এখন আর নাই; আধুনিক যুগের যুদ্ধব্যাপারে বিজ্ঞান ও মস্তিষ্ক চালনাই প্রধান অবলম্বন। যে জাতি যত বৈজ্ঞানিক অস্ত্রাদি আবিষ্কার করিবে, তাহাদেরই ক্ষমতা তত অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

সৈন্যগণ গুপ্তচরের নিকট হইতে শত্রুর অবস্থান অবগত হইয়া, উপযুক্তস্থানে পরিখা খনন করিয়া গোলাগুলি চালাইতে থাকে। এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং সময় সময় যখন শত্রুর দুর্ব্বলতা উপলব্ধ হয় অথবা আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময় আসে তখন সৈন্যগণ রাইফেলে সঙ্গিন চড়াইয়া পরিখা হইতে লাফাইয়া উপরে উঠে এবং ভীষণ কোলাহল করিয়া শত্রু সৈন্যের পরিখার ভিতর ঝম্ফপ্রদান করে। সময় সময় বোমা নিক্ষেপকারীর দল গুপ্তচরের নিকট হইতে শত্রুর অবস্থান অবগত হইয়া, গোপনে শত্রুর চক্ষে যেন ধূলি দিয়া তাহাদের পরিখার ভিতর প্রবেশ করে এবং শত্রু-সৈন্য ধ্বংস করিতে থাকে। এই সময়ে ইহারা যেন নিজ নিজ প্রাণ হাতে লইয়া কার্য্য করে। অবশ্য এইরূপ কায প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না;—এবং একবার এই কাযে গমন করিলে প্রায়ই কাহাকেও আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

সৈন্যগণ যখন শত্রুর সন্ধানে রণক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হয় তখন তাহারা একটি প্রকাণ্ড দল (Division or Brigade) গঠন করে। এই দলে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, হাঁসপাতাল, পায়োনিয়ার (অর্থাৎ যাহারা পরিখাদি খনন করে এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কার করে, ইহারাও পদাদিক সৈন্যশ্রেণিভুক্ত), দ্বিচক্রযানারোহী (cyclist) এবং গোলাগুলি, রসদ ও যাবতীয় আবশ্যকীয় সামগ্রী বহনকারী গাড়ী ও

খচ্চরাদি (transport) থাকে। সমস্ত দলটীকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রে পশ্চাতে ও পার্শ্বদেশে রক্ষক (advanced guard and rear guard) নিযুক্ত হয়। সর্ব্বাগ্রে একদল অশ্বারোহী গুপ্তচর (cavalry scout) প্রেরিত হয়। তাহারা শত্রুর সন্ধানে চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। পদাতিক গুপ্তচরও চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। উহারা শত্রুর সন্ধান পাইলেই দলস্থ অধিনায়কের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে এবং অধিনায়ক তদনুযায়ী সৈন্য চালনা করেন। তাহা ছাড়া বিমানবিহারীদের (air-men) নিকট হইতেও শত্রুর অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। দলটী কোথাও অবস্থান করিলে, পূর্ব্ব নিয়োজিত রক্ষকগণকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য নূতন একটি দল, সমস্ত দলটাকে পাহারা দেওয়ার জন্য (sentry groups) নিযুক্ত হয়।

এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে যখন দলটার উপর শত্রুর কামানের গোলা পড়িতে আরম্ভ করে, তখন দলস্থ অধিনায়ক উহাকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেন। ইহাতে এক সঙ্গে অধিক লোক বিনষ্ট হইতে পারে না; কারণ একটা সাধারণ গোলা (shell) বিদীর্ণ হইলে ২০০ শত গজের অধিক দূরে ছড়াইয়া পড়ে না। সুতরাং ২০০ শত গজের বাহিরে অবস্থিত কাহারও অনিষ্ট হয় না। এইরূপে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া দলটী যখন শত্রুর রাইফেল রেঞ্জের ভিতর পৌঁছে তখন পূর্ব্বোল্লিখিত বিভক্ত খণ্ডগুলিকে শত্রুর অবস্থান অনুসারে কয়েকটী সুদীর্ঘ 'ঢেউ খেলানো' লাইনে ছড়াইয়া দেওয়া হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর শুইয়া শত্রুর উপর গুলি ছুড়িবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। এই সকল লাইনের দুই পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে কতকগুলি "লিউইজ্ গান" থাকে। এই সময় সেনাগণ নিজ নিজ সেক্সন ও কমাণ্ডারের আজ্ঞানুযায়ী গুলি ছুড়িতে থাকে। তৎপর আবার অগ্রসরে হইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, কোন এক সেক্সনের কমাণ্ডার তাঁহার সেক্সনকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী সঙ্কেত দ্বারা অন্যান্য সেক্সন্ কমাণ্ডারগণকে জানাইয়া দেন যে সে তাঁহার সেক্সন্ লইয়া অগ্রসর হইবেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই তিনি তাঁহার সেক্সনকে অগ্রসর হইবার আজ্ঞা প্রদান করেন এবং আর একটা সঙ্কেত দেখান। সেক্সনস্থ সৈন্যগণ আজ্ঞা পাওয়া মাত্র, যথাসম্ভব মাটির সহিত মিশিয়া দৌড়াইয়া ১৫ হইতে ২০ গজ অগ্রসর হইয়াই পুনরায় শুইয়া পড়িয়া গুলি ছুড়িতে থাকে। এই সময়ে অন্যান্য সেক্সন কমাণ্ডারগণ শেষোক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্নটী দেখিবামাত্র নিজ নিজ সৈন্যগণকে ক্ষিপ্রহস্তে শত্রুর উপর গুলি ছুড়িবার আজ্ঞা দেন। ইহাতে শত্রুগণ সেই সময় মাথা গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, সুতরাং অগ্রগামী সেক্সনটা কতকটা নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপে অগ্রসর হইবার সময়ই অনেক সৈন্য হত হয়। এই প্রণালীতে একটার পর একটা সেক্সন্ অগ্রসর হইয়া, পুনরায় লাইন গঠন করে এবং ক্রমে ক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইতে থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণালীতেই পশ্চাতের লাইনগুলিও ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। অবশ্য উহারা অগ্রসর হইবার সময় 'লিউইজ্ গান'ই অধিক কার্য করে। চালকেরা দুই পার্শ্ব হইতে শত্রুর উপর গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। যখন সম্মুখের লাইনস্থ সৈন্য-সংখ্যা কমিয়া যায়, তখন পিছন হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে যখন দলটা শত্রুর ২০০শত গজের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে, তখন সমস্ত সৈন্য সম্মুখস্থ লাইনের সহিত মিশিয়া যায় এবং নিজ নিজ রাইফেলে সঙ্গিন চড়াইয়া গুলি ছুড়িতে থাকে। যখন শত্রু হইতে ১০০।১৫০ গজ ব্যবধানে থাকে, তখন একসঙ্গে সকল সৈন্য লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠে এবং ভীষণ কোলাহল করিয়া শত্রুকে সঙ্গিন যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। শত্রুকের ভীত করিবার উদ্দেশ্যেই এই ভীষণ কোলাহল করা হয়। এই সঙ্গীন সংঘর্ষে দুই পক্ষই প্রায় সমূলে বিনষ্ট হয়। কখন কখন এই সময়ে অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পরে।

সময় সময় এমনও হয় যে, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যুদ্ধ

করিবার সময় সৈন্যগণ সম্মুখে অগ্রসর হইবার সুযোগ একেবারেই পায় না। তখন সৈন্যগণ যে স্থানে শয়ন করিয়া গুলি ছুড়িতে থাকে, সেই স্থানেই নিজ নিজ বেল্টের সহিত ঝুলান ছোট ছোট "এন্‌ট্রেঞ্চিং টুল" (মৃত্তিকা খনন করিবার জন্য কোদালের ন্যায় যন্ত্র-বিশেষ) লইয়া ছোট ছোট গর্ত্ত কাটিয়া সম্মুখে মাটির ঢিপি নির্ম্মাণ করিয়া, উহার পশ্চাতে আশ্রয় লইয়া শত্রুর উপর গুলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। রাত্রিকালে ঐ সকল গর্ত্তকে পরিখায় পরিণত করিয়া উহাতে অবস্থান করে। এইরূপে প্রতি রাত্রেই পরিখা খনন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে।

এই সকল প্রণালী ছাড়া স্থানবিশেষে আরও নানবিধ উপায়ে যুদ্ধ হইয়া থাকে এবং বড় বড় রণপণ্ডিত সেনা-পতিগণ নিজ নিজ মস্তিষ্ক চালনা করিয়া নিত্য কত নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া থাকেন তাহা লিখিয়া ফুরাইবার নহে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র গুপ্ত।
(ল্যান্স-নায়েক)

বাদলের চিঠি

(চিত্র)

প্রিয় গল্পপ্রিয়,

তোমাকে অনেকদিন ধরিয়া লিখিব লিখিব ভাবিতেছি, কিন্তু হইয়া উঠিতেছে না। আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ,—শুধু এইটুকু লিখিলে তুমি খুসী হইবে না, তা জানি। তোমাকে লিখিতে হইলে ইনিয়ে বিনিয়ে এমন সব কথা লিখিতে হইবে যাহা তুমি হাজারবার জান যে উহার একটি বর্ণও সত্য নয়। কিন্তু তাই পড়িয়া তোমার খুসীর অন্ত নাই। কিন্তু তেমন জিনিষ শুক্লা দিনের উজ্জ্বল আলোকে বসিয়া লেখা চলে না। তাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আজ কয়দিন ধরিয়া তাহা পাওয়া গিয়াছে।

গতকল্য আষাঢ়ের ঠিক প্রথম দিবস ছিল কিনা তাহা আমার জানা নাই, কেননা পাঁজিপুঁথির অত খোঁজ রাখি না। কিন্তু সারাদিন আকাশ-বাসরে মেঘ ও বিদ্যুতের এমন উন্মত্ত লীলা চলিতেছিল যে আমার মেঘদূত-পড়া মন বলিয়া উঠিল—আষাঢ়স্য প্রথম দিবস বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে এই।

ঘরের বাহির হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীর যত কর্ম্ম-কোলাহল থামিয়া গিয়াছিল, মনে হইল যেন কালের মস্ত ঘড়িটা বিকল হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেশ বুঝা গেল বাহির হইবার আর উপায় নাই, কেননা আফিস ফেরতা কেরাণী ছাড়া এমন দিনে শেয়াল কুকুরও ঘরের বাহির হয় না। কিন্তু তুমি হয়ত বলিবে যে এ অত্যন্ত অ-কবির কথা। কারণ তুমি সংস্কৃত কাব্য পড়িয়াছ এবং নিশ্চয়ই বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা করিয়া থাক। ঐ সকল সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিদের মতে, ঘোর বাদলের রাতে,—যখন অন্ধকার সূচি দিয়া ভেদ করা যায়,—নূপুর তুলিয়া বাঁধিয়া ও কাঁকণ বাহুতে আঁটিয়া রাখিয়া অভিসারিকা বেশে পথে বাহির হইবার এমন শুভযোগ শরতে, হেমন্তে অথবা শীতে, বসন্তেও খুঁজিয়া মিলিবে না—গ্রীষ্মকালের ত কথাই নাই।

সে কথা যাক্। আমি শুধু দেখিলাম যে সারাটা বিকাল ও নিদ্রা যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সারাটা সন্ধ্যা নিতান্ত সঙ্গহীন অবস্থায় ঘরের চারিটি দেয়ালের ভিতর বন্দী হইয়া আমাকে থাকিতে হইবে।

তুমি জান কবি লিখিয়াছেন,—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

—অর্থাৎ কি না মেঘলা দিনে প্রণয়িনী কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিলেও সুখী লোকের মন উদাসী হইয়া যায়—দূরে থাকিলে ত কথাই নাই! কাযেই এহেন বাদলের দিনে আমার বিরহযন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া থাকা উচিত। কিন্তু উক্ত বিধির দুইটি সর্ত্তের কোনওটি অনুসারেই আপাততঃ তাহার যখন কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন ভাবিলাম, অন্ততঃ বিরহের এই মহাকাব্য খানাই পড়া যাক্।

আলমারি হইতে মেঘদূত বাহির করিয়া ইজিচেয়ারটা পশ্চিমের জানালার পাশে টানিয়া লইয়া সুর করিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। বাহিরে বৃষ্টির বিরাম নাই, আকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন, উহারই ভিতর উন্মত্ত বাতাস বিচিত্র ভঙ্গীতে খেলা যুড়িয়া দিয়াছে; আর এদিকে রুদ্ধ গৃহে একাকী আমি বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া মেঘদূত পড়িয়া যাইতেছি,—এসবে মিলিয়া কবির বর্ণিত চিত্র ও যক্ষের বিরহটা মনের ভিতর অত্যন্ত জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল।

বইটা যখন শেষ হইল তখন আকাশের আলো নিবিয়া গিয়াছে। বইটা কোলের উপর রাখিয়া তেমনি ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। বর্ষার দিনটা মনে হয় যেন প্রকৃতির বিশ্রামের দিন, কোনও তাড়াহুড়া নাই, সব যেন এই হচ্ছে-হবে ভাব। মানুষেরও কর্ম্মকোলাহল থামিয়া যায়—বাহিরটা তার বন্ধ। কাযেই ক্ষুধিত তৃষিত অন্তরটি আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পায়। মনে হইতেছিল এই বর্ষাকালটাকে আমাদের দেশের লোকেরা বৃথা যাইতে দেয় নাই; তাহাদের অন্তরের রস দ্বারা পূর্ণমাত্রায় ইহাকে উপভোগ করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। তাই ঝুলন কাজরি ইত্যাদি উৎসবের সৃষ্টি। আর মনে হইতেছিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই বর্ষা লইয়া কত বিচিত্র ভাব পাঠককে উপহার দিয়াছেন! সেগুলি যে নিছক 'কবিত্ব' সেকথা এহেন বর্ষার দিনে রুদ্ধ অন্ধকার গৃহে মেঘদূত স্পর্শ করিয়া কেহ বলিতে পারে কি না জানি না।

এই ভাবে পড়িয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ চক্ষের সম্মুখে রাজপথে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, উজ্জ্বল আলোক শোভিত বড় বড় সাইন্-বোর্ডওয়ালা দোকানগুলি মূর্ত্তিমান গল্পের মত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। ভিজা পথে আলো পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছিল, মনে হইল উহার উপর দিয়া শুষ্ক মুখে ক্লান্তদেহে যাহারা যাতায়াত করিতেছে, বর্ষার রস উপভোগ করিবার মত মনটি যে কোথায় তাহাদের ডুবিয়া গিয়াছে সে খবর তাহারা নিজেরাই রাখে না।

মেঘদূত পড়িলাম,'অনধিকারী' হইয়াও বৈষ্ণব কবিতা পড়িয়াছি, আর রবীন্দ্রনাথ—যিনি বর্ত্তমান যুগে বিশেষ করিয়া মেঘের গান গাহিয়াছেন,—তাঁহার কাব্যও পড়া আছে। সকলে মিলিয়া বর্ষার দিনের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া পাঠককে পরিবেষণ করিয়াছেন। অন্ধকার গৃহে একাকী বসিয়া বসিয়া এতক্ষণ সেই সব রস, স্মৃতির সাহায্যে একটু একটু করিয়া উপভোগ করিতেছিলাম, হঠাৎ রাজপথে আলো ও উজ্জ্বল বাড়ীগুলি দেখিয়া মনটা এই মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। সম্মুখে দেখিলাম, সুন্দর সাজানো গোছানো আলোক-উজ্জ্বল একখানা দোতালা বাড়ী, আর উহারই পাশে —রাজার পাশে ভিখারীর মত—ছোট একখানা খোলার ঘর। এই দুই বাড়ীর লোকেরা আজিকার এই বর্ষার দিনটা কিভাবে কাটাইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য মনে খেয়াল চাপিল। কিন্তু সর্ব্ব স্থানের 'পাসপোর্টের' মালিক, অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনা দেবীর অনুকম্পা ছাড়া যে তাহা সম্ভবপর নয় সে কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল। কেননা আইন বাঁচাইয়া 'ট্রেস্পাস্' করিতে হইলে ঐ দেবীর মত সহায় আর কেহই নাই। তাঁহারই অনুগ্রহে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া সেদিন যে দুইটি বস্তুতান্ত্রিক 'চিত্র' দেখিবার সৌভাগ্য

আমার ঘটিয়াছিল, তাহাই, হে আমার গল্পপ্রিয়, তোমাকে একান্ত নিরীহ ও ধৈর্য্যশীল জানিয়া তোমারই কাছে বর্ণনা করিতেছি।

কল্পনাদেবীর নিকট হইতে ছাড়পত্র লইয়া প্রথমেই আলোকোজ্জ্বল বাড়ীটাতে প্রবেশ করা গেল।—

১নং

প্রথম রাত্রে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল বলিয়া ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানটা খুলিয়া দিয়া, ধীরেন সঙ্গীহীন গৃহে একাকী নিদ্রা যাইতেছিল। শেষ রাত্রিতে কখন বৃষ্টি নামিয়াছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই, অত্যন্ত শীত বোধ হওয়াতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু বুজিয়াই সে উপলব্ধি করিল, বাহিরে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—আর দেহের উপর ফন্‌ফন্ করিয়া পাখা ঘুরিতেছে। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, অতি কষ্টে কোঁচার কাপড়টা খুলিয়া সে গায়ে দিল; কিন্তু উহাতে শীত মানিল না। ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া সুইচ্‌টা বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু শেষ-রাত্রির আরামের আলস্যটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিবার মত সামর্থ্য তাহার ছিল না। অবশেষে যখন দেখা গেল যে শীত ক্রমেই বাড়িতেছে, দেহ যথাসম্ভব গুটিসুটি করিয়াও রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই এবং পুনরায় ঘুম হওয়ার আশাও নাই, তখন কাযেকাযেই তাহাকে উঠিয়া সুইচটা বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

পুনরায় সে শয্যাগ্রহণ করিল এবং পাশ বালিশটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া মিনিট দুই পরেই নাক ডাকা সুরু করিয়া দিল।

ঘুম যখন তাহার ভাঙ্গিল, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নাই। ভৃত্য নীচে খাবার ঘরে টেবিলের উপর প্রাতরাশ দিয়া, কয়েকবার দরজার কাছে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, দরজা বন্ধ দেখিয়া ডাকিতে সাহসী হয় নাই। ধীরেন বালিশে মাথা রাখিয়াই চাহিয়া দেখিল, টেবিলের উপর টাইমপিসটায় আটটা বাজে; ভাবিল, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, এইবার উঠি। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল—উঠিয়াই বা করিব কি, কোথাও বাহির হইবার জো নাই, এই দীর্ঘ দিনটা নিতান্ত একাই কাটাইতে হইবে।

অবশেষে তাহাকে উঠিতেই হইল। দরজা খুলিয়াই ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চা দেওয়া হইয়াছে কি না। ভৃত্য আসিয়া জানাইল, চা ভিজানো হইয়াছে। ধীরেন তখন হাত মুখ ধুইয়া আয়নার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চুল দুরস্ত করিয়া চিবুকে হাত দিয়া সে দাড়ির খোঁচাটা অনুভব করিয়া দেখিল—কিন্তু বেলা হইয়া গিয়াছে, ভাবিল ক্ষৌরকর্ম্মটা স্নানের পূর্ব্বেই করা যাইবে।

নীচে নামিতে নামিতে বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সারা আকাশ জুড়িয়া ঘন মেঘ করিয়া আছে। মনে মনে ভাবিল, এমন মেঘলা দিনটা একা কাটানো কি মুস্কিল! মনের উপর কি যেন চাপিয়া বসিয়া আছে, কিছুই ভাল লাগে না।

সাহেব না হইলেও ধীরেন টেবিলে খাওয়াটা পছন্দ করিত। চেয়ারে বসিয়াই সে চা-দানীতে হাত দিয়া উহার উষ্ণতা পরীক্ষা করিল। দেখিল অনেকক্ষণ চা দেওয়া হইয়াছে—ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এই বাদলের দিনে একটু বেশি উষ্ণ চা না হইলে তাহার চলিবে না, তাই ভৃত্যকে পুনরায় চা দিতে আদেশ করিয়া, ডিম ও টোষ্টের সদ্ব্যবহারে মন দিল।

চা খাইয়া সে বরাবর উপরে চলিয়া গেল। বারান্দায় টবে ফুলগাছগুলি জলের ঝাপ্টা খাইয়া খুব সতেজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিল। তারপর এক-বার রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে ফুলগাছ গুলি দেখিতে লাগিল। গুঁড়াগুঁড়া বৃষ্টি আসিয়া তাহার চোখে মুখে পড়িতেছিল। তাহা যেন তাহার ভালই লাগিতেছিল; অথবা এমনি অন্যমনস্ক ও অবসাদগ্রস্ত যে সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই ছিল না।

কিছুই যে তাহার ভাল লাগিতেছিল না তাহা

বেশ বুঝা গেল। বারান্দা হইতে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া আসিয়া, অরগ্যানের ডালাটা তুলিয়া বাজাইতে বসিল। কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। একটা গানের অর্দ্ধেক বাজাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। ভাল লাগিবার জন্য সে যে কি করিবে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছিল না। খানিকক্ষণ এটা সেটা টানিয়া টুনিয়া, শেষটায় সে নিরস্ত হইয়া পড়িল। কবি বোধ করি এই অবস্থারই বর্ণনা বিরহী চক্রবাককে দিয়া করিয়াছেন,—

আয়াতি যাতি পুনরেব জলং প্রয়াতি
পদ্মাঙ্কুরাণি বিচিনোতি ধুনোতি পক্ষৌ।
উন্মত্তবদ্ ভ্রমতি কূজতি মন্দমন্দং
কান্তাবিয়োগবিধুরো নিশি চক্রবাকঃ॥

ঘরে পাইচারি করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল, ভারি ত মজা! আমি এখানে একা একা পচে' মরি, আর তিনি সেখানে দিব্য-আরামে গল্পগুজবে দিন কাটান!—সে হচ্ছে না, আজ তোমাকে আসতেই হবে।—এই বলিয়া সে টেলিফোনের কলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

তাহার স্ত্রীর নাম মলিনা—রঙটা একটু স্নিগ্ধ কালো, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে নিখুঁৎ সুন্দরী। মোটে দুই বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। 'প্রথম-যখন-বিয়ে হল—বাহা-বাহা-বাহারে' ভাবটা এখনও তাহাদের কাটিয়া যায় নাই।

আজ দুইদিন তাহার স্ত্রী ভবানীপুরে পিত্রালয়ে গিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে বিরহী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যক্ষ ছিল সেকেলে মানুষ, তাই সে মেঘকে দূত করিয়া ধীরে সুস্থে বিরহিণী প্রিয়ার কাছে সংবাদ পাঠাইয়াছিল; কিন্তু একালের এই বৈজ্ঞানিক যুগের নবীন বিরহীর কাছ হইতে অতটা ধৈর্য্য আশা করা যায়না। তাই সে দূতী করিল—টেলিফোনের বিদ্যুৎকে।

সেণ্ট্রালকে ডাকিয়া, ভবানীপুরের একটা বাড়ীর নম্বর সে বলিয়া দিল।...কিছুক্ষণ পর শব্দ আসিল —"কে আপনি? কাকে চান?"

শুনিয়া ধীরেন মনে মনে বলিয়া উঠিল, "বাবা! এ যে শ্বশুর মশায়!" তারপর কলে মুখ দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আমি ধীরেন; রমেশবাবুকে একটু শুন্‌তে বলুন।"—উপস্থিত বুদ্ধিতে এর চেয়ে বেশী আর তাহার জোগাইল না। রমেশবাবু মলিনার দাদা। পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল,—'ছাই, রমেশবাবুকে আবার কি বলব, কিছুই ত বলবার নেই তাকে!'

কিন্তু আবার যখন কানে শুনিল—"দাদাকে কেন জামাইবাবু? দাদা বাড়ী নেই।"—তখন সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তবু রক্ষা,—মলিনার ছোট বোন নীলিমা আসিয়া হাজির।

ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ তোমরা? তোমার দিদি কোথায়?"

কলে উত্তর আসিল, "কেমন আবার থাকব? ভালই আছি। আপনার ওখানে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে? বাবা! কি বৃষ্টিই হয়েছে আমাদের এখানে। কালাচাঁদ বলে ও নাকি এমন বৃষ্টি শীগ্‌গির দেখে নি। খুব সকাল বেলা আমাদের উঠানে এক হাঁটু জল হয়েছিল, আমার এমন ইচ্ছা করছিল সেই জলে নাম্‌বার জন্যে, কিন্তু মা দিলেন না। বামা ঝী এমন এক আছাড় খেয়েছিল!—"

ধীরেন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। বাধা দিয়া বলিল—"শোন, শোন, তোমার দিদি কোথায়, তাকে একটু ডেকে দাও।"

"দিদি কোন ঘরে আছে জানিনে। এখন আর তাকে খুঁজতে যেতে পারি নে। আমার হাতের লেখা হয়নি, কিছু হয়নি, এক্ষুণি হয়ত গাড়ী এসে পড়বে।"

ধীরেন মিনতির স্বরে বলিল—"লক্ষ্মীটি আমার, একটিবার ডেকে দাও।" তার পর মনে মনে ভাবিল, —এই সব ছোট মেয়েদের যদি একটু বুদ্ধি থাকে!

খানিকক্ষণ পরেই শ্রীমতী মলিনা দেবীর কণ্ঠ শুনা গেল, "কে আপনি?"

ধীরেন উত্তর করিল, "তোমার যম।"

"তা ত অনেক দিন টের পেয়েছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, ঘরে কি আর কেউ আছে?"

"কেউ নেই। তোমার ঘরে?"

"কেউ নেই।—বলি ব্যাপার কি? নীলিমা যে সারা বাড়ী চীৎকার করে ফাটাচ্ছে—দিদি শীগ্‌গির এস জামাই বাবু তোমাকে ডাক্‌ছেন। অত হাঁকাহাঁকি কেন বল দিকিন?"

ধীরেন গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "তোমার ত বেশ আক্কেল! এই ভয়ঙ্কর বাদলের দিনে আমাকে একা ফেলে, দিব্যি দশজনকে নিয়ে মজলিস করা হচ্ছে? আমার যে একা একা ঘরে বসে বসে কি ভাবে দিন কাটছে, সেদিকে তোমার ভ্রুক্ষেপও নেই। ঘোর কলিকাল! আর্য্যনারীগণ কখনও—"

"ওগো আর্য্যদেশের আর্য্যপুত্র, বক্তৃতা একটু থামাও, এক্ষণি কেউ এসে পড়বে। আহা, কি দুঃসহ দারুণ বিরহ! বলি, কেউ ত আর এখানে আসতে বারণ করে নি, এসে পড়লেই ত হয়!"

"হ্যাঁ, তুমি গেছ, এখন তোমার পেছনে পেছনে আমি যাই আর কি! সকলে কি ভাববে?—ঠাট্টা নয়, আজই বিকালে চলে এস। নইলে এমন কিছু করে বসব যে পরে তোমাকে পস্তাতে হবে। চাই কি কলকাতা ছেড়ে চলেও যেতে পারি একদিকে, যেখানে এমন বাদলের অত্যাচার নেই।"

"বাবা আসছেন, আমি যাই। হুকুম যখন করেছ তখন ত যেতেই হবে।"

আহারান্তে ধীরেন সময় কাটাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করিল,—অর্থাৎ দিবানিদ্রা। ঘুম যখন তাহার ভাঙ্গিল তখন, মোটে তিনটা। বাহিরে তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। সময় আর তাহার কিছুতেই কাটিতে চাহে না। শয্যার কাছে একটা টিপয় আনিয়া, তাহার উপর গ্রামোফোনটা রাখিয়া অগত্যা তাহাতেই মন দিল।

গ্রামোফোন যখন গাহিতে আরম্ভ করিল—

'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'—

ঠিক সেই সময় ধীরেন নীচে গাড়ীবারান্দায় গাড়ী আসিবার শব্দ শুনিতে পাইল। অমনি সে দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া নিতান্ত গম্ভীরভাবে পাশ ফিরিয়া শুইল!

মলিনা নীচে হইতেই গানটা শুনিতে পাইয়াছিল। উপরে উঠিতে উঠিতে তাহার মনে হইল, একটু চমকিত করিতে হইবে। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া দরজার কাছে আসিয়া উঁকি মারিল। তার পর ক্ষিপ্রপদে ঘরে ঢুকিয়া, আঁচল দিয়া স্বামীর চোখ চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা হা! কাঁদছ যে! ছি, এত কি কষ্ট!"

কিন্তু তাহার অতবড় ড্র্যামাটিক ব্যাপারটা মাটি হইতে বসিল। ধীরেনের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সে দুই হাতে স্বামীর মুখ ধরিয়া জোর করিয়া ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো অভিমানী, চেয়ে দেখ, তোমর শূন্যমন্দির পূর্ণ হয়েছে।"

২নং

মানস নেত্রে বায়স্কোপের ছবির মত যখন এই পর্য্যন্ত দেখা হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে আমার দৃষ্টি পড়িল—পাশের খোলার বাড়ীটার উপর। বায়স্কোপের স্বপ্নের দৃশ্য যেমন সহসা বিলীন হইয়া যায়, তেমনি ভাবে ধীরেন ও মলিনার দৃশ্য আমার মানস নেত্রের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল,—আর সেখানে ভাসিয়া উঠিল—পাশের সেই খোলার বাড়ীতে অভিনীত একটি করুণ দৃশ্য।

প্রকাশের স্ত্রী সুরমা শেষ রাত্রে জাগিয়া উঠিল, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের ঠাণ্ডা বাতাসে নয়, নিতান্তই এমন একটা ব্যাপারে, যার কল্পনা কোনও ভদ্র গল্প-লেখকের মাথায় আসা উচিত নয়। কয়দিন ধরিয়াই খোলার চাল চুয়াইয়া একটু একটু জল মশারির চাঁদার উপর পড়িয়া কতকটা জায়গা বিবর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। বাড়ীওয়ালাকে ইহা জানাইয়া তাহার অনুগ্রহের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা

করা ভিন্ন প্রকাশের আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আজিকার বৃষ্টিটা একটু বেয়াড়া রকম। মশারির চাদরের উপর টিপ টিপ করিয়া জল পড়িয়া, তাহা আবার সহস্র ধারায় বিভক্ত হইয়া সুরমার চোখে মুখে সিঞ্চিত হইতে লাগিল। এই অসময়ে এমন ফোয়ারার নীচে শুইয়া শুইয়া স্নান করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। জাগিয়া উঠিয়াই সে মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিল। পাশেই স্বামী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তিনি যেন না জাগেন; আস্তে আস্তে সে নিজের দিককার বিছানা গুটাইয়া ফেলিল। তারপর স্বামীর মুখের উপর হাত রাখিয়া উপলব্ধি করিল, জলকণা তাহার উপরও পড়িতেছে। তখন সে যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। হয়ত আর একটু পরেই স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে। হঠাৎ তাহার মাথায় এক বুদ্ধি জোগাইল। দু'খানা কাপড় পুরু করিয়া ভাঁজ করিয়া মশারির উপর পাতিয়া দিল। সে বুঝিল, এই উপায়ে বাকি রাত্রিটুকু নির্ব্বিঘ্নে কাটানো যাইবে। তার পর বসিয়া বসিয়া ভোরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া প্রকাশের ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হইয়া গেল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। ঘরে একটা ময়লা পুরাতন টেবিলের উপর একটা 'বী-টাইমপিস্' টিক্‌টিক্ করিতেছিল, চাহিয়া দেখিল সেটাতেই আটটা বাজে, অর্থাৎ তখন বেলা সাড়ে আটটার কম নয়!

গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িয়াই দেখিল, কলতলায় বসিয়া সুরমা বাসন মাজিতেছে। বৃষ্টিতে তাহার পিঠের কাপড় প্রায় ভিজিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াই তাহার মন পুরাতন বিষাদে তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—"ঝি আসেনি?"

সুরমা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিল—"না, কি করেই বা আসবে, যা বৃষ্টি!"

"তুমি কি ভেবেছ বল দিকিন? এই যে ক'দিন ধরে জলে ভিজ্‌ছ, যদি কিছু অসুখ করে' বসে তখন কি উপায়টা হবে? কি দরকার ওসব এখন মাজবার? হয়তো একটু পরেই ঝি এসে পড়বে।"

সুরমা হাসিমুখে বলিল, "তুমি কেন মিছামিছি ভাবছ, আমার কি কখনো অসুখ করেছে? যখন অসুখ করবে তখন বোলো।"

"নাইবা করল অসুখ। মিছামিছি কেন কষ্ট করা? ও জিনিষটির অভাব ত কোন দিন হয়নি, তবে সাধ করে কেন আরো কষ্ট বাড়ানো! কতই বা তোমাকে বলব! আমার কথা যদি শুনতে তা হলে আর এই কষ্ট সইতে হত না।"

গ্রাসগুলিতে তেঁতুল মাখিতে মাখিতে সুরমা বলিল—"এই বুঝি সুরু হল? কত দিব্যি দিয়ে কতবার বললাম, ওসব কথা কখনো বোলো না, তবু কথা শোন না কেন? সকালবেলা মিছামিছি নিজের মন খারাপ কোরো না।"

"কি করব সুরমা, না বলে পারিনে। তোমাকে যখনই এ সমস্ত কষ্ট সইতে দেখি, আমি যে মনে মনে কতটুকু হয়ে যাই, তা ত তুমি বুঝবে না! অদৃষ্ট আমি খুবই বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমাকে যখন এই সমস্ত কষ্ট সইতে দেখি, তখন আমি কিছুতেই মনে করতে পারিনে যে এই রকম ভাবে জীবন কাটাবার জন্যে ভগবান তোমায় সৃষ্টি করেছেন। যাক্ সে কথা। কিন্তু তোমার বাপ মারও ত ইচ্ছে নয় আমার কাছে থেকে তুমি এভাবে জীবন কাটাও।"

সুরমা শুধু একটুখানি ব্যথিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু আমারও ত একটা ইচ্ছে আছে।"—এই বলিয়া সে ধোয়া বাসনগুলি তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

প্রকাশ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনার ভিতর নূতনত্ব কিছুই ছিল না—সবই পুরানো কথা এবং ঠিক এমনিভাবে সেগুলি ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকবার ভাবা হইয়াছে।

প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করিয়া সে যখন কলেজে ভর্ত্তি হইল, তখন সে কিংবা তাহার পিতামাতা

কেহই ভাবে নাই যে,এমন করিয়া চল্লিশ টাকার কেরাণী-গিরি করিয়া তাঁহাকে জীবন কাটাইতে হইবে। পিতা মাতা জানিতেন যে ছেলে বিদ্বান হইয়া এত অর্থ উপার্জ্জন করিবে, দুয়ারে হাতী বাঁধিবার সামর্থ্য না হউক, দশ পাঁচটা দাসী চাকর যে হামেসা নিযুক্ত থাকিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জ্যোতিষীরাও সেইরূপ আশ্বাসই দিয়াছিলেন। প্রকাশ নিজেও জানিত যে কুবেরের ভাণ্ডারের একটা চাবি তাহার জন্য অদৃষ্ট-দেবতার নিকট গচ্ছিত আছে, অদূর ভবিষ্যতেই সেটা তাহার হাতে আসিবে।

যখন সে আবার কৃতিত্বের সহিত এফ্-এ পাশ করিল, তখন এই অদূর ভবিষ্যতের দূরত্বটা আরও কমিয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বেই সে কন্যার পিতাগণের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া পড়িল। একে কুলীনের সন্তান, তাহাতে আবার বি এ পড়িতেছে, এ অবস্থায় সে যে বিশেষ দর্শনীয়-সামগ্রী হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ কি? বি-এ এবং বিয়ের ভিতর উচ্চারণ সাদৃশ্য লইয়া রহস্য করিবার কিছু না থাকিলেও একথা ঠিক যে, বিবাহ সংগ্রামে কেল্লা মারিতে হইলে বি-এ পড়িবার সময়ই তাহার উপযুক্ত কাল—তা এখন উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করার বিরোধীরা যাহাই কেন বলুন না। তখন অনেকটা ক্ষেত্র তাহার বিচরণের স্থান হইয়া পড়ে, সে যে কতখানি পুষ্ট হইবে তাহার কোন সীমা নাই, চাই কি একদিন সে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটও হইয়া পড়িতে পারে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তখন যে শুধু নিজের কাছেই উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দেখা দেয় তাহা নয়, কন্যার পিতাগণও সেটাকে তেমনি উজ্জ্বল ভাবেই দেখিয়া থাকেন।

প্রকাশের পিতার অত সব তত্ত্ব জানা না থাকিলেও তিনি সুযোগ বুঝিতেন, কাযেই ধনী পিতার সুন্দরী কন্যা দেখিয়া তিনি হাতছাড়া করিলেন না।

কিন্তু এই সৌভাগ্যের পরই যে কতবড় দুর্ভাগ্য তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার কল্পনাও ত কোনদিন প্রকাশের মাথায় আসে নাই।—কোন এক অজ্ঞাত স্থান হইতে হঠাৎ এক আদেশ আসিয়া, প্রকাশের পিতা ও মাতাকে একই মাসের ভিতর ডাকিয়া লইয়া গেল। এই আকস্মিক ব্যাপারে প্রকাশের অবস্থা এমনি হইয়া পড়িল যে, উহাকে অকূল সাগরে ভাসা বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না। তার পর মামলা মোকদ্দমা, শ্বশুরের সহিত ঝগড়া ইত্যাদি অনেকগুলি এলোমেলো ব্যাপার যখন শেষ হইল, তখন প্রকাশকে পথের কাঙাল বলিলেও চলে।

পড়া তাহাকে ছাড়িতে হইল। কোন্ অদৃশ্য হস্ত 'মেন্ সুইচ' টানিয়া তাহার আশা আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল মানস-প্রাসাদের সবগুলি আলো এক মুহূর্ত্তে নিবাইয়া দিল, সেই কথাই সে অনেকদিন বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে। কিন্তু ভাবিলে ত দিন যায় না; দিন কাটাইবার সংস্থান তাহাকে করিতে হইল। সেই চেষ্টায় বাহির হইয়া সওদাগর আফিসে তাহার যাহা মিলিল, তাহাতে কোনও প্রকারে খোলার ঘরে বাস করা চলে।

ইহার ভিতরও ভগবানকে সে মাঝে মাঝে ধন্যবাদ দিত এই জন্য যে, এমন সুরমাকে সে লাভ করিয়াছে এবং তাহার দারিদ্র্য বহন করিবার জন্য ভগবান আজ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও পাঠান নাই।

অভ্যাসে সে অনেক সময় তাহার দারিদ্র্যের কথা ভুলিয়া যাইত। কিন্তু আজ ঘুম হইতে উঠিয়াই, সুরমাকে ভিজিয়া ভিজিয়া কায করিতে দেখিয়া তাহার মনটা নিতান্তই ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাই বসিয়া বসিয়া এই সমস্ত কথা কত ভাবেই যে ভাবিতেছিল তাহার অন্ত নাই।

তাহার ভাবনায় বাধা দিয়া সুরমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"ওগো চুপ করে বসে বসে কি ভাবছ বল দিকিন?"

প্রকাশ বলিল—"কি আর ভাববো? কিছু ভাবছি নে।"

"বেশ, তুমি যেন কিছু ভাবছ না, কিন্তু আমি যে বড় ভাবনায় পড়েছি। কাল রাত্রে ঝি রান্নাঘরের দরজা খোলা রেখে গিয়েছিল, জল গিয়ে সব ভিজে

গেছে। উনান জলে ভরে গেছে, কিছুতেই ধরান যাচ্ছে না। কি উপায় করি বল ত ? তোমারও ত আপিসের সময় হয়ে এল।"

"কি আর করবে, কোনও প্রকারে একটা ভাতে-ভাত নামিয়ে দাও।

"তা ছাড়া ত আর এবেলা উপায় দেখি নে।"

এই প্রকারে আহার শেষ করিয়া, জুতা হাতে লইয়া, ছাতা মাথায় দিয়া প্রকাশ দশটার সময় আফিস করিতে ছুটিল। বিকালে সাড়ে পাঁচটার সময় সে যখন এমনি বেশে বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল, তখন সুরমা একটা বাঁশের চোঙার ভিতর দিয়া ফুঁ দিয়া উনান ধরাইবার চেষ্টায় চোখের জলে নাকের জলে ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রান্নাঘর হইতে একরাশ ধুম উঠিতে দেখিয়া, প্রকাশ বাড়ীতে ঢুকিয়াই রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরমাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকালেই যে রান্না চড়িয়েছ ?"

সুরমা বলিল, "বাদলার দিন একটু সকাল সকাল সেরে ফেলাই ভাল। কিন্তু উনানের যা অবস্থা!—কাঁদিয়ে মারলে।"

সুরমার রং স্বভাবতঃই সুন্দর,—এখন উনানে ফুঁ দিতে দিতে আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। সেই রকম রাঙ্গা মুখের উপর দুইটি ভিজা চোখ থাকিলে যে বিশেষ রকম একটা সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়,তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা প্রকাশ এখনও হারায় নাই। এত বড় অভিশাপ বোধ করি ভগবান কেরাণীকেও দেন নাই। উহারই তারিফ করিতে গিয়া, প্রকাশ এমন সলজ্জ মিষ্টি হাসি উপহার পাইল যে, এক মুহূর্ত্তে তাঁহার মন বিষণ্ণ হইয়া গেল। সুরমার মুখে ও রকম সুখের হাসি দেখিলেই তাহার মন এতটুকু হইয়া যায়,—তাহার মনে হয়, অমন করিয়া হাসিবার অধিকার সে কি সুরমাকে দিতে পারিয়াছে !

ঘরে আসিয়া প্রকাশ পোষ্টকার্ডে একখানা চিঠি লিখিল। কিন্তু ঠিকানা লিখিবার সময় তাহাকে টেবিলের উপর হইতে একটা বাঁধানো খাতা লইয়া ঠিকানা খুঁজিতে হইল। সেই খাতা হইতে ঠিকানা বাহির করিয়া, চিঠিখানা শেষ করিয়া ফেলিল। তারপর খাতাটার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এটা-সেটা দেখিতে লাগিল।

এই খাতাটার একটা ইতিহাস আছে। এই ধরণের কয়েকখানা খাতা প্রকাশের ছিল। এইগুলি তাহার কবিতার বহি,—বর্ত্তমানের নয়, ইস্কুলে ও কলেজে পড়িবার সময়কার। অন্য খাতাগুলি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এই খাতাখানার পিছনের দিকে অনেকগুলি সাদা কাগজ ছিল বলিয়া ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সেই সাদা কাগজগুলি বর্ত্তমানে ভরিয়া গিয়াছে, কবিতার দ্বারা নয়,—গয়লার হিসাব, ধোবার হিসাব, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা ইত্যাদি আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে।

খাতাখানার প্রথম কয়েকপাতা জুড়িয়া এখনও কতকগুলি কবিতা বাঁচিয়া আছে। প্রকাশ নিতান্ত ঔদাস্যের সহিত তাহারই এক আধটা পড়িতে লাগিল। একটা কবিতার দুইটি লাইন এইরূপ :—

বাদলে ঝুনুঝুনু কি বলিতে চায়।
পাগল এ হিয়া মোর চেপে রাখা দায়॥

প্রকাশ আজ নিজের লেখার অর্থ নিজেই বুঝিতে পারিল না ;—বাদলের ঝম্‌ঝমানিতে মন মাতাইবার মত কি আছে ? সে অনেকক্ষণ বাহিরের বৃষ্টির দিকে চাহিয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মন পাগল করিবার মত কোনসাড়াই যখন মনে জাগিল না, তখন সে বই রাখিয়া দিয়া ভাবিল—কে জানি তখনই এক মন ছিল ; এখন আর সে মন নাই।

রাত্রে আহার সারিয়া প্রকাশ অমনি শয্যা লইল। কিন্তু সুরমার তখনও দেরী ছিল। কয়দিন ধরিয়া উঠানে কাদায় হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার পায়ের আঙুলের ফাঁকে অত্যন্ত চুলকানি হইয়াছিল, হয়ত কয়দিন পরে ঘা হইবে। সে ডিট্‌জ্‌ লণ্ঠনের উপর এক টুকরা

কাগজ গরম করিয়া সেই সব স্থানে সেঁক দিতে লাগিল।

* * * *

ঠিক সেই সময় পথের ওপাশের একটা ডা'লের দোকানে একটি হিন্দুস্থানী তরুণী দুই পা ছড়াইয়া যাঁতায় ডাল পিষিতে পিষিতে একটা কাজরি গান গাহিতেছিল, তাহার একটি পদ শুধু বুঝা গেল,—

"ঘড়ি দাগা দিয়ারে তু শাওন বাদরিয়া।"

গানটার ভিতর কাব্যরস যথেষ্ট আছে এবং 'বস্তু'র ও অভাব নাই। শ্রাবণের বাদলের দাগা হয়ত অনেককেই হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে দাগ যদি কাহাকেও দেহের উপর বহিতে হয়, তবেই বাদলের কবিত্বের কণ্ঠচ্ছেদ।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

পুরুষ ও অবৈদিকবাদ

(১) পুরুষের দুই রূপ।

পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে সাংখ্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি সাংখ্য পুরুষের দুই রূপ—জীবরূপ ও ব্রহ্ম-রূপ। পুরুষ যখন অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তখন তিনি বিশিষ্ট জীব-পুরুষ (সাং দঃ—৬।৬৩)। এই বিশিষ্ট জীবপুরুষে যে বুদ্ধিবাধিত জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধির পরিচ্ছেদ ও সুখ দুঃখের উপরঞ্জনা বশতঃ পরিচ্ছিন্ন, মলিন ও অপূর্ণ জ্ঞান। কেননা সাংখ্যেরা বলেন, পৌরুষেয় জ্ঞান-বৃত্তি বুদ্ধি হইতে অবশিষ্ট বৃত্তি। বুদ্ধি যতদুর পর্য্যন্ত ও যেমন ভাবে ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, পুরুষ ততদুর পর্য্যন্ত এবং ঠিক সেই ভাবেই বিষয় সকলকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং জীবগত বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে পৌরুষেয় বিষয়-জ্ঞানও অল্পবিস্তর ভাবে অপূর্ণ ও খণ্ডিত হয়,—ক্বচিৎ বা তাহা অ-তদ্রূপ অ-প্রতিষ্ঠ বিপর্য্যয় জ্ঞানই হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই যে বিষয়-জ্ঞান—যাহা বুদ্ধির সসীমতায় প্রতিহত, দেশ কালের অবধারণায় সংকীর্ণ রূপে অবধারিত, ও স্বল্প জ্ঞান মাত্র বলিয়া তাহা যে তৎ-কারণেই (ipso facto) মিথ্যাজ্ঞান ও অবিদ্যা হইতে বাধ্য, ইহা সাংখ্য মত নহে। অপূর্ণতা ও মিথ্যা একই জিনিস নহে। পণ্ডিত ও মূর্খ একই পদার্থকে তুল্য ভাবে দেখে না। যে পণ্ডিত সে বিষয়কে বড় করিয়া দেখে, যে মূর্খ সে ছোট করিয়া দেখে। তাহা বলিয়া যে মুর্খ, সে যে নিরবচ্ছিন্ন রজ্জুতে সর্পভ্রম, এবং মরীচিকায় জলভ্রমই করিয়া থাকে এমন কথা বলা যায় না। আবার পণ্ডিত হইতে যোগীরা সূক্ষ্মদ্রষ্টা। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম বিষয় সকলও প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন। অতএব স্থূলদ্রষ্টার বিষয়জ্ঞান যে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র, ইহাও যুক্তি হইতে পারে না। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণতঃ যে জ্ঞান, তাহা স্বল্প, পরিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্বল্প জ্ঞান বলিয়াই যে মিথ্যা জ্ঞান হইতে বাধ্য, ইহা সম্যক্ যুক্তি নহে।

এইত' গেল জীব-পুরুষের জ্ঞানের স্বরূপ। এই জীব-পুরুষ যখন মনের সহিত সাময়িক কিংবা স্থায়িভাবে সম্বন্ধ-রহিত হয়েন, তখন তাঁহার ব্রহ্মরূপতা লাভ হয়। আমরা দেখিয়াছি তখন পুরুষ,—মহাভারতীয় সাংখ্যের ভাষায়, স্বয়ং বুধ্যমান, মহা-প্রাজ্ঞ, নির্গুণ ও অব্যক্ত পুরুষ। তখন পুরুষ, বুদ্ধির-দ্বারা-অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ নির্ম্মল, অখণ্ড, বিশ্বব্যাপী, জ্ঞান-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তখন পৌরুষেয় জ্ঞান, স্মৃতির দ্বারা অখণ্ডিত, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, চরাচর-

ব্যাপ্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, জ্ঞান। সাংখ্যসূত্র বলিতেছেন,—সুষুপ্তি, সমাধি ও বিদেহমুক্তি দশাতে পুরুষের ঐরূপ ব্রহ্মরূপতা লাভ হয় (সাং দঃ—৫।১১৬)।

পরমারাধ্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন—

"মন আছে তাই আছি আমি
নৈলে আমি জগৎ স্বামী।"

—ইহাই অবিকল সাংখ্যমত।

কিন্তু যিনি কেবলমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাবাদী (merely empirical philosopher) তিনি এই জগৎস্বামিবাদের মর্ম্ম বুঝিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, যাহা বুদ্ধির অগম্য তাহাই সন্দিগ্ধ—অথবা শূন্যও অভাব। তাঁহাদের মতে পুরুষের বুদ্ধিশূন্যতাও যাহা, পুরুষের ইট কাট শ্রেণীতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হওয়াও তাহা। তাঁহাদের মতে বুদ্ধির অতীত যে জ্ঞান-রূপ, তাহা জ্ঞানের শূন্য-রূপ,—অভাব ও নাস্তিত্ব।

কিন্তু বুদ্ধির অতীত কোন জ্ঞানরূপ থাকিতে পারে কি না, এই প্রশ্নটিই দর্শন বিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নের হৃদ্গত মীমাংসাকে অন্তরের অন্তরে উহ্য রাখিয়াই প্রত্যেক দর্শনের 'স্কুল' স্ব স্ব তর্কজাল চারিযুগ হইতে বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। বিচার-শাস্ত্রের ইহাই চিরন্তন চতুষ্পথ। এই চতুষ্পথে পড়িয়াই প্রত্যেক দার্শনিক আপন আপন পথ খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হয়েন। আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় দর্শন সকলও এই চতুষ্পথে পড়িয়া বিভিন্ন ও বিভক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। এইখানেই আস্তিক ও নাস্তিক-বাদের গোত্রনির্ব্বাচন হইয়াছিল।

লোকোত্তরজ্ঞান-বাদের সমস্যার এক নঞ্‌-মূলক (negative) সুস্পষ্ট উত্তরকে সম্বল করিয়াই বেদবাদের মূর্ত্তিমান প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রাচীন বার্হস্পত্য বাদ, স্মরণাতীত প্রাচীনকালে এদেশে এক চটুল যুক্তিতন্ত্র প্রথমে প্রচার করিয়াছিল। এবং সেই প্রাচীন বেদবিরোধী তন্ত্রের উত্তরাধিকার-সূত্রে, লোকায়াত বাদ, বৌদ্ধ শূন্য-বাদে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং সাংখ্য যোগাদি দর্শন বুদ্ধিবোধিত জ্ঞানের সত্যতা অস্বীকার না করিয়াও, বুদ্ধ্যাতীত (Transcendental) জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই, আস্তিক-গোষ্ঠীয় দর্শন বলিয়া আজও পঠিত হইয়া থাকে। এই আস্তিক বাদের চরম পন্থী, অদ্বৈতবাদী, জগতের রূপ রসকে মিথ্যা বলিয়া, একমাত্র লোকোত্তর জ্ঞানকে সত্য করিয়াছিল বলিয়াই, দর্শন সকলের 'দেবীবর ঘটক' শঙ্করাচার্য্য, ইহাকেই দর্শন সকলের মধ্যে "মুখ্য কুলীন" করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালের দর্শন সকলের "কুলুজী" কর্ত্তারা দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষেও এই নাস্তিক ও আস্তিক বাদ যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এবং এই দুই বিরুদ্ধ বাদের সংঘর্ষ হইতে যুগে যুগে এই প্রাচীন দেশে নব নব যুগধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। সুতরাং যে কোন আস্তিক দর্শনের প্রকৃষ্ট আলোচনা, নাস্তিক বাদের সন্তান প্রবাহকে উপেক্ষা করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

পুরুষ প্রসঙ্গে আমরা বার্হস্পত্য নাস্তিকবাদের যাহা যুক্তি তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া লইয়াছি। এখন ঐ প্রসঙ্গে বৌদ্ধবাদের যুক্তি প্রণিধান করিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

(২) বৌদ্ধ-বাদ।

নবীন মহাযানে চারিটি বৌদ্ধ-বাদের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধেরা এই চতুর্ব্বিধ মতকে "চতুর্ব্বিধ ভাবনা" বলিতেন। এবং এই চতুর্ব্বিধ ভাবনাগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা নির্ব্বাণের অভিসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই চতুর্ব্বিধ ভাবনাগ্রস্ত বৌদ্ধদের নাম ছিল—মাধ্যমিক, যোগাচার, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। শূন্যবাদ প্রভৃতির মধ্যে তাঁহাদের চতুর্ব্বিধ ভাবনার 'খি' খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

শূন্য-বাদ।—মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী ছিলেন। কিন্তু এই যে শূন্যবাদ, ইহা প্রাচীন মহাযান হইতে নবীন মহাযানে অবতরণ করিবার সময়ে, দেশ

কালের আব-হাওয়ার মধ্যে পড়িয়া এমনই রূপ বদলাইয়া ফেলিয়াছিল যে ইহার উত্তর কালের আকারের মধ্যে পূর্ব্বরূপ খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। সেই জন্য অগ্রে প্রাচীন শূন্যবাদের সংবাদ লওয়া আবশ্যক।

জগদ্‌গুরু ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,—নির্ব্বাণ আত্মার স্বরূপ হইতেছে ""চতুষ্কোটী বিনির্মুক্ত" স্বরূপ। সেই চতুষ্কোটী ভাব হইতেছে—(১) অস্তি বা সৎভাব, (২) নাস্তি বা অসৎ-ভাব (৩) অস্তি-নাস্তি বা সদসৎ ভাব এবং (৪) নিঃঅস্তি-নাস্তি বা অ সৎ অসৎ-ভাব। অর্থাৎ পার্থিব সত্তা সম্বন্ধে আমাদের এই চারিপ্রকার জ্ঞান হইতে পারে, এবং সত্তাকে আমরা 'আছে' কিম্বা 'নাই', কখনও কুত্রচিৎ আছে এবং কুত্রচিৎ নাই,—এবং তাহার বিপরীত ভাবে,—এই চারি প্রকার ভাবের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব বুদ্ধি এতদ্‌তিরিক্ত ভাবে কখনই উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু নির্ব্বাণ আত্মার স্বরূপ এই চতুষ্কোটী দ্বারা উপলভ্য নহে,—তাহা সর্ব্বথা বুদ্ধির অতীত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ।

সাংখ্যেরা যাহাকে আত্মার মুক্ত-দশা বলেন,তাহাও এইরূপ কোন এক বুদ্ধির অতীত অনির্ব্বচনীয় দশা। তাঁহাদের মতে মুক্তি দুই প্রকার, জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি। জীবন্মুক্তি দশাতে জীবপুরুষ দেহ ও বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত থাকিলেও, অহংকার নিবৃত্তি বশতঃ এক উদাসীন, অনাসক্ত, অনির্ব্বচনীয় চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিদেহ মুক্তি দশাতে পুরুষের দেহাদি সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়,—তখন পুরুষ বুদ্ধির অগম্য, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় স্বরূপে শাশ্বৎ-প্রতিষ্ঠ হয়েন। সুতরাং সাংখ্যের আত্মার মুক্ত-স্বরূপ এবং বুদ্ধদেবের আত্মার নির্ব্বাণ-স্বরূপের মধ্যে যে বড়বেশী প্রভেদ আছে বলিয়াত' বোধ হয় না। উভয়ত্রই আত্মা অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ।

এই থানে আর একটি কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। জ্ঞান, জ্ঞেয়ের প্রতিযোগী (Correlative) সত্তা। জ্ঞেয়হীন জ্ঞান বলিলে স্ব-বচন-বিরোধ (self contradiction) হয়। এবং মুক্ত ও অমুক্ত উভয় দশাতেই আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নহেন। অতএব উভয় দশাতে আত্মার কোন-কিছু জ্ঞেয় আছে। আমরা দেখিয়াছি, বিদেহ মুক্তি দশাতে আত্মা ব্রহ্ম-রূপতা লাভ করিয়া, বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অর্থাৎ সেই দশাতে পুরুষ বিশ্বের পরিপূর্ণ ও অখণ্ড রূপের দ্রষ্টারূপে অবস্থিত হয়েন। মুক্ত পুরুষের জ্ঞেয় যে বিশ্বরূপ, তাহাই বিশ্বের পরিপূর্ণ ও অখণ্ড রূপ। বুদ্ধি সেই রূপের অবধারণা করিতে অক্ষম বলিয়া, প্রকৃত বিশ্বরূপ অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় রূপ। এই জন্য সাংখ্য যখন বিশ্বরূপের ত্রিগুণ সকলের পরম রূপ অবধারণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন—

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।

—গুণ সকলের যাহা পরমরূপ তাহা দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। তেমনি বৌদ্ধও বলিতে পারেন, সত্তার যাহা চতুষ্কোটী বিনির্মুক্ত রূপ, তাহা অনির্ব্বাণ অবস্থায় কখনই দৃষ্টি পথে আসে না। তাহা আত্মার নির্ব্বাণ অবস্থাতেই উপলভ্য।

কিন্তু নবীন মহাযান, সত্তার এই চতুষ্কোটী বিনির্মুক্ত স্বরূপকে, বুদ্ধি-সাধ্য এক স্থূল বিচারের ফাঁকি-কলে ফেলিয়া, অনির্ব্বচনীয়-বাদকে পিষ্টপেষণ করিয়া, তাহা হইতে এক খাঁটি শূন্যবাদ বাহির করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধ-দর্শন অধ্যায় হইতে, সেই পিষ্ট-পেষণ যুক্তির নমুনা উদ্ধার করিয়া আমরা পাঠকের উদ্দেশে নিবেদন করিতেছি :—

"সত্তা সম্বন্ধে, ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয়বিধ প্রতীতিই হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন এই রজত খণ্ড কখন স্বপ্নে বা জাগরণে দেখি নাই, তবে তাঁহার রজত সম্বন্ধে অভাবাত্মক প্রতীতি হইল। আবার যখন কেহ বলেন 'আমি রজত দেখিতেছি, তখন রজত সম্বন্ধে তাঁহার ভাবাত্মক প্রতীতি হইল। অতএব যাহা সত্তা তাহা ভাব ও অভাব, সৎ ও অসৎ,উভয়াত্মক। এখন এই সদসদাত্মক সত্তার একভাগ

সৎ এবং একভাগ অসৎ, ইহা বলা যাইতে পারে না। কুক্কুটীর একভাগ ডিম্ পাড়ে এবং একভাগ পরিপাক করে বলা যেমন অসঙ্গত, তেমনি সত্তার একভাগ সৎ, একভাগ অসৎ, তাহা বলাও তেমনি অসঙ্গত। আবার শুধুই সৎ অসৎ নহে, সত্তা অন্য প্রকারেও বিরুদ্ধ ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। একই সত্তাকে কেহ ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া দেখেন, কেহ বা স্থিতিশীল বলিয়া জানেন, কেহ বা সুখাত্মক বলিয়া দেখেন, কেহ বা দুঃখময় বলিয়া জানিয়া থাকেন। সত্তা এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবে সর্ব্বদাই প্রতীত হইয়া থাকে। যাহা এইরূপে বিরুদ্ধ ভাবে প্রতীতি-যোগ্য তাহা কখনই 'ভাব' (Substance) হইতে পারে না, তাহা স্বরূপতঃ 'অভাব', 'অ-বস্তু', ও 'শূন্য' (Nihil) অতএব বৌদ্ধ পক্ষ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—"অতঃ তত্ত্বং সদসৎ-উভয়াত্মকং চতুষ্কোটী বিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব"—অতএব যাহা তত্ত্ব তাহা সৎ-অসৎ-উভয়াত্মক, চতুষ্কোটী বিনির্ম্মুক্ত—শূন্য।"

এই প্রকার যুক্তি ধরিয়াই বৌদ্ধবাদ শূন্যবাদে পর্য্যবসান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় দর্শনের প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইহার মধ্যে কেবল যুক্তিতর্কই দেখিবেন না। এই যুক্তিবাদের মধ্যে, নব্য ন্যায়ের উদ্ঘাত ফেনপুঞ্জের তীব্র আঘ্রাণ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হইতেছে। এখানে ন্যায়ের অভাব বাদের "আমেজ" যথেষ্ট ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব উত্তর বৌদ্ধযানের শূন্যবাদ, ভারতবর্ষীয় যুগধর্ম্মের মধ্যেই যে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ক্ষণিকবাদ।—শূন্যবাদে অবতরণের ক্ষণিকবাদ একটি পূর্ব্ব সোপান। কিন্তু তা বলিয়া বৌদ্ধেরাই যে ক্ষণিকবাদের আবিষ্কারক ইহা কোন ক্রমেই মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন 'নাস্তিক' ও 'তার্কিক' গণের মধ্যেও, বুদ্ধ-পূর্ব্ব-যুগে এই ক্ষণিকবাদ বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। এই ক্ষণিকবাদকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে, ইহার মধ্যে নৈয়ায়িকের পরিণাম-বাদের পুরাতন 'কাঠাম' ধরা পড়িয়া যায়। শূন্যবাদের আভিজাত্যের অনুসন্ধান লইলে, তাহারও যে কোন পূর্ব্বাধিকারী মিলে না তাহা নহে। এবং বিজ্ঞান-বাদ প্রভৃতিরও পূর্ব্ব ইতিহাস অবশ্যই আছে।

ক্ষণিক বলেন, সত্তা প্রতিনিয়তই অভিনব পরিণাম লাভ করিতেছে। প্রতিক্ষণেই তাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই গতিশীল বিশ্বে কোন কিছুই অচল ভাবে দাঁড়াইয়া নাই। এবং সেই সর্ব্বব্যাপক গতির মধ্যে পড়িয়া, সত্তাভূত গুণ ও অবয়ব সকল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাইয়া যাইতেছে। যাহা পূর্ব্বক্ষণে ছিল তাহা আর উত্তর ক্ষণে নাই, তাহার স্থানে আর এক নূতন জিনিস উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষণিকেরা সত্তা সকলের প্রতিক্ষণের সূক্ষ্ম পরিণামকে এইরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন।

ক্ষণিকগণের এই ক্ষণ-পরিবর্ত্তন-বাদের সঙ্গে তার্কিক পরিণাম-বাদের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। তার্কিক মতে কার্য্য ও কারণ, উৎপত্তি ও অনুৎপত্তির, ভাব ও অভাবের মধ্যে কোনই বাস্তবিক সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। সাদৃশ্য থাকিলে কার্য্য কারণের ভেদ প্রতীতি ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব পরিণামবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্য-কারণ সূত্রে সত্তার যে পরিণাম ঘটিয়া থাকে তাহা সত্তার আমূলতঃ পরিণাম ও পরিবর্ত্তন—তাহা "কূটস্থ পরিণাম"। এই কূটস্থ পরিণামবাদই ক্ষণিকবাদের প্রাণ।

এইজন্য ক্ষণিকবাদী বলিয়া থাকেন, সত্তা আপনার সমস্ত ভাগ ও গুণের সহিত ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই সত্তার অত্যন্ত অভ্যুদয় ও অত্যন্ত বিনাশ ঘটিতেছে। একই সত্তার ধারাবাহিক অস্তিত্ব বলিয়া কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। সত্তার যাহা একত্ব-প্রতীতি তাহা ভ্রান্তি। এই ভ্রমকে ক্ষণিকেরা দীপশিখা ও নদী জলের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, দীপশিখার যাহা প্রথমক্ষণের শিখা তাহাই দ্বিতীয় ক্ষণের শিখা নহে। নদী প্রবাহে একক্ষণের যে জল যেখানে আছে, দ্বিতীয় ক্ষণের সেই জল সেথায় নাই। অথচ আমরা ভ্রান্তিবশতঃ

মনে করিয়া থাকি একই শিখা ক্রমাগত জ্বলিতেছে, একই নদী ক্রমাগত বহিতেছে। সেইরূপ ক্ষণবিধ্বংসী পরিণামী সত্তা সম্বন্ধে আমাদের যে ক্রমাগত একত্ব-প্রতীতি হয় তাহা ভ্রান্ত প্রতীতি।

পুরুষ বা আত্ম সম্বন্ধে ক্ষণিক বলেন, আত্মা যখন সত্তা তখন তাহাও অবশ্য ক্ষণ-পরিচ্ছিন্ন সত্তা। এই আত্ম-সত্তা অনন্ত বিষয় প্রবাহে উপরঞ্জিত হইয়া—কার্য্য কারণ-সূত্র অনন্ত বাসনা-বন্ধে বদ্ধ হইয়াছে। আত্মার বিলয় না হইলে, কোনক্রমেই বিষয়-উপরঞ্জনা জনিত বাসনা-বন্ধ ক্ষয় হইতে পারে না। অতএব যাহাতে আত্মার বিলয় বা অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয় তাহাই মুক্তি ও নির্ব্বাণ।

বিজ্ঞানবাদ।—বিজ্ঞানবাদ বুঝিতে কোনই কষ্ট নাই, কেন না বর্ত্তমান কালের "Idealist" নামে দার্শনিক জীব, পুরাতন বিজ্ঞানবাদের বংশধর রূপে এখনও ক্বচিৎ পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে বাস করিতেছে। বিজ্ঞান-বাদী বলেন, জ্ঞান ছাড়া জগতে আর কিছুই সত্য নাই। আমরা আমাদের নিজেদের জ্ঞানকেই বাহ্য সত্তা বলিয়া ভুল করি। বাহ্যসত্তা বলিয়া কিছু যে আছে তাহার একান্ত প্রমাণাভাব। এবং যাহার একান্ত প্রমাণাভাব তাহাই অভাব ও শূন্য। বিজ্ঞান-বাদীরা বাহ্য-শূন্য-বাদী এবং বৌদ্ধযানে ইহারাই যোগাচার বৌদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

স্বলক্ষণবাদ।—এই মতবাদ বৈভাষিক বৌদ্ধদের এক মহা "দুর্ভাবনা" ছিল। কেন না দুঃখকেই তাঁহারা সত্তার প্রধান লক্ষণ বলিয়া জানিয়াছিলেন। সত্তার যাহা ক্ষণভঙ্গুরত্ব তাহা দুঃখেরই নামান্তর। এবং স্বলক্ষণবাদী, ক্ষণিকবাদীর কনিষ্ঠ সহোদর রূপে সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, ক্ষণ পরিচ্ছিন্ন সত্তার যে বিভিন্নরূপ—তাহারা পরস্পর একান্ত-অসদৃশ রূপ—এবং সত্তা পরম্পরার প্রত্যেক সত্তাই স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত, দুঃখ রূপ মাত্র। যখন এমন হইবে যে জ্ঞান সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়া এই পরম দুঃখময় স্বলক্ষণ-প্রবাহকে আর জানিবে না—তখনই আত্মার সর্ব্বার্থসিদ্ধি, পরম পুরুষার্থ লাভ—মুক্তি ও নির্ব্বাণ!

(৩) সাংখ্যের বৌদ্ধবাদ বিচার।

সাংখ্য শাস্ত্রের নানা স্থানে এই সকল বৌদ্ধবাদের উল্লেখ আছে এবং শূন্যবাদ প্রভৃতি নাস্তিকবাদকে 'বৈনাশিকবাদ' নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহা দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শূন্যবাদিগণকে 'বৈনাশিক' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন বিস্তৃত ভাবে বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে সাংখ্যযুক্তি অবধারণ করা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, ক্ষণিকবাদ কূটস্থ পরিণামবাদেরই অত্যুৎকট পরিণাম মাত্র। আমরা ইতিপূর্ব্বে সাংখ্যের পরিণামবাদের আলোচনা কালে দেখিয়াছি যে পাতঞ্জল দর্শন, সত্তার ত্রৈকালীন পথভেদে অবস্থিতি দ্বারা পরিণাম ও কার্য্যকারণের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদও উৎপত্তি ও বিনাশের সেই অস্তিত্বমূলক ব্যাখ্যাই প্রদান করিতেছে। সৎকার্য্যবাদও সেই কথাই বলিতেছে। কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রের কোন কোন শাখা, এবং এই বৌদ্ধদর্শন, অভাব ও উৎপত্তির প্রকৃত স্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া—কেবল-মাত্র প্রত্যভিজ্ঞা মাত্রকে সম্বল করিয়া, উৎপত্তির অভাব মূলক এক হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।—কিন্তু এ সকল কথা পূর্ব্বে যথেষ্ট রূপে আলোচিত হইয়া গিয়াছে। ক্ষণিকেরা আত্মা সম্বন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, এখন তাহার সাংখ্য-খণ্ডন বুঝিতে পারিলেই চুকিয়া যাইবে।

ক্ষণিক বলিয়াছেন, আত্মা অন্তঃপ্রদেশের সত্তা বলিয়া, তাহাতে বাহ্য-প্রদেশের বিষয় সকল প্রতিরঞ্জিত হইয়া থাকে। সাংখ্য বলেন, তাহাই যদি হয় তবে ক্ষণিকের অন্তঃপ্রদেশ ও বাহ্যপ্রদেশ আপেক্ষিক (correlatively) ভাবে একই দেশের বিভিন্ন প্রদেশ হইবে না—তাহারা অত্যন্ত (absolutely) বিভিন্ন প্রদেশে (different sphere and plane) হইবে। কেন

না, তাহারা আপেক্ষিক ভাবে বিভিন্ন প্রদেশ হইলে স্থিতিবিপর্য্যয়ে কখন বা অন্তঃপ্রদেশ বাহ্যপ্রদেশই হইয়া পড়ে। এবং তাহা হইলে, যাহা পূর্ব্ব সংস্থানে উপরঞ্জ্য ছিল তাহা উত্তর সংস্থানে উপরঞ্জক হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণিক ত' তাহা বলেন না,—তিনি বলেন বাহ্যপ্রদেশের বিষয় সকল নিরন্তরই অন্তঃপ্রদেশস্থ আত্মাকে উপরঞ্জিত করিতেছে। সুতরাং ক্ষণিক মতে বহিরন্তর প্রদেশ যে অত্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ ইহা অনিবার্য্য ভাবে প্রতিপন্ন হয়।

ইহাতে সাংখ্য বলিতেছেন—"ন বাহ্য-অভ্যন্তরয়োঃ উপরঞ্জ্য-উপরঞ্জক-ভাবঃ, অপি দেশ ভেদাৎ, শ্রুঘ্নস্থ-পাটলিপুত্রস্থয়োঃ ইব" (সাং দঃ—১।২৮)—যাহা অত্যন্ত ভিন্ন বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রদেশ (যেমন সম-কেন্দ্রীয় দুই বিভিন্ন বৃত্তরেখা) তাহাদের মধ্যে কোনই মধ্যবর্ত্তী সংযোজক (medium) নাই। সুতরাং তাহাদের মধ্যে দেশ ব্যবধান হেতু উপরঞ্জ্য ও উপরঞ্জক ভাব হইতে পারে না।

শ্রুঘ্ন দেশের পরিধির মধ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাতে শ্রুঘ্ন দেশের সত্তারই উপরঞ্জনা হইতে পারে,—তাহাতে পাটলিপুত্রের সীমানার মধ্যে অবস্থিত জিনিসের উপরঞ্জনা হইতে পারে না—"দেশ ব্যবধানাৎ"। এবং বাহ্যাভ্যন্তর এক দেশ হইলে, কেন যে উপরঞ্জনার ব্যবস্থা হয় না (সাং দঃ—১।১৯), তাহা অগ্রেই আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

তাহার পর সাংখ্য ক্ষণিককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তোমার সত্তা ত' প্রতিক্ষণই ধ্বংস লাভ করিতেছে। তোমার মতে, সত্তার পরমায়ু এক মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ মাত্র। সত্তাদ্বয়ের সমকালীনতা বলিয়া, কোনই প্রতীতিযোগ্য প্রত্যভিজ্ঞা প্রকৃত পক্ষে, তোমার মতে হইতে পারে না। সত্তা সকলের দাঁড়াইবার অবসর মাত্র নাই—যে মুহূর্ত্তে তাহাদের উৎপত্তি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের বিনাশ। অথচ তুমি বল, সমকালীন কার্য্য-কারণ সূত্রে বাহ্য বিষয়ের উপরঞ্জনা বশতঃ আত্মাতে বাসনাবন্ধ উপচিত হয়। সেটা কেমন করিয়া হয়?"

ইহার উত্তরে ক্ষণিক বলেন, কার্য্য কারণতা যে সমকালীনই হইবে এমন কথা নাই। পিতা পূর্ব্বকালে গর্ভাধান করেন পুত্র উত্তরকালে তাহার দ্বারা উপকৃত হয়। সেইরূপ মনে কর, কোন পূর্ব্বকালে বিষয় উপরঞ্জনা করিতেছে, কোন উত্তরকালে তাহার দ্বারা আত্মাতে বাসনার উপচয় হইতেছে। (সাং দঃ—১।৩২)

সাংখ্য বলেন, হে ক্ষণিক! সাবধান হইয়া তর্ক কর। কে তোমার পিতা কে তোমার পুত্র? তোমার যিনি পিতা তিনি একজন পিতা নহেন, তিনি পিতৃ-পরম্পরা। তোমার যিনি পুত্র তিনিও এক পুত্র-পরম্পরা। এখন কোন্ পিতা, কোন্ পুত্রের উপকারক হইয়াছে?

ফল কথা এইরূপ যুক্তি দ্বারা অন্যদিক হইতেও ক্ষণিকবাদ পরিহাসে পর্য্যবসিত হইতে পারে। চক্ষে ঠুলি দিয়া, যাহারা কেবল পুঁথি ধরিয়া জগৎ বিচার করেন, তাঁহারা মাঝে মাঝে এই রূপই রহস্য সঙ্কুল গর্ত্তলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং তাহার অন্য উদাহরণ—কোন এক বাহ্য শূন্যবাদী দৈব্যাৎ মিউনিসিপ্যালেটির ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা খাইয়া বিজ্ঞানবুদ্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞান-বাদীকে কিন্তু সাংখ্য বলিয়াছিলেন—তোমার বাহ্য যদি শূন্য হয়, তাহা হইলে তোমার বিজ্ঞান অধিকতর (হোমিওপ্যাথিক দ্বিতীয় শক্তির?) 'শূন্য।' কেননা জ্ঞান, শূন্য বাহ্য বিষয় দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বাহ্য বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা দশম মাত্রার শূন্য হইতে শততম মাত্রার শূন্য ছাড়া, আর কিছুই হইতে পারেন। এবং বিজ্ঞান ও বাহ্য প্রতীতি যদি একই হইত তবে ঘটেতে ও আমাতে কোনই বিজ্ঞানের প্রভেদ থাকিত না। (সাং দঃ—১।৪২)

বাকী থাকেন শূন্যবাদী। ইহাঁর প্রতি সাংখ্যের জবাব খুব সংক্ষিপ্ত। শূন্যই যদি তত্ত্ব হয়, তবে সেই তত্ত্বকে অনায়াসেই লাভ করা যাইতে পারে। কেন

না যাহা ভাব, তাহা ত' বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারে বিনাশকে ত' প্রাপ্ত হইবেই এবং বিনাশকে প্রাপ্ত হইলেই সত্তা তত্ত্বলাভ করিবে—তবে আর সে জন্য এত তর্কাতর্কি ও মুষ্টামুষ্টির প্রয়োজন কি? ফল কথা শূন্যবাদে কোনই পুরুষার্থত্বের অবকাশ নাই এবং ইহা সাধারণ ন্যায় ও শ্রুতির বিরুদ্ধ। ইহা—

"অপ-বাদমাত্রম্ অ-বুদ্ধানাম।"

(সাং দঃ—১।১৫)

কিন্তু আমরা ভরসা করি কপিলাবস্তুর সেই পরম কারুণিক মহাপুরুষ এই সকল অপবাদের বহুযোজন ঊর্দ্ধে বিরাজ করিতেছেন।

(৪) বেদবাদ ও সাংখ্য।

যদিও চতুর্ব্বিধ ভাবনাগ্রস্ত বৌদ্ধদের সঙ্গে সাংখ্যের দুরতিক্রম্য ব্যবধান, তথাপি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্যমূলক। এখনকার কোন কোন পণ্ডিত আবার বলিতেছেন যে, বেদবাদের সমসাময়িক এক অবৈদিক বাদের চিরাগত ঐতিহাসিক প্রবাহকে সাংখ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। এই কথাটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

কিছুকাল হইতে আমাদের প্রত্নতত্ত্বের মহলে এক নূতন হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে। সেই জন্য আমরা চত্বরে ও প্রাঙ্গণে সর্ব্বদা শুনিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার পাশাপাশি একটি অনার্য্য সভ্যতাও এদেশে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এবং যাহা আর্য্য-সভ্যতা ছিল, তাহার বেদবাদ ও যজ্ঞবিধিই প্রধান লক্ষণ ছিল, এবং সেই অনার্য্য সভ্যতাকে জ্ঞানবাদ ও যোগাচারই আশ্রয় করিয়াছিল। তাহাতে সাংখ্য ও বৌদ্ধ, দুজনেই অনার্য্য কোঠায় পড়িতেছেন।

এই অভিনব প্রত্নতত্ত্ব, অনুদ্গতপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় এখনও এমন কোনও পূর্ণতা লাভ করে নাই যাহাতে সে, আপনার জল্পনা ও কল্পনার জন্মনীড় পরিত্যাগ করিয়া জগতে বাহির হইতে পারে। ইহার আর্য্য-অনার্য্য অংশ এখনও সমূহ সংশয়-স্থল। এবং পণ্ডিতেরা এই অংশকে এমন কোন তাত-বাত-সহ স্পর্শ-ক্ষম প্রমাণের উপর দাঁড় করাইতে পারেন নাই, যাহাতে এই অংশকে সাধারণে অবিসম্বাদে গ্রহণ করিতে পারে। এই অংশটি অনেকটা আঁচাআঁচির আদিম অবস্থার মধ্যেই বাস করিতেছে। কিন্তু ইহার অপর অংশ,—বেদবিধি ও তাহার বিরুদ্ধ জ্ঞানবিধি সম্বন্ধে অন্য কথা। এবং সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা সাহস করিয়া বলা যাইতেও পারে।

বেদবিধি যে নিরবচ্ছিন্ন যজ্ঞবিধি এবং অগ্নিহোত্র মাত্র একথা কেহই বলিতে পারেন না। বেদমন্ত্রের মধ্যে এমন মন্ত্রও অনেক আছে যাহা জ্ঞানমূলক, এবং যাহা জগৎ ও জগদীশ সম্বন্ধে অপার ও অপ্রমেয় রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছে। সুতরাং কেবল যজ্ঞবিধি বলিয়া কোনই বেদবাদ নাই। কিন্তু তথাপি বেদবাদের যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রই যে মুখ্য ও প্রকৃষ্ট লক্ষণ ইহাও অস্বীকার করা যায় না। বেদবাদ হইতে যজ্ঞ বিধিকে কিছুতেই তফাৎ করা যায় না। এবং যজ্ঞবিধির এক বিরুদ্ধবাদ—একজ্ঞান ও যোগবিধি—জ্ঞান ও ভক্তির মার্গ,—এদেশে আবহমান কাল হইতে যে চলিয়া আসিয়াছে তদ্বিষয়ে কোনই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। অন্ততঃ এদেশে প্রাচীন ও পৌরাণিক প্রমাণেও তাহা অস্বীকৃত হয় নাই।

উপনিষদ সকলের মধ্যে এই দুই বিরুদ্ধ বাদের সংঘর্ষ ও সম্মিলন আমরা প্রথমেই সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই। উপনিষদের প্রায় সমস্ত ঋষিই অগ্নিহোত্রী। কিন্তু সত্যার্থদ্রষ্টা লোকোত্তর-প্রতিভা-সম্পন্ন সেই মহাপুরুষগণ পরাবিদ্যাগত জ্ঞানবাদকেও কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এই জন্য উপনিষদের প্রায় সকল ঋষিই পরাবিদ্যা দ্বারা অপরা বিদ্যার উপাসনার ব্যবস্থা দিতেছেন—যজ্ঞবিধিকে জ্ঞানবিধি দ্বারা সংস্কার করিতে চাহিতেছেন—স্বর্গ-কামীকে অমৃত-কামী হইতে বলিতেছেন—এবং স্বর্গকে অপবর্গের পথে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিতেছেন।

উপনিষদের পরে মহাভারতীয় যুগ। এই যুগের

যিনি চিরারাধ্য ও পরমজ্ঞানী যুগাবতার, তিনি বেদ-বাদীকে কচিৎ কামাত্মা স্বর্গপর সঙ্কীর্ণমনাঃ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। এবং যোগ ও সাংখ্যের বিহিত জ্ঞান ও ভক্তির পন্থাকেই শ্রেষ্ঠতর মার্গ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও অগ্নিহোত্রকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এবং তিনিও উপনিষদের ঋষির ন্যায়, নিষ্কাম কর্ম্মবাদের মধ্যে বেদবিধি ও জ্ঞানবিধিকে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দান করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি মহাভারতীয় কালে জ্ঞানবিধির সহিত সঙ্ঘর্ষে যজ্ঞাগ্নিশিখা সর্ব্বত্রই পরিম্লান হইয়া পড়িতে-ছিল। মহাভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে দেখা যায় যে কোন এক জ্ঞান-নিষ্ঠ উচ্চ কর্ম্মবাদের কাছে যজ্ঞ যেন ছোট হইয়া যাইতেছে। ইহার একটিমাত্র উদাহরণের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শেষজীবনের কীর্ত্তি। বেদ-ব্যাসের নিদর্শনানুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বতর যজ্ঞ-প্রধান যুগের ভূপ্রোথিত স্বর্ণভার সমুত্তোলন করিয়া ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে যজ্ঞদক্ষিণা স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। তাহাতে উল্লসিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর যশোগানে ও সাধুবাদে যজ্ঞসভা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে কোন এক হতভাগ্য নকুল (বেঁজি) যজ্ঞসভায় অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল ধিক্ এই যজ্ঞকে! ইহার এত আড়ম্বরের ফল ক্ষুধার্ত্তকে একমুঠা ছাতুদানেরও সমতুল্য নহে। *

পাঠক অনায়াসেই মনে করিতে পারেন যে ঐ নকুল আর কেহই নহে, তাহা পরাজিত যজ্ঞবিধির মূর্ত্তিমান ভগ্নদূত; সে যেন যজ্ঞসভায় আসিয়া বলিয়াছিল,—হে যাজ্ঞিকগণ, তোমাদের চিরন্তন যজ্ঞশিবির উত্তোলন কর। কলির প্রারম্ভে জ্ঞান ও করুণার দুর্জ্জয় বাহিনী তোমাদের দুয়ারে হানা দিয়াছে।

এই যে জ্ঞানবাদ, ইহার মূল যে কোথায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমনও হইতে পারে যে প্রমথ্যমান বেদার্ণব হইতেই জ্ঞান সুধাকর স্বতঃ ও স্বভাবতঃ সমুত্থিত হইয়াছিল। এমনও হইতে পারে যে ইহা অন্যতর স্বাধীন প্রস্রবণ হইতেই প্রথমে পরিস্রুত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যেমন করিয়াই বা যেথা হইতেই প্রথমে সমুৎপন্ন হউক, এই জ্ঞানবাদের কেন্দ্রস্থলে মহাভারতকার কপিলকেই দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—"হে মহাত্মন, ইহলোকে যে কোন জ্ঞান আছে তাহা মহৎ সাংখ্য জ্ঞান বলিয়াই জানিবেন।" * অতএব কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মতে সাংখ্যই ভারতবর্ষীয় জ্ঞানবিধির পরিপূর্ণ ভাণ্ডার ও অক্ষয় প্রস্রবণ।

পুরাণ বলেন, কপিল ব্রহ্মার একজন মানস পুত্র। এবং কপিলের সঙ্গেই, যোগ ও সাংখ্যবিহিত ভাবচতুষ্টয়—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—জগতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ভগবান কপিল জীবের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া গুহ্য সাংখ্যজ্ঞান শিষ্য আসুরিকে প্রদান করেন। আসুরি আবার ঐ জ্ঞান পঞ্চশিখ মুনিকে প্রদান করেন। পঞ্চশিখ সাংখ্যজ্ঞানকে 'বহুধাতন্ত্রকৃত' করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চশিখতন্ত্র অধুনা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু যোগভাষ্যে ব্যাসদেব ইহা হইতে স্থানে স্থানে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। শিষ্য-পরম্পরা-আগত পঞ্চশিখ-তন্ত্র হইতে ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভেই সাংখ্য-কারিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এবং বোধ হয় উত্তর-কালে সাংখ্য দর্শনও এই পঞ্চশিখতন্ত্র হইতেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে যোগ দর্শনও প্রাচীন পঞ্চশিখতন্ত্রের শাখা মাত্র। মহাভারতে পঞ্চশিখ মুনির সহিত যে পরিচয় হয়, তাহাতে তিনি জ্ঞানী এবং যোগী দুই রূপেই প্রতীত হয়েন। এখন জিজ্ঞাস্য এই হয় যে, কপিলমুনি ও সাংখ্যগণ বেদের উপর কিরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বড় অল্প। তবে আমরা দেখিতে পাই যে সাংখ্যশাস্ত্র বেদবাদের স্বর্গকে তুচ্ছ করিয়া

* অশ্বমেধিক পর্ব্ব—৯০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* শান্তিপর্ব্ব—৩৪১।১০৯।

অপবর্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। প্রাচীন সাংখ্যতত্ত্ব-সমাসে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণাগ্রহণকে এক বন্ধের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে Maxmuller সাহেব সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন—"Sankhya hostile to priesthood"। তত্তটা না ও হইতে পারে। কিন্তু কপিল বেদ-বাদের উপর যে বড় একটা প্রসন্ন ছিলেন না, ইহা মহাভারতীয় একটি উপাখ্যান হইতেও জানা যায়। উপাখ্যানটির আরম্ভ হইতেছে এইরূপ—নবম প্রজাপতি নহুষের গৃহে একদা এক বিখ্যাত বৈদিক ঋষি সমাগত হয়েন। ঋষির অভ্যর্থনার জন্য বৈদিক প্রথানুসারে নহুষ একটি গাভীকে হত্যা করিয়া "মধুপর্ক" তৈয়ারী করিতে উদ্যোগী হ'য়েন। দৈবাৎ কপিলমুনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জীবে দয়া, বুদ্ধদেবের ন্যায় কপিলেরও বোধ হয় এক 'রোগ' ছিল। তিনি জীবের প্রতি অনুরক্ত হইয়াই গুহ্য সাংখ্যজ্ঞান জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এখানে হন্যমান পশুরপ্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ হইয়া প্লুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'হা বেদ!' কপিলের এই 'হা বেদ'-কে সাংখ্যবাদের 'মা নিষাদ' ছন্দ বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। ক্রৌঞ্চমিথুনের ব্যথায় বিদীর্ণ হৃদয় ঋষির ছন্দোময়ী করুণার মধ্যে যেমন ভারতবর্ষীয় আদিকাব্য প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল, তেমনি বোধ হয় যজ্ঞীয় পশুর প্রতি অনুকম্পারও মহৎ দুঃখের মধ্যেই বেদবিরোধী ভারতবর্ষীয় আদিম জ্ঞানবাদ সমুত্থিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, সেই হন্যমান পশুর মধ্য হইতে এক বেদপরায়ণ ঋষি বলিয়া উঠিলেন—"হে কপিল, তুমি সনাতন বেদবিধির নিন্দা করিতেছ?"

ইহাতে কপিল ও সেই গো-গত ঋষির মধ্যে তুমুল তর্ক বাঁধিয়া গেল। কপিল বলেন, মোক্ষ ও জ্ঞানবাদই শ্রেষ্ঠ। ঋষি বলেন, স্বর্গ ও বেদ-বাদই শ্রেষ্ঠ। সেই তর্কের বিস্তৃত বিবরণ পাঠক শান্তিপর্ব্বের গো-কপিল সংবাদে দেখিতে পাইবেন।

অবশেষে ফলকথা এই, মুক্তি-বাদের সঙ্গে বেদ-বাদের বড় একটা খাপ খায় না। কিন্তু ইহাও বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য কথা যে, বার্হস্পত্য নাস্তিকদের ন্যায় কোনই চটুল যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাংখ্য বেদ-বাদকে ভাণ্ডামি মাত্র বলেন নাই। তাঁহাদের উদার জ্ঞান-বাদে, অধিকারী ভেদে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও যজ্ঞ উপাসনারও স্থান আছে। এমন কি অধিকারী ভেদে তিনি 'অধ্যাস্ত উপাসনা' বা মূর্ত্তিপূজাও বিহিত করিয়াছেন (সাং দঃ ৪।১৫।২১)। কিন্তু তাঁহার তন্ত্রের মুখ্যপ্রাণ জীবের অত্যন্ত দুঃখ নির্বৃত্তি কল্পে মোক্ষকেই চরম করিয়াছে।

এই হিসাবে বুদ্ধদেব কপিল হইতে বেশী দূরে নহেন। উভয়েই জীবের পরম দুঃখে অনুকম্পা করিয়া তন্নিবৃত্তি-কল্পে মুক্তি ও নির্ব্বাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। করুণার মহামন্ত্রে তাঁহারা জগৎকে যে অভিনব দীক্ষা দান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগ সেই দীক্ষা মন্ত্রেরই সাধন করিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

সমুদ্রমন্থন সংগ্রাম

পুরাণে বহুকাল পূর্ব্বেকার ঘটনাবলি বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের সহিত সাল তারিখ লেখা নাই বটে, কিন্তু সেগুলি যে ঐতিহাসিক সত্য নহে এরূপ সন্দেহ করিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। পুরাতত্ত্ববিৎ সুধীগণ সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করুন।

বহু বহু কাল পূর্ব্বে, ইউরোপের আধুনিক মহা সম-

য়ের মত—অথবা তাহা অপেক্ষাও ভীষণ—ধনের নিমিত্ত দ্বাদশবার (১) দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল। যোগেশ বাবু বলেন (২), এই দ্বাদশ যুদ্ধের মধ্যে একটি যুদ্ধ —অর্থাৎ পঞ্চম যুদ্ধ—পৃথিবীতে হয় নাই, আকাশে হইয়াছিল; সেটা গ্রহযুদ্ধ মাত্র। তাহা হইলে এগার বার দেবাসুর-যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই দ্বাদশ সংগ্রাম ছাড়া আরও যে দেবাসুর-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণও পুরাণে আছে—যথা, শম্বরাসুর (৩) নামক দৈত্যের সহিত যখন যুদ্ধ হয়, তখন অযোধ্যাপতি দশরথ দেবতাদের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কৈকেয়ী ছিলেন; দশরথ আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে কৈকেয়ী তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। দশরথ এই উপকারের জন্য দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; এই প্রতিশ্রুতির পরিণাম রামের বনবাস। উপরে লিখিত দ্বাদশ সংগ্রামের মধ্যে চতুর্থ (৪) যুদ্ধের নাম অমৃতমন্থন-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম-কালীন-ভূগোলে এবং আধুনিক ভূগোলে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। এখন যে প্রদেশকে পরশিয়া, আফগানিস্থান বিলোচিস্থান, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাব বলে, তখন সেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডকে আর্য্যভূমি বলিত। আর্য্যভূমির পূর্ব্ব সীমায় ভাগীরথী গঙ্গা ও পশ্চিম সীমায় ইউফ্রেটিস প্রবাহিত। এই প্রদেশে কৃষ্ণসার (৫) মৃগ অবাধে চরিয়া বেড়াইত। দেশের অধিবাসীরা আর্য্যবংশোদ্ভব দেবতা। ইউফ্রেটিস নদের অপর পারে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবল পরাক্রান্ত অসুরেরা (Assyrian) বাস করিত। এই দুই জাতিই বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতায় তুল্য ছিল, কেবল দেবতারা বারুণীর সেবা করিয়া সুর (৬) নাম ধারণ করিয়াছিল, আর তাহাদের বিপক্ষেরা সুরা পান করিত না বলিয়া অসুর নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই দুই জাতিতে প্রায়ই সংঘর্ষ হইত, কিন্তু কখন-কখনও তাহারা সন্ধি করিয়া উভয়ে মিলিয়া উন্নতি করিবার চেষ্টাও করিত।

একবার যখন উভয় জাতি মধ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল, তখন দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি, অসুর-গুরু শুক্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, উভয় জাতি মিলিয়া বিদেশে ধন ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে যাইবেন। বিদেশে যাহা যাহা ভাল ও লোভনীয় বস্তু পাইবেন তাহা উভয়ে সমান সমান ভাগ করিয়া লইবেন। তখন উভয় জাতির কতকগুলি লোক বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখনও তরী আবিষ্কৃত হয় নাই। ছোট ছোট নদী পার হইবার প্রয়োজন হইলে লোকে একটা ছাগল বা মেষের বায়ুপূর্ণ চর্ম্মে বসিয়া পার হইত। যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে এখনও গ্রাম্য কৃষকেরা ঐরূপে নদী পার হয়। ছাগল মেষ বা অন্য কোন গৃহপালিত পশুর সম্পূর্ণ ছাল তুলিয়া লয়। তাহার পা-গুলির চামড়া অল্প রাখিয়া বেশীর ভাগ কাটিয়া ফেলে। পরে চামড়া গুটাইয়া দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া বা সেলাই করিয়া দেয়। কেবল গলার মুখ খোলা থাকে। এই চামড়ার থলিকে মশক্ বলে। আজকাল লোকে জলপূর্ণ মশক পিঠে করিয়া প্রয়োজন মত একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়। গো, মহিষ ইত্যাদি বড় জন্তুর চর্ম্মে প্রস্তুত

(১) দেবাসুরাণাং সংগ্রামাদায়ার্থং দ্বাদশা ভবান্।
অগ্নিপুরাণ। ২৭৬।১০ শ্লোক।

(২) "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী।"

(৩) বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যা, ৯ সর্গ।

(৪) ......চতুর্থোহমৃতমন্থনঃ। অগ্নি, ২৭৬।১১।

(৫) যস্মিনদেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্মিন ধর্ম্মান্নিবোধত॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১।২।

এই কৃষ্ণসার মৃগের কথা অন্য স্মৃতিতেও আছে, যথা হারীত ১।১৬, সংবর্ত্তসংহিতা, ৪ শ্লোক, ব্যাস সংহিতা ১।৩; বশিষ্ঠ ১ম অধ্যায় ইত্যাদি।

(৬) দিতির পুত্রেরা অনিন্দিতা সুরাধিষ্ঠাত্রী বরুণনন্দিনীকে গ্রহণ না করায় অসুর এবং অদিতি-নন্দনেরা গ্রহণ করায় সুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।—বাল্মীকি রামায়ণ, বঙ্গবাসী প্রেসের অনুবাদ, আদি, ৪৫ সর্গ, ৩৮ শ্লোক।

মশককে জল পূরিয়া উট বা বলদের পিঠে দুই দিকে দুইটা ঝুলাইয়া জল বহন করে। নদীপার হইবার প্রয়োজন হইলে এই মশকে বাতাস পূরিয়া মুখের চামড়া গুটাইয়া দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দেয়। তখন সেটা ফুটবলের মত ফুলিয়া ওঠে। এই বায়ুপূর্ণ মশক জলে ভাসাইয়া লোকে তাহার উপর দুই দিকে দুই পা ঝুলাইয়া বসে ও একটি দণ্ডের সাহায্যে যে দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে। ইতিহাসে দেখিতে পাই, যখন মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুঁ, শেরখাঁ আফগানকে কনোজের যুদ্ধে রাজসিংহাসন উপহার দিয়া, কেবলমাত্র প্রাণ লইয়া পলাইতেছিলেন, তখন নদীপার হইবার সময়ে প্রাণটিও হারাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তখন এক-জন জলবাহক (ভিস্তি) এই রূপ এক মশক সাহায্যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। বেশী ভারী মোট পার করিবার জন্য একটা ভেলা বাঁধা হইত ও তাহার নিচে প্রয়োজন মত ৫০।৬০ হইতে ১০০০।১২০০ বায়ুপূর্ণ মশক বাঁধা হইত। এইরূপ ভেলাতে ১০০০ বা ১২০০ মণ মাল অনায়াসে বোঝাই করা চলিত। তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চতুষ্কোণ ভেলা অপেক্ষা কূর্ম্মাকার ভেলা অনায়াসে জলে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। দেবাসুরেরা ২।৪ হাজার বড় মশক দিয়া এক প্রকাণ্ড কূর্ম্মাকার ভেলা বাঁধিলেন। এই ভেলার উপর ছয় সাত তল কাঠের ঘর বাঁধিলেন। তখন এই অভিনব তরীটি দেখিয়া বোধ হইল যেন একটি প্রকাণ্ড কূর্ম্মের পৃষ্ঠে মন্দার গিরিশৃঙ্গ দাঁড় করান হইয়াছে। অভিযান কালে মাস্তল, পাল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয় নাই। গুণ টানিয়া লইয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। গুণ টানিবার জন্য বলবান লোক, ও বড় দৃঢ় কাছির প্রয়োজন। কাছি মোটা হইলে ধরিয়া টানিতে অসুবিধা হয়। সেই জন্য একটি বড় মোটা কাছি প্রস্তুত করা হইল ও তাহার মুখে গ্রন্থি দিয়া একশত ছোট ছোট অপেক্ষাকৃত সরু কাছি বাঁধা হইল। নিয়ম করা হইল যে, একবার কতক্ষণ দেবতারা গুণ টানিবেন, পরে তাঁহারা ক্লান্ত হইলে অসুরেরা টানিবে। শীর্ষের কাছের ছোট কাছি এক একটি লোক টানিবে। যখন এই রূপে একশত লোক গুণ টানিতে লাগিল, তখন কাছিটি শতশীর্ষ সর্পরাজ বাসুকীর মত দেখাইতে লাগিল।

ক্রমে ভেলা ইউফ্রেটিস নদ ত্যাগ করিয়া পারস্য উপসাগরে আসিয়া পড়িল। তখন কূর্ম্মপৃষ্ঠে মন্দার পর্ব্বত, নাগরাজ বাসুকীদ্বারা বেষ্টিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিল। গুণ-টানা তরী তট হইতে দূরে যাইতে পারে না, অতএব এই ভেলা অরব দেশের তীরে তীরে দক্ষিণ দিকে চলিল। অরব দেশ ঘুরিয়া আধুনিক এডেন (Aden) বন্দরের কাছে দেবাসুরেরা দেখিলেন, অরব-বাসীরা সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তা-শামুক তুলিতেছে। তাঁহারাও এই দেশে নানা প্রকার রত্ন, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভেলা বোঝাই করিলেন। ক্রমে তাঁহারা আধুনিক জেদ্দার (Jedda) কাছে আসিয়া শুনিলেন, নিকটেই এক প্রাচীন দেবস্থান আছে, সেখানে দেশ দেশান্তরের লোক পূজা করিতে আসে; মন্দিরের হাটে সকল দেশের পণ্য পাওয়া যায়। তাঁহারা সমুদ্রতীরে ভেলা রক্ষা করিয়া হাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। হাটে উত্তর দেশীয় (নজদ দেশীয় Nejd) ভাল ভাল ঘোড়া বিক্রয় হইতেছে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা অনেকগুলি শ্বেতবর্ণ উচ্চ কর্ণযুক্ত ঘোটক সংগ্রহ করিলেন। উচ্চৈশ্রবা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা সমুদ্রতীরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা অরব দেশ-বাসীদের কাছে সংবাদ পাইলেন যে সমুদ্রের অপর পারে এক মহাদেশ আছে, সেখানে মহাকায় হস্তী পাওয়া যায়। তাঁহারা সে লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সে দেশে গিয়া কতকগুলি ঐরাবত সংগ্রহ করিলেন। তাঁহারা আরও পশ্চিম উত্তরে গিয়া এক সভ্য দেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সেখানে লোকের পীড়া হইলে চিকিৎসকেরা ওষধি দ্বারা আরোগ্যদান করিয়া থাকে। তাঁহারা নানাপ্রকার ওষধি ও একজন চিকিৎসক আপনাদের সহিত

লইলেন। এইরূপ নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার অদ্ভুত অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

দেশে ফিরিবার পথে দেবতারা পরামর্শ করিতে বসিলেন যে অসুরেরা বলবান বুদ্ধিমান ও শুক্রের মত মহাপণ্ডিতের শিষ্য। তাঁহারা এই সকল অদ্ভুত সংগ্রহের অর্দ্ধ অংশ ভাগ পাইলে, সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে দেবতাদের পরাজিত করিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইবে। অতএব এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা ভাগে বঞ্চিত হয়। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুই সর্ব্বাপেক্ষা কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন ও কুচক্রী, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করাই স্থির হইল।

বিষ্ণুর পরামর্শ মত মন্থনলব্ধ দ্রব্যাদি বণ্টনের জন্য অসুরদিগকে এক ভোজে নিমন্ত্রিত করা হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অসুরেরা সুরাপান করিত না, বা তাহাদের সুরাপান অভ্যাস ছিল না, কিন্তু দেবতারা অভ্যস্ত ছিলেন। দেবতারা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য নানা প্রকার তীক্ষ্ণ রস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অসুরেরা রসপান করিয়া প্রায় জ্ঞানশূন্য হইল;—যেটুকু জ্ঞান ছিল, যুবতী সুরা-পরিবেষণকারিণীদের কটাক্ষ বাণে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাও হারাইল। এই সময়ে মন্থন লব্ধ দ্রব্যাদির বণ্টন আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য ধন, রত্ন, ওষধি, চিকিৎসক, উচ্চৈশ্রবা, ঐরাবত ইত্যাদি সকলই দেবতাদিগের ভাগে পড়িল, অসুরেরা অজ্ঞানাবস্থায় এই বণ্টনে সম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিল। হটাৎ রাহু কেতু নামক অসুরের নেশার ঘোরে বোধ হইল যে বণ্টন অন্যায় রূপে হইতেছে;—সে সন্দেহ প্রকাশ করিল। বিষ্ণু জানিতেন, মদের নেশাতে একবার সন্দেহ হইলে সে সন্দেহ দূর করা সহজ নহে এবং রাহু কেতুর আপত্তি যদি অন্য অসুরেরা বুঝিতে পারে, তবে সকলেই বাঁকিয়া বসিবে ও তাহাদের 'কদলী প্রদর্শন' চেষ্টা বিফল হইবে। অতএব তিনি সূর্য্য ও চন্দ্র নামক দুই দেবতার সাহায্যে রাহু কেতুর গলদেশ চক্র দ্বারা কাটিয়া দিলেন—কেন না মৃত ব্যক্তি আপত্তি করিতে পারে না।

এইরূপে সমুদ্র মন্থন লব্ধ দ্রব্যাদি সকলই দেবতাদের ভাণ্ডারে স্থান পাইল। অসুরেরা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া গেল। দেশে গিয়া ভাই বেরাদরদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারা দেবতাদের আক্রমণ করিল। এই সংগ্রামই ইতিহাসে অমৃত-মন্থন সংগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ হইল।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

অপরাজিতা

(উপন্যাস)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাবাজীর মধুর আদেশ।

অপরাজিতা চলিয়া গেলে, আমি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া, আমার আজীবনের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিলাম, আমার বাল্যকালের যোগধর্ম্মের কথা, যোগবল লাভ করিবার প্রলোভনে গৃহত্যাগের কথা। আমি কি যোগবল লাভ করিতে পারিয়াছি? না পারিলে, কোন দৈব বলে, আমার এই অধম রূপ লইয়া, আমি অপরাজিতাকে লাভ করিতে পারিলাম; তাহার হৃদয়-মথিত সমস্ত ভালবাসার একমাত্র অধিকারী হইলাম? মাতাকে একাকিনী গৃহে ফেলিয়া আসাটা

আমার ভাল হয় নাই। কিন্তু গৃহত্যাগ না করিলে, আমার ত অপরাজিতা লাভ ঘটিত না। ভগবান আমাকে গৃহত্যাগী করিয়া ভালই করিয়াছেন। বাবাজী তর্কের অনুরোধে যাহাই বলুন, আমি বেশ বুঝিয়াছি, ভগবান অসীম দয়াময়। তাঁহার দয়ায় এক্ষণে অপরাজিতাকে লইয়া, আবার গৃহে ফিরিব। মা,—মাকে আমি খুব জানি—তিনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন; অপরাজিতাকে বধূরূপে বরণ করিয়া ক্রোড়ে লইবেন। তিনি আমাকে বলবান ও কৃতবিদ্য দেখিয়া কত আনন্দিত হইবেন। আমি অর্থোপার্জ্জন করিয়া, মাতাকে ও অপরাজিতাকে প্রতিপালন করিব।

কিন্তু কথাটা এই হইতেছে যে, আমি যোগী হইতে পারিলাম না। তাহাতে ক্ষতি কি? বাবাজী বলিয়াছেন, সংসারধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার সংসার ধর্ম্মে অপরাজিতা সহধর্ম্মিণী হইবে; তাহার রূপজ্যোতিঃ লইয়া, আমার ধর্ম্মপথ আলোকিত করিয়া রাখিবে। কে বলিতে পারে, তাহার সহায়তায় হয়ত আমি যোগবলও লাভ করিতে পারি।—বাবাজী বলিয়াছেন, ভবানীপতি হইলেও মহাদেব যোগিশ্রেষ্ঠ। আমার অপরাজিতা, দেবী ভবানীর মত আমাকে যোগিশ্রেষ্ঠ করিবে।

এই সুখ চিন্তার মাঝে, হঠাৎ একটা আশঙ্কার কথা আমার মনে উদিত হইল। সেই কালীঘাটের আমার সেই পঞ্চমবর্ষীয়া পত্নীকে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। সে কি এখনও জীবিত আছে? এই দীর্ঘ পতিবিরহে হিন্দু নারীর কি জীবিত থাকা উচিত? সেই পতিবিরহিতা পামরী যদি কোন ক্রমে জীবিতা থাকে, তাহা হইলে, ৺কালীঘাটের খড়্গাধারিণী জগন্মাতা কি তাহার রক্ষা রাখিবেন?—তাঁহার সেই তীক্ষ্ণ খড়্গ তিনি কি বৃথায় ধারণ করিয়াছেন? জয় মা কালী! তোমার অমোঘ খড়্গ লইয়া, তুমি আমাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিও।

কিন্তু কালীমাতার নিকট বরপ্রার্থনা করিয়াও আমার অন্তরের আশঙ্কা প্রশমিত হইল না। কেবল মনে হইতে লাগিল, আমার সেই পঞ্চমবর্ষীয়া সর্ব্বনাশী আমার সর্ব্বনাশ করিবে। আমি তাহাকে অপরিচিতার ন্যায় বিদায় করিয়া দিলেও, সে নির্লজ্জা আমাকে ছাড়িবে না। কি হইবে? আমার সুখ-পথের এই কণ্টককে আমি কিরূপে অপসারিত করিব?

আমার মাথায় অকস্মাৎ একটা দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল। আচ্ছা, আমি যদি একবারে অস্বীকার করি যে সেই পামরীর সহিত কোন জন্মে আমার পরিণয় ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে, সে কিরূপে প্রমাণ করিবে যে আমি তাহার পতি? সেই বিবাহের প্রধান সাক্ষী সেই দিদিমা বুড়ী, এক্ষণে ভগবানের কৃপায়, যমালয়ে বাস করিতেছে; যমালয়ে যাইয়া, কোনও লোক কখনও প্রত্যাগত হয় না; অতএব আমার বিপক্ষে সে সাক্ষ্য দিতে আসিতে পারিবে না। দ্বিতীয় সাক্ষী, সেই পুরোহিত; তখনই সে মরণাপন্ন বৃদ্ধ ছিল; এখন সে নিশ্চয় মরিয়াছে। আমার শ্বশুর আমাকে দেখেন নাই,—যেদিন তিনি আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, সেদিন আমি আপনাকে লুক্কাইত রাখিয়াছিলাম; তাহা ছাড়া, বিবাহের সময়ও, ছুটী না পাওয়ায় তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কাযেই তিনি আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আর এক সাক্ষী ছিলেন, আমার বাবা; কিন্তু তিনি ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর এক সাক্ষী সেই সর্ব্বনাশীর মা; তিনি আমাকে চিনিতেই পারিবেন না;—কোথায় সেই দ্বাদশবর্ষীয় অজাতশ্মশ্রু বঙ্গীয় বালক, আর কোথায় এই চোগোম্ফা-ওয়ালা ভোজপুরী পলোয়ান। তোমরা বলিবে যে আমার মা আমাকে চিনিবেন, এবং আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। আমি বলিতেছি, তোমরা মাতৃজাতিকে এখনও চিনিতে পার নাই;—বহুবৎসর পরে, হারাণ-রত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, কোনও মাতা কখন তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন না। অতএব আমি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারিব যে পামরী মেনকার সহিত আমার কখনও বিবাহ হয় নাই।

মেনকার সহিত বিবাহ অসিদ্ধ হইল বটে, তথাপি আমার হৃদয়াভ্যন্তরের অতি গুহ্যতম প্রদেশে একটু 'খুঁৎ' রহিয়া গেল। যদি দুষ্ট পাড়াপড়শীরা সাক্ষ্য দিতে আসে? যদি সেই ঢাকীরা আদালতে যাইয়া ঢাক বাজাইয়া দেয়! অতএব আমি স্থির করিলাম. অপরাজিতাকে লইয়া সহসা স্বদেশে যাওয়া হইবে না। আমার জানা ছিল যে এসব ব্যাপারে ৺কাশীধাম অতি উদার ও পরম পবিত্র স্থান; এজন্য আমি ঠিক করিলাম, কাশীতেই বাস করিব। মাতা ঠাকুরাণীকেও সেই স্থানেই লইয়া আসিব;—এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কাশীবাসই ভাল।

মানুষ যখন ভাবনা-সাগরে ঝাঁপ দেয়, তখন সে সহজে কূলে উঠিতে পারে না। মেনকা সম্বন্ধে আপনাকে নিরাপদ ভাবিতে না ভাবিতে, আমার মন মধ্যে নূতন আশঙ্কার উদয় হইল। আমার আশঙ্কা হইল, অপরাজিতাকে লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করা ত দূরের কথা, তাহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করাই আমার পক্ষে কঠিন হইবে। আমার মত কুলগৌরবহীন (তোমরা জান, এ'টা কতদূর মিথ্যা) রায় বামুনের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে, অপরাজিতার পিতা কখনই স্বীকৃত হইবেন না। স্বামী বর্ত্তমানে কন্যার দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু কুলগৌরবহীন পাত্রে তাহাকে পাত্রস্থ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। অপরাজিতা আমাকে স্পষ্টই একথা বলিয়া গিয়াছে; আর পূর্ব্বে তিনি নিজেও একথা বলিয়াছেন। অতএব শ্রীযুক্ত অনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট যাইয়া, আমি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিলে, তিনি নিশ্চয় আমার সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন।

তবে কি তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে না? তবে কি আমার সংসার ধর্ম্মের সুখস্বপ্ন অকালে ভাঙ্গিয়া যাইবে?

অসম্ভব! আমি অপরাজিতাকে বিবাহ করিবই। অপরাজিতার যখন মত আছে, তখন কে আমাকে বাধা দিবে? পিতা? হায়, হায়! আমি কি ইংরাজি উপন্যাস পাঠ করি নাই?—দেখি নাই, যে প্রেমের প্রবল স্রোতে কত ডজন ডজন পিতা ভাসিয়া গিয়াছে? পিতার মত না থাকিলে, অপরাজিতার সহিত পরামর্শ করিয়া, এ কার্য্য পিতার অগোচরেই সম্পন্ন করিতে হইবে। একদিন ভগবৎ-কৃপায়, তাহাকে লইয়া, কাশীতে পলায়ন করিবই। তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসীই আমাদের গোপন-বিবাহের উপযুক্ত স্থান।

কিন্তু সে যদি পিতামাতার মমতা ত্যাগ করিতে না পারে? বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিয়া, আজ হঠাৎ এক অপরিচিতের সহিত, এক অপরিচিত দেশে যাইতে না চায়? আগামী কল্য তাহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সে কি আমার এই প্রেমের মহা আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারিবে? না; সে নিশ্চয়ই আমার সহিত পলায়ন করিবে। ভগবানের এই প্রেমের রাজ্যে এরূপ পলায়ন নিত্য ঘটিতেছে—নিত্য ঘটিবে।

কিন্তু—আরও একটা মস্ত 'কিন্তু' আছে। অর্থ? অপরাজিতাকে লইয়া পলাইতে হইলে, অর্থের আবশ্যক। স্বার্থপর রেল কোম্পানি অর্থ না পাইলে, আমাদিগকে তাহাদের গাড়ীতে চড়িতে দিবে না। গাড়োয়ান প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিবে না, গাড়ীভাড়া চাহিবে, মুটে পয়সা না পাইলে গালি দিবে। সেই কুসুমকোমলা, স্নেহলালিতা লতিকাকে লইয়া, পদব্রজে হরিদ্বার হইতে কাশী যাওয়া অসম্ভব। সম্ভব হইলেও তাহাতেও অর্থের আবশ্যক;—রাস্তায় তাহাকে খাইতে দিতে হইবে, নিজেও আহার ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারিব না। তাহার পর, রাত্রিবাসের জন্য কুটীর ভাড়া লইতে হইলে, তাহাতেও অর্থব্যয় আছে। কাশীতে যাইয়াও বাড়ীভাড়া লইতে হইবে; নিত্য দুই প্রাণীর আহারের আয়োজন করিতে হইবে। আমি কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী, ইহার জন্য অর্থ কোথায় পাইব? হায়, প্রেমময়!—চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়, সুবাস কুসুম মধ্যে কীটের ন্যায় আমাদের প্রেমলীলার মধ্যে কেন 'তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রে-

ন্ধন চিন্তা' রাখিয়া দিলে? দ্বাপরযুগের শেষ রাজা পরীক্ষিতের হস্তধৃত সুপক্ব ফল হইতে বাহির হইয়া, ক্ষুদ্রাকার তক্ষক যেমন বৃহদাকার ধারণ করিয়া, অভিশপ্ত রাজাকে দংশন করিয়াছিল, আজ সুপক্ব অপরাজিতা প্রেমের মধ্য হইতে বাহির হইয়া, ক্ষুদ্র অর্থচিন্তা, তেমনই বৃহদাকার ধারণ করিয়া, অর্থহীন আমাকে দংশন করিতে লাগিল। এ বিষম অর্থসমস্যা কিরূপে নিরাকৃত হইবে,কোন ক্রমে স্থির করিতে পারিলাম না।

ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, আচ্ছা কিছু দিনের জন্য কোন স্থানে যাইয়া, কোনও সরকারি আপিসে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে কি হয়? এখন বাবাজীর কৃপায় আমার যে গুণপনা জন্মিয়াছে, তাহাতে অনায়াসে মাসিক শতাবধি মুদ্রা বেতন লাভ করিতে পারিব। এরূপ বেতন পাইলে, নিজের অশন বসনের জন্য যৎসামান্য ব্যয় করিয়া, এক বৎসরে প্রায় হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব। পরে ভদ্রবেশে হরিদ্বারে ফিরিয়া, অপরাজিতাকে লইয়া কাশী পলায়ন করিব। তথায় তাহাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া, গৃহস্থালী স্থাপন করিব। এবং স্থানীয় কোনও দপ্তরে প্রবেশ করিয়া, পুনরায় অর্থোপার্জ্জনে মন দিব।

কিন্তু—ইহাতে একটা 'কিন্তু' আছে। আমাদের ভাবনা সাগর 'কিন্তু'র তরঙ্গে সদাই সন্তাড়িত। অর্থ সংগ্রহ জন্য আমি যখন দীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থান করিব, তখন আমার প্রণয়িণীর পিতা, আমার প্রণয়িণীর জন্য নূতন পতির অন্বেষণে যদি স্থানান্তরে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে, আমার যত্ন-গঠিত আশাস্তম্ভ, বাবিলনের মন্দিরের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। না না, অর্থ সংগ্রহ জন্য, আমার হরিদ্বার ত্যাগ করা হইবে না। অর্থহীন ও নিরুপায় হইয়া, আমাকে হরিদ্বারে থাকিতেই হইবে। আমার অপরাজিতাকে চক্ষের অন্তরালে রাখা হইবে না। আমাদিগকে প্রেমপথে এতটা চালিত করিয়া, ভগবান কি আমাদিগের একটা উপায় করিয়া দিবেন না?

তোমরা কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে যে, ভগবান বহুপূর্ব্বেই আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া, তোমরা বুঝিবে যে বাবাজীর কথা ঠিক নহে;—তিনি দয়াময়, সত্যই দয়াময়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয় ও পল্তার বড়া।

পরদিন প্রত্যূষে অপরাজিতা আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলে, আমি তাহার বামহস্ত আপন হস্তমধ্যে গ্রহণ করিয়া, অনুরাগ ভরে তাহা নিপীড়িত করিলাম, এবং কহিলাম—"দেখ।"

সে আমার দিকে তাহার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কহিল—"কি?"

আমি। দেখ, আগে তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহ নাই; গত কল্য কিন্তু আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছ।

সে। কি করি?—তুমি যে ছাড়িলে না।

আমি। এখন এই বিবাহটা কবে, কিরূপে ঘটিবে, তাহার একটা উপায় স্থির করিতে হইবে।

সে। কিরূপে ঘটিবে?

আমি। তোমার বাবার নিকট যাইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিলে, তিনি আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন না?

সে। না। তুমি কুলীন হইলে দিতেন; তুমি কুলীন নহ বলিয়া দিবেন না।

আমি। কোন মতেই না?

সে। কোন মতেই না।

আমি। তবে কিরূপে আমাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে?

সে। এত তাড়াতাড়ি কেন? সে একদিন হইবে। ভগবান তাহার একটা উপায় করিয়া দিবেন। সে জন্য কোন ভাবনা নাই।

আমি। শোন। তোমার পিতার অগোচরে আমি তোমাকে বিবাহ করিব।

সে। করিও।

আমি। এই বিবাহের জন্য, তুমি তোমার পিতা-মাতাকে ছাড়িয়া, আমার সহিত দূর দেশে যাইতে পারিবে ত?

সে। নিশ্চয় পারিব। সে দিন তুমি আমার আহ্বানে নরক পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তত ছিলে, আজ তোমার আহ্বানে আমি স্থানান্তরে যাইতে পারিব না? আমি কি এমনই অকৃতজ্ঞ?

আমি। তোমার কোনও কষ্ট হইবে না?

সে। না। তুমি যেখানে লইয়া যাইবে,—তাহাই আমার স্বর্গ।

অপরাজিতার কথা শুনিয়া, একটা বিষয়ে আমার মন স্থির হইল। আমি বুঝিলাম যে অন্যান্য প্রণয়িনী-গণের ন্যায়, সেও প্রণয়ীর সহিত পলায়নে পরাঙ্মুখ হইবে না;—ইহাই সনাতন প্রথা। এক্ষণে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তাহা কিরূপে সংগ্রহ করিব?

আমি আপন মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমার অর্থাভাবের কথা। আমি অপরাজিতাকে বলিব কি? ছি! সে কথা কি বলা যায়? প্রেমশাস্ত্রে কি প্রণয়িনীকে অর্থাভাবের কথা বলিবার ব্যবস্থা আছে? হায়! কে জানে কত প্রণয়িনীর প্রবল প্রেম-মন্দাকিনী, ঐ নিষ্ঠুর কথায়, মরুভূমির দিকে প্রবাহিত জলপ্রবাহের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? অতএব আমি ঐ নীরস কথা কহিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে রসপূর্ণ কথা সকলের অবতারণা করিলাম।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, অপরাজিতা যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবিতেছ?" তখন আমি আমার করতলগত তাহার কোমল করপল্লব আমার অধর-প্রান্তে তুলিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বল দেখি, কি ভাবিতেছি?"

সে বলিল—"তুমি যোগী; বোধ হয় যোগধর্ম্মের কথা ভাবিতেছ। ভাবিতেছ অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও ব্যাপকন্যাসের কথা; ভাবিতেছ, মার্জ্জন প্রণায়াম ও অঘমর্ষণের কথা; ভাবিতেছ, ধেনুমুদ্রা, নারাচ মুদ্রা ও গালিনী মুদ্রার কথা।"

তাহার শ্রীমুখে এ সকল কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম অপরাজিতা কি যোগিনী? এই যোগিনীকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইয়া, হয়ত গৃহে থাকিয়াই আমার যোগধর্ম্ম সার্থক হইবে; আর যোগধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া বনে বনে ঘুরিতে হইবে না। মুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি এ সকল কথা কোথায় শিখিলে? তুমি কি যোগধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলে?"

সে তাহার মধুরাধর সুহাস্যে সজ্জিত করিয়া, লজ্জিত গণ্ড গোলাপরাগে রঞ্জিত করিয়া, লোল নয়নে আমার মুখাবলোকন করিয়া কহিল—"কেন, আমাদের কি যোগধর্ম্ম শিক্ষা করিতে নাই? মেয়েমানুষ কি যোগিনী হয় না? তুমি যোগী, তুমি আমাকে বিবাহ করিলে, আমি তোমার যোগিনী হইয়া থাকিব। কেমন?"

আমি বলিলাম—"তুমি দেবী; তোমাকে বিবাহ করিলে, তুমি আমাকে দেবতা করিয়া তুলিবে। তোমার ভালবাসায় আমি দেবত্ব লাভ করিব।"—এই বলিয়া আমি তাহার লজ্জাচিত্রিত গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলাম।

সে আমার বক্ষে তাহার মস্তক স্থাপিত করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিল—"আবার, আবার তুমি কালিকার মত কথা কহিতেছ! আমি তোমার সেবিকা; তুমি আমাকে আদর করিও না। তোমার আদরের কথা শুনিলে, আমি আত্মহারা হইয়া যাই। পৃথিবীর কোন কথা তখন আর আমার মনে থাকে না। তুমি যেন সংসারের একমাত্র সামগ্রী হইয়া পড়। দেখিবার, শুনিবার, পূজা করিবার, বর লইবার একমাত্র দেবতা হইয়া পড়। তোমার আদরে, আমার ইচ্ছা যায়, যেন জন্ম জন্মান্তর তোমাকে পতিরূপে পাই; যেন অনন্তকাল তোমার সেবিকা হইয়া থাকি; যেন তোমার এই চরণ-ধূলিতে মিশিয়া যাই!"—বলিতে বলিতে, কৃষ্ণতড়াগ-তরঙ্গ তুল্য কেশজালে, সে আমার চরণপ্রান্ত আবৃত

করিয়া, প্রণতা হইয়া, আমার পদধূলি তাহার মস্তকে গ্রহণ করিল।

প্রণয়াবেগে বিহ্বল হইয়া, আমি তাহাকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিলাম। তাহার বক্ষের স্পন্দনের সহিত আমার হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দিত হইতে লাগিল। আর, দেখ দেখ, আমার সম্মুখের কঙ্করময় ভূমি যেন পুষ্পাকীর্ণ হইয়া গেল। মস্তকোপরি সূর্য্যালোকিত বৃক্ষপত্র সকল যেন সুবর্ণময় হইয়া উঠিল; বৃক্ষোপরে পক্ষী সকল যে। স্বর্গের বীণা বাজাইল।

তোমরা আমার এই প্রেমচক্ষে জগৎকে একবার দেখিও। দেখিবে, ঐ গঙ্গার জল, জল নহে,—অমৃত-প্রবাহ। দেখিবে ঐ সূর্য্যোলোক কেবল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু উহাতে উত্তাপ নাই। দেখিবে, গঙ্গাতীরে সূর্য্যালোকে ঐ বালুকাকণা সকল, বিচিত্র মণি মাণিক্যের ন্যায়, উজ্জ্বল বিচিত্ররাগ বিকীর্ণ করিতেছে। দেখিবে, ঐ বালুকা কণা মাথায় লইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল, উজ্জ্বল ও মধুময় হাসি হাসিতেছে। দেখিবে, সে হাসিতে আকাশ হাসিয়া উঠিয়াছে।

কতক্ষণ পরে, অপরাজিতা বলিল,—"বেলা হইয়া গেল; আজ যাই, কাল আবার আসিব।"

আমি বলিলাম—"কে জানে কবে আমার এমন দিন আসিবে, যে দিন বেলা হইলেও তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে না; অহরহ তোমাকে পার্শ্বে পাইব।

অপরাজিতা। তোমার ভয় নাই; সে শুভদিন শীঘ্র আসিবে। তখন দিবারাত্র আমি আমার দেবতাকে ষোড়ষোপচারে পূজা করিব। ঐ দেখ, একটা কথা তোমাকে বলিতে আমি একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।'

আমি। কি কথা।

অপরাজিতা। মা তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন। আজ তুমি আমাদের বাড়ীতে খাইতে যাইও।

আমি। দেখ, তোমার মা আমাকে প্রায় প্রত্যহ আহারে নিমন্ত্রণ করেন কেন?

অপরাজিতা। আমি তোমাকে খাওয়াইতে ভালবাসি বলিয়া।

আমি। ইহাতে তোমার পিতামাতার মনে কোন সন্দেহের উদয় হইবে না ত?

অপরাজিতা। কেন হইবে? তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া, কে না সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করায়? বিশেষতঃ তুমি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আর আমরা বাঙ্গালী। তোমার কোন ভয় নাই; তুমি নিশ্চিন্ত মনে খাইতে যাইও।

আমি। যাইব। আজ আমার জন্য তোমরা কি রাঁধিবে?

অপরাজিতা। তুমি যাহা খাইতে ভালবাস।

আমি। আমি কি ভালবাসি?

অপরাজিতা। মুগের ডাল, পল্তা বড়া, আমসীর অম্বল, আর ...

আমি। পল্তা? পল্তা হরিদ্বারে কিরূপে পাইলে? পল্তার বড়া কতকাল যে খাই নাই, তাহা বলিতে পারি না।

অপরাজিতা। বাবার এক বন্ধু পাটনা হইতে হরিদ্বারে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের জন্য কতকগুলি পলতা আনিয়াছিলেন। আমরা উহা শুকাইয়া রাখিয়াছি। দরকার হইলে, ভিজাইয়া বাটিয়া লই। আজ ঐরূপ ভিজাইয়া, তোমার জন্য বড়া তৈয়ারী করিব।

আমি। তুমি কিরূপে জানিলে যে আমি পল্তার বড়া খাইতে ভালবাসি?

অপরাজিতা দাঁড়াইয়া উঠিল এবং হাসিয়া বলিল—"আমি সতী; স্বামী কি খাইতে ভাল বাসেন, সতীরা তাহা মনে মনে জানিতে পারে। চলিলাম,—আসিও।" —এই বলিয়া, গজেন্দ্রগামিনী ধীর পাদক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সুখ নিশার অবসানে যেন পূর্ণিমার চাঁদ নিবিয়া গেল।

স্নান সমাপনান্তে, সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া, আমি আশ্রমে ফিরিলাম। বাবাজী বলিলেন—"কার্ত্তিক বাবু, অনাথ বাবু এই মাত্র আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের বাটীতে আপনাকে আহারে আহ্বান করিয়া গেলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বলিলেন ?"

বাবাজী বলিলেন—"আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল কার্ত্তিকবাবুকেই নিমন্ত্রণ করেন কেন ?' তিনি বলিলেন যে তাহার কন্যা অপরাজিতা দেবী আমাদিগের চেয়ে আপনাকেই বেশী ভক্তি করিয়া থাকেন, এবং আপনাকে আহার করাইয়াই তাঁহার অধিক পরিতৃপ্তি হয়; তাই তিনি আপনাকেই খাইতে বলেন, এবং আমাদিগকে এ সুখাদ্য রসে বঞ্চিত করেন।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম,—তাহা হইলে, আমার প্রতি অপরাজিতার ভক্তির কথা, তাঁহার পিতা বেশ উত্তম রূপেই জানিতে পারিয়াছেন। এ জানাজানিটা এই খানেই শেষ না হইয়া, আর একটু অগ্রসর হইলেই মহা বিপদ,—আমার বিপদ, অপরাজিতারও বিপদ! আমাদের প্রেমাধিক্যের কথা প্রকাশ হইলে, আমি নিশ্চয় প্রহৃত হইব, এবং অপরাজিতা হয়ত লোক-লজ্জায় আত্মহত্যা করিবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যোগধর্ম্মের বিসর্জ্জন ও পলায়ন।

লোক-লজ্জার ভয়ে, অপরাজিতা আমার নিকট আসিতে বিরতা হয় নাই; এবং আমিও প্রহার ভয়ে আমার প্রেমালাপ বন্ধ করি নাই। উহা সপ্তাহ কাল অবিরাম গতিতেই চলিল। আরও কতকাল চলিত, তাহা ভগবান জানেন, কিন্তু সহসা উহাতে একটা বাধা পড়িল। তখন অপরাজিতাকে লইয়া শীঘ্র পলায়ন ছাড়া আর উপায়ান্তর রহিল না।

সাত দিন পরে, এক অপরাহ্নে অপরাজিতা বজ্রাঘাত-তুল্য এক অশুভ সংবাদ লইয়া আসিল। বলিল যে পরদিন প্রত্যুষেই তাহাকে লইয়া তাহার পিতা হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া যাইবেন। শুনিয়া, আমি ললাটে করতল সংলগ্ন করিয়া বসিয়া পড়িলাম। অত্যন্ত কাতরতার সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন আমার দশায় কি হইবে ?"

সে বলিল—"তোমার ভালই হইল। তুমি আমাকে লইয়া, কাশী যাইয়া সত্বর শুভবিবাহটা সম্পন্ন করিবে। তুমি ত আগেও আমাকে লইয়া পলায়নের কথা বলিয়াছিলে, এবং উহাতে আমি স্বীকৃত হইয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু এত হঠাৎ যাইতে হইবে, আমি ত তাহা তখন ভাবি নাই। আচ্ছা, তোমার পিতার হঠাৎ এ মতিপরিবর্ত্তনের কারণ কি? আজ তোমাদের বাটীতে আহারের সময়ও তিনি আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; বরং আগামী কল্য আমাকে আহারে আহ্বান করিয়াছিলেন। না, তিনি কাল সকালে, কখনই হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। অসম্ভব! তুমি বোধ হয় ভুল শুনিয়াছ।

সে। না, আমি ভুল শুনি নাই। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শুন। আজ তুমি আহার করিতে বসিলে, আমি অন্য দিনের ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, তোমায় খাদ্য পরিবেষণ করিতেছিলাম। পরিবেষণ কালে, আমার হাতের চুড়ির শব্দ শুনিয়া, তুমি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া, একটু হাসিয়াছিলে। মনে আছে ?

আমি। মনে আছে। আর আমার হাসির প্রত্যুত্তরে, তুমিও বোধ হয় একটু হাসিয়াছিলে।

সে। সেই হাসিতেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। সে হাসি বাবা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আমি। সর্ব্বনাশ!

সে। দেখিয়া, তোমার লোলুপ হস্ত হইতে, তাঁহার পরমা সতী কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য, সত্বর সপরিবারে হরিদ্বার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। আগামী কল্য সকালের গাড়ীতেই যাইবেন। গাড়ীভাড়া ও অপরাপর দেনা পাওনা পরিশোধ করা হইতেছে। মোট পুঁটুলি বাঁধা হইতেছে। সকলকে কাযে মনো-

যোগী এবং আমার প্রতি অমনোযোগী দেখিয়া, আমি চুপি চুপি তোমাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আজ রাত্রেই তুমি আমাকে সরাইয়া ফেলিতে না পারিলে, কাল প্রভাতে বাবা আমাকে সরাইবেন। তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না; আমি তোমাকে দেখিতে পাইব না। আমাদের প্রণয়পথ জন্মের মত রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

আমি। আজ রাত্রেই কিরূপে যাইব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

সে। আমি তোমার কাছে একটু বসি; তুমি আরও একটু ভাব। ভাবিয়া আমাকে লইয়া, যাহাতে আজ রাত্রেই পলায়ন করিতে পার, তাহার একটা সদুপায় স্থির করিয়া ফেল।

আমি। ভাবিয়া কি স্থির করিব? আজ রাত্রে পলায়ন করিতে হইলে, দুই ক্রোশ না যাইতেই প্রভাত হইবে; এবং দিবালোকে বাবাজীর সহপাঠীরা সহজেই আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে।

সে। কেন ধরা পড়িব? আজ রাত্রে বারটার গাড়ীতে চড়িলে, একঘণ্টার মধ্যে আমরা লাক্সার পৌঁছিব।

আমি। ট্রেণে যাইলে গাড়ীভাড়া দিতে হয়।

সে। গাড়ীভাড়া দিবে।

আমি। কোথায় পাইব? আমার নিজের কোনও অর্থ নাই। বাবাজীর নিকট প্রার্থনা করিলে কিছু অর্থ পাইতে পারি। কিন্তু হঠাৎ আজ সন্ধ্যাকালে অর্থ চাহিলে তিনি কি মনে করিবেন, এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমিই বা কি উত্তর দিব? তোমার সহিত মন্থর গমনে পদব্রজে প্রস্থান ব্যতীত, অদ্য রাত্রেই হরিদ্বার ত্যাগের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। রাত্রমধ্যে আমরা ধীর গমনে যতদূর যাইতে পারিব, প্রভাতে বাবাজীর শিষ্যেরা তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া, দুই ঘণ্টার মধ্যে আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে।

অপরাজিতা তাহার অলঙ্কারশোভিত বাম বাহুটি, ধীরে আমার দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া বলিল—"শোন, বলি।"

আমি তাহার বাহুবেষ্টনে বিচলিত হইয়া, চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম, দয়িতার এই আদর-মুখসর্গ কাহারও দৃষ্টিকণ্টকে কণ্টকিত কিনা? পরে নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি বলিবে?"

অপরাজিতা বলিল—"শোন, অর্থের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে।"

আমি। এই যথেষ্ট অর্থ তুমি কোথায় পাইলে?

অপরাজিতা। আমার এক বৃদ্ধা আত্মীয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার সঞ্চিত সমুদয় অর্থ আমাকে দান করিয়াছিলেন। ঐ অর্থ বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছেন।

আমি। ঐ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে কিরূপে আজ হঠাৎ উঠাইয়া লইবে?

অপরাজিতা। উহা উঠাইয়া লইব কেন?

আমি। তবে?

অপরাজিতা। ঐ টাকার সুদ বাবা কখনও কিছুই গ্রহণ করেন নাই। বৎসর বৎসর সমস্ত সুদ আনিয়া আমাকে দিয়াছেন। আমি ঐ সুদের টাকা কিছু কিছু খরচ করিয়াছি বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই এখনও আমার গহনার বাক্সে মজুদ আছে। আমি আজ তাহা গণিয়া দেখিয়াছি।—সাতাইশ খানা, একশত টাকার নোট আছে, দশটাকার নোট দুইশত চল্লিশ খানা আছে এবং তাহা ছাড়া নগদ টাকাও কিছু আছে।

আমি। সাতাইশ খানায় দুই হাজার সাত শত, আর দুইশত চল্লিশ খানায় দুই হাজার চারিশত;—দেখিতেছি তোমার পাঁচহাজার টাকারও বেশী আছে।

অপরাজিতা। ঐ টাকাতে, আমাদের পাঁচ বৎসর যাবৎ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

আমি। তাহার অনেক পূর্ব্বেই আমি অর্থোপার্জ্জন করিয়া, তোমার টাকা পরিশোধ করিতে পারিব।

অপরাজিতা। আমার ভালবাসার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিবে না।

আমি। প্রাণপণ ভালবাসিয়া তাহাও সুদ সমেত পরিশোধ করিব।

অপরাজিতা। তাহা পরিশোধ করিতে না করিতে, আমি তোমাকে আবার ঋণী করিব।

আমি। অসম্ভব নয়; বোধ হয়, চিরকালই তোমার কাছে ঋণী থাকিতে হইবে।

অপরাজিতা। দেখ, আমার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিও না। যে সামান্য দেয়, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। যে সর্ব্বস্ব দেয়, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায় না;—সর্ব্বস্ব দিয়াও সে ঋণ পরিশোধ করা চলে না।

আমি। বেশ, আমি সর্ব্বস্ব দিব, এবং তোমার কাছে চিরঋণীই থাকিব। কেমন?

অপরাজিতা। আর আমাকেও চিরঋণী করিয়া রাখিও।

এই বলিয়া অপরাজিতা অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের মত তাহার অধরোষ্ঠ আমার মুখের নিকট তুলিয়া ধরিল। আমি তাহা চুম্বন করিয়া তাহাকে ঋণী করিলে, সে তখনই সে ঋণ পরিশোধ করিল। এবং ঋণের সুদ স্বরূপ আর একবার আমার মুখচুম্বন করিয়া কহিল—"এই লও, সুদ লও। কেমন আজ রাত্রেই আমাকে লইয়া পলাইবে ত?"

আমি। পলাইব।

অপরাজিতা। আমি সন্ধ্যার আগে, তোমার কাছে আমার সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া যাইব। তাহার পর রাত্রি এগারটার সময় তুমি খুব চুপি চুপি অন্ধকারে আমাদের বাড়ীর দরজার পাশে যাইবে। সেখানে আমাকে দেখিতে পাইবে। আমার একটা বড় ট্রাঙ্ক আছে উহাও সঙ্গে লইতে হইবে। তুমি একটা মুটিয়া লইয়া যাইও।

আমি। মুটিয়া, আমাদের কার্য্যকলাপে একটা সন্দেহ করিয়া গোলমাল বাধাইতে পারে; মুটিয়া লইয়া যাওয়া হইবে না। আমিই উহা কোনও রূপে বহন করিয়া, সর্ব্বনাথের শিবালয় পর্য্যন্ত আনিব। সেখানে একখানা এক্কা ভাড়া লইয়া ষ্টেশনে যাইব। আর টাকাটা তোমার ঐ ট্রাঙ্কের ভিতরেই রাখিও। রাস্তা খরচের জন্য সামান্য কিছু টাকা আমার কাছে রাখিলেই চলিবে।

অপরাজিতা। তুমি আগেই আমাদের দুই জনের জন্য দুইখানা টিকিট ক্রয় করিয়া রাখিও। আমরা একবারে গাড়ীতে গিয়া চড়িব। আর একটা কায করিতে হইবে। আমি যখন তোমাকে টাকা দিতে আসিব, তখন তোমার জন্য জুতা জামা ধুতি ও চাদর আনিব; আর, একখানা কাঁচি আনিব।

আমি। কেন? কাঁচি লইয়া কি করিব?

অপরাজিতা। রাত্রে আমাদের বাড়ীর দরজার পার্শ্বে যাইবার আগে, তুমি কোন নিভৃত স্থানে যাইয়া, তোমার মাথার এই লম্বা চুল, আর এই সাত হাত লম্বা দাড়ি, অন্ধকারে যাহা পারি, কতক কতক কাটিয়া ফেলিও; এবং তোমার গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়া, আমার আনা ধুতি চাদর ইত্যাদি পরিও। ইহাতে রাত্রির অন্ধকারে, এখানকার লোক আর তোমাকে হঠাৎ চিনিতে পারিবে না। তোমাকে কোনও সস্ত্রীক তীর্থযাত্রী মনে করিয়া কাহারও মনে কোন সন্দেহের উদয় হইবে না।

* * * *

সন্ধ্যাকালে, আমি অপরাজিতা প্রদত্ত বস্ত্রাদি লইয়া, গঙ্গাতীরে, মানবলোচনের অগোচর এক স্থানে বসিয়া, আমার যোগিজনবাঞ্ছিত দীর্ঘ কেশরাশি এবং নবীন জলধরতুল্য কৃষ্ণ শ্মশ্রু-শোভা স্বহস্তে অনেকটা কাটিয়া ফেলিলাম। পরে গঙ্গাস্নান করিয়া, ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, গৈরিক বসন গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলাম। এইরূপে আমার চিরজীবনের যোগ ধর্ম্ম ভাসিয়া গেল।

জামা জুতা পরিয়া বাবু সাজিয়া, রেল ষ্টেশনে যাইয়া, আমি কাশী যাইবার, দুইখানি টিকিট খরিদ করিলাম। তাহার পর যথাসময়ে যাইয়া দুরু দুরু

কম্পিত হৃদয়ে, অপরাজিতাকে সর্ব্বনাথের শিবালয়ে লইয়া আসিলাম। রাস্তার এক দীপালোকে আমার মুণ্ডিত মস্তক ও শ্মশ্রুহীন চিবুক দেখিয়া অপরাজিতা হাসিল। তোমরা পাঠক, তোমরাও হাস'।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আমার পাপ ও নির্ব্বুদ্ধিতা।

তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। তখন শিবালিখ পর্ব্বতের কৃষ্ণমূর্ত্তি, রজনীর অন্ধকারে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। তখন হরিদ্বার প্রায় দৃষ্টিপথের অতীত। আমি গাড়ীতে বসিয়া, নত মস্তকে তীর্থেশ্বরী মায়াদেবীর চতুর্ভুজা ত্রিমুণ্ডধারিণী করালমূর্ত্তির চিন্তা করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল, দেবীমূর্ত্তির করধৃত ত্রিশূল, যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া,'আমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মনে হইতে লাগিল, পাষাণময়ীর নয়নতারা হইতে ক্রোধাগ্নি নির্গত হইয়া, সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমার দিকে ধাবিত হইতেছে। মনে হইল দেবীর হস্তস্থিত প্রস্তরময় নরকপাল, যেন সজীব হইয়া আমার দিকে স্তিমিত নেত্রে চাহিতেছে; সে স্তিমিত নেত্র যেন বলিয়া দিতেছে. 'পাপী তুমি, তুমি আমারই মত নির্জ্জিত হইবে।'

ভাবিলাম, আমি কি সত্যই পাপ করিয়াছি?

কনখলের দক্ষিণে নীলধারাগিরি। গিরিগাত্রে দক্ষেশ্বরের শিবালয়। শুনিয়াছিলাম, ঐ স্থানে পতিনিন্দা শুনিয়া দক্ষনন্দিনী সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; সতীর স্মরণার্থ, ঐ স্থানে ঐ শিবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ শিবালয়ের ছায়ায় ব'সয়া, আমি সতীর অবমাননা করিয়াছি। কুলকামিনী অপরাজিতার সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্যোগ করিয়াছি। তাহার পিতামাতার বক্ষে দারুণ বেদনা দিয়া, তাঁহাদের উন্নত মস্তক কলঙ্কভারে অবনত করিয়া, তাঁহাদের একমাত্র সন্তানকে পাপের পঙ্কিল পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছি। কল্য প্রভাতে উঠিয়া তাঁহারা কন্যাকে, এবং বাবাজী আমাকে দেখিতে পাইবেন না। তখন ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইবে না। আমার স্বরূপচিত্র তাঁহাদের নেত্রে প্রকট হইয়া উঠিবে। বাবাজী ভাবিবেন, 'পাপিষ্ঠ এত পাপ লইয়া কিরূপে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল!' অনাথবাবু ভাবিবেন, 'পাপিষ্ঠ মনে মনে আমার এই সর্ব্বনাশের কামনা লইয়া কিরূপে নিত্য আমার অন্ন গলাধঃকরণ করিত!' বাবাজীর শিষ্যেরা মনে করিবে, তীর্থস্থানে থাকিয়া; নিত্য পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়া, আমি কিরূপে অন্তর মধ্যে এত পাপ সঞ্চয় করিতে পারিলাম!

বুঝিলাম, যথার্থই আমি মহাপাপী।

আমরা গাড়ীর যে কামরাটিতে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে অন্য আরোহী ছিল না। উহাতে দুইটি মাত্র বেঞ্চ ছিল। বাহুতে মস্তক রক্ষা করিয়া একটি বেঞ্চে অপরাজিতা শুইয়া পড়িল; এবং শুইবার জন্য আমাকেও অনুরোধ করিল। আমি তাহার অনুরোধক্রমে শুইলাম বটে, কিন্তু আমার নিদ্রা হইল না। তোমরা ত জান, পাপের সহিত নিদ্রার তত সদ্ভাব হয় না। আমি শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, চিন্তাবেগে হৃদয় আলোড়িত ও ব্যথিত হইতে লাগিল।

ভাবিলাম, চারি বৎসর পূর্ব্বে দুঃখিনী অসহায়া মাতাকে একাকিনী গৃহে ফেলিয়া কেন আমি হরিদ্বারে আসিয়াছিলাম? আশা করিয়াছিলাম, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া আমি একজন মহাযোগী হইব। হায়, নির্ব্বোধ আমি! কেন বুঝি নাই যে এই পৃথিবীতে মানুষের কোন আশাই পূর্ণ হয় না। এক অজ্ঞেয় শক্তি, মানবলোচনের অন্তরালে থাকিয়া, এই সংসারচক্র চালাইতেছেন; মানুষের আশা, তাঁহার সেই ঘূর্ণ্যমান চক্রতলে, অতি ক্ষুদ্র পুষ্পের ন্যায় পলকমধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া যায়। হরিদ্বারে আমার আজীবনের আশা, সেই নির্ম্মম চক্রীর চক্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। যাহা ত্যাগ করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিলাম, দেখ, সেই কামিনীকাঞ্চন লইয়াই আজ কেমন পাপের স্রোতে ভাসিয়াছি! একটা গৃহস্থকে চিরকলঙ্কের অনন্ত সাগরে

ডুবাইয়া, অন্যের পরিণীতা সহধর্ম্মিণীকে হরণ করিয়া, এবং তাহার সমুদয় অর্থ ও অলঙ্কার আপন করায়ত্ত করিয়া রাত্রের অন্ধকারের আশ্রয়ে চোরের ন্যায় পলায়ন করিতেছি।

নিজের এই দুষ্কার্য্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। বাল্যকালের একটা ঘটনা সহসা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমাদের শ্যামবাজারে এক বালবিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়া, এবং তাহার অলঙ্কারাদি হস্তগত করিয়া তাহাদেরই বাটীর পাচক ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়াছিল। কন্যার এই কলঙ্কে কন্যার মাতা আত্মহত্যা করিয়াছিল; এবং পিতার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছিল। আমার ভয় হইল, পাছে অপরাজিতার কলঙ্কে তাহার মাতা সেইরূপ আত্মহত্যা করেন। তাহা হইলে, আমার দুষ্কার্য্যের ফল কি ভীষণ হইবে! পরস্ব ও পরদার অপহারী চোর আমি, তখন স্ত্রীহত্যাকারী হইব। আমাদের আইনে, এইরূপ স্ত্রীহত্যার জন্য, কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু পরস্ত্রীকে অপহরণ করিলে, রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইতে হয়। সেই পাচক ব্রাহ্মণ পরে ধরা পড়িয়া, দুই বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল। আমিও হয়ত পুলিসের হাতে ধরা পড়িব! অনাথ বাবু প্রভাতে উঠিয়াই, যখন আমাদের পলায়ন কাহিনী বিদিত হইবেন, তখন তিনি নানা স্থানে টেলিগ্রাম করিবেন। মুরাদাবাদ কিম্বা বেরিলি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি ধরা পড়িব। সর্ব্বনাশ! তাহা ঘটিলে, আমার দশায় কি হইবে? পুলিসের লোক যখন আমাকে ধরিয়া কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিবে, তখন অসহায়া অপরাজিতা কোথায় যাইবে; কি করিবে? শ্যামবাজারের সেই বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা কি করিয়াছিল? সে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া, আপনার কলঙ্কলীলার অবসান করিয়াছিল! অপরাজিতা যদি সেইরূপ আত্মহত্যা করে? আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন একটা বহ্নি প্রদাহ জ্বলিয়া উঠিল।—হায় হায়!—কেন আমার মনে পলায়নের পাপ বুদ্ধি প্রবেশ করিল? হে ভগবান, এখন আমি কি করিব? আমার চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়াছে, হে জ্ঞানময়, তুমি আমাকে সুবুদ্ধি দাও।

কতক্ষণ পরে স্থির করিলাম যে এ পাপ পথে আর অগ্রসর হইব না। লাক্সার ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া, প্রভাতে কাশী অভিমুখী অন্য গাড়িতে চড়িয়া, কাশী যাইব না; তৎপরিবর্ত্তে হরিদ্বারমুখী ট্রেণে আবার হরিদ্বারে ফিরিব। অপরাজিতাকে তাহাদের গৃহদ্বারে কোনক্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া, আমি নিশ্চিন্ত মনে হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষুক বেশে দেশে দেশে ফিরিব। না, তাহাও করিব না; এ কলঙ্কিত মুখ আর লোকালয়ে দেখাইব না। গহন বনে প্রবেশ করিয়া, বন ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিব।

কিন্তু এ সম্বন্ধে অপরাজিতার মত কি?

তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সে মুখে, গাড়ীর ছাদ হইতে আলোকরশ্মি পতিত হইয়াছিল। দেখিলাম সে শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পিতামাতাকে ত্যাগ করার জন্য, একটু বিষাদের সামান্য চিহ্নও তাহার মুখে দেখিতে পাইলাম না। ভবিষ্যৎ জীবনের কোন ভাবনাই, তাহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডলের প্রশান্ত প্রসন্নতা নষ্ট করিতে পারে নাই। যেন সে তাহার জীবনের সমস্ত শুভাশুভের জন্য, আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে করিয়াছে। দেখিলাম, আজি তাহার সীমন্তপ্রান্তে সিন্দুর-রাগ কিছু বেশী পরিমাণে অনুলিপ্ত রহিয়াছে। অধিকন্তু, ভ্রুদ্বয় মধ্যে আরও একটি সিন্দুরের সুন্দর টিপ শোভা পাইতেছে।—সেই প্রসন্ন, শান্ত ললাটে সেই টিপ। তেমন কি কেহ কখনও দেখিয়াছে? মরি মরি! জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ক্ষুদ্র গগনে, শরতের পূর্ণশশী যেন ক্ষুদ্রাকারে উদিত হইয়াছে; উজ্জ্বল রজতপাত্রের উপর কে যেন পদ্মরাগমণি স্থাপন করিয়াছে। সৌন্দর্য্য সাগরে যেন বালারুণ আসিয়া উঠিয়াছে।

আমি ডাকিলাম—"অপরাজিতা।"

আমার আহ্বানে, গভীর নিদ্রামগ্না অপরাজিতা কোনও উত্তর প্রদান করিল না।

আমি আবার ডাকিলাম, আবার ডাকিলাম। কিন্তু অপরাজিতার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। নিদ্রালস ললিত বাহুতে মস্তক স্থাপিত করিয়া, সে পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতে লাগিল। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, রক্তপুষ্পকোরকতুল্য তাহার নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। শ্লথ বস্ত্রাবৃত তাহার বক্ষঃ, নিশ্বাসে নিশ্বাসে তরঙ্গিত হইতে লাগিল।

আমি তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া, তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য উদ্যত হইলাম। কিন্তু উদ্যত হস্ত সরাইয়া লইলাম। ভাবিলাম, এ কলঙ্কিত হস্তের স্পর্শে, তাহার পুণ্যদেহ আর কলঙ্কিত করিব না। এ সিন্দুরবিন্দুশোভিতা সতীকে, তাহার সতীত্ব স্বর্গ হইতে নামাইয়া, আর কলঙ্কের পঙ্কিল কুণ্ডে নিক্ষেপ করিব না। ইহা প্রেমের ধর্ম্ম নহে। প্রেম, প্রেমিকাকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করে না। সে সেই দেবীকে স্বর্গের আসনে বসাইয়া পূজা করে।

সুতরাং আমি অপরাজিতার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিলাম না। বিনিদ্র নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

এক ঘণ্টা পরে,রাত্রি একটার সময়, গাড়ী লাক্‌সার জংসনে আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে ঐ গাড়ী সাহারাণপুরের দিকে যাইবে। হরিদ্বার হইতে পলায়নের কার্য্যটা রাত্রের অন্ধকারে সম্পন্ন করিব বলিয়া, এইরূপ গাড়ী পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। নতুবা গাড়ী পরিবর্ত্তন না করিয়াই, একবারে হরিদ্বার হইতে কাশী যাওয়া যায়।

গাড়ী হইতে যাহারা অবতরণ করিতেছিল,তাহাদের কোলাহলে অপরাজিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কোথায় আসিয়াছি ?"

আমি বলিলাম—"আমরা লাক্‌সার জংসনে আসিয়াছি। এইখানে আমাদের গাড়ী হইতে নামিতে হইবে।"

অপরাজিতা বলিল—"আমি একঘণ্টা বেশ ঘুমাইয়াছি।"

আমি একটা মুটিয়া ডাকিয়া, ট্রাঙ্কটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিলাম এবং নিজে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। অপরাজিতা আপন বেশবাস সংযত করিয়া, পরে নামিল।

নামিয়া, সে আমার হস্ত ধারণ করিল। সে কোমল স্পর্শে আমার সমস্ত দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গেল; আমি আমার সব সংকল্প ভুলিয়া গেলাম। সে আমার হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল—"চল, আমার জানা একটা দোকানে চল। লাক্‌সারে আমি ছেলেবেলা অনেকবার আসিয়াছি; আমি এখানকার সকল লোককে চিনি।" পরে কুলির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"চল, জগন্নাথ বেনিয়ার দোকানে চল।"

নক্ষত্রের অস্পষ্টালোকে, কঙ্করময় পথ অতিবাহিত করিয়া, ষ্টেশনের অনতিদূরে, আমরা জগন্নাথ বেনিয়ার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কলিদাসের নাটকে বিহঙ্গ-পরিচয়

মহাকবি কালিদাসের দুই একখানি কাব্যে যে সকল পাখীর কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইদানীং কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কেবলমাত্র পাখীগুলিকে তুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে Ornithology'র দিক হইতে আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া আমি যে শুধু পাশ্চাত্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পথ অনুসরণ করিতেছি, তাহা নহে; আমি

পদে পদে অনুভব করিতেছি যে, বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে মহাকবি-বর্ণিত ভারতবর্ষের এই পাখীগুলিকে আমাদের অধুনাকালের পরিচিত পাখীগুলির সহিত মিলাইয়া, তাহাদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা মত যথাযথ শ্রেণিবদ্ধ করা কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অথচ আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের উপর চারিদিক হইতে রশ্মিপাত হওয়া উচিত, নহিলে আলোকে-আঁধারে কাব্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে পারে না; তাই ব্যাপারটা যতই কষ্টসাধ্য হউক, একবার ভাল করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের রস-সাহিত্যে এই পাখীগুলির বর্ণনা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে কিনা। কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রই হংস, পারাবত, পিক, চাতক, শিখী, কাদম্ব, কারণ্ডব, শুক প্রভৃতি পাখীগুলির ছবি সাহিত্যের স্তরে স্তরে দেখিতে পান। মানুষের সুখ দুঃখের সহিত তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস যেন গ্রথিত হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, যে বিহঙ্গজাতি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকুঞ্জে মানবের এত নিকটে আসিয়া দেখা দেয়, তাহাদের সম্বন্ধে সাহিত্যের বাহিরে সমাজবদ্ধ সাধারণ ভারতবাসীর অজ্ঞতা বড় কম নহে। সেই অজ্ঞতা দূরীকরণের চেষ্টা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে অনেক দিন হইতে দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের মনীষিগণের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য আমি কালিদাসের তিনখানি নাটক হইতে কয়েকটি পাখীর বর্ণনা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই ধরিয়া লইলাম যে 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকত্রয়ের রচয়িতা একই ব্যক্তি; এবং তিনি আর কেহই নহেন, স্বয়ং কালিদাস। এসম্বন্ধে এস্থলে কোনও তর্কবিতর্কের অথবা সমালোচনার আবশ্যকতা নাই। এইটুকু মানিয়া লইয়া আমরা উক্ত নাটকগুলির ভিতরে পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমেই 'বিক্রমোর্ব্বশী'র কথা পাড়া যাউক। অসুরগণ বলপূর্ব্বক উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। চিত্রলেখা কমভিব্যাহারে কুবের-ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অর্দ্ধপথে তাঁহার এই বিপদ ঘটিল। রাজা পুরুরবা দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আততায়ীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। রম্ভা মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাকে সঙ্গে লইয়া উর্ব্বশী, চঞ্চুপুটে মৃণালসূত্রাবলম্বিনী রাজহংসীর ন্যায়, রাজার দেহ হইতে মনটিকে কাড়িয়া লইয়া আকাশমার্গে অদৃশ্য হইলেন।

উর্ব্বশী দানবের হস্তে বন্দিনী হইয়াছেন কি না এ সংবাদ যখন কেহই অবগত ছিলেন না, তখন সহসা আকাশ হইতে কুররীর কণ্ঠধ্বনির ন্যায় যেন কাহার করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে, এইটুকু আমরা সূত্রধার প্রমুখাৎ জানিতে পারিলাম। সূত্রধারের সংশয় উপস্থিত হইল,—শব্দটা কি কুসুমরসমত্ত ভ্রমরগুঞ্জন? অথবা ধীর পরভৃতনাদ?

মত্তানাং কুসুমরসেন ষট্পদানাং
শব্দোঽয়ং পরভৃতনাদ এষ ধীরঃ।

নাটকের প্রথম অঙ্কে উর্ব্বশী পুরুরবা ঘটিত ব্যাপারটি লইয়া মহাকবি যে রসের অবতারণা করিলেন, পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে রসভঙ্গ করিয়া আমি যদি ঐ মৃণালসূত্রাবলম্বিনী হংসী, ঐ আর্ত্ত কুররী ও ধীর পরভৃতকে লইয়া এস্থলে তাহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাকে অরসিক বলিয়া কৃপার চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে, সহৃদয় পাঠক যেন মনে রাখেন যে মহাকবিরচিত নাটকের মধ্যে বর্ণিত পাখীগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য ও বাস্তব জীবন হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হয় নাই। এখন কিন্তু নাটক হইতে আরও একটু ঘন কাব্যরস পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।

উর্ব্বশী চলিয়া গেলেন। রাজার বিষম চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। পাগলের ন্যায় তিনি বনে বনে

ভ্রমণ করিতেছেন। বনের ফুল, বনের ফল দেখিয়া তাঁহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে উর্ব্বশীর রূপলাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছে; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। উর্ব্বশী কোথায় গেল কে বলিয়া দিবে? তাহার সঙ্গলিপ্সু রসপিপাসু পুরুরবা, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে "চাতকব্রত" অবলম্বন করিয়াছেন;—চাতক যেমন একনিষ্ঠভাবে মেঘস্খলিত বারিবিন্দুর জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, রাজাও তেমনি একনিষ্ঠভাবে উর্ব্বশীর সঙ্গরূপ "দিব্যরস-পিপাসু" হইয়াছেন। ক্ষণেকের জন্য রাজার পিপাসা মিটিল। রঙ্গিণী উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া রাজার সহিত মিলিতা হইলেন। তাহার পর অপ্সরাদ্বয়ের তিরোভাব ও রাজ্ঞী ঔশীনরীর হঠাৎ আগমন। রাজা তখন বয়স্যের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। উর্ব্বশী অদৃশ্য থাকিয়া যে ভূর্জ্জপত্র রাজার নিকটে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বয়স্য নানা কথা পাড়িল,—দেখুন, মহারাজ! এই ময়ূরপুচ্ছ আমার ম্লায়মান কেসর বলিয়া ভ্রম হইতেছে। এমন সময় রাণী আসিয়া বলিলেন—কষ্ট করিবেন না মহারাজ! এই নিন আপনার ভূর্জ্জপত্র। কি বাক্যালাপ হইল সে কথার প্রয়োজন নাই। কুপিতা রাণী লঘুহৃদয় পতির অনুনয় গ্রহণ না করিয়া, সখীপরিবৃতা হইয়া ফিরিয়া গেলেন। বিদূষক রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে স্নান ভোজনের সময় হইয়াছে। রাজা ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিলেন,—তাই ত অর্দ্ধ দিবস অতীত হইয়া গিয়াছে। আতপতপ্ত শিখী তরুমূলের স্নিগ্ধ আলবালে অবস্থান করিতেছে; ভ্রমরগণ কর্ণিকার-কোরকে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; কারণ্ডব তপ্ত বারি ত্যাগ করিয়া তীর-নলিনীকে আশ্রয় করিয়াছে; এবং ক্রীড়াভবনে পঞ্জরস্থ শুক ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া বারিবিন্দু যাচ্ঞা করিতেছে।—

উষ্ণার্ত্তঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্ম্মূলালবালে শিখী
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারমুকুলান্যাশেরতে ষট্পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে
ক্রীড়াবেশ্মনি চৈষ পঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে॥

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশীর আসক্তি অতিনিপুণভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সুরসভাতলে সরস্বতীরচিত লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকের অভিনয়কালে বারুণী-ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মেনকা, লক্ষ্মীরূপিণী উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সমাগত সকেশব ত্রৈলোক্যপুরুষ লোকপালদিগের মধ্যে তুমি কাহাকে ভজনা কর? ইহার উত্তরে "পুরুষোত্তমকে" বলিতে গিয়া উর্ব্বশী বলিয়া ফেলিলেন—"পুরুরবাকে"। উত্তর শুনিয়া কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র লজ্জাবনতমুখী উর্ব্বশীকে বলিলেন—তুমি পুরুরবার কাছে যাও, এবং যতদিন না তিনি পুত্রমুখ দর্শন করেন ততদিন তুমি তাঁহার সহিত অবস্থান কর।

একদিন আনন্দসন্ধ্যায় রাজ্ঞী কাশীরাজ-তনয়ার নিকট হইতে বার্ত্তা বহন করিয়া কঞ্চুকী রাজসমীপে আসিতেছেন; রাজপ্রাসাদ দিবাবসানে রমণীয় বোধ হইতেছে; বাসযষ্টিগুলির উপরে নিশানিদ্রালস বর্হী চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইতেছে; গৃহবলভিতে পারাবতগুলি গবাক্ষজাল-বিনিঃসৃত ধূপে সন্দিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছে।

উৎকীর্ণা ইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো
ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বলভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ।

রাজাকে ডাকাইয়া আনিয়া রাণী বলিলেন—"আর্য্যপুত্রকে পুরঃসর করিয়া আমি চন্দ্ররোহিণীসংযোগ ঘটিত যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহার উদ্‌যাপনের জন্য আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, আর্য্যপুত্র যে রমণীকে লইয়া সুখী হইবেন এবং যে রমণী আর্য্যপুত্র-সমাগম-প্রণয়িণী, তাঁহাদের উভয়ের মিলনে যেন কোনও বাধা না হয়!"

তাহাই হইল। উর্ব্বশী-পুরুরবার মিলনের উপর তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পতিত হইল।

চতুর্থ অঙ্কে খণ্ডিতা উর্ব্বশী পুরুরবার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কুমারবনে প্রবেশ করিতে গিয়া

লতায় পরিণত হইয়া গেলেন। তাঁহার দুর্গতিতে সহজন্যা ও চিত্রলেখা সখীদ্বয় সরোবরে সহচরী দুঃখারূঢ় বাষ্পাকুলিতনয়ন হংসীযুগলের দশা প্রাপ্ত হইল। উন্মাদগ্রস্ত রাজার চক্ষু অশ্রুপরিপ্লুত; সঙ্গিনীবিরহে কম্পিতপক্ষ হংসযুবার ন্যায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন—

হিঅআহিঅপিঅদুক্খও সরবরএ ধুদপক্খও
বাহোবগ্গিঅণঅণও তম্মই হংসজুআণও।

পরক্ষণে তিনি স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন, আমি রাজা, কালের নিয়ামক্। এই বর্ষাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া পরভৃত সহচর বসন্তের আগমন কল্পনা করিতে পারি। এমন সময়ে নেপথ্যে বসন্তের একটি আবাহন সঙ্গীত শ্রুত হইল।

গন্ধোন্মাদিতমধুকরগীতৈ-
র্বাদ্যমানৈঃ পরভৃততূর্য্যৈঃ।
প্রসৃতপবনোদ্বেল্লিতপল্লবনিকরঃ
সুললিতবিবিধপ্রকারৈর্নৃত্যতি কল্পতরুঃ॥

রাজা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—না, না, বর্ষাকে প্রত্যাখ্যান করিব না, সে আমাকে যথোপচারে পরিচর্য্যা করিতেছে;—আকাশের বিদ্যুল্লেখা সমন্বিত কনকরুচির মেঘ আমার মাথার উপরে রাজছত্রের মত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে; কম্পমান নিচুল তরুর মঞ্জরী চামরব্যজন করিতেছে; নীলকণ্ঠ ময়ূর সুস্বরে আমার বন্দনা গান করিতেছে।

বিদ্যুল্লেখাকনকরুচিরঃ শ্রীবিতানং মমাভ্রং
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্ম্মঞ্জরীচামরাণি।
ঘর্ম্মচ্ছেদাৎপটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ॥

নবীন শাদ্বল দেখিয়া উর্ব্বশীর শুকোদরশ্যাম অশ্রুসিক্ত স্তনাংশুক বলিয়া ভ্রম হইতেছে! এই যে ময়ূরটি আকাশ পানে তাকাইয়া উন্নতকণ্ঠে কেকারব করিতেছে, ইহাকে আমার প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করি—

আলোকয়তি পয়োদান্ প্রবলপুরোবাতনাতিতশিখণ্ডঃ।
কেকাগর্ভেণ শিখী দূরোন্নমিতেন কণ্ঠেন॥

ময়ূরটি বারিধারাবর্ষণের মধ্যে শৈলতটস্থলীর পাষাণের উপরে অধিরূঢ় রহিয়াছে। পুরোবাতে ইহার পুচ্ছ কম্পিত হইতেছে। হে শিখী! এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? এই সকল লক্ষণে তুমি তাহাকে চিনিতে পারিবে;—তাহার চাঁদের মত মুখ, হংসের ন্যায় গতি—

নিসম্মহি মিঅঙ্কসরিসে বঅণে হংসগই
এ চিণ্হে জাণিহিসি আঅক্খিউ তুজ্ঝু মই।

হে শুক্লাপাঙ্গ নীলকণ্ঠ ময়ূর! তুমি কি আমার দীর্ঘাপাঙ্গা, আমার মূর্ত্তিমতী উৎকণ্ঠা-স্বরূপা বনিতাকে দেখিয়াছ—

নীলকণ্ঠ মমোৎকণ্ঠা বনেঽস্মিন্ বনিতা ত্বয়া।
দীর্ঘাপাঙ্গা সিতাপাঙ্গ দৃষ্টা দৃষ্টিক্ষমা ভবেৎ॥

কৈ, আমাকে উত্তর না দিয়া তুমি নৃত্য করিতেছ কেন? এই আনন্দের কারণ কি? ওঃ বুঝিয়াছি—আমার প্রিয়ার বিনাশ হেতু ইহার ঘনরুচির মৃদুপবন-বিভিন্ন কলাপ নিঃসপত্ন হইয়াছে। নহিলে, উর্ব্বশীর করধৃত কুসুম-সনাথ রতিবিগলিতবন্ধ কেশপাশ বিদ্যমান থাকিলে, এই ময়ূর-কলাপের স্পর্দ্ধা কোথায় থাকিত? যাক্; পরবাসনে যে আমোদ পায় তাহাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। এই যে, জম্বু বিটপ মধ্যে পরভৃতা আতপান্তে সংধুক্ষিতমদা হইয়া বসিয়া আছে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করি। এ ত পাখীদিগের মধ্যে পণ্ডিত—বিহগেষু পণ্ডিতৈষা জাতিঃ। হে মধুর প্রলাপিনি পরভৃতে, পরপুষ্টে! তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? * * * * রাজা তাহাকে "মদনদূতী" সম্বোধনে অভিহিত করিয়া অনেক অনুনয় করিলেন; কিন্তু সেই বিজ্ঞ পাখীটি নিশ্চিন্ত মনে জম্বুবৃক্ষ ফল ভক্ষণ করিয়া উড়িয়া গেল। * * * * * নূপুর শিঞ্জিতের মত ও কি শুনা যায়? হা ধিক! এ ত' মঞ্জীরধ্বনি নয়। দিঙ্মণ্ডল মেঘশ্যাম দেখিয়া মানসোৎসুকচিত্ত রাজহংস কূজন করিতেছে।

এই সমস্ত মানসোৎসুক রাজহংস এই সরোবর হইতে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে আমার প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করি।—হে জলবিহঙ্গরাজ! তুমি মানস সরোবরে কিছু পরে যাইও; একবার তোমার বিস-কিসলয় পাথেয়টুকু রাখ; আবার তুমি তুলিয়া লইও। আমার দয়িতার সংবাদটুকু দিয়া আমাকে শোকমুক্ত কর। রে হংস! তুই যদি সরোবর তটে আমার নতভ্রু প্রিয়াকে না দেখিয়া থাকিস্, তাহা হইলে কেমন করিয়া তুই তাহার কলগুঞ্জিত গতিভঙ্গিটুকু চোরের মত অপহরণ করিলি। তুই আমার প্রিয়াকে ফিরাইয়া দে। জঘনভারমন্থরা প্রিয়ার গতি দেখিয়া তুই নিশ্চয়ই তাহা চুরি করিয়াছিস। * * * * * * একি! চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে রাজার নিকট হইতে এ যে পলায়ন করিল! আচ্ছা, আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি। এই যে "প্রিয়াসহায়" চক্রবাক রহিয়াছে; ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। হে গোরোচনা-কুঙ্কমবর্ণ চক্রবাক! আমাকে বল মধুবাসরের রঙ্গিণী আমার প্রিয়াকে তুমি কি দেখ নাই? হে রথাঙ্গনামধেয় বিহঙ্গ! রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বা স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই রথী তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, তুমি উত্তর দাও। চুপ করিয়া রহিলে কেন? আমার অনুমান হয় যে তোমারও অবস্থা আমারই মত। সরোবর-বক্ষে তোমার ও তোমার পত্নীর মধ্যে সামান্য নলিনী-পত্রের ব্যবধান থাকিলেও তুমি তোমার জায়া বহুদূরে আছে মনে করিয়া সমুৎসুক হইয়া বিলাপ করিতে থাক। জায়াস্নেহবশতঃ এই যে তোমার পৃথক্‌স্থিতি-ভীরুতা, কেন তবে আমার মত প্রিয়াজনবিরহ বিধুরের প্রতি তুমি এমন প্রবৃত্তিপরাঙ্মুখ?

সরসি নলিনীপত্রেণাপি ত্বমাবৃতবিগ্রহাং
নমু সহচরীং দূরে মত্বা বিরৌষি সমুৎসুকঃ।
ইতি চ ভবতো জায়াস্নেহাৎপৃথক্‌স্থিতিভীরুতা
ময়ি চ বিধুরে ভাবঃ কোহয়ং প্রবৃত্তিপরাঙ্মুখঃ॥

উন্মাদগ্রস্ত রাজা ধীরভাবে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তাঁহার চঞ্চল চিত্তে সরোবরে প্রেমরসাভিষিক্ত ক্রীড়াশীল হংসযুবার চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তিনি গাহিলেন—

একক্রমবর্দ্ধিত-গুরুতর-প্রেমরসে
সরসি হংসযুবা ক্রীড়তি কামরসে।

তাহার পর তিনি ভোমরা, হাতী, পাহাড়, নদী যাহা কিছু সম্মুখে দেখিতে পান, তাহাকেই কাতর ভাবে নিজের বেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, উর্ব্বশী নদীরূপে পরিণতা হইয়াছেন;—তরঙ্গভঙ্গী প্রিয়ার ভ্রূভঙ্গী, তরঙ্গবেগে চঞ্চল বিহগশ্রেণী তাঁহার কাঞ্চীদামস্বরূপ, ফেনপুঞ্জ কোপবশে শিথিলী-ভূত বসনস্বরূপ। * * * * হে প্রিয়তমে, সুন্দরি, নদীরূপিণি উর্ব্বশি! তুমি আমার এই নমস্কার দ্বারা প্রসন্না হও। নদীরূপিণী তোমাতে হংসাদি পক্ষীরা চঞ্চল হইয়া করুণস্বরে কূজন করিতেছে। * * * জলনিধি সুললিত ভাবে নৃত্য করিতেছে। হংস, চক্রবাক্, শঙ্খ, কুঙ্কুম প্রভৃতি তাহার আভরণ। * * * কিংবা এ প্রকৃতই নদী, উর্ব্বশী নহে। নচেৎ পুরুরবাকে পরি-ত্যাগ করিয়া সাগরাভিমুখে অভিসারিণী হইবে কেন?

এইরূপে কোকিল-কূজিত নন্দন-বনে গজাধিপ ঐরাবতের মত বিরহসন্তপ্ত রাজা বিচরণ করিতে লাগিলেন—

অভিনব কুসুমস্তবকিত তরুবরস্য পরিসরে
মদকল-কোকিল-কূজিত-মধুপ-ঝঙ্কার-মনোহরে।
নন্দনবিপিনে নিজকরিণীবিরহানলেন সন্তপ্তো
বিচরতি গজাধিপতিরৈরাবতনামা॥

কৃষ্ণসারকে দেখিয়া রাজা মৃগলোচনা, "হংসগতি" সুরসুন্দরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহাকে সে দেখিয়াছে কি?

সহসা পাষাণের মধ্যে রক্তাশোক-স্তবক-সমরাগ-বিশিষ্ট মণি দেখিয়া বলিলেন, "এটা কি?" নেপথ্যে দৈববাণী হইল—"বৎস! এই শৈলসুতাচরণ-রাগ-জাত মণিটিকে তুলিয়া লও। ইহা প্রিয়জনের সহিত আশু সঙ্গম ঘটাইবে।"

রাজা মণিটিকে লইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে

করিতে, কুসুমরহিতা একটি লতাকে দেখিয়া অধীর ভাবে তাহাকে যেমন আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, অমনি উর্ব্বশী তাঁহার বাহুপাশে ধরা দিলেন। রাজা বলিলেন— "তোমাকে দেখিয়া আমার স-বাহ্যান্তরাত্মা প্রসন্ন হইল। আচ্ছা, বল দেখি আমার বিরহে তুমি এতকাল কেমন ছিলে? আমি ত' ময়ূর, পরভৃত, হংস, রথাঙ্গ, অলি, গজ, পর্ব্বত, কুরঙ্গ, সরিৎকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

এইরূপে উর্ব্বশীর সহিত মিলিত হইয়া রাজা বিমান-বিহারী "সহচরী-সঙ্গত হংসযুবার ন্যায়" নবীন মেঘের উপর ভর দিয়া প্রতিষ্ঠানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নাটকের পঞ্চম অঙ্কে একটা গৃধ্র আসিয়া গোল বাধাইল। আমিষভ্রমে সেই 'অশোকস্তবকের মত লাল মণিটিকে চঞ্চুপুটে লইয়া গৃধ্র অদৃশ্য হইল। রাজা অস্থির হইয়া নাগরিকদিগকে আদেশ দিলেন—কোথায় বৃক্ষাগ্রে ইহার বাসা আছে অনুসন্ধান করা হউক। সহসা শরবিদ্ধ হইয়া বিহগাধম ভূমিতে নিপতিত হইল। শর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, উর্ব্বশী-পুরুরবার পুত্র কর্ত্তৃক ইহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুরুরবার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। উর্ব্বশী যে জননী হইয়াছেন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অবিদিত। এমন সময়ে চ্যবন মুনির আশ্রম হইতে একজন তাপসী, কুমারের হাত ধরিয়া রাজার নিকটে আসিলেন। পরিচয়ান্তে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে এই বালকটি আশ্রমপাদপ-শিখরে নিলীয়মান গৃহীতামিষ গৃধ্রকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে বলিয়া তাহাকে রাজ-সমীপে প্রেরণ করা হইয়াছে। ছেলেটিকে কনকপীঠে উপবেশন করাইয়া উর্ব্বশীকে ডাকান হইল। উর্ব্বশী-কুমার আয়ুষকে দেখিয়া চিনিলেন। দুই একটি কথার পর তাপসী সত্যবতী প্রস্থানোদ্যতা হইলে, বালকটিও তাহার অনুগামী হইতে চাহিল। রাজা তাহাতে বাধা দিলেন। ছেলেটি বলিল, "তবে যে ময়ূরটি আমার অঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নে সুখবোধ করিয়া আরামে নিদ্রা যাইত, সেই জাতকলাপ শিতিকণ্ঠ শিখীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।" তাপসী বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই করিতেছি। তাপসী চলিয়া গেলেন। পুরুরবার আনন্দে বিষাদের কালিমা আসিয়া পড়িল। ইন্দ্রের আদেশ স্মরণ করিয়া জননী উর্ব্বশী, পুত্র ও স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া দেবরাজসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উর্ব্বশীর আসন্ন বিরহে ম্রিয়মাণ রাজা পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনগমনের ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া মহেন্দ্র সন্দেশ শুনাইলেন—"সুরা-সুরের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী; আপনি সেই যুদ্ধে আমার সহায় হউন; শস্ত্র ত্যাগ করিবেন না। আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, এই উর্ব্বশী আপনার সহধর্ম্মচারিণী থাকিবেন।"

কুমারের যৌবরাজ্যাভিষেকের সময় সমস্ত চরাচরের কল্যাণ-কামনার সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকের পরিসমাপ্তি হইল।

এখন বক্তব্য এই যে, নাটকের গল্পাংশের প্রতি প্রধানতঃ পাঠকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি না। কাব্য হিসাবে বা চরিত্রাঙ্কনের দিক হইতে ইহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য পণ্ডিত-সমাজের অগোচর নাই। আমি বিশেষ ভাবে এইটি বলিতে চাই যে, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের বর্ণিত জীবন-কাহিনীর সঙ্গে মুখ্যভাবে অথবা গৌণভাবে বিবিধ বিহঙ্গজাতি অত্যন্ত সহজে মিশিয়া গিয়াছে; এবং সেই মিশ্রণে উভয়েরই চিত্র সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে,—অথচ সমস্তটা বাস্তব সত্য হইতে রেখামাত্র বিচলিত হয় নাই। বিহঙ্গ-তত্ত্বের উপর কবির বর্ণনা হইতে কোনও আলোকরশ্মি নিপতিত হইতেছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য;—উর্ব্বশী-পুরুরবার উপাখ্যান একটা উপলক্ষ মাত্র। পাঠকের চিত্তে এমন কোনও কৌতূহল হয় না কি, যাহা Ornithologist ব্যতীত আর কেহ পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না? ঐ যে সুদূর ব্যোমপথে করুণ আর্ত্তনাদের মত কি যেন শোনা যাইতেছে, উহা কি কুররীর কণ্ঠধ্বনি? কতকটা ভ্রমর-গুঞ্জন বলিয়া ভ্রম

হইতেছে ; আবার পরক্ষণেই ধীর পরভৃতনাদ বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ পাখীটির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। সখী-পরিবৃতা উর্ব্বশী যখন রাজার মনটি কাড়িয়া লইয়া আকাশপথে উড়িয়া গেলেন, তখন কবিবরের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে চঞ্চুপুটে মৃণালসূত্রাবলম্বিনী রাজহংসীর ছবিটি স্বতঃই জাগিয়া উঠিল কেন ? রূপে ও শব্দে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কতদূর আছে তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। আবার কোন্ হিসাবে বিরহক্লিষ্ট রাজাকে চাতকব্রতাবলম্বী বলা হইয়াছে ? আতপতপ্ত মধ্যাহ্নে যে শিখী তরুমূলে স্নিগ্ধ আলবালে অবস্থান করিয়া থাকে, যে কারণ্ডব তপ্তবারি পরিত্যাগ করিয়া তীরনলিনীকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং ক্রীড়াভবনে যে পঞ্জরস্থ শুক ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া বারিবিন্দু যাচ্ঞা করিতেছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক পরিচয় লইবার সময় আসিয়াছে। আসন্ন সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদের গৃহবলভিতে যে পারাবতগুলি আশ্রয় লইয়াছে, বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ তাহাদিগকে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত করিবেন ? উন্মাদগ্রস্ত রাজাকে দেখিয়া কেমন করিয়া কম্পিতপক্ষ হংসযুবার সহিত তাঁহাকে তুলনা করা যাইতে পারে ? পরভৃত-সহচর বসন্ত, নীলকণ্ঠ ময়ূর, শুকোদরশ্যাম অংশুক, প্রিয়া-সহায় চক্রবাকের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিচার সাপেক্ষ। পরভৃতকে কবি কেন 'বিহগেষু পণ্ডিতৈষা জাতিঃ' বলিয়া বর্ণনা করিলেন ? এই পরভৃত পরপুষ্ট পাখীটি বাস্তবিকই কি ফল খাইতে এত ভালবাসে যে একাগ্রচিত্তে জম্বুবৃক্ষ-ফলাস্বাদনে মত্ত হইয়া রাজাকে গ্রাহ্যই করিল না ? ময়ূর কি মানুষের কাছে এত পোষ মানে যে সে মানবশিশুর সহিত অবিচ্ছিন্ন সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায় ? মাংসাশী গৃধ্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট "নিবাস-বৃক্ষ" থাকে কি ?

এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে, আমরা মহাকবিরচিত মালবিকাগ্নিমিত্রে ও অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে, উল্লিখিত পাখীগুলির নূতন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় কি না তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিব। পরে সবগুলি মিলাইয়া, বিহঙ্গ-তত্ত্বের দিক্ হইতে পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে তাহাদের জীবন রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে প্রয়াস পাইলে দেখা যাইবে যে, কবিবরের তুলিকায় পাখীগুলির যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সুন্দর ত' বটেই, পরন্তু তাহা অনেকাংশ সত্য।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

প্রদীপের পুনর্জ্জন্ম

প্রেয়সি, মোদের আঁধার আগারে প্রদীপ জ্বলেছে আজ,
ঘুচিয়া গিয়াছে সকল কুণ্ঠা, প্রণয়লীলার লাজ।
ভুলিনি সে দিন, দীপালোকে সখি মুদিয়া রহিতে আঁখি,
সঙ্কোচে মুখপঙ্কজ তব উপাধান তলে রাখি।
পরিহাসপ্রিয় নির্লাজ সে দীপে নিবালাম মুখ বায়,
প্রথম-মিলন-রজনী হইতে আর সে জ্বলেনি হায়।
নির্ব্বাণ পেলে পুনর্জ্জন্ম হয় না—কথার কথা—
আবার বর্ত্তী জনম লভেছে—আজি সে বিনয়নতা।

মোদের দোঁহের হৃদয় শিখায় সোণার প্রদীপ জ্বলে
তোমার অঙ্কে, সারা হৃদয়ের স্নেহধারা যথা গলে।
সোণার প্রদীপ জ্বলিতেছে আজ; মাটীর প্রদীপও তাই
সারা রাত জ্বলে দহে পলে পলে আজি বিশ্রাম নাই।
বাছার লাগিয়া আজিকে তাহার বাড়িয়াছে সমাদর,
কখন জাগিবে, উঠিবে সে কেঁদে, কখন পাইবে ডর!
সচেতন ঘুম, জাগ দশবার, রাতে বাড়িয়াছে কাজ,
বহুদিন পরে মোদের আগারে প্রদীপ জ্বলেছে আজ।

শ্রীকালিদাস রায়।

নারী-বিদ্রোহ

শাড়ী শেমিজ হয়েছে যে
নিতান্ত সেকেলে ;
ধুতি ও পাঞ্জাবী পর—
নইলে পিছে গেলে !

বাবু-ছাঁটা চুল

কি সুন্দর আহা মরি,
ইচ্ছে হয় যে বিয়ে করি!

দোক্তা জর্দ্দা প্রভৃতি "সেকেলে" বিবেচনা করিয়া
বর্ম্মা চুরট ধরিয়াছেন।

"সুপারিণ্টেডেন্ট পদী পিসী—
তার Underএ কলম পিষি !

("তাজ্জব-ব্যাপার"

—"এ প্যাহারাওয়ালা মাঈ !"
("তাজ্জব-ব্যাপার")

"ক্রমে ক্রমে হৈল জজিয়তী।"

মাতৃহারা

(গল্প)

এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রমনীয় সন্ধ্যায় স্বামী পুত্রের মমতা ভুলিয়া যতীশের স্ত্রী সুহাসিনী যখন ত্রিদিবের রাজ্যে চলিয়া গেল, তখন পঞ্চমবর্ষীয় ক্ষুদ্রবালকটীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াই যতীশ প্রেমময়ী পত্নীর শোক সহিতে পরিয়াছিল। মা-হারা বলকটীও তখন পিতাকেই জগতের মধ্যে একমাত্র আপনার বলিয়া নিবিড় ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছিল।

তারপর জগতের চিরন্তন রীতি অনুসারে, সেই শোকস্মৃতি ভাল করিয়া মুছিতে না মুছিতেই, আত্মীয় বান্ধবগণের অনুনয় উৎপীড়নে বিব্রত হইয়া যতীশ নববধূ গৃহে লইয়া আসিল।

সুশিক্ষিতা, রূপসী, কিশোরী বধূ গৃহে আসিলেও যখন যতীশের চিত্তবিকারের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বন্ধুগণ মনে মনে মানিয়া লইলেন যে, যতীশ একটা মানুষ বটে; প্রথম-যৌবনে সুহাসিনীকে বিবাহ করিয়া আসিবার পর গৃহকোণবাসী বলিয়া বন্ধুমহলে তাহার যে একটা মধুর দুর্নাম রটিয়াছিল, এক্ষেত্রে সেরূপ কিছু রুচিকর আলোচনার সুযোগ না পাইয়া বন্ধুরা অগত্যা যতীশকে মাপ করিয়া ফেলিলেন।

সুনীতি স্বামিগৃহে আসিয়া দুইটী অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছিল, তাহার একটি উদার স্নেহময় স্বামী। প্রথম যৌবনের উদ্দাম চাপল্য না থাকিলেও, চিরস্নেহ-প্রবণ যতীশের অন্তরে অগাধ স্নেহ সমুদ্র লুক্কায়িত রহিয়াছিল। সেই চিরন্তন খাঁটী জিনিসটার সন্ধান পাইয়াছিল বলিয়াই বুদ্ধিমতী সুনীতি জীবনে কোন অভাব অনুভব করিতে পারিল না। তাহার জীবনের আর একটি ঐশ্বর্য্য—ষষ্ঠবর্ষীয় সুকুমার বালকটি। প্রথম দৃষ্টিতেই কিশোর-হৃদয়ের ক্ষুধিত মাতৃস্নেহের দাবীতে সেই ক্ষুদ্র বালকটীকে সে বক্ষের একেবারে কাছে টানিয়া লইল। সুনীতির হাতে মনুকে সমর্পণ করিয়া যতীশও একটা শান্তি ও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু এই শান্তিরাজ্যের মধ্যে যে ক্ষুদ্র বিপ্লবটী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে কোনমতেই ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

কয়েকদিন বিবাহবাড়ীর বাদ্যভাণ্ড আনন্দ কোলাহলে এবং অনেক সমবয়সীর সঙ্গ পাইয়া মনু মায়ের কথা ভুলিয়া সাথীদের সঙ্গে মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল। উৎসব-কোলাহল নীরব হইয়া যাইতেই যখন মায়ের জন্য তাহার বড় মন কেমন করিয়া উঠিল, তখন সে তাহার একান্ত নির্ভর ও সান্ত্বনার স্থল পিতার সন্ধানে ছুটিয়া গেল। যতীশ তখন তাহার শয়নকক্ষে সুনীতির সঙ্গে কথা কহিতেছিল, ছুটিয়া গিয়া কক্ষমধ্যে সেই অপরিচিতাকে দেখিয়া বালক দুয়ারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল, আর একপদও অগ্রসর হইল না। অভিমানে ক্ষুদ্রবক্ষটী তাহার উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। একটি কথাও না কহিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া সে ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল—ছুটিয়া আসিয়া সুনীতি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। কোমল স্নেহভরা কণ্ঠে কহিল—"মনু, আমি যে তোর মা।"

মনুর অনেকখানি চেষ্টা বিফল করিয়া তাহার চোখে অশ্রুর উচ্ছ্বাস বাহিরে ঠেলিয়া আসিল। সেই অচেনা নারীর বক্ষে প্রাণপণে মুখ লুকাইয়া সে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগা মাতৃহারার প্রতি করুণাময় সমবেদনায় সুনীতিরও দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। মনুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া শয্যার কাছে আসিয়া করুণস্বরে স্বামীকে সে বলিল, "নাও ওকে তুমি; যদি তোমার কাছে গেলে চুপ করে।"

যতীশ ধীরে ধীরে মনুকে কোলের কাছে টানিতেই

সে দুই হাতে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "আমি চাইনে চাইনে তোমাকে, তুমি আমাকে নিওনা, নিওনা"—বলিতে বলিতে অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সে শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। যতীশের বক্ষটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল, মনুর এমন ব্যবহার তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নুতন; সে তো মনুকে একটুকুও অনাদর করে নাই, তবে কোন্ অপরাধে সে তাহার পিতাকে পর করিয়া দিতে চায়!

সুনীতি তাড়াতাড়ি শয্যার উপর হইতে মনুকে সবলে টানিয়া তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল। অশ্রুসিক্ত গালে চুম্বন দিয়া গাঢ়স্বরে কহিল "তুই, আমার কাছে থাক্, ওঁর কাছে যাসনে। আমি তোর মা যে রে বোকা ছেলে।" কিন্তু বোকা ছেলে সে আদরের কোনও মর্য্যাদা রাখিল না, হাত পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"না, না, তুমি আমার মা নও, তুমি কিছুতেই মা নও, আমার মা এখানে নেই, কোথায় চলে গেছে।"

সুনীতি বুঝিল, দীর্ঘ এক বৎসরেও তাহার চিত্তপট হইতে মায়ের স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই, একটু ম্লানও হয় নাই, উজ্জ্বল দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুনীতির চিত্তটা বড় আহত হইল, কিন্তু বাহিরে সে ভাব প্রকাশ হইতে না দিয়া সে নানা কৌশলে মনুকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে যতীশ ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেমন করিয়া জানিনা, মনুর শিশুচিত্ত ধারণা করিয়া লইয়াছিল যে পিতার প্রতি তাহার অখণ্ড অধিকারে আর একজন অনধিকার প্রবেশ করিয়া, তাহার নিতান্ত নিজস্ব জিনিসটি ভাগ করিয়া লইতে চায়, কিন্তু তাহার জিনিস সে ভাগ করিয়া লইতে দিবে না—একাই সবখানি লইবে। অভিমানে বেদনায় যাঁহার কাছে সকল বিষয়ের অভিযোগ আনিয়া সে সুবিচার পাইয়া আসিয়াছে, সেই পিতারও যে ঐ অচেনা স্ত্রীলোকটির প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতি আছে, এ গূঢ় তত্ত্বও তাহার কাছে অপরিজ্ঞাত রহিল না;—কারণ একদিন সে, পিতামাতার কাছে তাহার চিরপ্রাপ্য কোন একটা কিছু, যতীশ সুনীতিকে দান করিতেছেন সহসা দেখিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কোন-একটা-কিছু যে তাহারই আরক্ত সুন্দর গাল দুটির এবং ঠোঁট দুখানির নিজস্ব সম্পত্তি, সে বিষয়ে এতদিন মনুর কোন সন্দেহ ছিল না—কিন্তু সহসা সেদিন পিতার এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া তাহার বুকে ক্ষুব্ধ অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল।

মাও তাহার নাই, বাপও তাহার নহে, তবে কে আছে? ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া যখন আপনার বলিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন অসহ্য দুঃখে ছুটিয়া গিয়া সে তাহাদের পুরাতন ভৃত্য ভজহরির ক্ষুদ্রকক্ষে ছিন্নমলিন শয্যার উপরে কাঁদিতে কাঁদিতে শুইয়া পড়িল। ভজহরি তাহাকে কোলে টানিয়া বলিল, "কি হয়েচে দাদামণি, কাঁদচো কেন?"

আরও কাঁদিয়া মনু বলিল, "আমার মা কোথায় গেছে ভজুদা, আমায় বলে দাও, আমি মার কাছে যাব।"

ভজহরি সুহাসিনীর পিত্রালয় হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, শৈশব হইতে 'হাসি'কে 'মানুষ' করিয়াছিল তাই সুহাসিনীর মায়া কাটাইতে না পারিয়া তাহার কাছেই রহিয়া যায়। যেদিন সুহাসিনী কুন্দ-কলিকা-তুল্য ক্ষুদ্র শিশুটী সংসারকে উপহার দিল, সেদিন আনন্দের আবেগে বৃদ্ধ ভৃত্য অশ্রু সামলাইতে পারে নাই। আবার যেদিন সংসারের সকল দাবী অগ্রাহ্য করিয়া সে অনন্ত লোকে চলিয়া গেল, সেদিন এই বৃদ্ধের বুকভাঙ্গা যাতনার পরিমাণ শুধু অন্তর্য্যামীই জানিয়াছিলেন।

তাহারই বড় আদরের 'হাসি'র মা-হারা শিশুটীকে দেখিলে ভজহরির বুক ফাটিয়া যাইত। সৎমা হাজার ভাল হইলেও, সে ঠিক মায়ের মত হইতে পারে কি না এবিষয়ে তাহার ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

মনুর অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি সস্নেহে মুছাইতে মুছাইতে, বাষ্প-অবরুদ্ধ স্বরে সে উত্তর দিল, "সে সতীলক্ষ্মী যে স্বর্গে চলে গেছে ভাই, সে যে অনেক দূর, আমরা সেখানে তো যেতে পারিনে দাদা!"

স্বর্গ যেখানেই হোক, তাহার মা সেখানে আছেন জানিয়া আশান্বিত চিত্তে মুখ তুলিয়া মনু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "অনেক দূর?—আমি বুঝি হাঁটতে পার্ব্বো না? তবে গাড়ী করে আমায় নিয়ে চল না ভজুদা!"—বালকের এ সকল কথায় ভজহরির চোখের জল আর বাধা মানিল না, শীর্ণ দুইগণ্ড বহিয়া অজস্রধারে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

হারানোর দুঃসহ ব্যথা শিশুচিত্তে যে ত্যাগের বৈরাগ্য সঞ্চার করিয়াছিল, তাহারই ফলে সে যখন পিতৃস্নেহের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতেও পিতার শয্যার অংশ ছাড়িয়া দিয়া ভজুদার ক্ষুদ্র কক্ষখানিতে দিনরাত্রির জন্য আশ্রয় লইল, তখন ঐ আলোক-বায়ুহীন ক্ষুদ্র ঘরে ময়লা বিছানায় রাত্রে থাকিলে অসুখ করিবে বলিয়া যতীশ ও সুনীতি মহা আপত্তি করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই মনুর সঙ্গে তাহারা পারিয়া উঠিল না।

রাত্রিতে শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বটা যতীশের কাছে নিতান্তই শূন্য শূন্য বোধ হইল। বুকের মধ্যেও কেমন একটা অভাবের সাড়া পড়িল। পাশ ফিরিয়া দুইচোখ বুজিয়া সে ঘুমাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বামীর এ ব্যথা-গোপনের চেষ্টা সুনীতি বুঝিয়া বড় কাতর হইল, কিন্তু তাহার নিজের দুঃখও যতীশের দুঃখের হিসাবে তুচ্ছ ছিল না। এই প্রাণঢালা স্নেহের মধ্যেও যে দুর্জ্জয় বালক ধরা দিল না, তাহাকে কোন্ অব্যর্থ মন্ত্রে বশীভূত করিয়া আপনার করা যাইতে পারে, তাহা সুনীতি কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না।

২

এমনি করিয়া একবৎসর কাটিয়া গেল। মনুর বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য রাশি রাশি নূতন খেলানা সঞ্চিত হইয়া কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছুতেই এই দুর্বোধ ছেলেটীর মন পাওয়া গেল না। স্নানাহারের সময় সুনীতি যখন ব্যথাকাতর চিত্তে তাহার হাত ধরিয়া বলিত—"আয় বাবা, চান করিয়ে দিই, দেখ্‌তো ধুলো মেখেছিস কত; তোর কি ক্ষিদে পায় না রে, চল খাইয়ে দেইগে।" তখন এক ঠেলায় তাহাকে সরাইয়া দিয়া মনু বলিত, "আমি খাবো না, চান ক'র্‌বো না, তুই যা।" বলিতে বলিতে কোথায় ছুটিয়া পলাইত। তাহাকে স্নান করান, খাওয়ান প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিল। কেবল ভজহরির অনুনয় অনুরোধ সে মানিয়া চলিত—ভজুদা নহিলে কেহ তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারিত না; দুর্জ্জয় অভিমানের ভরে পিতাকে সে একরকম দেখাই দিত না—লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরিত।

যাহা অপ্রাপ্য অথবা দুষ্প্রাপ্য, দেখা যায় তাহারই সম্বন্ধে মানুষের একটা প্রবল আগ্রহ থাকে। স্বামীর প্রতিচ্ছবি সুন্দর বালকটীকে জোর করিয়াও একবার বুকে জড়াইয়া ধরিবার প্রলোভন সুনীতি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিত না। এ নিবিড় পুত্রস্নেহ কোন্ বিধাতা তাহার অন্তরে সঞ্চার করিয়াছিলেন জানিনা; এক এক সময় অতৃপ্তির হাহাকারে চিত্ত তাহার যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন সে ভজহরির ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া, নিদ্রিত বালককে নিঃশব্দে সহস্র চুম্বন দিয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করিতে চাহিত। মনে মনে সে ভাবিত, যদি ওই দুর্ব্বিনীত ছেলেটী নিজের ছেলের মতই তাহার অঞ্চল-ছায়ায় নিতান্ত নির্ভয়ের সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিত, যদি সে সুনীতির তৃষাতুর প্রাণের ব্যগ্র আলিঙ্গনের মধ্যে আগ্রহে ধরা দিয়া তাহারই বক্ষে মাথাটী রাখিয়া নীরবে ঘুমাইয়া পড়িত, উঃ তাহা হইলে কি সুখ, কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি! ক্ষুধিত মাতৃপ্রাণ তাহার এইটুকু পাইবার জন্য যে কত বেশী লালায়িত ছিল, তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী দেবতাই বুঝিতেন।

সেদিন গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে ছুটাছুটিতে ক্লান্ত হইয়া মনু

ঘর্ম্মাক্ত দেহে ভজহরির মলিন কাঁথাখানির উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্নেহময়ী মাতার মতই তাহার শিয়রে বসিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে তাহাকে পাখা করিতেছিল। এমনই সময়ে অনেকক্ষণ মনুকে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া সুনীতি খোঁজ লইতে আসিল; দরজার বাহির হইতে ডাকিল—"ভজুমামা, মনু তোমার ঘরে আছে তো?"

"আছে, মা!"—বলিয়া ভজহরি প্রত্যুত্তর দিল।

সুহাসিনীর মাতার যখন বধূজীবন, সেই সময়ে ভজহরি সে সংসারে প্রবেশ করে, কিন্তু কি কারণে জানি না,—হয় তো নাম সম্পর্কে অথবা এমনই কোন কারণে সে তাঁহাকে 'বৌঠাকুরাণী' না বলিয়া "দিদি ঠাক্‌রুণ" বলিয়া সম্বোধন করিত। সেই সূত্রে সুহাসিনীও বাল্যকাল হইতে ভজহরিকে 'ভজুমামা' বলিত। বিবাহিতা হইয়া আসিয়া সুনীতি সেকথা জানিতে পারিয়াছিল, তাই ভজহরিকে সাধারণ ভৃত্য হিসাবে না দেখিয়া তাহাকে সে মানিয়া চলিত, এবং পূর্ব্বপদ বজায় রাখিয়া 'ভজুমামা' বলিয়াই ডাকিত। ভজহরিও প্রথম প্রথম মনুর সৎমাটীর উপর মনে মনে বিদ্বেষভাব রাখিলেও, ক্রমে এই শান্ত সহিষ্ণু স্নিগ্ধ স্বভাব বধুটীর বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ মনুর উপর যে সুনীতির সত্যকার 'প্রাণের টান' আছে—তাহার পরিচয়ও সে যথেষ্ট পাইয়াছিল।

দুয়ারের সম্মুখ হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সুনীতি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। অনাবৃত দেহ বালকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সহসা সে অন্তরে বাহিরে শিহরিয়া উঠিল। কোথায় সেই সুপুষ্ট সবল দেহ, সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল গৌর-কান্তি! এই কি সেই শিশু, যাহাকে একবৎসর পূর্ব্বে স্বামিগৃহে আসিয়া, দেখিয়া সে মুগ্ধ চিত্তে ভাবিয়াছিল "কি সুন্দর ছেলে, ঠিক যেন স্বামীরই মত!" পঞ্জরাস্থিগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কণ্ঠার হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে, সুগোল নিটোল মুখখানি কৃশ হইয়া গিয়াছে;—কৈ এত দিন তো সে ইহা লক্ষ্য করে নাই!

চাহিয়া চাহিয়া সুনীতির দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—"ওরে, ও অভাগা, যাকে তুই হারিয়েছিস, তার চেয়ে আমার বুকে তো তোর জন্যে কম কিছু নেই, তুই তা বুঝলিনে, কেন?"

ধীরে ধীরে মনুর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যথা-বিজড়িত স্বরে সুনীতি বলিল, "ও এমন হয়ে গেল কেন ভজুমামা? ওর চেহারা যে দেখ্‌তে ভয় হচ্চে!"

ভজহরি অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিল, "কি জানি মা!"

সেইদিনই রাত্রে সুনীতি স্বামীকে জানাইল, মনুকে সে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইবে, শরীর তাহার আজকাল বড়ই খারাপ হইয়াছে। যতীশ উদাস ভাবে সম্মতি দিল; একটু পরে বলিল, "কিন্তু তুমি কি একা ঐ দুষ্টুকে সাম্‌লাতে পারবে?"

সেজন্য যতীশের খুব বেশী যে আশঙ্কা ছিল তাহা নহে, কারণ সে জানিত যে, সে ভার বহন করিবার শক্তি সুনীতির আছে। এই বৃহৎ শূন্য বাড়ীটাতে একা বাস করিবার কল্পনাই তাহার চোখের সম্মুখে বিভীষিকা রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সুনীতি বলিয়া উঠিল, "না না, তা কেন? তোমায় এখানে আমি একা থাক্‌তে দেব না তো, তোমায়ও ছুটি নিয়ে যেতে হবে; ভজুমামাও যাবে।"

একটু নির্জ্জন স্থান দেখিয়া, পুরীতে সমুদ্রের ধারে বাসা লওয়া হইল। যতীশ ও সুনীতি প্রতিদিন অপরাহ্নে মনুকে লইয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইত। সুনীতি মনুকে কত রঙ্গীন নুড়ী পাথর, কত ছোট বড় ঝিনুক কুড়াইয়া দিত; অস্তমান রক্তিমসূর্য্যকিরণোজ্জ্বল তরঙ্গের খেলা দেখাইত, কত বিষয়ে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিত; কিন্তু ঐটুকু বালক আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার সকল কথা উপেক্ষা করিয়া, পিতার অঙ্গুলি ধরিয়া শুধু নীরবে বহুদূর দিগন্তে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিত।

বাসা হইতে বাহিরে আসিবার দরজা কেহ যেন কখনই খুলিয়া না রাখে, এজন্য সুনীতি দিনের মধ্যে

সহস্রবার করিয়া ঝি চাকরদের সাবধান করিত। তাহার আশঙ্কা ছিল, কখন্ বা উন্মুক্ত দুয়ার পাইয়া দুষ্ট ছেলেটা একাই ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু হায়, মানুষের চেষ্টা, মানুষের প্রাণের ব্যগ্রতা যদি অদৃষ্টলিপিকে বিফল করিয়া দিয়া জয়পতাকা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তবে তো বিশ্বজগৎকে এত শোক দুঃখের আঘাত সহিতে হইত না!

৩

সেদিন সুনীতির শরীর ভাল ছিল না বলিয়া সে বিছানায় পড়িয়া ছিল; যতীশও বাসায় ছিল না, প্রবাসের পরিচিত কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। মনুকে বেড়াইয়া আনিবার ভার সেদিন ভজহরির উপরই পড়িয়াছিল।

রৌদ্রের ঝাঁঝটা ভাল করিয়া না কমিতেই মনু ছুটিয়া আসিয়া ভজহরির গলা জড়াইয়া বলিল, "ভজুদা, বেড়াতে চল।"

ভজুদা বলিল, "একটু পরে দাদা। এখনই কি বেড়াতে যায়, এখনও কত রোদ রয়েছে।"

বেড়াইতে যাইবার আগ্রহটা যে মনুর খুব বেশী তাহা যতীশ এবং সুনীতিও লক্ষ্য করিয়াছিল। তাই তাহাকে তাহাদের সঙ্গে লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। উভয়েই মনে করিয়াছিল যে এ তাহার বালক-স্বভাবোচিত কৌতূহল, সুতরাং মনুর এ আগ্রহ দেখিয়া তাহারা মনে মনে সুখীই হইয়াছিল। কিন্তু তাহা যে শুধু কৌতূহলের মধ্যেই অবসিত হয় নাই, আরও কিছু যে তাহার মধ্যে ছিল—একথা সেদিন ভজহরির কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

সমুদ্রের ধারে মনুর হাত ধরিয়া ভজহরি দাঁড়াইয়া ছিল এবং তাহার মনোরঞ্জনার্থ অনেক কথা বকিয়া যাইতেছিল। সহসা একটা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া সে বিস্মিত ভাবে শ্রোতার মুখের প্রতি চাহিল, দেখিল তাহার বৃহৎ দুইটী আঁখির উৎসুক দৃষ্টি দূর দিগ্বলয়ে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ভীতচিত্তে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ভজহরি প্রশ্ন করিল, "ওখানে কি আছে দাদা, কি দেখ্ছিস্?"

মনু ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "ওইখানে,—ও-ই অনেক দূরে—আমার মা আছে ভজুদা।"

আর কোন কথা না কহিয়া ভজহরি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া সেদিন ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

মনুর জন্মদিনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যতীশ প্রধান প্রধান বাঙ্গালী বন্ধুদের রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাই সেদিন সারাদিনই সুনীতির একটুও অবসর ছিল না। নানাপ্রকার জলখাবার তৈয়ারী এবং উড়িয়া বামুন ঠাকুরকে রান্না সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, দেখাইয়া দেওয়া ইত্যাদিতে সে বড় ব্যাতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছিল। বাসার ঝি চাকরেরাও সকলেই কাছে ছিল। এই অবসরে সুযোগ পাইয়া মনু কোথা হইতে টানিতে টানিতে একখানা টুল আনিয়া হাজির করিল, এবং তাহার উপরে উঠিয়া বাহিরে যাইবার দরজার খিলটা অবিলম্বে খুলিয়া ফেলিল। তখন আর কি! সকলের নিষেধ শাসনের অপেক্ষা না করিয়া একছুটে সে বাসার বাহির হইয়া পড়িল।

সেইমাত্র সূর্য্যদেব সহস্র রশ্মির প্রখর তেজ সংযত করিয়া অস্তপথাবলম্বনের ইচ্ছা করিতেছিলেন। বীচি-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে রবির কিরণ বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছিল। তখনও রৌদ্রভয়ে সমুদ্রতীরে বায়ু-সেবনকাঙ্খীরা উপস্থিত হন নাই।

সন্ধ্যা যখন আসন্ন, তখন সুনীতি রান্নাঘর হইতে ভজহরিকে ডাকিয়া বলিল, "ভজুমামা, মনুকে নিয়ে এস, খাইয়ে দেই। আবার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে।"

ভজহরি উত্তর করিল, "দাদা তো আমার কাছে আসে নাই মা, সে যে অনেকক্ষণ থেকে তোমার ঐ দিকেই ছিল।"

উদ্বেগজড়িত স্বরে সুনীতি বলিল, "সে কি! তবে কোথায় গেল সে? এখানে তো নেই। দেখ, দেখ, বাবুদের কাছে আছে কি না।"

যেখানে যতীশ বন্ধুবর্গকে লইয়া বসিয়া ছিল, ছুটিয়া সেই কক্ষে গিয়া ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাকে দেখেছেন বাবু ?"

তাহার কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতায় বিস্মিত হইয়া যতীশ উত্তর দিল, "না, কৈ এখানে সে তো আসেনি, সে কোথায় ?"

ছুটাছুটি করিয়া এ ঘর সে ঘর, চৌকীর নীচে, দরজার পার্শ্বে, আলমারির পশ্চাতে ভজহরি খুঁজিতে লাগিল। সুনীতিও সকল কায ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সে তো লুকাইয়া থাকিয়া কৌতুক করিবার ছেলে নয়। সন্দেহাকুল ত্বরিত স্বরে সহসা সুনীতি বলিয়া উঠিল, "বাইরের দরজাটা তো খোলা নেই ?"

কে একজন চাকর উত্তর দিল, "হাঁ মা, এ বড় দরজাটা তো খোলা,একখানা টুলও যে এখানে রয়েছে।"

তখন সন্ধ্যাকে অতিক্রম করিয়া রাত্রি নিবিড় হইয়া আসিতেছিল।

"তবে দাদা আমার ঐ পথেই গিয়েছে,"— বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভজহরি উন্মত্তের মত সেই নিবিড় অন্ধকারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুনীতির সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছিল, আর এতটুকু শক্তিও যেন তাহাতে অবশিষ্ট ছিল না। কম্পিত দেহে সে ধূলিতলে বসিয়া পড়িল। গোলমালে যতীশ এবং তাহার বন্ধুগণও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, কয়েকটা আলো লইয়া সকলেই খুঁজিতে বাহির হইলেন।

অন্ধকার সিন্ধু সৈকতে ভজহরির বিকৃত কণ্ঠের উচ্চ চীৎকার বহুদূর হইতে শোনা যাইতেছিল—"দাদা, দাদা আমার।" হায়রে অবোধ মানুষ। সে যে তার মায়ের সন্ধানে অসীমের পথে যাত্রা করিয়াছে, সহস্র স্নেহের আহ্বানে, বুকফাটা অশ্রুজলে আর তাহাকে ফিরাইতে পারিবে কি ?

রাত্রি-শেষে পুত্রশোকের প্রচণ্ড বহ্নির জ্বালা বক্ষে লইয়া, বিফল প্রযত্ন যতীশ রোদনারুণ চক্ষু, উচ্ছৃঙ্খল বেশ উন্মাদের মত যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন সুনীতি মূর্চ্ছিতা—ধূলিতে লুটাইতেছে।

ভজহরি আর ফিরিল না। যে মায়ার শৃঙ্খল চরণের নিগড় হইয়া এতদিন তাহাকে সংসারের মাঝখানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ; তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া সংসারের অন্তরালে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছ"

ছোটগল্প বাঙ্গলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক নূতন সৃষ্টি। একপ্রকারের গল্প বা কথাসাহিত্য আমাদের দেশে যে ঠাকুরমার ঝুলি বা ঠানদিদির থলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত এবং বাঙ্গালী জীবনের একাংশ তাহা পূর্ণ করিয়া রাখিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই গল্প বা রূপকথা বিশেষ ভাবে শিশুসাহিত্য। তাহার মধ্যে রসের অভাব আছে বলিতে পারি না ; কিন্তু সে রসে কল্পনা-কুশল অস্থির-চিত্ত শিশুই পুষ্ট হইতে পারে। "সে সকল হইতে যাঁহারা আনন্দলাভ করিতেন, তাঁহারা—বয়সেই হউক আর মনেই হউক—শিশু ছিলেন।" জনশূন্য তেপান্তর মাঠের মধ্যে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালের পুত্র, আশ্রয়ান্বেষণে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের ঘুমন্ত রাজকন্যার জন্য রাজপুত্র

অভিসারে বাহির হইয়াছে ; সোনার কাঠি রূপার কাঠির স্পর্শে রাজকন্যার নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে প্রভৃতি রূপকথা নিছক কল্পনা মাত্র—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের, সামাজিক জীবনের বাস্তবের উপর তাহাদের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাহার মধ্যে যে সুখদুঃখকে গল্পের সূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হইত—তাহাদের বাস্তবের সংযোগ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথই এই নূতন ধরণের ছোটগল্পকে বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম আমদানি করিলেন এবং তিনি ইহার ধারাও কতকটা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু সে সমস্ত আলোচনার পূর্ব্বে, গল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে একটি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি প্রধানত যে আবহাওয়ার মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বিবেচনা না করিলে এই নূতন সাহিত্যসৃষ্টির সার্থকতাটুকু আমাদের চক্ষে পড়িবে না। "১২৯৮ সাল—তখন কবির ত্রিশবৎসর বয়স—এই সময় হইতেই গল্পগুচ্ছের সূত্রপাত।" "এ সময়ে কবির জীবনটি প্রকৃতির একটি অতি নিবিড় উপভোগের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিল।" জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষে কবি তখন পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, "ডাঙ্গায় বড় কিচিমিচি" তাই জলে বাসা বাঁধিয়াছেন—নদীতে নদীতে বোটে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন—জনশূন্য পদ্মার বালুচরে কতদিন বোট বাঁধিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। তাঁহার মাথার উপরে, তাঁহার চারিদিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি এলাইয়া পড়িয়া থাকিত, কবি তাহার মাঝখানে নিজের অস্তিত্বকে মিশাইয়া দিয়া আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রকৃতির হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতেন। তাঁহার এই পরিপূর্ণ উপভোগের জীবন, এই স্বপ্নাবিষ্ট ভাব তাঁহার এই সময়কার সমস্ত চিঠি পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।—"জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটো একটা পাখীর চিক্ চিক্ শব্দ সবশুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব"—এই স্বপ্নাবিষ্ট ভাবেই তাঁহার তখনকার দিনগুলি পরিপূর্ণ থাকিত। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কতদূর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, তাহা তাঁহার একটি চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারি। এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"সন্ধ্যাবেলায় যখন ছোট জেলে ডিঙ্গি চ'ড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন...সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পদ্মার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন অন্তঃপুরের ঘরের মত বোধ হত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক—সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বল্লেও কেউ উপলব্ধি কর্‌তে পারবে না।" এই ত গেল কবির প্রকৃতির সহিত নিবিড় যোগ। ইহা ব্যতীত এই প্রবাসের ফলে কবির আরও একটা বৃহৎ চেতনার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কবি বাংলা দেশের একেবারে অন্তরের মাঝখানটীতে গিয়া পড়িয়াছিলেন। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের ঘটনা বৈচিত্র্যবিহীন জীবন স্রোত তাঁহার চক্ষের উপর দিয়া ধীরকল্লোলে বহিয়া যাইতেছিল—চারিদিকের কত ঘটনা, পল্লিজীবনের কত খুঁটিনাটি সুখ দুঃখ তাঁহার মনের মধ্যে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া যাইতেছিল। এইরূপে একদিকে প্রকৃতির সহিত যোগ, অন্যদিকে বাংলাদেশের জীবন যাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়—এই উভয়ের সমবায়ে তাঁহার এই সময়ের সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। গল্পগুচ্ছের মধ্যেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

সমালোচক ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর ভাষায় আমরা বলিতে পারি—"প্রকৃতির একটি সুন্দর ছায়া-রৌদ্র-মণ্ডিত শ্যামল বেষ্টনের মধ্যে মানুষের জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে গাঁথিবার আবেগ গল্পগুলির আসল উৎপত্তির উৎসস্বরূপ।" এই গল্পগুলি উপভোগ করিতে হইলে ইহাদিগকে কবির এই সময়কার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। কবি গল্পগুলিতে আমাদিগকে যতটুকু দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তিনি দিতে চাহিয়াছেন

কিন্তু পারেন নাই। কবি নিজেই বলিয়াছেন—"আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করচি, তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদী তীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্য্যে সজীব করে তুলচে! কিন্তু পাঠকেরা এর অর্দ্ধেক জিনিসও পাবে না। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্র-রঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া, এবং গ্রামের শান্তিটি এমন অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম, তাহলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে এক মুহূর্ত্তে বুঝে নিতে পারত।"* চতুর্দ্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে মিশিয়া কবি এই গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই জন্যই তিনি গল্পগুলির মধ্যে এতটা রস, এতটা মাধুর্য্য, এতটা সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতে পারিয়াছেন।

আমরা উপরে বলিয়াছি—কবির এই সময়কার জীবনে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার হৃদয়ের এক ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিজীবন ব্যাপিয়াই আমরা এই যোগটাকে বৃহৎভাবে দেখিতে পাইব—ইহা যে কেবলমাত্র তাঁহার নিজের জীবনকে একটা বৈচিত্র্য অভিনবত্ব বা সৌন্দর্য্যদান করিয়াছে তাহা নহে, তিনি তাঁহার সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির ভিতরেও বিশ্বপ্রকৃতির এই প্রভাবটাকে বৃহৎ ভাবে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

গল্পগুচ্ছের কয়েকটা গল্পে ইহাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ "অতিথি" গল্পটিকে আমরা লইতে পারি। অতিথি গল্পের বালক তারাপদ অল্প-বয়সে পিতৃহীন হইয়া, মাতা আত্মীয়স্বজন অনাত্মীয় প্রতিবেশী সকলেরই স্নেহপাত্র ছিল। কিন্তু সকলের অজস্র স্নেহবন্ধনের মধ্যে সে বিন্দুমাত্র ধরা দেয় নাই। স্নেহ পাইত বলিয়াই যে স্নেহের একটা আকর্ষণ ছিল না তাহা নহে; কারণ সংসারে যাহা কিছু সে পাইয়াছে এবং যাহা পায় নাই—তাহার মধ্যে একটা পার্থক্য দেখার মত অবস্থা তাহার নহে। কোনও বন্ধনের মধ্যে বাঁধা পড়াই তাহার পক্ষে অসম্ভব। যে উদার উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির বুকে তাহার জন্ম, তাহা স্নেহহীন হইয়াই তাহাকে আকর্ষণ করিত, উদাসীন হইয়াই তাহাকে আহ্বান করিত। "অজ্ঞাত বহিঃ-পৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্যই তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।" প্রকৃতির চিরপ্রবহমান এই অনন্ত স্রোতের মধ্যে ভাসিয়া যাইতেই তাহার আনন্দ। প্রকৃতির হৃৎস্পন্দন সে হৃদয় দিয়া অনুভব করিত—তাই "গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহারও চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত।" প্রকৃতির এই কম্পন স্পন্দন, এই উন্মত্ততার মধ্যে তাহার চিত্তও ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিত, দুইবাহু দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিত। বিশ্বসঙ্গীতের তালে তালে তাহার হৃদয়ের সুর বাঁধা ছিল, তাই, "গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত।" প্রকৃতির সকল দৃশ্যই সে সকৌতূহল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত; অতি পুরাতনও তাহার চক্ষে যেন চির নূতন, চির-রহস্যময়। সে যেন "অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটী আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ"—পর্ব্বতবক্ষোবিহারী নির্ঝরশিশুর মতই কল-হাস্যময় চঞ্চল উদাসীন,—তাহার কায কেবলই বহিয়া যাওয়া—কিন্তু নির্ঝর যেমন বহিয়া যাইতে যাইতে লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পঙ্কিল আবিলতাময় নদীস্রোতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—তারাপদের মনে সে পরিবর্ত্তন হয় নাই। সকলের সঙ্গেই সে মিশিত, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। এই ছেলেটী একদিন এক যাত্রার দলের সঙ্গে মিশিয়া নিজের গ্রাম, মাতা ভ্রাতা

অতিথি

* ছিন্নপত্র।

আত্মীয়স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়া গেল। আবার তাহা-দের প্রিয়পাত্র হইয়া, হঠাৎ একদিন রাত্রে তাহাদিগকেও ছাড়িয়া গেল। মানুষ তাহাকে যাহা কিছু দিয়াছে —এবং তাহার পরিমাণ অল্প নহে—স্নেহ ভালবাসা যত্ন আদর, সমস্তই সে অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু স্নেহহীন, উদাসীন নির্ম্মম বিশ্বজগৎ তাহাকে কি অমূল্য নিধি দান করিয়াছিল যাহার আকর্ষণ সে কখনই ভুলিতে পারে নাই? "এই সুবৃহৎ, চিরস্থায়ী, নির্নিমেষ বাক্যহীন বিশ্বজগৎই যেন তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল।" তাই নূতন শিক্ষার মোহে, সহপাঠিকা বালিকা চারুশশীর দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে, মতিবাবু এবং তাঁহার গৃহিণীর আদর যত্নে যদিও সে দীর্ঘ দুইবৎসরের জন্য বাঁধা পড়িয়াছিল—সে বন্ধন স্থায়ী হইল না। চারুশশীর সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে—এমন সময়ে একদিন—যখন আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিয়াছে, গ্রামের প্রান্তে শুষ্কপ্রায় নদীটি জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, রথযাত্রার মেলা উপলক্ষে যাত্রীর নৌকায় নদী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—চারিদিকে উদ্দীপনার সীমা নাই—দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কাল পাল তুলিয়া দিয়া আকাশে মাঝখানে উঠিয়া পড়িল—পূবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল;—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা —এই রথযাত্রার উদ্দীপনার মাঝখানে তারাপদও অদৃশ্য হইয়া গেল। "স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্ব্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া এই ব্রাহ্মণ বালক উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল।"

জনৈক সমালোচক গল্পটিকে "বিশ্বপ্রকৃতির চঞ্চল অথচ নির্লিপ্ত একটি ভাবকে ঐ একটু গল্পের সূত্রের মধ্যে ধরিবার চেষ্টা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখক একটি ভাবকে মূর্ত্তি দিয়াছেন। সামাজিকত্বের দ্বারা পীড়িত না হইয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির সহিত মিশিয়া যাইবার জন্য মানুষের মনে মাঝে মাঝে যে ব্যাকুলতা দেখা যায়, তাহারই খুব একটা স্পষ্ট চিত্র লেখক এই গল্পের মধ্যে দেখাইয়া-ছেন। এই বহিঃপৃথিবীর আকর্ষণ—ইহা রবীন্দ্রনাথের জীবনে কতদূর সত্য ছিল তাহা আমরা তাঁহার একটি চিঠি হইতে দেখিতে পাই—সেই চিঠিতে কবির নিজের যে অনুভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার মধ্যে অতিথি গল্পের মূল ভাবটুকু রহিয়াছে। কবি লিখিতেছেন—"এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিন-কার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি বহুযুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করচেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠে-ছিলুম।...যখন এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দো-লিত হয়ে উঠেছিলুম। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী করে বসলেই আমাদের সেই বহু-কালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

মানুষ যুগে যুগে প্রকৃতির বুকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে —তাই প্রকৃতি মাতার সঙ্গে তাহার যে অন্তরঙ্গ জীবন-সম্পর্ক তাহা সে ভুলিতে পারে না—অনেকের পক্ষে তাহা অজ্ঞাত। তারাপদের জীবনে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল।

এই অতিথি গল্পটি রবীন্দ্রনাথের একটী শ্রেষ্ঠ গল্প।

ইহাতে ঘটনার অভিনবত্ব বা বাহুল্য নাই—কিন্তু যে রস, যে শান্তি, যে মাধুর্য্য ইহার সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাহা সাহিত্যে দুর্লভ।

"শুভা" গল্পটির মধ্যে আমরা কতকটা এই ভাবের আর একটি চিত্র দেখিতে পাই। গল্পটি মাতার অনাদরের পাত্রী, পিতৃগৃহের অভিশাপ স্বরূপ একটি মূক বালিকাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বালিকা নিজের অবস্থা নিজে বুঝিত, তাই সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে চাহিত, কিন্তু আপনার মৌন বিষাদটিকে অন্তরের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিত না বলিয়াই, ম্লান প্রকৃতির অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিত। কবি এই বালিকাকে প্রকৃতির সহিত একেবারে মিশাইয়া দিয়াছেন—মানুষের ভাষা এই মিলনের মধ্যে একটুখানি বাধার সৃষ্টি করে, "মানুষের তুচ্ছ কথায় কত সময়ে অসীম আকাশভরা প্রকৃতির আবির্ভাব আবৃত হইয়া যায়"—তাই যেন কবি শুভাকে বোবা করিয়া সে বাধাও সরাইয়া দিয়াছেন।

শুভা

শুভাদের বাড়ীর পাশ দিয়া ক্ষুদ্র একটী নদী বহিয়া যাইত—শুভা অবসর পাইলেই নদীতীরে আসিয়া বসিত। মধ্যাহ্নে চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতা বিজনতার মাঝখানে "রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।" ভাষাহীনতার মধ্য দিয়াই নদী-কলধ্বনি ঝঙ্কৃত, জনকোলাহল মুখরিত, তরুমর্ম্মর বিকম্পিত প্রকৃতির সঙ্গে বালিকার অন্তরের পরিচয় চলিত।" কবি নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"প্রকৃতির এই বিবধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি হইলেও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট শুভার যে ভাষা, তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লীরবপূর্ণ তৃণ-ভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।"

শুভার যে দুইচারিটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—তাহারাও মূক প্রাণী। কিন্তু ইহারই মধ্যে কবি আর একটি ভাষাবিশিষ্ট জীবকে আনিয়াছেন।—এই ছেলেটীকে আনিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বোবা বালিকার অভ্যন্তরে যে হৃদয় ছিল—তাহা ভাষাহীনতার বাধা অতিক্রম করিয়াও একটি ছেলের প্রয়োজনে লাগিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

পিতামাতা শুভাকে বিবাহের জন্য কলিকাতায় লইয়া গেলেন—বালিকার আবাল্য-পরিচিত নিতান্ত আপনার নদীতট তরুশ্রেণী হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেলেন। প্রতারণার সাহায্যে বিবাহ হইল; বর বধূকে পশ্চিমে লইয়া গেলেন। শুভা চারিদিকে চায়, ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্ম পরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।"—আর শুনিল পদতলে মূক প্রকৃতি, মাথার উপরে নিস্তব্ধ অনন্ত নীলাকাশ—সেখানকার ম্লান বিষাদের মধ্যে বালিকার হৃদয়ের প্রতি-ধ্বনি মিলিল।

অনেক লেখক অনেক পাত্র পাত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মুখে ভাষা দিয়াছেন, তাহারা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই মূক বালিকা তাহার ম্লান ব্যথিত ভাষাহীনতা লইয়াই আমাদের অন্তরের মাঝ-খানটীতে যে আসন অধিকার করিয়াছে তাহা হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

এই সম্পর্কে আর একটি গল্পের আমরা আলোচনা করিব—সেটী "ছুটি" গল্প। গ্রামের স্নেহময় আশ্রয়ে লালিত, অবাধ উন্মুক্ত স্বাধীনতার আনন্দে পুষ্ট একটি অবোধ কিশোর-চিত্তকে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাজধানীর স্নেহহীনতার মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া, তাহার পরিণামের একটি করুণ-রসাত্মক চিত্র এই গল্পটির মধ্যে দেখান হইয়াছে। ইহাতে বিশ্বপ্রকৃতির যে বৃহৎ প্রভাব সে সম্বন্ধে কিছু নাই বটে, তথাপি পল্লীর

ছুটি

বাল্যপ্রকৃতি কি কি সমবায়ে গঠিত, স্বাধীনতার স্নেহের অভাবে সে প্রকৃতি কতটা পীড়িত হয়, সে সমস্ত আমরা এই গল্পটির মধ্যে দেখিতে পাই। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে কৈশোরের প্রারম্ভে যখন অবাধ বালকের মনে স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা জন্মায়, যখন নিজের সম্বন্ধে একটু কুণ্ঠাভাব মনে আসে এবং তাহার জন্য দুইটা মিষ্ট কথা, একটুখানি ভালবাসার জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুক্ত হইয়া উঠে, যখন পরিচিতদিগকে ছাড়িয়া অপরিচিতের মধ্যে জীবন আরম্ভ বিশেষ ক্লেশকর—সেই সময়ে ফটিক ছেলেটি কলিকাতায় মাতুলালয়ে নীত হইল। সেখানে সে কিছুরই সহিত খাপ খাইতে পারিল না। "মামীর স্নেহহীন চক্ষে একটা দুর্গ্রহের মত প্রতিভাত হইয়া সে বেদনাবোধ করিল।" ইহার উপর স্বাধীনতা নাই—"কোথায় ঘুড়ি লইয়া উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা।", স্নেহময় মাতৃক্রোড়বিচ্ছিন্ন বালকের এই ইতিহাসটুকু লেখক এক অতি শোকাবহ পরিণামের মধ্যে সমাপ্ত করিয়াছেন। মানুষের স্নেহহীনতা, বন্ধন, অত্যাচার হইতে সে চাহিয়াও ছুটি পায় নাই—তাই যেন বিধাতা তাঁহার অবাধ উন্মুক্ত অনন্ত ছুটির রাজ্যে বালককে আহ্বান করিয়া লইলেন।—সে রাজ্যের সংবাদ কে দিবে?

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এই সময়ে বাংলার গ্রামের চিরন্তন বাঙ্গালী হৃদয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে তাঁহার এই সময়কার সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিকে প্রধানতঃ পল্লীজীবনচিত্র বলিলেই চলে। কথা উঠিতে পারে—এবং কিছুদিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আলোচনাও হইয়া গেছে—যে গল্পগুচ্ছে পল্লীজীবনের বাস্তবচিত্র নাই। সম্প্রতি আমরা আর এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের পল্লীসমাজের চিত্র পাইয়াছি। সে হিসাবে দেখিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের চিত্রে যথেষ্ট বাস্তবতা নাই। গল্পগুচ্ছ কবির একটা সৃষ্টি। তিনি পল্লীগ্রামের জীবনযাত্রার খুব একটা ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাই যথাযথরূপে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কার্য্য নহে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক পল্লী ঐতিহাসিকের কার্য্যগ্রহণ করেন নাই, এবং উপন্যাস ছাড়িয়া ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি আরও অনেকটা স্বাধীনতার অবসর পাইয়াছিলেন। একথা হয়ত ঠিক যে গল্পগুচ্ছে আমরা অনেকগুলি ঠিক বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র সুগঠিত মানুষ পাই না,—কিন্তু মানুষ পাই না বলিয়া লেখককে, দোষ দিতে পারি না, কারণ গল্পগুচ্ছ উপন্যাস নহে। ছোটগল্পে নানা সমবায়মণ্ডিত 'ইনডিভিজুয়েলের' (individual) বিশেষ প্রয়োজন নাই—গল্পের প্রয়োজন মত মনুষ্যচরিত্রের একটা কোনও বিশেষ দিক, দুই একটা ঘটনার সংস্পর্শে, দুইচারিটি চরিত্রের একটা বিশিষ্টতার স্ফূর্ত্তি—এইগুলিই কল্পনার রশ্মিপাতে ফুটাইয়া তোলা গল্পলেখকের কার্য্য।

ইহাতে পল্লীজীবনের একটা যথাযথ অনুকৃতি আমরা পাই—গল্পগুচ্ছের এ গৌরব না থাকিতেও পারে। গল্পগুচ্ছের প্রধান গৌরব এইটুকু যে, ইহার মধ্যে আমরা যে সুখদুঃখের পরিচয় পাই তাহা ছোট খাট হৃদয়ের সুখদুঃখ, সরল মানব-হৃদয়ের অভিব্যক্তি এবং সে হৃদয় চিনিতে আমাদের বিলম্ব হয় না—তাহা নিতান্তই বাঙ্গালী হৃদয়। এই সম্পর্কে বন্ধু ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে যে পরামর্শ দিতেছেন, তাহারই মধ্যে গল্পগুচ্ছের মূলসূত্রটুকু ধরা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"আপনি কোন রকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে গম্ভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস, তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া আম কাঁঠালের

বন, পুকুরের পাড়ে কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা—এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তরল কলধ্বনি তুলে বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবন-স্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।"

গল্পগুচ্ছের মধ্যে যে একটা বিশিষ্টতার ছাপ মারা আছে, বাংলার পল্লীজীবনের রসে প্রত্যেক গল্পকে যে ভাবে অভিষিক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাই এ গল্পসাহিত্যের বাস্তবতার প্রাণস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ অগ্রে দেখাইতে চাহিয়াছেন—বাংলার পল্লীজীবন কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে। দেশের শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তিনি স্বাভাবিক চিরন্তন বাঙ্গালী হৃদয়কে বড় করিয়া ধরিয়া দেখাইয়াছেন, সাহিত্যের একটা স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছেন, এইটুকুই তাঁহার গৌরব। এমন একটা সাহিত্য চাই যাহা দেশের একবারে প্রাণের কাছে গিয়া পৌঁছিবে —যাহার মধ্যে বাহিরের সমস্ত প্রভাব-বর্জ্জিত, দেশের চিরন্তন হৃদয়ের প্রকাশ দেখিতে পাইব—ইহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন এবং সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের জীবনযাত্রা নিতান্তই সাধারণ, তাহার মধ্যে অভিনবত্ব কিছুমাত্র নাই, অনর্থক ব্যস্ততা কোলাহল নাই, বিশেষ ঘটনাবৈচিত্র্যও নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পই ঘটনাবৈচিত্র্য বা ঘটনা-বাহুল্য-বিহীন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের "ভাববিশ্লেষণ, ঘটনাবাহুল্যের গতির সহিত খাপ খাইবারই নহে।" কয়েকটা গল্পে তিনি কোনও ঘটনাই না দিয়া, কেবল মাত্র দুই একটা পাত্র পাত্রী আনিয়া শুধু রসের সৃষ্টিই করিয়া গিয়াছেন। ছোট গল্পের ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে ঘটনার বিশেষ স্থানই নাই। ঘটনার স্রোত বহিয়া যাইবে, গল্পের মধ্যে খুব একটা গতিশীলতা বা চলার বেগ থাকিবে—আমাদের মনে হয়, ছোট গল্পে তাহার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ছোট গল্পে পাঠকের মন একটা স্থানেই আবদ্ধ থাকিয়া সমস্ত রসটুকু উপভোগ করিতে চায়, তাই গল্পের মধ্যে একটা সংহত ভাব থাকা আবশ্যক। গল্পগুচ্ছের সমস্ত গল্পেই যে এ ভাব আছে তাহা আমরা বলিতে চাহি না—কয়েকটী গল্পে মনস্তত্ব-বিশ্লেষণেরও পরিচয় আছে—সেগুলি অনেকটা উপন্যাসের আদর্শে গঠিত—যেমন 'সমাপ্তি' বা 'দৃষ্টিদান'।

গল্পগুচ্ছের মধ্যে ঘটনা, ভাব বা মানুষের দিক দিয়া অসাধারণত্ব কিছুই নাই। যাহা আছে তাহা অতি সাধারণ সামান্য হৃদয়ের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের ইতিহাস মাত্র। সেই সুখ দুঃখ লেখকের সহানুভূতির আলোকরশ্মিপাতে আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি গল্প পর্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে, সে সহানুভূতি কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। কোথায় এক দরিদ্র পোষ্টমাষ্টার ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটাইতে পারিতেছে না, কোথায় এক ক্ষুদ্র বালিকা আর এক দূর মরুপর্ব্বত-নিবাসী কন্যাবিচ্ছেদ-কাতর কাবুলিওয়ালাকে লইয়া এক নিবিড় স্নেহের জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে, কোথায় এক টিনের ঘরে ছোট ডেস্কের উপর খাতা রাখিয়া স্ত্রী-কন্যা আত্মীয়-স্বজন-বিচ্ছিন্ন প্রবাসী কেরাণী হিসাব লিখিতেছে, কোথায় এক মূক বালিকার মর্ম্মব্যথা বুঝিবার কেহই নাই—প্রভৃতি কত বিভিন্ন ব্যাপার লেখক তাঁহার গল্পের সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা বলিবার আছে। এই ছোট খাট হৃদয়ের সুখদুঃখের কথা খুব একটা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট শিশুচরিত্রে। এই শিশুচিত্রও একটা নূতন সৃষ্টি। "ছুটি" গল্পের বালক ফটিক, বালিকা মিনি, মৃন্ময়ী, গিরিবালা, চারুশীলা প্রভৃতি পাঠকের হৃদয়ে চিরদিনের মত একটী স্থায়ী উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া তবে অন্তর্হিত হয়। শিশুচরিত্রের যত রকম রহস্য থাকিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। বর্ষণশ্রান্ত আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মত বালিকা-হৃদয়ের তুচ্ছ হাসি কান্না, স্নেহ লইয়া মান অভিমান, আনন্দ আবেগ, স্বাধীনতার উল্লাস, বন্ধনের দুঃখ প্রভৃতি তাহাদের ক্ষুদ্র

জীবনের অসংখ্য অকিঞ্চিৎকর ঘটনা তাঁহার গল্পের মধ্যে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শিশুচরিত্রগুলি "সজীব, স্পন্দিত, প্রগলভ আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ।" যে শিশুরাজ্যে আইন কানুন নাই, যাহা মেঘরাজ্যের মতই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, সময়ে অসময়ে যে রাজ্যের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস প্রথম প্রভাতের সোণালি রৌদ্রের মত ঝরিয়া পড়ে, অভিমান অশ্রুজলের এক একটা তরঙ্গ অনাহূত আসিয়া পড়িয়া আবার পরক্ষণেই হাস্যধারায় অদৃশ্য হয়—একটা স্থায়ী রেখা আঁকিয়া যায় না,—যেখানে বন্ধনমমাত্র বেদনা, কেবল অবাধ স্বাধীনতার একটা আনন্দোচ্ছ্বাস উপলখণ্ডঝঙ্কৃত নির্ঝরশিশুর মতই বহিয়া যাইতেছে—সে রাজ্যের প্রত্যেক গোপন রহস্যটুকু রবীন্দ্রনাথের চক্ষে পড়িয়াছে এবং সে রহস্যের প্রান্তে তিনি আমাদিগকেও স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এই শিশুরাজ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিবার পূর্ণ অবসর দেন নাই। আনন্দের পাশে বিষাদের অবতারণা করিয়াছেন—তাহা না হইলে যে চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কেমন করিয়া বাল্যজীবনের এই তুচ্ছ হাসি-কান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখদুঃখের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, কেমন করিয়া ভালবাসার অশ্রুজলের সোণার কাঠির স্পর্শে চঞ্চল স্বাধীন বালিকাপ্রকৃতি হইতে গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি বিকশিত হইয়া উঠে—তাহাও দেখাইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা পরে এই সম্পর্কীয় গল্পগুলির আলোচনা করিব।

(আগামী কার্ত্তিক সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার।

আলোচন

"রামেন্দ্র-প্রসঙ্গ"।

শ্রাবণ সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকার ৬২৮ পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"রামেন্দ্রসুন্দরের কোনও অংশের কিছুমাত্র পরিচয় যিনি পাইয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'দেখুন, সুরেশ সমাজপতির অনেক দোষ থাকতে পারে ; কিন্তু ওর কতকগুলো এমন গুণ আছে, যা'র জন্য বাস্তবিকই আমি ওকে ভালবাসি। আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না সে কেমন করে দীনেশ সেনকে সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দিলে। দীনেশ তখন একেবারে নিঃস্ব সহায়হীন স্কুল মাষ্টার ; সম্পত্তির মধ্যে তা'র হাতে ছিল 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পাণ্ডুলিপি খানি। দীনেশকে সঙ্গে করে সুরেশ কল্‌কাতা সহর ঘুরলে ; শেষে বেলা বারটার সময় আমার বাসায় এসে ধরণা দিয়ে পড়ল ;—বইখানি যেমন করে হোক্ ছাপিয়ে দিতেই হবে—নইলে সে জলস্পর্শ করবে না! একটু সবুর করতে বল্লাম ; আচ্ছা হবে,' ইত্যাদি কোন কথাই সে শুনতে চায় না। কি করি, তখনই বেরিয়ে গিয়ে সান্যাল কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা ক'রে বইখানি ছাপবার ব্যবস্থা করে বাড়ী ফিরলাম। সুরেশ আশ্বস্ত হয়ে উঠে গেল।' — রামেন্দ্র বাবু এই ঘটনাটি এমন করিয়া বিবৃত করিতেন যেন এ ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্ব কিছুমাত্র ছিল না ; কেবল সমাজপতির একান্ত চেষ্টাই প্রশংসনীয়।"

বিপিন বাবু রামেন্দ্র বাবুকে দিয়া বলাইতে চাহিতেছেন যে আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের "পাণ্ডুলিপি" লইয়া কলিকাতার সহর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। কিন্তু রামেন্দ্রবাবু একথা কখনই বলিতে পারেন না—এবং আমার বিশ্বাস, বলেন নাই। কারণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রথম সংস্করণ ত্রিপুরা "রাধারমণ প্রেসে" ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। ত্রিপুরেশ্বর বীরচন্দ্র মাণিক্য ইহার ব্যয়-ভার বহণ করেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার অনেক দিন পরে আমার সঙ্গে সুরেশ বাবু ও রামেন্দ্র বাবুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় হয়। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আমার যে সামান্য প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরেই। সুতরাং সমাজপতি মহাশয় আমাকে সাহিত্য-

ক্ষেত্রে "দাঁড় করাইয়াছেন" এ কথার মূল্য কি? এই পুস্তকের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, রামেন্দ্রবাবু, হীরেন্দ্র বাবু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ। রবীন্দ্র বাবু স্বয়ং তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া এই পুস্তকের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যদি বলিতেন তাঁহারা আমাকে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতাম।

আমি পারিশ্রমিক না লইয়া সুরেশ বাবুর "সাহিত্য" পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তজ্জন্য তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে রামেন্দ্র বাবুকে, অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং ঐ সংস্করণের ভার স্বর্গীয় কালীনারায়ণ সান্ন্যাল মহাশয়ের উপর অর্পণ করা সম্বন্ধে ত্রিবেদী মহাশয়ের সহযোগে চেষ্টা করিয়াছিলেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিব। কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" তৎপূর্ব্বেই তাহার প্রাপ্য যৎসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল; এবং তাহার পাণ্ডুলিপি কলিকাতাবাসী কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই, যেহেতু ২।৪ পৃষ্ঠা করিয়া আমি তাহা ত্রিপুরার রাধারমণ প্রেসে দিয়া সেইখানেই বহুপূর্ব্বে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার ছয় বৎসর পরে সান্ন্যাল প্রেস দ্বিতীয়বার ঐ পুস্তক ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশ করেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ভূমিকা পাঠ করিলেই বিপিনবাবু তাহা জানিতে পারিতেন। মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে তাহা সতর্ক হইয়া লেখা উচিত, কারণ পরলোক হইতে তাঁহার স্বয়ং প্রতিবাদ করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর উপকার আমার জীবনে বিস্মৃত হইবার কথা নহে। যখন আমি অতি দুঃস্থ ও পীড়িত—যখন আমার ভিক্ষা ভিন্ন অন্য অবলম্বন ছিলনা, সেই সময় এই সদাশয় মহাপ্রাণ আমার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমাকে যেরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা আমি ভগবানের করুণা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় কুমার শরৎকুমার রায় তাহা জানেন। তাহা ভাবিতে গেলে আমার কণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় অবরুদ্ধ হয়। ভগবান রামেন্দ্রবাবুর স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গল করুন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বেহালা (২৪ পরগণা)
৩০শে জুলাই, ১৯১৯।

চৈতন্যদেব পাশ্চাত্য বৈদিক—দাক্ষিণাত্য নহেন।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র ১০বর্ষ—২য় খণ্ড—১ম সংখ্যায়, ১৩২৫ সনের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় লিখিত "ব্রজ-কাহিনী" নামক প্রবন্ধের স্থান বিশেষ পড়িয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। ২৫ পৃষ্ঠার ১৬ লাইনে দত্ত মহাশয় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য বৈদিক।" দত্তমহাশয় এরূপ অদ্ভুত আবিষ্কারের পক্ষে কি প্রমাণ পাইয়াছেন জানি না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রবন্ধে ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন যুক্তির উল্লেখ করাও তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। যাঁহারা দেশের ও সমাজের কিছু খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন, চৈতন্যদেব সামবেদীয় ভরদ্বাজ বংশজ পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক নহেন। পুলিন বাবু এরূপ সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ে কি প্রকারে এরূপ ভ্রমে পতিত হইলেন ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছি। প্রথমে অনবধানতা মনে করিয়া বিষয়টীকে উপেক্ষাই করিয়াছিলাম, পরে লোকপরম্পরায় জানিলাম, 'ব্রজ-কাহিনী' নাকি শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং সাধারণে এরূপ একটা বিষম ভ্রান্ত সংবাদের প্রচার না হয় এই জন্যই এই বিষয়ে পুলিনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছি।

চৈতন্যের পাশ্চাত্যতা সম্বন্ধে দুইপ্রকার প্রমাণের অবতারণা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, চৈতন্যের মাতামহবংশের পরিচয় ও তদ্বংশের অস্তিত্ব এখনও আছে কি না এবং তাঁহাদের কুলপঞ্জীতে চৈতন্য সম্বন্ধে কোনও বিবরণের উল্লেখ দেখা যায় কি না তাহার অনুসন্ধান; কেন না, চৈতন্যের নিজ বংশ তাঁহার তিরোধানের সহিত লুপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-বৈদিককুলমঞ্জরী গ্রন্থে লিখিত আছে,—"চৈতন্যদণ্ডগ্রহণাৎ সামবেদীভরদ্বাজো নাস্তি"; এবং আমরাও একথা জানি। পরন্তু যে কোন পাশ্চাত্য বৈদিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজস্থ সামবেদীয় ভরদ্বাজবংশ লুপ্ত। দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে চৈতন্য ও চৈতন্যের মাতামহ বংশের পরিচয় বিবরণ।

(১) পাশ্চাত্য-বৈদিককুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে—যশোধর মিশ্রের সহিত সমাগত, ভরদ্বাজগোত্র জিত মিশ্রের বংশে জগন্নাথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথের পুত্র চৈতন্য। যশোধর মিশ্র যে পাশ্চাত্য বৈদিক ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত এবং তাঁহার সঙ্গে যে আর চারিজন ভিন্ন-গোত্রের ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও যে পাশ্চাত্য বৈদিক ইহাও সকলেই জানেন। আর, চৈতন্যের মাতামহের নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী; ইনি রথীতর বংশীয় পাশ্চাত্য বৈদিক। ইঁহার

বংশধরগণ এখনও বাংলার বহুস্থানে আছেন। তাঁহারা সমাজে পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়াই খ্যাত এবং তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সহিতই চলিয়া আসিতেছে। চৈতন্যদেব যদি 'দাক্ষিণাত্য বৈদিক' হইতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহার পিতা জগন্নাথমিশ্র 'পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপ্রদীপ স্বধর্ম্মরাট্' নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। ইহা সকলেই জানেন যে, তখন 'এখনকার মত, দাক্ষিণাত্যে পাশ্চাত্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত না। সুতরাং কেবল ইহার দ্বারাও চৈতন্যের বৈদিকতা প্রমাণিত হয়।

চৈতন্য যে মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন ইহারও কিছু প্রমাণ আছে। চৈতন্যের মাতামহ বংশের বংশ-বিবরণে এরূপ জানা যায়:—চৈতন্যের মাতামহ ও মাতুল বিষ্ণুদাস সাধকও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্য যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পুরীধামে যাত্রা করেন, তখন বিষ্ণুদাসও তাঁহার সহচর ছিলেন। পরে চৈতন্যের উপদেশে, বিষ্ণুদাস সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন। সেই রাত্রিতেই স্বপ্নাদেশে শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহলাভ করিয়া, কালক্রমে পদ্মার তীরবর্ত্তী 'মুকডোবা' গ্রামে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং চাঁদ রায় কেদার রায়ের নিকট হইতে বিগ্রহের সেবার নিমিত্ত বহু ব্রহ্মোত্তরাদি লাভ করেন। উহাতে এরূপ কথিত আছে—শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার সময় ঋত্বিক, 'হোতা, সদস্যাদি কার্য্য করিবার জন্য চৈতন্যদেব, ব্রহ্মানন্দ গিরি, অমৃতানন্দ স্বরস্বতী ও পূর্ণানন্দ গিরি 'মুকডোবা'য় পদার্পণ করিয়া প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে বিষ্ণুদাসের সহকারিতা করিয়াছিলেন। এই বিবরণের কোন উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে দেখা যায় না। তবে চৈতন্যের পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থানে গমন, তথায় আত্মীয়কুটুম্ব নিবাসে অবস্থান, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমধিক প্রচার এবং উপহারাদি ও বহু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের বিবরণ উহা হইতে জানা যায়। সুতরাং চৈতন্যের মাতামহবংশের কুলপঞ্জীর বিবরণ এই ভাবে সংলগ্ন হয়। চৈতন্যের মাতামহের বংশের কুলবিবরণীতে জগন্নাথ মিশ্রের ও চৈতন্যের নামও দেখা যায়। পরন্তু প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে অমৃতানন্দ স্বরস্বতী আর একবার 'মুকডোবা' গ্রামে ৺বাসুদেব দর্শনে আসিয়াছিলেন—বৃদ্ধ পরম্পরায় ইহাও জানা যায়। মুকডোবা এখন নদীগর্ভে—৪৭ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মা উহাকে কুক্ষিগত করিয়াছেন। এখন শ্রীশ্রীবাসুদেব ও তাঁহার সেবকগণ—বিষ্ণুদাস ও চৈতন্যের একমাত্র জীবিত নিদর্শন—ফরিদপুর অন্তর্গত ফরিদপুর হইতে ১৮ মাইল দূরে 'ভাঙ্গা' চৌকির নিকটে 'পাটরা' গ্রামে বাস করিতেছেন। ৺বাসুদেবের মূর্ত্তি অতি মনোহর, নয়নাভিরাম ও দেবত্বব্যঞ্জক। এরূপ মূর্ত্তি আর দেখিতে পাওয়া যায় না—ঠাকুর এখনও 'জাগ্রত'। সুতরাং ইহা হইতেও বুঝাইতেছে যে, চৈতন্য ও চৈতন্যের মাতুলবংশ উভয়েই পশ্চাত্য বৈদিক কুলসম্ভূত।

(২) প্রায় সমুদায় বৈষ্ণবগ্রন্থেই চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে অতি সাধু ও তপস্বী পণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি যে পাশ্চাত্য বৈদিক ছিলেন এ কথারও উল্লেখ আছে। আমরা এখানে প্রমাণবাহুল্য করিব না। পাশ্চাত্য বৈদিককুলমঞ্জরীর কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন আর একটা প্রমাণের উল্লেখ করিব। শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্ররচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থের ১ম ও ২য় সর্গে চৈতন্য ও চৈতন্যের মাতামহ বংশের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে, আমাদের অনুকূল দুই একটী স্থল মাত্র দেখাইব। "আসীৎ শ্রীহট্টমধ্যস্থো মিশ্রো মধুকরাভিধঃ। পাশ্চাত্যবৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ * * * নিশম্য গুণরূপাণি শ্রীলবৈদিকসত্তমঃ। নীলাম্বরো দ্বিজবরো দ্রষ্টুং তং প্রযযৌ মুদা॥ দৃষ্ট্বা তং নরশার্দূলং চক্রবর্ত্তী স্বধর্ম্মরাট্। অস্মৈ কন্যাং প্রদাস্যামি সুশীলায় মহাত্মনে॥" ইত্যাদি। উপরিলিখিত বচনাবলীর দ্বারা চৈতন্যের ও চৈতন্যের মাতামহবংশের পাশ্চাত্য-বৈদিকতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। এই সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ে অধিক প্রমাণাড়ম্বরের প্রয়োজন দেখা যায় না। এই প্রমাণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দত্তমহাশয় চৈতন্যদেবের পাশ্চাত্য-বৈদিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া, তাঁহার শীঘ্র প্রকাশ্য গ্রন্থে প্রয়োজনীয় সংশোধনটুকু করিলে আমরা আশ্বস্ত ও বাধিত হইব।

শ্রীসূর্য্যকুমার কাব্যতীর্থ।

শিবাজী ও তাঁহার রাজত্বকাল*

(আলোচনা)

পূর্ব্বভাষ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ মহাশয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত *'Aurangzib'* ও অন্যান্য ইতিহাস-গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। এইবার তিনি মহারাষ্ট্র-বীর ছত্রপতি শিবাজীর একখানি মৌলিকতথ্যপূর্ণ জীবন-চরিত রচনা করিয়া, ভারতেতিহাসের বহুদিনের অভাব দূর করিলেন। সদ্‌গ্রন্থের বোধ হয় বিশেষত্ব এই, ইহা নিজে পাঠ করিলে আর দশজনকে পড়াইবার বাসনা হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক সরকারের বহু পরিশ্রমলব্ধ-ফলের কিঞ্চিত পরিচয় প্রদান করিব।

উপাদান।

আলোচ্য গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহে অধ্যাপক সরকার যে শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ঐতিহাসিকের অনুকরণীয়। উপকরণের সন্ধানে তিনি দিল্লী, আগ্রা, দাক্ষিণাত্য—প্রকৃত কথা বলিতে কি,—সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। British Museum, India Office—এমন কি Lisbon Academy of Sciences প্রভৃতি হইতে, তিনি ইংরাজী, পর্ত্তুগীজ, হিন্দী, মারাঠী ও ফার্সী, এই পাঁচভাষায় শিবাজী সম্বন্ধে হস্তলিখিত ও মুদ্রিত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বহু অর্থব্যয়ে লণ্ডন হইতে আনীত প্রাচীন ইংরেজ-কুঠির চিঠিপত্রের নকল হইতে অসংখ্য অপূর্ব্বপ্রকাশিত সংবাদ আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উর্ণনাভের জালের ন্যায় জটিল সপ্তদশ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে মারাঠাজাতি বহুসূত্রের মধ্যে অন্যতম; সুতরাং শিবাজীর কার্য্যাবলী ও রাজনীতির কার্য্যকারণ বুঝিতে হইলে মোগল, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আলোচ্য গ্রন্থখানি কেবল শিবাজীর জীবন-চরিত নহে—তাহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী; ইহাতে উপরিউক্ত তিনটী মুসলমান-রাজ্যের সমসাময়িক ইতিহাসও বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অধ্যাপক সরকারের "শিবাজী" ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে শেষ দুইটী অধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ইহাতে লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি, গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পরিস্ফুট। এই দুই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, শিবাজীর শাসন-প্রণালী, বিধি-ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠা, রাজনীতি, কীর্ত্তি, চরিত্র, ও ইতিহাসে তাঁহার স্থান। এতদ্ব্যতীত নিম্ন-লিখিত কয়েকটী অধ্যায়ও অতি সুললিতভাবে লিখিত এবং পড়িতে উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক :—

(১) শিবাজী ও আফ্‌জল্ খাঁ।
(২) আরংজীবের দরবারে শিবাজী।
(৩) শিবাজীর রাজ্যাভিষেক।
(৪) রণপোত ও জলযুদ্ধ।
(৫) শিবাজীর কর্ণাটক-অভিযান।

গ্রন্থের বিশেষত্ব।

আমরা নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থের বিশেষ গুণগুলির উল্লেখ করিলাম :—

(১) ফার্সী উপাদান অবলম্বনে মোগলদিগের সহিত শিবাজীর বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের মৌলিক ও বিস্তৃত বিবরণ।

( ) ইংরেজ-বণিকদিগের সহিত শিবাজীর সজ্ঘর্ষ

* SHIVAJI AND HIS TIMES—Prof. Jadunath Sarcar, M. A., Indian Educational Service (M. C. Sirkar & Sons, Calcutta), pp. 528; Price Rs. 4-

ও সন্ধি, এবং শিবাজীর দরবারে তাঁহাদের বহু দৌত্য-কার্য্যের বিবরণ।

(৩) শিবাজীর রণপোত ও তাঁহার জলযুদ্ধ-ব্যাপারের চিত্তগ্রাহী বিবরণ। এই বিষয়টী বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক; কারণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ সমুদ্র-যাত্রার বিরোধী ছিলেন; অথচ শিবাজী সেই হিন্দু-সমাজের নেতা!

(৪) রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের (Political Philosophy) দিক্ হইতে শিবাজীর রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ও কীর্ত্তিকলাপের নিরপেক্ষ আলোচনা, এবং পারি-পার্শ্বিক ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সহিত তুলনা করিয়া শিবাজীর প্রকৃত মহত্ত্বের অবধারণ।

(৫) ভৌগোলিক বিবরণ; ঘটনাবলীর বিশুদ্ধ কালনির্ণয়; অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় স্থান-সমূহের বৃত্তান্ত এবং তাহাদের সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিচয়।

প্রায় শতাব্দীপূর্ব্বে রচিত, জেম্‌স্ গ্রাণ্ট ডফ্ (James Grant Duff) সাহেবের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ *History of the Mahrattas* প্রকাশিত হইবার পর হইতে শিবাজী সম্বন্ধে সমালোচনাপূর্ণ একখানি নূতন গ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল; কারণ প্রায় এই শতাব্দীকালের মধ্যে বহু মৌলিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সে-সকল তথ্য বিক্ষিপ্তভাবে থাকায়, সাধারণ পাঠক কেন, বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকের পক্ষেও সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য;—এমন কি অনেক সময়ে অসাধ্য ছিল। অধ্যাপক যদুনাথ সেই অভাব পূর্ণ করিলেন। শিবাজী-সম্বন্ধে ডফ্ সাহেবের একমাত্র গ্রন্থে যে-সকল ঐতিহাসিক ভ্রম-প্রমাদ এত দিন নির্ব্বিচারে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাও সংশোধিত, এবং শিবাজী-চরিত্রে নূতন ছায়াপাতও হইল।

ডফ্ সাহেবের গ্রন্থ অতি সুপাঠ্য হইলেও ইহাতে উপযুক্ত উপাদানের একান্ত অভাব। খাফি খাঁ শিবাজীর জন্মের ১০৮ বৎসর পরে গ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু যে যে স্থলে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের যথাযথ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সেই অংশমাত্রই মূল্যবান্। ফার্সী উপকরণের মধ্যে ডফ্ সাহেবের কেবল অবলম্বন ছিল এই খাফি খাঁর গ্রন্থ, এবং জোনাথান্ স্কট্ (Jonathan Scott) কর্ত্তৃক ভীম্‌সেন বুরহানপুরীর জীবনচরিতের আংশিক ইংরেজী অনুবাদ (১৭৯৪ খ্রীঃ)। অপরপক্ষে অধ্যাপক সরকারের অবলম্বন—শাহ্‌জহান্ ও আওরংজীবের সমসাময়িক সরকারী ইতিহাস-নিচয়; বহু প্রয়োজনীয় ফার্সী চিঠি-পত্র; জয়সিংহ ও আওরংজীবের সমগ্র পত্রাবলী; আওরংজীবের দরবারের প্রাত্যহিক বিবরণ-পত্র; ভীম্‌সেনের সমগ্র গ্রন্থ, এবং ঈশ্বরদাস নাগর নামক সেই যুগের অপর এক হিন্দুর লিখিত ফার্সী ইতিহাস।

মারাঠী উপাদানের মধ্যে শিবাজীর জন্মের ১৮৩ বৎসর পরে রচিত চিট্‌নীস্-বখরের উপর ডফ্ সাহেব একটু বেশী আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানি বিচারসঙ্গত গ্রন্থ নহে; পরন্তু ইহাতে গ্রন্থকারের স্বেচ্ছাকৃত বহু ত্রুটি—মিথ্যা বিবরণের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু অধ্যাপক সরকার, শিবাজীর সভাসদ্ কৃষ্ণাজী অনন্তের গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অধিক বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গত ৪০ বৎসরকালের মধ্যে পুণা ও সাতারার বহু ভারতীয় ইতিহাস-সেবকের অক্লান্ত চেষ্টায় সংগৃহীত মারাঠী উপাদান হইতে যাহা মূল্যবান ও প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকন্তু ডফ্‌কে মারাঠী বখরের এক-খানি মাত্র পুঁথির সাহায্যে কাজ চালাইতে হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের যুগে এই সব পুঁথির পাঠান্তরযুক্ত টীকাপূর্ণ মুদ্রিত সংস্করণ পাইবার সুবিধা বিদ্যমান।

বোম্বাই উপকূলের ইংরেজ ও ওলন্দাজ-কুঠির চিঠিপত্র, যদুবাবু নিঃশেষে অনুসন্ধান করিয়া, তাহা হইতে সমস্ত আবশ্যকীয় উপাদান আহরণ করিয়াছেন। ডফ্ ইহার অনেকগুলি ছাড়িয়াছেন।

অধ্যাপক সরকার ঘটনাবলীর বিশুদ্ধ তারিখ, এবং নির্ভুল Government Survey মানচিত্রের সহায়তায়

স্থানগুলির যথার্থ অবস্থিতি নির্ণয় করিয়াছেন; ইহার ফলে ডফ্ সাহেবের গ্রন্থে প্রদত্ত অনেক তারিখ ও স্থানের ভুল সংশোধিত হইয়াছে। এ বিষয়ে দু'একটী উদাহরণ দিব:—

(১) ডফ্ লিখিয়াছেন—"১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ চাকন্ দুর্গ কাড়িয়া লইলেন।" প্রকৃত কথা এই, ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে (see *Shivaji*, p. 88) যখন বিজাপুর-সৈন্য শিবাজীকে দক্ষিণে পানহালা দুর্গে অবরুদ্ধ করিল, ঠিক সেই সময় মোগলেরা উত্তরে চাকন্ দুর্গ ঘেরাও করিল; এই যুগপৎ আক্রমণে শিবাজী দুই দুর্গই হারাইলেন। ইহাই তাঁহার পরাজয়ের স্বাভাবিক ও সরল কারণ। কিন্তু ডফের মতে পানহালা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং চাকন্ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ করা হয়!

(২) ডফের মতে—"দিল্লী হইতে পলাইয়া আসিয়া, ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে শিবাজী পুরন্দরের সন্ধিতে প্রদত্ত দুর্গগুলি মোগলের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন।" প্রকৃত কথা, ১৬৬৭ হইতে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন বৎসর শিবাজী মোগলদিগের সহিত শান্তিরক্ষা করেন এবং ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ঐ সব দুর্গ পুনরধিকার করেন। মুসলমান-ইতিহাস হইতে তারিখগুলি পাওয়া যায়।

(৩) ডফ্ লিখিয়াছেন, বেলবাডী মাদ্রাজের বেলারী জিলায় অবস্থিত; ইহা ভুল। বেলগাঁও জিলা হইবে। (see *Shivaji*, p. 401.)

(৪) পট্টাগড়—ইহা ভুল—(see *Shivaji*, p. 421.)

আর একটা কথা, ডফ্ শিবাজীর শাসন-প্রণালীর (Policy) ভুল বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার একটী কারণ, তিনি খাফি খাঁর একস্থলের ভুল অনুবাদ পাইয়াছিলেন, অথবা অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

অল্পদিন হইল, অধ্যাপক রলিন্‌সন্ (Rawlinson), এবং রাও বাহাদুর ডি, বি, পারসনিস্-প্রদত্ত উপাদান-অবলম্বনে কিন্‌কেড্ (Kincaid) কর্ত্তৃক রচিত শিবাজী সম্বন্ধে দুইখানি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয়ই বহু দোষদুষ্ট। রলিন্‌সন্ কেবল ইংরেজী গ্রন্থের সাহায্যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন —এখনও অনুবাদ হয় নাই, এরূপ ফার্সী বা মারাঠী উপকরণের অভাব তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যমান। কিন্‌কেড্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থের মালমশলা 'চোক বুঁজিয়া' ব্যবহার করিয়াছেন; —বিশিষ্ট সমালোচক রাজবাড়ের (Rajwade) মতে তাঁহার গ্রন্থ 'বহু ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ;—ইহা history নহে—mis-story.' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে কোন অংশে এই দুইখানি ইতিহাস আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে নাই। গ্রন্থদ্বয় মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিত হইলেও, ইহাতে আধুনিক অনুসন্ধানলব্ধ ফলের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই; এই কারণে পণ্ডিতদিগের নিকট আদরলাভ করিতে পারে নাই। অপর পক্ষে, অধ্যাপক সরকার শিবাজী সম্বন্ধে হিন্দী, মারাঠী, ফার্সী, ইংরাজী ও পর্ত্তুগীজ, এই পাঁচটী ভাষার সর্ব্ববিধ হস্তলিপি ও মুদ্রিত উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি এই প্রচুর উপকরণ ব্যবহারকালে যে কৃতিত্ব ও দোষগুণ-বিচার-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। আলোচ্য গ্রন্থে শিবাজী বিষয়ক বহু পৌরাণিকী আখ্যায়িকা যুক্তিতর্কবলে খণ্ডিত, এবং শিবাজীর বিরুদ্ধে অদ্যাবধি-প্রচলিত কয়েকটী অন্যায় অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত একটী তথ্য হইতে একথা পরিস্ফুট হইবে।

শিবাজী চরিত্রে নূতন আলোকপাত।

অধিকাংশ ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়, আফ্‌জল্ খাঁর হত্যাকাণ্ডে শিবাজীকে 'বিশ্বাসঘাতক' প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অধ্যাপক সরকার এ মত গ্রহণ করেন নাই; তিনি লিখিয়াছেন:—

"সহচরেরা নিম্নে দণ্ডায়মান রহিল। শিবাজী উচ্চ-বেদীর উপর আরোহণ করিয়া নতশিরে আফ্‌জল্‌কে অভিবাদন করিলেন। খাঁ তাঁহার আসন হইতে

উত্থিত হইয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহুদ্বয় প্রসারিত করিলেন। খর্ব্বাকার, ক্ষীণকায় মারাঠা তাঁহার শত্রুর কাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। সহসা আফ্‌জল্ তাঁহার বাহু-বেষ্টনীর মধ্যে শিবাজীকে সবলে চাপিয়া ধরিলেন, এবং বাম হস্তে সজোরে শিবাজীর গলা টিপিয়া, দক্ষিণ হস্তে তাঁহার সুদীর্ঘ সোজা ছোরা বাহির করিয়া শিবাজীর পাঁজরে আঘাত করিলেন; কিন্তু অদৃশ্য বর্ম্ম এই আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিল। শিবাজী যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ করিতে লাগিলেন; তাঁহার যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে শিবাজী এই অতর্কিত আক্রমণ হইতে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, এবং তাঁহার বামবাহুর দ্বারা আফ্‌জলের কটি বেষ্টন করিয়া, ইস্পাতের নখের আঘাতে তাঁহার উদর চিরিয়া ফেলিলেন। তারপর দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে আফ্‌জলের বাম পার্শ্ব-দেশে 'বিছুয়াটি' বিদ্ধ করিয়া দিলেন। আহত আফ্‌জলের হস্ত শিথিল হইয়া আসিল; শিবাজী তাঁহার আলিঙ্গন হইতে নিজেকে জোরে মুক্ত করিয়া লইলেন। তারপর বেদী হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নিম্নে অবতরণ করিয়া অনুচরদিগের দিকে ধাবিত হইলেন।"

ভিন্‌সেন্ট এ, স্মিথ্ (Vincent A.Smith) সাহেবের ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও তাঁহার নবপ্রকাশিত *Oxford History of India* পুস্তকে আফ্‌জল্ খাঁর হত্যাব্যাপারে শিবাজীকে বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীরূপে পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"The Maratha professed the most abject submission and threw himself weeping at the general's feet. When Afzal Khan stooped to raise him and embrace him in the customary manner, Sivaji wounded him in the belly, with a horrid weapon called 'tiger's claw', which he held hidden in his left hand, and followed up the blow by a stab from a dagger concealed in his sleeve. The treacherous attack succeeded perfectly." (p. 426.)

আফ্‌জল্ খাঁর হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা মান্‌কর অনূদিত (*The Life & Exploits of Sivaji*—J. L. Manker) সভাসদ্-বখর সাহায্যে রচিত—এ কথা স্মিথ্ সাহেব স্বীয় গ্রন্থের একস্থলে পাদটীকায় (পৃঃ ৪২৬-৭) স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য মারাঠা-ঐতিহাসিকের ন্যায় সভাসদের গ্রন্থেও প্রকাশ, **আফ্‌জলই প্রথমে শিবাজীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন—শিবাজী কেবল আত্মরক্ষাকল্পে তাঁহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।** বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, স্মিথ্ সাহেব সভাসদ্-বখর-সাহায্যে আফ্‌জল খাঁর কাহিনী লিখিত বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াও, ঘটনার প্রথমাংশ, (অর্থাৎ আলিঙ্গনকালে আফ্‌জলের শিবাজীকে গলা টিপিয়া ধরিয়া ছোরা মারিবার কথা) বাদ দিয়া শেষাংশ উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া, শিবাজীকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করিয়াছেন! কিন্তু এরূপ করিবার কোন কারণ তিনি উল্লেখ করেন নাই।

যদি কেহ বলেন, মারাঠী-বখরকারেরা তাঁহাদের জাতীয় বীর শিবাজীর কলঙ্ককাহিনী গোপন করিবার উদ্দেশ্যে আফ্‌জল-চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা হইলে সে মত বিচারসহ হইবে না; কারণ ইংরেজ-কুঠির চিঠিপত্রে প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। শিবাজীর সৈন্যবলের সন্ধান পাইয়া, আফ্‌জল্ খাঁ তাঁহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে বলপরীক্ষা করিতে সাহসী হ'ন নাই। প্রকৃতপক্ষে বিজাপুরের রাজমাতা স্বয়ং আফ্‌জল্‌কে উপদেশ দিয়াছিলেন—শিবাজীর সহিত "বন্ধুত্বের ছলনা" করিয়া, এবং খাঁর অনুরোধে বিজাপুর-রাজ তাঁহার বিদ্রোহিতা ক্ষমা করিতে পারেন, এ আশ্বাস দিয়া, শিবাজীকে হয় বন্দী করিতে, না হয়

হত্যা করিতে চেষ্টা করিবেন। (Factors at Rajapur to Council at Surat, 10th Oct, 1659. F. R Rajapur.)

অধ্যাপক সরকার শিবাজীর অন্ধভক্ত নহেন; সত্যের অনুরোধে তিনি শিবাজীকে হত্যাকারী, অথবা হত্যাকার্য্যের উৎসাহদাতা, বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। জাবলী অধিকার প্রসঙ্গে তিনি শিবাজীকে চন্দ্ররাওর হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন :—

"The acquisition of Javli was the result of deliberate murder and organised treachery on the part of Shivaji." (p. 53.)

সুতরাং আফজলের হত্যাকাণ্ডে শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকিলে, অধ্যাপক সরকারের ন্যায় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু একই মর্ম্মের বহু প্রমাণ বিদ্যমান, যাহার সমবেত সাক্ষ্যের ফলে বলা যাইতে পারে, মিলনকালে আফজলই সর্ব্বপ্রথমে শিবাজীর জীবননাশের চেষ্টা করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

অধ্যাপক সরকার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে 'কেন শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত মারাঠা-রাজ্য স্থায়ী হয় নাই?' এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মারাঠা-রাজ্য অস্থায়ী হইবার কারণগুলির মধ্যে জাতিভেদ-প্রথাকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন। জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে সাধারণ প্রতিবন্ধকগুলি উল্লেখ করিলেও, মারাঠা-রঙ্গমঞ্চের প্রত্যেক অভিনেতার উপর জাতিভেদ কেমন করিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তাঁহার বিবরণ হইতে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না; তবে মারাঠা রাজ্যধ্বংসের মূলে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি যে-সকল কারণ নিহিত, তাহা অধ্যাপক সরকার গ্রন্থের অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আমাদের মনে হয়, ইহার যে-কোন একটীই মারাঠা রাজ্যভঙ্গের যথেষ্ট কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু কোন একটা বিশিষ্ট কারণকে রাজ্যধ্বংসের হেতুস্বরূপ প্রাধান্য দিতে হইলে, যথোপযুক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রয়োগ প্রয়োজন। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে অধ্যাপক সরকার আলোচ্য-প্রসঙ্গের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক-প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করিবেন।

ইতিহাসের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ।

একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন :—"It is useless to fill the minds with dates of great battles, with the births and deaths of kings. They should be 'taught the philosophy of history, the growth of nations, of philosophies, theories and, above all, of the sciences. (*How to Reform Mankind*—G. Ingersoll, p. 21. কথাটা মিথ্যা নহে; কারণ আজকাল সাধারণতঃ আমরা যে সমস্ত ইতিহাস দেখিতে পাই, তাহাতে কেবল রাজকীয় ঘটনাবলী, রাজ্য-পরিবর্ত্তন, যুদ্ধবিগ্রহ এবং তারিখের প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু ইহা লইয়াই কি ইতিহাস?

ঐতিহাসিক যদি কেবল ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার লিখিত ইতিহাস চিত্তগ্রাহী বা বিশেষ মূল্যবান্ হইবে না। সত্যনির্দ্ধারণ ঐতিহাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও এই-খানেই তাঁহার কার্য্য শেষ হইল না; তাঁহাকে অতীতের একটা জীবন্ত চিত্র পাঠক-সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হইবে,—কেবল ঘটনা বিবৃত না করিয়া, তাহার সহিত ঘটনার গূঢ় অর্থ (significatce) দেওয়া আবশ্যক;—অন্তর্দৃষ্টি এমন কি কার্য্যপরম্পরা দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয়, কেন এরূপ ঘটিল,—ঘটনার অভিনেতারা কোন্ উদ্দেশের বশীভূত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে এরূপ synthetic imagination খাটাইবার অধিকার ঐতিহাসিকের আছে। অতীতের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া, সেই জ্ঞান বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মানব-সমাজের পক্ষে উপদেশপ্রদ ও কার্য্যকর করিতে হইবে। অতীতের বাহ্য আবরণ চক্ষের সম্মুখে আনা সহজ;

কিন্তু যিনি তাহার অন্তঃস্থল—হৃদয়টী দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ঐতিহাসিক। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ঐতিহাসিককে ঘটনার সাক্ষী বিচার করিয়া সত্যাসত্য-নির্ণয়ের পর ঘটনা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হয়। এই নির্দ্ধারিত সত্য কতকটা শুষ্ক অস্থিপঞ্জরের মত; ঐতিহাসিক তাহাতে দেহের অন্যান্য উপকরণ ভূষিত করিবেন। কিন্তু বাহ্যদৃশ্যের অন্তরালে অবস্থিত কঙ্কাল যেরূপ প্রাণীর জীবন ধারণ ও চলৎ-শক্তির জন্য অত্যাবশ্যক, সেইরূপ ঐতিহাসিক মত (theory) দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা সঞ্জীবনী শক্তিহীন হইবে।

সুখের বিষয়, প্রকৃত ইতিহাসের অঙ্গীভূত সামাজিক, সাহিত্যিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়-সমাবেশে আলোচ্য গ্রন্থখান উজ্জ্বল। প্রকৃত ঐতিহাসিকের পক্ষে যে সমস্ত গুণ একান্ত প্রয়োজনীয়, অধ্যাপক সরকার তাহার যোগ্যতম অধিকারী। তাঁহার রচিত 'শিবাজী' ভবিষ্যৎ ইতিহাস-সেবকগণের নিকট অমূল্য আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে,—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৌটিল্যের রাজনীতি * (২)

১। রাজধর্ম্ম।

রাজা যাহাতে স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া রাজ্যের অকল্যাণ ও প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না করেন, তদুদ্দেশ্যে সকল দেশে ও সকল যুগেই নানারূপ বিধি বিধানের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপের ইতিহাস এক হিসাবে এই প্রকার বিধিবিধানেরই ইতিহাস মাত্র। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাসেও অনুরূপ বিধি বিধানের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনৈতিক গ্রন্থসমূহে, বিশেষতঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও, এই বিষয়টী আলোচিত হইয়াছে।

এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আছে—সাধারণতঃ অনেকেই তাহা লক্ষ্য করেন না। ইউরোপে বা অন্যান্য দেশে কেবলমাত্র নিষেধমূলক বিধান দ্বারা রাজার শক্তি ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত যাহাতে রাজার প্রকৃতি ও চরিত্র পদানুযায়ী উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা একমাত্র ভারতবর্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই প্রাচীন রাজনীতি-মূলক গ্রন্থে ভবিষ্যৎ রাজার শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত্রগঠন প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। রাজা কুকার্য্য করিতে উদ্যত হইলে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত কিরূপ অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, সকল দেশেরই শাসন-সংক্রান্ত নিয়ম-প্রণালীতে তাহা বিবেচিত হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে রাজার চরিত্র উন্নত হয় এবং তিনি স্বতঃই কুকার্য্য হইতে বিরত হন, এই উদ্দেশ্যে কোনরূপ বিধিবিধান প্রাচীন ভারতবর্ষের দণ্ডনীতি মূলক গ্রন্থেই দেখিতে পাই।

কৌটিল্য এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণে রাজার শিক্ষা ও দীক্ষার আদর্শ চিত্র উপস্থাপিত করা

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ৩৬২ পৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

হইয়াছে। আমরা প্রথমে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়া, পরে রাজনীতির দিক হইতে এবিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য আলোচনা করিব।

কৌটিল্যের মতে চূড়াকর্ম্ম সমাপ্ত হইলেই, লিপি এবং সংখ্যার জ্ঞানলাভ করতঃ, পরে উপনয়নান্তে শিষ্টগণের নিকট ত্রয়ী, সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারীর নিকট বার্ত্তা, এবং বক্তৃ ও প্রযোক্তৃ (১) এই উভয় বিধ আচার্য্যের নিকট দণ্ডনীতি শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষার্থে কি প্রণালীতে জীবন যাপন করিতে হইবে, কৌটিল্য তাহারও বিধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, তৎপরে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ জ্ঞানবৃদ্ধগণের নিকটে নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইবে—পূর্ব্বাহ্নে হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অস্ত্র-বিদ্যা, এবং অপরাহ্ণে ইতিহাস অর্থাৎ পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি। অন্য সময়ে নূতন পাঠ গ্রহণ, পুরাতন পাঠের আবৃত্তি ও যে সমুদয় বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই গুরুর নিকট তাহা পুনঃ, পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। কারণ শ্রুতি হইতে প্রজ্ঞা জন্মে, প্রজ্ঞা হইতে যোগ এবং যোগ হইতে আত্মবত্তা—এইরূপে বিদ্যার চরম সার্থকতা হয়।

কিন্তু কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করিলেই শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হইল না। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়জয় শিক্ষা করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে বিদ্যার সার্থকতা হইতে পারে না। অতএব কাম ক্রোধ লোভ মান মদ হর্ষ প্রভৃতি পরিহার করিয়া, ইন্দ্রিয় সমূহকে স্ববশে আনিতে হইবে, কারণ শাস্ত্র মাত্রেরই চরম লক্ষ্য ইন্দ্রিয়জয়। এইরূপে ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া পরস্ত্রী পরদ্রব্য ও পরহিংসা বর্জ্জন করিতে হইবে। স্বপ্নেও লালসার বশীভূত হইবে না এবং অসত্য, উদ্ধত, ধর্ম্মহীন ও অনর্থকর ব্যবহার ও কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইহার যে কোন একটির প্রতি অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকিলে তাহা কদাচ সুখের হেতু হইবে না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে রাজার আদর্শ শিক্ষার যে চিত্র উদ্ধৃত করা হইল, প্রাচীন রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ মাত্রেই তাহার অনুরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।—কামন্দক প্রণীত "নীতিসার" গ্রন্থের প্রথম তিনটী প্রকরণ এই বিষয় লইয়া লিখিত। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে, শুক্রনীতির প্রথম অধ্যায়ে, গৌতমধর্ম্মসূত্রের একাদশ অধ্যায়ে, যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত রাজধর্ম্ম নামক পর্ব্বাধ্যায়েও অনুরূপ বিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এই সমুদয়ই কি কেবলমাত্র সাধু উপদেশ রূপেই এই গ্রন্থ সমূহে স্থানলাভ করিয়াছে, অথবা রাজার এই শিক্ষার সহিত রাজনীতির কোন গূঢ় যোগাযোগ আছে ?

সৌভাগ্যের বিষয়, কৌটিল্যের গ্রন্থ হইতেই এবিষয়ে মীমাংসা করা যায়। অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণের সপ্তদশ অধ্যায়ে কৌটিল্য স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, রাজপুত্রের সমুচিত শিক্ষালাভ হয় নাই, তিনি রাজ্যের অধিকারী নহেন। রাজার যদি একটি মাত্র পুত্র থাকে এবং এই পুত্র সমুচিত শিক্ষা লাভ না করে, তবে যাহাতে রাজার অন্য পুত্র হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। অভাব পক্ষে রাজ-কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করাইতে হইবে। রাজা যদি বৃদ্ধ বা জরাগ্রস্ত হন এবং তাঁহার পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে বরং তাঁহার মাতামহ অথবা জ্ঞাতিকুলের কোনও ব্যক্তি, অথবা সামন্ত রাজ-গণের মধ্যে সদ্গুণ-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি দ্বারা রাজ-মহিষীর গর্ভে নিয়োগ-প্রথা দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইবে,

(১) যাঁহারা কেবলমাত্র কথা দ্বারা দণ্ডনীতির ব্যাখ্যা করেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা বক্তৃ, এবং যাঁহারা প্রয়োগদ্বারা এই নীতির তাৎপর্য্য বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করান তাঁহারাই প্রযোক্তৃ, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কদাচ অশিক্ষিত রাজপুত্রকে রাজ্যে স্থাপনা করিবে না। (২)

কথাটি ভাবিবার বিষয়। কৌটিল্য, প্রজাগণের জননীতুল্যা রাজমহিষীর গর্ভে, অপর ব্যক্তি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করাইতে বিধি দিয়াছেন; কিন্তু তথাপি অশিক্ষিত অসচ্চরিত্র রাজপুত্রের সিংহাসনের দাবী স্বীকার করেন নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, তৎকালে রাজার পুত্র হইলেই কাহারও সিংহাসনে অধিকার জন্মিত না, সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্র দ্বারা সিংহাসন-লাভের উপযোগিতা প্রমাণ করিতে হইত। অতএব রাজনৈতিক গ্রন্থ সমূহে রাজার শিক্ষা দীক্ষার যে সমস্ত বিধি বিধান দেখা যায়, তাহা কেবল সাধু উপদেশ মাত্র নহে—রাজনীতির সহিত তাহার যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। অবশ্য বাস্তব জগতে ব্যবহার ক্ষেত্রে, সর্ব্বদাই এই প্রথা অনুসৃত হইত কিনা তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা যে নীতি হিসাবে স্বীকৃত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌সের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুশ্চরিত্রের বিষয় পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলেও ইংলণ্ডের লোক তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু কৌটিল্যোক্ত নীতি তথায় প্রচলিত থাকিলে ইহা অনায়াসেই সম্ভবপর হইত; এবং প্রায় তিন বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে যে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই রোধ করা যাইত। জেম্‌স্ সিংহাসনে আরোহণ করিবেন এই সম্ভাবনা মাত্রেই ইংলণ্ডের জনসাধারণ কিরূপ সংক্ষুব্ধ ও আশঙ্কান্বিত হইয়াছিল, তাঁহার উৎপীড়ন হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ পূর্ব্ব হইতেই কিরূপ আয়াস সহকারে বিধিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তাঁহারা কুশিক্ষা ও অসচ্চরিত্রের দোহাই দিয়া জেম্‌সকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই, কারণ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে রাজার অধিকার সম্বন্ধে রাজমন্ত্রী কৌটিল্য যে উদার নীতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতেও ইংলণ্ডে তাহা গৃহীত হয় নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, রাজশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সমুদয় বিধি ও বিধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, রাজার শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা ও তদনুযায়ী সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্র লাভ করিতে না পারিলে কেহ রাজ সিংহাসনের দাবী করিতে পারিবেন না, এই উদারনীতির প্রবর্ত্তন তাহাদের অন্যতম। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিলেও রাজা যে সকল সময়েই প্রজাবর্গের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্য করিবেন, এরূপ ভরসা করা যায় না। সাময়িক উত্তেজনা, অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালন জনিত মদমত্ততা, কুলোকের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে রাজা অত্যাচারী হইতে পারেন। এই নিমিত্ত, যাহাতে তিনি শক্তির অপব্যবহার না করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা দুই প্রকার। প্রথমতঃ মন্ত্রিপরিষদ্ স্থাপনা, দ্বিতীয়তঃ রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ নিরূপণ এবং প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের অঙ্গীভূত-কারণ। আমরা ক্রমে এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা করিব।

মন্ত্রিপরিষদ্ জিনিষটি বুঝিতে হইলে, দুই একটি গোড়ার কথা জানা দরকার। বৈদিক যুগে রাজার শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য "সভা" ও "সমিতি" নামে দুইটী প্রতিষ্ঠান ছিল। অনুমান হয় যে স্থানীয় ব্যাপারের মীমাংসার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে "সভা" থাকিত, আর "সমিতি" রাজ্যের কেন্দ্রস্থানে সমগ্র প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ সমুদয় প্রয়োজনীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই সমিতির গঠনপ্রণালী, এবং ইহার বিশিষ্ট

(২) বুদ্ধিমানাহার্য বুদ্ধির্দুর্ব্বুদ্ধিরিতি পুত্রবিশেষাঃ। শিষ্যমাণো ধর্মার্থাবুপলভতে চানুতিষ্ঠতি চ বুদ্ধিমান্। উপলভমানো নানুতিষ্ঠত্যাহার্য বুদ্ধিঃ। অপায়নিত্যো ধর্মার্থদ্বেষী চেতি দুর্বুদ্ধিঃ। স যদ্যেকপুত্রঃ পুত্রোৎপত্তাবস্য প্রযতেত। পুত্রিকাপুত্রানুৎপাদয়েদ্বা। বৃদ্ধস্তু ব্যাধিতো বা রাজা মাতৃবন্ধুতুল্য (কুল্য) গুণবৎসামন্তানামন্যতমেন ক্ষেত্রে বীজমুৎপাদয়েৎ। নচৈকপুত্রমবিনীতং রাজ্যে স্থাপয়েৎ।

প্রকৃতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কিন্তু ইহার সদস্য সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প ছিল না, ইহার ক্ষমতার নিকট রাজশক্তি সন্ত্রস্ত থাকিত, ইহাতে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা ও তদুপলক্ষে তীব্র বাদ প্রতিবাদ হইত এবং নেতৃস্থানীয়গণ ইহার সদস্যগণকে নিজ মতে আনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা, এমন কি যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তুকতাক্ প্রভৃতিও করিতেন, বৈদিকসূত্র হইতে তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। (৩)

অ্যাংগ্লোস্যাক্সন জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, তাহাদের জাতীয় সমিতি ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া (Privy Council) প্রিভি কাউন্সিলের আকার ধারণ করে। রাজা এই কাউন্সিল হইতে কয়েক জনকে বাছিয়া লইয়া Cabinet বা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অনুমান হয় যে অনুরূপ বিবর্ত্তনের ফলে, বৈদিক "সমিতি" "মন্ত্রিপরিষদে" পরিণত হয়, এবং এই পরিষদ হইতে বাছাই করিয়া কয়েকজনকে লইয়া রাজা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কারণ শান্তিপর্ব্বের ৮৫ অধ্যায়ের ষষ্ঠ হইতে ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, চারিজন ব্রাহ্মণ, আটজন ক্ষত্রিয়, একুশ জন বৈশ্য এবং তিন জন শূদ্রকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া, তন্মধ্যে সুদক্ষ আট জন মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক রাজা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সমিতির উল্লেখ নাই, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের কথা আছে। মন্ত্রিপরিষদ যে সম্মিলিত 'মন্ত্রিবর্গ হইতে একটি' স্বতন্ত্র জিনিষ, তাহা কৌটিল্যের নিম্নলিখিত সূত্র হইতে জানা যায়।

"আত্যয়িকে কার্য্যে মন্ত্রিণো মন্ত্রিপরিষদং চাহূয় ব্রূয়াৎ" (২৯পৃঃ)। এই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন কালের অর্থশাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে বার জন, কাহারও মতে ষোল জন এবং কাহারও মতে বা কুড়ি জন অমাত্য লইয়া এই মন্ত্রিপরিষদ গঠন কর্ত্তব্য। কৌটিল্য বলেন যে এ সম্বন্ধে কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই মন্ত্রিপরিষদের কার্য্য কি, তাহা কৌটিল্য নিম্নলিখিত সূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"তেহস্য স্বপক্ষং পরপক্ষং চ চিন্তয়েয়ুঃ। অকৃতারম্ভমারব্ধানুষ্ঠানমনুষ্ঠিতবিশেষং নিয়োগসম্পদং চ কর্ম্মণাং কুর্য্যুঃ।" (২৯ পৃঃ)—অর্থাৎ তাঁহারা রাজার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই উভয় বিষয়ই চিন্তা করিবেন। অনারব্ধ কার্য্যের আরম্ভ, আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তি, ও কৃত কার্য্যের উৎকর্ষ বিধান, এবং এতদ্ব্যতীত যে সমুদয় বিশেষ কার্য্যের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হয় তাহার সফলতা সম্পাদন করিবেন। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে—তাঁহারা রাজ্যের যাবতীয় গুরুতর কার্য্যেরই তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কৌটিল্য লিখিয়াছেন—"আসন্নৈঃসহ কার্য্যাণি পশ্যেৎ। অনাসন্নৈঃসহ পত্র সম্প্রেষণেন মন্ত্রয়েত।" (২৯ পৃঃ)

অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের যে সমুদয় সদস্যগণ উপস্থিত থাকিবেন, রাজা তাঁহাদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিবেন। যদি কেহ অনুপস্থিত থাকেন, তবে পত্রদ্বারা তাঁহাদের মত লইতে হইবে। এইরূপে উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের মত লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। বিশেষ কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে মন্ত্রি ও মন্ত্রিপরিষদ্ এই উভয়ের যুক্ত অধিবেশনে রাজা বিষয়টি উপস্থিত করিতেন। এই অধিবেশনে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য্য করা হইত। যথা "আত্যয়িকে কার্য্যে মন্ত্রিণো মন্ত্রিপরিষদং চাহূয় ব্রূয়াৎ। তত্র যদ্ভূয়িষ্ঠাঃ কার্য্যসিদ্ধিকরং বা ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ।" মন্ত্রিপরিষদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে ইহা দ্বারা রাজশক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হইত।

দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রিগণও যে রাজশক্তি সংহত করিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ আছে। কৌটিল্য একস্থানে লিখিয়াছেন যে, রাজা যদি কোন বিষয়ে

---

(৩) যাঁহারা সভা ও সমিতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা মৎপ্রণীত "Corporate Life in Ancient India" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন।

কেবলমাত্র দুই জন মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করেন, তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে—কারণ এই দুই ব্যক্তি একত্র হইয়া রাজাকে পরাভূত করিতে পারেন"(৪)। ইহা হইতে অনুমিত হয় সে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ-কালে অধিকাংশের মত দ্বারাই সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইত। সুতরাং মন্ত্রিগণও মন্ত্রিপরিষদের ন্যায় রাজশক্তি সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ কি, তাহা কৌটিল্য নিম্নলিখিত শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্॥"
(৩৯ পৃঃ)।

অর্থাৎ প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার হিতেই রাজার হিত। যাহা কেবলমাত্র নিজের প্রিয় তাহা নহে, পরন্তু যাহা প্রজাগণের প্রিয় তাহাই তিনি সম্পন্ন করিবেন।

আর এই প্রকার প্রজার হিতকল্পে আত্মশক্তি নিয়োগ করিলেই যে রাজা যাগ যজ্ঞ ব্রতাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিতে পারেন, তাহাও কৌটিল্য ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

"রাজ্ঞো হি ব্রতমুত্থানং যজ্ঞঃ কার্য্যানুশাসনম্।
দক্ষিণা বৃত্তিসাম্যং (৫) চ দীক্ষিতস্যাভিষেচনম্॥
(৩৯ পৃঃ)।

অর্থাৎ "রাজকার্য্যে উদ্যমই রাজার ব্রত, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাহার যজ্ঞ, প্রজাগণের জীবিকানুষ্ঠানই দক্ষিণা, এবং সকলের প্রতি সমব্যবহারই দীক্ষা স্নান।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ লোক যজ্ঞ ব্রতাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান যথাযথ সম্পন্ন করিয়া যে পুণ্যফলের অধিকারী হয়, সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করিয়াই রাজা তাহার অধিকারী হইতে পারেন ; তাঁহার অন্যরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

অন্যত্র কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা সৈন্যদিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিবেন যে, "তুল্য-বেতনোঽস্মি"—"আমিও তোমাদের ন্যায় (রাজ্যের) বেতনভোগী ভৃত্যমাত্র।" (পৃঃ ৩৬৭)

কৌটিল্য রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে আদর্শ চিত্র আঁকিয়াছেন, মৌর্য্যরাজ অশোকের শিলালিপিতে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার ষষ্ঠ গিরিলিপিতে উক্ত হইয়াছে—

"আমি যেরূপ পরিশ্রম করি বা তৎপরতার সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করি তাহা আমি যথেষ্ট মনে করি না —কারণ সর্ব্বলোকের হিত করাই আমি কর্ত্তব্য মনে করি এবং উদ্যম অধ্যবসায় ও তৎপরতার সহিত কার্য্য সম্পাদনই ইহার মূল (অর্থাৎ এই সমুদয় ব্যতীত ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না)। সর্ব্বলোকের হিত-সাধন অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য নাই। আমি যে উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে রাজকার্য্য করি তাহার উদ্দেশ্য কি? যাহাতে আমি সর্ব্বভূতের নিকট অঋণী হইতে পারি, যাহাতে তাহারা ইহলোকে সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে।"

অশোকের উক্তির মূলে রাজনীতির দুইটি মূল তথ্য নিহিত আছে। প্রথমতঃ প্রজার হিতসাধন করাই রাজার কর্ত্তব্য তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই কর্ত্তব্যের মূলে রাজার যে একটি গুরুতর দায়িত্ব বিদ্যমান তাহারও উল্লেখ আছে। অশোক বলিয়াছেন যে এইরূপ কার্য্যদ্বারা তিনি সর্ব্বভূতের ঋণ পরিশোধ করেন মাত্র—অর্থাৎ সর্ব্বভূতেরই যেন রাজার নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার পাওয়ার দাবী আছে।

(৪) "দ্বাভ্যাং মন্ত্রয়মাণো দ্বাভ্যাং সংহতাভ্যামবগৃহ্যতে।"
(২৮ পৃঃ)

(৫) শ্রীযুক্ত শ্যাম শাস্ত্রী 'বৃত্তিসাম্য' এই কথাটির অনুবাদ করিয়াছেন "equal attention to all" এবং ইহাকে দক্ষিণা ও দীক্ষার সহিত তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু এই অর্থটি সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য আমি বৃত্তিঃ সাম্যং এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া ধরিয়া, 'দক্ষিণা'র সহিত 'বৃত্তির' এবং 'দীক্ষা স্নানের' সহিত 'সাম্যভাবে'র তুলনা করিয়াছি। ইহাতে অর্থও সুসঙ্গত হয় এবং দক্ষিণা ও দীক্ষা স্নান এই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের সহিত একই জিনিষের তুলনা না করিয়া দুইটি ভিন্ন জিনিষের সহিত সাদৃশ্য দেখান যায়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অশোকের উল্লিখিত উক্তির সামঞ্জস্য দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, মৌর্য্য-যুগে রাজার আদর্শ অতি উন্নত ছিল। পূর্ব্বে রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে কৌটিল্যের যে মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে এই আদর্শ সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুকূল। কারণ ঐ মতবাদ অনুসারে রাজা প্রজাগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র, তিনি রাজ্য সংরক্ষণ ও প্রজাবর্গের ধনমান রক্ষা করিবেন এই সর্ত্তে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই মতবাদটি যে তৎকালে সর্ব্বজন-গৃহীত সুপরিচিত তথ্য ছিল, কৌটিল্যের উল্লিখিত উক্তিসমূহ ও অশোকের ষষ্ঠ শিলালেখই তাহার প্রমাণ।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে নরপতিগণ স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন ছিলেন না। সাধারণে গৃহীত মতবাদ অনুসারে তাঁহারা প্রজাগণের রক্ষণার্থ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র রূপে পরিগণিত হইতেন। রাজা ও রাজনীতিকারগণ উভয়েই ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাতে বাস্তব জগতে কর্ম্মক্ষেত্রে রাজা এতদনুযায়ী জীবন যাপন ও প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করেন, তদুদ্দেশ্যে বিধি ও বিধানেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। ধর্ম্মগতপ্রাণ হিন্দুলেখকগণ একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, যাগ যজ্ঞ ব্রতাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে পুণ্য, একমাত্র প্রজাপালন করিলেই রাজা সে সমুদয়ের অধিকারী হইতে পারেন। যেরূপ শিক্ষালাভ করিলে রাজা দায়িত্বপূর্ণ গুরু কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ছিল এবং এইরূপ শিক্ষা লাভ না করিতে পারিলে কেহ রাজপদের অধিকারী হইতেন না। রাজপদ লাভ করিয়াও যাহাতে সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ রাজা কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট না হইতে পারেন, তাহারও বিধান ছিল।

অতঃপর রাজার সাধারণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। রাজপ্রণিধি নামক অধ্যায়ে (৩৭ পৃঃ) কৌটিল্য এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং দিন ও রাত্রি এই উভয়কে আটভাগে বিভক্ত করিয়া, নালিকা নামক এই প্রত্যেক বিভাগে রাজার কি কর্ত্তব্য তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাজা দিবসের প্রথম নালিকায় রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিধি বিধান, এবং আয় ব্যয় এই সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিবেন (৬)। দ্বিতীয় নালিকায় পৌর ও জানপদ-বর্গের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তৃতীয় নালিকায় স্নান আহার ও অধ্যয়নাদি সম্পন্ন করিবেন। চতুর্থ নালিকায় রাজস্ব গ্রহণ ও বিভিন্ন শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষ নিয়োগ করিবেন। পঞ্চম নালিকায় মন্ত্রিপরিষদের সহিত মন্ত্রণার উদ্দেশ্যে পত্রাদি লিখিবেন এবং গুপ্তচর-গণের নিকট হইতে সংবাদাদি জ্ঞাত হইবেন। ষষ্ঠ নালিকায় আমোদ প্রমোদ অথবা নানা বিষয় নিজে নিজে চিন্তা করিবেন। সপ্তম নালিকায় হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক প্রভৃতি পরিদর্শন করিবেন। অষ্টম নালিকায় সেনাপতির সহিত যুদ্ধাদি বিষয়ে পরামর্শ করিবেন। দিবসান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া রাত্রির প্রথম নালিকায় গুপ্তচরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। দ্বিতীয় নালিকায় স্নান, আহার ও অধ্যয়নাদি করিবেন। তৃতীয় নালিকায় শয়নঘরে প্রবেশ করিবেন এবং চতুর্থ ও পঞ্চম নালিকায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিবেন। ষষ্ঠ নালিকায় তূর্য্যধ্বনি দ্বারা জাগরিত হইয়া শাস্ত্র ও স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিবেন। সপ্তম নালিকায় রাজকার্য্য চিন্তা ও গুপ্তচর প্রেরণ করিবেন। অষ্টম নালিকায় ঋত্বিক, আচার্য্য ও পুরোহিত-গণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসক, প্রধান পাচক এবং জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পরে সবৎসা ধেনু ও বলীবর্দ্দকে প্রদক্ষিণ করিয়া সভাস্থলে গমন করিবেন।

---

(৬) "রক্ষাবিধানমায়ব্যয়ৌ চ শৃণুয়াৎ (৩৭পৃঃ)। শ্রীযুক্ত শ্যাম-শাস্ত্রী ইহার অনুবাদ করিয়াছেন---"He shall post watchmen and attend to the accounts of receipts and expenditures."

সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দর্শনপ্রার্থিগণের নিবেদন শ্রবণ করিবেন এবং দেবতা, আশ্রম, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, পশু, তীর্থক্ষেত্র, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, ব্যসনগ্রস্ত, অনাথ ও স্ত্রীলোকের সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিবেন।

অবশ্য এই সমুদয় নিয়ম যে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে হইবে, কৌটিল্য এরূপ বিধান করেন নাই। আবশ্যক হইলে রাজা ইহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনও করিতে পারিতেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

হেমচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ত্রয়োবিংশ সর্গ। দ্বাবিংশ সর্গে রুদ্রপীড়ের অপূর্ব্ব সংগ্রামের বিবরণে কবি যেমন বীররসের অবতারণা করিয়াছেন, ত্রয়োবিংশ সর্গে তেমনই করুণরসের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন, "রুদ্রপীড়ের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বীর বৃত্রের গম্ভীর কাতরতা এবং দেম্ব হিংসা-পূর্ণা ঐন্দ্রিলার তেজোগর্ভ অমর্ষসূচিত রোদন উভয়ই কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল।" মাননীয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকার মহাশয়া লিখিয়াছেন, "রুদ্রপীড়ের মৃত্যু হইলে শব দেখিয়া ঐন্দ্রিলা যে বিলাপ করিতেছে, তাহা অত্যন্ত মর্ম্মভেদী—

> কে হরিলা? কারে দিলা, ওহে দৈত্যরাজ
> আমার অমূল্যনিধি? হৃদয় মাণিক!
> আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার
> দৈত্যনাথ আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম।
>
> * * *
>
> এজগৎ মাঝে
> মা বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর?
> 'ধরাসনে নহে, বস জননীর কোলে'
> বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া
> তিন্দ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম,
> দৈত্যপতি এনে দাও সে ধন আমার।

কি সুন্দর! ঐশ্বর্য্যের গরিমা ও ভোগ-বিলাসের অতৃপ্ত বাসনা যে প্রাণকে পাষাণের মত কঠিন করিয়াছিল, আজ শোকের দারুণ প্রহারে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া জননীর রক্তমাংসময় স্বাভাবিক উত্তপ্ত হৃদয়ের ধারা ছুটিয়া বাহির হইয়াছে! পুত্রহন্তার প্রতি ঐন্দ্রিলার প্রতিহিংসা কি উগ্র!

> কি কব হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
> সংগ্রামের প্রকরণ, ঐন্দ্রিলা কামিনী!
> নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন,
> ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে?
> জ্বালাতাম ঘোর শিখা চিত্ত দহে যাহে
> সেই তস্করের চিত্তে, জায়া-চিত্তে তার
> জ্বালাতাম পুত্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর,
> জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা।"

পুত্রশোকাতুর বৃত্র ঐন্দ্রিলাকে বিলাপ করিতে নিষেধ করিলেন—

> বিলাপি এখন,
> চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর মহিষি।"

এবং

> স্ফুরিত নাসিকা,
> বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি
> ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে,
> সাজ রে দানববৃন্দ সংহারের রণে।"

সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "এই রণসজ্জা অতিশয় ভয়ঙ্করী। পরদিন সূর্য্যোদয়ে রণ হইবে—দানবপুরীতে সেই কালরজনীতে ভীষণ রণসজ্জা হইতে লাগিল। পরদিন দানবকুল ধ্বংস হইবে। আমরা সেই ভয়ঙ্করী রণসজ্জার কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—দুঃখ

রহিল। কৃতান্তের "কালছায়া আসিয়া সেই পুরীর উপর পড়িয়াছে—গভীর মানসিক অন্ধকারে অসুরপুরী গাহমান হইয়াছে কাল-সমুদ্র উদ্বেগোন্মুখ দেখিয়া কূলস্থ জন্তু সমূহের ন্যায় অসুর পুরমহিলাগণ বিত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগামী বৃত্রসংহারের করালছায়া অসুরের গৃহে গৃহে পড়িয়াছে।"

চতুর্ব্বিংশ সর্গ। এই সর্গে বৃত্রবধ ও কাব্য সমাপ্তি। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বৃত্রসুত শরাঘাতে কাতর দেবগণকে পটগৃহে আহ্বান করিলেন। তিনি বৃত্রবধের অব্যর্থ অস্ত্র বজ্র পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মদিবা শেষ না হইলে বৃত্র নিপাত হইবে না, এক্ষণে বৃত্রকে নিবারণ করা যাইবে কিরূপে? সূর্য্য বলিলেন, তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বজ্রনিক্ষেপ করা হউক

অদৃষ্ট লিখন
কে বলে খণ্ডিত নয়? সুযোগে সকলি
শুভফল।

ইন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন কিন্তু সূর্য্য কিছু ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, ইন্দ্রকে বহুনিন্দা করিয়া কহিলেন যে তিনি ভীরু, কুমেরু গহ্বরে এতদিন লুকাইয়া ছিলেন, তাই তিনি দেবগণের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। বরুণ সূর্য্যের দর্পিত বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—

লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি।

গৃহবিচ্ছেদের উপক্রম দেখিয়া ইন্দ্র পুনরায় শান্ত বাক্যে বুঝাইলেন—

গৃহ-বিসংবাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগৎ মাঝে:
বিপদের কালে মনোমিলনই সম্পদ।
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ ভুঞ্জিতে?

ইন্দ্র যখন যুদ্ধযাত্রার জন্য উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিলেন, তখন সুহাসিনী চপলা, শচীর কুশলবার্ত্তা লইয়া তথায় আগমন করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ মত এইস্থানে হেমচন্দ্র লাবণ্যরাণী চপলার সহিত তেজঃকুলরাজ স্বপ্রের বিবাহ দিয়াছেন।

তাহার পর দেবদানবের আশ্চর্য্য রণ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, যুদ্ধবর্ণনায় হেমচন্দ্র মধুসূদন অপেক্ষা সুপটু—

হেনকালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,
নাচিল বীরের হিয়া। লহরে লহরে
সাগর-তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল
দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার,
চলিল দনুজ দল সেনানী চালনে!
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকার!
ঝক্‌ঝক কিরণ চমকে অস্ত্র'পরে,
রথধ্বজা কলসে, তনুত্রে, ধনুহূলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া।

মহাসংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র ও জয়ন্তের পরাভবার্থ বৃত্র শৈবশূল নিক্ষেপ করিলেন—

ছুটিল ভৈরব শূল ভীমমূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে। হেনকালে হায়,
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে,
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য কোলে!

শূল ব্যর্থ দেখিয়া বৃত্র "হা শম্ভু তুমিও বাম!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পরে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রণসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিলেন—

ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী,
ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়ে!
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ!

উজাড় স্বর্গের বন উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ তারাদল
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
উছলিল কত সিন্ধু কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ রেণু প্রায়!
সে চীৎকারে সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র সূর্য্য শূন্য গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়া
ছুটিতে লাগিল ভয়ে রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মলোকে!—সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন! মহাকাল
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠ দ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র হে সুরপতি দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র বিশ্ব লোপ হয়।"

তখন ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করিলেন।

ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্যপথে
উনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিগ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল।
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল শরীর
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য. ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে—পড়িল অসুর
বিন্ধ্যাধরাধর যেন পড়িল ভূতলে।
বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি।
বহিল বৃত্রের শ্বাস প্রলয়ের ঝড়
"হা বৎস হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে,
মুদিল নয়নদ্বয় দুর্জ্জয় দানব!

এইরূপে স্বর্গজয়ী বীর বৃত্র তাহার দাম্ভিকতা ও অত্যাচারের প্রতিফল পাইল। আর ঐন্দ্রিলার কি হইল? তাহার পরিণাম কবি কাব্যশেষে তিনটি ছত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কি ভীষণ—

দহিল ঐন্দ্রিলা চিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে
চিরদীপ্ত চিতা যথা। ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে।

এইখানে, বৃত্রসংহার সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথমখণ্ড পাঠের পর বাঙ্গালা পাঠক সম্প্রদায় যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা অতিমাত্রায় পূর্ণ হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। হেমচন্দ্র পূর্ব্বেই বাঙ্গালার তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৃত্রসংহার সম্পূর্ণ হইবার পর ইহা সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, তিনি যে কেবল তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান কবি তাহাই নহে, তাঁহার আসনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন এরূপ কবিও শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিবেন না।

আমরা এপর্য্যন্ত কেবল পাঠকগণের সহিত বৃত্র-সংহার পাঠ করিয়া আসিয়াছি—সমালোচকের দৃষ্টিতে তাহার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই। অনেক জিনিষ, যাহা দূর হইতে দেখিতে সুন্দর, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তাহা বহুদোষের আকর বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু বৃত্রসংহার সেরূপ কাব্য নহে। বৃত্রসংহার সমালোচনার ধৃষ্টতা বা ক্ষমতা আমাদিগের নাই, কিন্তু যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি সূক্ষ্মসমালোচনা-শক্তির জন্য চিরদিন বাঙ্গালায় বরণীয় থাকিবেন, তাঁহারা সকলেই সমস্বরে এই কাব্যের প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে তাঁহাদিগের অভিমতগুলির আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

মোগলযুগে স্ত্রীশিক্ষা।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। ডবলক্রাউন, ৪৪+৫ পৃষ্ঠা : "মানসী" প্রেসে মুদ্রিত এবং ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০

পুস্তকখানির ছাপা সুন্দর, কাপড়ে বাঁধা মন্দ নহে; ইহাতে ৪ খানি সুন্দর ও দুর্ল্লভ হাফটোন ছবি আছে; তন্মধ্যে নূরজহানের চিত্রখানি অভিনব হইলেও প্রামাণিক এবং মনোরম। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী কর্ত্তৃক পুস্তকের প্রচ্ছদপটটি অঙ্কিত হইয়াছে।

আধুনিক সময়ে যে-সকল উদীয়মান লেখক বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক বিষয়ে সুনিপুণ লেখনী পরিচালনা করিয়া ধন্য ও খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার "বাঙ্গলার বেগম" আজকাল সর্ব্বত্র সুপরিচিত। আনন্দের বিষয়, উহার একখানি ইংরাজী অনুবাদও বাহির হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু মোগল যুগের ইতিহাস বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও অধিগত করিয়াছেন; বর্ত্তমান ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সেই জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় দিতেছে।

হিন্দু বৌদ্ধযুগের ইতিহাস পড়িতে গেলে, যেমন পদে পদে উপাদানের অভাব অনুভব করিতে হয়, মুসলমান যুগের ইতিহাসে তাহা নহে। প্রত্যেক মুসলমান রাজবংশের পৃথক্ ইতিবৃত্ত-লেখক ছিল। ভারতবক্ষে আজ যেমন বহুস্থানে মুসলমান-যুগের স্থাপত্য-নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য কীর্ত্তিমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনই সে যুগের ইতিহাস-চর্চ্চার নিদর্শনে ভারতীয় সাহিত্যে এক নূতন বন্যা আসিয়াছে। কিছুদিন হইতে "ঢাকা রিভিউ" পত্রে আমি "মুসলমান ঐতিহাসিক" শীর্ষক প্রবন্ধ-নিচয়ে উহার প্রকৃষ্ট আভাস দিয়াছি। মুসলমানযুগে সত্য সত্যই উপাদানের অভাবে নহে, বরং প্রাচুর্য্যে ঐতিহাসিককে পরিশ্রান্ত হইতে হয়।

সেই ঐতিহাসিকগণের সংখ্যা আবার সর্ব্বাপেক্ষা মোগল-যুগেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাদশাহ্গণের বিদ্যোৎসাহিতা এবং বিশেষতঃ ইতিহাস-রসিকতাই উহার প্রধান কারণ। বর্ত্তমান যুগে সহিষ্ণু লেখকগণ এই প্রাচুর্য্য-সাগরে সমুত্তীর্ণ হইয়া জগৎভরা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমরা অন্ততঃ তিনজনের নাম করিতে পারি। অশীতিপর বৃদ্ধ মহামতি বিভারিজ 'আকবর-নামা'র বিরাট্ অনুবাদে এবং অসংখ্য সারগর্ভ প্রবন্ধে মোগলযুগে দিবালোকভাতি প্রতিফলিত করিয়াছেন; বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ সর্ব্ববিধ উপাদানের সদ্ব্যবহার করতঃ সম্প্রতি বাদশাহ্ আকবর সম্বন্ধে এক বিরাট্ গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাদের দৃষ্টি-পরিধি বহু বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন; আর আমার ও ব্রজেন্দ্রবাবুর উভয়ের গুরুকল্প ইতিহাসাচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয় কঠোর অধ্যবসায় ও মৌলিক গবেষণার ফলে বাদশাহ্ আওরংজীব ও তৎসাময়িক ইতিহাসের উপর অসাধারণ আলোকপাত করিয়াছেন। ইঁহাদের ও অন্যের শ্রমের সহায়তা গ্রহণ করিয়া ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষায় বহুগ্রন্থ লিখিত হইবে। তন্মধ্যে আলোচ্য পুস্তকখানির নাম করা যাইবে।

মুসলমান-ঐতিহাসিকেরা কেবল যে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা অনেকে সংগৃহীত তথ্যমালা বহু বিচারে এবং বহু সংস্কারের পর লিপিবদ্ধ করিতেন। আবুল-ফজলের thoroughness সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, এবং আরও প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি এবং তাঁহার প্রভু আকবরের একটা উৎকট অনুসন্ধিৎসা a flair for research ছিল। আবুল-ফজল পুনঃপুনঃ অন্যূন পাঁচবার সংস্কার করিয়া তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থ "আকবর-নামা" প্রচারিত করিয়াছিলেন।

এইরূপ রাশীকৃত উপকরণের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য সংগ্রহ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্ষুদ্র অথচ অমূল্য মাল্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে যাহা আছে তাহার সবটুকু ইতিহাস, কিছুমাত্র উপন্যাস নাই। স্বয়ং যদুনাথই যখন ইহার আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন, তখন ঐতিহাসিকতা হিসাবে কিছু বলিবার কথাও নাই। আবার ব্রজেন্দ্রবাবুর লিখন-ভঙ্গিটিও চমৎকার; তিনি সরস ও সতর্ক ভাষায় বিষয়ের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া নিজের কথা গুছাইয়া বলিয়াছেন। কোথায়ও তরল বা ত্বরিত রচনায় পল্লবগ্রাহিতার চিহ্নমাত্রও দেখান নাই। তাঁহার ভাষাটি শিষ্ট অথচ মিষ্ট; বিষয়টী সংক্ষিপ্ত অথচ প্রক্ষিপ্ত নহে। বহিখানি নভেল-পাঠকের পকেটে হাত না দিয়া সুধী-সমাজে সমাদৃত হইবে।

পুস্তিকাখানির লেখার ভিতরে যেখানে সেখানে যে সকল সাঙ্কেতিক reference দেওয়া আছে, সাধারণ পাঠকের জন্য উহা স্থানান্তরে পরিস্ফুটরূপে বিবৃত হইলে ভাল হইত। ক্ষুদ্র পুস্তকে অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধিও রহিয়া গিয়াছে। নূরজহানের প্রথম স্বামীর নাম শের-আফ্কন্ না হইয়া বোধ হয় "শের-

আফগান" হইবে। তিনি আফগান না হইয়া তুর্ক ছিলেন, এ কথা সত্য। বিভারিজ সাহেব এক সময় আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, একটী পারসীক ক্রিয়াপদ হইতে আফগান শব্দ হইয়াছে; এস্থলে শের-আফগান অর্থে ব্যাঘ্রহন্তা বুঝিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

আড়াই চাল। (গল্প ও উপন্যাস)—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। কলিকাতা ৯নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী, ১৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৷০

একখানি ছোট উপন্যাস। "আড়াই চাল" এই গ্রন্থের উপন্যাসাংশ, তা ছাড়া সাতটি গল্প ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। "আড়াই চাল" উপন্যাসখানি ইতঃপূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তেই প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই—পাঠকগণ স্বয়ং বিচার করিতে পারিবেন।

গ্রন্থনিবদ্ধ গল্প কয়টিই আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে। "ননী খানসামার ছুটি যাপন" একটি উৎকৃষ্ট গল্প। লেখিকা এই গল্পে পাড়াগাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর লোকের একটি নিখুঁত এবং অবিকল গার্হস্থ্য চিত্র অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। অধিকাংশ গল্পেই লেখিকা লিখনভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও রচনাশক্তি প্রশংসনীয়।

গ্রন্থের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

হাসি ও অশ্রু। (গল্পগ্রন্থ)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, প্রণীত। কলিকাতা ১২নং নারিকেল বাগান লেন, লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত এবং ২৭।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোং হইতে শ্রীদুলালচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৫৬ পৃষ্ঠা মূল্য ১৲

একখানি গল্পগ্রন্থ, তেরটি গল্পের সমষ্টি। আমরা ইহার কতিপয় গল্প পূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার সুলেখক, তাঁহার লেখাও সুপরিচিত। আমরা আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। গল্পগুলির ভিতর দিয়া যথাক্রমে হাসি ও অশ্রুর যে নির্ম্মল ধারাটি প্রবাহিত হইয়াছে তাহা পাঠকের মনকে স্পর্শ ও অভিষিক্ত করে। এ হাসিকান্নায় তৃপ্তি আছে। "খেয়ার মাঝি", "সুখের মূল্য", "অম্ল মধুর" প্রভৃতি কয়টি গল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলির ভাব ও ভাষা এবং রচনা-পারিপাট্য বেশ হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থের "হাসি ও অশ্রু" নাম সার্থক হইয়াছে।

পুস্তকখানির কাগজ ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

ভোট যুদ্ধ। (ব্যঙ্গ চিত্র)—বিটকেল বিরচিত। মান-সম্ভ্রমের লালসায় যাঁহারা যেখানে সেখানে ভোট সংগ্রহের জন্য খোসামোদ ও অকাতরে রাশি রাশি অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকেন, "বিট্‌কেল" কবি এই পুস্তকে তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া "অমিত্র অক্ষরে" ব্যঙ্গের ভাষায় অল্পবিস্তর মিষ্ট ভৎসনা গাহিয়াছেন। যাঁহাদের ইহা ভাল লাগে তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন, একটু আমোদ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি হইবার নিয়মাবলী। কলিকাতা ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত এবং "সিরাজগঞ্জ রিক্রুটিং কমিটি"র সেক্রেটারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী, ১৬ পৃষ্ঠা মূল্য লেখা নাই।

যাহারা বাংলা গবর্ণমেণ্টের সৈনিকবিভাগে প্রবেশার্থী এই পুস্তিকাখানি তাঁদের কাযে লাগিবে। যাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে এবং যুদ্ধ করিতে হইবে না, এরূপ দুই শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও আবশ্যকীয় নিয়মাবলী ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

ওমারপ্রসাদ।—শ্রীসুরেন রায় প্রণীত। কলিকাতা গড়পার রোডে ইউরায় এণ্ড সন্স্ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ৩২ পেজী, ৭৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০

পুস্তকখানি পারস্য কাব্যকুঞ্জের বিখ্যাত কবি ওমর খায়ামের রচিত শ্লোকাবলীর ফিটজেরাল্ড কৃত ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় ছন্দে রচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য সংরক্ষা অসম্ভব। আলোচ্য গ্রন্থখানি অনুবাদ হইতে অনুবাদিত হইলেও কবিতাগুলি সুমিষ্ট ও ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে বলা যায়। ভাষাও ভাল, কাগজ ও ছাপা ও ভাল। মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে।

তুষার। (কবিতাগ্রন্থ)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং এলাহাবাদ ১৯ নং জর্জ্জ টাউন হইতে শ্রীঅনন্তকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী, ৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য উল্লিখিত নাই।

একখানি কতকগুলি কবিতার (সনেট) সমষ্টি। সমুদয় কবিতার ভিতর দিয়া কবির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ধীরভাবে বহিয়া

গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কবিতাগুলি কোথাও কষ্টকল্পনার পেষণে আড়ষ্ট হয় নাই, কল্পনা, ভাব ও কবিত্ব স্বতঃই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং বেশ উপাদেয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। ইহাতে কবির প্রাণ ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীত ও তৃপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানি পুরু-আর্ট পেপারে ছাপা, দেখিতে খুব সুন্দর।

অশান্তি। (উপন্যাস)—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ১৬।৩এ বৃন্দাবন বোসের লেন, কোহিনুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৬ বি, ভীম ঘোষের লেন, শ্রীমনোহরচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ১২৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০

ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। শান্তির সংসারে সামান্য একটা ভুলের জন্য সময়ে সময়ে কিরূপ অশান্তি সংঘটিত হয়, গ্রন্থকার এই উপন্যাসে তাহারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। আখ্যানভাগ একেবারে নূতন না হইলেও লেখকের লিখন কৌশলে উপন্যাসখানি সুপাঠ্য ও উপভোগ্য হইয়াছে। চরিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিক এবং পরিস্ফুট ভাবে অঙ্কিত; তাহার মধ্যে মনোরমার চরিত্রই বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থের ভাবও বেশ সাদাসিধে, ভাষা ঝরঝরে এবং অনাড়ম্বর। এই উপন্যাস প্রণয়নের মূলে গ্রন্থকারের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। লেখক এই কার্য্যে নূতন ব্রতী হইলেও তিনি অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি।

দুঃখের বিষয় পুস্তকখানিতে বহুল পরিমাণে বর্ণাশুদ্ধি এবং ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ লক্ষিত হইল। বাহুল্যভয়ে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

"কলাকান্ত।"

বিষদৃষ্টি। (উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত। ১৭৮ নিমুগোস্বামীর গলি, ক্রাউন লাইব্রেরী হইতে শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ৩১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৸০

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ একবৎসরের মধ্যে "দত্ত-গৃহিণী" "জয়ন্তী" ও "বিষদৃষ্টি" এই তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত করিয়া ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। "বিষদৃষ্টি" একখানি সুপাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইহাতে সতীত্বের মুখোস পরা গণিকার সম্বন্ধে, দুশ্চরিত্র পুরুষকে 'সাপের ছুচো গেলা' অবস্থায় ফেলিয়া, আর্টের কারদানি নাই; ধরি মাছ না ছুই পানি কামুকতার সহিত উচ্চভাবের ছিটাফোঁটা মিশাইয়া, প্রেমারিষ্ট বলিয়া চালান দিবার চেষ্টা নাই। যে গুণে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" আজ পর্য্যন্তও টিকিয়া আছে, ক্ষেত্রবাবু সেই গুণের অধিকারী। পুস্তকখানি নিঃসঙ্কোচে আমাদের পুরলক্ষ্মীদের হস্তে দেওয়া যায়।

"গৌরাঙ্গ।"

সাহিত্য-সমাচার

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত পক্ষিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা লণ্ডন জুলোজিকাল সোসাইটির ফেলো হইয়াছেন। আর কোনও ভারতসন্তান বোধ হয় F. Z. S নাই।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত 'নির্ম্মাল্য' নামক গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।০। তাঁহার "স্পর্শমণি" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

গত ২৬শে শ্রাবণ ঢাকা বার-লাইব্রেরী হলে, মাননীয় ডাক্তার স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের স্মৃতি-সভা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন, এম এ ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস "বাসরে বিভ্রাট" যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আলোচনা সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত সাধক জীবন সীরিজের ৪র্থ গ্রন্থ "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ", পারমার্থিক উপন্যাস "সংসার চক্র" এবং সামাজিক উপন্যাস "অভাগিনী" পূজার মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

অভিশপ্ত

(দি কাপ অব ট্যানটেলস)

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১১শ বর্ষ } ২য় খণ্ড | আশ্বিন ১৩২৬ সাল | ২য় খণ্ড } ২য় সংখ্যা

পুরোণো বাড়ি

(১)

অনেক কালের ধনী গরীব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি।

দিনে দিনে ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড় পড়ছে। দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙ্গা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুই পাখী ধুলোয় পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মত দল বাঁধল।

উত্তর দিকের এক পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েচে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা—শোকাতুরা বিধবার মত—বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে, কেউ তাকিয়ে দেখে না।

তিন মহল বাড়ি। কেবল পাঁচটি ঘরে মানুষের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন, পঁচাশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের সবখানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি;—কেবল একটুখানিতে একালের চলাচল।

বালি-খসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগ্‌লার মত রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আপনাকেও দেখে না, অন্যকেও না।

(২)

একদিন ভোর রাত্রে ঐদিকে মেয়ের গলায় কান্না উঠ্‌ল। শুনি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, সখের যাত্রায় রাধিকা সেজে যার দিন চল্‌ত, সে আজ আঠারো বছরে মারা গেল।

ক'দিন মেয়েরা কাঁদল, তার পরে তাদের আর খবর নেই।

তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়ল।

কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না; ব্যথিত হৃৎপিণ্ডের মত বাতাসে ধড়াস্ ধড়াস্ করে আছাড় খায়।

(৩)

একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল।

দেখি, বারান্দা থেকে লালপেড়ে শাড়ি ঝুলচে।

অনেকদিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেচে। তার মাইনে অল্প, ছেলেমেয়ে বিস্তর।

শ্রান্ত মা বিরক্ত হয়ে তাদের মারে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে।

একটা আধা-বয়সী দাসী সমস্ত দিন খাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে; বলে "চল্লুম",কিন্তু যায় না।

(৪)

বাড়ির এই ভাগটায় রোজ একটু আধটু মেরামত চল্‌চে।

ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হল; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগুলোতে বাঁখারি বেঁধে দিলে; শোবার ঘরে ভাঙা জান্‌লা ইঁট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌লে; দেয়ালে চুনকাম হল, কিন্তু কালো ছাপগুলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।

ছাদে আলসের পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিৎ ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্‌ খিল্‌ করে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্র্য। তাকে ছোট হাতের ছোট কৌশলে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।

কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায়নি। তার সেই জোড়-ভাঙা দরজা আজো কেবল বাতাসে আছ্‌ড়ে পড়চে—হতভাগার বুক-চাপ্‌ড়ানির মত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুঃখের রাজ্যে

সেথা রবি উঠেনাক, পড়ে যায় বেলা রে,
হয়নাক বেচাকেনা, ভেঙ্গে যায় মেলা রে।
সেথা বনে কাঁদে সীতা,
জ্বলে সতী, জ্বলে চিতা,
গাঙ্গুরের নীরে ভাসে বেহুলার ভেলা রে।

সেথা দেয় আঁখি-নীর গিরিশির গলায়ে,
সেথা যায় ভুখারীর পোড়া শোল্‌ পলায়ে।
সেথা উঠে হা-হা বাণী,
শ্মশানেতে রাজা রাণী,
সেথা শুধু উৎসব নব চিতা জ্বালায়ে।

জাগে সেথা দুর্ব্বাসা, কপিলের সহিতে
অভিশাপ কহিতে ও কোপানলে দহিতে।
সেথা শুধু বাজে শিঙা,
ডোবে মাঝি, ডোবে ডিঙ্গা,
সেথা গিলে অঙ্গুরী তীর্থের রোহিতে।

তবু সুরধুনী নামে সে দেশেরি লাগি রে,
পরি' চীর যুবরাজ তারি অনুরাগী রে।
সেথা থামে আনাগোনা,
পায়ে তরী হয় সোণা,
পাষাণও মানবী হয়ে উঠে ত্বরা জাগি রে।

সে দেশের বিষে মিশে আছে যে রে অমিয়া,
প্রেম হয় হেম হয় দুখ ক্লেশ জমিয়া।
আজও সেথাকার নামে
দেবের চরণ ঘামে,
ব্যথিত স্বরগ পড়ে অবনীতে নামিয়া।

হরিরে তাহারি ডাকে হয় শুধু আসিতে,
নাশিতে শাসিতে অরি, তারে ভালবাসিতে।
সেথাকার আঁখিজল,
যমুনায় আনে ঢল;
সেই দেয় নবসুর কৃষ্ণের বাঁশীতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কুলীন-কুমারী

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মূর্চ্ছা।

রতনপুর বর্দ্ধমান জেলায়,—মেমারী রেল ষ্টেশনের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে। রতনপুর হইতে মেমারী আসিতে হইলে, প্রথমে দুই ক্রোশ ব্যাপী ধান্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া, চৌগ্রাম নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে আসতে হয়; তাহার পর, চৌগ্রাম হইতে পুনরায় ক্রোশব্যাপী ধান্যক্ষেত্র পার হইয়া মেমারী রেল ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারা যায়। রতনপুর হইতে চৌগ্রাম পর্য্যন্ত 'মাঠাল' রাস্তা বা আইল পথ; তাহা অসমান, বৃক্ষাদির ছায়া-বর্জ্জিত, এবং তজ্জন্য দুরধিগম্য। কিন্তু চৌগ্রাম হইতে যে রাস্তা মেমারী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাহা পাকা প্রশস্ত রাজপথ; তাহার দুই পার্শ্বের বৃহৎ বৃক্ষ সকল পথক্লান্ত পথিকগণের মস্তকে শীতল ছায়া বর্ষণ করিত; বৃক্ষাশ্রিত পক্ষিগণ তাঁহাদের কর্ণে সুধার ধারা ঢালিয়া দিত।

রতনপুর-নিবাসী হারাধন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা অভিমুখী গাড়ী পাইবার প্রত্যাশায়, স্বগ্রাম হইতে মেমারী যাইতেছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া গীতা নাম্নী কন্যা ছিল।

চৈত্র মাস। দ্বিপ্রহরের প্রখর ও পরিশুষ্ক রৌদ্রে, চৌগ্রামের নিকটে আসিয়া, বৃদ্ধ হারাধন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

হারাধন অতি উচ্চদরের কুলীন ব্রাহ্মণ,—কৌলিন্যের গৌরবে মহা গৌরবান্বিত। সেরূপ উচ্চদরের কুলীন হইলে, বাল্যকাল হইতেই বহুবিবাহ করা আবশ্যক; কিন্তু হারাধন, সুবুদ্ধি কুলীনের ন্যায়, এই আবশ্যকীয় কার্য্য করেন নাই; তিনি বাল্যকালেও বিবাহ করেন নাই, এবং বহু বিবাহও করেন নাই। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং একটী মাত্র পত্নীতেই পরিতুষ্ট ছিলেন। কুলীনের অত্যাবশ্যক কার্য্য না করিলেও, তাঁহার পক্ষে যাহা অত্যন্ত অনাবশ্যক, তাঁহার অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়াছিল;—তিনি কন্যার জনক হইয়াছিলেন। তিনি এই কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন, গীতা।

কেহ চিরদিন শিশু থাকে না। গীতা, বিধাতার ইচ্ছায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত গীতার রূপের জ্যোতিঃ প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার সৌন্দর্য্যখ্যাতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে প্রচারিত হইয়া পড়িল; সকলেই বলিল, এমন মেয়ে সাতখানা গ্রাম খুঁজিলেও পওয়া যায় না।

শুনিয়া, চৌগ্রামের চক্রবর্ত্তীরা গীতাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা হারাধনের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব শুনিয়া হারাধন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন—কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! যে চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ হইয়া কুলীন-কুমারীকে পুত্রবধূরূপে পাইবার প্রত্যাশা! হউক না তাহারা জমীদার, হউক না তাহারা বিদ্বান!—জমীদারীর গৌরব, বিদ্যার গৌরব, কৌলিন্যের গৌরবের অনেক নিম্নে। সুতরাং চৌগ্রামের ধনী জমীদারদিগের বাটীতে গীতার বিবাহ হইল না।

তথাপি এই কুলীন-কুমারী বিবাহযোগ্যা হইয়াছিল। বিবাহযোগ্যা কন্যা অনূঢ়া থাকায় হারাধনের পত্নী পল্লীবাসিনীগণের নিকট নিন্দিতা হইতেন। নিশীথে, হারাধনের বিনিদ্র কর্ণে সে নিন্দা প্রতিধ্বনিত হইত। হারাধন কন্যাভারে ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী হইলেও কুলীন-কন্যা,—কুলীন পাত্র ব্যতীত তাহাকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করা চলিবে না।

কুলীন পাত্র দুর্ম্মূল্য সামগ্রী ; দরিদ্র পল্লীবাসী হারাধন সে পণ্য কিরূপে ক্রয় করিবেন ?

কুলীন পাত্রানুসন্ধানের জন্য হারাধন আত্মীয়স্বজনগণকে পত্র লিখিলেন। তিনি তাঁহার শ্যালক শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এক পত্রোত্তর পাইলেন। রত্নেশ্বর হাওড়ার নিকটবর্ত্তী শিবপুরে বাস করিতেন, এবং হাওড়ার আদালতে মোক্তারি করিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে তিনি বহু কষ্টে এক কুলীন কুমারের সন্ধান পাইয়াছেন। কুলীনকুমার মাতৃপিতৃহীন, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত ; অল্প ব্যয়ে তাহাকে লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু বরপক্ষ কলিকাতাবাসী ; তাঁহারা কন্যাকে দেখিবার জন্য পল্লীগ্রামে যাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন ; সুতরাং কন্যাকে শিবপুরে লইয়া আসিতে হইবে।

ঐ পত্র পাইয়া, কন্যাকে লইয়া, হারাধন শিবপুরে যাইতেছিলেন। স্থির করিয়াছিলেন যে রতনপুর হইতে মেমারী পদব্রজেই যাইবেন ; পল্লীবাসীদিগের পক্ষে তিন ক্রোশ পথ ভ্রমণকরা কষ্টকর নহে। কিন্তু হারাধন চৈত্রের প্রখর রৌদ্রের কথা এবং নিজের পরিণত বয়সের কথা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। চৌগ্রামের নিকটে আসিয়া, তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কোন স্থানে একটি ছায়াময় বৃক্ষ নাই ; চারিদিকে চৈত্রের শস্যশূন্য মাঠ, মূর্ত্তিমান হাহাকারের ন্যায়, বিদীর্ণ বক্ষ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ; নির্দ্দয় আকাশ, নির্দ্দয় চিকিৎসকের ন্যায় মাঠের সেই বিদীর্ণ বক্ষে অগ্নিতপ্ত রৌদ্রের প্রলেপ লেপিয়া দিতেছে ; বায়ু, বিকারগ্রস্ত রোগীর দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে।

বৃদ্ধ পিতার কাতরতা দেখিয়া গীতা কাপড়ের ছোট গাঁটরীটি পিতার হস্ত হইতে আপনার কক্ষে ধারণ করিল এবং পিতাকে সাহস দিয়া কহিল—"আর একটুখানি বাবা ! আর একটুখানি পরেই আমরা গ্রামে প্রবেশ করব। তখন কোনও গাছতলায় বসে' কিম্বা কোন দোকানে বসে তুমি জিরিয়ে নিতে পারবে। সমুখে ঐ গ্রামের নাম কি, বাবা ?"

বৃদ্ধ কাতর কণ্ঠে কহিলেন—"চৌগাঁ।"

বালিকা পূর্ব্বে কখন রতনপুরের বাহিরে আসে নাই। সে মনে করে নাই যে মেমারী যাইতে হইলে রাস্তায় চৌগ্রাম দেখিবে। পিতার নিকট চৌগ্রামের নাম শুনিয়া, চৌগ্রামের জমীদারের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল ; ছয় মাস আগে বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া, জমীদারের লোক তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল। সেই বিবাহ হইলে, আজ তাহার পিতার এই কষ্ট হইত না। মনের কথা মনে রাখিয়া,সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, চৌগাঁয়ে জলখাবারের দোকান আছে ?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"হ্যাঁ, গ্রামে ঢুকেই আমরা একখানা জলখাবারের দোকান পাব। সেখানে পৌছতে পারলে হয়, একবার মনের সাধে জল খাব ;—তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। ঐ বটগাছটা দেখছ, ঐ গাছটার কাছে পৌছতে পারলেই আমরা গ্রাম পাব।"

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বালিকা কহিল—"ঐ দেখ বাবা ! ঐ কাদের মস্ত কোঠা দেখা যাচ্ছে।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"ঐ জমীদারের বাড়ী।"

কিয়ৎকাল মধ্যে, হারাধন পূর্ব্ব কথিত বটবৃক্ষের তলে উপনীত হইলেন। গীতা কক্ষ হইতে গাঁটরিটী নামাইয়া পিতাকে বলিল—"বাবা ! তুমি এই বটগাছের ছায়ায় এই শিকড়ে ঠেস দিয়ে এই পুঁটলির উপর বস, আমি তোমার জন্যে ঐ পুকুর থেকে একটু জল নিয়ে আসি।"

বৃদ্ধ কন্যার নির্দ্দেশ মত বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।

নিকটে পুষ্করিণীর একটা বাঁধা ঘাট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। গীতা জল আনিবার পাত্রের জন্য মান গাছের একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেল। কিন্তু পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া দেখিল যে উহাতে একবিন্দু জল নাই ; তলায় বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে। দেখিয়া, সেই পুষ্করিণীর তলার ন্যায়

তাহার হৃদয়ও শুষ্ক হইয়া গেল। সে ম্লানমুখে পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বৃদ্ধ সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়াছেন; তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষুর তারা দুইটী সম্পূর্ণ স্থির হইয়া গিয়াছে; তাঁহার মুখবিবর হইতে ফেন নির্গত হইতেছে।

ভীতা বালিকা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল—"বাবা! বাবা গো!" পিতার অবনত মস্তক দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল—"বাবা, বাবা গো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতা।

চৌগ্রামের চক্রবর্ত্তীরা চৌগ্রাম এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চারি পাঁচখানা গ্রামের জমীদার।

বর্ত্তমান জমীদার বাবুর নাম শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রাখাল বাবু কেবল মাত্র জমীদার ছিলেন না, তিনি বর্দ্ধমান আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল। তিনি ওকালতীতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন; এবং অর্জ্জিত অর্থে বীরভুম জেলায় এক বিস্তীর্ণ জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। রাখাল বাবুর জমীদারীর বাৎসরিক আয় ষাট হাজার টাকার কম হইবে না। ইহা ইহা ছাড়া ওকালতীতেও তিনি বৎসর বৎসর পনর কুড়ি হাজার টাকা পাইতেন। সুতরাং চৌগ্রাম অঞ্চলে রাখাল বাবু বড় ভারি বাবু। চৌগ্রামে, মেমারী যাইবার রাস্তার ধারে তাঁহার নূতন বাসভবন ও তৎসংলগ্ন পুষ্পবাটিকা, পথচারী পথিকগণকে নয়নানন্দ প্রদান করিত;—তাহারা অবাক হইয়া তাহা দেখিত। রাখালবাবুর অশ্বশালার অশ্বগণ সুন্দর যানে সংযোজিত হইয়া, পদশব্দে রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিত; পল্লী-পথিকগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহা অবলোকন করিত।

রাখাল বাবুর এক পুত্র, তাহার নাম যুগলকিশোর। তাহার বয়স বাইশ বৎসর। সে বি-এস-সি পাস করিয়া শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছিল। সম্প্রতি আই ই পরীক্ষার পর ছুটী পাইয়া বাটী আসিয়াছিল। এবার বাটী আসিবার সময় সে কলিকাতা হইতে, একটি ভাল দূরবীক্ষণ যন্ত্র কিনিয়া আনিয়াছিল।

বহির্ব্বাটীর ত্রিতলে একটী বৃহৎ ঘর যুগলকিশোরের পাঠাগার।

আজ আহারাদির পর পাঠাগারে বসিয়া দূরবীণ লইয়া যুগলকিশোর গবাক্ষপথে দূরস্থ বস্তু সকল নিরীক্ষণ করিতেছিল। সহসা গ্রামের বাহিরে শস্যক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, দুইটি ক্লান্ত পথিক আইল পথ দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিল, পথিক দুইজনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ও একজন বালিকা। দেখিল, বৃদ্ধের মস্তকের উপর একটি জীর্ণ ছত্র এবং বালিকার মস্তকে একখানি ভাঁজকরা গামছা রহিয়াছে। দেখিল, বালিকার নাকে একটী নোলক দুলিতেছে। দেখিল বৃদ্ধের হস্ত হইতে একটী গাঁটরী লইয়া বালিকা আপন কক্ষে ধারণ করিল। দেখিল, উভয়ে মিলিয়া বৃক্ষতলে আসিল; বৃদ্ধ বসিল; কিন্তু বালিকা বসিল না। বালিকা একটী মানপাতা ছিঁড়িয়া লইয়া কোথায় যায়? ঐ পুষ্করিণীতে? কেন? জল আনিতে? হাঁ হাঁ—যুগলকিশোর জানিত যে পাত্রাভাবে অনেক দরিদ্র ব্যক্তি মান পাতায় বা পদ্ম পাতায় জল বহন করে। হঠাৎ যুগলকিশোরের মনে পড়িয়া গেল যে ঐ পুষ্করিণীতে একবিন্দু জল নাই! সর্ব্বনাশ! এই তৃষ্ণাতুরেরা কি পান করিবে? যুগলকিশোরের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পার্শ্বের বারান্দায়, শ্বেতপ্রস্তরের মেঝের উপর শুইয়া, খস্‌খসের পর্দার পার্শ্বে যুগলকিশোরের ভৃত্য ঘুমাইতেছিল। তাহার নাম গোপী।

যুগলকিশোর ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ডাকিল—"গোপী, ও গোপী।"

গোপী চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছেন?"

যুগল। তুমি এই জানালা থেকে উত্তর দিকে ঐ মাঠ দেখছ ?

গোপী। হ্যাঁ অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে।

যুগল। ঐ মাঠ থেকে গ্রামে প্রবেশ করবার পথে একটা বটগাছ দেখছ ?

গোপী। কোনটা বটগাছ, এখান থেকে চিনতে পারছিনে; কিন্তু আমি জানি ঐখানে একটা বট-গাছ আছে।

যুগল। ঐ বটগাছের তলায় একটি মেয়েকে আর একজন বুড়োকে দেখতে পাবে। তারা এখনই মাঠ থেকে ঐ বটের ছায়ায় এসে বসেছে। তারা অত্যন্ত ক্লান্ত, তৃষ্ণায় বড় ব্যাকুল হয়েছে। বুড়ো জল না পেলে হয়ত মরে' যাবে। তুমি একজন মালীকে সঙ্গে নিয়ে এক কলসী ঠাণ্ডা জল, ঘটী, একখানা মাদুর আর একখানা পাখা নিয়ে এখনই ঐ বটতলায় যাও। জল খেয়ে বিশ্রাম করে' ওরা সুস্থ হলে, তোমরা ফিরে আসবে। বুড়োকে বেশী অসুস্থ দেখলে, মালীকে সেখানে রেখে তুমি একলা এসে আমাকে খবর দেবে। তার পর যা ব্যবস্থা করতে হয়, আমি করব।

গোপী ভাবিল, তাহারা যে ঐ গাছতলায় আসিয়া বসিয়াছে, এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছে, তাহা খোকাবাবু ঘরের মধ্যে বসিয়া কিরূপে জানিতে পারিল ? যুগল-কিশোরকে বাটীর সকল লোকে খোকাবাবু বলিত; বাহিরের লোকের নিকটও সে খোকাবাবু নামেই পরিচিত ছিল। খোকাবাবুর কথায় গোপীর বিলক্ষণ অবিশ্বাস জন্মিলেও সে তাহার আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিল না।—সে জানিত যে বরং কর্ত্তাবাবুর আদেশ লঙ্ঘন করা চলে, তথাপি খোকাবাবুর এতটুকু আজ্ঞা অপ্রতিপালিত থাকিতে পারে না।

মালীকে লইয়া, এবং আদেশ মত দ্রব্য সকল লইয়া, গোপী যখন বটবৃক্ষতলে আসিয়া হারাধন ও গীতাকে অবলোকন করিল, তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; ভাবিল, খোকাবাবু নিশ্চয়ই দৈব-বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন।

মালী ও গোপী উভয়ে মিলিয়া হারাধনকে মাদুরে শয়ন করাইয়া, তাঁহার সেবা আরম্ভ করিল। পাখার বাতাসে ও শীতল জলসিঞ্চনে বৃদ্ধ জ্ঞানলাভ করিলেন, এবং অল্প জলপান করিয়া উঠিয়া বসিলেন। পিতাকে সুস্থ দেখিয়া, গীতা পরে জলপান করিল; এবং পিতাকে কহিল—"বাবা! আর আমাদের মেমারী যাবার দরকার নেই। চল, বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে আমি চিরকাল আইবুড় থেকে তোমাদের সেবা করব।"

হারাধন বলিলেন,—"এখন আমি বেশ সুস্থ হয়েছি; আর মেমারী যাবার রাস্তা ভাল। বেলাও পড়ে' এসেছে; গাছের ছায়ায় ছায়ায়, এই এক ক্রোশ পথ অনায়াসে যেতে পারব। মেমারী যাওয়ার চেয়ে বাড়ী ফেরা বেশী শক্ত। দু ক্রোশ রাস্তা চলতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে; আলো নেই, লাঠি নেই—এই বসন্তকালে সাপের ভয় বড়ই বেশী।"

পিতার কথা যে যুক্তিযুক্ত, তাহা গীতা বুঝিল; অতএব সে আর আপত্তি করিল না।

মাদুর, জলপাত্র ও পানপাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হারাধন গোপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এসব কোথা থেকে এল? তোমরাই বা কি করে' জানতে পারলে, যে আমি এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছি?"

গোপী বলিল—"আমরা খোকাবাবুর হুকুম মত এখানে এসেছি। আপনার মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা তিনি কেমন করে' জানতে পারলেন, তা আমরা বলতে পারি নে।"

হারাধন। খোকাবাবু কে ?

গোপী। জমীদার বাবুর ছেলে।

হারাধন। কে ? রাখাল বাবুর ছেলে ?

গোপী। হ্যাঁ, তিনিই।

হারাধন। এই ছেলের সঙ্গেই ত আমার এই মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে রাখালবাবু চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু আমরা কুলীন, আমরা ত বংশজের ঘরে মেয়ে দিতে পারি নে। কাযেই বিয়ে হল না। খোকাবাবুকে বোলো, যে তিনি আজ আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন, আমি কায়মনোবাক্যে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করছি।"

পিতার কথা শুনিয়া গীতা ভাবিল, এই বংশজের পুত্রই করুণাময়, তাহার পিতার জীবনরক্ষা কর্ত্তা; তাহার নিকট সে চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নোলকের আন্দোলন।

পাঠাগারে বসিয়া, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যুগলকিশোর দেখিল যে তাহার আদেশ মত গোপী একজন মালীকে লইয়া, বৃদ্ধের সেবা করিতেছে। দেখিল, সেবায় সুস্থ হইয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিলেন। দেখিল, বৃদ্ধকে সুস্থ দেখিয়া বালিকা পরে জলপান করিল; ভাবিল, এই কন্যা দয়াবতী বটে, বৃদ্ধের অসুস্থাবস্থায় জলপানে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাহার পর, যুগলকিশোর আবার দেখিল যে বৃদ্ধ উঠিয়া গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর, আর তাহাদিগকে দেখা গেল না,—গ্রামের বৃক্ষান্তরালে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

যুগলকিশোর দ্বিতলে নামিয়া আসিল। দ্বিতলের এক কক্ষের গবাক্ষ হইতে, তাহাদের বাটীর সম্মুখের রাস্তা বেশ দেখা যায়, এবং পথিকগণের কথাবার্ত্তাও বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। সে বুঝিয়াছিল যে বৃদ্ধ ও বালিকা ঐ পথ দিয়াই যাইবে। সে স্থির করিয়াছিল যে নোলকপরা বালিকাটিকে সে ভাল করিয়া দেখিবে। পথগামিনী এক অপরিচিতা বালিকাকে দেখিয়া তাহার লাভ কি? আমরা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিব না, তোমরা বাইশ বৎসরের যুবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

কিয়ৎকাল মধ্যে বৃদ্ধ ও বালিকা উভয়েই জমীদার বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যুগলকিশোর গবাক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, বলিকাকে উত্তমরূপে দেখিয়া লইল। তেমন সুন্দরী সে আর কখনও দেখে নাই। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়াও বালিকার মুখশ্রী মলিন হয় নাই; বরং মধ্যাহ্নের নলিনীর ন্যায় আরও প্রস্ফুট হইয়াছিল। ত্রস্তা কুরঙ্গীর ন্যায় তাহার নয়নদ্বয় নিমেষশূন্য হইয়া জমীদার বাবুদিগের বৃহৎ ও সুদৃশ্য অট্টালিকা অবলোকন করিতেছিল। বিমল মধুখ-বিনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় তাহার কোমল অবয়বে যেন জগতের সমস্ত কমনীয়তা বিরাজ করিতেছিল। তাহার নিম্মল ওষ্ঠের উপর ক্ষুদ্র নোলকটি, গোলাপদলে শিশির কণার ন্যায় জ্বলিতেছিল।

বালিকা পিতার সহিত চলিয়া গেল। সে জানিতে পারিল না যে তাহার অগোচরে তাহার মধুর মূর্ত্তি একটী নবীন হৃদয়-পটে চিত্রিত হইয়া গেল। শুধু চিত্র নহে; জমীদারের সুন্দর বাটী দেখিয়া বালিকা পিতার সহিত যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনিও যুগলকিশোরের মুগ্ধ কর্ণে বীণার ঝঙ্কারবৎ বাজিতেছিল।

সে পুনরায় আপন পাঠাগারে যাইয়া উপবেশন করিল এবং একখানা পুস্তক লইয়া, তাহাতে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। সম্মুখে পুস্তক রাখিয়া, সে বালিকার রূপের ধ্যান করিতে লাগিল।

গোপী বটতলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, যুগলকিশোরের পাঠাগারে আসিয়া সংবাদ দিল যে বৃদ্ধ সুস্থ হইয়া কন্যাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

যুগল। বুড়োই বুঝি ঐ সুন্দর মেয়েটির বাপ? বুড়োর কোন গ্রামে বাড়ী, তাঁর নাম কি, জিজ্ঞাসা করেছিলে কি?

গোপী। না, নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

যুগল। তুমি একটি আস্ত বাঁদর!

গোপী। কিন্তু ওর নাম কি, আর বাড়ী কোথায়, তা এখনই জেনে আপনাকে বলতে পারি।

যুগল। কি করে' বলবে? তাঁরা ত চলে'

গেছেন। নাম ধাম জানবার জন্তে, তাঁদের পাছু পাছু ছুটবে নাকি ?

গোপী। তা' কেন ? নায়েব মশায়কে জিজ্ঞাসা করলেই সব পরিচয় এখনই জানতে পারব।

যুগল। নায়েব মশায় ওদের পরিচয় কি করে' জানবেন ?

গোপী। ঐ বুড়োর ঐ মেয়েটির সঙ্গে, আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করবার জন্তে, কর্ত্তাবাবু গত অগ্রহায়ণ মাসে ওদের বাড়ীতে নায়েব বাবুকে পাঠিয়েছিলেন।

যুগল। ওই যে সেই মেয়ে, তা তুমি কি করে' জানলে ?

গোপী। ঐ বুড়োর মুখেই শুনলাম।

যুগল। তার পর, সে সম্বন্ধ স্থির হল না কেন ?

গোপী। ওরা বিয়ে দিতে স্বীকার হল না।

যুগল। কেন ?

গোপী। ওরা বড় কুলীন ব্রাহ্মণ।

যুগল। যাও, ঐ কুলীন ব্রাহ্মণের নাম কি আর বাড়ী কোথায়, নায়েব বাবুর কাছে জেনে এস।

গোপী চলিয়া গেল ; এবং অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণের নাম ধাম জানাইল—কন্যাটির নাম যে গীতা, তাহাও বলিল।

সেই রাত্রে বিছানায় শুইয়া, যুগলকিশোর সারা রাত ঘুমাইল না ; গীতার ধ্যান করিল ; গীতা নাম জপ করিল। সারা রাত গীতার নাকের সেই ক্ষুদ্র নোলকটি তাহার বক্ষোমধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুগলকিশোরের প্রতিজ্ঞা।

হারাধন মুখোপাধ্যায় শিবপুরে শ্যালক রত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে সাতদিন ছিলেন।

এই সাতদিনের মধ্যে একদিন, পাত্রের মাতুল আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। গীতাকে দেখিয়া, তাঁহাদের পছন্দ হইয়াছিল ;—হইবারই কথা। আর একদিন হারাধন ও রত্নেশ্বরবাবু পাত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। পাত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া হারাধন বুঝিয়াছিলেন, সে পাত্র চূড়ান্ত কুলীন, এবং বিদ্যাশিক্ষাও কিছু করিয়াছে ; এক্ষণে সে একটি রঙ্গের দোকানে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। পাত্রের বয়সটা একটু বেশী,—ত্রিশ বৎসর ; তা' হউক, কন্যাও বাড়ন্ত,—তের বৎসর বয়স হইয়াছে। পাত্রের আদি বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়, বৈদ্যপুরে ; এখনও সেখানে তাহার পৈত্রিক জমীজমা ও ভগ্ন ভদ্রাসন আছে। পাত্রের এই সকল পরিচয় পাইয়া, দরিদ্র হারাধন পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রত্নেশ্বর বাবুও মনে করিলেন, তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে এমন একটা কুলীন পাত্র অনুসন্ধানে বাহির করিয়াছেন। স্থির হইল যে পণ, পণ, দান, আভরণ ইত্যাদিতে মোট হাজার টাকা খরচ করিলেই চলিবে ; এবং আগামী বৈশাখ মাসেই শুভবিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু পল্লীগ্রামে যাইয়া বিবাহ দেওয়া অসুবিধা উহা শিবপুরে রত্নেশ্বর বাবুর বাটীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

সাত দিন পরে, পরম পরিতুষ্ট মনে, কন্যাকে লইয়া হারাধন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। রত্নেশ্বর বাবু বলিয়াছিলেন—"হারাধন, গীতাকে এই শিবপুরেই রেখে যাও। এই অল্প ক'দিনের জন্যে, কেন আবার ওকে রতনপুর নিয়ে যাবে ? তুমি একলা বাড়ী ফিরে, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে অর্থ-সংগ্রহ করে আমার ভগিনীকে নিয়ে এসো।" কিন্তু গীতা পিতাকে একাকী রতনপুরে পাঠাইতে স্বীকৃতা হয় নাই। আসিবার সময়, রাস্তায় যে বিপদ ঘটিয়াছিল, স্মরণ করিয়া সে ভাবিল যে পিতাকে অসহায় অবস্থায় যাইতে দেওয়া নিরাপদ হইবে না। অতএব বাড়ী

ফিরিবার জন্য সেও পিতার সহিত হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছিল।

হাওড়া ষ্টেশনে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিবার সময়, সে পিতাকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, তুমি এই ভাল গাড়ীতে উঠ্‌ছ না কেন? এটা ত খালি রয়েছে।"

হারাধন বলিলেন—"বাবা! ও গাড়ীতে আমাদিগকে চড়তে দেবে কেন? ও গাড়ীর ভাড়া যে অনেক বেশী। আমরা গরীব মানুষ, আমরা তত ভাড়া কোথায় পাব? ওতে সাহেবেরা আর বড়লোকেরা চড়ে।"

গীতা পিতার সহিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে উঠিয়া, একটি গবাক্ষের নিকট নিজের স্থান করিয়া লইল, এবং গবাক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল যে ঐ ভাল গাড়ীতে কেহ চড়িতেছে কি না।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। গাড়ীর গবাক্ষ হইতে গীতা চাহিয়া দেখিল যে সেই গাড়ীতে এক বাঙ্গালী যুবক উঠিল। যুবক দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ; তাহার চোখে সোণার চশমা; তাহার সুগৌর প্রশান্ত ললাটে কুঞ্চিত কেশদাম আসিয়া পড়িয়াছে। গীতা যুবককে চিনিত না; সে তাহাকে আগে কখনও দেখে নাই। সে যুগলকিশোর, পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল; তাহা জানিয়া, পিতাকে সংবাদ দিবার জন্য সে বর্দ্ধমানে যাইতেছিল। সেই পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে উঠিয়াছিল।

ঠিক সেই দিন, ঠিক সেই গাড়ীতে চড়িয়া, কেন সে বর্দ্ধমানে যাইতেছিল? ইহাকেই হয়ত ভবিতব্যতা বলে।

গীতা যুগলকিশোরকে দেখিয়াছিল; কিন্তু যুগলকিশোর গীতাকে দেখে নাই।

গাড়ী ছাড়িল। ষ্টেশনে ষ্টেশনে থামিতে থামিতে গাড়ী ক্রমে তালাণ্ড ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিল। তালাণ্ড নূতন ষ্টেশন; সেখানে গাড়ী হইতে নামিবার জন্য বা গাড়ীতে উঠিবার জন্য তখনও প্লাটফরম প্রস্তুত হয় নাই; ভূমি হইতে একেবারে উচ্চ গাড়ীতে উঠিতে হইত। এক বৃদ্ধা একটি দ্রব্যপূর্ণ ধামা মাথায় লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিল; কিন্তু পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। গাড়ীর জানালা হইতে তাহা দেখিয়া, গীতা কাঁদিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে সে দেখিল, সেই ভাল গাড়ীর যুবকটি আপন গাড়ী হইতে ভূমিতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং পতিত বৃদ্ধার দিকে ছুটিয়া আসিল। ধামাটি গুছাইয়া বৃদ্ধাকে তাহাদেরই কামরাতে তুলিয়া দিতে আসিল। আর এক মুহূর্ত্ত পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল; যুবক সেই কামরা হইতে নামিয়া আপনার কামরায় যাইবার সময় পাইল না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, যুগলকিশোর সেই কামরাতে গীতাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।—সে পদ্মের মত প্রফুল্ল মুখ; রাঙ্গা ঠোঁটের উপর সেই ক্ষুদ্র নোলক দুলিতেছিল।

বৃদ্ধার পতনে গীতা হৃদয়ে যে ব্যথা পাইয়াছিল, এই যুবকের দ্বারা সেই মনোব্যথা অপনীত হওয়ায়, সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে যুবকের দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবককে আপন পার্শ্বে বসিবার স্থান দিয়া বৃদ্ধ হারাধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা থেকে বাবুর আসা হচ্চে?"

"হাওড়া থেকে।"

"কোথায় যাওয়া হবে?"

"বর্দ্ধমানে।"

"বর্দ্ধমানে কি করা হয়?"

"বর্দ্ধমানে আমাদের বাড়ী। আপনি কোথায় যাবেন?"

"আমরা যাব রতনপুরে; এই মেমারী ষ্টেশনে নামব। এইটি আমার মেয়ে"

মেমারী ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। যুগলকিশোর বলিয়া উঠিল—"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি নেমে আপনার হাতটি ধরে নামাই। যে নীচু প্লাটফরম!"—বলিয়া সে অতি সত্বর গাড়ীর দরজা খুলিয়া প্লাটফরমে অবতরণ করিল; এবং বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নামাইল।

গীতা কাপড়ের গাঁটরী লইয়া আপনি নামিতে যাইতেছিল, কিন্তু যুগলকিশোর অতি সত্বর অগ্রসর হইয়া, বাম হস্তে গাঁটরীটি লইয়া, দক্ষিণ হস্তে গীতার করতল গ্রহণ করিল। সেই পরম সম্পদ গ্রহণ করিয়া যুগলকিশোর মুহূর্ত্তমধ্যে ভাবিয়া লইল, "এই পাণিগ্রহণ হইয়া গেল, এখন আমি গীতার, গীতা আমার। আমার গীতাকে কে আমার কাছ হইতে বিছিন্ন করিবে?" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে গীতাকে গাড়ী হইতে নামাইল, এবং তাহার পিতার নিকট পৌছাইয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত হইলে, যুগল অগত্যা ছুটিয়া আপন দ্বিতীয় শ্রেণী কামরায় যাইয়া বসিল; গাড়ী ছাড়িল। সেই নির্জ্জন কামরায় বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, যেমন করিয়াই হউক, দুই তিন মাস মধ্যে গীতাকে সে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিবে। সে ত জানিত না যে গীতার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে এবং এক মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নৌকাডুবি।

যুগলকিশোর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আই-ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; আগামী সোমবার হইতে, তাহাকে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে হইবে। সে শনিবারেই শিবপুরে আসিয়াছিল। কলেজ হষ্টেলে নিজের স্থান গুছাইয়া রাখিয়া, সে একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল।

হষ্টেলে ফিরিবার সময়, কলেজ ঘাটের নিকট আসিয়া সে দেখিল যে ঘাট হইতে দূরে একখানা যাত্রী-ষ্টীমার দাঁড়াইয়াছে; এবং তাহা হইতে ঘাটে আসিবার জন্য যাত্রী সকল ক্রমান্বয়ে একখানা পান্সীতে চড়িতেছে। লোকের পর লোক পান্সীতে নামিতে লাগিল। পান্সীর মাঝি চিৎকার করিয়া বলিল, 'আর নয়, আর নয়, পান্সী ভারি হয়েছে, আর লোক নিতে পারব না।' কিন্তু নিয়তি যাহাদিগকে টানিয়াছিল, তাহারা শুনিবে কেন? তাহারা কেহই মাঝির কথা গ্রাহ্য করিল না; ষ্টীমার হইতে আরও অনেক লোক নৌকায় নামিল। লোকের ভারে, নৌকার প্রায় 'কাণা' অবধি জল উঠিল। মাঝি এই মগ্নপ্রায় নৌকা তীরের দিকে চালিত করিল। দূরে একখানা ষ্টীমার ছুটিয়াছিল। তাহার একটা ঢেউ আসিয়া লোকপূর্ণ নৌকায় সামান্য আঘাত করিল। সেই সামান্য আঘাতে নৌকা একটু হেলিল; নৌকার লোক সকল একটু বিচলিত হইল; নৌকা অন্যদিকে টলিল; নৌকারোহীরা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল; নৌকা দুলিয়া উঠিল,—গেল, গেল। আতঙ্কে আরোহীগণ আর্ত্তনাদ করিল। পর মুহূর্ত্তে নৌকা ও আরোহী জলমধ্যে অদৃশ্য হইল। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, কয়েকজন আরোহী ভাসিয়া উঠিল; তাহাদের মধ্যে কয়েকজন আবার ডুবিল; অন্য কয়েকজন সাঁতরাইয়া তীরের দিকে আসিতে লাগিল। আবার কিয়ৎকাল পরে, দূরে দূরে, জলমগ্নগণের কয়েকখানা অবশ হস্ত জলের বাহিরে দেখা গেল; এবং পরক্ষণেই তাহা আবার অদৃশ্য হইল। তাহার পর, গঙ্গার তর্ তর্ স্রোত যেমন প্রবাহিত হইতেছিল, তেমনিই প্রবাহিত হইতে লাগিল।

যে ষ্টীমারের যাত্রীসকল নিমজ্জিত হইয়াছিল, তাহার নাবিকগণ মগ্ন লোক সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই; ষ্টীমারের ধারের রেলিং ধরিয়া, বিশুষ্ক নয়নে, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতেছিল; স্বজাতির জীবন রক্ষা করিবার জন্য পাপিষ্ঠেরা একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করিল না। এই নৌকাডুবির কথা, এবং ষ্টীমারের নাবিকদিগের ঐ অস্বাভাবিক নির্দ্দয়তার কথা অনেকেই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন, এজন্য আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব না।

এই ভয়ঙ্কর নরহত্যার দৃশ্য দেখিয়া যে সকল লোক কলেজ ঘাটে ব্যাকুল নয়নে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের অধিকাংশ কেবলমাত্র দুঃখপ্রকাশই করিল; সন্তরণ-

শিক্ষা বা সৎসাহসের অভাবে জলে নামিল না। কিন্তু দুই চারিজন ব্যক্তি—যে দেবোপম মানবগণ পরের বিপদুদ্ধারের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে কাতর নহেন—জলে নামিয়া কতকগুলি মগ্ন লোককে তীরে উঠাইতে লাগিলেন। যুগলকিশোর তিনজন মগ্ন লোককে উদ্ধার করিল। তাহাদের মধ্যে দুইজন সহজেই জ্ঞানলাভ করিয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। তৃতীয় ব্যক্তির সহজে জ্ঞান লাভ হইল না। যুগলকিশোর কিয়ৎকাল নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ভাড়াটিয়া গাড়ী আনাইয়া, তাহাকে হাওড়ার হাঁস্পাতালে লইয়া গেল। সেখানে বহু যত্নে রাত্রি আটটার পর তাহার জ্ঞান জন্মিল।

সে সুস্থ হইলে যুগলকিশোর তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে সে একজন বরযাত্রী; বরের সহিত কলিকাতা হইতে শিবপুরে আসিতেছিল। বর, বর-কর্ত্তা, পুরোহিত, নাপিত এবং এগারজন বরযাত্রী সকলেই ঐ নিমজ্জিত নৌকায় ছিল। অন্য সকলের কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা সে বলিতে পারে না।

যুগলকিশোর বরযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"শিব-পুরে আপনারা কাদের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন?"

বরযাত্রী। রত্নেশ্বর গাঙ্গুলীর বাড়ী।

যুগল। তিনি কি করেন?

বরযাত্রী। শুনেছি, হাওড়ার আদালতে মোক্তারি করেন।

যুগল। শিবপুরে তাঁর বাড়ী কোথায়?

বরযাত্রী। শিবতলা গলি,—নম্বরটা আমার মনে পড়ছে না।

যুগল। তার জন্যে চিন্তা নেই। একটা গলির মধ্যে একটা বিবাহের বাড়ী অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারব। তাঁর বাড়ীর দরজায় ফুল পাতার মালা থাকবে, কলাগাছ থাকবে, পূর্ণ কুম্ভ থাকবে; তাঁর বাড়ীর ছাদে হোগলা পাতার ছাউনি থাকবে। এই সকল চিহ্নে বিবাহ বাড়ী সহজেই চিন্‌তে পারব। তা ছাড়া সেটা একজন মোক্তারের বাড়ী; পাড়ার সকলেই তা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে।

বরযাত্রী। আপনি কি সেখানে যাবেন?

যুগল। আমার একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। বর তীরে উঠতে পেরেছেন কিনা বলিতে পারি নে। কিন্তু যদি উঠ্‌তে না পেরে থাকেন, তা হলে ভেবে দেখুন, ঘটনাটা কি ভয়ানক হবে! একটা মানুষের জীবন ত গেলই; তার উপর সমাজ শাসনে একটা নির্দ্দোষী বালিকার সমস্ত জীবন বৃথা হয়ে যাবে; সে চিরকাল পতিতা হয়ে থাকবে। হিন্দু সমাজে আর কেউ কখনও তাকে বিবাহ করবে না; সে আজীবন একটা দুঃখময় জীবন যাপন করবে। কি ভয়ানক!

বরযাত্রী। এই রাত্রেই অপর পাত্র সন্ধান করে যদি তার বিবাহ দেওয়া যায়, তবেই তার বিবাহ হবে।

যুগল। এই রাত্রের মধ্যে নূতন পাত্র কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

হঠাৎ একটা কথা যুগলকিশোরের মনে উদিত হইল। বরের অভাবে, এই বরযাত্রীকে লইয়া গিয়া ইহার সহিত বালিকার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া সে বলিল—"চলুন, আপনি চলুন, বরকে পাওয়া না গেলে, আপনি কন্যাকে বিবাহ কর-বেন।"

বরযাত্রী। অসম্ভব। শুনেছি, কন্যা মস্ত কুলীন কুমারী; আমি বংশজ ব্রাহ্মণ, বিবাহিত। আপনি কি ব্রাহ্মণ?

যুগল। হ্যাঁ।

বরযাত্রী। আপনিই ত ঐ মেয়েকে বিবাহ করতে পারেন।

যুগলকিশোর গীতার কথা ভাবিয়া বলিল—"আমিও এক রকম বিবাহিত। তা ছাড়া, আমিও কুলীন নই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বর কোথায় ?

মাঠে যে সময় ফসল না থাকিত, সে সময় গো-যানে আরোহণ করিয়া মাঠের উপর দিয়া, রতনপুর হইতে চৌগ্রামে আসা চলিত। বৃদ্ধ হারাধন, একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহার উপর পুরাতন মাদুর ও সতরঞ্চ দিয়া আচ্ছাদন রচনা করিয়া, পত্নীকে এবং কন্যাকে লইয়া, মেমারী রেল ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন। তথায় রেলগাড়ীর জন্য দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া, গাড়ী পাইয়া হাওড়ায় আসিয়াছিলেন, এবং হাওড়া হইতে শিবপুরে শিবতলা গলিতে শ্যালক শ্রীরত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া কয়েকদিন সেকরার দোকানে আনাগোনা এবং বিবাহের অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন।

আজ বিবাহ। বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে আগন্তুক ভদ্রগণের বসিবার জন্য আসন রচনা করা হইয়াছিল। ঐ আসরের মধ্যভাগে বরের জন্য উজ্জ্বল আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। ছাদের কড়ি হইতে বেললণ্ঠন সকল ঝুলিতেছে এবং দেওয়ালে দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে। বরের আসনের দুই পার্শ্বে দুইটি শামাদানে বাতি জ্বলিতেছিল। বাড়ীর ছাদের উপর হোগলাপাতার আচ্ছাদন রচিত হইয়াছিল; সেই আচ্ছাদনতলে এক স্থানে রন্ধনাদি হইতেছিল; অবশিষ্ট স্থানে বরযাত্র ও অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণের আহারের জন্য কুশাসন সকল বিস্তৃত ছিল। ভিতর বাটীতে দ্বিতলে কলকণ্ঠনাদিনী কুলললনাগণ শুভ্র শয্যায় বাসরঘর সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বারের কাছে, রত্নেশ্বরের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র, গীতাদিদির বিবাহোপলক্ষে রঙ্গিণ জাপানি কাগজে কবিতা ছাপাইয়া, তাহা হস্তে লইয়া হাস্য মুখে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল। কিন্তু বর কোথায় ? বরযাত্রীরা কোথায় ?

পাড়ার দুই একজন পরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া, আসরে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। রত্নেশ্বর বাবু ছাদে যাইয়া হৃষ্ট নয়নে দেখিলেন যে ব্যঞ্জনাদি সমস্ত রন্ধন হইয়া গিয়াছে এবং লুচি ভাজা আরম্ভ হইয়াছে। পুরনারীগণ বিচিত্র আলেপন-চিত্রিত পীঁড়ি দুইখানি বরকন্যার জন্য পাতিয়া রাখিলেন; শঙ্খটি খুঁজিয়া হাতের কাছে রাখিলেন, বর আসিলেই বাজাইতে হইবে। নাপিত প্রতিজ্ঞা করিল যে দুই টাকার কম বরের ধুতিখানা ছাড়িবে না। পুরোহিত পঞ্জিকার পাতা উল্টাইয়া বলিলেন যে রাত্রি নয়টা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত শুভলগ্ন আছে। এক ভদ্রলোক পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া, তাহা দেখিয়া বলিলেন যে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বর কোথায় ?

বৃদ্ধ হারাধন অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পরই বর আসিবার কথা ছিল। রাত্রি নয়টা বাজিল, বর আসিল না কেন ? আজ সন্ধ্যার পর ঝড় বৃষ্টি হয় নাই যে তাহার জন্য তাঁহাদের বাহির হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছে; আজ শনিবার, বরযাত্রীরা সকলেই সকাল সকাল আপিস হইতে ফিরিয়াছে। তবে এখনও আসিয়া পৌছিতে পারিল না কেন ? হারাধন বলিলেন—"বেশী দূর নয় ত, আমি ষ্টীমার ঘাট পর্য্যন্ত এগিয়ে একবার দেখি।" এই বলিয়া তিনি জামা চাদর ও জুতা পরিয়া বাহির হইলেন। সেদিন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, কাযেই তাঁহার পথ চিনিতে অসুবিধা হইল না।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়, বিবাহ বাড়ীর দরজায় একখানা ফিটন গাড়ী আসিয়া থামিল। বাটীর দরজার সম্মুখে গাড়ী থামিতে দেখিয়া, সরগোল পড়িয়া গেল; সকলেই মনে করিল, বর আসিয়াছে। বাড়ীর ভিতর স্ত্রীলোকদিগের কাছে সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ পৌছিল; স্ত্রীলোকেরা পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিল। রত্নেশ্বর বাবু ছুটিয়া দরজার নিকট আসিলেন। কিন্তু তিনি বরকে দেখিতে পাইলেন না। গাড়ী হইতে অন্য এক ব্যক্তি অবতরণ করিল; সে যুগলকিশোর।

যুগলকিশোর হাওড়া হাঁসপাতাল হইতে একটা

ফিটন গাড়ীতে শিবপুরের কলেজ হষ্টেলে পৌঁছিয়া, আর্দ্র ও মলিন বসন পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়া এবং কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া আসিয়াছিল। সে গাড়ী হইতে নামিয়া, বাড়ীর দরজায় রত্নেশ্বর বাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নমস্কার মশায়! আপনারই কি এই বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারই কি নাম রত্নেশ্বর গাঙ্গুলী?"

"হ্যাঁ।"

"আজ আপনারই কি কন্যার বিবাহ?"

"কন্যার নহে, আমার কন্যা নেই; আমার ছোট ভগিনীর কন্যার বিবাহ হবে।"

"বর, বরযাত্রীরা এসেছেন কি?"

"না; এত বিলম্ব হবার কারণ কি, আমরা বুঝতে পারছি নে। মেয়ের বাপ—আমার ভগিনীপতি—অনুসন্ধান করতে গেছেন।"

"বর বরযাত্রী সম্বন্ধে আমি আপনার নিকট একটা সংবাদ নিয়ে এসেছি। সেটা কিন্তু দুঃসংবাদ।"

"কি?"

"ষ্টীমার থেকে তীরে নামবার জন্যে বর বরযাত্রীরা একখানা নৌকায় উঠেছিলেন। সেই নৌকাখানা ডুবে গিয়েছে। নৌকাতে আরও অনেক লোক ছিলেন। দশ বারজন ছাড়া নৌকার কোন লোকই তীরে উঠ্‌তে পারেন নেই। একজন বরযাত্রীকে আমি তীরে তুলতে পেরেছিলাম; তাঁর মুখে আপনাদের ঠিকানা জেনে আমি সংবাদ দিতে এসেছি। বড়ই অপ্রিয় সংবাদ দিতে হল, আমাকে ক্ষমা করবেন।"

এই সংবাদ অল্পকাল মধ্যে সমস্ত বাটীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; আনন্দোৎসব হাহাকারে পরিণত হইল।

এই মহাবিপদগ্রস্ত গৃহস্থকে এই বিপদ সাগর হইতে কিরূপে উদ্ধার করিবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে যুগলকিশোর আসরে গিয়া উপবেশন করিল। সমাগত লোকদিগের মধ্যে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মশায়ের সন্ধানে কি কোন সৎপাত্র আছে?"

সহসা যুগলকিশোরের মনে পড়িয়া গেল যে তাহার পরিচিত এবং তাহার পিতার দ্বারা উপকৃত এক যুবক এই শিবপুরেই বাস করে। এই যুবকের মাতা তাহাকে বলিয়াছিলেন যে একটি সুন্দরী পাত্রী পাইলে, তিনি পুত্রের বিবাহ দেন। এই যুবকটী বি-এ পাস করিয়া হাওড়া রেলষ্টেসনে একটি পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরী করিতেছিল; এবং ভবিষ্যতে তাহার আরও অনেক উন্নতির আশা ছিল। এই যুবকের কথা স্মরণ করিয়া যুগলকিশোর কহিল—"আমি পাত্র খুঁজে আনব। এই শিবপুরেই আমার জানিত এক ব্রাহ্মণ যুবক আছে। বি-এ পাস করেছে, বয়স চব্বিশ বৎসর। আপনাদের মেয়ে যদি খুব সুন্দরী হয়, তাহলে চেষ্টা দেখি; কারণ তার মা সুন্দরী মেয়ে পান না ব'লে ছেলের আজও বিয়ে দেন নি।"

কথাটা রত্নেশ্বর বাবুও শুনিলেন। বিপদ-সাগরের মধ্যে তিনি যেন একখানা তরণী দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাত্র কি গোত্র?"

যুগল। সে কি গোত্র তা ত আমি বলিতে পারি নে। সে চট্টোপাধ্যায়, কুলীন বটে, আমি কেবলমাত্র এই জানি।

রত্নেশ্বর। তাঁরা কি মেল জানেন কি?

যুগল। দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার মনে পড়েছে, ঐ পাত্রের মা একদিন আমাকে বলেছিলেন, যে তাঁরা খড়দা মেল।

রত্নেশ্বর। আহা! ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। তিনি আপনাকে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা করে পাঠিয়েছেন। আমাদেরও খড়দা মেল। আপনি সেই পাত্রটি এনে দিন। আমাদের মেয়ে খুব সুন্দরী সে জন্যে ভাবনা নেই। আপনি বরং একবার বাড়ীর ভিতর চলুন, মেয়েটিকে দেখবেন। তার মাকে বলতে পারবেন। কিংবা

না, আপনি এইখানেই বসে থাকুন, আমি তাকেই এখানে নিয়ে আসি।

রত্নেশ্বর বাবু গীতাকে আনিবার জন্য বাটীর মধ্যে যাইয়া, এই অপরিচিত যুবকের সদাশয়তার কথা বলিলেন। শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গীতার হৃদয়ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া রহিল। সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া সে মাতুলের সহিত বহির্ব্বাটীতে আসিল।

শামাদানের আলোক যুগলকিশোরের সুগৌর মুখের উপর পড়িয়াছিল। বাহিরের অন্ধকার হইতে তাহাকে দেখিয়া, গীতা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, এই পরম সুন্দর যুবকটি কি সকল স্থানেই সকলের উপকার করিয়া বেড়ায়! আবার মনে পড়িল, সেই মেমারী ষ্টেশনে তাহার হাত ধরার কথা। বালিকা বুঝিতে পারিল না, সে কথা স্মরণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল কেন।

গীতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া যুগলকিশোর চমকিয়া উঠিল। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল—"গীতা! গীতা! তুমি এখানে কেমন করে এলে?"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন—"আপনি আমার ভাগ্নীকে চেনেন?"

যুগলকিশোর আপনাকে সংযত করিয়া বলিল—"হাঁ; আমি গত চৈত্র মাসে একবার এক গাড়ীতে এঁদের সঙ্গে মেমারী পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম।"

গীতা মনে মনে বিস্মিত হইল। এই যুবক তাহার নাম জানিল কিরূপে? এই যুবক সম্বন্ধে সেদিনকার প্রত্যেক ঘটনাটি গীতা মনে করিয়া রাখিয়াছিল—কৈ তাহার বাবা ত তাহার নামটী ইহাকে বলেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

যুগলকিশোর এক মহাসুযোগ পাইয়াছিল; এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কি সে গীতাকে আপনিই বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে? একবার ইতস্তত ঘুরিয়া সে যদি বলে যে তাহার পরিচিত যুবককে পাওয়া গেল না, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তারা নিরুপায় হইয়া নিশ্চয়ই বংশজকে কন্যাসম্প্রদান করিতে আপত্তি করিবেন না; কারণ কন্যা আজীবন অবিবাহিত থাকা অপেক্ষা ইহাও শ্রেয়ঃ। তখন, অনায়াসে তাহার গীতালাভ ঘটিবে। যদিও সে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যে কৌশলেই হউক সে গীতাকে বিবাহ করিবে, তথাপি এই সুযোগ পাইয়া, তাহা গ্রহণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। এই দৈব সুযোগের নীচতায় নামিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

সেই ভাড়াটিয়া ফিটন গাড়ীটা বিবাহবাটীর দরজাতেই দাঁড়াইয়া ছিল। যুগলকিশোর তাহাতে চড়িয়া তাহার সেই পরিচিত যুবকের অনুসন্ধানে বাহির হইল। তাহার নির্দ্দেশ মত গাড়ী চালিত হইয়া, সেই যুবকের বাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আবার ভবিতব্যতার মহাশক্তি প্রকট হইয়া উঠিল। যুগলকিশোর দেখিল, সেই বাটীর দরজায় তালা ঝুলিতেছে; তাহারা বাটীতে চাবি বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিকটে অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে তাহারা দুই তিন দিন কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

অগত্যা সে বিবাহবাটীতে একাকী প্রত্যাগত হইল; এবং এক্ষণে আপন বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপনে আর কোন প্রকার স্বার্থপরতা ও নীচতা না থাকায়, সে কহিল—"আমি যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম, তার সাক্ষাৎ পেলাম না; বাড়ীতে তালাবন্ধ করে সে কোথায় গিয়েছে। আপনাদের যদি অমত না হয়, আর আমি যদি নিতান্ত অযোগ্য পাত্র না হই, তা হলে আমার সঙ্গে পাত্রীর বিবাহ দিতে পারেন। আমি এই শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, আমার পিতা বর্দ্ধমানের উকিল। আমার নাম যুগলকিশোর চক্রবর্ত্তী।

সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে তখনও যাঁহারা আসরে বসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—

"আমি আপনাকে চিনেছি; আপনি আমার জামাতার সঙ্গে একত্রে শিবপুর কলেজে পড়েন। আপনি আমার জামাতার সঙ্গে একবার আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন এখন একথা আমার বেশ মনে পড়ছে।"

যুগলকিশোর বলিল—"আপনি রমণকৃষ্ণের শ্বশুর, এইবার আমি আপনাকে চিনেছি।"

পুরোহিত বলিলেন—"রাত্রি বারটা বাজল; আর এক ঘণ্টা মাত্র লগ্ন আছে; যা হোক একটা ব্যবস্থা শীঘ্র করে ফেলুন।"

যুগলকিশোর কহিল—"আমি বংশজ, আপনারা কুলীন, এই একটা আপত্তি আপনাদের হতে পারে। কিন্তু এই রাত্রে, একঘণ্টার মধ্যে আপনারা কুলীন পাত্র কোথায় পাবেন?"

সমাগতগণ বলিলেন যে যখন হারাধন মুখোপাধ্যায়ের পুত্রসন্তান নাই, তখন বংশজের সহিত এরূপ ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহ দিলে কোনও ক্ষতি হইবে না।

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন—"আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি নে। আবার এই সময় হারাধন কোথায় গিয়ে বসে রইল!"

যে ভদ্রব্যক্তি যুগলকিশোরের পরিচয় জানিতেন, তিনি বলিলেন—"তাঁর অভাবে আপনিই কন্যার মাতার মত নিয়ে কার্য্য করতে পারেন। আর আমি জোর করে বলছি যে পাত্র অতি সৎ, আমার জামাতা সর্ব্বদা এঁর সুখ্যাতি করে থাকেন।"

ভগিনীর নিকট যাইয়া রত্নেশ্বর বাবু তাঁহাকে সকল কথা শুনাইলেন।

মাতা যুগলকিশোরের সেই একদিনকার গল্প কন্যার মুখে শুনিয়াছিলেন। তাহাতে বুঝিয়াছিলেন যে কন্যা যদি সেইরূপ বর লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে চিরসুখিনী হইবে। হারাধনও একদিন গৃহিণীর নিকট যুগলকিশোরের সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, হাঁ সুন্দর বটে; যাহারা এরূপ সুন্দর জামাতা লাভ করিতে পারে, তাহাদের জীবন সার্থক হয়। এই সকল কথা মনে করিয়া এবং এই অঘটন ঘটনায় বিধাতার হাতের খেলার পরিচয় পাইয়া, তিনি বলিলেন—"দাদা, আমি এই নূতন পাত্রকে জানালা থেকে দেখেছি; এ বিয়েতে আমার একটুও আপত্তি নেই। তিনিও বাড়ী ফিরে আপত্তি করবেন না। দেখছ না, এ ত আমাদের মানুষের পছন্দ করা বর নয়; এ ভগবানের পাঠিয়ে দেওয়া বর; এমন বর কোথায় পাবে?"

রত্নেশ্বর বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমি কন্যাসম্প্রদান করব, আপনি শীঘ্র উদ্যোগ করে নিন।"

ঐ বাক্যের সহিত বাটীতে আবার আনন্দোৎসব ফিরিয়া আসিল। পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনিতে দিক্ সকল পুলকিত হইয়া উঠিল। সেই শঙ্খধ্বনির মধ্যে গীতা আসিয়া তাহার পুলকাবেগ কষ্টে সম্বৃত করিয়া মন্ত্রপূত ও আবেগভরে ঈষৎ কম্পিত হস্তখানি বাড়াইয়া দিল; যুগলকিশোর আপন মন্ত্রপূত হস্তে তাহা গ্রহণ করিল। বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর বাসরঘরে বসিয়া যুগলকিশোর তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। লিখিল যে, তিনি রতনপুর নিবাসী হারাধন মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন অভাবনীয় কারণে অগ্ররাত্রেই তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে; আগামী সোমবার কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নিকট সাত দিনের ছুটী লইয়া, নবপরিণীতা বধূকে লইয়া সে দেশে ফিরিবে।

হারাধন গঙ্গার ঘাটে ঘাটে সারারাত নির্দ্দিষ্ট পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া নিশাবসানে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। বাটী আসিয়া শুনিলেন যে কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বংশজ পাত্রের সহিত কুলীনকুমারীর বিবাহ দিতে হইল বলিয়া তিনি কিছু বিমর্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু জামাতাকে দেখিয়া, এবং তাহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না—বারংবার বলিতে লাগিলেন—ইহাকেই বলে ভবিতব্যতা।

যুগলকিশোর সোমবার-দিন সকালে কলেজের প্রিন্‌সিপ্যালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। প্রিন্‌সিপ্যাল তাহার আই-ই পরীক্ষার উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন; তাহার উপর সেইদিন প্রত্যূষের সংবাদপত্র পড়িয়া তিনি জানিয়াছিলেন যে, তাঁহারই কলেজের যুগলকিশোর নামক একটি ছাত্র, আপন জীবন বিপন্ন করিয়া, জলনিমজ্জিতগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল; ইহাতে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। কাযেই যুগলকিশোর সহজেই এক সপ্তাহের ছুটি পাইল। ছুটি পাইয়া সে হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া আসিল এবং বেলা এগারটার গাড়ীতে নববধূকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিল।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ধরণী

ধরণী! ওমা ধরণী!
অয়ি-অবিচলা স্নেহ-চঞ্চলা
স্নিগ্ধ শ্যামল বরণী!
তোমার বুকের সুধারস পিয়ে
তরুশিশু ঢল ঢল,
তোমার সবুজ অঞ্চল-ছায়ে
ফুল মেলে আঁখিদল,
অঙ্গনে তব বনবীথিকায়
বিহগ-কণ্ঠে সুর উথলায়,
স্নেহের পরশে শিশু মেলি আঁখি
হেরে তোমা মনোহরণী।

তোমার কোমল বুকে রাখি মাথা
পশুপাখী ভাই ভাই,
তরুলতা নর কীট-বিহঙ্গে
ভেদাভেদ কভু নাই;
নদী নির্ঝরে স্তন্য-সুধার
কল্লোল ধারা বহে অনিবার,
ভাণ্ডার ফল কুসুম শস্যে
ভরেছ বিশ্বভরণী!

ওমা বুঝি তোর বক্ষের আড়ে
বাজে বেদনার হাহাকার,—
দগ্ধ পাঁজর দহি হল ক্ষীরা
তপ্ত হিয়ার অনিবার;
নিখিলের দুখে নয়নের জল
মর্ম্মর হল জমি' অবিরল,
বিদলিত বুকে শোণিত ধারায়
রক্ত-শিলার সরণি!

কান পেতে শুনি দুরু দুরু দুরু
কাঁপে কোথা হিয়া থর থর,
বিগলিত স্নেহ বাঁধন টুটিয়া
বহে নির্ঝরে ঝর ঝর;
রুদ্ধ ব্যথার নিশ্বাস বায়
অনল গিরির মুখে বাহিরায়,
অধীর হিয়ার উন্মাদ-দোলে
দোদুল বিশ্বপরাণী!

সুবিপুল তব স্নেহের সায়রে
সীমা খুঁজে কভু নাহি পাই,
বুঝি সবাকার জননীর মাঝে
শতরূপে ধরা দেছ তাই!
আমার মায়ের বক্ষ মাঝার
লভি তাই স্নেহ-পরশ তোমার,
নিখিল-জননী অয়ি ধরিত্রি!
নিখিল-মানস-হরণী!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

কুট-যুদ্ধে তুর্কীহস্তে বন্দী বাঙ্গালীর আত্মকাহিনী

[আমার জনৈক বন্ধুর এক আত্মীয় শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভট্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের Supply & Transport Department-এ কর্ম্ম করেন। তিনি মেসোপোটেমিয়ায় কেরাণীরূপে প্রেরিত হইয়া কুট-আমারার 6th Divisionএর সহিত বন্দী হইয়াছিলেন। এখন তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছি তাহাই অবিকল এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।]

১৯১৫ সাল, অক্টোবর মাস, জগন্মাতা দশভূজার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি যথারীতি উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম; পুত্র-কন্যা লইয়া সময়োচিত আনন্দ উপভোগ করিলাম। তখনও জানিতাম না যে আমার নাম (সীতানাথ ভট্ট) তৎপরমাসের অর্থাৎ নবেম্বরের Recruit-তালিকাভুক্ত হইবে; তবে অনতিবিলম্বেই যে আমাকে য়ুরোপ কিংবা পূর্ব্ব-আফ্রিকা অথবা মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই স্থির ছিল। যে কয়টা দিন স্বদেশে অতিবাহিত করা যায় তাহাই ভাল, কারণ সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে, কোনওরূপে সংসারের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে; তাহার পর ভগবদিচ্ছা।

ক্রমশঃ উৎকণ্ঠা হইতে নিবৃত্তিলাভের দিন উপস্থিত হইল। নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আফিস হইতে আজ্ঞা প্রচারিত হইল আমাকে এবং আমার কয়েকজন সহকর্ম্মীকে দুই দিবসের মধ্যে মেসোপোটেমিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইবে। আজ্ঞা-প্রচার হইবামাত্র আমাদের সকলেরই মুখের দীপ্তি মলিন হইয়া গেল, পরমাত্মীয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার মর্ম্মস্পর্শী যাতনা চিত্তকে আলোড়িত করিল। বৈকালে বাসায় আসিয়া একটি তোরঙ্গের মধ্যে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র বোঝাই করিলাম—সরকার প্রদত্ত কিট্ (Kit) ত আছেই—সেইগুলি সঙ্গে লইয়া তৎপরদিন সন্ধ্যার সময় জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া, বাটী হইতে রওনা হইলাম।

যথাসময়ে আমি বসরায় পৌঁছিলাম। কয়েকদিন মাত্র সেখানে অবস্থিতি করিবার পর, ১লা ডিসেম্বর হইতে আমাদের ডিভিসন্ (Division) সোলেমান পার্ক হইতে কুট-আমারার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। ঐ মাসের ৪ঠা তারিখে আমি তাহাদের সহিত তথায় উপনীত হইলাম। পরদিন (৫ই ডিসেম্বর) তুর্কী সৈন্য আমাদিগকে বেষ্টন করিল। প্রথম দিবস আমাদের সেনা-নায়কেরা দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলেন যে, ইংরাজ শিবির হইতে শত্রুপক্ষ ৪৫ মাইল দূরে আছে এবং নদীর (টাইগ্রীস) দিকটা ছাড়িয়া স্থলভাগের তিন দিকে আড্ডা স্থাপন করিয়াছে। পরদিন দেখা গেল যে তাহারা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে; ক্রমশঃ তাহারা ইংরাজ-শিবিরের দশ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া আমাদিগের উপর ভীষণভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করিল।

ব্রিটিশ রণবাদ্যের মনোহর ঝঙ্কার এবং রণভেরীর নিনাদ দিগন্ত কম্পিত করিয়া মরুপ্রান্তরে, টাইগ্রীস্ বক্ষে এবং সুদূর অন্তরীক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল। সহস্র সহস্র শিক্ষিত অশ্ব এবং অশ্বতর হ্রেষারব করিয়া তাহাদের কর্ম্মতৎপরতা জ্ঞাপন করিল। চতুর্দ্দিকে সজ্জিত সেনাগণ প্রাণপণ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। বর্ষার প্রবল ধারার ন্যায় বর্ষিত ইংরাজ এবং তুর্কীর গোলাগুলিতে গগনমার্গ আচ্ছন্ন হইল। দিনে বা রাত্রে কোন সময়েই মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধের বিরাম নাই।

যে খাদ্যসামগ্রী অভিযানের সহিত কুটে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম পাদে অভাবের লক্ষণ সূচিত হইল। দিনের পর দিন যতই অতীত হইতে লাগিল, ইংরাজ-শিবিরে খাদ্যাভাব-জনিত বিভীষিকা ততই ভীষণ

হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। শিবিরের তিনটা দিক তুর্কীগণ রুদ্ধ করিয়াছে, কেবল নদীর দিকটা উন্মুক্ত ছিল। নদীর দিক ব্যতীত অন্য কোনও দিক দিয়া আহার সরবরাহ করিবার উপায় ছিল না। দুই তিন দিন অন্তর 'উড়ো জাহাজ' হইতে যে খাদ্যসামগ্রী ফেলিয়া দেওয়া হইত, তাহা চল্লিশ সহস্র বীরপুরুষের পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর। একখানা জাহাজে খাদ্য বোঝাই করিয়া শিবিরে পাঠাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় উহা নদীর একটা চড়ায় এরূপ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইল যে তাহাকে কোন প্রকারে উদ্ধার করিয়া নদী-বক্ষে ভাসাইতে পারা গেল না। এই দৈব দুর্ব্বিপাক যে একটা ভয়ঙ্কর অনিষ্টের বীজ রোপণ করিল, দূরদর্শী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি জেনারেল টাউনসেণ্ড সাহেব তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রমাদ গণিলেন।

ইংরাজের সাহস, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অভিভূত হইতাম। মার্চ্চ মাস হইতে শিবিরের প্রত্যেক ব্যক্তি তিন আউন্স (১॥০ ছটাক) যবের আটা এবং কিছু ঘোড়ার মাংস আহারের জন্য পাইত; সেই খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজ সৈন্য বীরবিক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম,—অর্থাৎ কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলি ইত্যাদি প্রচুর ছিল, আহার্য্যের অল্পতাই অনিষ্টের মূল হইল।

তুর্কী সৈন্য আমাদিগের উপর অবিরাম গোলাগুলি নিক্ষেপ করিত; ক্রমে বন্দুকের গুলির হিস্‌হিস্ রবে আমরা এরূপ অভ্যস্ত হইলাম যে, সেগুলা আমাদের আশ্রয় (তাম্বু) ভেদ করিয়া আমাদিগের মস্তকের উপর দিয়া, পার্শ্ব দিয়া এবং কথনও বা কোটের উপর ঘর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলেও আমরা তাদৃশ ভীত হইতাম না। তবে যে বন্দুকের সকল গুলিই এরূপ সরলভাবে লুকো-চুরী খেলিয়া চলিয়া যাইত এমন নহে; কোন কোনটা বা লোকজনকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিত। শত্রু-গণ মধ্যে মধ্যে আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া আমাদের বিশেষ অনিষ্ট করিত। আমাদের সুদক্ষ জেনারেল সাহেব ভূমি খনন করাইয়া মসীজীবিদিগকে ভূগর্ভে বাস করিতে আদেশ করিলেন,—আমরাও আমাদের জীবন সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইলাম।

১৯১৬, ২৮শে এপ্রিল তারিখে শিবির খাদ্যসামগ্রী-শূন্য হইল। ২৯ তারিখে আমাদের জেনারেল সাহেব অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধ স্থগিত (Armistice) জ্ঞাপক নিশান তুলিয়া, তুর্কীদিগের জেনারেল খালিফ পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া শ্বেতপতাকা উত্তোলন করিলেন। কুটের পতন হইল।

৩০শে এপ্রেল, দ্বিপ্রহরে, তুর্কী সৈন্য দলে দলে আমাদের শিবিরে প্রবেশ করিল। সে সময়ে আমি একখানা কাষ্ঠাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া কতিপয় সহ-কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম। তখন আমি একটি অজানুলম্বিত পাজামা (নিকার), একটি শার্ট এবং একজোড়া মোজা মাত্র পরিধান করিয়া ছিলাম। প্রায় ৩০ জন তুর্কী সেনা আমাদের আবাস-স্থলে প্রবেশ করিল এবং আমাদের প্রত্যেককে তিনজনে আক্রমণ করিল। দুইজনে প্রত্যেকের দুই বাহু দৃঢ়মুষ্টি সংযোগে চাপিয়া ধরিল এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাহার সমস্ত পরিধেয় তন্নতন্ন রূপে অনুসন্ধান করিয়া টাকা কড়ি যাহা পাইল আত্মসাৎ করিল। অতঃপর আমা-দের তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিল। এই তস্করোচিত কার্য্য সম্পন্ন হইলে, অন্য একদল আসিয়া আমাদিগকে সেস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। আমি তাড়াতাড়ি একযোড়া চটিজুতা পদলগ্ন করিয়া বহির্দ্দেশে আসিলাম। দৈনিক ব্যবহারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপহৃত হইল, অথচ সে সকল জিনিস ব্যতিরেকে দিনযাপন করা অতিশয় কষ্টজনক হইবে। সাত পাঁচ ভাবিয়া, আমরা আমাদিগের জনৈক কর্ণেল সাহেবের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে আমাদের অবস্থা বিস্তারিত জ্ঞাত করি-লাম। তুর্কীরা যদি কোন জিনিষ ফেলিয়া গিয়া থাকে, সেইগুলি পাইবার আশায় একবার বাসায় প্রবেশলাভের

নিমিত্ত তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলাম। সাহেব আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না; আমরা বাধ্য হইয়া জিনিষের মমতা পরিত্যাগ করিলাম।

তুর্কী সেনাগণ আমাদিগকে শিবির হইতে বিতাড়িত করিয়া, জনকয়েক প্রহরীর তত্ত্বাবধানে চাম্‌রাণের (Chamran) বন্দীনিবাস অভিমুখে পাঠাইয়া দিল। কুট হইতে চামরাণ অন্যূন ৭০ মাইল, জল-তৃণাদিশূন্য মরুপথ, চতুর্দ্দিকে বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, তাহার উপর নিদাঘের উগ্র সূর্য্যতাপ পতিত হইয়া তাহাকে অগ্নিবৎ উষ্ণ করিয়াছে—নির্নিমেষ নেত্রে অনেকক্ষণ এবং বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিলেও একটি উদ্ভিদ অথবা একবিন্দু জল দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই বালুকাময় পথে আমরা প্রতিদিন ২০-২৫ মাইল পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমরা যে বস্ত্র পরিধান করিয়া কুট হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এ পর্য্যন্ত তাহাই আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছিল। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে প্রাতে একখানি মকাইয়ের রুটি এবং কিঞ্চিৎ মটর কড়াই সিদ্ধ, সন্ধ্যাকালেও সেই উপাদেয় খাদ্য। আমরা সর্ব্বসমেত দশজন বাঙ্গালী তুর্কীহস্তে বন্দী হইয়া চলিয়াছিলাম। সেই ভয়ঙ্কর মরুময় পথ অতিক্রম করিতে করিতে আমাদের শ্রান্ত দেহের সহিত চক্ষুও ক্রমে ক্রমে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আসিত। তন্দ্রার ঝোঁকে চক্ষু নিমীলিত করিয়া চলিতে চলিতে কখনও যদি প্রহরীদিগের পশ্চাতে থাকিতাম, আর রক্ষা নাই, বিনা বিচারে তাহারা আমাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিত। হণ্টার (চাবুক), কিংবা বন্দুক অথবা সঙ্গীনের স্থূল প্রান্তের (Butt end) দ্বারা আমাদের কর্ত্তব্যপালনের পথ প্রদর্শিত হইত। তুর্কীর দেশে আর একটা বিচিত্র দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—অপরাধীর জুতা খুলিয়া নগ্ন পদতলে বেত্রাঘাত। পথের কষ্ট এবং নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া আমাদের দলের অনেক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল—মৃতের সংখ্যাও অল্প নহে।

আমাদের দলের কতিপয় পীড়িত ব্যক্তিকে রোগীনিবাসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এ ইংরাজের হাঁসপাতাল নহে, কলিকাতার মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্বেল স্কুল কিম্বা শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাঁসপাতাল নহে! তুর্কী হাঁসপাতালের শুশ্রূষা ও ব্যবস্থা অন্যরূপ। রোগী রোগ-নির্ব্বিশেষে হাঁসপাতালে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকে হামামে স্নান করান হয়। যাহারা অধিক সৌভাগ্যবান, কেবল তাহারাই আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিতে পায়। ইহা হইতেই অনুমান করিতে হইবে সেখানে রোগীর চিকিৎসা কিরূপ হইয়া থাকে এবং শতকরা কতগুলি রোগী হাঁসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার মনুষ্যসমাজে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়।

সার্দ্ধ দুই বৎসর কাল তুর্কীদিগের সংসর্গে থাকিয়া উত্তমরূপে বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, দয়া মমতা শূন্য। তাহারা অতিশয় অর্থলোভী, অর্থের বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে কায পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু যে তাহাদিগকে অর্থ দান করিতে না পারে তাহাকে তাহারা মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। বর্ব্বরতাই যেন তাহাদের আভরণ, কঠোরতা এবং অবৈধ উৎপীড়ন তাহাদের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে বিদ্যমান। আমাদিগের মধ্যে দুই এক ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ ছিল বলিয়া অদ্যাপি আমাদের ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে; নচেৎ তীব্র বালুকাশয্যার উপর আজ আমাদের কঙ্কালগুলি শায়িত থাকিত। উষ্ট্র কিংবা অশ্বতর চালকের হস্তে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া আমরা কিয়দ্দূরের জন্য তাহাদের পশুপৃষ্ঠে স্থান পাইতাম। এক দফা অর্থের বিনিময়ে তাহারা অর্থদাতাকে এক মাইল বা দুই মাইল পশুপৃষ্ঠে লইয়া যাইত, সেই পথটুকু অতিক্রান্ত হইলেই আরোহীকে অবতরণ

করিতে বাধ্য করিত, এবং অন্য একজনের অর্থ গ্রাস করিয়া তাহাকে কিয়দ্দূর লইয়া যাইত, অথবা পূর্ব্বব্যক্তি যদি আর এক দফা অর্থ দিতে সম্মত হইত তাহা হইলে তাহাকেই আরও কিয়দ্দূর লইয়া যাইত। পথে আমরা যে সামান্য খাদ্য পাইতাম, তাহা হইতেও তাহারা কিছু কাড়িয়া লইত। কোট এবং জুতার প্রতি তাহাদের অতিরিক্ত লোভ দৃষ্ট হইত। আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই নিকট হইতে এই সকল জিনিষ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, সুতরাং যাহারা এইরূপে বিনামাভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর নগ্নপদে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

অবশেষে জগদম্বার কৃপায় আমরা চাম্‌রাণ বন্দীশিবিরে পৌঁছিলাম। সেখানে আমাদিগকে ছয়দিন থাকিতে হইয়াছিল। এবার আমাদের গন্তব্যস্থান "রেস্‌-এল-আম্‌" (Res el-am), চাম্‌রাণ হইতে ১০০ মাইল দূরে। চাম্‌রাণ হইতে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের জন্য ট্রানস্‌পোর্ট কার্ট (transport cart) দেওয়া হইল। আমরা নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী, আমাদের নিমিত্ত গাড়ীর বন্দোবস্ত হইল না। আমরা সামান্য সৈনিক এবং অনুচরবৃন্দের (followers) সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলাম।

৩রা জুলাই তারিখে আমরা রেস্‌-এল্‌-আমে উপনীত হইলাম। পথে যে কষ্ট এবং নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত! সেখানে ছয়মাস কাল অবস্থিতি করিবার পর তথা হইতে আমাদিগকে রেলগাড়ীতে কনষ্টাণ্টিনোপলে (২০০ মাইল) লইয়া গেল। রেলগাড়ীতে তুর্কী প্রহরীগণ আমাদের সহিত নানাপ্রকার নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছিল—এমন কি মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য গাড়ী হইতে নামিতে পর্য্যন্ত দেয় নাই। প্রহরীদিগের অযথা তিরস্কার এবং অবৈধ প্রহার বরং আমাদের সহ্য হইত, কিন্তু যখন তাহার সহিত ব্যঙ্গ এবং শ্লেষ উচ্ছ্বসিত হইত, তখন আমরা ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইতাম। কথনও কথনও আমি অশ্রু বর্ষণ করিয়া বুকের ভার লঘু করিবার চেষ্টা করিতাম। সে সময় কত কি স্মরণপথে উদিত হইত! কখনও বা স্ত্রী পুত্রের মুখমণ্ডল মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া একটু আনন্দ বোধ করিতাম, আবার সংসারের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া একটা যে কিম্ভুত কিমাকার শুষ্কজীবন বহন করিতেছি তাহাই ভাবিতাম। কনষ্টাণ্টিনোপলে আমাদের খাদ্যকষ্ট চরমে উঠিয়াছিল, একপ্রকার অর্দ্ধাশনেই দিন কাটাইতে হইত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা ভাল মন্দ কোন প্রকার পরিধেয় পাই নাই। এবং তাহা পাইবারও আশা করি নাই, কারণ উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেককেই কৌপীনধারী হইয়া দিগম্বর সদৃশ বেশে আমাদের সমক্ষে বিচরণ করিতে দেখিতাম।

কনষ্টাণ্টিনোপল সহরের দৃশ্য অতীব সুন্দর, কিন্তু আমরা অতিশয় নগণ্য বস্ত্র পরিহিত এবং অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় এবং দৈহিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে সহরটি দেখিতাম বলিয়া তাহার সৌন্দর্য্য এবং পারিপাট্য সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। এথানে আমরা কয়েক মাস ছিলাম। এখানে আসিয়া অবধি উপযুক্ত আহার অভাবে আমাদের দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল। সেই হেতু ঐ স্থান যত শীঘ্র ত্যাগ করিতে পারা যায় আমাদের পক্ষে তাহাই মঙ্গল। নিমীলিত নেত্রে ত্রিতাপনাশিনী মা জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া অটল ভক্তি সহকারে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে আমাদের উদ্ধার জন্য আবেদন জানাইতাম। ক্রমে বিশ্বজননীর আসন কম্পিত হইল। ১৯১৮ সনে অক্টোবর মাসে আমাদিগকে কনষ্টাণ্টিনোপল এবং রেস-এল-আমের মধ্যবর্ত্তী একটা শিবিরে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানে পৌছিবার অব্যবহিত পরেই আমরা আমাদের ইংরাজ সরকার হইতে এলেপ্পোর কন্‌সলের মারফতে যথেষ্ট পরিমাণ পরিধেয় বস্ত্র, নানাবিধ সুপক্ক এবং শুষ্ক ফল, প্রচুর উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী এবং ঔষধ ও পথ্য—অর্থাৎ যাবতীয় আবশ্যক বস্তু—প্রাপ্ত হইলাম, আমাদের জীবন রক্ষা হইল। কুট হইতে আসিবার

দিন আমি যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ছিলাম, আজ ইংরাজ প্রেরিত বস্ত্রাদি পাইয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলাম।

বিগত নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা বন্দী-দশা হইতে মুক্তিলাভ করিলে আমাদিগকে মিসরে প্রেরণ করা হইল, তথা হইতে আমরা সুয়েজ এবং অবশেষে বোম্বাই পৌঁছিলাম। বোম্বাই হইতে স্বদেশে পুত্রের নামে একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আমার ভারতে প্রত্যাগমনের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলাম।

প্রায় আড়াই বৎসরকাল আমরা যুদ্ধসম্পর্কীয় নানা স্থানে পরিভ্রমণ এবং বাস করিয়া তিনটি বলবান স্বাধীন জাতির—অর্থাৎ ইংরাজ, জার্ম্মাণ এবং তুর্কীর—চরিত্র এবং প্রকৃতি বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অবসর পাইয়াছিলাম।

ইংরাজের অন্তঃকরণে যথেষ্ট পরিমাণ দয়া, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি ও মহানুভবতা বিদ্যমান। ইংরাজ নিরপেক্ষতার প্রয়াসী, দুর্ব্বলের উপর বলবানের উৎপীড়ন ইংরাজ সহ্য করিতে পারে না; কিন্তু অপর দুইটি জাতির মধ্যে ঐ গুণাবলীর একটিরও আধিপত্য দৃষ্ট হইল না।

যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মান এবং তুর্কীদিগের যে সকল অমানুষিক অত্যাচারের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অসত্য বা অতি-রঞ্জিত জ্ঞানে অনেকের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বেলজিয়ান নরনারীর প্রতি জার্ম্মানীর ভীষণ নিগ্রহ এবং তুর্কীর নিষ্ঠুরভাবে আর্ম্মানিদিগের হত্যাকাণ্ড, যেমন ঘটিয়াছিল, সংবাদপত্রে অবিকল তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। নিরীহ আর্ম্মানী নরনারী এবং সরল প্রকৃতি বালক বালিকাদিগকে সংহার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, আমরা সে মর্ম্মভেদী দৃশ্যের প্রত্যক্ষ-দর্শী! কোন কোন পিতামাতা নিজ নিজ শিশুপুত্র-দিগকে গুপ্তস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। আমাদের ভারতীয় সিপাহীদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া উদ্ধার করতঃ পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিতেছে। আমি যখন মিসর হইতে যাত্রা করিলাম, তখন পর্য্যন্ত এই বালক-দিগকে সিপাহীর সহিত মিসর হইতে ভারতে পাঠাইবার আজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। জার্ম্মানী এবং তুরস্ক যখন এই পৈশাচিক নাটকের অভিনয় করিতে-ছিল, ইংরাজ বিবিধ কারণে তাহার প্রতীকার করিতে অক্ষম ছিলেন বলিয়া তখন সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় এখন তিনি দণ্ডধর হইয়াছেন, এখন তাঁহার দণ্ড দিবার এবং অপরাধীদিগের উহা গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায়।

৺রামেন্দ্রসুন্দর

হায় বঙ্গবাণি,
পূজা-অর্ঘ্যে তব পুণ্য-পদ্মাসন-খানি
সাজাইয়াছিল যেই সাধক তোমার,
সে যে নাই আর!
নাই সেই রামেন্দ্রসুন্দর,
থামিয়াছে কণ্ঠে তার আরতির মন্ত্রপূত স্বর।
পুড়ে গেছে ধূপ-ধুনা, গন্ধ তার পবনে পবনে
বিতরিছে ভবনে ভবনে।

জ্ঞানবৃদ্ধ শিশু সম মধুভরা অন্তর নির্ম্মল,
শরতের চন্দ্রকান্ত হাস্য-জ্যোতি আনন্দ-উজ্জ্বল,
সেই দিব্য প্রতিভার মৃগনাভি ধারা
কালের মরুভূতলে কোথা হ'ল হারা!
এ পারের খেলা-ঘরে অলীক খেলায়
তৃষা তার মিটিল না হায়,
তাই বুঝি ছেড়ে গেল,—ছিঁড়ে গেল স্বপন-বাঁধন,
দু'দিনের হাসি ও কাঁদন।

ছড়াইয়া গেল পথে কত রত্ন, মাণিকের কণা,
কে করে গণনা !
এত ত্বরা এল শেষ-বিদায়ের রথ !
মুখরিত চক্রে তার ক্ষুব্ধ বঙ্গ-সাহিত্য-জগৎ।

হের ওই জন্মান্তের অস্তের বেলায়
মহাকাশে প্রাণপাখী ধায়।
হয়তো সে তাকাইয়া দেখে পিছে তার
তরঙ্গিত চিত্রলেখা এই বসুধার
রেণুরূপে বাষ্প-স্তূপে মিলাইয়া যায়
ছায়াবাজি প্রায়।
মাঝে মাঝে আজো তার পড়ে বুঝি মনে
খেলেছিল মানবের সনে;
গলে' গেছে চিত্ত তার উছলিয়া রসের বরষা,—
একি নিয়তির লীলা, কোথা হ'তে চকিতে সহসা
এল ডাক,—'ওরে পান্থ, সাঙ্গ তোর কর্ম্ম-অভিনয়,
মহীতল নিত্যগৃহ নয়।'
অন্তঃকর্ণে শুনিল সে—'এই আমি যুগ যুগ ধরে'
সঞ্জীবিত কল্প-কোটি মৃত্যুঞ্জয় করে'।
পরার্দ্ধ যোজনান্তরে রশ্মিচক্রে সৃষ্টির লহরী
ধ্যান-যোগে আসে সে বিহরি'।
লোকোত্তর ব্রহ্মস্বাদ-পরিতৃপ্ত অন্তরাত্মা তার
শান্তি-গীতা পড়ে বারংবার।
সমুদ্রের উদ্বোধনে, মহানীলে দূর চক্রবালে,
তারি মন্ত্র জলোচ্ছ্বাস-ছন্দে তালে তালে।

হে রামেন্দ্র, হে সুন্দর, তোমার 'অয়োরা' সম হাসি
স্মৃতির দর্পণে মম আরো স্পষ্ট উঠিতেছে ভাসি';
মনে পড়ে যেন কোন্ প্রহেলিকা-ভাতি,
এ জাগর-ঘুমঘোরে স্বপনের সাথী,
অপরূপ নব বস্তু, সনাতন রহস্য-কল্পনা
অন্তরের তলে মোর দেয় আলিপনা ;—
কি সত্তায়, কি ভাবে সে আছে গো সেথানে ?
সে বোধেরে বুঝাইতে ভাষা হারি মানে।

অর্দ্ধ-মুক্ত দ্বার-পথে হেরি মুগ্ধ প্রাণে
অন্তর বাহির দোঁহে এ উহারে টানে।
চলে দোঁহে কি শাশ্বতী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া,
মিছে ধায় দার্শনিক ক্ষুদ্রতার মান-দণ্ড নিয়া।
জীবনের বিরাট্ অরণ্য-বর্ত্ম দিয়া,
আব্ছায়ে লুকাইয়া যায় সে চলিয়া।
জ্যোৎস্না দেয় হাত-ছানি তায়,
মুকুলিত গীতি-কাব্যে, সুকুমার ললিত কলায়,
সঙ্গীতের যাদুমন্ত্রে, কত কড়ি, কোমল পর্দ্দায়
শুভক্ষণে তারে চেনা যায়।
তুলনার অতীত সে অনির্ব্বচনীয়,
সে পরম প্রিয়।

একদা তরুণ মনে তব পদতলে,
ছাত্রাসনে বসি' কৌতূহলে,
শিখেছি যে মহাশিক্ষা শ্রীমুখে তোমার,
মগন-চৈতন্যে জাগে প্রতিধ্বনি তার।
কহিতে প্রশান্ত কণ্ঠে—"বহি' মোরা ভ্রান্তির পসরা
সহি নিত্য আধি-ব্যাধি-জরা।
অন্ধ হয়ে ধন-বিদ্যা-আভিজাত্য-মদে
সাধি অ-করুণ কর্ম্ম, নাহি বুঝি অনিত্য প্রমোদে
আমারি সে কর্ম্ম-ব্যূহ পরিণামে শত্রুরূপে মোরে
দেবে নিঃস্ব করে'।"
দিতে যাহা উপদেশ, নিজে তুমি চলিতে সে পথে,
সদ্‌ধর্ম্ম সত্য-হিতব্রতে।

বিচিত্র আনন্দ-রাগ বাজে শুদ্ধ শঙ্খ-রন্ধ্র-পথে
লোকান্তরে অতীন্দ্রিয় প্রাণের জগতে ;—
সে আনন্দ-অমৃতের, নির্ম্মাল্যের পরসাদী ফুলে
সুধা-গন্ধে গেছ আজি সব ক্লান্তি ভুলে।
পেয়েছ অভয় ঋদ্ধি, আজি তব কাছে
জন্ম,মৃত্যু,দেশ,কাল,—এ অধ্রুব শেষ হ'য়ে গেছে।

দর্শনে বিজ্ঞানে ধনী,
হে গুণীর শিরোমণি,
জাতীয় সাহিত্য-ক্ষেত্র-তলে
নব নব ভাব-তীর্থ-জলে
ফলায়েছ অপূর্ব্ব ফসল ;—
চিরন্তন চিন্তামণি ভাস্বর তরল।
হে বরেণ্য, হে ত্রিবেদী,
কীর্ত্তিধ্বজ অভ্রভেদী,
বিজয়-দুন্দুভি তব বাজে দিগ্ দশে
অশ্রান্ত নির্ঘোষে।

বাঙ্গালীর যত বংশধর
ঘিরি' ঘিরি' তুঙ্গতম তব যশোমেরুর শেখর,
অকপট ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদিবে তোমার উদ্দেশে
চিররাত্রি, চিরদিবা, স্বদেশে-বিদেশে।*

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

* গত ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে আহূত কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটে স্বর্গীয় আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় পঠিত।

আঁখির বাঁধন

(গল্প)

তখন আমার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। এই তরুণ যৌবনে সকল সুখশান্তি আশা-উচ্ছ্বাস আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ সমূলে বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে রেল-কোম্পানির কঠোর দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

দীর্ঘ তিন বৎসর কাল সপ্তাহে একুশবার করিয়া ঘড়ি ধরিয়া লাল ও সবুজ রঙের বাতি ও নিশান নাড়িয়া এবং "ওয়ে বিলে"র সঙ্গে মিলাইয়া পার্শেল উঠাইয়া নামাইয়া ক্রমশঃ আমিও যেন আমার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সেই সুদীর্ঘ লৌহসরীসৃপের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছিলাম !

প্রথম-প্রথম এই কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যেও আমি নিত্য নূতন আনন্দ লাভ করিতাম। যৌবনের সজীব চিত্ত, মুক্তপ্রকৃতির নিত্য নবীন সৌন্দর্য্যোৎসবের মধ্য হইতে সর্ব্বদাই আনন্দরস সংগ্রহ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। বসন্তে স্বর্ণাভ আম্রমুকুলের স্নিগ্ধ সৌরভ, নিদাঘে সরসীশোভিত ইন্দীবরের বিকশিত সুষমা, বর্ষার বারি-স্নাত কদম্বের পুলক-রোমাঞ্চ, শরতে আন্দোলিত ধান্য-ক্ষেত্রের মরকতশোভা, শীতে স্বর্ণশীর্ষ সরিষার সৌন্দর্য্য-লীলা, গ্রীষ্মে শিমুল ও পলাশের শোণিমা-বিকাশ আমার তরুণহৃদয়কে অপূর্ব্ব পুলকোচ্ছ্বাসে মগ্ন করিয়া দিত। টেলিগ্রাফের তার ও দণ্ডের উপর উপবিষ্ট শঙ্খচিল ও ভৃঙ্গরাজের তীক্ষ্ণ স্বর লহরী, গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী রাখাল বালকের তাল-লয়-হীন সরল সঙ্গীত-ধারা, রেল-লাইনের নিকটবর্ত্তী হাটবাজারে সমবেত জনতার উচ্চ কোলাহল আমার তৃষিত কর্ণে সুধাবর্ষণ করিত।

বর্ষার দিনে বর্ষণরত প্রকৃতির সুগম্ভীর মঙ্গলোৎসব, বারিসিক্ত তরুরাজির সুনিবিড় আনন্দের নীরব উপলব্ধি, জলমগ্না ধরিত্রীর আন্দোলিত লাবণ্যোচ্ছ্বাস আমার চিত্তকে অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ করিয়া দিত; শরতের বঙ্গব্যাপী আনন্দোচ্ছ্বাসের দূরাগত ক্ষীণরাগিণী আমার চিত্তে আমার ক্ষুদ্র পল্লীভূমির নিভৃত আকর্ষণ নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিত; ষ্টেশনে সন্তান-বৎসলা জননীর মহিম-মূর্ত্তি আমার বিধবা জননীর স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিখানিকে নূতন সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করিত; বিচিত্র বেশ-পরিহিত বরযাত্রী ও বরকন্যার নয়নানন্দ মূর্ত্তি অনাদৃত সংসারের মোহময়

সৌন্দর্য্যকে যেন সহসা আমার চক্ষে নিবিড় রহস্যের মত ফুটাইয়া তুলিত।

কিন্তু দিনের পর দিন সমভাবে যথাসময়ে যন্ত্রের মত একই কায করিতে করিতে, আমার নিজের অজ্ঞাতসারে আমার চিত্তের সজীবতা ও হৃদয়ের সরসতা বালুকা-প্রবিষ্ট জীর্ণ জলধারার ন্যায় নীরবে বিলুপ্ত হইতেছিল। আমি ধীরে ধীরে আমার চির-সহচর সুদৃঢ় লৌহযানের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছিলাম!

যদি কোনদিন বর্ষার ঘনান্ধকার স্তব্ধ আকাশ, অথবা কাল-বৈশাখের তুমুল-ঝটিকার ভীষণ রুদ্রলীলা আমার চিত্তকে ক্ষণকালের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিত, তাহা হইলে আমার সম্মুখবর্ত্তী গুড়ের নাগরী, কেরোসিনের টিন, এবং আম্রের ঝুড়ি মুহূর্ত্তে আমার স্বপ্ন-ভঙ্গ করিত। শরৎ-শশধরের পূর্ণ সুষমা কোনদিন যদি চিত্তে কোন অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব কোমল-ভাবের সঞ্চার করিত, তাহা হইলে ষ্টেশন-খালাসীর "গার্ডবাবু, কুছ্ মাল বা?" শব্দে চকিতে তাহার বিলোপ-সাধন করিত। এইরূপে আমার গার্ড-জীবনের দীর্ঘ তিন বৎসর ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল।

২

সেদিন শরতের প্রভাত। স্বর্ণবর্ণ সূর্য্য-কিরণে জলস্থল উদ্ভাসিত। নিকটে অমল ধবল কাশ কুসুমের শুভ্র শয্যা, দূরে চঞ্চলা কমলার শস্যশীর্ষরচিত স্বর্ণাঞ্চল।

দূরে গ্রাম হইতে আনন্দময়ীর আনন্দ-সঙ্গীতের ক্ষীণ-প্রতিধ্বনি প্রভাত-পবনে ভাসিয়া আসিতেছিল, সুনীল আকাশ স্নিগ্ধ প্রকৃতির মস্তকের উপর দীপ্ত চন্দ্রাতপ বিস্তার করিতেছিল, শিশির-সিক্ত শেফালিকার স্নিগ্ধ সৌরভ অগুরু ধূমের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ভগবতীর পাদপীঠতলে নীরবে উথলিয়া উঠিতেছিল।

বহুকাল পরে আজ কি জানি কেন এক অজ্ঞাত আকুলতা হৃদয়ের গোপন-কক্ষে ক্ষণে ক্ষণে বেদনা-সঞ্চার করিতে লাগিল।

আনন্দময়ীর আগমনে সকলেই মিলনের আনন্দে উৎফুল্ল, কেবল হতভাগ্য গৃহ-হারা আমি এমন দিনেও লাল ও সবুজ নিশান দেখাইয়া গাড়ী চালাইতে এবং মাল উঠাইতে ও নামাইতে নিযুক্ত!

পরবর্ত্তী ষ্টেশনের "মাল" গণিয়া ও সাজাইয়া, ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া, শরৎ প্রকৃতির দিগন্ত প্রসারিত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। স্নেহময়ী প্রকৃতির মাতৃমূর্ত্তি ব্যাপ্ত করিয়া সেই নির্ম্মল আকাশ-তলে আমার মহিমময়ী জননীমূর্ত্তি সহসা ফুটিয়া উঠিল। হৃদয় সহসা সে স্নেহস্পর্শের জন্য বেদনাতুর হইয়া উঠিল।

গাড়ী ধীরে ধীরে সাগরদীঘি ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। ষ্টেশনের বাবুদের ছোট ছোট বাড়ীগুলিকে আমার চিরদিন এই বিরাট লৌহ-যন্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়াই মনে হইত। তাহাদের ভিতর যে আবার মানুষ থাকিতে পারে, মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র লীলাতরঙ্গ সেখানেও অনুকূল প্রভাবে উথলিয়া উঠিতে পারে,—একথা আমার মনেও আসিত না। সুতরাং এগুলি চিরদিন আমার উপেক্ষার বস্তুই ছিল।

বাবুদের S. M. বা A. S. M. লেখা টুপি, খালাসীদের নীল ও পীতবর্ণের পাগড়ী, পানি-পাঁড়ের মলিন জলপূর্ণ E. I. R. লেখা বাল্‌টি, এবং লম্বমান রেলখণ্ডরূপী ঘণ্টার সঙ্গে এগুলিকে আমি এক পর্য্যায়েই ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ কি জানি কেন সহসা-জাগ্রত স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় কোন্ আকাঙ্ক্ষিত স্নেহের লোভে আমার চক্ষু দুইটিকে এদিকে ফিরাইয়া দিল।

আমার গাড়ীখানি যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সম্মুখেই একখানি ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত "বাঙলা।" আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহার সম্মুখেই সেই বাঙলার একটি অর্দ্ধমুক্ত ক্ষুদ্র বাতায়ন।

কি জানি কেন একবার সাগ্রহে সেই বাতায়নের দিকে চাহিলাম। বাতায়ন-বিলম্বী সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালে সহসা যেন কাহার দুইটি বিলোল উজ্জ্বল চক্ষু

ফুটিয়া উঠিল। কি অদ্ভুত সে চক্ষু!—যেন শরতের আকাশের মত নীল, পূর্ণিমার চন্দ্রের মত শোভাময়, নদীতরঙ্গের মত চঞ্চল, মরুভূমির মত তৃষিত।

তাড়াতাড়ি চক্ষু ফিরাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় কিছুতেই তাহার তীব্র আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারিলাম না।

অন্ধকার কক্ষমধ্যে, সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালে আর কিছুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না—শুধু দেখা যাইতেছিল সেই দুইটি চক্ষু—নীলাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত, স্বচ্ছ দীর্ঘিকাবক্ষে প্রস্ফুটিত শতদলের মত, নিবিড় অরণ্য মধ্যে সুদূরস্থিত স্থির অগ্নিশিখার মত!

ষ্টেশনের খালাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখানকার কোন মাল নাই, গার্ড বাবু?"

"মাল? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে বৈকি!"—বলিয়া অপ্রস্তুত ভাবে মাল খুঁজিতে লাগিলাম। সেদিন সম্মুখবর্ত্তী মালও বহুবার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। বহুকষ্টে খালাসীর সাহায্যে মাল বাহির করিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

চকিতে আর একবার বাতায়নের দিকে চাহিলাম। অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল ধ্রুবনক্ষত্রের মত সেই মায়া-চক্ষু তখনও তেমনি অম্লান জ্যোতিতে ফুটিয়া আছে!

ছোট বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আজ ফেরবার সময় আজিমগঞ্জ থেকে গোটাকতক ফুলকপি নিয়ে আসবেন; কাল রাত্রে ছোট জামাইটি এসেচে কি না—!"

"ওঃ। তা বেশ ত।"—বলিয়া আমার ক্যাম্প খাটের উপর শুইয়া পড়িলাম।

সমস্ত প্রকৃতি সহসা যেন নূতন সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল। অজ্ঞাতে হৃদয়ের মধ্যে নূতন রাগিণী গুঞ্জরিয়া উঠিল—"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুলহার!"

৩

সেই অপরিচিত অদ্ভুত চক্ষু দুইটি আমায় কি ভীষণ মায়া জালে বাঁধিয়াছিল—অজগর দৃষ্টিমুগ্ধ মৃগশাবকের মত আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহাদের মায়াপাশ অতিক্রম করিতে পারিতেছিলাম না।

চক্ষুর অধিকারিণীকে কোন দিন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই—দেখিতে চেষ্টাও করি নাই। এ কায আমার সাহসে কুলাইত না। কি জানি যদি ইহার ফলে সে চক্ষু দুটি চিরদিনের মত আমার জীবনাকাশ অন্ধকার করিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়!

তথাপি সেই চক্ষু দুইটি দিবারাত্র আমাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিত।

রাত্রে যখন কিছুই দেখা যাইত না, তখনও মনে হইত তাহারা সেই বাতায়নপথে তেমনি অম্লান শোভায় ফুটিয়া আছে।

চাকরিতে প্রবেশ করিয়া অবধি পাঁচ বৎসর ছুটি লই নাই। স্নেহময়ী জননী বাটী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। কিন্তু আমার ছুটি লইবার উপায় ছিল না। ছুটির কথা মনে করিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত।

আমাদের লাইনে আমরা দুইজন গার্ড ছিলাম। এক দিন অন্তর আমাদের "ডিউটি" পড়িত। যেদিন আমার বাসায় থাকিতে হইত, সেদিন আমার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইত। আমি প্রায়ই বলিয়া-কহিয়া ভোলানাথ বাবুর কাযের দিনেও বাহির হইতাম। "বাত" পীড়িত শীতভয়ার্ত্ত বৃদ্ধ ভোলানাথ বাবু আমায় মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন।

কিন্তু অবশেষে একদিন আমায় এখান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল। আমায় "অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনে" বদ্‌লি হইতে হইল। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এখানে থাকিতে পারিলাম না। বড় সাহেবকে চুণাখালির বিখ্যাত আম্রের ভেট দিয়া, বড় বাবুকে আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ রূপালি মণ্ডিত বরফি খাওয়াইয়া, বেতন বৃদ্ধির মায়া ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াও কোন প্রকারে বদলির হুকুম রদ করাইতে পারিলাম না।

শেষ বারের মত সেই ধ্রুবতারকা দুইটির দীপ্ত

জ্যোতি প্রাণপণে পান করিয়া, আমার মুমূর্ষ চিত্ত লইয়া সেখান হইতে বিদায় লইতে হইল।

নূতন কাযে আসিয়া আমি যেন গভীর স্বপ্নের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিলাম। কলের মত গাড়ীতে উঠিতাম নামিতাম, কিন্তু কি যে করিতাম তাহা আমার মনেও পড়িত না। কোথাকার মাল কোথায় নামাইয়া দিতাম, কোন কাগজ সহি করিতে কোন্ কাগজ সহি করিয়া দিতাম, কিছু বলিতে পারিতাম না। সেই দুই অদৃশ্য চক্ষু দিবারাত্র আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। ছুটির রাত্রে কত দিন চন্দ্রালোকে ময়ুরাক্ষীর তীর বহিয়া নির্জ্জন প্রান্তরে নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের নির্দ্দেশে যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছি তাহার ঠিকানা নাই।

বন্ধুরা বলিতেছিল আমার উন্মাদের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে,—আমার ছুটি লইয়া শীঘ্রই চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। আমার নিজেরও সময়ে সময়ে তাহাই মনে হইত।

তবু কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইত না। তখনও মনের মধ্যে কোন ক্ষীণ দুরাশা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত ছিল কি? কে জানে!

৪

গত তিন দিন হইতে দিবারাত্র মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। জলস্থল সব একাকার হইয়া গিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু শুভ্র জলরাশি—আর ধূসর আকাশ! মাঝে মাঝে শুধু বিপন্ন পথিকের মত এক একটা আকণ্ঠ জলমগ্ন বৃহৎ বৃক্ষ।

শেষরাত্রি হইতে জলের বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। ভোর পাঁচটার সময় অণ্ডাল হইতে ট্রেণ ছাড়িবার কথা। কোম্পানি-প্রদত্ত "ওয়াটারপ্রুফে" দেহ আবৃত করিয়া, নিশান হস্তে প্লাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রাকৃতির প্রচণ্ড প্রাবৃটোৎসব প্রলয়ের সূচনা করিতেছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে ড্রাইভার নিকটে আসিয়া বলিল—"বাবু এ দুর্য্যোগে গাড়ী ছাড়িব কি? কোন দিকেই যে নজর চলে না!" আকাশের অবস্থা দেখিবার জন্য আকাশের দিকে চাহিলাম। সেই দুই ভীষণ অদৃশ্য চক্ষু সহসা দীপ্ত শোভায় ফুটিয়া উঠিয়া ইঙ্গিতে বলিল—"এস, এস, ওখানে দাঁড়াইয়া কেন?"

তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া বলিলাম—"সময় হইয়াছে গাড়ী ছাড়িয়া দাও।" ড্রাইভার চলিয়া গেল। নিশান দেখাইয়া ছুটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল, সেই চক্ষুদ্বয়ও পথ দেখাইতে দেখাইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিতেছে! স্তব্ধ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ওই পাচড়ার পুল না? কই, ড্রাইভার গাড়ীর বেগ কমাইল না ত!

তবে কি ভুল করিলাম? বোধ হয় পুল আরও দূরে আছে।

জলের তুমুল কোলাহল কর্ণে প্রবেশ করিল। নীচের দিকে চাহিলাম। গাড়ী চাকা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গিয়াছে! কিছুই বুঝা যায় না।

সহসা বিষম ধাক্কা খাইয়া গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আর্ত্তনাদ কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিলাম—অর্দ্ধেক গাড়ী নদী-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে!

গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সম্মুখে ছুটিলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া ভীতি-বিহ্বল যাত্রীগণকে টানিয়া বাহির করিতে লাগিলাম।

ক্রমে ক্রমে ইণ্টার ক্লাশের গাড়ীর নিকট আসিলাম। ইহার যে অংশ স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট তাহা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

প্রাণপণে দ্বার খুলিয়া আন্দাজে ভিতরে হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম কেহ তাহার ভিতর পড়িয়া আছে কি না? সহসা সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল। এক যুবতীর ক্ষীণ দেহ তীব্র স্রোতে নদীগর্ভে ভাসিয়া চলিতেছিল। যুবতী যেন সহসা একবার আমার দিকে চক্ষু ফিরাইল। কি সর্ব্বনাশ! ও যে সেই চক্ষু! আমার লৌহময়

জীবনের প্রবল চুম্বক, আমার অদৃষ্ট নিয়তি, আমার জীবন মরণের সহচর সেই চক্ষু!

আমি তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িলাম! প্রাণপণে সাঁতার দিয়া ছুটিয়া চলিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। সে যেন কৌতুকভরে "আমায় ধর দেখি, আমায় ধর দেখি"—বলিতে বলিতে তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

* * * *

উঃ! আর পারি না! সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে। ধরণীর আলোক চক্ষের উপর ম্লান হইতে ম্লানতর হইতেছে। আর সাঁতার দিবার সাধ্য নাই। শুধু স্রোতের বেগে অবশভাবে ভাসিয়া চলিলাম। সহসা যুবতীর তীব্রগতি যেন মন্দীভূত হইয়া আসিল। আমরা কোনও চরের উপর আসিয়া পড়িলাম কি? ক্রমে ক্রমে যুবতীর দেহ সম্পূর্ণ নিশ্চল হইয়া পড়িল।

মনে হইল, সে আর একবার আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, দীপ্ততর চক্ষে আমায় তাহার নিকটে যাইতে বলিতেছে!

প্রাণপণ আবেগে আর একবার হাত পা নাড়িয়া যুবতীর দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার হস্ত যেন তাহার তুষার-শীতল হস্ত স্পর্শ করিল। আমি মরণের আবেগে তাহার হস্ত আমার হস্ত মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সমস্ত দীপ্ত জ্যোতি আমার চক্ষে সহসা নিবিয়া গেল। আমি যেন নিমিষের মধ্যে মৃত্যুর অতলগর্ভে তলাইয়া গেলাম!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ভূতের আবির্ভাব

কোন কোন ব্যক্তির উপর কখন কখন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে; চলিত কথায় ইহাকে 'ভূতে পাওয়া' বলে।

ভূতে পাইলে নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যখন যাহার উপর ভূতের আবির্ভাব হয়, তখন আর তাহার নিজের কোন অস্তিত্ব থাকে না; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিজের কোন কথাই বলিতে পারে না; সে ভূতের নামে পরিচয় দেয়, ভূতের ভাষায় কথা কয়—ভূতে তাহাকে যাহা বলায় এবং যাহা করায় সে তাহাই বলে এবং তাহাই করে।

আমাদের দেশে ভূতে পাওয়ার অনেকপ্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

কোন গ্রামের ভদ্রপল্লীতে এক ঘর গোয়ালার বাস ছিল। তাহাদের বাড়ীতে একটী বৌ ছিল, তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর। বৌটী অতি লক্ষ্মী এবং অতি লজ্জাশীলা, তাহার মাথায় আধহাত ঘোমটা, কেহ কখন তাহার মুখ দেখে নাই বা তাহার মুখের কথা শুনে নাই।

একদিন দুপুর বেলায় বৌটী পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহার শাশুড়ী এবং বাড়ীর আর আর সকলে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার জ্ঞান হইল না—বৌটী ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল।

বৌয়ের কান্না শুনিয়া পাড়ার দুই একজন করিয়া অনেকেই তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, কি হইয়াছে? কেহ ভাবিল, শাশুড়ী হয়ত তাহাকে অপমান করিয়াছে, কেহ মনে

করিল ছেলেমানুষ অনেকদিন বাপের বাড়ী যায় নাই, হয়ত তাহার বাপ মার জন্য মন কেমন করিতেছে; সমবয়স্কারা যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? বৌ কাহারও কথায় উত্তর দিল না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাড়ায় একজন বৃদ্ধা ছিল, প্রথম বয়সে নানাপ্রকার দোষ-দৌরাত্ম্য করিয়া এখন বৃদ্ধ বয়সে তপস্বিনী হইয়াছে; তাহার গায়ে নামাবলী, গলায় হরিনামের ঝুলি, সর্ব্বাঙ্গে তিলক। সময় সময় তাহার উপর কালী মায়ের ভর হয়; কাহারও ব্যারাম হইলে সে হাত দেখে, আবার সময় সময় লোকের ভালমন্দ গণনা করিয়া বলিয়া দেয়—মেয়ে মহলে তাহার খুব পসার ও প্রতিপত্তি; তাহাকে ডাকিয়া পাঠান হইল।

বৃদ্ধা আসিবামাত্র বৌটী বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। যাহার মুখ কেহ কখনও দেখে নাই, আজ তাহার গায়ে-মাথায় কাপড় নাই, তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, তাহার চুল এলাইয়া পড়িয়াছে; সেই উগ্রচণ্ডামূর্ত্তিতে বৌটী যাইয়া বৃদ্ধাকে আক্রমণ করিল এবং "হতভাগী সর্ব্বনাশী আমার এ দুর্দ্দশা তুই করেছিস্" বলিয়া তাহার চুল চাপিয়া ধরিল এবং তাহাকে কামড়াইতে আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধার চীৎকারে এবং বৌয়ের চীৎকারে বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বৌয়ের হাত হইতে বৃদ্ধাকে ছাড়াইয়া লওয়ার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কাহার সাধ্য বৃদ্ধাকে ছাড়াইয়া লয়? গোপবধূর সুকোমল শরীরে আজ অসুরীর বলসঞ্চার হইয়াছে। তাহার কান্না গিয়াছে,—সে বৃদ্ধাকে কামড়াইয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে বিকট হাস্য করিতেছে।

এই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই মনে ভয় হইল। তাহারা দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া আছে নিকটে যাইতে কাহারও সাহস হইতেছে না।

পাড়ায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া একজন যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। বসিবার জন্য তাঁহাকে দূরে একটী মোড়া দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া গোপবধূ সেই বৃদ্ধা বৈষ্ণবীকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল এবং কিয়ৎক্ষণ এদিক সেদিক চাহিয়া, নক্ষত্রবেগে ঠাকুরের পায়ের উপর পড়িয়া আবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন, "ছিঃ মা, তোমার গায়ে মাথায় কাপড় নাই, তুমি গৃহস্থঘরের বৌ।"

বৌ এবার কথা কহিল। বলিল, "ঠাকুর আমি যে আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার কি গতি নাই?"

ঠাকুর। কেন, তোমার কি হইয়াছে?

বৌ। আমার না হইয়াছে কি? আমি গৃহস্থ ঘরের বৌ সত্য, কিন্তু—

ঠাকুর। কিন্তু কি বল?

বৌ। আমি এ বাড়ীর বৌ নই।

ঠাকুর। তবে তুমি কে?

বৌ উঠিয়া বসিল এবং চারিদিক্ চাহিয়া বলিল, "আমি কে? কেমন করিয়া বলিব আমি কে—আমার পরিচয় দিতে বড় লজ্জা করিতেছে।"

ঠাকুর। তোমার পরিচয় না পাইলে তোমার গতি কি হইবে কেমন করিয়া বলিব?

ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, গোপবধূর উপর কোন অপ-দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কথা শুনিয়া গোপবধূ ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কুলকলঙ্কিনী, আমি মহাপাপ করিয়াছি তাই আমার এই দুর্দ্দশা। সদাসর্ব্বদা আমাকে যেন শত সহস্র বিছায় দংশন করিতেছে; প্রতিহিংসায় আমার শরীর অহরহঃ জ্বলিয়া যাইতেছে, একমুহূর্ত্ত আমি স্থির থাকিতে পারি না। আলোক আমার সহ্য হয় না। আমি থাকি নরকের কীট মধ্যে; বহুকাল পরিত্যক্ত

এক পায়খানার ভিতরে; সেখানে সেই কূপের মধ্যে আমি কেবল উঠি আর নামি, নামি আর উঠি। উঃ কি যন্ত্রণা! আর তো এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না; এ পায়খানায় আমি কেন থাকি তা বলিতে পারিব না।

ঠাকুর। তুমি কে তা বল।

বৌ। আমি কলঙ্কিনী; আমি কে তা আপনাকে বলিব। অনেক দিন মনে করিয়াছি আপনাকে আমার গতি করিতে বলিব, কিন্তু সাহস করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই। আমাকে আপনি উদ্ধার করুন।

এই বলিয়া আবার সে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল।

ঠাকুর। তোমার প্রকৃত পরিচয় দেও; আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় তাহা আমি নিশ্চয় করিব।

গোপবধূ উঠিয়া বসিল এবং গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া বলিল, "আমার পরিচয় আমি এত লোকের সম্মুখে দিতে পারিব না।"

তখন বাড়ী হইতে সকলকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। সকলে চলিয়া গেলে বৌ বলিতে আরম্ভ করিল—"আমি গৃহস্থের বৌ সত্য কিন্তু আমি এ বাড়ীর বৌ নই, আমি দক্ষিণপাড়ার রায় বাড়ীর বৌ।"

ঠাকুর। তোমার স্বামীর নাম কি?

বৌ। স্বামীর নাম মুখে আনিব না, শ্বশুরের নামও করিতে পারিব না, কিন্তু দক্ষিণপাড়ার রায়েদের তো আপনি জানেন।

ঠাকুর। তোমার স্বামী এখন কোথায়?

বৌ। তিনি এখন কোথায় তা আমি জানি কিন্তু বলিব না। আমার জন্য তিনি লজ্জায় মুখ দেখাইতে না পারিয়া দেশত্যাগ করিয়াছেন। এখন খুব দূরদেশে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

ঠাকুর তাহার স্বামীর নাম করিয়া বলিলেন, "কেমন তুমি তাহার স্ত্রী বটে তো?"

বৌ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "কেমন করিয়া বলিব তিনি আমার স্বামী; আমাকে তিনি কত ভালবাসিতেন, কত আদর যত্ন করিতেন, কিন্তু উঃ কি যন্ত্রণা! সে দেহ গিয়াছে, সে রূপযৌবন পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, কিন্তু তাঁর সে আদর, সে সোহাগ, সে ভালবাসা মনে জাগিয়া উঠিয়া দিবারাত্র আমাকে দগ্ধ করিতেছে। তিনি দেবতা আর আমি নরকের কীট। আমি পিশাচী হইয়া নরকে বাস করিতেছি। কিন্তু প্রথমতঃ আমার বড় দোষ ছিল না; আমি প্রকৃতই সতী ছিলাম, সাধ্বী ছিলাম; কিন্তু আমার স্বামী কোনও কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাওয়ার সময় আমাকে ও আমার শাশুড়ীকে তাহার একজন কপট বন্ধু—

কথা বলিতে বলিতে বৌ হঠাৎ থামিয়া গেল। বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার চক্ষু দুটী রাগে লাল হইয়া উঠিল। বৌ নিজের ওষ্ঠ নিজেই কামড়াইতে লাগিল এবং দন্তে দন্তে স্পর্শ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল:—

"বন্ধু নয়, একজন ঘোর বিশ্বাসঘাতকের হাতে আমার স্বামী আমাকে ও আমার শাশুড়ীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন; সে বন্ধুভাবে প্রতিনিয়ত আমাদের বাড়ী আসিত, আমাকে কত কি বলিত, কত প্রলোভন দেখাইত। তাহার রূপ দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া আমি নরকে ডুবিলাম। সে আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য প্রেত হইয়া আমি কতদিন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়াছি, কিন্তু আমাদের প্রতিহিংসা আছে, প্রতিশোধ লওয়ার ক্ষমতা নাই। প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছি। আজ এই সময় যদি একবার তাহার দেখা পাইতাম, তাহা হইলে এই বুড়ীর যেমন শাস্তি করিয়াছি তাহারও তাহাই করিতাম। তাহার ঘাড়টী মট্‌কাইয়া মনের সাধে তাহার রক্তপান করিতাম—"

ঠাকুর। বুড়ীর এ শাস্তি করিলে কেন?

বৌ। তাহার শাস্তি কেন করিলাম তাহা বলিতেছি; আমি সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়াছি জানিতে

পারিয়া সেই বিশ্বাসঘাতক আমাকে ফেলিয়া গেল। তখন আমি নিরুপায় হইয়া আমার লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য ভ্রূণহত্যা করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু সে কায কে করিয়া দিবে? অনেক চেষ্টায় এই বুড়ীর সন্ধান পাইয়া তাহার হাত পা জড়াইয়া ধরিলাম; সে আমাকে অনেক সাহস ভরসা দিয়া এবং আমার নিকট পাঁচ সিকা লইয়া আমাকে কি একটা বিষাক্ত ঔষধ খাইতে দিল, তাহাতেই আমার—

"তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে; সেই রাত্রে আমি ও এই বুড়ী দুজনে আমার সেই ভ্রূণ ও রক্তাক্ত বস্ত্রাদি এক পায়খানার কূপে নিক্ষেপ করিয়া আসিলাম; মনে করিলাম, পাপ বুঝি ধুইয়া মুছিয়া গেল। কিন্তু তাহা হইল না। আমার অধঃপতনের বিষয় পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। এ বিষয়ও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। আমি লজ্জায় মুখ দেখাইতে না পারিয়া একদিন আত্মহত্যা করিলাম।

"যে কূপে আমার ভ্রূণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই খানেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আজ দশ বৎসর হইল আমি দেহত্যাগ করিয়াছি, একাল যাবত আমি সেইখানেই আছি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমি যা ছিলাম তাই আছি। আমি যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহা বলিতে পারি না।

"আমার দুঃখ কষ্ট আমি কাহাকে ধরিয়া জানাই তেমন লোক পাই না। সকলকে আমরা ধরিতে পারি না। এই বৌটীকে আজ ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাই আমার দুঃখের কথা সমস্ত জানাইতে পারিলাম। ঠাকুর যাহাতে আমার গতি হয়, আপনি তাহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

ব্রাহ্মণ ঠাকুর গয়ায় তাহার পিণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। সেই কথা শুনিয়া প্রেতিনী আশ্বস্ত হইয়া গোপবধূকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ভূতে পাইলে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা অনেকটা হিষ্টিরিয়া রোগের সহিত মিল হয়, এজন্য বড় বড় ডাক্তারেরা ভূতে পাওয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, ভূতে পাওয়া হিষ্টিরিয়ার নামান্তর মাত্র।

'অমৃতবাজার-পত্রিকা' আফিস হইতে প্রকাশিত, "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন" পত্রে নিম্নলিখিত বিস্ময়কর ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

বড় বেশী দিনের কথা নয়—এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার কোন একটি ছাত্রের উপর ভূতের আবির্ভাব হইয়াছিল। ছাত্রটি তখন এণ্ট্রেন্স ক্লাসে পড়ে, বয়স ১৯ বৎসর। তাহার পিতা একজন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কোন পদস্থ ব্যক্তির বাড়ীতে কাহাকে ভূতে পাইলে যেমন আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া থাকে, অন্যত্র তাহা হয় না। অন্যত্র ভূতে পাওয়ার কথা শুনিলে বড় কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। এখানে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকে ভূতে পাইয়াছে শুনিয়া সহরে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। অনেকেই তাহা দেখিতে গিয়াছিল, এবং সে সময়ে সংবাদ পত্রেও এবিষয়ের আন্দোলন আলোচনা হইয়াছিল।

ছাত্রটি বাঙ্গালী কিন্তু তাহার পিতা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অনেকদিন যাবত পশ্চিমাঞ্চলে বাস করায় জন্য তাহারা এক প্রকার সেইদেশবাসী হইয়া পড়িয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এলাহাবাদে ভয়ঙ্কর প্লেগ, এজন্য কথিত ছাত্র এবং তাহার পরিবারস্থ আর আর সকলে যে বাড়ীতে বাস করিত, সে বাড়ী ছাড়িয়া তাহারা দূরে ভিন্ন পল্লীতে মাঠের মধ্যে একটি বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিল।

একদিন রাত্রি প্রায় একটার সময় ছাত্রটি যখন বাসায় ফিরিয়া আসে, সেই সময় সে হঠাৎ দেখিতে পাইল, তাহাদের বাংলার এক কোণে একটি আমগাছ তলায় একজন সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে এবং সে ছাত্রটিকে তাহার নিকট যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। ছাত্র তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময় দেখিতে পাইল,

সৈনিকপুরুষ গাছে চড়িল ও সেই সঙ্গে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

পরদিন সেই বালকটির ভয়ানক জ্বর হইল এবং জ্বরের সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

বালকের চিকিৎসার জন্য প্রথম হইতেই একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; সে বকে, আপন মনে হাঁসে কাঁদে, চেঁচায়, কেহ নিকটস্থ হইলে তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করে, কি বলে তাহা বুঝা যায় না। দেখিয়া অন্য একজন বড় ডাক্তারকে ডাকা হইল এবং তাহার পিতা তখন লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন, তাঁহাকে অগৌণে বাড়ী আসিবার জন্য টেলিগ্রাম পাঠান হইল।

পিতা বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, পুত্রের জ্বর বেশী না হইলেও অন্যান্য লক্ষণ ভাল নয়। বালক অনর্গল ইংরাজিতে কথা বলিতেছে, তাহার ভাষা এত বিশুদ্ধ যে এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্রের মুখ হইতে তেমন ইংরাজী বাহির হওয়া কখন সম্ভব নয়। বালকের কথা-বলার সুর এবং ধরণ ধারণও বাঙ্গালীর মত নয়। পিতার মনে মনে সন্দেহ হইল এবং উপস্থিত সকলেই ভাবিল, বালকের উপর কোন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।

ভূত ছাড়াইবার জন্য একজন ওঝা ডাকা হইল, কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিল না।

এই সময়, শেষে যে বড় ডাক্তারকে ডাকা হইয়াছিল তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূতে পাওয়ার কথাটা ডাক্তার বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না জানি না, তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে—তোমার নাম কি?"

বালক। আমি নাম বলিব না।

ডাক্তার। কেন?

বালক। না বলার বিশেষ কারণ আছে।

ডাক্তার। তুমি কোথায় থাক?

বালক। এইখানেই থাকি, কিন্তু এ বাংলায় নয়। সম্মুখে যে গাছ দেখিতেছ আমি ঐ গাছে থাকি।

ডাক্তার। এ বালকের উপর তোমার আবির্ভাব হইল কেন?

বালক। আমি ইহাকে বড় ভালবাসি।

ডাক্তার। সেই জন্য ইহার প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ! বালক যে আজ তিন দিন কিছুই খায় নাই।

বালক। না না, আমি তাহার কোন অনিষ্ট করিব না। সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে আমায় কিছু খাইতে দাও।

ডাক্তার। তুমি কি খাইতে চাও?

বালক। রুটী, ভেড়ার মাংস, চিনি ও কিছু লবণ।

ডাক্তার। রুটি কয়খানা, মাংসই বা কত?

বালক। ছয়খানা রুটি ও যথেষ্ট পরিমাণে মাংস চাই।

ডাক্তার। আমরা তোমার আহারের যোগাড় করিতেছি, তুমি এখন যাও।

এই কথার পর বালকের চৈতন্য হইল। ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

প্রেত যে সকল খাবার চাহিয়াছিল তাহা খরিদ করিবার জন্য বাজারে লোক পাঠান হইল এবং সেই সঙ্গে কিছু মাখন আনিতে বলিয়া দেওয়া হইল।

সামান্য কিছুক্ষণ পরে বালক আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আবার আসিলে কেন?"

বালক। আমার একটী কথা বলিতে ভুল হইয়াছে, আমি কিছু মাখন চাই"।

বালকের পিতা উত্তর করিলেন, "আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি; ছেলেটিকে তুমি আর জ্বালাতন করিও না।"

বালক। খাবার পাইলে আমি আর আসিব না।

পিতা। খাবার কোথায় দিতে হইবে?

বালক। এ বাড়ীতে দুইটা কূপ আছে। তন্মধ্যে রাস্তার ধারে কূপের ভিতর খাবার ফেলিয়া দিও।

বালকের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পুত্রের প্রাণের কোন হানি হইবে না তো?

বালকের মুখে প্রেত উত্তর করিল—"না—কখনই তাহার প্রাণের হানি হইবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তাহাকে আর আমি পাইয়া বসিব না। তাহার বিবাহ না হইলে তাহাকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম, কিন্তু তাহাকে লওয়া হইবে না, তবে তার সঙ্গ আমি ছাড়িব না; সদাসর্ব্বদা আমি তাহার সঙ্গে থাকিব এবং সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে তাহাকে আমি রক্ষা করিব।

প্রেত চলিয়া গেল এবং বালকের আবার চৈতন্য হইল।

এই সময়ে প্রেতের আহারীয় সামগ্রী বাজার হইতে আসিলে, বালকের পিতা সেই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী একটি ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া এবং তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া কূপের ভিতর নামাইয়া দেওয়ার জন্য নিজেই গমন করিলেন; সঙ্গে আরও দুই একজন লোক গেল।

বালকের পিতা দড়ি ধরিয়া খাবারপূর্ণ ঝুড়ি কূপের ভিতর নামাইতেছিলেন; ৮।১০ হাত না নামাইতে কে যেন ভিতর হইতে বলপূর্ব্বক ঝুড়িটি টানিয়া নামাইয়া লইল; পিতা সে টান সহ্য করিতে না পারিয়া দড়ি ছাড়িয়া দিলেন।

সে রাত্রে বালক সুস্থ শরীরে আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে যাইবে, এমন সময় কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া গেল, সে যেন একাই শয়ন করিয়া থাকে, তাহার কাছে যেন আর কেহ না থাকে।

বালক এক খাটে শয়ন করিল; তাহার ঠাকুরমা অন্য খাটে তাহার গায়ে হাত দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

একজন আত্মীয় বারান্দায় জাগিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত্রে সে তাড়াতাড়ি আসিয়া বালকের পিতা এবং আর আর সকলের নিকট প্রকাশ করিল যে, সে পাঁচজন লোককে কূপের দিক হইতে আসিতে দেখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনের সৈনিকের বেশ, তাহারা ঐ গাছে উঠিয়াছে।

এই সময় বালক অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ সে "হাত—হাত, গায়ে কার হাত" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ঠাকুরমাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

বালকের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খাবার পাইয়াছ?"

প্রেত। হাঁ, পাইয়াছি।

পিতা। খাইয়াছ?

প্রেত। সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।

পিতা। আমরা কি এ বাংলা ছাড়িয়া যাইব?

প্রেত। কেন?

পিতা। আমার পরিবার মধ্যে তেরজন পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রেত। কাল তাহারা সকলেই আরোগ্যলাভ করিবে। তোমাকে দুইটি বিষয় নিষেধ করিতে আসিয়াছি। যতদিন তোমরা এই বাংলায় বাস করিবে, ঐ গাছতলায় যাইও না, আর ঐ কূপ হইতে জল তুলিও না।

অতঃপর সকলেই শুনিতে পাইল, কে যেন বলিল, "আমি চলিলাম।" "Good night to all. I am off now."

সে বাসায় যাহাদের ব্যারাম হইয়াছিল পরদিন সকলেই সুস্থ হইয়াছিল।

(Hindu Spiritual Magazine, Vol 1, page 252.)

এখানে বড় বড় ডাক্তারদের স্বীকার করিতে হইয়াছিল বালকের হিষ্টিরিয়া নয়, তাহার উপর প্রকৃতই প্রেতের আবির্ভাব হইয়াছিল।"

"এ প্রকার ভূতে পাওয়ার গল্প অনেকই শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল গল্প যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানুষ মরিয়া কোথায় যায় এবং তাহাদের দশাতেই বা কি হয়, এ সমস্যা পূরণ করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু

কাহারও উপর ভূতের আবির্ভাব হইলে, ভূতের ভয়ে হউক, অথবা ভূতে পাওয়াটা কিছুই নয় ভাবিয়া হউক, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কেহ কখনও বিশেষরূপে কোন তথ্যানুসন্ধান করেন নাই। আমাদের দেশে কেহ কোন অনুসন্ধান না করিলেও, পাশ্চাত্যদেশে এ বিষয়ে ঘোর আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। আমেরিকায় নিউইয়র্ক নগরের ফক্সের বাড়ীতে কোনও অদৃশ্য পুরুষের নির্দ্দেশমত তাহার ঘরের মেজে খুঁড়িয়া একটি মনুষ্য-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়ার পর, Sir Alfred Russel Wallace, Sir Oliver Lodge, Crooks, Myers প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ Psychical Research Society সংস্থাপিত করতঃ যে সকল প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, আমাদের স্থূলদৃষ্টির অগোচরে অমানুষিক শক্তি ও জ্ঞান-সম্পন্ন দেবতা বা অপদেবতা সকল বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের আবির্ভাব হইলে নিম্নলিখিত প্রকার অলৌকিক কার্য্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) রুদ্ধদ্বারবিশিষ্ট ঘরের দুয়ার জানালা আপনা হইতে খুলিয়া যায়, আবার আপনা হইতেই বন্ধ হয়।

(২) ঘরের ভিতরে ও বাহিরে, শূন্যের উপরে হাসি কান্নার রব, করতালিধ্বনি, বিকট চীৎকার, মুদ্গার আঘাত বা মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

(৩) টেবিল চেয়ার প্রভৃতি গুরুভার বিশিষ্ট দ্রব্যাদি শূন্যের উপর ঝুলিয়া থাকে; সেই সকল দ্রব্য শূন্য হইতে টানিয়া মাটিতে নামাইয়া আনা দুঃসাধ্য হয়।

(৪) টেবিল বা চেয়ার আপনা-আপনি হাঁটিহাঁটি করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যায়।

(৫) রুদ্ধদ্বারবিশিষ্ট এক ঘরের দ্রব্য অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হয়।

(৬) বাড়ীতে ধুলা, ঢেলা, গোহাড় ইত্যাদি পড়ে।

(৭) শূন্যের উপর বাজনা বাজে। ঢাক, বেহালা বা একর্ডিয়ণ নামক বাদ্যযন্ত্র শুনা গিয়াছে। পিয়ানো বন্ধ রহিয়াছে, সে অবস্থায় তাহার ভিতর হইতে সুর বাজিয়াছে।

সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই উপরি-উক্ত কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মম্‌সন, গ্ল্যান্‌ভিলের বাড়ী এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল। Methodism ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ওয়েশ্‌লির গৃহেও ঘটিয়াছে। অনেক বড় বড় লোক এই সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষী পর্য্যন্ত দিয়াছেন। কিন্তু Psychical Research Society স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কেহ কোন প্রকার বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই।

মানুষ মরিয়া আপন-আপন কর্ম্মফল অনুসারে কেহ দেবতা কেহ বা অপদেবতা হইয়া থাকে এবং সেই অপদেবতাদের লোকে ভূত বলিয়া থাকে। অপদেবতারা পার্থিব সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে না পারিয়া, তাহাদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য এই মর্ত্তলোকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সেই অবস্থায় কখন কোন বাড়ীর উপর, কখন বা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর তাহাদের আবির্ভাব হয়।

কোন বাড়ীর উপর কোন অপদেবতার আবির্ভাব হইলে, তখন উপরিউক্ত নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর অপদেবতার আবির্ভাব হইলে তখন তাহার কার্য্যকলাপ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও অল্প বিস্ময়জনক নহে। উপরে আমরা যে সকল অলৌকিক ঘটনার কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য; কিন্তু এ প্রকার প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্য কখনও সংঘটিত হইতে পারে না বলিয়া যাঁহারা অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অবশ্য ভৌতিক উৎপাত বিশ্বাস করিবেন না। ওয়েস্‌লি একজন বিখ্যাত প্রবর্ত্তক, ইতিহাসে তাঁহার নাম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীতে ভূতের উৎপাত হওয়ার জন্য তাহার পিতা মাতা ভগিনী ও ভৃত্যবর্গ ভয় পাইয়াছে

শুনিয়া, কোন কোন বড় লোক ওয়েস্লির জীবনচরিত লিখিবার সময়, তাঁহাদের সকলের "মোহ পীড়া" (catalepsy) জন্মিয়া তাহারা ভূত দেখিয়াছিল বা ভূতের ভয় পাইয়াছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কাহারও উপর ভূতের আবির্ভাব হইলে বড় বড় ডাক্তার মহাশয়েরা তাহার হিষ্টিরিয়া (hysteria) অথবা সাময়িক ক্ষিপ্ততা (temporary insanity) জন্মিয়াছে বলিয়া ভূতে পাওয়ার কথাটা উড়াইয়া দিয়াছেন।

Sir Alfred Russel Wallace প্রমুখ যে সকল প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ভৌতিক-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন. তাঁহারা পূর্ব্বে প্রায় সকলেই ঘোর জড়বাদী নাস্তিক ছিলেন : ভূত বিশ্বাস করা দূরের কথা, আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। নানা স্থানে নানা সময়ে এবং নানা অবস্থায় তাঁহারা দুই পাঁচজন একত্র এবং স্বতন্ত্রভাবে উপরিউক্ত অলৌকিক ঘটনা সকল পরীক্ষা করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য (violation of the laws of nature) হওয়া অসম্ভব বলিয়া, কোন একটি অলৌকিক ঘটনাও তাঁহারা অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই এবং যাহাদের উপর প্রেতের আবিভাব হয়, তাহাদেরও উক্ত বিজ্ঞানাচার্য্যগণ অতি সাবধান ও সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা হিষ্টিরিয়া বা সাময়িক উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হয় নাই।

প্রেতেরা প্রায় কোন একজনকে আশ্রয় করতঃ তাহার মুখে কথা কহিয়া থাকে। কখন বা তাহার হাত ধরিয়া নিজের বক্তব্য বিষয় লিখিয়া দিয়া থাকে। প্রেত যাহাকে আশ্রয় করিয়া কথাবার্ত্তা বলে, ইংরাজীতে তাহাকে মিডিয়ম বা মধ্যস্থ বলে।

প্রেতের আবির্ভাব হইলে মিডিয়মের আর তখন জ্ঞান চৈতন্য থাকে না। হিপ্‌নটাইজ করিলে যেমন trance অর্থাৎ অচৈতন্যের মত ভাব হয়, প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তিরও সেই রকম একটা ভাব হয় এবং সেই ভাবের অবস্থায় সে কত কথা কয়, কত কি লিখিয়া দেয়। তখন সে যে কথা বলে বা লিখিয়া দেয় তাহা শুনিলে বা তাহার সে লেখা পড়িলে মনে হয়, যেন সে কথা বা সে লেখা তাহার নিজের নয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ মরিয়া দেবতা হয়, অপদেবতাও হয়, এবং মানুষের উপর যেমন অপদেবতার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ আত্মিক দেবতাগণেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে ইতর শ্রেণীর লোকের উপর দেবতার আবির্ভাব, হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। দেবতার আবির্ভাব হইলে tranceএর মত তাহারও কেমন একটা ভাব হয় এবং সেই ভাবের অবস্থায় সে ভূত-ভবিষ্যতের নানা কথা বলে, ঔষধ দেয় এবং তাহাকে নানাপ্রকার অলৌকিক কায করিতেও দেখা যায়। মানুষের উপর দেবতার আবিভাব হয় এই প্রবাদ বাক্যটি অনেকদিন হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। আত্মিক দেবতাগণের নিকট ইতর ভদ্র নাই ; কোন লোকের উপর কোন সময়ে হয়ত কোন আত্মিক দেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং এখনও হয়ত কাহারও উপর সেই রকম আবির্ভাব হইতেছে দেখিয়া, অনেকে দেবতার আবিভাব হওয়ার ভাণ করতঃ নানাপ্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া এবং প্রতারণা করিয়া ইহা একটি অর্থ উপার্জ্জনের পথ করিয়াছে ; এজন্য এসকল লোকের কথায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস স্থাপন করেন না। কিন্তু দুই দশজন লোকে প্রতারণা করিয়াছে বলিয়া, সকলেই প্রতারক বা মিথ্যাবাদী ইহা ধারণা করা সঙ্গত নহে। মানুষের উপর দেবতার আবির্ভাব হয় এই প্রবাদ বাক্যের মূলে যদি কিছুই সত্য না থাকিত, কেবল মিথ্যা ও প্রতারণার উপর যদি ইহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইত, তাহা হইলে এ প্রবাদের কখনও উৎপত্তি হইত না।

প্রতীচ্যভূখণ্ডে বিজ্ঞানাচার্য্যগণ এই সকল ব্যাপার অনুসন্ধানের ফলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

"তুমিও"

(ডিটেক্‌টিভ গল্প—নহে)

১। গোয়েন্দার কথা।

বাঘ বনে হরিণ শিকার করে, আমরা সহরে মানুষ শিকার করি। তাই বলিয়া আমরা বাঘের মত নিরীহ হরিণগুলির সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়াই না; আমরা নিরীহ লোকের মিত্র, বদ্‌মাইসের কাছেই বাঘ।

ডিটেক্‌টিভ্ এই নাম শুনিয়াই বাহিরের লোকের মনে একটু অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের জীবনটা তোমরা যত মন্দ মনে কর ততটা নয়। ইহাতে অনেক কবিত্ব আছে, নাটকত্ব আছে—অন্তত: মনুষ্যহৃদয় জানিবার বিলক্ষণ অবকাশ আছে। অন্ধকার না জানিলে কি আলো বুঝিতে পারা যায়? আমরা আবার যেমন আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি দেখিতে পাই, আলো ও আঁধারের মেশামেশি অনুভব করিতে পারি, তোমরা কি তাহা পার? পাপের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, সহসা যখন পুণ্যের অপূর্ব্ব জ্যোতি আমাদের নয়নে উপস্থিত হয়, তখন আমাদের মনে যে কি অচিন্তনীয় ভাবের উদয় হয়, তোমরা জগতের বৈচিত্র্য-বিহীন কাযকর্ম্মের মাঝে থাকিয়া তাহা বুঝিতেও পারিবে না। মানুষ দেখিবার, মানুষ চিনিবার, মানুষের শত প্রকার ভাবাবলী হৃদয়ঙ্গম করিবার, কত ভ্রম কত প্রমাদ যে মানুষের মনে উদয় হয় তাহা বুঝিবার আমাদের যত সুবিধা আছে, তাহা তোমাদের স্বপ্নেরও অতীত।

বিগত ১৮ বৎসর কাল বোম্বাই সহরে এই কায করিয়া যে কত দেখিলাম, কত শিখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। যত দেখিলাম, তাহা হইতে একটা শিক্ষা আমার মনে চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছে—তাহা এই যে, অসংযমই চিত্তের সর্ব্বনিকৃষ্ট ব্যাধি, আর ইহা হইতেই জগতের সর্ব্ববিধ অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অসংযমী ব্যক্তি শুধু নিজের নহে, কত লোকের সর্ব্বনাশ করে তাহা বলা যায় না। এই উপলক্ষে একটী কাহিনী আমার মনে পড়িয়া গেল; আমি যতগুলি 'সেন্‌সেশনাল কেস্' করিয়াছি, এইটী তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

একদিন প্রাতঃকালে হেড্ আফিস হইতে জোর তলব আসিল, সহরে একটা ভারি রহস্যময় হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, তদারক করিতে হইবে। অমনি সকল কার্য্য ফেলিয়া হাঁসপাতালে রওনা হইলাম। গিয়া দেখিলাম যে এক মুসলমান দম্পতী কোনও তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া হাঁসপাতালে জীবন হারাইয়াছে। তাহাদের মৃত্যুকালীন বিবৃত হত্যা সংক্রান্ত বিবরণ পাঠে অবগত হইলাম যে এই রহস্যাবৃত হত্যাকাণ্ড গতরাত্রে তাহাদেরই বাটীতেই ঘটিয়াছে। হত্যাকারী একজন মাত্র। মৃতা রমণীর মরণের পূর্ব্বের উক্তি (Dying declaration) হইতে জানিলাম যে গত রাত্রে তাহার স্বামী কোনও কার্য্যবশতঃ বাটীর বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী লোক—নাম সুলতান। রাত্রি বারটার সময় তিনি ফিরিয়া আসেন এবং আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করেন। রমণীও তাহার পর আহারাদি সারিয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করে। প্রদীপ জ্বালিয়া শয়ন করিয়াছিল। প্রায় একঘণ্টা পরে, যখন তাহার ঘুমের ঘোর আসিয়াছে, এমন সময় সে বুঝিতে পারিল যেন কে একজন মশারির দড়ি কাটিয়া দিল, এবং একখানা বৃহৎ হস্ত তাহার বুকের উপর রাখিল। অমনি তাহার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল, এবং সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাহার স্বামীকে উঠাইল। তখন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে—ঘর ঘনান্ধকারে আবৃত! স্বামী উঠিয়াই যেন একজনের হস্তে বন্দী হইলেন। দুইজনে যুদ্ধ

হইতে লাগিল। রমণী ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রাণ ভয়ে 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যেমন রমণীর মুখ হইতে এই চীৎকার ধ্বনিত হইল, অমনি তাহার স্বামীর পতন শব্দও শ্রুত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে সেই ভীষণ ব্যক্তির ছুরিকা তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, এবং রমণীও রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। রমণীর প্রতি অস্ত্রাঘাত করিবার পূর্ব্বে কিন্তু হত্যাকারী বলিয়া উঠিয়াছিল "তুমিও ?" ক্রমে স্ত্রীপুরুষের সমবেত আর্ত্তধ্বনিতে প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়াতে, হত্যাকারী অন্ধকারের আশ্রয়ে প্রাচীর পার হইয়া পলায়ন করিল। প্রতিবেশিগণ ধরাধরি করিয়া তাহাদের হাঁসপাতালে লইয়া যাইল এবং পুলিসে খবর দিল।

এই তো খুনের ইতিহাস। কে যে এই কার্য্য করিল তাহার কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। ঘুণাক্ষরেও কোনও সন্দেহের কথা পুরুষ বা রমণীর মুখে প্রকাশিত হয় নাই। এই বিশাল নগরীর মধ্যে কাহাকে ধরিব, কেমন করিয়া এ রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে ?' এই সকল চিন্তা আমার মনে যুগপৎ উত্থিত হইল। যাহা হউক, যখন এই কার্য্যের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল তখন তো আমায় ইহার একটা কিনারা করিতেই হইবে; কোনও কার্য্যে পশ্চাৎ-পদ হওয়া আমার অভ্যাস নহে।

কিন্তু বলিতে কি, এই মোকর্দ্দমা তদারকের ভার পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম। যেন চারিদিক হইতে রহস্যের একটা আবরণ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল,—যেন গভীর অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, কোথাও একটু আলো দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ মনের অবস্থা লইয়া তদারকে প্রবৃত্ত হইলাম—কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সফলতা লাভের কোনও ভরসা দেখিলাম না। যাহা হউক, হাঁসপাতালের এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, নিহত দম্পতীর গৃহাভিমুখে চলিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হত ব্যক্তিদ্বয় মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বোম্বাই সহরের মধ্যে, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত একটা বাটীতে তাঁহারা বাস করিতেন। সেই পল্লীর নাম উমার খাঁড়ি। পুরুষটী বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও জাতিতে মোগল, নাম মহম্মদ সাল্লার সুস্ত্রী। স্ত্রীলোকটী সুন্দরী ও যুবতী, নাম গুলনেহার, বয়স অনুমান ১৮।১৯। সে সুস্ত্রীর বিবাহিতা পত্নী। দম্পতী নিরীহ গৃহস্থ, কাহারও সহিত কোনও বিবাদ বিসম্বাদ নাই; তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহধর্ম্ম পালন করে। বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে তাহাদের বাসগৃহ অবস্থিত, উদ্যানের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর। ইহাদের হত্যা করিবার কাহার এত প্রয়োজন হইয়াছিল কিছুই বুঝিলাম না; এই হত্যার—এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংস ভাবে এই নিরীহ দম্পতীকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যই বা কি তাহাও সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম; দেখিলাম যে বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ, কাযেই হত্যাকারী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বেশ বুঝা গেল। আহত ব্যক্তির শয়নগৃহ অন্বেষণ করিতে করিতে একটী টুপি এবং একটা কোর্ত্তা একটা টেবিলের নীচে হইতে পাওয়া গেল। নিবিড় অন্ধকারে যেন একটু আলোকের রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে আলোক কত ক্ষীণ! এত বড় বোম্বাই সহরে এই একটু সামান্য সূত্র অবলম্বনে হত্যাকারীকে ধরিয়া বাহির করা তো সহজ ব্যাপার নয়! পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের ফলে বুঝিতে পারিলাম যে বাটী হইতে হত ব্যক্তিদ্বয়ের কিছুই অপহৃত হয় নাই; তবে কি চৌর্য্য এই কার্য্যের উদ্দেশ্য নাই ? ইহাই বা নিশ্চিত ভাবে বলি কি করিয়া? হয় তো হত্যাকারী চুরীর উদ্দেশ্যেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল, এবং সুস্ত্রীর দ্বারা ধৃত হইয়া আত্ম-রক্ষার্থ অস্ত্র চালনা করিয়াছিল। মৃত দম্পতীর সহিত কাহারও তো শত্রুতা দেখিতে পাইলাম না, তবে কেনই বা তাহাদিগকে সে হত্যা করিতে আসিবে? বড়ই সমস্যায় পড়িলাম।

লোকটা যে পারস্য দেশবাসী তাহা জানিতে বিলম্ব

হইল না, কারণ রমণীকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিল তাহা পারস্যভাষায় বলিয়াছিল। এমন সময়ে বিদেশীয় ভাষায় কেহই কথা কহে না, অতএব তাহার পারস্যদেশবাসিত্বে কোনও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কে সেই পারসীক, কেনই বা সে গভীর নিশীথে এই সুখস্বপ্নময় নিরীহ দুইটী প্রাণীকে জগতের বক্ষ হইতে নির্দ্দয়ভাবে অপসারিত করিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সুন্দরীর ভৃত্যবর্গ কেহই কোন কাযের কথা প্রকাশ করিল না।

যে সূত্রগুলি পাইয়াছিলাম তাহা লইয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম, কিন্তু অনেকদিন কোনও কিনারা করিতে পারিলাম না। হঠাৎ একদিন মাথায় একটা আলোকের জ্যোতি ঝলসিয়া উঠিল। হত্যাকারী না রমণীর প্রতি অস্ত্রাঘাত করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিল— "তুমিও"! ইহাই তো এই রহস্যজালাবৃত ঘটনার বিশ্লেষণের প্রধান সূত্র। এই "তুমিও" কথায় যে হত্যাকারীর হৃদয়ের অনেকটা ধরা পড়িয়াছে। সে তবে এই রমণীকে জানিত, এবং রমণীও নিশ্চয়, তাহাকে জানিত—নচেৎ একজন সামান্য চোর একথা কখনও বলিত না। শুধু তাই নয়, এই "তুমিও"র ভিতর আমি যেন একটা বিষম শ্লেষ, বিষম ঘৃণার, বিষম হতাশার তীব্র তিরস্কার স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিলাম। বুঝিলাম, চুরি এ ঘটনার সহিত আদৌ সংশ্লিষ্ট নাই ; ইহার মূলে হয় প্রতিহিংসা নয় অসংযত চিত্তের তীব্র লালসা। যখন ইহা বুঝিতে পারিলাম, তখন সে ঘটনার আদ্যোপান্ত কি কি হইয়াছিল তাহা যে বাহির করিতে পারিব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না। বলা বাহুল্য যে কালবিলম্ব না করিয়া, এই সূত্র লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম।

ডিটেক্‌টিভের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য আমি এ কাহিনীর অবতারণা করি নাই—সুতরাং এই অনুসন্ধান ব্যাপারে কিরূপে মাসের পর মাস অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া গেল, বিপদের উপর বিপদ ঘনাইয়া আসিল, প্রাণের মমতা ছাড়িয়া কায করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে অপরাধীকে ধৃত করিলাম ; সে বর্ণনায় কোনও প্রয়োজন নাই। এই হত্যাকাণ্ডের যে অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলাম, তাহাই তোমাদিগকে শুনাইব। সে কাহিনী, আমার মত কাঠের ও নীরস গোয়েন্দার মুখ হইতে না শোনাই ভাল; ধরা পড়িয়াই, প্রথম হৃদয়াবেগে অপরাধী যে ভাষায় তাহার আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছিল, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

২। হত্যাকারীর কথা।

ভাই ডিটেক্‌টিভ সাহেব, আজ তুমি আমায় ধরিয়া মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করিতেছ সন্দেহ নাই, কিন্তু জানিনা, আমি যদি আমি থাকিতাম, তাহা হইলে তুমি আমাকে ধরিতে পারিতে কি না! আমি এখন নিস্তেজ, আমি স্বহস্তে নিজের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া নিজের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়াছি। আমার প্রাণের মমতা নাই, জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, তাহার জীবনের সহিত নিবিয়া গিয়াছে। তাই আজ আমি তোমার হাতে ধরা পড়িলাম। এ জীবনে আর কায কি?

ভাই গোয়েন্দা, আজ আমি হত্যাকারী—চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমিও একদিন ভদ্রলোক ছিলাম, আমিও মনে কত সুখের আশা পোষণ করিতাম, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তবে মনুষ্যের চিরশত্রু দারিদ্র্য আমাকে কখনও স্থির হইতে দেয় নাই। আমি আমার জন্মভূমি ছাড়িয়া, সুদূর ভারতে উন্নতির আশায় আসিয়া বাস করিতেছিলাম। জানিনা কোন কুক্ষণে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল। কে সে? তুমি যাহার ও যাহার স্বামীর হত্যাকারীর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলে, সে সেই গুল্‌নেহার বিবি। দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিবার অবসর পাও নাই, দেখিলে বুঝিতে যে আমার সর্ব্বনাশের যথার্থ হেতু ছিল কি না। সেই মূর্ত্তি—কি বলিয়া বুঝাইব সে মূর্ত্তি কত মধুময়ী, কত উত্তেজনাময়ী, কত আনন্দদায়িনী!

যখন তাহাকে আমি এই বোম্বাই সহরে প্রথম

দেখিলাম, তখন সে অনূঢ়াবস্থায় পিত্রালয়ে ছিল। তাহার স্ফুটিত যৌবনশ্রী সুরার মত আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আমার দারিদ্র্য-নিপীড়িত নীরস হৃদয়ে কে যেন রাশি রাশি বসন্তকুসুম ঢালিয়া দিয়া গেল; যেন 'ঘনতমসাবৃত অম্বর-ধরণী' ভেদ করিয়া, চিরনূতন অনন্ত মাধুর্য্যময় সুধাকর রশ্মি প্রকাশিত হইয়া আমার হৃদয় সমুদ্রকে বাসনার উচ্ছ্বাসে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

ভাই ডিটেক্‌টিভ, আজ এই লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ লৌহবলয়ধারী নরপিশাচকে দেখিয়া তখনকার যে-আমি তাহাকে হয়তো তুমি চিনিতে পারিবে না। কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তখন আমি অন্য রকমের লোক ছিলাম। তখন আমার শুধু এই সুন্দর শরীর ছিল তাহা নহে, কবিত্ব ছিল, ভাব ছিল, হয়তো একটু মনুষ্যত্বও ছিল। শিক্ষিত হইলেও দরিদ্রের যদি মনুষ্যত্ব সম্ভব হয়, তবে তাহা আমার ছিল। কিন্তু জন্মে যাহা কখনও শিখি নাই, তাহাই আমার ছিল না—আত্মসংযম! ভাব সংবরণ করিতে জানিতাম না, পারিতামও না। তাহাকে দেখিয়া আমি কি হইলাম তাহা বুঝাইতে পারিব না। ঐ এক মুহূর্ত্তে ভাবে, কবিত্বে, বাসনায়, লালসায় আমার হৃদয় যেন অভিভূত হইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিলাম যে আমার অদৃষ্ট, আমার সমস্ত নিয়তি, ঐ একখানি কুসুম-কোমলা, যৌবনতরলা, ঘনীভূত জ্যোৎস্না-ময়ী মূর্ত্তিতে নিবদ্ধ হইয়া গেল। এতদিন একাকী ছিলাম, সহসা সেই ক্ষণ হইতে হৃদয়ের মধ্যে আর একটি মূর্ত্তিকে চিরসহচরীরূপে পাইলাম। শয়নে স্বপনে ভ্রমণে বিশ্রামে পরিশ্রমে—সব অবস্থাতে, সব সময়ই সেই মুখখানি আমার মনের ভিতর জাগিতে লাগিল। আমার সমগ্র হৃদয় অন্ধবিশ্বাসের মত তাহার দেবতাকে জড়াইয়া ধরিল—কিছুতেই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। আমি মরিলাম, কিন্তু যেন মরিয়া বাঁচিলাম। এতদিন হৃদয়ে উৎসাহ ছিল না, আনন্দ ছিল না, শুধু নিজের জন্য বাঁচিয়া, নিজের চিন্তায় ডুবিয়া আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া যেন বাঁচিয়া-মরিয়া ছিলাম। আজ যেন একটা নূতন আলোক, একটা নূতন আনন্দ, এক অভিনব ভাবের প্রবাহ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আমি আত্মহারা হইলাম।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, আমার হৃদয়ে তাহাকে পাইবার, তাহাকে আপন করিবার, তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া মর্ত্তে স্বর্গসুখের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এক ভ্রাতা আমার বন্ধু; এই সূত্রে আমি প্রায় নিত্যই তাহাদের বাড়ী যাইতাম—বন্ধুত্বের অছিলায় তাহাকে দেখিতে, তাহার সহিত কথা কহিতে। সে আমাকে ভালবাসে কি না তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতাম না। অথচ মনে হইত, সে আমাকে উপেক্ষাও করে না, আমাকে দেখিলে তাহার নয়নে একটা যেন আনন্দের রশ্মি ফুটিয়া উঠে, মুখে লজ্জার ভাব দেখা দেয়, অধরোষ্ঠে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া আবার মিলাইয়া যায়। ইহারা মুসলমান হইলেও, পার্সিসমাজ সংশ্লিষ্ট হইয়া অত পর্দ্দার পক্ষ-পাতী ছিল না, তাই গুলনেহার বুরকাবৃত থাকিত না, সকলের সমক্ষে বাহির হইত, আমার কাছেও তাহার সঙ্কোচ ছিল না। তাহার কাছে আকারে ইঙ্গিতে কবিতার উচ্ছ্বাসে কতদিন মনের ভাব প্রকাশ করিতাম—সে কেবলই হাসিত, কোনও কথা বলিত না। এই কি ভালবাসার লক্ষণ? বুঝিতে পারি-না-পারি, আমার মনে হইত, কেন সে আমায় ভালবাসিবে না? আমি শিক্ষিত, ভদ্রসন্তান, রূপবান, গুণবান, তাহার উপর তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছি—সে আমায় চাহিবে না? আমার নিজের বাসনার প্রখরতায় তাহার হৃদয়ের প্রতি আমার তত দৃষ্টি ছিল না বোধ হয়;—কিন্তু একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, সে আমার সহিত কথা কহুক বা না কহুক, সে যে আমার রূপের প্রতি, আমার সৌজন্যের প্রতি, আমার জীবনজড়িত কবিত্বের প্রতি একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও আকর্ষণ করিতেছিল, তাহা আমার বেশ উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু সে যে কতটুকু ভালবাসা,

কতটুকুই বা স্ত্রীজাতিস্বভাবসুলভ পুরুষকে আকর্ষণ করিবার প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা,তাহা তখন অত তলাইয়া বুঝিবার মত মাথা আমার ছিল না।

ভালবাসিয়া পুরুষ যেমন অন্ধ হয়, পাগল হয়, তেমন স্ত্রীজাতি হয় কি? আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি জানি, পুরুষ একবার ভালবাসিলে আর ভুলিতে পারে না, সমস্ত জীবনে—বোধ হয় মরণেও—সে ভালবাসা তাহার হৃদয় হইতে মুছে না। কৈ, আমি তো তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না! তুমি কঠোর গোয়েন্দা, তুমি বুঝিতে পারিবে কি? আমি তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছি, তবু আজও প্রত্যেক অণুর মধ্যে তাহার দেবীমূর্ত্তি আমার নয়নের কাছে অহরহঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে।—কিন্তু সে তো আমায় ভুলিয়াছিল!

যাক সে কথা। আমার হৃদয়ের বাসনা এত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল যে আমি আর মনের কথা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। তাহার অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে বিবাহপ্রস্তাব উপস্থিত করিলাম, এবং বলিতেও ভুলিলাম না যে সেও আমাকে পাইলে সুখী হইবে। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। কঠোরচিত্তে সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। হাসিয়া বলিল যে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির হস্তে ভগিনীকে সমর্পণ করিতে পারে না; আমার দারিদ্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আমাকে মর্ম্মপীড়িত করিতেও ছাড়িল না, এবং তাহার ভগিনীর হৃদয়ে আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব জন্মিয়াছে শুনিয়া আমাকে তাহার বাড়ী আসা পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিল। আমার সকল আশা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে সে তিনটা প্রাণীর সর্ব্বনাশ করিল। তাহারা আমার হৃদয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিল না,—বুঝিলনা যে,নববসন্ত সমাগমে ফলপুষ্পভরা তরুণ তরু সহসা বজ্রাঘাতে শুষ্ক দগ্ধ কালিমাময় নীরস ও ভয়ঙ্কর হইয়া যায়। আমার শত আশা শত আকাঙ্ক্ষা, আমার হৃদয়ের নবোদ্‌বুদ্ধ কোমল কবিত্ব, আমার জীবনের সকল উৎসাহ সকল উদ্যম, তাহাদের এই কঠিন প্রত্যাখ্যানে নিষ্পেষিত হইল! হৃদয়ের প্রতি শিরায় শিরায় যে খর রক্তস্রোত বহিয়াছিল, তাহা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল; এই নির্ঘাত বাক্যে আমি যেন অসাড় হইয়া গেলাম; ভালবাসার যে নূতন ও উজ্জ্বল আলোক আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, সহসা তাহা নিবিয়া গেল; আমি বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখিলাম। আমি দীনের দীন হইয়া কত সাধিলাম, কত কাঁদিলাম, নিজের বিষয় কতভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, আমি যে নিতান্ত হেয় নহি তাহা কত রকমে বুঝাইলাম,—কিছুতেই কিছু হইল না। তাহাদের সেই এক কথা—আমার মত লোকের সহিত বিবাহ দিয়া তাহারা কন্যাকে অসুখী করিতে পারিবে না। আমার সব ভরসা ফুরাইল। আমি মানুষ হইলেও হইতে পারিতাম; যদি তাহাকে পাইতাম, তাহা হইলে হয় তো আমার ভিতরকার সকল মনুষ্যত্বটুকু জাগিয়া উঠিতে পারিত। তাহাকে সুখী করিবার জন্য আমি না করিতে পারিতাম কি? কিন্তু আমার মানুষ হওয়া হইল না; তাহার পরিবর্ত্তে হইলাম—তোমার বন্দী। নিয়তি! আমার নিয়তি, তাহারও নিয়তি!

তাপদগ্ধ জর্জ্জরিত হৃদয় বহিয়া ঘরে ফিরিলাম। ঘর ভাল লাগিল না। সব শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না—কাহার জন্য কায করিব? নিজের জন্য ঘুরিয়া মরিব? আর তাহা ভাল লাগিল না। সংসার যেন আমার কাছে কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে সংযমী, সে বোধ হয় এমন অবস্থায় পড়িলে নিজেকে ভুলিয়া, জগতের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে; কিন্তু আমি তো বলিয়াছি, সংযম কাহাকে বলে আমি কখনও তাহা জানিতাম না, তাই নিজের বেদনায় জগৎকে ভুলিয়া যাইলাম। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল; কি করিব কোথায় যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কোন পাপে বিধাতা আমাকে এই নবীন বয়সে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন? যদি তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে হয় তো জ্বালা যন্ত্রণা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার কাযে

মন দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে আমার জীবনের সমস্ত আগ্রহের সহিত তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, তাহাকে না পাইলে আমার জীবনে স্বস্তি নাই, হৃদয়ে সুখ নাই, জগতে শোভা নাই, আকাশে আলোক নাই, জ্যোতি নাই।

মনে হইল, একবার তীর্থদর্শন করিয়া আসি। যেখানে পয়গম্বরের পবিত্র দেহ সমাহিত আছে, সেই পবিত্র তীর্থে নয়নের জল ঢালিয়া যদি হৃদয়ে শান্তি পাই, যদি সেই মহাপুণ্যের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে আমার হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে ধরিতে পারি। আশা যে যায় না; এত বিড়ম্বনার পরেও মূর্খ আমি তাহার আশা তো ছাড়িতে পারিলাম না। যেই সে কথা মনে উঠিল, অমনি সংসারের সকল কায ফেলিয়া মক্কার দিকে ছুটিলাম। কত কষ্ট করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম; মনে আশা যে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে অবিবাহিত অবস্থায় দেখিতে পাইব, এবং ততদিনে তাহার অভিভাবকবর্গের মত ফিরিবে—তাহারা আমাকে তাহার সহিত পরিণীত করিতে সম্মত হইবে।

এই দুরাশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, মাসের পর মাস কাটাইয়া আবার স্পন্দিত হৃদয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিন আশা নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইতেছিলাম; ভারতে ফিরিয়া সন্ধান লইয়া যে সংবাদ পাইলাম তাহাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। শুনিলাম তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্বামীর নাম মহম্মদ স্বরের স্ত্রী। হে বিজয়ী গোয়েন্দা, বুঝিতে পার কি, যে আমার এই সর্ব্বনাশের সংবাদে আমার মত অসংযমীর হৃদয়ে কি নিদারুণ জ্বালা, হতাশার কি ভীষণ দংশন উপস্থিত হইয়াছিল? এত দিন পাগল হই নাই, এইবার পাগল হইলাম। আমার মনুষ্যত্ব আমার জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইতে চলিল। যদি তখনও তাহার আশা ছাড়িয়া, সংসারে লিপ্ত হইতে পারিতাম, তাহা হইলেও রক্ষা হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার রূপসম্ভোগের পিপাসা কিছুতেই তিরোহিত হইল না। মানুষ ছিলাম, পশু হইলাম; কবি ছিলাম, লালসায় জর্জ্জরিত হইয়া নরকের কীট হইলাম। দূতী মিলিল। দূতী-মুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম যে সে আমাকে দেখা দিবে কি না, পুরাতন বন্ধুর সহিত পুনরালাপ করিবে কি না। উত্তর আসিল—ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান।

আমার অন্ধ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমাকে জ্ঞানহীন করিল। আমার সকল ক্রোধ নিরপরাধ সুন্দ্রীর উপর গিয়া পড়িল। তাহাকে সরাইতে পারিলে হয়তো আমার গোপন আশা মিটিবে, এই জঘন্য কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া, সেই পূর্ব্বোক্ত দূতীর সাহায্যে গভীর রাত্রিতে, তাহাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া শয়নাগারে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, এবং স্বামীর পার্শ্বে আমার হৃদয়ানন্দবিধায়িনী, অথবা আমার সর্ব্বনাশের মূলস্বরূপা গুলনেহার নিদ্রিতা রহিয়াছে। আমার মূলসংকল্প ভুলিয়া, দাঁড়াইয়া ক্ষণেক তাহার রূপসুধা পান করিলাম। আহা আহা, কি মধুর সে রূপ! এক মুহূর্ত্তে আবার হৃদয়ের মধ্য দিয়া একটা প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল; ঈর্ষায় হৃদয় পুড়িয়া গেল, লালসায় প্রাণ বিকল হইয়া উঠিল। শেষে লালসারই জয় হইল; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া, ঈর্ষা ক্রোধ ভুলিয়া, বিপদ আপদ ভুলিয়া, সেই নবনীত কোমল দেহের স্পর্শ কামনায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। সেই বসোরার গোলাপ বিনিন্দিত সুন্দর গণ্ড দুইটীতে দুইটি সানুরাগ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিবার প্রবল বাসনা আমাকে অবশ করিয়া তুলিল। আমি সুন্দ্রীকে হত্যা করিতে ভুলিয়া গিয়া, টুপি ও কোর্ত্তা খুলিয়া, আলোক নির্ব্বাণ করিয়া, তাহার চিরবাঞ্ছিত অমরদুর্লভ অঙ্গে হস্তার্পণ করিলাম; সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য একটা বিরাট সুখ—কিন্তু তখনই আবার স্বপ্ন টুটিয়া গেল, আবার বাস্তব জগতে, সেই নিদারুণ জ্বালাময় ঘৃণাময় ঈর্ষাময় জগতে নামিয়া আসিতে হইল। স্পর্শমাত্রেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার স্বামী আমাকে অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া জড়াইয়া ধরিল। ক্ষুধিত হিংস্র পশুর ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ভূপাতিত করিলাম। ততক্ষণ

তাহার স্ত্রী—সেই রাক্ষসী, সেই সর্ব্বনাশী—"চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। এই চোর 'চোর রব আমাকে যেন আরও আত্মহারা করিয়া তুলিল—সেও কি না চোর চোর বলিয়া চেঁচায়! যাহার জন্য আমার সমস্ত বুকের শোণিত শুকাইয়া গিয়াছে, যে আমাকে স্বর্গ হইতে রসাতলে নামাইয়া লইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য আমি সব হারাইয়াছি—সে কি না আমাকে সামান্য ধনাপহারী চোর বলিয়া মনে করিল! তাই সেই জ্ঞান-হীনতার মাঝেও ক্ষোভে ঘৃণায় ও নিরাশায় পাগল হইয়া তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলাম "তুমিও—তুমিও আমায় চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতেছ!" তার পর তাহার হৃদয়ে আমার জিঘাংসু রক্তপিপাসু ছুরিকা আমূল বসাইয়া দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য মনুষ্যের আত্মজীবন-রক্ষার প্রবৃত্তি! নিজের বুকে সেই ছুরি বসাইয়া তাহার বুকে শুইয়া মরিলাম না কেন? সে তো সুখের মরণ হইত,—তোমার হাতে বন্দী হইয়া কুকুরের মত মরিতে হইত না। তা না করিয়া আমি পলাইয়া আসিলাম—পলে পলে তুষানলে জ্বলিবার জন্য—তিলে তিলে পুড়িয়া মরিবার জন্য!

৩। গোয়েন্দার কথা।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আসামীর নামটি বলা হয় নাই—তাহার নাম মহাম্মদ গোয়াম—মক্কা হইতে ফিরিবার পর হইতে—হাজি মহাম্মদ গোয়াম।

তাহাকে প্রায়ই দেখিতে যাইতাম, কিন্তু কোনও দিন তাহাকে মৃত্যুভীত বলিয়া মনে হয় নাই। সে বিমর্ষ থাকিত বটে, কিন্তু সে বিমর্ষতার কারণ অন্য প্রকার। সে নিজেই বলিত, "হায় হায়, কি করিলাম! আমার ক্ষুদ্র লালসার ও স্বার্থের বহ্নিতে দুইটি প্রাণীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম!" এই অনুশোচনাই এখন তাহাকে অভিভূত করিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এই কেস্‌টা যত পর্য্যালোচনা করি, ততই যেন মনে খটকা লাগে। এই যে লোকটা—সুশ্রী, সর্ব্বতোভাবে ভদ্র বলিয়া পরিগণিত, এই লোকটা নিজের লালসার খাতিরে কি না করিল! লালসা না ঈর্ষা? লালসা হইতেই ঈর্ষা আসে—নয়? দুর্য্যোধনের প্রবল ধন-লালসা ছিল, প্রভুত্বের লালসা ছিল, তাই যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্যে সে ঈর্ষায় পাগল হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিল। এও ছোট হিসাবে তাহাই ঘটিয়াছিল। সে যাহাকে চায়, অন্যে তাহাকে ভোগদখল করিবে, এই ব্যক্তির মনে তাহা সহ্য হইল না। মূলে লালসা, পরে লালসার সহচর ঈর্ষা, শেষে লালসা ও ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অবশ্যম্ভাবী ফল—পাপ। পশুজাতিও ত ঠিক এই রকম লালসা ও ঈর্ষায়—বিশেষতঃ স্ত্রী পাওয়ার জন্য—মারামারি করিয়া মরে। তবে আমরা এত বড়াই করি কেন?

বড়াই করি কেন তাহা শুনুন।

ফাঁসির দিন সমাগত হইল। ফাঁসি দেখিবার জন্য অনেকের একটা বীভৎস আগ্রহ থাকে, কিন্তু আমি এই আগ্রহের বশীভূত হইয়াই নয়, এই অদ্ভুত জীবটির জীবন নাট্যের শেষ অঙ্ক কিরূপে অভিনীত হয় তাহা জানিবার ঔৎসুক্যবশতঃ ফাঁসির স্থানে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি যে, যে ফাঁসি যাইবে তাহার মনে তখনও কোনও ভয়ের লক্ষণ নাই। ক্ষণ পরেই যে তাহার জীব-লীলা শেষ হইবে, তাহার জন্য তাহার ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত নাই। সে বেশ সবল পদবিক্ষেপ করিয়া ফাঁসির স্থানে উপস্থিত হইল, এবং মঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল; মুখঢাকা টুপিটা পরিবার পূর্ব্বে নির্ভীক দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া, মহাকবি হাফেজের অমর কবিতা "ভালবেসে মরেছে যে, তারে পুনঃ মারিবে কে" আওড়াইল। পরক্ষণেই সব শেষ!

মাথাটা গোলমাল হইয়া গেল; ভালবাসা—ভালবাসা—ভালবাসা—ভালবাসা, এই একটা কথার ভিতর জগতের যে কতখানি বাঁধা পড়িয়াছে তাহা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম; অন্ধকার হইতে যেন উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে আসিলাম।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

জয় পরাজয়

(গল্প)

মতিগঞ্জের জমীদার মধুসূদন মিত্র মহাশয় মহকুমা হইতে মোকর্দ্দমা অন্তে গ্রামে ফিরিতেছিলেন। উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দশক্রোশ, বর্ষাকালে পথঘাট সব জলে ডুবিয়া যায় বলিয়া নৌকা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যাতায়াত করা যায় না।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রাবণের ধারা সমস্তদিন অক্লান্তভাবে বর্ষণ করিয়া, অপরাহ্ণ হইতে একটু ছুটি লইয়াছে, তাই খণ্ডমেঘের অন্তরাল হইতে শুক্লপক্ষের চাঁদ কয়েকদিন পরে দেখা দিয়া পৃথিবীটাকে একখানি পাতলা আলোকের আবরণে মুড়িয়া দিয়াছিল।

ঘাটের উপর নৌকা বাঁধিয়া, মধুসূদন বাবু আলবোলার নলটী মুখে দিয়া তাঁহার সদর নায়েব মণিরাম মল্লিকের সহিত সেদিনকার একটা মোকর্দ্দমার গল্প করিতেছিলেন। দাঁড়ি মাঝি এবং বেহারারা ঘাটের বাঁধান চাতালের উপর রন্ধন সুরু করিয়া দিয়াছিল, কারণ উজানে দশক্রোশ রাস্তা দাঁড় টানিয়া প্রত্যূষের মধ্যেই তাহাদিগকে মতিগঞ্জে পৌছিতে হইবে, নচেৎ অনর্থপাতের সম্ভাবনা।

শত্রুপক্ষীয় একজন জমীদার সেদিনকার একটা মোকর্দ্দমায় কিরূপ নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন, তাহার কাহিনীটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে অনুমান ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক একটি ব্রাহ্মণ যুবক নৌকার সম্মুখে আসিয়া মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার নৌকো ?"

মাঝিরা জানাইল, মতিগঞ্জের।

সে বলিল, "গোপাল মাঝির নৌকো ?"

গোপাল মাঝি চাতালের অপর প্রান্তে বসিয়া মাছ কুটিতেছিল, সে জানাইল যে হাঁ তাই বটে।

আগন্তুক যুবকটী তখন বলিল, "বাজারের দোকানে শুনলাম যে তোমাদের নৌকো এখানে রয়েছে। আমিও মতিগঞ্জে যাব, আমার মামার বাড়ী সেখানে। আমাকে নিয়ে যাবে তোমরা ?"

গোপাল মাঝি ইঙ্গিতে বাবুকে দেখাইয়া দিল। সে তখন বাবুর সম্মুখীন হইল।

সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বাবু বলিলেন, "কে তুমি ?"

সে জানাইল যে মতিগঞ্জে তাহার মাতুলালয়, তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মণিরাম মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার মামা ?"

উত্তরে সে বলিল, "আমার মামা নেই, দাদামশাই আছেন। তাঁর নাম শিবনাথ শিরোমণি।"

বাবু তখন বসিবার জায়গা দিলেন। মণিরাম মল্লিক প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে একপাশে সরিয়া গেল।

বাবু তাহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে তাঁহার বাড়ী নিকটবর্ত্তী কুসুমপুর গ্রামে। পিতা বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছেন, সম্প্রতি মাতার মৃত্যুতে সে একেবারে আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়া সে কোন এক টোলে কিছুদিন সংস্কৃত পড়িয়াছিল, তাহার পর আবার কিছুদিন ইংরাজী স্কুলে পড়িবার পর কি কারণে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিনা দিনকতক গ্রামে পৌরোহিত্য করে, এবং তাহা ভাল না লাগায় মাষ্টারী করিতেছিল। কিন্তু মাতার মৃত্যু হওয়াতে সে মাষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া মতিগঞ্জে তাহার দাদামহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়াছে।

ছেলেটীর সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া এবং তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বাবু বলিলেন, "চাকরি করবে ?"

সে এক কথায় উত্তর দিল, "না।"

বাবু এবং মণিরাম মল্লিক উভয়েই অবাক্ হইয়া

গেলেন। আজ খাইবার সংস্থান যার নাই, সে স্বেচ্ছায় হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতে পারে! বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, চাকরী করবে না কেন?"

সে বলিল, "ভাল লাগে না।"

বাবু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাল লাগে?"

সেও একটু হাসিয়া জবাব দিল, "সেটা ঠিক বলতে পারি নে। কোন্ জিনিষটা ভাল লাগে না সেটা বলা যত সহজ, কি ভাল লাগে সেটা বলা তত সহজ নয়।"

বাবু বলিলেন, "ঠিক কথা। তোমাকে যদি কেউ মানুষ কর্ত্তে পারতো, তা হলে তুমি সত্যি সত্যিই মানুষ হতে পারতে।"

নরেন্দ্র একথা শুনিয়া কেন যে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, তাহা সেই জানে। মণি মল্লিক তাহার ভাবগতি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ভাবিল, "পাগল নাকি?"

কিন্তু সে যে ঠিক পাগল নয় তাহার একটা উদাহরণ শীঘ্রই সে দেখাইয়া দিল।

রাত্রে আবার মেঘ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া নৌকা এক জায়গায় বাঁধিতে হইয়াছিল। সুতরাং বন্দোবস্ত উল্টাইয়া গেল। ভোরে মতিগঞ্জে পৌঁছিবার কথা ছিল, কিন্তু মতিগঞ্জ হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে একটা গ্রামে আসিতেই সূর্য্যোদয় হইল। বাবু লক্ষ্মণ খানসামাকে চা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়া হাত মুখ ধুইতে গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তীরে একটা গোলমাল শুনিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, এক ব্যক্তি ঘটি হাতে করিয়া কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়াইয়া, আর লক্ষ্মণ খানসামা "দে ঘটি—দে ঘটি" বলিয়া তাহার হাত হইতে ঘটিটা কাড়িয়া লইতে উদ্যত। মণিরামকে দেখিবামাত্র খানসামা জানাইল যে বাবুর চায়ের জন্য সে এই লোকটির কাছে একটুখানি দুধ চাহিয়াছিল, সে তাহা দেয় নাই; উপরন্তু বাবুর উদ্দেশে কতকগুলি কুকথা বলিয়াছে; ইহার ঘটিশুদ্ধ কাড়িয়া লওয়া হউক।

লোকটা বলিল, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে তাহার রুগ্ন পুত্রটীর জন্য শেষ রাত্রে আধ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গোয়ালাবাড়ী হইতে দুধ লইয়া আসিতেছিল, এই খানসামা তাহাকে বলিয়াছে যে ঘটিশুদ্ধ দুধ তাহাকে দিতে হইবে, নৌকায় গিয়া সে তাহার ঘটি ফেরত পাইবে। সে তাহাতে আপত্তি করায় তাহার এই অবস্থা।

মণিরাম মল্লিক বলিল, "এতো বেশ কথা। দুধটুকু ঢেলে নিয়ে ওর ঘটিটা ফেরত দাও। একজন বড়লোক চা খাবেন বলে দুধ চাইছেন, এতে আপত্তি করবার কিছুই দেখতে পাইনে।"

খানসামা ঘটি ধরিয়া টানিতে গেল। সেও বলিল, দুধ দিতে পারিব না। খানসামা পুনরায় জোরে টান দিল, সেও টান দিল। টানাটানির ফলে দুধটুকু সব মাটিতে পড়িয়া গেল। লক্ষ্মণ খানসামা আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া লোকটীর গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিল, সেও তাহার পাল্টা জবাব দিল। আঘাত সামান্য হইলেও লক্ষ্মণ খানসামা 'বাপ্‌রে!' বলিয়া নদীর পাড় হইতে একেবারে জলের ধারে গড়াইয়া পড়িল। মল্লিক মহাশয় পায়ের চটিজুতা খুলিতে যাইতেছিলেন, তাহা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া হুকুম দিলেন, "বাঁধো হারামজাদাকে।"

মাঝি মাল্লারা হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল। লক্ষ্মণ খানসামাও পুনরায় ছুটিয়া গিয়া তাহাকে চড় কিল যাহা পারিল মারিল। অবশেষে মাঝিদের সাহায্যে তাহারই কাপড় দিয়া তাহার হাত দুটি বাঁধিয়া নৌকার নিকট লইয়া আসিল।

মণিরাম মল্লিক সক্রোধে হুকুম দিলেন, "বেটাকে আজই দারোগার হাতে দাও।"

সে ব্যক্তি তখন যোড়হাত করিয়া বলিল, "দোহাই হুজুর, রাগের মাথায় করে ফেলেছি; আমাকে ছেড়ে দিন, আমার ঘরে রোগা ছেলে-

"চোপরও হারামজাদ"—বলিয়া মণিরাম লাফাইয়া

উঠিলেন। এমন সময়ে গোলমাল শুনিয়া মধুসূদন বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

মণিরাম তাঁহাকে জানাইলেন যে লক্ষ্মণ খানসামা একটু দুধ চাহিয়াছিল বলিয়া এই ষণ্ডামার্ক লোকটা তাহাকে মারিয়া একেবারে আধমরা করিয়া দিয়াছে। ইহাকে থানায় না দিলে তো আর সম্ভ্রম রক্ষা করা যায় না।

বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র বলিল, "মশাই, আমি স্বচক্ষে দেখেছি এর কিছু দোষ নেই। সম্পূর্ণ দোষ আপনার খানসামার। ও ব্যক্তি নিজের রোগা ছেলের জন্যে দুধ নিয়ে যাচ্ছিল, ওর ছেলের অসুখের গুরুত্বটা আপনার চা খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী।"

বাবু বলিলেন, "যাক আর হাঙ্গামে কায নেই। এর নাম ধাম লিখে নিয়ে ছেড়ে দাও। থানায় একটা ডায়েরী করিয়ে রাখলেই হবে।"

মণিরাম মল্লিক বলিলেন, "বলেন কি ? এই ছোকরার কথায় আপমি বিশ্বাস করলেন ? এই দুষ-মণকে থানায় দিয়ে তবে আমি জলগ্রহণ করবো।"

লক্ষ্মণ খানসামা নিজ গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "হুজুর, আমার গালটা একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে দেখুন।"

হুজুর তাহার গণ্ডের দিকে চাহিয়া লাল হওয়ার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। মল্লিক মহাশয় তখন তাঁহার কাণে কাণে কি পরামর্শ দিলেন। পর মুহূর্ত্তেই তিনি নৌকার কামরার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

লোকটাকে অবিলম্বে নৌকায় তুলিতে মণিরাম মাঝিদিগকে আদেশ দিলেন।

নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিল না। কামরার ভিতর বাবুর নিকটে যাইয়া বলিল, "মশাই, কল্যাণ হোক, আমি এইখানেই নামছি।"

বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা, এই যে বল্লে মতিগঞ্জে তোমার—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দাদামশাইয়ের বাড়ী। কিছু মনে করবেন না মশাই, আপনি বড়লোক, আমি গরীব। এ দৃশ্যটা আর দেখতে পাচ্ছি নে। তাই নামছি। ভগবান করেন যেন আপনাদের মত লোকের কাছ থেকে দূরেই থাকতে পারি।" বলিয়া একবার তীব্রভাবে তাঁহার দিকে চাহিল।

সেই লোকটী হাত পা বাঁধা অবস্থায় তখনও হতভম্বের ন্যায় বসিয়া ছিল, বোধ হয় সে তখন তাহার রুগ্ন পুত্রটীর ম্লান মুখখানি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিল। নরেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, তোমার নাম?"

সে বলিল, "সদাশিব।"

"বাড়ী ?"

"এই গ্রামেই, মুকুন্দপুরে।"

নরেন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া তীরে উঠিল। বাবু ঘুলঘুলির ভিতর হইতে তাহাকে ডাকিলেন, সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

মণিরাম বলিল, "লোকের কখনও ভাল করতে নেই। সমস্ত রাত্তির নৌকায় নিয়ে এলাম, এখন কাছাকাছি এসে নৌকো থেকে নেবে ঠাকুরের পুরুষত্ব দেখান হল! কলিকাল কি না!"

এই তুচ্ছ ঘটনাটাকে আর বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতে মধুসূদন বাবুর আদৌ ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মণিরামকে বলিলেন, "আর হাঙ্গামে কায নেই, ছেড়ে দাও লোকটাকে।" বলিয়া তাহার মুখে একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নাও বাপু তোমার দুধের দাম। যাও এখান থেকে।"

সদাশিব চলিয়া গেলে বাবু লক্ষ্মণকে বলিলেন, "দেখ দিকিনি উপরটা খুঁজে, সেই বামুন ঠাকুর কোনও গাছতলায় বসে আছে কি না।" এই স্পষ্টবাদী নির্ভীক ব্রাহ্মণ যুবকটীর শ্লেষোক্তি গুলি তাঁহার মর্ম্মস্থলে বিঁধিয়া গিয়াছিল।

অনিচ্ছাসত্বেও লক্ষ্মণের যাইতে হইল। কিন্তু

নরেন্দ্রের উপর তাহার একটা কেমন বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছিল। সে তাহার সন্ধানের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, নিজেই একটা গাছতলায় কিছুক্ষণ বসিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বাবুকে জানাইল যে ঠাকুরটার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যে চায়ের জন্য এতবড় গণ্ডগোলটা বাঁধিল, সেই চা সেদিন আর উদরস্থ হইল না। ইহাকেই বলে বিধাতার বিড়ম্বনা!

২

কথাটা কিন্তু রাষ্ট্র হইতে বেশী দেরী হইল না। মুকুন্দপুরে এক ক্ষুদ্র জমীদার ছিলেন, তাঁহার নাম রাধানাথ চৌধুরী। তিনি সদাশিবকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, এ তো তোমার অপমান নয়, আমারই অপমান। আমার এলেকার মধ্যে নৌকো বেঁধে আমার প্রজার গায়ে হাত তোলা যে কতটুকু ব্যাপার, তা আমি তাদের বেশ করে বুঝিয়ে দিতে চাই। কোন্ গাঁয়ের নৌকো বলতে পার?"

সদাশিব জানাইল যে সে জানে না, তবে যে বামুন ঠাকুর তাহার উপর করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যিনি তাহাদের উপর রাগ করিয়া নৌকা হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন, সমস্ত সন্ধান সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

রাধানাথ বাবু নরেন্দ্রের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। সে গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অল্পক্ষণ পরেই আসিল। রাধানাথ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাইল যে নৌকা মতিগঞ্জের। বাবুর নাম বলিতে পারিল না, তবে নৌকায় থাকিয়া মণিরামের নাম শুনিয়াছিল, তাহা বলিল।

নৌকারোহীদের সম্বন্ধে রাধানাথ বাবুর আর কিছু জানিতে বাকী রহিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে মতিগঞ্জের বাবুটীকে এবার তিনি ভাল করিয়াই চা পান করাইবেন।

নরেন্দ্রের পরিচয় লইয়া তিনি বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি আমার এখানে থাক না কেন?"

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে নরেন্দ্র মধুসূদন বসুর প্রস্তাব পূর্ব্বরাত্রে উপেক্ষা করিয়াছিল, সেদিন রাধানাথ বাবুর কথায় সাগ্রহে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

রাধানাথ বাবু বলিলেন, "থাসা হবে। আমার রাধামাধব ঠাকুরটী রয়েছেন, তাঁর সেবা করবার ভাল পুরুত পাওয়া যায় না, তুমি সেই ভার নাও, আর সেরেস্তার কাযকর্ম্মও শেখ। দিব্বি থাকবে, কোন কষ্ট হবে না। দাদামশাইকে দেখে আসতে চাও, তাও যখন ইচ্ছা যেতে পার। মতিগঞ্জ এখান থেকে ৪।৫ ক্রোশের মধ্যেই হবে।"

বাবু তাঁহার স্থাপিত বিগ্রহের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী ঘর তাহার জন্য পরিষ্কার করাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র রহিয়া গেল এবং দাদামহাশয়কে দেখিয়া আসিবার জন্যও আপাততঃ তাহাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখা গেল না।

অবিলম্বে আদালতে একটি ফৌজদারী মোকর্দ্দমা দায়ের করা হইল। একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার যে এতখানি গড়াইবে তাহা মধুসূদন বাবু ভাবিতেও পারেন নাই। মণিরাম মল্লিক জিদের উপর মোকর্দ্দমার যথেষ্ট তদ্বির করিলেও, ফলে কিছু সুবিধা হইল না। লক্ষ্মণ খানসামার ১৫৲ টাকা জরিমানা ও একসপ্তাহ জেল হইয়া গেল।

মণিরাম মল্লিকের সমস্ত রাগটা তখন পড়িল নরেন্দ্রের উপর। এই হতভাগাটাকে সেদিন নৌকায় না লইলে তো এত কাণ্ড ঘটিত না! ঝগড়া হইল খানসামার সঙ্গে আর একটা পথের লোকের, তাহাতে তাহার এত মাথা ব্যথা কেন?

ওষ্ঠ দংশন করিয়া মণিরাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এর প্রতিশোধ যেমন করিয়াই হউক লইতে হইবে। একটা নিরাশ্রয় ভিক্ষুকের স্পর্দ্ধার সীমা এত!

নরেন্দ্রের জীবনের যে ধারাটী এতদিন লক্ষ্যশূন্য

অবস্থায় ইতস্তত ঘুরিতেছিল, সহসা একটা পাথরে আছাড় খাইয়া তাহার গতির বেগটা এক মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া গিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট পথে গিয়া পড়িল। রাধানাথ বসুর আশ্রয়ে আসিয়া যেন একটা দৈবশক্তির বলে তাহার জীবনটা আগাগোড়া বদলাইয়া গেল।

রাধানাথ বসুর পুত্রসন্তান ছিল না, ছিল এক বিধবা কন্যা, তাহার নাম কল্যাণী। তাহারই একান্ত আগ্রহে ৺রাধামাধবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মেয়েটি রাধামাধবের সেবায় দিনরাত বিভোর হইয়া নিজের অদৃষ্টকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময়ে নূতন পূজারীরূপে নরেন্দ্রনাথ তাহাদের সংসারে প্রবেশ করিল।

এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ যুবকটীর কথা সদাশিব পূর্ব্বদিনেই কথা পরম্পরায় বলিয়াছিল। সেদিন প্রভাতে মেয়েটি তাহাকে মন্দিরে দেখিয়াই ভাবিল যে ইঁহার ভিতর সত্যই একটা অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে বটে।

প্রথম দিন মন্দিরে ঢুকিয়াই নরেন্দ্র চমৎকৃত হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে কিছুকাল সে পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে সকল স্থানে তো পূজা নৈবেদ্যের এত পারিপাট্য, ঠাকুরের সাজসজ্জার এত বিন্যাস সে কখনও দেখে নাই! ঠাকুরের নির্ম্মাল্য হাতে করিয়া একবার সে সম্মুখস্থ শুভ্র পাষাণ নির্ম্মিত প্রতিমার দিকে, একবার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা শুভ্রবসনা সজীব মূর্ত্তিটীর দিকে বিহ্বলের মত চাহিতে লাগিল। মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে এখানকার পূজায় ছেলেখেলা করিলে চলিবে না, সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়া ঠাকুরের সেবা করিবে, নহিলে এই দেবতার প্রতিষ্ঠাত্রীর অকল্যাণ করা হইবে, নিজেরও মনে শান্তি ও তৃপ্তি পাইবে না।

সেদিন পূজা অন্তে তাহার মনটা দৈন্য ও দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে যেন কোন্ এক মায়ামন্ত্র বলে বিশ্বদেবতার স্বর্ণতলে অবনত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই নরেন্দ্র স্নান করিয়া, কপালে চন্দনের রেখা আঁকিয়া, বসুদের দেওয়া নূতন গরদের ধুতি ও চাদরখানি পরিয়া যখন মন্দিরে আসিল, তখন তাহার সুগৌর কান্তির উপর পবিত্রতার একটা দীপ্তি ঝলমল করিতেছিল। কল্যাণী গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। নরেন্দ্র পূজায় বসিল।

ছয়মাস এই ভাবে কাটিল। এমন সময়ে অদৃষ্টদেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া এমন একটী কাণ্ড করিলেন যাহাতে সব ওলটপালট হইয়া গেল।

রাধানাথ বাবু কয়েকবৎসর হইতে কাসরোগে ভুগিতেছিলেন। নানাবিধ ঔষধাদি সেবন করিয়া তাহার অনেকটা উপশমও হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার জ্বর হইল। গ্রামের যিনি ডাক্তার ছিলেন, তিনি রোগটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ একদিন শ্বাসবন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল।

তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। উইলে এক ভাগিনেয়কে বিষয়ের একজিকিউটার করিয়া গিয়াছিলেন, সে ৩।৪ দিন না যাইতেই মাতুলের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার মাতাকে লইয়া গরুর গাড়ী চড়িয়া মুকুন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সংসারের উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল।

কল্যাণী শীঘ্রই বুঝিল যে সেদিন আর নাই। পিতার কাছে আবদার চলিত, কিন্তু এখন আবদার শুনিবার কেহই নাই, উপরন্তু পিসী এবং তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে ২।৪টা বড় বড় কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। সে তাহার অতীত জীবনের মোহন স্বর্গের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, সে পথের সোনার সিঁড়ি চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াও অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না।

পিসী ইতিমধ্যেই বাড়ীর গৃহিণী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র গোপীকান্তও বিষয় কর্ম্মের সুব্যবস্থা করিতে সুরু করিয়াছিলেন। বাজেখরচ যাহাতে কোন

প্রকারে এতটুকু না হইতে পারে তৎপ্রতি তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি !

সপ্তাহ অতিবাহিত না হইতেই গোপীকান্ত তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "মা, এ কি রকম দেখত পাই। পুরুত বামুন তো চিরকালই বুড়োসুড়ো, মাথায় টিকি, বগলে কুশাসন, পায়ে চটিজুতো এই রকমই হয়ে থাকে জানি, পাঁজিতে ছবিও সেইরকম দেখেছি। কিন্তু এ বাড়ীতে দেখছি দিব্বি ফিট্ বাবু, টেরী কাটা, গরদ পরা, ছোকরা পুরুত—এ কি রকম—"

মাতা বিস্ময়ের অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "আর বাবা, দাদার কি আর শেষ বয়সে বুদ্ধি শুদ্ধি ছিল! তা এখন তুমিই তো সর্ব্বময় কর্ত্তা, তুমিই একটা বিহিত কর। সত্যি কথাই তো—"

বিহিত করিতে বড় বিলম্ব হইল না। গোপীকান্ত সেইদিনই নরেন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিল, "বামুন ঠাকুর, শুনতে পাই তুমি নাকি সেরেস্তার কাযকর্ম্ম জান?"

নরেন বলিল, "হ্যাঁ জানি।"

গোপীকান্ত বলিল, "ভালই হল। আমাদের সুন্দরবনের আবাদের একজন মুহুরী ছুটীর দরখাস্ত করেছে, তা হলে তোমাকেই সেখানে—"

নরেন বলিল, "সুন্দরবনে আমি গেলে ঠাকুরের সেবা করবে কে?"

গোপীকান্ত বলিল, "যার মাথা আছে সেই মাথা-ব্যথার কথা ভাববে। ঠাকুর সেবার অন্য বন্দোবস্ত আমি করিয়ে দেব।"

নরেন বলিল, "না, আমি সুন্দরবনে যেতে পারবো না। আমার ইচ্ছে নেই।"

এই অনিচ্ছার মূলে একটা গুপ্তরহস্যের কল্পনা করিয়া গোপীকান্ত মনে মনে ভারি কৌতুক অনুভব করিল এবং প্রকাশ্যে খুব গরম হইয়া বলিল, "ইচ্ছে নেই! চাকরের আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা! আলবৎ যানে হোগা।"

হিংস্র ব্যাঘ্রের মত নরেন্দ্রের চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। "কি! আমি আপনার চাকর!" কথাটা বলিতে গিয়া যেন গলার কাছে আটকাইয়া গেল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল যে এই সয়তানটাকে একটু শিক্ষা দেয়, কিন্তু কি ভাবিয়া আত্মসংবরণ করিয়া, গোপীকান্তের কথার কোন উত্তর না দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং তাহার ক্ষুদ্র কক্ষমধ্য হইতে নিজের কাপড়, চাদর প্রভৃতি ২।১টা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ লইয়া, ঘরে তালাবন্ধ করিয়া, চাবিটা গোপীকান্তের কোলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দেউড়ী পার হইয়া রাস্তায় আসিল। সেখান হইতে মন্দিরের চূড়াটী দেখা যাইতেছিল, সেদিকে একবার চাহিয়া, একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে মতিগঞ্জে তাহার দাদা-মহাশয়ের বাড়ীর রাস্তা ধরিয়া চলিল। একবার মনে হইল যে কল্যাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাই, কিন্তু কি ভাবিয়া তাহা আর করিল না।

৫

সন্ধ্যার সময় কল্যাণী মন্দিরে আসিয়া দেখিল যে নরেন্দ্র তখনও আসে নাই। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইল। লোক ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে ঘরে তালা বন্ধ, বামুন ঠাকুর গৃহে নাই।

গৃহে নাই! কল্যাণী ভাবিল, তবে কোথায় গেলেন? ঠাকুরের সন্ধ্যারতি করিতে হইবে সে চিন্তা বর্জ্জন করিয়া যে ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে বাহিরে থাকিতে পারে, তাহাকে দিয়া ঠাকুরের সেবা কেমন করিয়া চলিবে? তাহার মনে মনে বড় রাগ হইল।

পরিচারিকাকে বলিল, "গোপালের মা, একবারে কাছারী বাড়ীটা ঘুরে আয় তো বাছা। যদি দেখিস সেখানে তিনি আছেন, তা হলে বেশ করে শুনিয়ে বলে আসবি যে ঠাকুর সেবার চাইতে কি তাঁর কাছারীর কাযটা বড় হল।"

গোপালের মা চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে বামুন ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন, বাবু তাঁহাকে আ[illegible]য়াছেন।

"বাবু জবাব দিয়াছেন! আমার মন্দির, আমার ঠাকুরের পুরোহিতকে এক কথায় জবাব দিবার বাবুর কি অধিকারটা শুনি?"—কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া গোপীকান্তের নিকট আসিয়া বলিল, "গুপী দা, বামুনঠাকুরকে নাকি তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ?"

সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া গোপীনাথ নিজের মর্য্যাদাকে খর্ব্ব করিতে ইচ্ছুক হইল না। সে বলিল, "হ্যাঁ। উঃ বেটার তেজ দেখ্‌লে—"

কল্যাণী দৃপ্তভাবে বলিল, "মুখ সামলে কথা কয়ো গুপী দা! তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তুমি তাঁর পায়ের ধূলোর যোগ্য নও। তার পর, আজ সন্ধ্যাবেলা যে ঠাকুরের পূজো হয় না, ভোগ হয় না! তার উপায়?"

গোপী হাসিয়া বলিল, "নে নে, আর ছেলেমানুষী কর্ত্তে হবে না। পাথরের নুড়ী একদিন ভোগ না হলে শুকিয়ে আমসী হয়ে যাবে না। আজ আর ও সব হাঙ্গামে কায নেই, কাল সকাল বেলা বরং ওপারের ভুলু মুখুয্যেকে ডাকিয়ে আনাব। ওঃ ভারি তো ওঁর ঠাকুর, তার আবার ভোগ!"—বলিয়া হাসিয়া একেবারে লুটোপুটি হইয়া পড়িল।

কল্যাণীর আর সহ্য হইল না। রাগে দুঃখে অভিমানে সে আর কথা কহিতে পারিল না। মন্দিরে ফিরিয়া গিয়া, নিজেই গোপালের মার দ্বারা সংবাদ দিয়া, পাড়ার এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে ডাকাইয়া আনিল এবং কোন মতে তাহারই দ্বারা পূজা সারিল। কিন্তু কিছুই তাহার মনঃপূত হইল না। এই ব্রাহ্মণটীর প্রত্যেক কাযে সে খুঁত ধরিয়া, অবশেষে প্রণাম করিতে গিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা করিও ঠাকুর। আজ কেউ নাই, তাই তোমাকে এই অতৃপ্তির পূজা গ্রহণ করিতে হইল।"

প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে।

৬

লোকের সহিত মিশিবার ক্ষমতা নরেন্দ্রের যথেষ্ট ছিল, সুতরাং মতিগঞ্জে আসিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানির মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে তাহার বেশী দেরী লাগিল না। বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় তাহার উপর ঠাকুর সেবার ভার ছাড়িয়া দিয়া হৃষ্টমনে বহুকাল পরে আবার ভক্তিরত্নাকর লইয়া বসিলেন।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যহীন জীবনটা নরেনের নিকট যে খুব প্রীতিকর বোধ হইত তাহা নহে। সে বুঝিত যে তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে যে একটা শক্তির ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ লুকাইয়া আছে, সময় ও সুবিধা পাইলে হয়তো তাহা একদিন জ্বলিয়া উঠিতে পারে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত আসিয়াই তাহার চিন্তার সূত্রটী ছিঁড়িয়া যাইত, সময় এবং সুযোগ এই দুইটীর একটিকেও সে হাত বাড়াইয়া নাগাল পাইত না।

নরেন্দ্রের দিনগুলি যখন এইভাবে মরা গাঙের স্রোতের মত ধীরে ধীরে বহিতেছিল, তখন একটী ঘটনা ঘটিল।

মতিগঞ্জের অনতিদূরে কামারহাটী বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। সেখানে একখানি আটচালা ঘরের মটকার উপর দুইখানি কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে যীশুর ক্রুশ নির্ম্মাণ করিয়া একটী দেশীয় গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাহার পাদ্রি ছিলেন, রেভারেণ্ড যোশেফ নীলকণ্ঠ তালুকদার।

পাদ্রি সাহেব একটু হোমিওপ্যাথিও জানিতেন, সুতরাং বিনামূল্যে ঔষধ ও বিনাভিজিটে রোগীর বাড়ী গিয়া দেখিয়া, সুসমাচার, বাইবেলের ছবি প্রভৃতি বিতরণ করিয়া, চারিপার্শ্বের অনেকগুলি গ্রামের কৃষক-কুলকে তিনি নিজের বশে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং কয়েকটী গোপসন্তানকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া অল্পকাল মধ্যেই বেশ যশস্বী হইয়াছিলেন।

কেলু বাগ্দী নামধারী একটী ১৭।১৮ বৎসরের যুবক পাদ্রি সাহেবের বক্তৃতা ও গান শুনিয়া এবং বাঁধান বই পড়িয়া একেবারে গলিয়া গেল। সে তাহার মাছের বাজরা হইতে একটি নাতিবৃহৎ মৎস্য লইয়া নীলকণ্ঠের জুতার তলায় রাখিয়া, যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল।

পাদ্রি সাহেব মাছের দিকে তখন দৃক্‌পাত না করিয়া, এই ভক্তটীকে একেবার বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া ফেলিলেন এবং জানাইলেন যে প্রভুর আশীর্ব্বাদের জ্যোতি তাহার দেহের মধ্যে দেখা যাইতেছে। তাহাকে বলিলেন যে অপরাহ্নে সে যেন কামারহাটির গির্জ্জায় যাইয়া তাঁহার সহিত অতি অবশ্য সাক্ষাৎ করে।

৭

নরেন্দ্র স্নান শেষ করিয়া, সবেমাত্র পূজায় বসিয়াছিল, এমন সময়ে বৃদ্ধা ফেলুর মা তাহার উঠানে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।

পূজা ছাড়িয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, ফেলুর মা তাহার পা দুইখানি ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল যে, তাহার ফেলুকে পাদ্রি সাহেব যাদু করিয়াছে। আজ একটি পয়সার মাছ বিক্রয় করে নাই, এবং অপরাহ্নে কামারহাটির গির্জ্জায় যাইয়া খৃষ্টান হইবার জন্য সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দাদাঠাকুর রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। বৃদ্ধার সে একমাত্র পুত্র, সে যদি খৃষ্টান হয় তাহা হইলে বুড়ী হয় গলায় দড়ি দিয়া নয়তো নদীতে ঝাঁপ দিয়া মরিবে।

নরেন্দ্রের ধমনীতে রক্তস্রোত যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করিয়া, পুনরায় স্নান করিয়া কোনরূপে ঠাকুরপূজা শেষ করিয়া, অভুক্ত অবস্থাতেই সে কামারহাটি চলিয়া গেল।

পাদ্রি সাহেব গির্জ্জার আটচালায় বসিয়া নূতন ভক্তটীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এই ব্রাহ্মণযুবকটীকে দেখিয়া যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন। প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে বামুন ঠাকুরটী বুঝি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইতে আসিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভ্রম বুঝিলেন।

নরেন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, কোন ভূমিকা না করিয়াই বলিল, "পাদ্রিসাহেব, আপনি ফেলু বাগ্দীকে জোর করে খৃষ্টান করতে চাইছেন কেন?"

পাদ্রিসাহেব তাহার এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইয়া জানাইলেন যে, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করান তাঁহাদের নীতিবিরুদ্ধ, সুতরাং কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফেলু নিজেই এই সত্যধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে।

রাগের মাথায় অনেকগুলি কথা বলিয়া শেষে নরেন্দ্র বলিল—"তার বুড়ো মা বেঁচে রয়েছে। ছেলেটা যদি খৃষ্টান হয় তা হলে সে বুড়ীর দশাটা কি হবে একবার ভেবে দেখুন দিকিনি। ওদের জাতের মধ্যে কেউ তাকে মলেও ছোঁবে না।"

সাহেব বিরক্ত হইয়া জানাইলেন যে বুড়ীর কি হইবে ভাবিয়া তাহার ছেলেকে সত্যপথে আসিতে বাধা দেওয়ার ইচ্ছাও তাঁহার নাই, ক্ষমতাও নাই।

নরেন্দ্র বলিল, "কিন্তু আমার ইচ্ছাও আছে, ক্ষমতাও আছে। আমি কিছুতেই তাকে খৃষ্টান হতে দিব না।"—বলিয়া ভ্রুকুটি করিয়া, উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল।

পাদ্রি সাহেব সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে টাটুঘোড়ায় চড়িয়া মতিগঞ্জে মধুসূদন বসুর নিকট আসিয়া ব্যাপারটা আগাগোড়া বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মণিরাম একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল, "কি! এতবড় স্পর্দ্ধা! আপনাকে অপমান! বোলাও উস্কো।"

একজন বরকন্দাজ তখনি ছুটিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে নরেন ঠাকুর বলিয়াছে, সে এখন আসিতে পারিবে না। অন্য সময় দেখা করিবে।

মণিরাম ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পাদ্রি সাহেবও ইহার যথোচিত প্রতীকার করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া গির্জ্জায় ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার হেড-কোয়ার্টারে এক রিপোর্ট লিখিলেন যে সম্প্রতি একজন স্থানীয় যুবক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল,

কিন্তু মতিগঞ্জের এক দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মণ তাহাকে ধর্ম্ম-গ্রহণে বাধা দিয়াছে এবং পাদ্রি সাহেবকে তাঁহার ধর্ম্মমন্দিরে চড়াও হইয়া আসিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে।

রিপোর্ট পড়িয়া হেড কোয়াটার্স একবারে আগুন হইয়া উঠিল। কি! ইংরাজরাজ্যে রাজধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ! স্বেচ্ছায় একব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাকে কিনা বলপূর্ব্বক বাধা দেওয়া! শুধু তাই নয়, বাড়ী চড়াও হইয়া একজন নির্ব্বিরোধ ধর্ম্মযাজকের অপমান! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি?

মিশনারী তৎক্ষণাৎ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে পত্র লিখিলেন যে ধর্ম্মদ্রোহী এই পাষণ্ডের হাত হইতে খৃষ্ট-ধর্ম্মকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেটও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে পত্র লিখিলেন, ডেপুটীও পুলিসকে লিখিলেন। পাষণ্ড দলনের ভার পড়িল অবশেষে ফতাইপুরের থানার রাম-জয় দারোগার উপর। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া মতিগঞ্জে সরেজমিন তদন্তে আসিয়া জানিলেন যে সত্য সত্যই নরেন্দ্রনাথ বাড়ী চড়াও হইয়া পাদ্রিসাহেবকে অপমানের একশেষ করিয়াছে এবং তাঁহার অপমানে খৃষ্টধর্ম্মেরও অপমান করা হইয়াছে।

নরেন্দ্রনাথকে অচিরে গ্রেপ্তার করিয়া রামজয় দারোগা ফতাইপুর লইয়া গেলেন।

* * * *

বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া মধুসূদন বসুর হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবু এ যাত্রা ছেলেটাকে দয়া করে বাঁচান।"

বসু ইঙ্গিতে মণিরামকে দেখাইলেন। মণিরাম হরি-নামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ভগবানকে দেখাইল, একটি বাক্যও উচ্চারণ করিল না।

বৃদ্ধ চক্ষু মুছিতে মুছিতে মহকুমায় ছুটিলেন।

৮

সদাশিব সন্ধ্যার পর ঠাকুরের শীতল লইতে আসিয়া কল্যাণীকে বলিল—"শুনেছ দিদিঠাকরুণ?"

কথাটা বাহিরে খুব রাষ্ট্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর তখনও তাহা প্রবেশ করিতে পারে নাই। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

"আমাদের সেই পুরুত ঠাকুর মশায়ের কথা?"

কল্যাণীর মনের দ্বারে যেন একটা আঘাত পড়িল। বলিল, "কি কথা?"

নিজের কি একটা কার্য্যোপলক্ষে সদাশিব দুইদিন পূর্ব্বে মহকুমায় গিয়াছিল, সুতরাং বৃত্তান্তটা সে ভাল করিয়াই জানিয়া আসিয়াছে। ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিল—"সেদিন তাঁর মোকর্দ্দমার দিন ছিল কি না। আহা, দিদিঠাকরুণ, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর মুখখানি যা হয়ে গেছে তা যদি দেখতে! আমার দিকে তিনি চাইলেন, আমারও চোখে জল এল।"

কল্যাণী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর, মোকর্দ্দমাটির কি হল?"

"হাকিম তাকে পাঁচশো টাকা জরিমানা কর্চ্ছে। না দিতে পারলে ছ'মাস কয়েদ। তা, কে আর টাকা দেবে বল? তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে! আহা, আমার জমীজমাগুলো বিক্রী করলেও যদি পাঁচশো টাকা হ'ত দিদি ঠাকরুণ, তা হলে আমি সেই টাকা দিয়ে তাঁকে খালাস করে' নিয়ে আসতাম। অমন মানুষ আর হবে না।"

কল্যাণী কিছু বলিল না, কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন আপনা হইতেই বাহির হইয়া গেল।

মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে গোপালের মাকে বলিল—"গোপালের মা, সদর দেউড়ীর বেহারাদের বলে আয় তো, যে শেষ রাত্তিরে পাল্কী ঠিক করে, আমাকে ভোরের মধ্যে মহকুমায় নিতাই উকীলের বাড়ী পৌঁছে দেয়।"

গোপালের মা অনেক দিনের পুরোণো লোক,

কথাটা বলিতে সে একটু গোলমাল করিয়া ফেলিল, তাহার ফলে অনতিবিলম্বেই গোপীকান্তের কর্ণে উঠিল যে দিদি ঠাকুরাণী নিতাই উকীলের বাড়ী যাইবার জন্য শেষ রাত্রে পাল্কী ঠিক করিতে আদেশ দিয়াছেন।

গোপীকান্ত বুঝিল, কল্যাণীর পৈতৃক বিষয়ের উপর সে প্রভুত্ব করিতেছে বলিয়া কল্যাণী উকীলের পরামর্শ লইতে যাইতেছে। রাগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, বেহারাদের হুকুম দিল যে খবর্দ্দার যেন পাল্কীর বন্দোবস্ত না করা হয়।

ভোরবেলা অনেক ডাকাডাকি করিয়াও পাল্কী না পাইয়া, কল্যাণী অবশেষে তাহার কারণটা শুনিল। গোপীকান্তের নিকটে আসিয়া বলিল—"গুপী দা এসব কি হচ্ছে?"

গুপীদা বলিলেন—"কিসের?"

কল্যাণী বলিল—"তুমি আমার পাল্কী বন্ধ করলে কেন?"

গোপীকান্ত নিজের অনুমানটি প্রকাশ না করিয়া বলিল—"আমার খুসী।"

কল্যাণী বলিল—"তোমার খুসী! আমি কি তোমার খেলার ঘুঁটী যে তোমার খুসীর উপর আমার নির্ভর? আমি এখনই গরুর গাড়ী আনিয়ে নিচ্ছি।"

গোপীকান্ত বলিল, "যে শালা গাড়োয়ান দেউড়ীতে মাথা গলাবে, তার মাথা আমি দুফাঁক করবো।"

কল্যাণী তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিজের কক্ষে ফিরিয়া গিয়া, একজনকে দিয়া সাদাশিবকে ডাকাইল।

সদাশিব আসিলে কল্যাণী তাহার হাতে একতাড়া নোট ও একখানি পত্র দিয়া বলিল, "সদাশিব দাদা, ধর্ম্ম সাক্ষী করে এগুলি তোমার হাতে দিলাম। নিতাই কাকার কাছে গিয়ে আমার নাম করে এই চিঠিখানি দিয়ে বলো যে, এই পাঁচশো টাকা যেন আজই আদালতে দাখিল করে দেওয়া হয়।" শেষের কথাগুলি বলিবার সময় কল্যাণীর গলাটা যে ধরিয়া গিয়াছে তাহা বেশ বোঝা গেল।

সদাশিব অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে কল্যাণীর পায়ে হাত দিয়া বলিল, "দিদি ঠাকরুণ, তুমি মানুষ নও দেবতা। নিশ্চয়ই তুমি ঠাকুর মশায়ের আর জন্মের কেউ ছিলে।"

কল্যাণী বলিল—"ছিঃ ও কথা উচ্চারণ কত্তে নেই।"

৯

জেল হইতে মুক্ত হইয়া নরেন্দ্র একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এজগতে তাহার এমন হিতাকাঙ্ক্ষী কে আছে যে তাহার জরিমানার পাঁচশত টাকা দাখিল করিতে পারে, তাহা অনেক ভাবিয়াও সে ঠিক করিতে পারিল না। দাদামহাশয় মোকর্দ্দমার দিনে ঘটিবাটী বন্ধক দিয়া একজন মোক্তারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এত টাকা দেওয়া অসম্ভব।

জেলের অনতিদূরে দীঘির ঘাটে সে দেখিল, সেখানে সদাশিব বসিয়া। সদাশিব তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সদাশিব ভাল আছ?"

সদাশিব বলিল, "আজ্ঞে দেবতা।"

নরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কবে এসেছিলে এখানে?"

"আজ্ঞে কাল দুপুরবেলায়।"

"কোন কায ছিল বুঝি?"

সদাশিব বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, ছিল বৈ কি। আপনার জন্যে—"

নরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। বলিল—"আমার জন্যে—"

"আজ্ঞে জরিমানার টাকাটা—"

নরেন্দ্র ব্যগ্রভাবে বলিল—"তবে কি তুমি টাকা এনেছিলে? এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?"

সদাশিব বলিল—"আজ্ঞে আমি গরীব মানুষ, কোথায় পাব? দিদিঠাকরুণ—"

নরেন্দ্র আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। বলিল, "দিদিঠাকরুণ? কে—কল্যাণী?"

সদাশিব বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ তিনিই।"

ঘাটের বাঁধান চাতালের উপর নরেন্দ্র বসিয়া পড়িল। বলিল, "সদাশিব, আচ্ছা তিনি কি করে খবর পেলেন ?"

সদাশিব বলিল, "আজ্ঞে আমিই বলেছিলাম।"

"তার পর ?"

তার পর যাহা ঘটিয়াছিল সদাশিব তাহাকে বলিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নিকটে কোন লোকালয় ছিল না, কাযেই সন্ধ্যার পরে স্থানটি আরও নির্জ্জন বোধ হইতে লাগিল। দীঘির জলে চাঁদের প্রতিচ্ছায়া প্রত্যেক তরঙ্গের প্রতিঘাতে নাচিতে লাগিল।

সদাশিব বলিল—"ঠাকুরমশাই, তা হ'লে উঠতে আজ্ঞে হোক।"

নরেন্দ্র তখনও স্থিরভাবে বসিয়া। বাহ্যজগত তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার মনের সম্মুখে এক মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমা বৈধব্যের শুভ্র আবরণে জলস্থল সমস্ত আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে রাত্রি হইল।

সদাশিব আবার ডাকিল। নরেন্দ্র বলিল—"সদাশিব, কোথায় তুমি আছ ?"

সদাশিব বলিল—"নিতাই উকীলের বাড়ী। তাঁরই হাতে টাকা এনে দিয়েছিলাম ; তিনিই আদালতে সেটা দাখিল করলেন কি না!—আজ রাত্রে সেইখানেই চলুন, দেবতা। কাল তখন ভোরে উঠে দুজনে বাড়ী যাওয়া যাবে।"

নরেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, তুমি বরং এগিয়ে যাও। আমি হাতমুখ ধুয়ে একটু জিরিয়ে, যাচ্ছি।"

নিতাই উকীলের বাড়ী কোন পথে যাইতে হয় তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সদাশিব বলিল, "যে আজ্ঞে। আমি বাজারটা ঘুরে যাই, আপনার জন্যে ফলমূল যা পাই দুটো নিয়ে যাই। আহা মুখখানি আপনার শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে!" বলিয়া সদাশিব উঠিল।

নরেন্দ্র সেইখানেই বসিয়া রহিল। রাত্রি ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল। জেলের যে প্রহরী-দুইটা অনতিদূরে বসিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে ঢোলক বাজাইতেছিল, তাহাদের গীতের শব্দ থামিয়া গেল। বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে জেলর বাবুর গৃহ হইতে যে আলোকশিখা দেখা যাইতেছিল, তাহাও নিবিল। নরেন্দ্র তখন উঠিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, অন্ধকারের মধ্যেই মিশাইয়া গেল।

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

সাগর-সঙ্গীত

অসীম পথে ছুটে যে'তে ঐ কে আমায় ডাকে !
ওগো শূন্য, ওগো ঊর্দ্ধ,
ধরার কারায় আমি রুদ্ধ ;
পাতাল আমায় মাতাল করে' আঁকড়ে টেনে রাখে।
পথে পদে অশেষ বাধা,
প্রান্তে প্রান্তে মেরু বাঁধা.
তবু আমি আত্ম-হারা নিত্য তোমায় সাধি,
এস সখি—সোহাগ রাণি,
জড়িয়ে ধ'রে তোমায় টানি ;
তোমার লোভে প্রাণের ক্ষোভে আকুল হয়ে কাঁদি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অবতারবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব

মহাত্মা ডারউইন প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যুরোপে এক অভিনব মত প্রচার করিলেন। তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহাতে খৃষ্টীয় জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। তিনি স্পষ্ট প্রমাণ করিলেন যে জীবদেহ, সৃষ্টির আদিমকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যুগযুগান্তর ধরিয়া জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিলাভ করিয়া আসিতেছে।

এ তত্ত্ব নবসভ্যতালোকপ্রাপ্ত যুরোপে নূতন ও বিস্ময়কর হইতে পারে, কিন্তু ভারতে ইহা চলিত কথার অন্তর্গত।

হিন্দুমাত্রেই সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও জীবের পুনর্জ্জন্ম চিরকাল বিশ্বাস করেন। আর্য্যশাস্ত্রে অতি পুরাকাল হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সহ ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে এ পৃথিবী জলময় ছিল। ক্রমে মৃত্তিকা বাহির হইল। পরে সেই পরমাত্মার অংশ জীবদেহে প্রবেশ করিয়া অতিনিম্নস্তর হইতে যুগযুগান্ত ধরিয়া ৮৪ লক্ষ জন্মের পর মানবদেহে প্রবিষ্ট হইল। আমাদের শাস্ত্রে ইহাও বলে যে, এই মানব স্বীয় কর্ম্ম বলে আত্মোন্নতিলাভ করিতে করিতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ভবিষ্যতে পুনরায় সেই ব্রহ্মে লীন হইতে পারে।

অনন্ত বারিধির অল্প জল যেমন বাষ্পরূপে আকাশে উঠিয়া, মেঘরূপে নানাদেশের উপর বিচরণ করিয়া, বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া, নদীরূপে কখন বা শস্যশ্যামলা ভূমির উপর দিয়া কখন বা অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে জীবন সঞ্চার করিয়া, নানা দেশে ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই উৎপত্তিস্থান অনন্ত বারিধিতে মিশিয়া যায়, জীবকুল তেমনই সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেরই অনন্তরূপ মধ্যে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন করে। আমরা যেমন বিদেশ যাত্রার সময়ে বস্ত্রাদি গায়ে দিয়া বাহির হই এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সেই বসন পরিত্যাগ করি, বিশ্বস্রষ্টাও তেমনই আমাদের সংসার ভ্রমণের জন্ম প্রতি জন্মে নূতন নূতন দেহ দান করেন; অবশেষে যখন আমাদের ভ্রমণক্লান্ত আত্মা সেই 'আপন ঘরে' ফিরিয়া যায়, তখন দেহ ফেলিয়া দিয়া সে পরমাত্মার কোলে আশ্রয় লয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের আর্য্যশাস্ত্রকার মনীষীদিগের বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় এ পৃথিবী জলমগ্ন ছিল; ক্রমে মৃত্তিকা বিকাশ প্রাপ্ত হইল; পরে দেহবিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইল।

আমাদের অবতারবাদ এই মতের পোষকতা করে। কথিত আছে যে ভগবান যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম ও বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে কল্কীরূপ ধারণ করিবেন।

আমার বোধ যে আর্য্য ঋষিগণ সৃষ্টির ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাই রূপকচ্ছলে দশাবতারের কথায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাহার পর সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থায় দেখিতে পাই যে সেই দিগন্তবিস্তৃত অম্বুধি হইতে সলিলসিক্ত মৃত্তিকা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং জীব তখন মৎস্য হইতে কূর্ম্মরূপে উন্নীত হইয়াছে। সত্যসত্যই মৎস্যের পর কূর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল কি না একথা বলা যায় না। কূর্ম্ম অবতারের কথায় ইহাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, ক্রমবিকাশানুসারে আত্মা এরূপ একটী জীবদেহ ধারণ করিয়াছিল, যাহা কূর্ম্মেরই মত জলে ও কর্দ্দমে বাসোপযোগী ছিল। সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থায় তখনও চতুর্দ্দিক সলিলময়;—মৃত্তিকা কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা শুষ্ক না হইয়া কর্দ্দমরূপে থাকাই সম্ভব। সুতরাং তখন তাহাতে বাসোপযোগী এরূপ জীব সৃষ্ট হইল যাহা পূর্ব্বসংস্কারানুসারে জলেই বেশী থাকে এবং কর্দ্দমে মধ্যে মধ্যে উঠে।

আবার, বরাহ অবতারে দেখি যে শুষ্ক মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভূত হইয়া ধরণীরূপ ধারণ করিয়াছে; এবং পরমাত্মা বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অর্থাৎ জীব

তখন এরূপ দেহ ধারণ করিয়াছে যাহা ইচ্ছামত শুষ্কভূমিতে এবং কর্দ্দমে বিচরণ করিতে পারে। তখনও সে কর্দ্দমেই বেশী থাকিতে ভালবাসে, শুষ্কভূমিতে বাস করার অভ্যাস হয় নাই।

তাহার পর নৃসিংহ অবতার। অর্থাৎ জীব তখন পশুরূপ হইতে মানবরূপে উন্নীত হইতে চলিয়াছে, অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়াছে মাত্র। সিংহ পশুশ্রেষ্ঠ জীবের রূপক। পশুজীবনে শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়া অর্দ্ধমানবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সিংহ ও নর উভয়ই শুষ্ক মৃত্তিকায় ভ্রমণের উপযোগী, কর্দ্দমে বা জলে যাওয়া তখন প্রয়োজন-সাপেক্ষ। নরসিংহমূর্ত্তি, সৃষ্টির এই চতুর্থ অবস্থার ও তাৎকালীন সৃষ্টজীবের রূপকমাত্র।

তৎপরে বামন অবতার। অর্থাৎ জীব তখন মানব দেহ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তখনও দেহ সম্পূর্ণতালাভ করে নাই। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি তখনও শিশুর মত কোমল ও ক্ষুদ্র। তখন সে ইচ্ছামত স্থলে ও জলে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে। "নীর-জনিত-জন-পাবন-পদনখ" লইয়া স্বেচ্ছায় স্রোতস্বিনী উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ে সলিলে কমলদল বিকাশের উপাখ্যান, বোধ হয় জীবের এই বিচরণ শক্তির যথার্থতা প্রতিপাদন করে। সৃষ্টির এই পঞ্চম অবস্থায় জীব শিশুদেহধারী। তখনও তাহাতে বালসুলভ ছলনা, চপলতা ও নির্ব্বিকারভাব। তখন তাহার—

"শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ।
মুখে মাখা সরলতা, কয় না সাজানো কথা,
জানে না যোগাতে মন করি নানা ভাণ।
প্রাণ খোলা মন খোলা, আপনি আপনা ভোলা,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান্।"

বোধ হয় Adam ও Eve এই সময়ের জীব।

পরশুরাম অবতারের বর্ণনায় এই বুঝিতে পারি যে, জীবসৃষ্টির ষষ্ঠ অবস্থায় জীব বামন হইতে মানবে উন্নীত হইয়াছিল। জীবদেহ তখন সম্পূর্ণতালাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি, আচার, ব্যবহার ও মনের গতি পাশবিক ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। 'ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে' জগৎ প্লাবিতকারী সংহার মূর্ত্তি ও কিরাতভাব বনবাসী আদি মানবের তুল্য। তখনও যেন সমাজ বলিয়া কিছু মানবের ধারণায় আসে নাই। তখন Individualism ছিল, Socialism ছিল না। স্বজাতিকে বারবার ধ্বংস করিতে, এমন কি অবস্থা বিশেষে মাতাকে হত্যা করিতেও পরাঙ্মুখ ছিল না। মানবের ইতিহাস জীবের এ অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করে।

সপ্তম অবতার রাম। জীব তখন উন্নত হইয়াছে, সমাজ গঠিত হইয়াছে; রাজা, প্রজা, নীতি, কৌশল, জ্ঞান প্রভৃতি মানবকে আদর্শপথে লইয়া চলিয়াছে। মনের উন্নতি, বিবেকবুদ্ধি ও জ্ঞান এই তিনটী যে মানবকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করে, ইহাই এই নবম অবস্থায় দর্শিত হইয়াছে। রামের চরিত্র বর্ণনায় আমরা এক আদর্শ মানবের জীবনী স্পষ্ট দেখিতে পাই। মানব তখন সম্পূর্ণতালাভ করিতে চলিয়াছে। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখ হইতেছে। কিন্তু রাম স্বীয় দেবত্ব সম্বন্ধে তখনও সন্দিহান, তখনও মায়াবদ্ধ জীবের মত স্ত্রীর জন্য ক্রন্দন করিতেছেন। অর্থাৎ জীব তখনও ব্রহ্মের সহিত আত্মসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কখনও বা মনে হইতেছে—'না, না, তা' নয়, আমাতে ও তাঁহাতে একটা দেহের ব্যবধান আছে। আমার দেহ মধ্যস্থ আত্মা সেই পরমাত্মার অংশমাত্র, সম্পূর্ণ নহে।'

অষ্টম অবতার বলরাম,—পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা; ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ অত্যুন্নত যোগিপুরুষ। সৃষ্টির এই অষ্টম অবস্থায় দেখিতে পাই যে, জীব আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ ব্রহ্মের সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছে।

সাধক যখন এইভাব প্রাপ্ত হন, ভগবানে ডুবিয়া যান, চারিদিকে তাঁহাকে ভিন্ন দেখিতে পান না, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

মানব তখন জীবন্মুক্ত পুরুষ; দেহমধ্যে পূর্ণব্রহ্ম মাত্র। স্কন্ধে লাঙ্গলযুক্ত বলরাম-মূর্ত্তি কর্ম্মবীরের পরি-

চায়ক। অর্থাৎ রূপকচ্ছলে ইহাই দেখানো হইয়াছে যে, মানব তখন শিখিয়াছিল, স্বীয় কর্ম্মবলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া এ ভব সংসারে আপন দিন কিনিয়া লইয়া অন্তিমে সেই অনন্তের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন দিতে। তাই বুঝি বলরাম অন্তিম সময়ে অসীম অনন্ত মহাসিন্ধুর বেলাভূমিতে যোগে সমাধিলাভ করিলেন, এবং তাঁহার আত্মা অনন্ত নাগরূপে বাহির হইয়া অনন্তসাগরে মিলাইল। অনন্তের অনন্ত আত্মা অনন্ত আত্মায় বিলীন হইল।

আর্য্য মাত্রেই এইরূপ মহানির্ব্বাণ কামনা করেন, ইহাই মানবের আদর্শ দেহত্যাগ।

নবম অবতার বুদ্ধদেব। এই যুগে জীবের হৃদয়ের যাহা কিছু সঙ্কীর্ণতা ছিল তাহাও দূর হইল। প্রেম এখন আর সীমাবদ্ধ রহিতে চাহিল না, সে এখন অসীম পথে অগ্রসর হইয়া জীবমাত্রকে কোলে তুলিয়া 'আমার' বলিয়া আদর করিতে লাগিল। এতদিন জীবের উদ্দেশ্য ছিল আত্মজ্ঞানলাভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অনন্তে আত্ম-বিসর্জ্জন। এখন সেটাও রহিল, উপরন্তু আর একটু অগ্রসর হইল। সে এখন শিখিল, অপর জীবের উদ্ধারের জন্য আত্মবলিদান দিতে।

তাই বুদ্ধদেব রাজা বিম্বিসারের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন—

"বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে, মানব যেমতি !
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়,
বেদনা জানাতে নারে !
বধি তারে ধর্ম্ম উপর্জ্জিন,
না হয় কখন—
বিচক্ষণ বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।"

* * *

জীবের প্রাণ যখন এত উদার, এত উন্নত, এত বিশ্বপ্রেমিক ও ব্রহ্মের সন্নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সে ভগবানের নিরাকার মূর্ত্তি বা বিরাটরূপ কল্পনা করিতে পারে। তখন তাহার আর যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, সাকার মূর্ত্তি পূজা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। তাই দেখিতে পাই যে বুদ্ধদেব এই সকলকে তত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন না।

এইখানেই সৃষ্টির আদর্শযুগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এমন নহে। জীব কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করিয়া, বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবমাত্রের উন্নতির জন্য আত্মত্যাগ করিয়া অবশেষে মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, ইহাই বর্ত্তমান কালের জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এমন নহে।

এখনও ভবিষ্যৎ সম্মুখে। জীবের কার্য্য ও উন্নতি শেষ হইতে এখনও বাকি আছে। ঋষিগণ সেই জানিয়া কল্কী অবতারের অভ্যুদয় কল্পনা করিয়া-গিয়াছেন। যে মহাপুরুষ সংসার হইতে পাপ, হিংসা, জ্বালা, দ্বেষ সমস্ত বিদূরিত করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতঃ সংসারের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বজীবমধ্যে সুখশান্তি দান করিতে পারিবেন, তিনিই সৃষ্ট জীবকুল মধ্যে আদর্শপুরুষ। এইখানেই সৃষ্টির পূর্ণতা, এইখানেই জীবের পরিতৃপ্তি। জ্ঞানী মাত্রেই এই ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নে আস্থা রাখেন এবং জীবের এই আদর্শত্বলাভে বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের ফলে সাহিত্যে Utopiaর সৃষ্টি, মানব সমাজে Theosophical Society এবং Masonic Lodge-এর অভ্যুদয়। সকলেই একবাক্যে বলিতেছে.—"ধর্ম্মদ্বন্দ্ব আর ভাল লাগে না। কারণ—

ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্যস্থান।
যে যেমনে পারে, তেমনেই তাঁমারে
হোক সেথা আগুয়ান।"

এই ভাবে দশ অবস্থার ভিতর দিয়া জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হইতেছে।

বহুপূর্ব্বকাল হইতে এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমে মানবের বর্ত্তমান অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানেও সেই একই নিয়মে সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ চলিতেছে। এই মুহূর্ত্তে কত জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগর মধ্যে প্রেরিত হইল। তাহাদের প্রথম অবস্থা আজ আরম্ভ হইল। হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে, যুগযুগান্ত পরে সেই জীবই দশ অবস্থার ভিতর দিয়া বিচরণ করিতে করিতে, মানবরূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কেহ বা আবার বলরাম ও বুদ্ধদেবের মত আদর্শ পুরুষরূপে ধরা উজ্জ্বল করিবে। তাহাদেরই মধ্যে যে কেহ কল্কীরূপে ধরাধামের সমস্ত পাপ মোচন করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে ?

এই একই কথা Darwin সাহেব সে দিন বুঝিয়াছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নূতনভাবে নূতন প্রমাণে ইহা লোককে বলিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জাহ্নবীতটে যে মহাবাণী স্পষ্টতঃ এবং রূপকচ্ছলে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহারই প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সভ্যজগৎ বিস্ময়ে ও হর্ষে আত্মহারা হইতেছে।

শ্রীঅভয়চরণ লাহিড়ী।

অতীতের স্বপ্ন

(একটি ইংরাজী কবিতার ভাবানুবাদ)

কত না গভীর নিশায়, যখন
　　শয্যার ক্রোড়ে সুপ্তিমগন আঁখি ;
অতীতের শত রঙীন স্বপন—
　　সুখের আলোকে বুকখানি দেয় ঢাকি।
　　　　মধুর দিনের কথা—
　　　　মধুময় মধুরতা,
সেই ধুলাখেলা, মন ভাঙ্গা গড়া, হাসিকান্নার দোল ;
　　　　প্রিয়ের সে প্রিয়মুখ—
　　　　ফেনিলোচ্ছল সুখ,
স্মৃতি হয়ে মোর হৃদয়ের পুরে তুলিতেছে কল্লোল।
কতনা গভীর নিশায়, যখন
　　শয্যার ক্রোড়ে সুপ্তিমগন আঁখি ;
অতীতের শত রঙীন স্বপন—
　　সুখের আলোকে বুকখানি দেয় ঢাকি।

বন্ধু যাহারা ছিল এ ধরায়
　　জ্যোৎস্নার মত আমার গগনে ফুট ;—
তুহিন-আহত পত্রের মত হায়
　　একে একে তারা ভূমিতে পড়েছে লুট।
　　　　বহিতে নিয়তি লেখা,
　　　　আজি আমি শুধু একা—
উৎসবগত কক্ষের মত আগি ম্রিয়মান সাজে ;
　　　　নাই সে আলোক মালা,
　　　　আমোদ সিরাজী ঢালা,
সবে গেছে চলি কক্ষ একাকী রহিল আঁধার মাঝে।
এখনি গভীর নিশায় যখন
　　শয্যার ক্রোড়ে সুপ্তিমগন আঁখি ;
অতীতের শত রঙীন স্বপন—
　　সুখের আলোকে বুকখানি দেয় ঢাকি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

কামিনী-কুন্তল

(লেখক কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত)

নবীনাগণের চুল বাঁধিবার বৈকালি বৈঠকে কোনও ঠান্‌দিদিকেই আজকাল বলিতে শুনা যায় না—

পদ্মফুলে ভোমরা ভোলে,
ওলো, খোঁপায় ভোলে বর,
নাতনি লো, তোর খোঁপা দেখে
হবে, সতীন জরজর।

কারণ সাবেক বাঙ্গলার সে সত্যযুগ আর নাই। কবি ভারতচন্দ্রও বেণীর মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

"বিননিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥"

ভারতচন্দ্র যে বেণীর বর্ণনা করিয়াছেন, সে বাঙ্গলা দেশের মেয়ের বেণী। এ-হেন প্রতাপশালী বেণী যাঁহাদের কেশে হয়, তাঁহাদের কেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

বঙ্গ-মহিলাগণের কেশের কথা কহিবার পূর্ব্বে আমরা অতি প্রাচীনকালের—প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের ভারত-ভামিনীর কেশ-প্রসাধনের একটা নমুনা দিলাম। আজকাল সকল বিষয়েই পুরাতনের দিকে একটা আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। নব্যাগণ যদি এই প্রাচীন ফ্যাশনটি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে বাঙ্গলায় একটা নূতন জিনিষ দেখা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী হিন্দু ও মোগল যুগে এবং ইংরাজাধিকারের প্রথম অবস্থায় কি প্রকার কেশ-প্রসাধন-রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও তাম্রশাসন বা শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত না হওয়ায়, আমরা মাত্র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করিলাম।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার মেয়েরা পেটো পাড়া চুলে ও কস্তাপেড়ে শাড়ীতে ঘর আলো করিতেন। তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাই—

"হাতের শাঁখা ধব্‌ধবে বেশ,
ঝুমকো ঢেঁড়ী দুল্ দুলে
সিঁথেয় সিঁদুর, কাজল চোখে,
খয়ের গোলা টিপ জ্বলে।"

কিন্তু এই কাজল-চোখে ও ঝুমকোঢেঁড়ী-দোলান মেয়েদের "ওঁরা" যখন পেটোপাড়া চুলে আর ভুলিতে চাহিলেন না, তখন কস্তাপাড় শাড়ী পরা সীমন্তিনীরা প্রথমে "হাফ্" শেষে "ফুল আলবার্ট" ফ্যাশনে দেখা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রালঙ্কারের ফ্যাশনও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল।

এই "আলবার্ট ফ্যাশন" প্রিন্স আলবার্টের টেরীর নমুনায় ইঁহারা নিজের মাথায় চালাইয়াছিলেন। আমার এক বন্ধু প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে, এই যুগের নারীগণ বীর-নারী। তাঁহাদের অঙ্গে সেই সময়কার গহনা রতনচূড় ইত্যাদি দেখিলে এইসব বঙ্গবালাকে বর্ম্মাবৃতা বীরাঙ্গনা ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। সে কথা এখন থাক, কেশের কথা বলি।

"আলবার্ট" বহুদিন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ইঁহাদের সীমন্তে রাজত্ব করিয়া যখন নামিলেন, তখন "নেপোলিয়ন" আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। কিন্তু "আলবার্ট" একেবারে মায়া কাটাইতে পারেন নাই—কচিৎ কাহারও শিরে আজিও চাপিয়া বসেন। যাহা হউক "নেপোলিয়নের" রাজত্বই এখন চলিতেছে। কেন যে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী সম্রাটের নামে এই ফ্যাশনের নামকরণ হইল তাহা বলা কঠিন—রমণীরাই ইহা জানেন।

আমরা ইঁহাদের এই নেপোলিয়ন-পক্ষপাতিত্ব হইতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—বঙ্গললনাগণ কুসুমকোমলা হইলেও বীরত্বের আদর করিতে জানেন; কারণ—

"বীর বিনা আহা রমণী রতন,
কারে আর শোভা পায় রে !"

এই কবিবাক্যের সার্থকতা এই স্থানেই পরিস্ফুট।

নেপোলিয়নকে ভাঙ্গিয়া ইহাঁরা আর একটা জিনিষ গড়িয়াছেন, তাহার নাম "পাতা।" পাতাকাটা কিরূপে উদ্ভূত হইল ? বাঙ্গলার কোথাও কোথাও ইহাকে "আল্তাপাতা" বলে। কেহ কেহ বলেন, এক প্রকার অালুর পাতার ঢেউ-খেলান ধার দেখিয়া প্রমদাগণ তাহা হইতেই "পাতার" সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইহা চীনে পুতুলের মাথার অনুকরণ মাত্র, কারণ আমাদের মনোমোহিনীগণও পুত্তলিকা-বিশেষ। কবির কথায় বলিতে গেলে—"ননীর পুতলি।"

"পাতা কাটা" এখন কিছু কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে 'দশী' হইতে 'পঁচিশী' এবং এবং তদূর্দ্ধ বয়সের নারীগণের শিরেও পাতা শোভিত থাকিত—কপালটি প্রায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। এ প্রকোপ আর কিছুদিন থাকিলে পরিণতিটা কিরূপ হইত তাহা চিত্রেই প্রকাশ্য। মন্দ কি ? ঘোমটার প্রয়োজন হইত না,—এক কাযেই দুই কায চলিত। সীমন্তিনীগণ বলেন, পাঁচ থাক পাতা কাটায় সব চাইতে বেশী বাহাদুরী। এক থাকেই রক্ষা নাই, আবার পাঁচ থাক্ ! কোনও কোনও ফ্যাশ্‌নেব্‌ল্ ভামিনী আড়াপাতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ ফ্যাশনের সবই বাঁকা —কাপড় পরিবার ধরণটি পর্য্যন্ত।

মার্জ্জিতরুচি নব্যাগণের "হাল ফ্যাশন", অন্তঃপুররুদ্ধা অবলাগণের "পাতা" বা "নেপোলিয়ন" হইতে স্বতন্ত্র। বাঁকা সীঁথি, সযত্নকৃত আলুথালু চুলে একটা এলো খোঁপা, চোখে ফেয়ারি 'পাঁসনে' (pince nez) চশমা এবং কদাচিৎ মুখে একটি আঙুল—এই হাল ফ্যাশনের অঙ্গ। ইহাঁরা সিঁথেয় সিঁদুরের পক্ষপাতী নহেন, যেহেতু,

"সিঁথেয় সিঁদুর দিলে পরে
Husband আমার রেগে মরে

এবং

পাছে মাথায় টাক ধরে
তাইতে সিঁদুর পরি না।"

তবে কেহ কেহ সিঁথিতে সিঁদুরের পরিবর্ত্তে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরেন।

সীমন্তিনীগণের সম্মুখের কেশ ছাড়িয়া এবার খোঁপা ধরি। সাবেক বাঙ্গলার কয়েকটা খোঁপার নাম শুনুন—

পাণ, টালি, 'স্বামী' ভুলান, চ্যাটাই, চ্যাটাদর্ম্মা, চ্যাটা-পাটি, গোলাপতোড়া, অমৃতীপাক, লোটন, ল্যাজ বিনুনি, খেজুরছড়ি, বি-এ পাশ, হেঁটোভাঙ্গা, আতা, আঁটাসাঁটা, ডায়মনকাটা, ফুলঝাঁপা, এলোকেশী, বিনোদবেণী, ঝাপটা, ঝুঁট, বিছে, পৈচেফাঁস, জোড় কল্কা, বেহারী ফাঁসী, ধামা, মাতঙ্গিনী, কলকেফুল, লাটিম, প্রজাপতি, সইয়ের বাগান, উকীলের কাণে কলম, বাবুর বাগানের ফটক খোলা, ইত্যাদি।

শুনা যায় সেকালে উলা, গুপ্তিপাড়া ও শান্তিপুর খোঁপার জন্য বিখ্যাত ছিল। কেহ কেহ বলেন, বাঘ্‌না-পাড়ার মেয়েরাই সব চাইতে ভাল খোঁপা বাঁধিতে পারিতেন যথা—

"উলার মেয়ের কলকলানি,
শান্তিপুরের চোপা,
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া, আর
বাঘনাপাড়ার খোঁপা॥"

আমাদের এই খোঁপা-তথ্য কতদূর ঠিক, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ রিসার্চ স্কলারগণ তাহার বিচার করিবেন। এসব কথা প্রবীণাদের নিকট হইতে আমরা যেমন শুনিয়াছি তেমনই লিখিতেছি। এই সমস্ত খোঁপাই বাঁধিতে পারেন, এমন কতকগুলি নারী এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সেকালে ঐরূপ কতশত খোঁপা যে প্রচলিত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রবীণাগণ কাহারও খোঁপা বাঁধিতে বসিয়া বলিতেন—

"এমন খোঁপা বেঁধে দিব
লক্ষ টাকা মূল।"

হাজার
বছর
আগের
খোঁপা
ও
ফ্যাশন
অজন্তা চিত্র হইতে)

৫০ বছর পূর্ব্বে পেটো পাড়া চুল

বিদ্যার "বেণী"
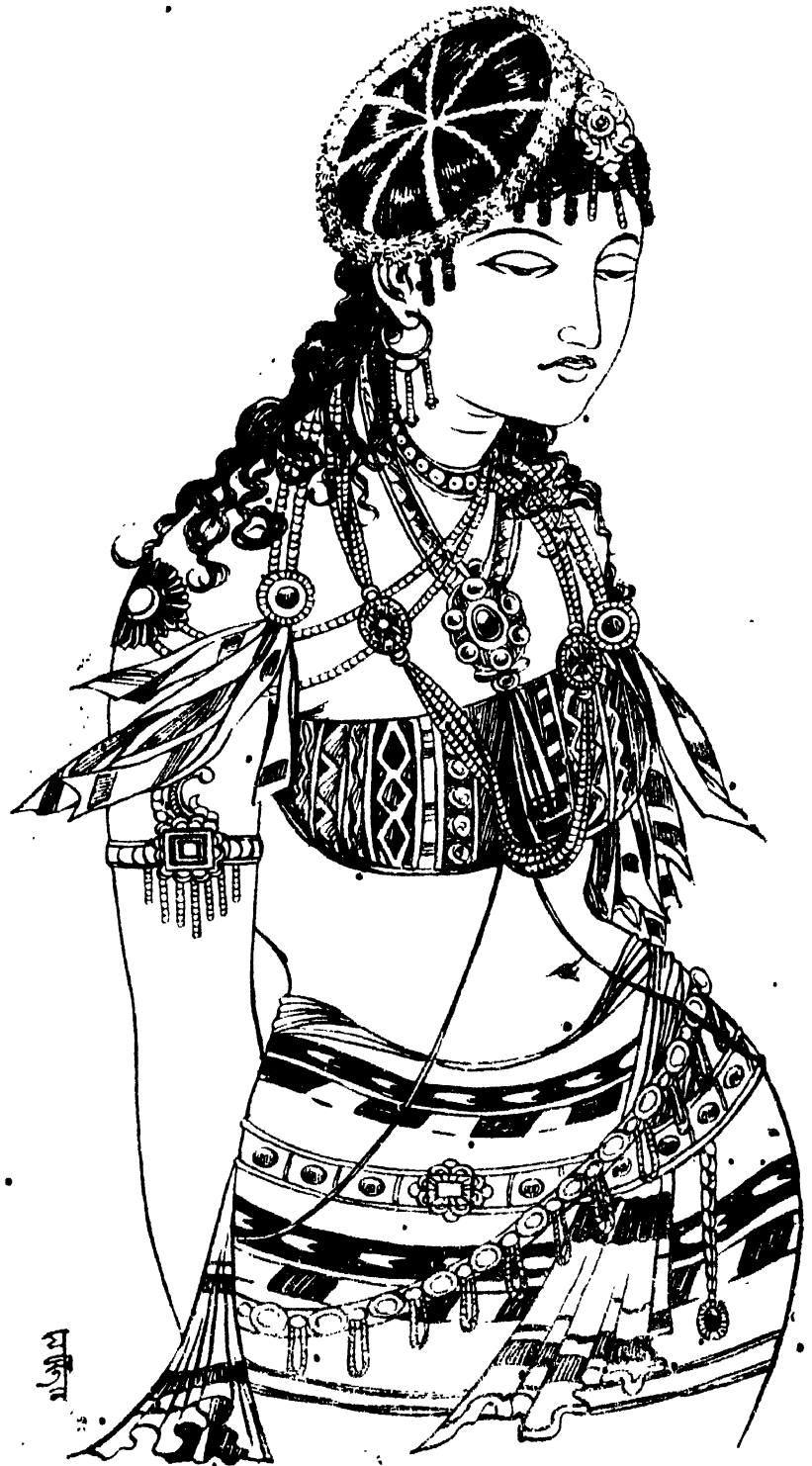
"বিননিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥

ভারতচন্দ্র।

পরের যুগ—আলবার্ট ফ্যাশন চুল

(হাফ্ আলবার্ট)
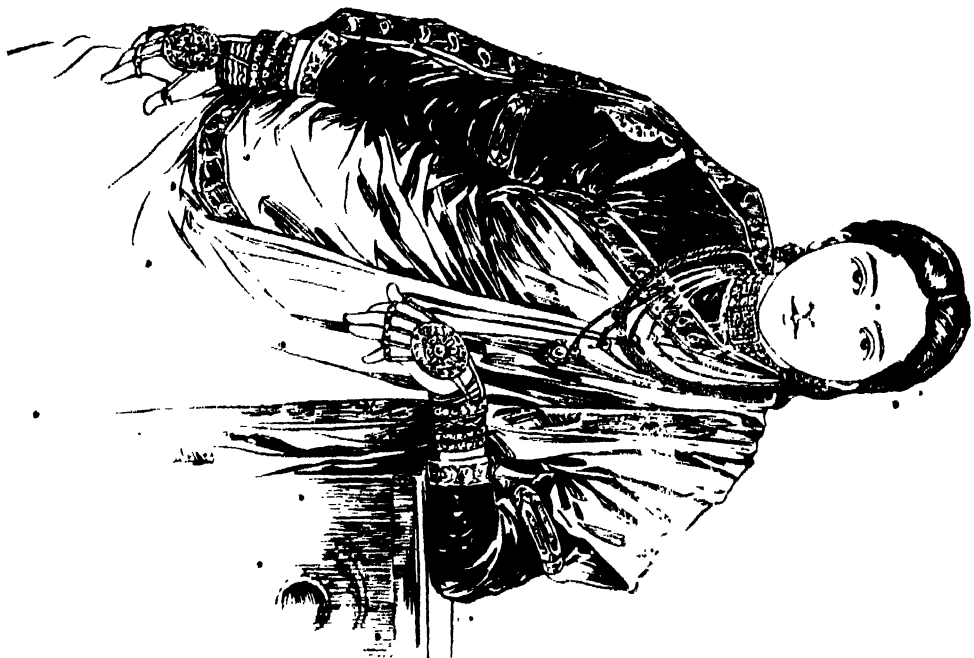
ফুল আলবার্ট

নেপোলিয়ন ফ্যাশন চুল

পাতার আরম্ভ

ফুল পাতা
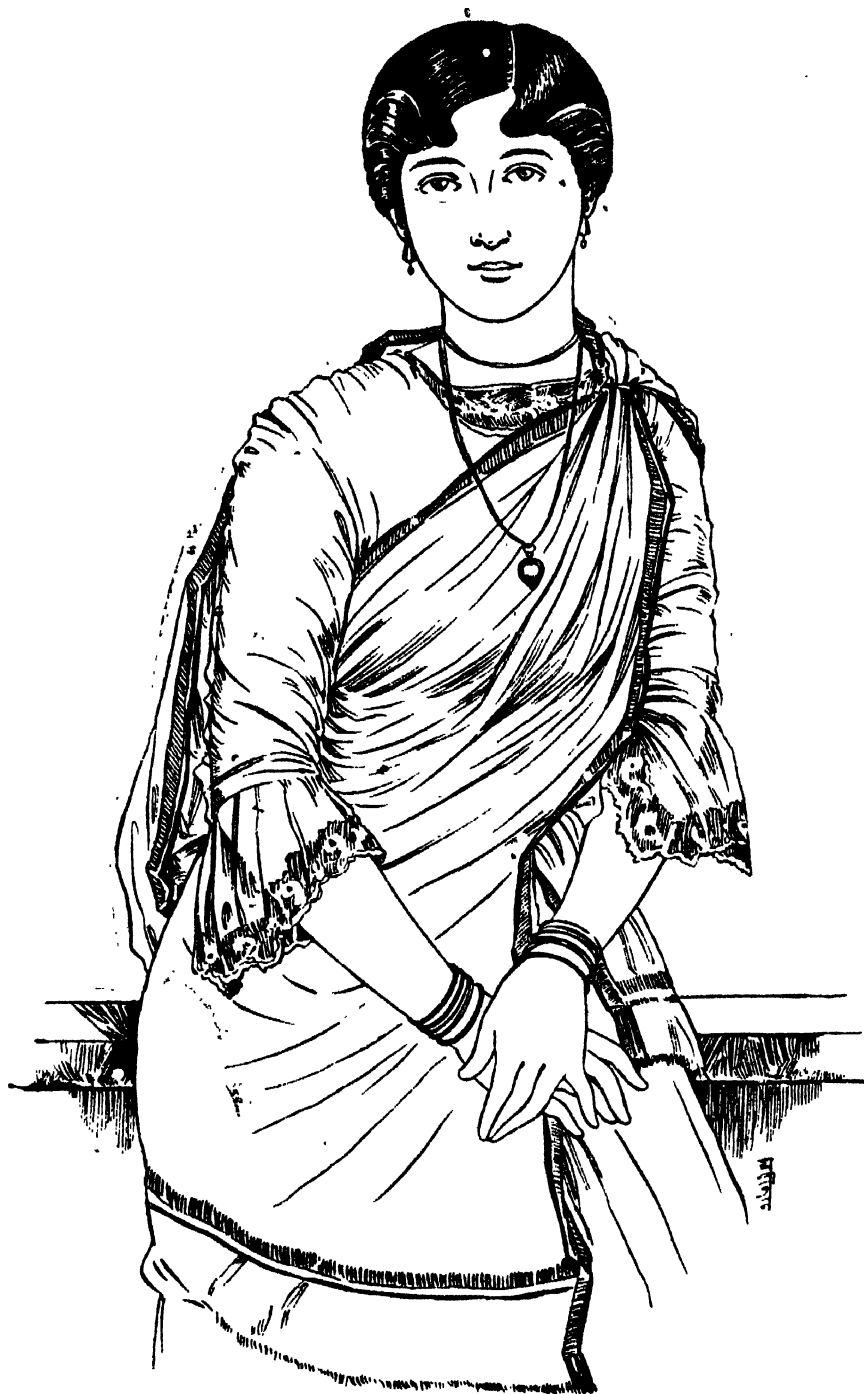
পাতায় কপাল চাপা

পাতার পরিণতি

ফ্যাশনেব্‌ল্ আড়পাতা

বাঁকা সিঁথি ও হাল ফ্যাশন
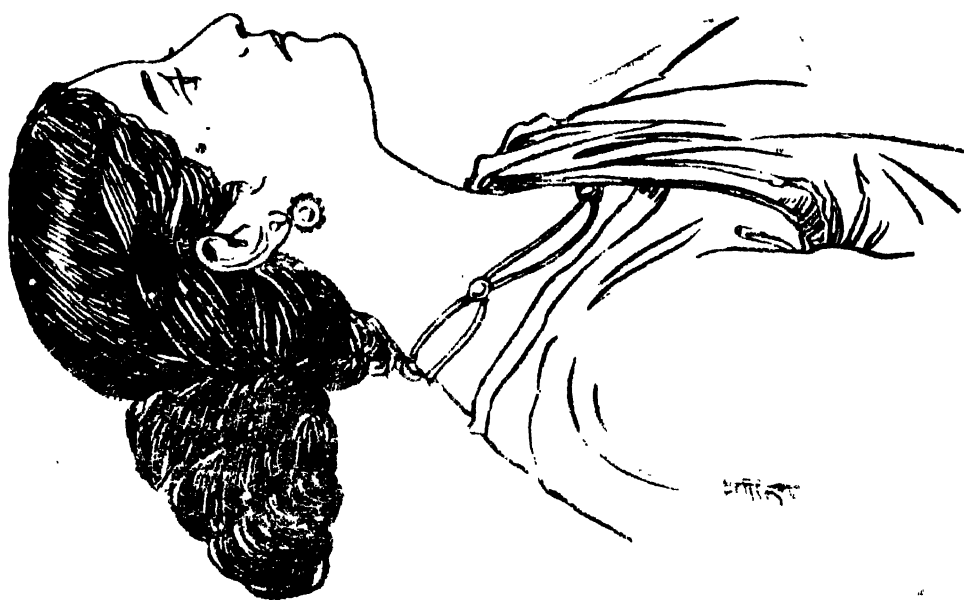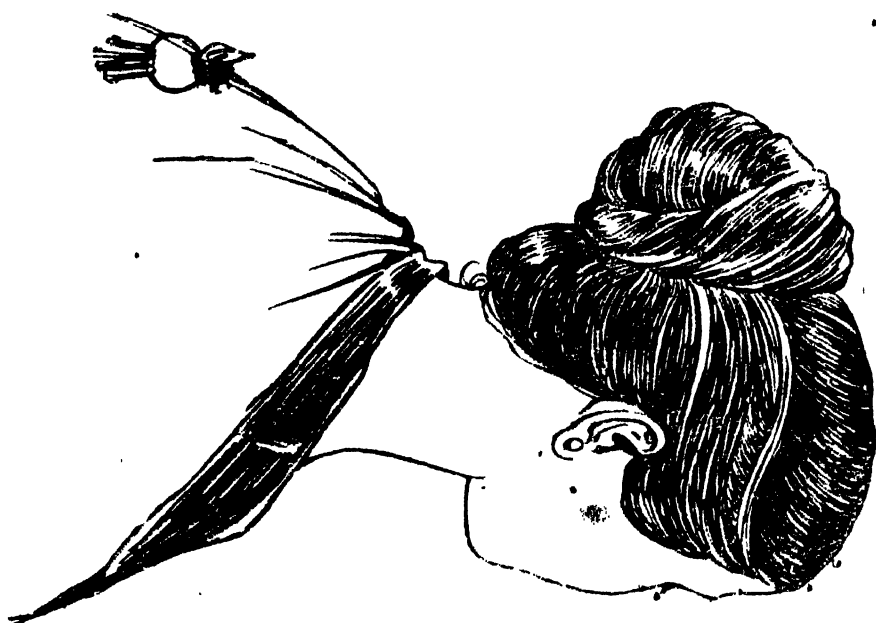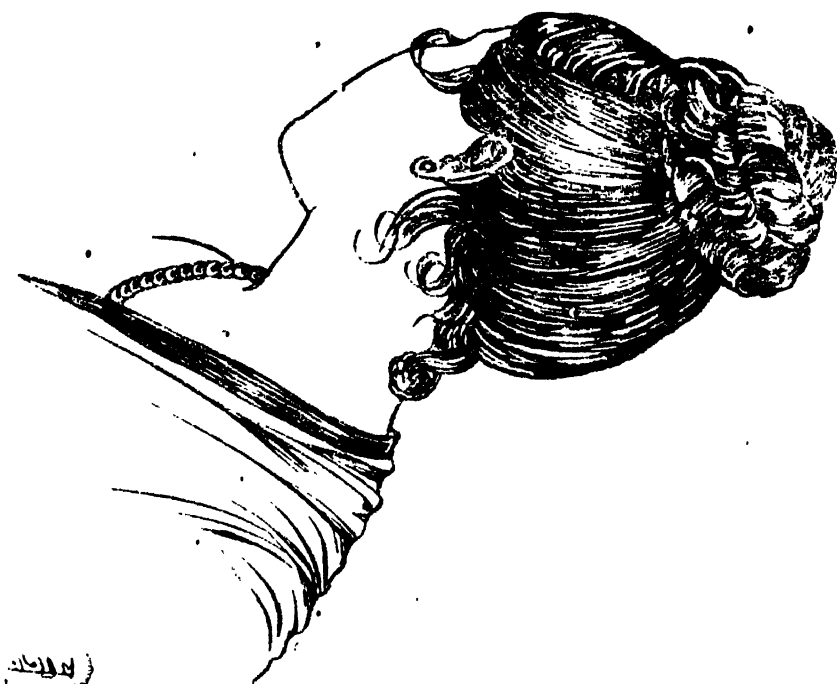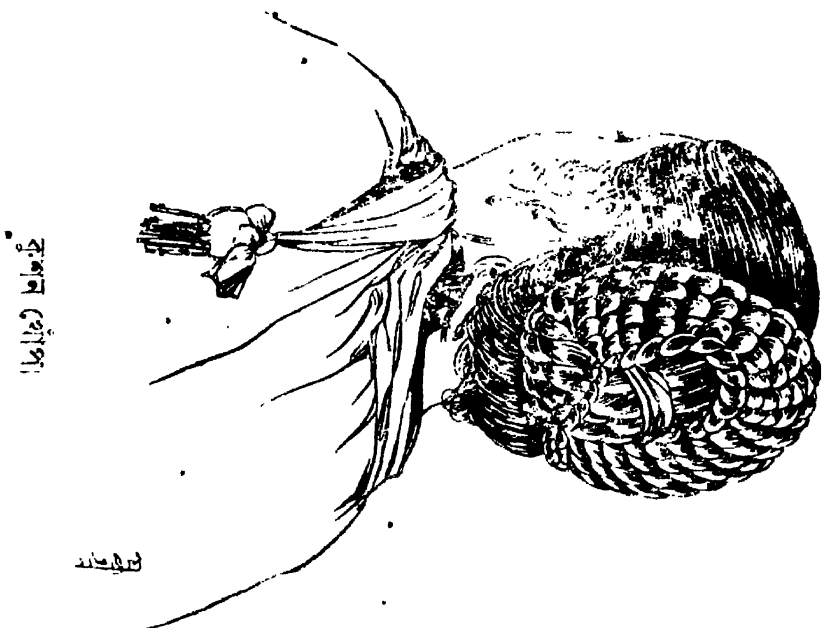
বিঁড়ে খোঁপা

খোত্রা খোঁপা

বেণে খোঁপা

গোঁজ খোঁপা

বৈষ্ণব চুড়

ব্রহ্মচূড়

ভৈরবী খোঁপা

খেয়াল খোঁপা

ফিরিঙ্গি খোঁপা

বিবি-গোঁজ খোঁপা

সোহাগী খোঁপা

গোলকধাঁধা

কুশন খোঁপা

দোলন খোঁপা

টায়রা খোঁপা

এয়ারোপ্লেন খোঁপা

জাক্ জনসন্ (তোপ) খোঁপা

চুলের ওড়না

সেঞ্চুরি প্রাইমার

বিজ্ঞান রীডার

ম্যাট্রিকুলেশন বেণী

বি-এ ফেল

পোষ্ট গ্রাজুয়েট্

প্রেমচাদ রায়চাদ

নাবেল্ প্রাইজ
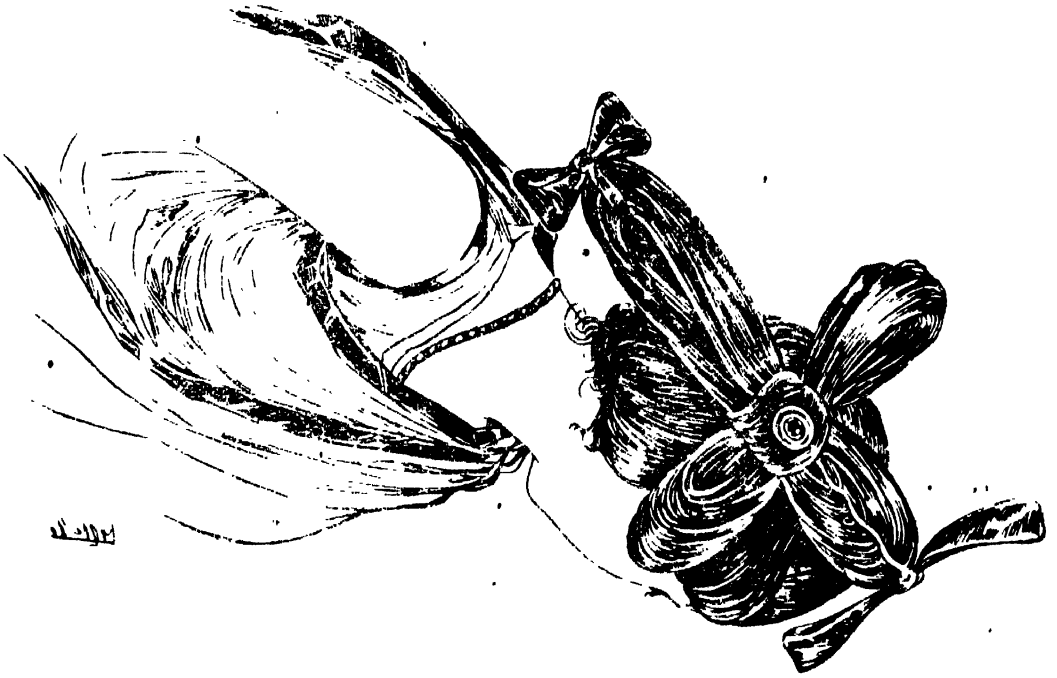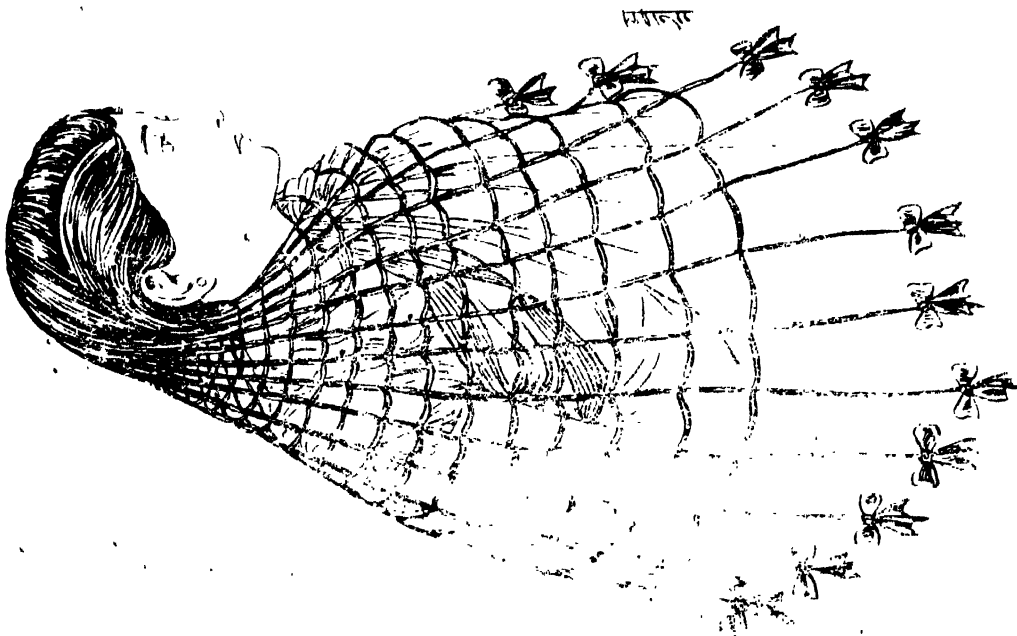
উপন্যাসের নায়িকা
(আগুল্ফ-লম্বিত কেশ)

বাধিয়া গেলে নূতনত্ব ত হইবেই, অধিকন্তু দশজনের উপকার করা হইবে। কারণ এই খোঁপার প্রধান অঙ্গ একটি পেন্‌ডান্ট ঘড়ী সীমন্তে থাকায়, অনেকের সময় দেখিবার সুবিধা হইবে এবং টায়রাধারিণীও জিজ্ঞাসা করিয়া ক'টা বাজিয়াছে জানিতে পারিবেন।

এয়ারোপ্লেন—বিগত মহাযুদ্ধকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এয়ারোপ্লেন খোঁপার আবিষ্কার। সেকালে এই ধরণের "একটা প্রজাপতি" খোঁপা ছিল। একালে তাহা এয়ারোপ্লেনে রূপান্তরিত হইয়া সীমন্তিনী-শিরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হয় তাঁহারা ডি এল রায়ের উর্ব্বশীর ন্যায় প্যাখম নাড়িয়া উড়িয়া না যান!

জ্যাক জনসন—কাহারও কাহারও মাথায় জ্যাক্ জনসন দেখা দিতেছে। এইবারেই চক্ষুস্থির। একে ত নয়নবাণের খোঁচায় আমরা আধমরা, তাহার পর যদি মাথায় জ্যাক জনসন বসাইয়া তোপ দাগিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই ত সশরীরে স্বর্গলাভের ব্যবস্থা।

থিয়েটারের বিরহিণী

ওড়না—কোন কোনও লাবণ্যময়ী ললনা প্রচলিত ওড়না ছাড়িয়া নিজ কেশেরই ওড়না বিনাইতেছেন। ইহাঁরা মূর্ত্তিমতী স্বদেশী। অর্থের বহুমুখী অপব্যয়ের একটা পথ অন্ততঃ বন্ধ করিতেছেন। ভগবান এইসব প্রমদাগণের সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় করুন।

কম্ফর্টার—অতি উপকারী খোপা। শীতে কম্ফর্টারের কাযও করে, আর কথায় কথায় উদ্বন্ধনের ভয় দেখাইয়া স্বামীকে শাসনে রাখাও চলে।

এইবার মার্জ্জিত রুচি নব্যাগণের ফ্যাশনটা বলি। মনসা পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়া পাতাড়ী বগলে মেয়েদের আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার পরিবর্ত্তে দেখা যায়,—মাথায় কিম্বা চুলের বাঁ-দিকে ফিতা-বাঁধা, বেণী-দোলান অথবা খোঁপা-বাঁধা, "বাসে" চড়া মেয়েগুলিকে। এই এডুকেশ্যানাল ফ্যাশনগুলির এইরূপ নাম দেওয়া যাইতে পারে,—
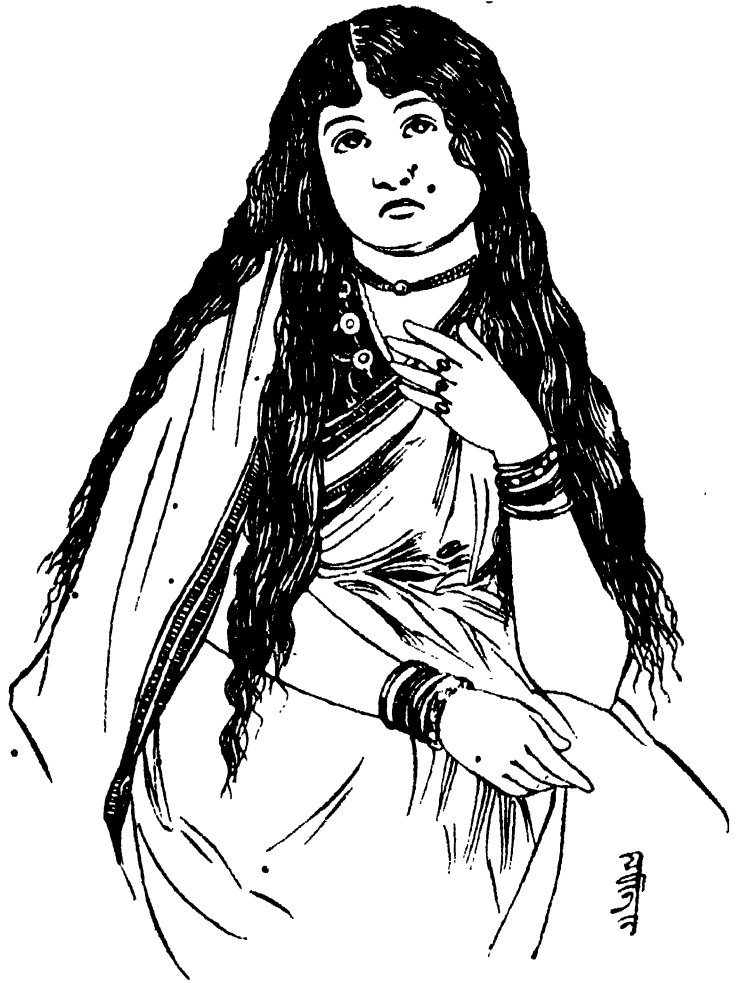
"সেক্সরী প্রাইমার"—অর্থাৎ 'এ বি সি ডি' পড়িবার সময় মাথায় ফিতার বেড়।

বিজ্ঞান রীডার—আর একটু উচুতে উঠিলে, বেড় বাদ দিয়া চুলের বাঁ দিকে একটা "বো", তৎপরে

প্রয়াগী কেশ

বিজ্ঞাপনের কেশ—কোনও সজীব নারীর মস্তকে এ প্রকার পাথুরে কয়লার মত জমাট বাঁধা কেশ দেখিতে পাওয়াযায় না। ইহা কেশতৈলের বিজ্ঞাপনদাতার ফরমাসী কেশ। তাঁহারা এইরূপ চিত্র দিয়া ক্রেতার মনে—

"মেঘমালা সঙ্গে তড়িত লতা জনু
হৃদয় শেল দেই গেল।"

এই ভাব জাগাইতে চান বোধ হয়।

উপন্যাসের কেশ—নায়িকা ষোড়শীই হউন বা ৩×১৬=৪৮ই হউন, আগুল্ফ লম্বিত কেশ না হইলে নায়িকার রূপই মিথ্যা।

বিরহিণীর কেশ—থিয়েটরের বিরহিণীরা বিরহের অভিনয় কালে এই প্রকার কেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইহা দেখিলেই দর্শকের মনের ভাব—কি জানি কি যেন হয়! পিঠের দুইপাশে দুই গোছা, এবং কণ্ঠ হইতে কটি পর্য্যন্ত সযত্ন-শৈথিল্যে রক্ষিত আরও দুই গোছা চুল। এইরূপ কেশের ফ্যাশন বিদ্যালয়ের মেয়েদের মধ্যেও দেখা দিতেছে।

ইস্কুলের গণ্ডী পার না হওয়া পর্য্যন্ত—বেণী। ইহার নাম শোক—

ম্যাট্রিকুলেশন—হালকা চুলের ফাঁপা বেণীর ডগায় ফিতার 'টাই'।

কলেজে যাওয়া বড় বড় স্কলার, মেডালিষ্ট ও প্রাইজ উইনার মেয়েদের পরিচয় খোঁপাতেই পাওয়া উচিত, যথা—বি-এ ফেল, পোষ্ট গ্রাজুয়েট, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, এবং এবং যাহার কপাল খুলিল, নোবেল প্রাইজ।

আরও কয়েক প্রকার কামিনী-কুন্তল,—

প্রয়াগী কেশ—এ হেন কুন্তলের মায়া কামিনী যদি প্রয়াগে ত্যাগ করিলেন, তবে আমাদের আর কহিবার থাকিল কি? শেষে—

হরিনামের মালায় দিলেন
ভামিনীরা মন,
বুঝি আমাদেরও যেতে হয়
কাশী বৃন্দাবন।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।

গান

(সুর—পূরবী)

দিয়েছিলে যাহা গিয়েছে ফুরায়ে
ভিখারীর বেশ তাই।
ফুরায়না যাহা এবার সে ধন
তোমার দুয়ারে চাই।
সুখ—আমারে দেয় না অভয় ;
দুঃখ—আমারে করে পরাজয়।
যত দেখি তত বাড়ে বিস্ময়,
যাহা পাই তা হারাই।

ভবের মেলায় কতই খেলনা
কিনিলাম তবু সাধ ত গেল না
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি,
কে দিবে তরীতে ঠাঁই !
দাও বিশ্বাস, দাও হে ভকতি,
বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি,
সম্পদে বিপদে তব শিবপদে
স্থান যেন সদা পাই।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

"সধবার একাদশী" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

"সধবার একাদশী" আমার পিতৃদেব ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের রচনা, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে এবং তাহার রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। স্নেহ ও ভক্তি হয়ত কর্ত্তব্যের পথে অন্তরায় হইতে পারে। তবে যতদূর পারি পক্ষপাতশূন্য হইয়া কয়েকটি কথা বলিব।

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক স্থলে প্রতিভাশালী লেখকের রচনা তাঁহার অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সহিত জড়িত হইয়া থাকে। সেই সকল বৃত্তির প্রভাব তাঁহার জীবনে ও রচনায় সর্ব্বত্রই স্পষ্ট লক্ষিত হয়। আমার পিতার 'ক্ষণভিন্ন-সৌহৃদ' বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সহানুভূতি। তিনি সর্ব্বদাই সেই সহানুভূতির বশবর্ত্তী থাকিতেন, তাহার প্রভাব অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। এই সহানুভূতির জন্য তিনি সাহিত্যে সর্ব্বস্থলে রুচির মুখ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং জীবনেও অন্যায়ের প্রতি সকল সময়ে কশাঘাত করিতে পারিতেন না।

এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব। ১৮৭০।৭১ সালে যখন সেনসসের অবতারণা হয়, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্রদ্ধাস্পদ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সরকারের তরফ হইতে, একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার হাতে অল্প বেতনের বহু সংখ্যক চাকরি ছিল। অনেকে আমার পিতার নিকট হইতে পত্র লইয়া সঞ্জীব বাবুর সহিত দেখা করিতেন, তাঁহাদের সকলকারই চাকরি হইত। ক্রমে কলিকাতায় যেন প্রচারিত হইল, সঞ্জীব বাবুর নিকট দীনবন্ধু মিত্রের পত্র অমোঘফলপ্রদ। একদিন সঞ্জীব বাবু আমার পিতার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলেন। স্বাক্ষর দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, স্বাক্ষর জাল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে চাকরী দিতেছি, কিন্তু এ স্বাক্ষরটি জাল।" চাকরীপ্রার্থী তাহার অপরাধ

স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা চাহিল। সেইদিন সন্ধ্যা কালে, সঞ্জীব বাবু আমার পিতার নিকট আসিয়া জাল স্বাক্ষরের কথা জানাইলেন। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কি করিলে?" সঞ্জীব বাবু উত্তরে বলিলেন, "তাহাকে চাকরি দিয়াছি।" পিতৃদেব তাহার স্বাক্ষরের কথা ভুলিয়া, তাহার চাকরি হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "বেশ করিয়াছ —কেননা তাহার অন্নের সংস্থান হইল।" লোকের উপকার হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার সহানুভূতির গুণে তিনি তাহার অপরাধের প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর পাইলেন না। পরদুঃখ-কাতরতা তাঁহার হৃদয়ের এতটা অংশ অধিকার করিয়াছিল যে, লৌকিক নীতিমূলক বৃত্তির সেখানে বিকাশ হইল না। মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মাহশয় বঙ্গসাহিত্যের মহারথিগণের সহিত ফৌজদারী আইনের সম্বন্ধ উপলক্ষে বলিয়াছেন—"নবনীত কোমলহৃদয় না হইলে, ডাকবাবুর হর্ত্তাকর্ত্তা দীনবন্ধুও অনেককে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারিতেন।"

দীনবন্ধুর এই সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা কেবল যে ব্যক্তি বিশেষের জন্য দৃষ্ট হইত তাহা নহে। ইহা দেশের ও দশের জন্য সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল। দেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সেই ক্রন্দনের ফল "নীলদর্পণ।" দেশকে লইয়া সমাজ, সেই সমাজের জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সেই ক্রন্দনের ফল "সধবার একাদশী।" 'প্রবাসীর বিলাপ" শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতায় তিনি কাতর কণ্ঠে ডাকিয়াছিলেন—

কোথায় জনমভূমি শুভ বঙ্গদেশ।
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ॥

সেই ক্ষেত্র যখন নীলাগ্নির ভীষণ তাপে বিদীর্ণ হইতেছিল, তখন তিনি আপনার নয়ন সলিলে সেই ক্ষেত্র পুনরায় সুজল সুফল শস্য-শ্যামল করিয়াছিলেন। নীলদর্পণে তাঁহার হৃদয়ের দর্পণ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল,—এবং তথায় বিরাজমানা সহানুভূতির আসন সকলের নয়নগোচর হয়। নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকরের মঙ্গল জন্য তিনি যে দর্পণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে সকল চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহারও স্থলবিশেষ হয়ত কেহ কেহ অনুমোদন না করিতে পারেন। কিন্তু লেখক যে উদ্দেশ্যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, পাছে চিত্র অসম্পূর্ণ রাখিলে উদ্দেশ্যের হানি হয়, সেই জন্য ভাব ও ভাষার ব্যতিক্রম করিতে পারেন নাই। তোরাপ যে ভাষায় গালাগালি দেয় সেই ভাষা প্রয়োগ না করিলে, তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে যে অমানুষিক অত্যাচার-বহ্নি প্রজ্জলিত রহিয়াছে তাহা কেমন করিয়া লোকে বুঝিবে? নীলদর্পণের স্থলবিশেষে অর্থ ও ভাষায় যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা বাস্তব চিত্রাঙ্কনের দোষে ঘটিয়াছে, লেখকের দোষে নহে। প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া বলিতে পারা যায় যে, বাস্তব চিত্র অঙ্কনে নীলদর্পণ-প্রণেতা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার তুলিকার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। চিত্রের কোন অংশই তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেইজন্য এক শ্রেণীর সমালোচক তাঁহার রুচির দোষ দিয়া থাকেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাঁদিগের অন্যতম, কিন্তু তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে—"রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ।"

বর্ত্তমান সময়েও বাস্তব চিত্র সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ দেখা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথের বাস্তব উপন্যাসগুলি সর্ব্বজন-অনুমোদিত নহে। কিন্তু কেহই সে গুলিকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে অগ্রসর নহেন। সাধারণ ভাবে এই কথাগুলি বলিয়া এইবার সধবার একাদশী সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

যেমন দেশের নিরক্ষর প্রজামণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া সেই দুঃখ বিমোচনের জন্য পিতৃদেব নীলদর্পণ রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া "সধবার একাদশী" রচনা করেন। শিক্ষিত সমাজ যখন ইংরাজী শিক্ষার বাহ্য চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, আমার পিতৃদেব

সেই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। দুইটি জলীয় পদার্থ বিশেষকে একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন ফেন-পুঞ্জের আবির্ভাব হয়, শিক্ষিত সমাজের তখন সেই অবস্থা ছিল। কলেজের ছাত্রগণ অনেকেই তখন স্থির শান্ত স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত হইয়াছিল। এ চিত্র রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার 'সেকাল ও একাল' পুস্তকে কতক দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয় তাহার "মধুসূদনের জীবন চরিতে" ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তৎপ্রণীত "সাধু রামতনু লাহিড়ী মহাত্মার জীবন চরিতে" সেই সময়ের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এ সকল চিত্র অনেকেই অবগত আছেন, এজন্য তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। মদিরা রাক্ষসীর প্রভাব শিক্ষিত যুবক-বৃন্দের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য করিতেছিল। মদ না খাওয়া যেন শিক্ষার অভাব বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বদেশহিতৈষী বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের এক ভাগিনেয় সুশিক্ষিত হইয়া কলেজ হইতে বাহির হয়েন। তিনি মদ্য পান করিতেন না। শুনিয়াছি, ঘোষ মহাশয় তাহাকে বলিতেন, "তুই মদ খেতে শিখিলি না, তোকে আমি সমাজে বার করিব কি করিয়া?" ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া নিমচাঁদ বলিয়াছে, "বেটা কলেজের নাম ডোবাইল, মদ খায় না"—শিক্ষিত সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ দেশনুরাগিগণ সেই সময় "সুরাপান নিবারণী সভা" স্থাপন করিয়া মদিরার স্রোত রোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তদানীন্তন সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া পিতৃদেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিরাকরণের জন্য, তিনি সাহিত্যের আশ্রয় লইলেন। এই অধঃপতনের নিখুঁত চিত্র সমাজের সমীপের উপস্থিত করিলে কল্যাণ হইবে, এই আশায় আবার লেখনী ধরিলেন। শরীরে গলিত গন্ধময় ক্ষতস্থান দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া উঠে এবং তাহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজ-শরীরের ক্ষতস্থান দেখাইয়া তাহাকে সচেতন করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু শিক্ষিত মণ্ডলীর করে দ্বিতীয় দর্পণ অর্পণ করিলেন। সেই দর্পণ "সধবার একাদশী"। নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হইলেও, লেখকের অসাধরণ ক্ষমতা থাকিলে তাহার সহিত লোক-শিক্ষাও সাধিত হইতে পারে। সেক্ষপীয়রের প্রধান Tragedy গুলি হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা অমূল্য। মানসিক বৃত্তি বিশেষের সংযম করিতে না পারিলে মানুষের কিরূপ ভীষণ শোচনীয় হৃদয়বিদারক পরিণাম উপস্থিত হয়, তাহার নিখুঁত চিত্র দেখাইলে সমাজের সম্যক্ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ম্যাকবেথ যদি নারকীয় উচ্চ আশা দমন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে তিনিই আরোহণ করিতেন, এবং তাঁহাকে বন্য বরাহের মত বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইত না। সন্দেহ-সন্তপ্ত ওথেলো যদি যুক্তি শক্তির বিকাশ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ডেসডিমোনার বধ জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইত না এবং তাহার শোচনীয় পরিণামও ঘটিত না। হ্যামলেট দীর্ঘসূত্রতা ও দার্শনিকতার বশীভূত না হইয়া যদি কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ডেনমার্কের মুকুট তাঁহারই মস্তকে শোভা পাইত এবং ওফেলিয়া তাহার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী হইয়া বিরাজ করিতেন। বৃদ্ধ লিয়ার যদি স্নেহের প্রতিদান সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অকৃতজ্ঞতার তীব্র বাণে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইত না। মানসিক বৃত্তি-সমূহের সামঞ্জস্যের অভাবের এই জীবন্ত চিত্রগুলি দর্শন করিলে, মানসিক দৌর্ব্বল্য পরিহারের জন্য মানুষ স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়।

সধবার একাদশীর কবি, সেক্সপীয়রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে তাঁহার নাটকে নিমচাঁদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত,

মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির অধঃপতনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মানুষ সংযমের অভাবে কিরূপ পশুতে পরিণত হয়, তাহাই কবির দেখাইবার উদ্দেশ্য। ইহাতে একাধারে লোকশিক্ষা ও নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে নিমচাঁদ স্কুল হইতে বাহির হইলেন, একটি দেবতা, সেই নিমচাঁদ রাজপথে ধূলিশয্যায় শায়িত হইয়া বারবিলাসিনীদ্বয়ের সহিত অশিষ্ট আলাপে প্রবৃত্ত, নিম্নশ্রেণীর দাসীকে কুৎসিত অনুরোধ করিতেও সংকুচিত নহে! ইহা অপেক্ষা হৃদয় বিদারক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য কল্পনা করিতে পারা যায় না। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের মনে পাপের প্রতি ঘৃণা উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না এবং সুরাপানের বিষময় ফল সহজেই অনভূত হয়।

নিমচাঁদ কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নিমচাঁদ স্বর্গভ্রষ্ট সন্তান। যদিও নিমচাঁদ অধঃপতনের নিম্নস্তরে উপনীত হইতেছেন, তিনি তখনও বুঝিতেছেন যে এটা তাঁহার পক্ষে উচিত হইতেছে না; কিন্তু সামলাইতে পারিতেছেন না। যদিও তিনি পশুতে পরিণত হইতেছেন,কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব একবারে তিরোহিত হয় নাই। তাই তিনি অটলের কুপ্রস্তাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "I dare do all that becomes a man, who dares do more is none." তাই তাহার মর্ম্মান্তিক যাতনা পূর্ণ খেদোক্তিতে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি এবং অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তির কথা সকলেই জানেন। নিমচাঁদের ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি একবারে নির্ম্মূল হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ঊর্দ্ধে উঠিবার শক্তি নিস্তেজ হইয়াছে। পক্ষান্তরে অধঃস্রোতস্বিনীবৃত্তি অবাধে নিম্নগামিনী হইতেছে। সে গতি রোধ করিবার সাধ্য তাহার নাই। এই বিরোধী বৃত্তিদ্বয়ের আবর্ত্তে পড়িয়া নিমচাঁদ 'জঘন্যতার জলনিধি' হইলেও আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত। এই অন্তর্যুদ্ধের জন্য নিমচাঁদ একবারে মনুষ্যত্ব-শূন্য হন নাই। তাই তিনি খেদ করিয়া বলিতে পারিয়াছেন—"হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরা হস্তে নিপাতিত কল্লে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন। যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা করিতেন, সে জননী এখন আমার দেখলে আপনাকে হতভাগিনী বলিয়া কপালে করাঘাত করেন। শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন।"

মনে হয়, এ চিত্র যেমন নাটকীয় উৎকর্ষের ষোল কলায় পূর্ণ হইয়াছে,তেমনি নীতিশিক্ষা হিসাবেও অমূল্য। নাটকত্বের হানি না করিয়া সৎশিক্ষা প্রদান সধবার একাদশীর একটি বিশেষত্ব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কবি সেক্সপীয়রের ট্রাজেডির অনুসরণ করিয়া নিমচাঁদের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; সেই জন্য অনেকে সধবার একাদশীকে মর্ম্মান্তিক ট্রাজিডি বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে তাঁহার একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি এরূপ গুরুতর গম্ভীর বিষয়কে হাস্যের আবরণের ভিতর দিয়া ফুটাইয়াছেন। এইখানে, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মুখ হইতে শ্রুত, সাহিত্যানুরাগী বিজ্ঞ পণ্ডিত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের "সধবার একাদশী"র গুণপণা সম্বন্ধে অভিমতের উল্লেখ করিব। তিনি বলিতেন, "আটটি ভাষায় নাটক শ্রেণীর বহুতর গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু "সধবার একাদশী"র তুলনা কোথাও দেখিতে পাই নাই।" দ্বিজেন্দ্রলালকে বলিতেন, "তুমি যেমন কয়েকটি গানে অতি গুরুতর বিষয়, হাস্যের আচ্ছাদনে অতি দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছ, দীবন্ধু একখানি সমগ্র নাটক সেই ভাবে রচনা করিয়া অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কৃতিত্ব দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।" দ্বিজেন্দ্রলালের—"সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়" গানটি শুনিয়া একদিন পরম শ্রদ্ধাভাজন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"ইহা কি হাসির গান? It is the cruellest tragedy." সধবার

একাদশী সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ ধারণা ছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'সধবার একাদশী কয়জন বুঝে!' সংযমের অভাবে বিফলীকৃত শিক্ষার অপূর্ব্ব চিত্র গেটে তাঁহার ফাউষ্টে দেখাইয়াছেন। কলিকাতার ফাউষ্টেও আমরা সেই চিত্র দেখিতে পাই, তবে মেফিস্টফেলিস্ অশরীরী হইয়া মদের বোতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সধবার একাদশীর মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কি উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল তাহাও বলিয়াছি।

সধবার একাদশীর তৎকালে সফলতা সম্বন্ধে এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, Temperance Society স্থাপিত হইবার পরে সধবার একাদশী প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশের কিছুদিন পরে Temperance Societyর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা প্যারীচরণ সরকার মহাশয় আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে, এখন আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।" এরূপ প্রশংসা অতি অল্প পুস্তকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

মদের বশীভূত হইয়া নিমচাঁদের অধঃপতনে, শুধু পাঠকগণই যে দুঃখিত ও স্তম্ভিত হয়েন তাহা নহে। নিমচাঁদ এ অধঃপতনের বিষে স্বয়ংও জর্জ্জরিত। তাই তিনি আক্ষেপ করিতেন—"মহাদেব ভোলানাথ, নিস্তার কর মা। তোমার গণেশের মুণ্ডু শনি দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ্! রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্মলজ্জা মানমর্য্যাদপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে দেখ দেখি তুমি কি ছিলে কি হইয়াছ! তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত। যতদূর অধঃপাতে যেতে হয়, গিয়েছ।"

মদের এমনি কুহকিনী শক্তি যে মনুষ্য ইহাকে হলাহল জানিতে পারিয়াও পান করিতে বিরত হয় না। নিমচাঁদ মদ খাইতেন কিন্তু তাঁহার পাপের প্রতি ঘৃণার অভাব ছিল না, ইহার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে পাওয়া যায়। তিনি বিদ্বান্ ছিলেন, বুঝিতেন সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হইলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। সুতরাং যে অটলের সহায়তায় তিনি মাতাল যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাকেও তিনি আদর করিতেন না। তাহাকে স্বর্ণক্ষুর গর্দ্দভ বলিতেন। তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, "তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জানতিস, তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম; তোর কথায় রাগ করিলে মূর্খতার সম্মান করা হয়। কিন্তু আজ অবধি প্রতিজ্ঞা, এই সুরাপান নিবারণী সভায় নাম লেখাতে হয় সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্মা পামরের সঙ্গে আর আলাপ করিব না, not even for wine." মদ তাঁহাকে কিরূপে গ্রাস করিয়াছিল এখানে তাহা স্পষ্টভাবে দেখা যায়! নকুলেশ্বরের মত যাঁহারা বলেন "মডরেট্‌লি খাওয়ায় কোন অপকার করে না—আমোদ করা বইত নয়"—তাঁহাদের এখানে শিক্ষা হওয়া উচিত। সাতদিনে অটল কিরূপ টলটল করিয়াছিল, কবি তাহাও দেখাইয়াছেন। মদ্যপানে কতরূপ কুফল ঘটে তাহাই প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, সে ফল যে শুধু মদ্যপায়ীর ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, তাহার জন্য আত্মীয়স্বজন সকলকেই ভুগিতে হয়। তাই হিন্দু ললনাকেও বলিতে হইয়াছে, "এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল।"

১২৭৯ সনে এডুকেসন গেজেটে ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "নাটক ও নাটকের অভিনয়" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে নিমচাঁদ-চরিত্রের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পড়িবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করি। এরূপ সমালোচনা সাহিত্যে বিরল। এই সমালোচনাটি পুনর্মুদ্রিত হইয়া শীঘ্রই সাধারণের হস্তগত হইবে।

এইবার সধবার একাদশীর রুচির অবতারণা করিব। রুচি কি তাহা বুঝান সহজ নহে। তবে রুচি দুই প্রকার কেহ তাহা অস্বীকার করিবেন না। ভাব-গত রুচি ও ভাষা-গত রুচি। সুন্দর সাধুভাষায় জঘন্য ও কুৎসিত ভাবের অভিব্যক্তি সাহিত্যে বিরল নহে। ইহা নিন্দনীয় ও দূষণীয় এবং ইহাকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে তরলমতি পাঠকের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয় ভাষা-গত রুচি। শুধু অশ্লীলতার জন্য

অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ 'সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু আর্টের জন্য বর্জ্জনীয় ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন শিল্পী আর্ট অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, চিত্রের সম্পূর্ণতা রক্ষা করিবার জন্য বর্জ্জনীয় ভাষা প্রয়োগ করিতে ভীত হয়েন না। তাঁহারা জানেন, যদি চিত্রের মূলগত সৌন্দর্য্য যথাযথ রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা গ্রহণ করিতে লোকের অভাব হইবে না। Swinburne বলেন, "No work of art has any worth or life in it that is not, before all things, a work of positive excellence." কিন্তু ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। তাই সধবার একাদশীর স্থল বিশেষের ভাষা যে আপত্তিশূন্য হইবে না, তাহা আশা করা যায়। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম :—

"নিমে দত্তকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে অশ্লীল কথা ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। নিমে দত্ত ইহশরীরে নরক-যন্ত্রণা ভোগের আদর্শ স্বরূপ। পাপী ব্যক্তি কি প্রকার নরক যাতনা ভোগ করে তাহা দেখাইতে হইলে কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশ্যক হয়।"

সধবার একাদশীর প্রধান পাত্র নিমচাঁদ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লক্ষ্য করিয়া নিমচাঁদ অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বলিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। নিমচাঁদ তদানীন্তন সময়ের একটি ছাঁচ (Type.) সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"নিমচাঁদ কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হয় নাই। সাময়িক যাবতীয় নিম একত্রে বাটিয়া ছানিয়া এই অপূর্ব্ব চাঁদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বঙ্গ নাট্য-জগতে ইহাকে তিলোত্তমা বলিলেও বলা যায়।" শুনিয়াছি আমার পিতাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মধুসূদনকে কি নিমচাঁদ সাজাইয়াছেন? তিনি নিজ স্বভাব-সুলভ ভাষায় উত্তর দিয়াছিলেন, "মধু কি কখনও নিম হয়?"

এইবার সধবার একাদশী অভিনয়ের কথা বলিব। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে সধবার একাদশীর স্থান অতি উচ্চ। কেন উচ্চ, তাহা শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার ৺গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গ পত্রে বুঝাইয়াছেন। সেই উৎসর্গ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

"নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু—বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়াছি শ্রদ্ধা সকল উচ্চ স্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চ স্থানে যেরূপ কার্য্যেই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে—এই আমার বিশ্বাস। যে সময়ে 'সধবার একাদশী''র অভিনয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সে নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-সম্রাট্ বলিয়া নমস্কার করি।"

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী মহাশয় প্রভৃতি "সধবার একাদশী"র প্রথম অভিনয় করেন। কবি-প্রতিভাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রঙ্গমঞ্চের গাত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল

"He holds the mirror up to Nature".

এ অভিনয় দেখিবার জন্য তাৎকালীন শিক্ষিতমণ্ডলীর কিরূপ আগ্রহ হইয়াছিল তাহা পূজনীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় "বঙ্গদর্শনে" "দীনবন্ধু মিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। আপনাদের অবগতির জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজার দিন আমি সধবার একাদশীর অভিনয় প্রথম দেখি। সেদিন আমাদের এম-এ পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। প্রথমত বি-এ তাহার পর মাসেই এম-এ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ক্রমাগত কয়েক মাস পরিশ্রম করায়, সরস্বতী পূজার দিনও কলম বন্ধ হওয়ার কারণ সত্ত্বেও Use and abuse of Satire বিষয়ক প্রবন্ধে মাথামুণ্ড লিখিয়া দিনপাতান্তে রাত্রিকালে নিদ্রার খুব প্রয়োজন। কিন্তু দীনবন্ধুর সধবার একাদশী অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা নিদ্রা অপেক্ষা অনেক প্রবল হইয়াছিল। দিনের বেলায় যে রস আমাকে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবৃত করিয়াছিল, তাহা নিদ্রাদেবীকেও তাড়াইয়া দিল। বিদ্রূপের বশীভূত হইয়া আমি সমাজ বিষয়ক হাস্যোদ্দীপক নাটকের অভিনয় দেখিতে চলিলাম। সেদিন কবিবর গিরিশ স্বয়ং নিমচাঁদ। সধবার একাদশী পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষত নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। * * * সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল।"

এ আগ্রহের হ্রাস হইয়াছে বলা যায় না। কেননা সেদিনও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ এটর্ণীগণ সধবার একাদশীর অভিনয় করিয়াছিলেন।

অভিনয়ে নাটকের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, যাঁহারা নীলদর্পণ প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়াছেন, এ কথা তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আবার অযথা অভিনয়ে নাটকের মর্য্যাদায় হানি হয়, এবং দর্শকের মনে অমূলক ধারণার উদয় হয়। সধবার একাদশীর অভিনয় অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কখন কখন অভিনেতা অযথা ভঙ্গী প্রদর্শনে দর্শক মণ্ডলীর বিরাগভাজন হইয়াছেন। এইরূপ অভিনয়ের ফলে নাটকের গৌরব হ্রাসের কথা শুনিয়াছি। আবার উপযুক্ত শ্রোতার অভাবে নাটক সম্যক আদৃত হয় না। সেই জন্য আমার মনে হয়, উপযুক্ত অভিনেতা ও উপযুক্ত শ্রোতার সম্মিলন না হইলে সধবার একাদশী অভিনয় বন্ধ থাকাই শ্রেয়ঃ।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, এইবার উপসংহার করিব। কবি নাটকের সদুদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য ইংরাজী কাব্য হইতে ভূমিকা স্বরূপ যে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ পুনরাবৃত্তি করিয়া বিদায় লইব। "Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates'.

ললিতচন্দ্র মিত্র।

দান

অনন্ত উদার এই নীলিমার তলে
ম্লানজ্যোতি গোধূলির বিদায়ের পলে
আমারে দিয়াছ তুমি শ্রেষ্ঠ দান তব,
ওগো দাতা,—বুকভরা বেদনা বিভব!

শিরে বহি দান তব আজো হাসিমুখে,
যতনে লুকায়ে রাখি আহত এ বুকে;
আঘাত যদিও পাই,—তোমারি সে দান,
অটুট রেখেছি আমি তাহার সম্মান।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

পাথরের দাম

(গল্প)

"ঠাকুমা, বল দিকিন্ আজ কে আস্‌বেন ?"

পাঁচ বৎসরের একটি বালক আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পিতামহীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

পিতামহী হইলেও তাঁহার বয়স পঞ্চান্ন বৎসরের অধিক নহে। মাথার খুব ছোট করিয়া ছাটা চুলগুলি বেশীর ভাগ এখনও কৃষ্ণই আছে। মুখে ব্রহ্মচারিণীর একটি পবিত্রভাব দীপ্যমান।

পিতামহী সকৌতুকে পৌত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কে আস্‌বে রে আজ অরুণ—তোর বৌ নাকি ?

পৌত্রটি পরম বিস্ময়ের সহিত পিতামহীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা কে বল্লে ঠাকুমা ? বৌ এখন আস্‌বে কেন ? আমি যে ছেলেমানুষ !—"

পিতামহী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ তুমি ছেলেমানুষ ? তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তাহলে কে আসবে ?"

"আজ সন্ধের গাড়ীতে কাকা আস্‌বেন্—আমি ইষ্টিশনে যাব বাবার সঙ্গে, বুঝ্‌লে ?"—বলিয়া প্রফুল্লমুখে পিতামহীর মুখের পানে বালক আপনার স্নিগ্ধ ও চঞ্চল দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য নিবদ্ধ করিল।

পিতামহীর নিকট এ সংবাদ অজ্ঞাত ছিল না। তিনি শুধু পৌত্রের আগ্রহ ও প্রফুল্লতাটুকু উপভোগ করিবার জন্য অজ্ঞতার ভান করিতেছিলেন। অরুণকে সস্নেহে কোলের কাছে আনিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"এত করে বুঝিয়ে দিলে ভাই, তবু বুঝ্‌বো না ?"

"দেখ ঠাকুমা, ঠিক বলিছি কি না"—বলিয়া বালক পিতামহীর কোলে একবার মাথাটি কিছুক্ষণের জন্য স্থিরভাবে রাখিয়া, আবার নাচিতে নাচিতে, বোধ হয় এই আগমন সম্বন্ধে অপর কাহাকেও বিস্মিত করিয়া দিবার জন্য সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে দ্বিজেন্দ্র আপিস যাইবার সময়ে মাকে বলিলেন—"মা, আজ ওবেলা তাহলে একটু মাছ-টাচের যোগাড় রেখো! মাছ না হলে আবার গোঁসাইজীর খাওয়াই হয় না !"

মা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, "আহা, তা ছেলেমানুষ, খাবে না ? তোর মত সবাই যদি নিরামিষ না খেতে পারে বাপু! তোকেও ত কত বলি খা খা, মাছ খেলে তো আর জাত যায় না। তা তোর সেই এক গোঁ।"

পুত্র কোন ভাল জিনিষ হইতে বঞ্চিত থাকিবে, মায়ের মনে তাহাতে ব্যথা লাগে। মায়ের গোপন দুঃখ বুঝিয়া দ্বিজেন্দ্র বলিল—"কেন মা, মাছ না খাওয়ার সুবিধেটাও তো ঢের আছে। তোমাকে তো কতবার বলেছি, তুমি যে কেবলই ভুলে যাও। মাছ খেলে কি আর দুবেলা দুসের খাঁটী দুধের ব্যবস্থা করে রাখতে মা ? ধর কোনও জায়গায় নেমতন্ন খেতে গেলাম, সবারই মুখে এক কথা শুনবে, ওহে ঐ পাতে দেখে দিও, উনি নিরামিষ খান—আলুভাজা ওঁকে বেশী করে দাও, ক্ষীর ঐ পাতে দাও—কত সুবিধে! তোমার বৌমাও এই সুবিধে দেখে ঐ পথ ধরেছেন। আজ কালকার দিনে বোকা আর কেউ নেই মা।"

যে তরুণীটি দুয়ারের পাশে স্বল্প অবগুণ্ঠনে সুন্দর মুখখানি ঈষৎ আবৃত করিয়া মাতা-পুত্রের কথা শুনিতেছিলেন, শেষের কথা কয়টি শুনিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিলেন।

পুত্র ও পুত্রবধূর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া মনের ক্ষোভটুকু দূর করিয়াই মা হাসিমুখে বলিলেন, "তোর

দেখাদেখি ও পাগলীও কম দুষ্ট হয়নি। সেদিন বলে কিঁ না, বেশ তো মা, এই রকম খাওয়াইতো ভাল, মন বেশ পবিত্র থাকে। তুই-ই ওর মাথাটা খেলি বাপু— নইলে বৌমা তো খেতো।"

পুত্র অপাঙ্গে পত্নীর পানে একবার মাত্র চাহিয়া মাকে বলিল—"দোহাই তোমার, মা! আমি মাছমাংস খাইনে, ঐ হাঁটু পর্য্যন্ত চুলওয়ালা মাথাটা খাওয়া আমার কর্ম্ম নয়। চুল বেঁধে দেওয়ার সময় তুমি রোজ হাত দিয়ে দেখো, মাথাটি একটুও কমে নি।"

মাতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কথায় তোর সঙ্গে কে পেরে উঠবে বাবা! ছেলেবেলায় তো মুখ বুজে থাকতিস্, এখন একেবারে অতবড় বক্তা কি করে হয়ে উঠলি তাই ভাবি।"

পুত্র একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"তাহলে তোমাকে বলি শোন মা। তুমি মনে করে দেখ, বিয়ের পর থেকেই কিন্তু আমি ক্রমশঃ বক্তা হয়ে উঠেছি। তোমার বৌমা—"

পত্নী দুয়ারের আড়াল হইতে একটি হাস্যরঞ্জিত কৃত্রিম কোপকটাক্ষ হানিয়া সরিয়া গেলেন। মাতা পুত্রকে বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম বাপু; বৌমাকে কেন দোষ দিস? বৌমা তোর সিকির সিকি কথাও জানে না।"

হাসিতে হাসিতে পুত্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে বলিয়া গেল—"আমি আপিস থেকে এসে সন্ধ্যার আগে অরুণকে নিয়ে ষ্টেশনে যাব।"

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পরেই দরজার সম্মুখে ঘোড়ার গাড়ী থামিতেই, অরুণ গাড়ীর ভিতর হইতে চীৎকার করিতে লাগিল, "মা, ঠাকুমা! কাকাবাবু এসেছেন, শীগ্‌গির দেখবে এস।"

হাসিতে হাসিতে দুইজনে নামিয়া অরুণকে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

অরুণ যাহাকে কাকাবাবু বলিল তাঁহার নাম হরিদাস গোস্বামী, দ্বিজেন্দ্রের আবাল্যের বন্ধু ও সতীর্থ। উভয়েরই নিবাস শান্তিপুরে। হরিদাস কলিকাতায় এক মার্চেণ্ট আপিসে কায করেন। কলিকাতাতেই সপরিবারে থাকেন। দ্বিজেন্দ্র বর্দ্ধমান রাজ এষ্টেটের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। বাল্যের বন্ধুতা প্রথম যৌবনে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসে আরও মধুময় হইয়াছিল। উভয়েরই যখন বিবাহ হইল, তখন গোলযোগ হইল উভয়ের বয়স লইয়া। কোন পক্ষই বয়সে বড় হইতে স্বীকৃত না হওয়ায় সন্ধি হইল, দুইজনেরই বয়স একে বারে ঘণ্টা ও মিনিট ধরিয়া এক। কাযেই উভয়েরই বন্ধুপত্নীর দেবরত্বে অধিকার জন্মিয়া গেল। হরিদাস দ্বিজেন্দ্রের স্ত্রী সুনীতিকে ডাকিতেন, 'বৌদিদি'। দ্বিজেন্দ্র বন্ধুপত্নী শৈলবালাকে বলিতেন 'বৌঠান্'। পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এই বন্ধুত্বকে অভিনব মাধুর্য্য দান করিয়াছিল। এখন দুইজনেরই বয়স ৩০।৩১ বৎসর।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই হরিদাস দ্বিজেন্দ্রের মাতাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইলেন। তিনি সস্নেহে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বেঁচে থাক বাবা, রাজা হও।"

দ্বিজেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "মা এ রকম আশীর্ব্বাদ করা কেবল ভগবান্ বেচারাকে বিপদে ফেলা। কোথায় আবার তিনি তোমার আদরের ছেলের জন্যে এই রাতে রাজত্ব খুঁজ্‌তে বেরোন বল ত? তার চেয়ে আশীর্ব্বাদ করলেই হত মাইনে বাড়ুক, তোমার ছেলেটিও খুসী হতেন।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে বাপু। টিপ্পনি কাটা অভ্যেসটা তোর কদ্দিনে যাবে বল দেখি?" পরে, হরিদাসকে বাড়ীর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির বাবা হাত পা ধুয়ে, জল খাও। সেই সকালে কখন দুটি ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছ!"

হাত মুখ ধুইতেই মা খানকয়েক গরম লুচি, আলু ভাজা, বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি আনিয়া দিলেন। হরিদাস অরুণকে কোলে বসাইয়া তাহার সঙ্গে ভাগে শীঘ্র সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া ফেলিলেন।

সুনীতি তখন এক পেয়ালা চা আনিয়া হাসিমুখে হরিদাসের নিকট রাখিয়া দিল।

দ্বিজেন্দ্র বলিলেন, "গোঁসাইজী, তোমার চায়ের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু।"

হরিদাস হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তোমার ভরসায় আমার এখানে এলেই হয়েছিল আর কি!"

মা পুত্রকে বলিলেন, "তোর বাপু আর চায়ের খোঁটা দিতে হবে না। তোর তো এসব আর কিছু করতে হয়নি। বৌমা এবার চায়ের সব সরঞ্জাম নতুন করে রাণীগঞ্জ থেকে আনিয়েছেন।"

তার পরে হরিদাসের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোর চিঠি আস্‌বার দিন ২।৩ দিন আগেও বৌমা বল্‌ছিলেন—'মা চায়ের এই সব দেখলেই ঠাকুরপোর জন্যে মন-কেমন করে।"

হরিদাস পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতি লইয়া একবার মাত্র সুনীতির মুখের পানে চাহিলেন।

আরও দুই একটি কথাবার্ত্তার পরে মা অরুণকে লইয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য গেলেন। সুনীতিও রান্না-ঘরে প্রবেশ করিল। তখন দুই বন্ধু মিলিয়া অনেক কথা হইল।

দুই বন্ধু খাইতে বসিলে সুনীতিই পরিবেষণ করিতে লাগিল। সুনীতির রন্ধন পারিপাট্যে ও সস্নেহ পরিবেষণে খাদ্যদ্রব্য হরিদাসের রসনাকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকেও সিঞ্চিত করিল। বন্ধুজায়ার আনন্দবিধানের জন্য তিনি আহার্য্য দ্রব্য নিঃশেষে উজাড় করিতে লাগিলেন।

দ্বিজেন্দ্র পত্নীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওগো আর একটু মাছের তরকারী এনে দাও। গোঁসাইজীর সেবা যেন আবার আধপেটা না হয়।"

সুনীতি হরিদাসের নিষেধ সত্ত্বেও আরও খানিকটা মাছের তরকারী আনিয়া পাতে দিল এবং হরিদাস অগত্যা তাহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন।

খাইতে খাইতে হরিদাস বলিলেন—"খেয়ে নিই আজকের দিনটা। আমাকে কালই ফিরে যেতে হবে।"

সুনীতি একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "সে কি কথা ঠাকুরপো! এলে তো দু'মাস পরে। কালকের দিনটা থাকতেই হবে। যাওয়া সেই যার নাম সোমবার সকালে। আচ্ছা দিদিকে আর খুকীকে কেন এই সঙ্গে একটিবার নিয়ে এলে না? কদ্দিন দেখিনি দিদিকে। সেই আর বছর পূজোর সময় একটি দিনের জন্যে দেখা হয়েছিল। দিদির জন্যে বড্ড মন কেমন করে।"

সুনীতির স্নেহপরায়ণ হৃদয়টি হরিদাসের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তিনি মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার কার জন্যই বা মন কেমন করে না বৌদিদি! আচ্ছা, এবার যখন আস্‌ব সঙ্গে করে আন্‌ব।"

দ্বিজেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "তা'হলেই মহাবিপদে পড়বে গোঁসাইজী। বৌদিদিটিকে তো জান? তোমার আপিস,তাই বল্লেন সেই যার নাম সোমবার। বৌঠান্‌কে পেলেই তোমায় জবাব দিয়ে দেবেন—এখন যাও ঠাকুর, সেই যার নাম আস্‌ছে মাস। তখন তোমার যে যে অবস্থাটা হবে বুঝতেই পাচ্ছ, বাসায় একলাটি পড়ে পড়ে সুধু বৈষ্ণব কবিদের গান গাইতে হবে। এতো আর আমি নই যে কাটখোট্টা মানুষ, একাই রইলাম!"

হরিদাস বাধা দিয়া বলিলেন, "ওই কথাটি শুধু বাদ দিয়ে বোলো ভাই। আমি তবু মাঝে মাঝে একা এসে তোমাদের দেখে যাই; তোমার যে একটি বার নড়বারও ফুরসত নেই!"

সুনীতি হাসিয়া মাথা নত করিল। স্বামীর পরিহাসপরায়ণ প্রাণের ভিতর তাহার জন্য যে কতখানি অনুরাগ সঞ্চিত আছে তাহা সে ভালই জানিত।

পরদিন রবিবারে হরিদাসের আর যাওয়া হইল না। সুনীতির কথামত সোমবারেই তাঁহাকে যাইতে হইল।

২

কলিকাতা মধুরায়ের লেনের একটি বাড়ীতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হরিদাস একখানি চেয়ারে বসিয়া

এক এক চুমুক চা-পান করিতেছিলেন এবং পত্নী শৈলবালার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

শৈলবালা বলিল, "তা হলে পূজার সময় ঠিক নিয়ে যাচ্ছ তো? শেষটা যেন একটা ছুতো দেখিয়ে একা পালিও না। তোমার আবার সে গুণ বিলক্ষণ আছে।"

হরিদাস চায়ের বাটিতে আর এক চুমুক দিয়া বলিলেন, "তা দেখ, নিজের গুণ মানুষ কিছুতেই অস্বীকার করে না; আমিই বা মানুষ হয়ে কি করে সেটা করি?"

তার পর পেয়ালায় আর এক চুমুক দিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, আগের চুমুকেই সবটুকু নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীর পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা শৈল, ঠিক বলত আজ কতটুকু চা দিয়েছিলে? পেয়ালাটা ভরেও তো দিতে হয়!"

শৈলবালা গালে হাত দিয়া সাশ্চর্য্যে বলিল, "ওমা সে কি কথা! পেয়ালায় যা ধরে তাই তো দিয়েছি; এ তো আর অন্য কিছু নয়, যে চেপে চেপে ধরাব!"

হরিদাস শূন্য পেয়ালার পানে সক্ষোভে চাহিয়া বলিলেন, "আহা, তুমি যে এক নিশ্বাসে সব কথাগুলি বলে ফেলে দিলে! হঠাৎ ফুরিয়ে গেল কিনা, তাই বল্‌ছিলাম। তা, আর এক পেয়ালা যদি দাও লক্ষ্মীটি। আজ শরীরটা বড্ড মেজমেজ কচ্ছে।"

"হাঁ! ও তোমার চা খাবার একটা ছুতো। আবার বেশী চা খেয়ে অম্বলের ব্যথাটা বাড়িয়ে তোল, তখন ঠিক হবে।"

"আচ্ছা কাল থেকে সকালে এক পেয়ালা আর বিকালে এক পেয়ালা মেপে দিও—এক ফোঁটা বেশী দিও না তুমি। আজ যখন বর্দ্ধমানে নিয়ে যাব বল্লাম তখন খুসী হয়েও তো এক পেয়ালা চা বক্‌শিস দেওয়া উচিত।"

শৈলবালা তখন স্বামীর চা-কাতর মুখের পানে চাহিয়া করুণাপরবশ হইয়া উঠিয়া গেল। উনানে কি একটা চড়ান ছিল তাহা নামাইয়া চায়ের জল গরম করিয়া লইল ও ক্ষিপ্রহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া স্বামীর নিকট লইয়া আসিল।

অত্যুষ্ণ চায়ে সাবধানে একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া "আঃ—" বলিতেই শৈলবালা বলিল—"আ-ই বল আর উ-ই বল, কাল থেকে দুবেলায় দুপেয়ালার বেশী চা কিছুতে পাবে না এ কিন্তু আমি বলে দিলাম।"

হরিদাস হাস্যমুখে বলিলেন, "এখন তুমি যা ইচ্ছে বল, কিছুতেই না বল্‌ব না।"

এমন সময় বাড়ীর ঝি তাঁহাদের তিন চার বছরের মেয়েটিকে লইয়া বেড়াইয়া ফিরিল। শৈলবালা মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইল। হরিদাস কন্যাকে আদর করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় হয়ে আমাকে চা করে দিও তো মা, কেমন?"

কন্যার নাম ইন্দুলেখা। সে বাপের নিকট সরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি দেব বাবা, আমি চা কত্তে পারি।"

শৈলবালা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "পার হয়ে গিয়ে পাটনীকে গাল দিতে সবাই পারে। আচ্ছা কাল আবার দেখা যাবে।"

হরিদাস ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না গো না; পাটনীকে আবার কি বল্‌লাম। এ কি একবারের খেয়া যে পাটনীকে চটাব!"

এমন সময় দরজার কড়া সজোরে নড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "একঠো তার আয়া বাবু।"

হরিদাস বাবু চায়ের পেয়ালাটি তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর রাখিয়া দরজা খুলিলেন এবং পিয়নের হাত হইতে এক খণ্ড কাগজ ও টেলিগ্রামখানি গ্রহণ করিলেন। পরে তাহার নিকট হইতেই একটা সুতাবাঁধা পেন্‌সিল লইয়া খামের উপরকার নম্বরের সহিত নম্বর মিলাইয়া কাগজখানিতে সহি করিয়া দিলেন।

পিওনকে বিদায় দিয়া ব্যগ্র হস্তে হরিদাস খামখানি ছিঁড়িয়া মনে মনে পড়িলেন। দ্বিজেন্দ্রের পুত্র অরুণ

তার করিতেছে, পিতার কলেরা হইয়াছে, শীঘ্র আসুন।

উদ্বেগাতিশয্যে হরিদাসের হাত কাঁপিতেছিল। তিনি শুষ্কমুখে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

শৈলবালা ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্বামীর হঠাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁগা কে টেলিগ্রাম করেছে? তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গেল যে!"

হরিদাসকে একটু চেষ্টা করিয়া কথা কহিতে হইল। বলিলেন, "বর্দ্ধমান থেকে এসেছে; দ্বিজেনের বড্ড অসুখ, আমাকে এক্ষুণি যেতে লিখেছে।"

"অ্যা বল কি!"—বলিয়া শৈলবালা সেখানে বসিয়া পড়িল।

হরিদাস চিন্তান্বিত স্বরে বলিলেন, "সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যেটা জ্বাল তা হলে। আমি বম্বে মেলেই যাব, সেটা বোধ হয় সাড়ে আটটায় ছাড়ে।"

শৈলবালা ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা ঠাকুরপোর কি অসুখ? কি রকম অবস্থা আমায় সত্যি করে বল না।"

হরিদাস শৈলবালাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "শক্ত অসুখ এই লিখেছে, ভয়ের তেমন বেশী কারণ নেই। বাড়ীতে আর কোন পুরুষ নেই তাই আমি শীগ্‌গির যাচ্ছি। গেলে তবু শুশ্রূষার একটু সুবিধে হবে।"

শৈলবালা উঠিয়া সাগ্রহে বলিল, "তা'হলে আমাকেও নিয়ে চল না কেন। যাবে?' বলনা?"—

হরিদাস এই ভয়ই করিতেছিলেন। একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তোমরা গেলে তাঁরা আরও ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। রোগের বাড়ীতে সেটা কি ভাল হবে? তারপর, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে গোছাতে গাছাতেও তো দেরী হবে।"

শৈলবালা সে কথা না মানিয়া বলিল, "আমরা কি কুটুম্ব যাচ্ছি যে আমাদের নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে? সেখানে ছেলেটাকেই বা কে দেখ্‌ছে! আর ঠাকুরপোর, যদি তেমন অসুখই হয়ে থাকে, মায় আর সুমুর কি হাত পা উঠছে? আমায় তুমি নিয়ে চল। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে সব গুছিয়ে নিচ্ছি।"

বলিয়া শৈল তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। হরিদাস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। তখন তাঁহাকে কঠোর সত্যই বলিতে হইল। বলিলেন, "দেখ, দ্বিজেনের কলেরা হয়েছে। এ অবস্থায় তোমরা গেলে তোমরাও বিপন্ন হবে, তাদেরও বিপদে ফেল্‌বে।"

কলেরা শুনিয়াই শৈলবালা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার চোখের কোলে কোলে জল ভরিয়া আসিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

চক্ষু মুছিয়া শৈলবালা স্বামীর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "আমায় নিয়ে চল, তোমার পায়ে পড়ি। ঠাকুরপোর জন্যে আমার মন বড্ড কি রকম কচ্ছে। আমি না হয় সেখানে গিয়ে অরুণ আর ইন্দুকে সাবধানে অন্য ঘরে রাখব, তোমরা তার শুশ্রূষা কোরো। তাতেও তো একটু কায হবে।"

হরিদাসের আর না বলা হইল না। তাড়াতাড়ি একটা ঘরে দামী জিনিষপত্র চাবি বন্ধ করিয়া, বাড়ী ও অন্যান্য ঘর ঝিয়ের জিম্মায় রাখিয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া হরিদাস মেল ধরিলেন।

৩

রাত্রি এগারটার সময় হরিদাস সপরিবারে দ্বিজেনের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বাহিরের ঘরটিতে তখন তিন জন ডাক্তার ও জন কয়েক স্থানীয় বন্ধু বসিয়া ছিলেন। বাড়ীখানি একেবারে নিস্তব্ধ। হরিদাস মেয়েকে কোলে লইয়া স্ত্রীকে পথ দেখাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই দ্বিজেন্দ্রের মাতা অগ্রসর হইয়া "হরি এসেছ বাবা,—কোলে কে বাবা?—একি বৌমাকেও এনেছ।"—বলিয়া প্রণতা শৈলবালাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

শৈলবালা সজল চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো, এখন কেমন আছেন মা ?"

মা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলবালার অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন, "চোখের জল ফেলো না মা! ঐটে আমি সইতে পারিনে। তোমাকে কাঁদতে দেখলে বৌমাকে আমি আমি সামলাতে পারবো না। দ্বিজুর মুখে এখনও হাসি লেগে রয়েছে। তোমরা চোখের জল ফেল্লেই তার হাসিটুক ফুরিয়ে যাবে।"

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার উপস্থিত আছেন তো মা ? তিনি কি বলছেন এখন ?"

মা বলিলেন, "তিনজন ডাক্তার বাইরের ঘরে আছেন।" হরিদাস এইটুকু শুনিয়াই তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তাহলে তুমি মা এদের নিয়ে যাও। আমি একবার ডাক্তারদের কাছে হয়ে যাই।"

মা বলিলেন, "আমিই সব বল্‌ছি বাবা। তাঁরা বলেছেন, রাত না কাট্‌লে কিছুই বলা যায় না।"

এখানে মায়ের গলাটা একটু ধরিয়া আসিল। একটুখানি নিস্তব্ধ রহিয়া তিনি আবার বলিলেন, "এখন তোমার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না, আগে একবার দ্বিজেনের কাছে চল। সে সন্ধ্যা থেকে, তুমি কতক্ষণে পৌঁছুবে তারই হিসাব কচ্ছে।"

হরিদাসের চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। গোপনে তিনি অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। মায়ের সহিষ্ণুতা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়টি হরিদাসের অবিদিত নাই। সেই গোপন হৃদয়টিতে কি ঝড়ই আজ বহিতেছে, তাহা ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

ইন্দু পিতার কাঁধের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে অরুণের পাশে শোয়াইয়া তিন জনে কম্পিত বক্ষে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হরিদাসকে দেখিবামাত্র দ্বিজেন্দ্র হাসিমুখে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে গোঁসাইজী এসেছেন! একি, বৌঠানও যে! দেখ, তোমরা অসুখ হয়েছে বলে কত ভাবছিলে, অসুখ না হলে কি বৌঠানের দর্শন পাওয়া যেত!"

হরিদাস ও শৈলবালা দেখিলেন যে দ্বিজেন্দ্রের মুখখানি তেমনি শান্ত ও হাসি মাখান আছে। দারুণ রোগে মুখখানিকে শীর্ণ করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার চিরস্থায়ী হাসিটুকুকে ম্লান করিতে পারে নাই।

হরিদাস উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া বন্ধুর শিয়রে বসিলেন। শৈলবালা স্বামীর পদতলে উপবিষ্টা সুনীতির নিকট আসিলেন। মা পুত্রের বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওষুধটা খেয়ে এখন কেমন আছিস্ বাবা ?"

"অনেকটা ভাল মা—আর তো যন্ত্রণা নেই তেমন।" —বলিয়া দ্বিজেন্দ্র প্রফুল্ল মুখে মায়ের পানে চাহিলেন।

একটু পরেই আবার বলিলেন, "মা, বৌঠানরা তো খবর পেয়েই বেরিয়েছেন, খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই কিছু হয় নি। তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও মা।"

"এই যে যাই বাবা! সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি"—বলিয়া মা তখনি বাহিরে আসিলেন।

"আমিও একটু বাইরে থেকে আসি"—বলিয়া হরিদাস বাহিরের ঘরে ডাক্তারদের কাছে আসিলেন।

হরিদাস বাহিরে আসিয়া নিজের পরিচয় দিয়া ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগীর অবস্থা কেমন। ডাক্তারদের দুই জন এম্ বি, একজন এল্-এম্-এস্। ইঁহাদেরই একজন হোমিওপ্যাথ। তিনজনের মধ্যে যিনি প্রাচীন তিনি বলিলেন, "রোগীর বাইরের অবস্থা দেখে চট্ করে কিছু বুঝে ওঠা যায় না। এ টাইপের কলেরা রোগীকে আমি কখনও স্থির থাকতে দেখিনি। বলিহারি দ্বিজেন বাবুর ক্ষমতা, যে তিনি এখনও পর্য্যন্ত হাসিটাকেও বজায় রেখেছেন! কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি এক একবার নীচের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছেন, তাঁর যে যন্ত্রণা হচ্ছে এইটুকুই কেবল তার প্রমাণ এটা আমি লক্ষ্য করেছি। রোগ দুপুরে আপিসেই আরম্ভ হয়। সবক'টা লক্ষণই আছে। নাড়ীর অবস্থাও ভাল নয়। কেবল অসাধারণ মনের জোরে এখনও পর্য্যন্ত একেবারে নিরাশ হবার মত হয় নি।"

দ্বিজেনকে দেখিয়া যেটুকু তাঁহার ভরসা হইয়া-

ছিল, ডাক্তারদের কথায় তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। তিনি সেখান হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় বাড়ীর ভিতর গেলেন। মায়ের অনুরোধে যথাসাধ্য কিছু খাইয়া, রোগীর ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়াই দ্বিজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খেয়ে এসেছ তো ভাই?" হরিদাস ঘাড়নাড়িয়া স্বীকার করিতেই দ্বিজেন্দ্র পত্নীকে বলিলেন, "ওগো তুমি তাহলে একটীবার যাও, বৌঠানকে যা হয় কিছু খাইয়ে নিয়ে এস।—আচ্ছা ইন্দুকে আনা হয়েছে তো, সে কোথায় গেল?"

শৈলবালা বলিল, "তাকে খোকার কাছে শুইয়ে রেখে এসেছি।"

সুনীতি উঠিয়া স্বামীর কথানুসারে শৈলবালার হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

শৈলবালা ও সুনীতি চলিয়া যাইতেই দ্বিজেন্দ্র মৃদু হাসিয়া হরিদাসের দক্ষিণ হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিলেন, "হরি, তাহলে আগেই চল্‌লাম ভাই, মনে কিছু কোরো না।"

আপনাকে সম্বরণ করা এবার হরিদাসের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমার তো হতাশ হওয়া স্বভাব নয়, ভাই তুমি সেরে উঠবে। রোগ তো তেমন বেঁকে দাঁড়ায়নি।"

দ্বিজেন্দ্র কষ্টে আর একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেঁকেছে বই কি ভাই। হাতে পায়ে খিল ধর্‌ছে, পেটের ভিতর দুঃসহ যন্ত্রণা, দারুণ তৃষ্ণা, সব লক্ষণই দেখা দিয়েছে। আমি তো এ রোগকে বিলক্ষণ জানি। মনে মনে কেবল ভগবানকে ডাকছি, ঠাকুর সহ্য করবার শক্তি দিও—তাই কোন রকমে চুপ করে আছি। বুঝি আর পারি না।"

হরিদাস আর অশ্রু রোধ করিতে পারিলেন না। দ্বিজেন্দ্র হরিদাসকে বিচলিত দেখিয়া বলিলেন, "আরে ছিঃ, তুমি চিরকালই ছেলেমানুষ রইলে। এখনই ওঁরা এসে পড়বেন। দুই একটা কথা তোমাকে বলে যাই শোনো। তুমি যে এদের দেখবে তা আর বেশী করে কি বল্‌ব! তবে একটা কথা—তুমি এদের নিজের চেষ্টায়, নিজের বুদ্ধিতে চল্‌তে দেবে। সুধু এদের উপর একটা সতর্ক স্নেহদৃষ্টি রাখবে—তাহলেই বড় কায করা হবে। তবে অরুণের লেখাপড়ার ভার তোমার রইল! এর পরে আবার যখন দেখা হবে, কথাবার্ত্তা হবে।"—বলিয়া আর একবার মৃদু হাসিলেন।

আর একটু পরেই সুনীতি ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ের কাছে বসিল। দ্বিজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌঠানকে বসে খাওয়ালে না?" সুনীতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "মা দিদির কাছে রয়েছেন।"

রাত্রি ২৷৩টা হইতে রোগ খুব বাড়িয়া উঠিল। জীবনের আশা দুরাশা হইয়া পড়িল। ডাক্তারেরা ক্রমশঃ নিরাশ হইয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন। দ্বিজেন্দ্রের চরিত্রমাধুর্য্যে তাঁহারা এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, চেষ্টা নিষ্ফল জানিয়াও তাঁহারা সেখান হইতে একেবারে চলিয়া যাইতে পারিলেন না। মায়ের ইচ্ছানুসারে একা সুনীতি শেষক্ষণে স্বামীর সমস্ত সেবা নিজ হস্তে করিতে লাগিল।

যখন আর না বলিলে নয়, দ্বিজেন্দ্র আপনার ক্ষীণ শীতল হস্ত সুনীতির কোলের উপর রাখিয়া, ম্লান পুষ্পের মত হাসিটুকু মুখে ফুটাইয়া বলিলেন, "তোমার উপর আমার কত ভরসা জান ত। মুষড়ে যেও না, শক্ত হোয়ো। এ আর ক'টাদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ি! আবার দেখা হবে, আবার দু'জনে এক হব। তোমায় না হলে আমার তো কোনখানেই চল্‌বে না। তোমাকে এমন করে দিনরাত চাইব, যে এখানে যতবার আসব, তুমি এসে আমার পাশে দাঁড়াইবেই দাঁড়াবে—"

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সুনীতি স্বামীর বুকে লুটাইয়া পড়িল।

কি একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে গিয়া, দ্বিজেন্দ্রের মুখের চিরদিনকার হাসিটুকু ঝরিয়া পড়িল। সে মধুর কণ্ঠ চিরকালের মত নীরব হইল।

৪

"বৌমা, ঢের বেলা হয়েছে, জপটা সেরে একটু জল মুখে দাও মা। কালকের রাত্তির যে ভয়ানক রাত্তির গিয়াছে মা!"

"তোমার পূজোটা সেরে নেও মা এক সঙ্গে খাব'-খন। তুমি ভাবছ কেন মা, উপোসের জন্যে আমার কোন কষ্ট হয়নি।"

"ও কথাটা বোলো না বৌমা—তুমি আমার সঙ্গে সমান করে কষ্ট করবে, ঐটি আমার বড্ড বাজে মা!"

"আচ্ছা মা আর ওকথা বল্‌ব না; আমি জপ করে এখনি জল খাচ্চি।"—বলিয়া সুনীতি তাড়াতাড়ি হাতের কায ফেলিয়া গোপনে অশ্রু মুছিয়া পূজার ঘরে গেল। আসনে বসিয়া মাটিতে মাথা লুটাইয়া অশ্রু জলে ভাসিতে ভাসিতে মনে মনে বলিল, "তুমি তো আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছ; আমার এখানকার কায মিটিয়ে দিয়ে শীগ্‌গির তোমার কাছে ডেকে নাও। আর যে পারিনে!"

বাহিরে পুত্রশোকাতুরা জননীর বদ্ধ ওষ্ঠাধর মর্ম্মন্তুদ বেদনায় শুধু রহিয়া রহিয়া কাঁপিতেছিল।

দ্বিজেন্দ্রের মৃত্যুর পর ৪ ৫ মাস অতীত হইয়াছে। বর্দ্ধমানেই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া, হরিদাস ইহাদের শান্তিপুরে দেশের বাটিতে রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে সামান্য যে দুই একশত টাকা জমিয়াছিল, তাহা সম্বল করিয়াই তাহাদের দেশে ফিরিতে হইয়াছিল। বাড়ীতে অনেকখানি জমি ছিল, তাহাতে তরকারী উৎপন্ন করিয়া, স্বল্প মূল্যে ধান্য কিনিয়া তাহা হইতে আপনারা চাউল প্রস্তুত করিয়া, দ্বিজেন্দ্রের মাতা পুত্রবধূ ও পৌত্রটিকে লইয়া কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

দ্বিজেন্দ্রের অনেক গোপন দান ছিল, সে জন্য তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই দুঃসময়ে হরিদাস পত্রাদি লিখিয়া সর্ব্বদা বন্ধুপরিবারের সংবাদ লইতেন এবং দুই এক মাস অন্তর আপনি আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। দ্বিজেন্দ্রের শেষ কথা স্মরণ করিয়া তিনি কোন অর্থ সাহায্যের কথা বলিতেন না এবং বন্ধুজননীর দৃঢ়তা ও বন্ধুজায়ার ন্যায় নিষ্ঠা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে অর্থসাহায্য ইহাঁরা গ্রহণ করিবেন না।

এই দ্বাদশীর দিন অপরাহ্ণে সুনীতি মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, আজকে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। বাবার দরুণ সেই যে পাথরগুলো আছে, যার থেকে ঠাকুরপো দু'তিন বছর আগে গোটাদশেক ৫ টাকা করে বেচে দিয়েছিলেন, সেগুলো থেকে বাছাই করে ঠাকুরপোর কাছে একবার দেখতে দিলে হয় না? বাবা যখন বর্ম্মায় থাক্‌তেন তখন পাহাড়ে নদীর ধারে যেখানে পাথরের মত দেখতেন সব জড় কর্‌তেন! মা ঐ নিয়ে ঠাট্টা করলেই বল্‌তেন, 'তোমরা বোঝ না, এর মধ্যে যদি দুচারটেও সত্যিকার পাথর মিলে যায় তাহলেই পরিশ্রম সার্থক হবে। সেগুলো প্রায় সবই আমার কাছে আছে। যদি বিক্রি করে কিছু হয় তাহলে অরুণের লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।"

মাতা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হরি এবার যখন আসবে, তার হাতে কতকগুলো বেছে দিও।"

ইহার দিন পনের পরে হরিদাস অরুণদের একবার দেখিতে আসিলেন। যাইবার সময়ে পুঁটুলি বাধা একরাশি রঙ বিরঙের পাথর ও কাচের কুচি লইয়া গেলেন। দিন ১০।১২ পরে সংবাদ দিলেন, এখনও কিছু সুবিধা করিতে পারেন নাই; দুই একটার যা সামান্য দাম বলিয়াছে, তাহাতে বেচা না বেচা সমান।

মাসখানেক পরে হরিদাস একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুঁটুলি ভরা কাঁচের কুচাগুলি ফেরত দিয়া, পকেট হইতে কাগজে মোড়া ফিকে সবুজ রঙের একটা পাথর বাহির করিয়া বলিলেন, "তোমার ২০০।৩০০ কুচির ভেতর থেকে এই একটা মাত্র ভাল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। এর দাম একজন ৫০৲ টাকা দিতে চেয়েছে। যদি এই রকম আর গোটা কয়েক বার করতে পার তো কিছু হতে পারে।"

নিরাশার ভিতর এইটুকুও আশার আলোক।

সেই দিনই সকলে মিলিয়া ৪।৫টি পুঁটুলি খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বাছিয়া গোটা পঁচিশেক খুঁজিয়া পাইলেন। পরদিন সেইগুলি সযত্নে কাগজে মোড়ক করিয়া হরিদাস কলিকাতায় ফিরিলেন।

সপ্তাহ পরে তিনি পত্র দ্বারা মাকে জানাইলেন, একজন দোকানদার সেই ২৫টার মধ্যে ২০টা গ্রহণ যোগ্য মনে করিয়াছে। আগেকার ১টি লইয়া ২১টা হয়। কিন্তু দামের বেলায় সে বলিতেছে ৫০৲ কম দিবে;—অর্থাৎ সবসুদ্ধ এক হাজার টাকা দিতে চায়। আমার এক বন্ধু বলিতেছেন ইহার দাম নাকি আর কিছু বেশী হইতে পারে, কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। আপনাদের কি মত পত্রপাঠ লিখিবেন। যদি এই দামেই বিক্রয় করা মত হয়, শীঘ্র এক আনার টিকিট লাগাইয়া বিহারীচরণ শীল ৭নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট এইনামে একখানি টাকা প্রাপ্তির রসিদ লিখিয়া আমাকে পাঠাইবেন।"

শাশুড়ী ও পুত্রবধু পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, নারায়ণ যখন দয়া করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেছেন, তখন বেশী লোভ করা সঙ্গত নহে। তাঁহারা হাজার টাকাতেই বিক্রয় করা মত জানাইয়া, কথামত রসিদ লিখিয়া পাঠাইলেন। সপ্তাহ পরে রবিবারে হরিদাস হাজার টাকা লইয়া আসিয়া অরুণের নামে শান্তিপুর পিপ্‌লস ব্যাঙ্কে জমা দিয়া গেলেন।

৫

তারপর আরও বৎসর দুই কাটিয়া গিয়াছে। মাঝে অরুণের একবার শক্ত অসুখ হইয়াছিল, অতি কষ্টে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। মাতা ও পিতামহী মানত করিয়াছিলেন পুত্রকে লইয়া কালীঘাট ও তারকেশ্বরে গিয়া পূজা দিয়া আসিবেন। অরুণ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। কালীঘাটে পূজা দিয়া, হরিদাসের বাসায় একটা দিন থাকিয়া, পরদিন তারকেশ্বর হইয়া বাড়ী ফিরিবেন ইহাই শাশুড়ী ও পুত্রবধু স্থির করিয়াছেন। জ্ঞাতি সম্পর্কে দ্বিজেনের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কালীঘাটে পূজা দিয়া আসিয়া তাঁহারা হরিদাসের বাসায় উঠিলেন। এ বাসাটি নূতন এবং আগেকার চেয়ে ছোট।

শৈলবালা সুনীতির শীর্ণ শরীর, ম্লান মুখ, ও বিধবার বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আহা, সুনীতির হৃদয়টি স্নেহে পরিপূর্ণ; বিধাতা তাহার ভাগ্যে এমন দুঃখ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা তো কেহ ভাবে নাই! মা আপনার দুঃখ গোপন করিয়া, বধূদ্বয়ের অশ্রু মুছাইয়া উভয়কে শান্ত করিলেন।

হরিদাসের পাঁচ বছরের মেয়ে ইন্দু সুনীতিকে চুপি চুপি আসিয়া বলিল, "কাকীমা, আমার মেয়ের সঙ্গে ওদের লতিকার ছেলের বিয়ে দিয়েছি। বাবা আমার মেয়েকে কেমন গহনা দিয়েছেন দেখবেন আসুন।"

সুনীতি তাহার মুখখানি ধরিয়া চুমু খাইয়া সস্নেহে বলিল, "আচ্ছা চলমা, দেখিগে।" চলিতে চলিতে ইন্দু বলিল, "দেখুন কাকীমা, লতিকা একদিন মিছামিছি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বল্‌ছিল সে বিয়ে ফিরিয়ে নেবে। আচ্ছা বলুন তো, বিয়ে একেবার হয়ে গেলে নাকি ফিরিয়ে নেওয়া যায়?"

ইন্দু পুতুলের বাক্সের কাছে আসিয়া বাক্স খুলিতে খুলিতে বলিল, "আমি লতিকাকে ডেকে আন্‌ব, তুমি একবার তাকে বলে দিও তো কাকীমা।"

বাক্সের মধ্যে অনেকগুলি পুঁতুল জামাযোড়া গায়ে দিয়া দিব্য আরামে শুইয়া ছিল। ইন্দু তাহার মধ্য হইতে মধ্যস্থলের পুতুলটি তুলিয়া তাহার সাজগোজ দেখাইল। পুতুলটিকে একটি সুন্দর জামা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার চারিপাশে বেশ সুন্দর সবুজ রঙের ছোট ছোট কাঁচ কি পাথর বসান। সুনীতি চমকিত হইয়া সেগুলি দেখিতে লাগিল। গণিয়া দেখিল সবসুদ্ধ ১২টি পাথর আছে। লক্ষ্য করিয়া বুঝিল এগুলি তাহারই বোধ হয়। ইন্দুর গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা তোমার বাবা আর কাউকে কোন গহনা দেন নি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছেন বৈকি। আমার জামাইয়ের জামাতেও কেমন ভাল ভাল মণি বসিয়ে দিয়েছেন।"—

বলিয়া ইন্দু পূর্ব্বোক্ত পুতুলের পার্শ্বস্থিত মাঝারি গোছের আর একটি পুঁতুল টানিয়া তুলিল। সুনীতি গণিয়া দেখিল, তাহাতে নয়খানা পাথর বসান আছে। তাহার মনে আর কোন সংশয় রহিল না।

সুনীতি একটু ভাবিয়া ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা ইন্দু, তোমার মায়ের কি কি গহনা আছে জানো ?"

ইন্দু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "মার তো আর গহনা নেই। মা বলেছেন, কত লোকে খেতে পায়না, এ সময় গহনা পরলে পাপ হয়। যাদের গহনা, বাবা তাদের দোকানে দিয়ে এয়েছেন। আমিও গহনা পরব না কাকীমা।"

সুনীতির চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। সে আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সেই পুরাণো ঝি কোথায় গেল ?—সেই জ্ঞানো পিসি ?"

"বাবা বলেছেন, সে নাকি মাসে মাসে মাইনে নেয়—বাস্তুঘুঘু সে। বাবা তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন। আমরা এই ছোট্ট বাড়ীতে লুকিয়ে চলে এসেছি—জ্ঞানো পিসি আর আমাদের খুঁজে পাবে না, কেমন জব্দ! হ্যা কাকীমা, টাকা না থাক্‌লে নাকি মাইনে দেওয়া যায় ?"—ইন্দু এক নিশ্বাসে এই সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল।

সমস্ত বুঝিয়া সুনীতি আপনাকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না। পাথরের দামের রহস্য বুঝিয়া তাহার আয়ত চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া সেই পুতুল দুটির বহুমূল্য আভরণগুলিকে সিক্ত করিয়া দিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

শুকতারা

(গল্প)

বিজয় ও বসন্ত দুটি বন্ধু ; প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করা অবধি তাহারা কলিকাতায় একসঙ্গে এক মেসে থাকে। বিজয় বয়সে কিছু বড় ; সেই অধিকারে সে একটু মুরুব্বির চালে চলে। যখন কোনও কথা কহে, তখন একটু অনাবশ্যক জোর দিয়া জানাইয়া দেয় যে বয়োজ্যেষ্ঠের যেটুকু প্রাপ্য, তাহা অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল'; পরীক্ষায় গোটাকতক নম্বর বেশী পাইলেই যে সে অধিকার কেহ লোপ করিতে পারে এমন কোনও কথা নাই। বসন্ত পরীক্ষায় বরাবর উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে ; বিজয়ের ঝোঁকটা কিছু নিম্নের দিকেই বেশী। সে কোন প্রকারে দু'কুড়ি সাত বজায় রাখিয়া আসিতেছে, ইহাই তাহার মস্ত একটা গর্ব্বের বিষয় ছিল। এ বিষয়ে কথা হইলে সে বলিত, পরীক্ষাটা একটা নেহাৎ অপরিহার্য্য উৎপাত—একটা necessary evil বই আর কিছুই নয় ; এর জন্য যারা মাথা ব্যথা করে' মরে, তা'দের মত মূর্খ দুনিয়ায় নেই।" বসন্ত জীবনটাকে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল ; বিজয় সেটাকে অতি সহজ ও তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতেই চেষ্টা করিত।

বসন্ত বিজয়কে ডাকিত, "বিজয় দা, আজ ইন্‌ষ্টিটিউটে একটা ভাল লেক্‌চার আছে ; ডাক্তার রায় প্রিজাইড করবেন, যাবে ত চল।"

বিজয় বলিত, "আরে রেখে দে, ওসব লেক্‌চারে

লেক্‌চারে গেলে আমার সর্দ্দিগর্ম্মি হবে। তার চেয়ে বরং চল্ এলফিনষ্টোনে ট্রে-অব হার্টস্ আছে, দেখে আসা যাক্।"

বসন্ত বিরক্ত হইয়া ইন্‌ষ্টিটিউটে যাইত; বিজয় হাসিতে হাসিতে সিনেমা দেখিতে যাইত।

প্রথম প্রথম একঘরেই তাহাদের 'সিট' ছিল। বিজয় কতকগুলি বিষয়ে তাহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিত। প্রথম, বসন্ত যে কেবল বসিয়া বসিয়া পড়িবে ইহা বিজয় সহিতে পারিত না। তারপর বসন্ত একটু বাবু গোছের ছেলে ছিল; সব সময়ে সে ছিমছাম ফিটফাট হইয়া থাকিতে ভালবাসিত। বিজয় সেদিকে সময়ের অপব্যয় করিতে চাহিত না। বসন্ত অতি যত্নে তাহার জুতা জামাটি গুছাইয়া রাখিত, বিছানা ঝাড়িয়া গুটাইয়া রাখিত এবং বইগুলি পড়া হইলে যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া দিত। বিজয় যেখানে সেখানে যখন তখন জিনিষপত্র কাগজ কলম ছড়াইয়া রাখিত। বসন্ত যখন তাহার কুঞ্চিত দেহে টেড়ি বাগাইয়া, রুমালে গন্ধ উড়াইয়া বেড়াইতে বাহির হইত, তখন বিজয় তাহাকে হাসি টিট্‌কারীতে অস্থির করিয়া তুলিত। তাই এবার বসন্ত এক-'সিট' ওয়ালা একটি ঘর বাছিয়া লইয়াছে। বিজয় তাহাতে একটু মুখভার করিলে, সে বলিয়াছিল—

"কি জান ভাই, পরীক্ষার বছর; গল্পগুজবে সময় কাটালে আর চল্‌ছে না। একটু নিরিবিলি এ ক'টা মাস পড়তে দেও।"

বিজয় ভাবিল বসন্ত ভাল ছেলে;—হিষ্ট্রীতে ফার্ষ্ট ক্লাস্ অনার্ পাবে—পড়ুক একলাই দিনকতক।

কিন্তু বসন্তের পড়াশুনার বাধা জন্মাইয়া দিল—একখানি সুন্দর মুখ। সে মুখখানি তার খুবই সুন্দর বোধ হইয়াছিল। শরতের রৌদ্র যখন আকাশে ভুবনে সুস্নধৌত ময়ূরকণ্ঠি গরদের শাড়ীর মত সূর্য্যকিরণ বিছাইয়া দিয়াছে, তখন একদিন হঠাৎ জানালা খুলিয়া রাস্তার ওধারের বাড়ীর জানালায় একখানি বড় সুন্দর মুখ সে দেখিয়াছিল। আলুলায়িত-কুন্তলা একটি কিশোরীর মূর্ত্তি তাহার নয়নপটে প্রেমের তুলিকা বুলাইয়া দিয়া গেল।

তার পরে দিনের মধ্যে শতবার সে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইত, এবং যতক্ষণ সে তরুণীর উদয় না হইত, ততক্ষণ হাঁ করিয়া সেই বাড়ীর দিকে তাকাইয়া থাকিত।

প্রথম যৌবনের আবেগে হৃদয় যখন দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া উঠে, তখন সে তাহারই উল্লাসে বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গমের মত একবার উন্মুক্ত গগনের আস্বাদ পাইবার জন্য ছুটিয়া যায়। চারিদিকের স্বাধীন বাতাস তাহার শিরায় শিরায় যেন মদিরা ছুটাইয়া বহে। সে তখন লক্ষ্য ভুলিয়া, সকল ভুলিয়া দিগ্‌দিগন্তে আপনাকে প্রচারিত করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়ায়। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে না, সম্মুখের ভাবনাও ভাবে না, সে আপন মনে উড়িয়া উড়িয়া শুধু আপনাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। বসন্তেরও কতকটা সেইরূপ হইল; সে আপনার ভারকেন্দ্র স্থির রাখিয়া সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। উন্মেষিত যৌবনের সমস্ত পিপাসা-পূর্ণ হৃদয় লইয়া সে একটি মুক্ত গবাক্ষের পার্শ্বে একখানি সুন্দর মুখের আশায় বড় উন্মনা হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইতে যাইবার জন্য বিজয় তাহাকে ডাকিতে আসিত। সিনেমার লোভ পরিত্যাগ করিয়া লেক্‌চার শুনিবার জন্যও সে প্রস্তুত হইত। কিন্তু নিষ্ফল। নানা ওজর করিয়া বসন্ত বাড়ীতে থাকিতেই ভালবাসিত। বিজয় হয় ত বলিত,—

"আচ্ছা তা হলে আমিও না হয় আজ বেড়াতে না-ই গেলাম; তুমি একটা গান গেয়ে যদি শোনাও।"

অন্য কোনও ঘর হইতে একটি হারমোনিয়ম ধার করিয়া আনা হইত। মেসের যে সব ছেলেরা বিকালে বেড়াইতে যায় নাই, তাহাঁরা হারমোনিয়মের সুর শুনিয়া সেই ঘরে আসিয়া জড় হইত। বসন্ত মিহি সুরে গলা কাঁপাইয়া বিরহের গীত গাহিত। যাহার উদ্দেশে তাহার হৃদয় এই গানের সুরের আসনখানি পাতিয়া পূর্ব্বরাগের অর্ঘ্য নিবেদন করিত, তাহার

নিকট ইহা পঁহুছিত কি না, সে জানিত, না। তবে গান ভাঙ্গিয়া গেলে, সকলে যখন আপন আপন ঘরে ফিরিত, তখন তাহার সেই অন্ধকার ঘরের বাতায়ন-তলে দাঁড়াইয়া সে দেখিত, আর একখানি অন্ধকার ঘরের জানালা উন্মুক্ত হইয়াছে এবং তাহার পশ্চাতে যেন সেই কিশোরী মূর্ত্তিটি বিরাজ করিতেছে।

কতদিন সে দেখিয়াছে, রাস্তার ওধারে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ও-বাড়ীর মেয়েরা বেড়াইতে যাইতেছেন। বসন্ত কাপড় চাদরের পারিপাট্য বিধান করিয়া সে সময়ে বিনা প্রয়োজনেও বাহিরে যাইত এবং গাড়ী যখন তাহার কামনার সুন্দরীকে লইয়া তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত, তখন সে আরও নিকট হইতে তাহাকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। তাহার প্রেমনিবেদন যে একান্ত ব্যর্থ হইতেছে না, এই চিন্তা তাহাকে আনন্দে এত অধীর করিয়া তুলিত যে, সে ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইত না, ইহার পরিণাম কোথায়! একটা অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য উন্মাদনা তাহার মনকে লইয়া বড়ই নিষ্ঠুর খেলা খেলিতে লাগিল।

একদিন বিজয় তাহাকে বড়ই মুস্কিলে ফেলিল। বিকালে রোজ যেমন বিজয় বেড়াইতে যায়, তেমনই বেড়াইতে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এবং বসন্তকে জানালার ধারে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে একবারে বলিয়া উঠিল—"বটে, এই তোমার এগ্‌জামিনের পড়া তৈরি করা হচ্চে? এরি জন্যে তুমি বেড়াতে যাবার অবসর পাওনা বটে? কি হে, 'লভে' পড়ে গেছ নাকি ভায়া?"

বিজয় অপরাহ্নের অস্পষ্টালোকে দেখিল, রাস্তার অপর পারের জানালাটি হইতে একটি কিশোরী মূর্ত্তি সরিয়া গেল। বসন্ত লজ্জায় মরিয়া গেল; সে বিজয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও পারিল না। বিজয় তাহার স্কন্ধে প্রকাণ্ড এক চড় মারিয়া বলিল—"কি, একেবারে হুঁস নেই যে? এস এস এখন একটুখানি বেড়াতে যাওয়া যাক্। ওসব ভাল নয়, বল্‌ছি; ফের যদি এ রকম বেয়াড়া চাল দেখতে পাই, একটা অনর্থ ঘটাব, দেখে নিও।"

বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাবটা অন্য সময়ে হইলে বসন্ত তাহা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করিত। কিন্তু বসন্ত আজ তাহার লজ্জা ঢাকিবার এমন একটা সুবিধা পরিত্যাগ করিল না। তাই সে তখনি জামা চাদর লইল ও জুতাটা পরিয়া লইল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে দুই বন্ধু সীঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে যখন বায়োস্কোপ দেখিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল, তখন বিজয় অপরাহ্নের সমস্ত কথাই ভুলিয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার তিন চার দিন পরে, বিজয় একদিন বিকালে বসন্তের ঘরে আসিয়া টেবিল হইতে খবরের কাগজ টানিয়া লইয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল। বসন্ত এই মাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়াছে। সে জামা জুতাগুলি যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিল—

"বিজয় দা, এবার পূজায় কি করা যায় বল ত?"

বিজয় খবরের কাগজ হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল—"সটান বাড়ী যাওয়া যায়।"

"বাড়ী ত যাওয়া যায়; কিন্তু না গেলে বোধ হয় আরও ভাল হয়।"

"কারণ?"

"কারণ হচ্চে এই যে বাড়ীতে পড়াশুনাটা তেমন হয় না।"

"ঢের হয়! মেসে একলা এই সারা ছুটিটা কাটিয়ে দেওয়া—এ কল্পনাই করা যেতে পারে না। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি থাক্‌তে পার, কিন্তু বায়ু ভক্ষণ করে' থাক্‌তে হবে, জেনো।"

"কেন?"

"মেস বন্ধ হয়ে যাবে। ঠাকুর চাকর কেউ থাক্‌বে না।"

"সে ত তোমার হাত। তুমি ত ইচ্ছে করলেই এ সব বন্দোবস্ত করতে পার।"

বিজয় মেসের ম্যানেজার। সে গম্ভীরভাবে বলিল, "পারি—কিন্তু করবো না। ঠাকুর চাকর পূজোর

ছুটীতে দিন কতক একটু জিরিয়ে নেবে—এ থেকে আমি তাদের বঞ্চিত করতে পারবো না।"

বসন্ত একটু আবদারের সুরে বলিল, "আর বছর ত পেয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, সেই জন্যই এ বছর আর বেচারীদের কষ্ট দিতে চাইনে।"

বলিয়া বিজয় খবরের কাগজের পাতা উল্‌টাইয়া মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল। বসন্ত বুঝিল, বিজয় তাহার সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে নড়ানো সহজ নহে।

কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ বিজয় বলিয়া উঠিল—

"ওহে বসন, কার্ত্তিক বোসের ছেলে অনিল যে আমাদের সঙ্গে পড়ে।"

"কার্ত্তিক বোস্‌টা আবার কে?"

"বাড়ীটাই চেনো, তার স্বত্বাধিকারীর কোনও খবর রাখ না?"—বলিয়া বিজয় রাস্তার ওপারের বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

"ওঃ।"

"এবং কার্ত্তিক বোসের একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, সে খবরটিও আমি অনিলের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তোমার জন্য, বুঝলে?"

"হুঁ"—বলিয়া বসন্ত নীরব হইল।

২

পূজার ছুটী হইয়া গিয়াছে। বিজয় বসন্তের মেস সমস্ত জানালা খড়খড়ি বন্ধ করিয়া মাসখানেকের জন্য গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল। বিজয় দেশে পূজার উৎসব উপভোগ করিতেছে। বসন্ত বেচারী দিনকতকের জন্য বাড়ী গিয়াছিল বটে, কিন্তু যে দুষ্ট অদৃষ্ট দেবতা মানুষের প্রাণ লইয়া ক্রূর ক্রীড়া করিতে ভালবাসেন, তিনি তাহাকে স্বস্তি দিলেন না! সে একদিন পুঁথিপত্র বাঁধিয়া কাপড় জামা ট্রাঙ্কে পুরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। সে এবার সত্য সত্যই সঙ্কল্প আঁটিয়া আসিল—কলিকাতায় গিয়া ভাল করিয়া পড়িবে, এগ্‌জামিনে তাহাকে ভাল ফল করিতেই হইবে।

পটলডাঙ্গায় তাহার একটি বন্ধু ডাক্তারী পড়িত; মেডিকেল কলেজের সেই মেসে আসিয়া সে আপাততঃ উঠিল এবং "ফ্রেণ্ড চার্জ্জ" দিয়া বন্ধুর সঙ্গেই রহিল। দিন কুড়ি বাদে তাহাদের শিমলায় মেস খুলিলে তখন আবার সেখানে গিয়াই জুটিবে।

সে প্রথম প্রথম খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল। তাহার বন্ধু প্রায় সারাদিনরাত কলেজে ও হাঁসপাতালে কাটাইয়া দেয়; সেও নির্জ্জনে তাহার বই ও খাতাগুলি বাহির করিয়া বেশ পড়ে, মুহূর্ত্তের জন্যও মনে অন্য চিন্তা আসিবার অবকাশ দেয় না। কিন্তু দুষ্ট ছেলে যেমন গুরু মহাশয়ের সতর্ক শাসন এড়াইয়া পাঠশালা হইতে পলায়ন করে, তেমনই তাহার মন সঙ্কল্পের বাঁধ লঙ্ঘন করিয়া উধাও হইয়া কোথায় ছুটিত! সমস্ত দিনটা সে কোনও রূপে কাটাইয়া দিত। চারিটা বাজিতেই তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিত; এবং তাহার পদযুগল যেন কিসের টানে শিমলার দিকে তাহাকে বহিয়া লইয়া যাইত। শত সংকল্পের রশ্মি দিয়াও সে তাহাদের গতি ফিরাইতে পারিত না। প্রথম প্রথম দুই একদিন গিয়া সে দেখিল, তাহাদের মেসবাড়ীর দরজাগুলি বন্ধ, সম্মুখের বাড়ীর জানালাও রুদ্ধ; এক আধদিন খোলা থাকিলেও তাহার পার্শ্বে কোনও তরুণী আসিয়া ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইত না।

একদিন বসন্ত যখন পদচারণা করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া তাহাদের মেসের রোয়াকে বসিয়া পড়িয়াছে, তখন অতি ধীরে ধীরে, যেন কত সংকোচ ও ভয়ের সহিত, খড়খড়িগুলি তুলিয়া আবার কে বন্ধ করিয়া দিল। তার পরক্ষণেই জানালা খুলিয়া গেল এবং বসন্তের অভীপ্সিত মূর্ত্তি যেন যবনিকার অন্তরাল হইতে আবির্ভূত হইল। তাহার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি, তাহার লীলাচঞ্চলতা বসন্তকে যেন বুঝাইয়া দিল যে, তাহারও প্রাণ এতদিন পিপাসিত হইয়া রহিয়াছে।

ইহার পরদিন হইতে প্রতিদিন বিকালে সে রাস্তায়

বিনা প্রয়োজনে বসন্ত কতবার যাতায়াত করিত এবং প্রতিদিনই জানালা হইতে দুইটি একান্ত বিচ্ছেদ-বিধুর চক্ষুর সতৃষ্ণ দৃষ্টি ভিড়ের ভিতর হইতে তাহার চক্ষুর সন্ধান করিয়া লইত। ইহাদের দৃষ্টি বিনিময়ের ভিতর কোনওরূপ ইঙ্গিত, সঙ্কেত বা পরিচয়ের আভাস ছিল না। তবুও প্রতিদিন এই চারিটি চক্ষু অন্ততঃ একবার মিলন-সুখে বিভোর হইয়া দুইটি প্রাণীর হৃদয়ের কথা কি এক ইন্দ্রজালে পরস্পরকে নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিত, তাহা তাহারাই জানে!

পূজার ছুটি ফুরাইয়াছে; ছেলের দল বাক্স বিছানা লইয়া শূন্য মেসের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীওয়ালার পাঁড়ে দরওয়ান পৈতায় প্রান্তলগ্ন চাবি-গুচ্ছের একটি বাহির করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। শূন্য বাড়ী মুহূর্ত্তের মধ্যে কলকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। বিজয় ঠাকুর চাকরকে খবর দিতে গেল; বসন্ত পাশের দোকানে লুচি ভাজিতে বলিয়া চোর-বাগানে চপ কাট্‌লেট্‌ কিনিতে গেল। মেসে উৎসব পড়িয়া গেল; কেহ গানের ছলে চীৎকার করিয়া অন্য ছাত্রের নিকট ধমক খাইল; কেহ সেই গানের তাল দিতে গিয়া তক্তপোষের ধুলা উড়াইয়া ঘরময় করিল।

পরদিন হইতে কলেজ খুলিল; মেসের উৎসাহ উৎসবও কমিয়া আসিল। বসন্ত কলেজে গেল বটে, কিন্তু মন তিষ্ঠিল না। অধ্যাপকেরা যথারীতি পড়াইয়া গেলেন, কিন্তু ঘুমন্ত মানুষের মত বসন্ত তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। সে হতাশ হইয়া একঘণ্টা পরেই চলিয়া আসিল এবং বইগুলি বিছানার উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া জানালার ধারে গিয়া এক দৃষ্টিতে রাস্তার পর-পারের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে সিটি কলেজে পড়িত; কাজেই বিজয় বুঝিতে পারিত না যে বসন্ত এমনি করিয়া পুথিগত বিদ্যার পরিবর্ত্তে একখানি সুন্দর মুখের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর বসন্ত বিকালের দিকে বড় ও-বাড়ীর দিকে চাহিয়া থাকে না। বেড়াইতে যাইতে বলিলেও বসন্ত আর আপত্তি জানায় না। তবে প্রায়ই বিজয় যে দিকে যায়, সে দিকে সে যাইতে চাহিত না। বিজয়ও সেটা সহজেই উপেক্ষা করিত; কারণ বিজয় জানিত, খেলা ঘোড়দৌড় বা বায়োস্কোপের দিকে বসন্তের আদবে 'টেষ্ট' নাই। সুতরাং সে যখন অন্যদিকে যাইতে চাহিত, বিজয় তখন বাধা দিত না। ক্রমেই সে বসন্তের প্রণয়ঘটিত রহস্যটি ভুলিয়া গেল। বসন্ত যে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া বাহিরে গিয়া কিছু-ক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসে, তাহা সে সন্দেহ করিতেও পারে নাই।

বসন্তকে বিজয় ভালবাসিত; সে যে ভাল ছেলে এ জন্য তাহার মনে ঈর্ষা আসিত না। সে নিজে পরীক্ষায় খুব ভাল পাশ না করিতে পারিলেও বসন্তের গৌরবে সে উৎফুল্ল হইত। বোধ হয় সেই জন্যই সে তাহার প্রতি একটু কর্ত্তৃত্বের দাবী রাখিতে পারিলেই তৃপ্তিলাভ করিত। বসন্ত গান গাহিত, বিজয় তাহা আদর করিয়া শুনিত—তেমন করিয়া আর কেহ শুনিত না। বসন্ত ইতিমধ্যে কোনওমতে মিল জুটাইয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছে; বিজয় হঠাৎ আসিয়া কাড়িয়া লইয়া সেটি দেখিয়াছে এবং অজস্র প্রশংসাবাদে তাহাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে। গান কি কবিতা এর কোনটিই বিজয়ের আসিত না; তাই সে ইহার অভিব্যক্তি বসন্তের ভিতর দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু তাহাদের বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ ঘটিল। একদিন সকালে বিজয় একখানি চিঠি হাতে করিয়া বসন্তের ঘরে হুড়মুড় করিয়া ঢুকিল। দরজাটি ভেজানো ছিল; একটু শব্দ হইতেই বসন্ত একখানি বই শেল্ফ হইতে টানিয়া লইয়া পড়িবার ভান করিল। বিজয় সে সব কিছুই লক্ষ্য করিল না। সে একেবারে বসন্তের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে বেশ করিয়া ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিল—"ওরে বসা, আমার বিয়ে যে রে!"

বসন্তও তাহার হাসিতে যোগদান করিল এবং চিঠিখানি বিজয়ের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বিজয় তাহাকে উল্লাসে আনন্দে

এতই বিব্রত করিয়া তুলিল যে, সে চিঠিখানি হাতে করিয়াই রাখিল, পড়িবার সুযোগ ঘটিল না।

বিজয় বলিল—"বাবা 'পুজার ছুটিতে নিজে কলকাতায় এসে মেয়ে দেখে গেছেন, ওরা অগ্রহায়ণ গায়ে হলুদ এবং ৫ই সুতহিবুক লগ্নে বিবাহঃ।"

বসন্ত বলিল—"বাঃরে—সে ত এই আস্‌ছে শুক্রবার—গায়ে হলুদ এখানে হবে ত? তা হলে ঐ জটাবেটা একবাল্‌তী হলুদ পিষে দেবে, আর আমরা হুলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তোমাকে হলদে পাখী বানিয়ে ছাড়ব।"

বিজয় হলদে পাখী সাজিবার সম্ভাবনায় আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল, তার পরেই একটু থামিয়া বলিল, "সে বোধ হয় হবে না—মা ওঁরা সম্ভবতঃ আসছেন বাড়ী, ভাড়া কর্‌তে লোক আস্‌ছে—বোধ হয় বিকেলেই এসে পড়বে।"

বসন্ত বলিল—"তা হলই বা; আমরা বুঝি চুপ করে থাক্‌ব? কনে দেখতে পেলুম না, আবার গায়ে হলুদটায়ও ফাঁকিতে ফেল্‌তে চাও, বেশ লোক যা হোক তুমি।"

ইহাদের আনন্দ কোলাহল শুনিয়া অপর ঘরের নলিনী, পরেশ ও সুধা আসিয়া জুটিল। তাহারা বিবাহের গন্ধ পাইয়া মিষ্টান্নের জন্য নাচিয়া উঠিল। বসন্তের সঙ্গে তাহারাও সকলে 'কনে' দেখার সুযোগ না পাওয়ার জন্য যথেষ্ট অনুযোগ করিল। 'কনে' দেখিতে কেমন? বয়েস কত? নাম কি? লেখা পড়া জানে কি না ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিয়া বিজয়কে তাহারা বিব্রত করিয়া তুলিল।

বিজয় বলিল, "তোদের অত কথার জবাব দেওয়া একজন লোকের পক্ষে অসম্ভব। আগামী ৫ই অগ্রহায়ণ তিয়াত্তরের দুই নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান করিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। সত্বর অর্দ্ধ-আনার টিকিট সহ আবেদন করুন।"

সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। হাসিল না কেবল বসন্ত। তাহার মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের সামনের বাড়ীর নম্বর যে ৭৩।২, এ সংবাদ সে রাখিত। সুতরাং বিজয়ের সহিত যে কার্ত্তিক বাবুর কন্যার বিবাহ হইবে এ কথা তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। বিজয় এ কথাটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিল—"ওহে কার্ত্তিক বাবুর ছেলে আমাদের কলেজের অনিলই এই সম্বন্ধ করেছে, বুঝলে।"

বসন্তের আকস্মিক পরিবর্ত্তন বিজয়ের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহার আনন্দোচ্ছ্বাসও কমিয়া গেল। ছাত্রেরাও কলেজের সময় হইল বলিয়া একে একে চলিয়া গেল।

"বসন্ত, তুমি হঠাৎ বিমর্ষ হলে যে?"

"না, বিমর্ষ আর কি?"

"তোমায় সত্যি বলছি বসন্ত, এ বিবাহে আমার কোনই হাত নেই। সেদিন অনিলকে কথায় কথায় তার বোনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন করেছিলাম সেটা তুমি জান—তাতেই সে বোধ হয় মনে করলে যে আমি একজন 'ক্যাণ্ডিডেট'। তার পর সে একটু একটু করে আমার ঠিকানা, বাবার নাম ইত্যাদি জেনে নিয়েছিল, একদিন বলেওছিল—এখন মনে পড়চে—যে আমার বাবাকে তার বাবা জানেন। কার্ত্তিক বাবু সেক্রেট্যারিয়েটে চাকুরী করেন কি না, বাবা ডেপুটী হবার সময় পরিচয় হয়েছিল।"

বসন্ত একটু হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বিজয়কে বলিল, "আমার হঠাৎ ভয়ানক মাথা ব্যথা করচে, বোধ হয় জর হবে।"—এই বলিয়া জর আসিবার ভাবটা অভিনয় করিয়া দেখাইল।

বিজয়ও কতকটা তাহাই বুঝিল। অন্য কারণ কিছু যে থাকিতে পারে, তাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইল না। বসন্ত একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিলেও হইতে পারে। কিন্তু কেন? সে কার্ত্তিক বাবুর মেয়েটিকে জানালা দিয়া দেখিয়াছে? সে ত একটা অন্যায় কায করিয়াছে—অমন ছেলেমানুষি করিবার বা তাহাতে প্রশ্রয় দিবার মত বয়স ত তাহাদের নয়। তাহারা বড় হইয়াছে, এখন দায়িত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছে। যাহাকে বিবাহ করিবে না, এমন একটি অবিবাহিত কন্যার দিকে তাকাইয়া

থাকা কোনও ভদ্রলোকেরই উচিত নহে। বসন্ত লেখাপড়া শেষ না করিলে, তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না; অথচ কার্ত্তিক বাবুর কন্যা বয়স্কা। এমন অবস্থায় তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাবে আপত্তির কি থাকিতে পারে? এইরূপ একটা চিন্তার ধারা বিজয়ের মনের মধ্য দিয়া দ্রুত বহিয়া গেল।

বসন্তকে কিছু আহার করিতে নিষেধ করিয়া, বিজয় কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেল। বসন্তও দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

৩

বিজয়ের বিবাহ হইয়া গেল। বসন্তই কেবল সে বিবাহে গেল না। সে গায়ে হলুদের আগের দিন হঠাৎ বিছানাপত্র বাঁধিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না। বিজয় ইহাতে অবশ্য অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিল। তাহার দুঃখের কারণ যে বসন্ত তাহাকে একটি কথাও না বলিয়া চলিয়া গেল। দুঃখের সময় বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি না পাইলেও তাহাতে মনে তেমন ক্ষোভ হয় না। কেননা দুঃখ দেখিলে পথের মানুষও একটু দাঁড়াইয়া সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া যায় না; কিন্তু সুখের সময়, উৎসবের দিনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর অভাবে হৃদয়ে যে আঘাত লাগে তাহাতে যেন উৎসবের সমস্ত আনন্দ ম্লান হইয়া উঠে। বসন্তের অভাবে বিজয়ের প্রাণটা বড় আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া উঠিল। সে তাহাকে কিছু না বলিয়া কহিয়া চলিয়া গিয়াছে, এজন্য অভিমানও হইল। বিজয় ত জানিত না, কি দুঃসহ বেদনা লইয়া বসন্ত চলিয়া গিয়াছে।

বসন্তও ব্যর্থ ক্ষোভের নিষ্পেষণে জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়ের উপর তাহার যে খুব রাগ হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। কারণ বিজয়ের ত কোনও দোষ ছিল না। তাহার প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার সে কোন দিন বিজয়কে বলিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই। কারণ সে জানিত যে বিজয় কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না, এমনই একটা গর্হিত কাজ সে করিয়া ফেলিয়াছে।

কার্ত্তিক বাবুর কন্যা আর দুদিন বাদেই বিজয়ের হইবে—এ চিন্তায় তাহার সমস্ত হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। প্রথমেই সে তাহার উপর রাগ করিল; ঘরের জানালা দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়া শয্যার আশ্রয় লইল। কিন্তু ঘরের জানালা বন্ধ করা যত সহজ, বিধাতার নিয়মে হৃদয়ের জানালা বন্ধ করা তত সহজ নহে। তাহার হৃদয় শতবার যেন সেই বিরহ-কাতর চক্ষু দুইটির অন্বেষণে ধাবিত হইল। আর সে অবলা বালিকারই বা দোষ কি? হিন্দু সমাজের বিবাহে কন্যার স্বাধীনতা কোথায়? পিতা যাহার করে অর্পণ করিবেন, তাহারই গলদেশ মাল্য এবং বাহুযুগে বেষ্টন করিতে হইবে, এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বিরুদ্ধে একজন সামান্য বালিকা কি সাহসে দাঁড়াইবে?

বসন্ত তাহার নিজের অপরাধ সম্বন্ধেও অন্ধ ছিল না। সে কেন এমন করিয়া সে বালিকাকে প্রলুব্ধ করিয়া এতদূর টানিয়া আনিল? তাহারই ত যত দোষ। যদি এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, তবে কেনই বা সে বিবাহের জন্য চেষ্টা করিল না? বিজয় কোনও কোনও বিষয়ে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু আগে হইতে চেষ্টা করিলে হয়ত তাহারই সহিত এ বিবাহ হইতে পারিত। বিজয়ের পিতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বসন্তের পিতা পল্লীগ্রামের জমিদার। বিজয়ের পিতা বিনা পণে পুত্রের বিবাহ দিতে প্রস্তুত; তাহার পিতা হয়ত পাঁচ সাত হাজার চাহিয়া বসিতেন। তাহা হইলেও ত চেষ্টা করিয়া দেখা যাইত! সে চেষ্টা সে করিল না কেন? এখন সব বিফল; তাহার চোখে জল আসিল।

এই সকল চিন্তায় বসন্তের মন অস্থির করিয়া করিয়া তুলিল এবং সে সকলের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। নিষ্ফল ক্রোধের নির্য্যাতনে বিড়ম্বিত হইয়া সে অবশেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

বাড়ীতে গিয়া সে তাহার পিতাকে বলিল যে তাহার মাথার অসুখ হইয়াছে, সে আর কিছুতেই পড়িতে পারিতেছে না। কথাটা যে একেবারেই মিথ্যা তাহা নহে। চিন্তায় চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। তাহার চোখ বসিয়া গিয়াছিল, ললাটের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল এবং সমস্ত মুখ মণ্ডল এমন পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল যে তাহাকে দেখিবা-মাত্র তাহার পিতা ও মাতা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ মনে করিলেন, বিশ্রাম ও শুশ্রূষার গুণে তাহাকে শীঘ্রই ভাল করিয়া তুলিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। বসন্ত ক্রমশঃ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কিছু দিন পরেই কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

চোরবাগানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া বসন্তের পিতা রামকমল বাবু পুত্রের চিকিৎসার জন্য সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিজয় এতদিন বসন্তের কোনও খোঁজই লয় নাই—অভিমান করিয়াই সে সংবাদ লইতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু যখন শুনিল যে বসন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়া রহিয়াছে, তখন সে তাহাকে দেখিতে ছুটিয়া গেল।

বসন্ত তাহাকে দেখিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল; কিন্তু পরক্ষণেই মাথার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া শুইয়া পড়িল। বিজয় অনেকক্ষণ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল।

প্রতিদিন সে কলেজ হইতে চোরবাগানের বাসায় যায় এবং অনেকক্ষণ কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে। রামকমল বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া সে ডাক্তার করকে আনিয়া হাজির করিল। বিজয়ের আগ্রহ দেখিয়াই ডাক্তার কর বসন্তকে অত্যন্ত যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার কর বিজয়ের শ্বশুরের বন্ধু। তাঁহার চিকিৎসার গুণে বসন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল, এবং একটু আধটু বেড়াইতে বাহির হইল।

একদিন সে তাহাদের মেসে গিয়া পড়িল; তখনও বিজয় কলেজ হইতে আসে নাই। মেসে তখন প্রায় কেহই ছিল না। বসন্ত একবার তাহার ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে গেল এবং পূর্ব্বের অভ্যাস মত জানালাটি কম্পিত হস্তে খুলিয়া ফেলিল। রাস্তার অপর পারের বাড়ীর জানালাটিও বন্ধ ছিল। বসন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া সেই জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে জানালা আজ খুলিল না এবং কেহই আজ আর সে জানালার পাশে দাঁড়াইল না। বসন্ত ভাবিল, 'আজ সে পরের বধূ; রুদ্ধ জানালা তাহারই অবরোধের প্রথম নিদর্শন।'

বিজয় আসিল; হঠাৎ বসন্তের ঘর খোলা দেখিয়া, সে সেইদিকে আসিয়া দেখিল বসন্ত মুক্ত বাতায়নের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে; বিজয়ের আগমন সে বুঝিতে পারে নাই। বিজয় ধীরে ধীরে গিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। আজ বসন্ত তাহার চোখ জানালা হইতে ফিরাইয়া লইল না। বিজয়ের সহানুভূতি তাহাকে স্পর্শ করিল এবং যখন সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিজয়ের দিকে ফিরিল, তখন তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল। দুঃখের অনলে পুড়িয়া তাহার লজ্জা ভস্মীভূত হইয়াছিল। সে আজ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিজয়কে বলিল, "বিজয় দা, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা সুখী হও।"

বিজয় বুঝিল, তোমরা বলিতে সে আর কাহার কথা বলিতেছে। সে বসন্তের হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "এতদিন পরে, তবু ভাল—"

বসন্ত একটু সামলাইয়া বলিল, "এতদিন পরে নয়, ঐটি তুমি ভুল বুঝেছ। আমি তোমার বিবাহে উপস্থিত না থাকতে পারলেও, তোমাদের মঙ্গল কামনাই করেছি এটা বিশ্বাস কোরো।"

"আচ্ছা তা যেন হলো, বসন্; একটা বিষয় এখনও আমার মনে খট্‌কা লেগে আছে; তুই আমায় না বলে' চলে গেলি কেন? এটি কি তোমার উচিত হয়েছে বলতে চাও?"

বসন্ত একটু মিথ্যা বলিল; সে বিজয়ের দিক হইতে চক্ষু নামাইয়া বলিল, "উচিত কি অনুচিত তা জানিনে বিজয়দা। তবে তোমাদের উৎসবের মধ্যে আমার মাথার ব্যামো নিয়ে তোমাকে জ্বালাতন করে তুল্‌তে আমার বিশেষ আগ্রহ হ'বার কোনও কারণ ছিল না।"

বিজয়ের খট্‌কা দূর হইল; তবুও সে অনুযোগের স্বরে বলিল, "আমার বিবাহের উৎসবটা এমন করে' মাটি করে' দেওয়ার চেয়ে সেটা যে মন্দ হ'ত, তা আমার মনে হয় না।"

বসন্ত জানিত যে বিজয়ের এই দৈন্যের মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। অনেক দিন পরে বিজয়ও বসন্তকে আবার তেমনই বন্ধুত্বের পদে বরণ করিয়া লইল; তাহাদের মাঝখানে যে ব্যবধান ছিল, তাহা খসিয়া পড়িয়া গেল।

বিজয় অতি আগ্রহের সহিতই তাহাকে বলিল, "বসা, আজ চল্ না তোর বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল; বিজয় দেখিতে পাইল না যে বসন্ত তাহার প্রস্তাবে চমকিয়া উঠিল।

"আর একদিন হবে বিজয়দা; আজ মাথাটা বড় ক্লান্ত বোধ হচ্চে।"

বিজয় ইহার পর আর কথা বলিতে পারিল না; কিন্তু একটু বিমর্ষ হইল।

সন্ধ্যার পর যখন বসন্তকে পৌছাইয়া দিয়া বিজয় মেসে ফিরিতেছিল, তখন হঠাৎ রাস্তায় রামকমল বাবুর সহিত তাহার দেখা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকাল ওকে কেমন দেখ্‌ছো বাবাজি?"

বিজয় হাসিয়া বলিল, "ভালই ত; আপনি কেমন বোধ করেন?"

"আমিও ত মন্দ বুঝ্‌ছি না; ভাবচি এখন কোথাও ওকে পাঠাতে হবে। দেখ, একটা মজার কথা আছে, বাবাজি; ডাক্তার কর আমায় কাল বল্‌ছিলেন যে ওর একটা বিবাহ দিলে মন্দ হয় না।"

বলিয়া রামকমল বাবু হাসিতে লাগিলেন।

বিজয় উৎসাহের সহিত বলিল, "তা হলে' ত বেশ হয়, আমি কাল থেকে মেয়ে খুঁজতে লেগে যাব। অনেক ঘটক আমার কাছে আসে; মুখের কথা বল্‌লে তারা অমন দু'শো মেয়ের খোঁজ এনে দেবে এখন।"

রামকমল বাবু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ছেলেকে আজ জিজ্ঞাসা করেছিলাম; সে ত একেবারে নারাজ, বাপু। দেখ যদি তাকে বলে করে রাজি করতে পার, ত আমার অমত নেই।"

"সে আমি দেখে নেবো; আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন। ডাক্তার কর যখন বলেছেন যে, বিয়ে দেওয়া দরকার, তখন বিয়েটা যেমন করে' হোক্ দিতেই হ'বে। নয় ত অসুখ ভাল হ'বে না যে।"

রামকমল বাবু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন হইতে বিজয় বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। বসন্ত প্রথম প্রথম সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; তার পর যখন দেখিল যে বিজয় তাহার জেদ কিছুতেই ছাড়ে না, তখন সে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

একদিন বিজয় তাহাকে মেসে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিজয়ের ঘরে বসিয়া দুজনে গল্প করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বিজয় সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল এবং নিজের চেয়ারখানি তাঁহাকে দিয়া খাতা পুঁথি ঠেলিয়া তক্তপোষে আপনার জন্য একটু স্থান করিয়া লইল। ভদ্রলোক একবার সে ঘরের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া লইলেন; তাহার পর পকেট হইতে চুরুটের বাক্স ও দেয়াশলাই বাহির করিয়া চুরুট ধরাইলেন।

বিজয় বসন্তের পরিচয় করিয়া দিল; বসন্তের কানে কানে বলিল, "আমার শ্বশুরের ভগ্নীপতি।" বসন্ত উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; তিনি বলিলেন, "বসো বাবা, বসো।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি বসন্তকে দেখিলেন; তার পর বলিলেন,"তোমার শুন্‌ছি বাবা বিবাহেতে বড় আপত্তি ?"

প্রথম পরিচয়ে একজন ভদ্রলোককে এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়িতে দেখিয়া বসন্ত কিছু বিরক্ত হইল। সে কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

আগন্তুক বলিলেন, "শোনো বাবা, আমি আসছি মেদিনীপুর থেকে, মেয়ের বিয়ের চেষ্টায়। জানই ত, বাবা, আজকাল মেয়ের বিয়ে কি ব্যাপার! বিজয় বাবুর কাছে তোমার কথা শুনে বড় আশা হয়েছিল; মনে করলাম তোমার বাবার হাতে পায়ে ধরে' কাজটা ঠিক করে' ফেল্‌তে পারব। কিন্তু কাল তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে' যা শুনলুম, তাতে নিরাশ হ'য়ে পড়েছি। তিনি বল্লেন, 'ছেলের মত নেই'। বিজয়ও বল্লেন, "আমরা হার মেনেছি মশায়।"

আগন্তুক থামিলেন; বসন্ত মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আমার শরীর অসুস্থ, হয়ত এ বছর আমার পরীক্ষা দেওয়াই হবে না; এখন অন্য কথা ভাব্‌বার সময় নেই।"

"কিন্তু বাবা বুঝে দেখ, তোমার যখন ভাববার সময় হবে, তখন যে আমার বড় অসময় হয়ে পড়বে। আমার মেয়েটি বড় হয়েচে, আর ত রাখ্‌তে পারিনে।"

বসন্ত ভাবিল, তার আমি কি করিতে পারি? কিন্তু কিছু বলিল না।

তিনি আবার বলিলেন, "আমি তোমায় কিছু জোর করে' ধরে' নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিতে পারিনে। তবে আমার বড় আকিঞ্চন যে তোমার মত সৎপাত্রে মেয়েটিকে দিতে পারি বাবা। তুমি অগত্যা মেয়েটিকে দেখ; মেদিনীপুর যেতে না চাও এখানে এনে দেখাতে পারি। পছন্দ না হয় তখন যা ইচ্ছে বলতে পার—মেয়েটি আমার বড় ভাল। যেমন দেখ্‌তে, তেমনি কাজে কর্ম্মে।"

মেয়ের বর্ণনায় বসন্তের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। সে এই প্রসঙ্গ কোনও মতে চাপা দিবার জন্য বলিল, "আচ্ছা আমি ভেবে দেখি; বিজয়দাকে দিয়ে আপনাকে জানাব।"

ভদ্রলোক একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিদায় লইলেন।

৪

বসন্ত পরীক্ষা দিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া গত দুই মাসকাল বারাণসী ধামে বাস করিতেছে। সেখানকার চিরপ্রসিদ্ধ কোলাহলময়ী শান্তি তাহার হৃদয়ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইয়া দিল। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দিরে যখন লোক ধরে না, তখনও সেই জনতার মধ্যে সে অপূর্ব্ব বিজনতার শান্তি বোধ করিত। দশাশ্বমেধের ঘাটে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যায় যখন গঙ্গার কলতান ডুবাইয়া দিয়া সহস্র ঘণ্টায় বিশ্বদেবের আরতি বাজিয়া উঠিত, তখনও সে আপনার সুখ দুঃখের স্মৃতি লইয়া একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। বাহিরের বিশ্ব তাহাকে সে সমাধি হইতে বিমুক্ত করিতে পারিত না। এমনই ভাবে সে তাহার সেই সুখের দিন কয়েকটির মধুর স্মৃতি বহিয়া বহিয়া কাটাইয়া দিল। তাহার দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বিশ্রাম ও অবসর সেই দুইটি চক্ষুর বিষাদভরা দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

ক্রমে যখন তাহার মন একটু স্থির হইয়া আসিল, তখন আর বারাণসী ভাল লাগিল না। গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে একদিন এলাহাবাদ যাইবার জন্য ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিল। মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল করিতে হইবে। সকল যাত্রীতে মিলিয়া ষ্টেশনে মহা কলরব তুলিয়াছে, এখনি কলিকাতার যাত্রীগাড়ীও আসিবে। যাহারা কলিকাতার অভিমুখে যাইবে, তাহারা টিকিট কিনিয়া গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আপ ট্রেণের কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল।

বসন্ত প্লাটফরমে পায়চারী করিতেছিল। কলিকাতার গাড়ী আসিয়া চলিয়া গেল। আপট্রেণও আসিল; গাড়ী অনেকক্ষণ থামিবে। সুতরাং বসন্ত গাড়ীতে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইল না। একজন আরোহী

মধ্যম শ্রেণীর একখানি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া চাবিওয়ালা চাবিওয়ালা বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। স্বরটি বসন্তের বিশেষ পরিচিত; সে সেদিকে চাহিবামাত্র বুঝিল, বিজয়। বিদেশে অকস্মাৎ পরিচিতের দর্শন পাইলে যে পুলকে আত্মহারা করিয়া ফেলে, বসন্ত সেই পুলকের বশীভূত হইয়া তাহার দিকে ছুটিল। চাবিওয়ালা চাবি খুলিয়া দিল; বিজয় প্ল্যাটফরমে নামিয়া বসন্তকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিল। তাহার চেহারা একটু ভাল হইয়াছে দেখিয়া বিজয় আনন্দ প্রকাশ করিল। বিজয় জানিত যে বসন্ত বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কাশীতে আসিয়াছে, সুতরাং সে বসন্তকে সেখানে দেখিয়া বিস্মিত হইল না। বিজয়কে দেখিয়া বসন্ত বরঞ্চ বিস্মিত হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "পরীক্ষা দিচ্চ না, বিজয়দা?"

"না ভাই, এবারে আর হলো না। এক দফা বিয়ে করে' বয়ে গেছি। তারপর তুমি এই নানা খানা করে' আমাকে কি কম ভোগালে ভাই? সত্যি, বসন্, তুমি এই মাথার ব্যামো ক্যামো না করে বস্‌লে বোধ হয় এবারে তরে' যেতে পারতাম।"

বসন্ত তাহা জানিত; তাই সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুধু বলিল, "আস্‌ছে বছর দেখা যাবে। তার পর কোথায় যাওয়া হচ্চে?"

"ওঃ তা বলিনি বুঝি। দিল্লী যাচ্চি বউকে নিয়ে। আমার শ্বশুরের ওখানে রাখতে যাচ্চি। তার পর, তোমার কতদুর গমন হবে?"

বিজয় তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে শুনিয়া বসন্তের ইচ্ছা হইল, প্লাটফরম হইতে ছুটিয়া পলায়। সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বিজয় তাহাকে ধাক্কা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি কোথায় যাওয়া হচ্চে?"

বসন্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "এলাহাবাদ।"

"ব্যস, তা হলে ঝাঁ করে' আমার গাড়ীতে উঠে বোসো ত! আমি রাত্রিকার জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসি।" বলিয়া বিজয় বসন্তকে টানিতে টানিতে গাড়ীর মধ্যে উঠাইল। বসন্ত একবার মিনতি করিয়া বলিল, "বিজয়দা, খাবার আমি নিয়ে আসছি, তুমি বোস, দোহাই তোমার।"

বিজয় তাহাকে জোর করিয়া গাড়ীর ভিতরে পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং ছুটিয়া খাবারের দোকানের দিকে গেল। যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "তোর বৌদিকে ছেড়ে যেন পালাস না।"

বসন্ত নিস্পন্দভাবে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী যে রমণী সেই বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসিয়াছিলেন, তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। বসন্তের মনে হইল যেন এখনি তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। সে কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

বিজয় খাবার কিনিয়া ফিরিয়া আসিতেই বসন্ত নামিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বিজয় তাহাকে কোনও মতে নামিতে দিল না। কুলিকে সঙ্কেতে বসন্তের মালপত্র আনিতে বলিয়া বিজয় খাবারের পাত্রটি স্ত্রীর হস্তে দিল।

"ও হো তোমাদের পরিচয় করে' দেওয়া হয়নি। আজকালকার নিয়মানুসারে কেউ পরিচয় না করে' দেওয়া পর্য্যন্ত যে আলাপ করতে নেই, সে কথাটি আমার মনে ছিল না। ইনি হচ্চেন শ্রীমান বসন্তবিহারী দত্ত, আমার বন্ধু, বাংলা কথায় আমার ছোট ভাই। আর ইনি হচ্চেন গিয়ে আমার—শ্রীবিষ্ণু—তোমার বৌদি। এই বারে নাও।"

বসন্ত নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল; বিজয় একটু অপ্রতিভ হইয়া তাহার স্ত্রীর দিকে তাকাইল। তিনি ততক্ষণ দুইখানি পাতায় খাবার সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বিজয়ের দিকে একখানি পাতা সরাইয়া দিতেই সে বলিল, "বাঃ আগে তোমার দেওরকে দেও।"

বিজয়ের স্ত্রী মাথার কাপড় একটু টানিয়া, একখানি পাতা দু'হাতে লইয়া বসন্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, বসন্ত মোগল সরাইয়ের দ্রুত পলায়মান সৌধরাজির দিকে অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত তাকাইয়া ছিল।

বিজয়ের স্ত্রী খাবারের পাতা হাতে করিয়া যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সে উঠিয়া নতমুখে একটি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সরসী—বিজয়ের স্ত্রী—মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া প্রতি নমস্কার করিল এবং হাসিয়া বলিল, "কিছু খেয়ে নিন।"

বসন্ত নিস্তব্ধ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই, ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। বিজয় ও তাহার স্ত্রী মনে করিল, গাড়ীর বেগের জন্য বসন্ত পড়িয়া গেল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তাহার মনে অকস্মাৎ এমন একটি সংশয়ের ধাক্কা খাইল যে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।—এ ত সে নহে। প্রতিদিন যাহার মুখখানি দেখিয়া তাহার আকুল পিপাসা চরিতার্থ হইত, এ ত সে নহে। সে তবে কে?

যন্ত্রচালিতের মত বসন্ত সরসীর হস্ত হইতে খাবার লইয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার চোখ মুখ এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতায় ভরিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার খাবার ফুরাইল। সরসী আবার তাহাকে খাবার আনিয়া দিল। বিজয় মনে করিল, "ভায়া আমার এবার খাদ্যের প্রতি সুবিচার করতে শিখেচে; পরিবেশনের গুণে ক্ষুধা বাড়ে কি না!"

সে খাইতে খাইতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। সরসীও সে হাসির প্রত্যুত্তরে হাসিল।

বসন্ত আপন মনে খাইতেছে; আবার যখন তাহার পাত্র শূন্য হইল, তখন সরসী জিজ্ঞাসা করিল, "আর দেবো—অন্ততঃ একটা মিহিদানা?"

বসন্ত মাথা নাড়িয়া বুঝাইল আর চাই না। সরসী কিন্তু আর একটি মিহিদানা তাহার পাতের উপর দিল। বসন্ত আর আপত্তি না করিয়া সেটিও খাইল। সরসী কুজো হইতে জল গড়াইয়া বসন্তের সম্মুখে ধরিল; বসন্ত অন্যমনস্কভাবে জলের গেলাসটি লইতে গিয়া সরসীর গায়ে সমস্ত জলটি ঢালিয়া ফেলিল। বিজয় ও তাহার স্ত্রী হাসিয়া আকুল হইল; বসন্ত অপ্রতিভ ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে কেবল একটি প্রশ্ন হইতেছিল—সে কে তবে? ইনি যদি কার্ত্তিক বাবুর কন্যা, তবে তিনি কে? বিজয় তাহার চিন্তার সূত্র কাটিয়া দিয়া বলিল, "গত সপ্তাহে তোমার বাবার এক চিঠি পেয়েছি, তিনি কি লিখেছেন জান?"

বসন্ত তাহার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল।

বিজয় তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "তোমার একটা বিয়ে শীঘ্র জুটিয়ে দেবার জন্যে।"

সরসী একটু হাসির পুলকে জানাইয়া দিল 'আমিও তার মধ্যে আছি।'

বিজয় বলিল, "বড় ভাল করতে, বসন, যদি কেদার বাবুর মেয়েটিকে বিয়ে করতে।"

সরসী সায় দিল, "পিসে মশায় নিজে এসে এত করে বল্লেন।"

বিজয় বলিল, "সে মেয়েটি বড় ভাল ছিল কিন্তু।"

সরসী বলিল, "কেন, উনি ত তাকে দেখেছেন।"

বসন্ত যেন আপনার মনে বলিল, "আমি দেখেছি? কই আমি ত কোনও মেয়ে দেখি নি।"

সরসী বিজয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন আমাদের বাড়ী থেকে ওঁরই পড়বার ঘর দেখা যেত না? আমরা ত ওঁকে দেখেছি।"

এবার আর বসন্তের বুঝিতে বাকী রহিল না। মাঘমাসের দিনেও তাহার কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল।

সরসী বলিল, "এই ২৭শে তার বিয়ে!"

বসন্ত তাহার চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি সরসীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া, একটু অতিরিক্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে ২৭শে?"

সরসী সে আগ্রহের অর্থ বুঝিতে পারিল না; বলিল, "আমার পিস্‌তুতো বোন্—প্রতিভার। আমরা ত কাল মেদিনীপুর যাব, ঠিক ছিল; তার পর বাবার টেলিগ্রাম সব উল্‌টে দিলে!" সরসী বিজয়ের মুখের দিকে চাহিল।

"কেদার বাবু আমাকেও বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন সেখানে যাবার জন্যে। ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ের জন্য কি বিব্রতই হয়েছিলেন। আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।"

সরসী বুঝিল, তাহাকেও একটু ইঙ্গিত করা হইল। সে বিজয়ের মুখের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

বসন্ত এসব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। চুণার ষ্টেশনে যখন গাড়ী থামিল, তখন বসন্ত হঠাৎ বিজয়কে বলিল—"আমার এখানেই নাম্‌তে হবে; আমি পরের ট্রেণে কল্‌কাতায় ফিরে যাচ্ছি।" বলিয়াই সে নামিয়া পড়িল এবং কুলী ডাকিয়া তাহার জিনিষপত্র নামাইয়া লইল।

"বৌদি, আসি" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া বসন্ত অদৃশ্য হইল। বিজয় আপত্তি করিবার অবসর পাইল না; সে তাহার স্ত্রীকে দুঃখের স্বরে বলিল, "ওর মাথার অসুখ এখনও কিচ্ছু কমে নি।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা স্বামী স্ত্রীতে নীরব রহিল।

৫

মেদিনীপুর ডাকবাঙ্গলায় বসন্ত অধীরভাবে পায়চারি করিতেছিল। সে কোনও মতেই মতিস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে কেদার বাবুর সহিত কি প্রকারে দেখা করা যাইতে পারে। প্রতিভার বিবাহের আর দুই দিন মাত্র বিলম্ব আছে; এখন যদি সে বলে, আমি বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক আছি, তাহাতেই কি একটা স্থির সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে? হয়ত যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, সে সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যপাত্র। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বসন্তকে গ্রহণ করিবার কি এমন সম্ভাবনা থাকিতে পারে? সে ভাবিতে লাগিল, মেদিনীপুর আসিয়া ভাল করে নাই।

এমন সময় "Hallo Mr Dutt বলিয়া একজন সাহেব বেশী ভদ্রলোক তাহার করমর্দ্দন করিলেন। সে দেখিল ডাক্তার কর। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

"আপনি এখানে?"

"তুমি এখানে?"

"হ্যাঁ আমি এখানে একটু প্রয়োজনে এসেছিলাম।"

"আমি এসেছি যে জন্যে বুঝতেই পার্চ্ছ—রোগী দেখ্‌তে। কেদার বাবুর একটি মেয়ে বড় পীড়িত।"

বিজয় ও বসন্তের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া ডাক্তার কর মনে করিয়াছিলেন যে কেদার বাবু নিশ্চয়ই বসন্তেরও সুপরিচিত।

"কেদার বাবুর মেয়ে বড় পীড়িত?"—আস্তে আস্তে বসন্ত এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিল।

"হ্যাঁ তার ফিট হচ্ছে, পরশু বেচারীর বিয়ে—সব ঠিকঠাক—কি বিপদ।"

"আপনি কি তাকে দেখে এলেন?"

"হ্যাঁ, ষ্টেশন থেকে আগে তাকে দেখতে গেছ্‌লুম।" —বলিতে বলিতে ডাক্তার কর অপর একটি কক্ষের দিকে গেলেন। সেখানে তাঁহার খানসামা জিনিষপত্র সব পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সে অগ্রসর হইয়া ডাক্তার করের টুপী ও ছড়িটা লইল।

বসন্ত সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, রোগীর অবস্থা কেমন?

ডাক্তার কর তাহার সাগ্রহ দৃষ্টি দেখিয়া বলিলেন, "উপস্থিত কোনও আশঙ্কার কারণ আছে বলে' ত মনে হয় না। তবে হার্ট বড় দুর্ব্বল; বেশী ফিটটিট হলে কি হয় বলা যায় না।"

ডাক্তার কর বিশ্রাম করিতে গেলেন; বসন্ত ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে গেল। অনেকক্ষণ পরে যখন সে ফিরিল, তখন ডিনার খাইয়া ডাক্তার কর শুইয়া পড়িয়াছেন। বসন্ত খানসামাকে বলিল, সে কিছু খাইবে না। "বহুত্ আচ্ছা" বলিয়া খানসামা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

বসন্ত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। রাত্রি দুইটার সময় বারান্দায় জুতার শব্দ শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। আগন্তুক ডাক্তার করের দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। ডাক্তার কর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?"

"আমি মণি; প্রতিভার আবার ফিট হয়েছে; আপনাকে বাবা এখনি যেতে বলেছেন।"

"এত রাত্রে গিয়ে আর কি হবে? সেই ঔষধটা আর এক দাগ খাইয়ে দাওগে।"

"সে খাওয়ান হয়েচে; এখন অবস্থাটা বড় খারাপ বলে বোধ হচ্চে। আপনি শীগ্‌গির উঠে আসুন দয়া করে।"

বসন্তও কম্বল জড়াইয়া ডাক্তার করের দরজায় আসিল।

ডাক্তার কর দরজা খুলিয়া আগন্তুককে বলিলেন "এত রাত্রে আমার যাওয়া অসম্ভব। কাল সকালে যাওয়া যাবে, বুঝলে?"

কেদার বাবুর পুত্র কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। নিকটাগত বিপদের ঘনীভূত ছায়া তাহার হস্তস্থিত লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখমণ্ডলে লক্ষিত হইল। ডাক্তার কর এতক্ষণ বসন্তকে লক্ষ্য করেন নাই, সে মণির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বসন্ত অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বলিল, "আপনার পায়ে পড়ি, আপনি একবার দেখে আসুন।"

মণি অবাক্ হইল। ডাক্তার কর একটু চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন, "এই শীতকালের অন্ধকার রাতে বুড়ো মানুষকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমবে, তা হবে না, বাপু। তুমিও এস; তা হ'লে আমি যাচ্ছি।"

বসন্ত বলিল, "আমি এখনি প্রস্তুত হচ্ছি।"

ডাক্তার করও খানসামাকে ডাকিয়া উঠাইলেন এবং কাপড় জুতা পরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ডাক্তার করের সহিত রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মত কখন যে বসন্ত শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। নিশাশেষে ঝরা শেফালির মত বালিকার কুসুম-পেলব কান্তি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। তাহার স্পন্দহীন দেহ শয্যার সহিত যেন মিলাইয়া গিয়াছিল। বসন্ত তাহার নাকের কাছে ঔষধ ধরিতেই অক্ষি-পল্লব একটু কম্পিত হইয়া উঠে; আবার দেহ অসাড় হইয়া পড়ে। ডাক্তার কর পুনঃ পুনঃ নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একবার সে চক্ষু মেলিল; চক্ষুর দৃষ্টি চারিদিকে সঞ্চালিত হইয়া বসন্তের উপর পতিত হইল। সে দৃষ্টিতে বসন্তের চোখে অশ্রুধারা বহিল; বালিকা এক-দৃষ্টে শুধু তাহাকেই দেখিতে লাগিল। তারপর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ডাক্তার কর প্রত্যূষে বিদায় লইয়া ডাকবাঙ্গলায় আসিলেন। বসন্তকে কেদার বাবু যাইতে দিলেন না। ডাক্তার করও বলিলেন, "বসন্ত শুশ্রূষা করে ভাল।"

প্রতিভার ঘুম ভাঙ্গিলে সে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং গতরাত্রিতে ফিট হইবার পূর্ব্বে যেমন ছটফট করিয়াছিল, তেমনই ছটফট করিতে আরম্ভ করিল। বসন্ত আবার গিয়া তাহার নাকে ঔষধ প্রয়োগ করিল। এবারে রোগী ঘুমাইল না; শুধু বসন্তের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

* * * * *

প্রতিভার বিবাহের দিন ফিরিয়া গেল। সে একটু সুস্থ হইলেই বসন্ত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে জানাইল যে, সে কেদার বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছে। রামকমল বাবু আনন্দভরে সেই দিনই কেদার বাবুকে চিঠি লিখিলেন।

কেদার বাবু পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ফাল্গুনে এক শুভ সন্ধ্যায় কেদার বাবুর দুই কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। প্রতিভার জন্য অন্য যে পাত্র স্থির করা হইয়াছিল, তাহার সহিত সুরমার বিবাহ দিতে কেদার বাবুকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

বিবাহের পর প্রতিভা একদিন বসন্তকে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে বলিয়াছিল, "তুমি সেদিন শেষরাত্রে না আসিলে আমার সে রাত্রি প্রভাত হইত না। তুমিই আমার জীবনের শুকতারা।"

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

অভিভাষণ *

যে সম্ভাবিত-সজ্জন-সঙ্ঘের সুবৃহৎ সভায় নেতৃত্ব করিবার জন্য আমি নিযুক্ত হইলাম, ঐ পদের আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এ কথার উল্লেখ যে বাহুল্য, ইহা শিষ্টসম্প্রদায়-সম্মত বিনয় প্রকাশের জন্য মিথ্যা বাগাড়ম্বর নহে, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য কথা এবং অন্তরের একান্তে—যেখানে সকল সত্য মিথ্যা আপনা-আপনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, আমার হৃদয়ের সেই নিভৃত নির্জ্জনে—এই সত্য স্বপ্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমি দ্বিধাহীন চিত্তে আপনাদের সম্মুখে উহা নিবেদন করিতেছি। যোগ্যতা এবং অযোগ্যতার অনুপাতে যদি সংসারের সকলকেই ক্ষয় ক্ষতি ও লাভকে স্বীকার করিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে অনেক-কেই যেমন রিক্তহস্তে ভূমিষ্ঠ হইতে হইয়াছে, সেই রিক্তমুষ্টি অমুক্ত রাখিয়াই এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত। স্নেহ, যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া প্রীতির অযাচিত দানে স্নেহ-ভাজনের দুইহাত ভরিয়া দেয়; এবং যে পায় সেও স্নেহের অমূল্য দানকে সাদরেই শিরোধারণ করিয়া লয়, স্বীয় অযোগ্যতার প্রতি চক্ষু দিবার সময় তখন তাহার থাকে না। স্নেহ প্রযুক্ত যাঁহারা আমাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন, অযোগ্যতার জন্য আমার অবশ্যম্ভাবী স্খলন পতন গুলিকেও তাঁহারাই মার্জ্জনা করিয়া লইয়া, একলব্যের মৃণ্ময় দ্রোণের ন্যায় আমাকে সম্মুখে মাত্র রাখিয়া তাঁহাদের কার্য্য তাঁহারাই সম্পন্ন করিবেন এ আশা আমার না থাকিলে এতবড় দুঃসাহস আমার হইত না, একথার উল্লেখও আমি বাহুল্য মনে করিতেছি।

পঞ্চাশৎবর্ষমাত্র পূর্ব্বে একদিন ছিল, যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় সংস্কৃত পুরাণেতিহাস গুলির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বক্রদৃষ্টিপাত করিতে ক্রটী করিতেন না। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসা ভূধরে ভূগর্ভে কাননে কান্তারে প্রবিষ্ট হইয়া এমন সকল উপাদান আবিষ্কার করিয়াছে, যাহার ফলে সেই ছন্দোবদ্ধ পুরাণকাহিনীর সংস্কৃত শ্লোকগুলিকে আর তেমন করিয়া বিদ্রূপবিদ্ধ করিবার উপায় নাই। অনেক স্থলে স্বীকৃত হইয়াছে যে, অনুসন্ধান করিতে জানিলে, সংস্কৃত ভাষার বাক্য ও অর্থালঙ্কার গুলির মধ্যে যথার্থ প্রবিষ্ট হইতে পারিলে, প্রাচীন ইতিকথার অনেক আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এমন সকল উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে শ্লোকবর্ণিত ঘটনাগুলি পুরাণকর্ত্তাগণের রচিত উপন্যাস নহে, পুরাণবর্ণিত রাজবংশাবলী-উপন্যাসের কাল্পনিক নায়কের স্থান পূরণ করিবার জন্য গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দাম কল্পনাপ্রসূত হইয়া, জীর্ণ গ্রন্থের কীটদষ্ট পত্রের মধ্যে কায়ক্লেশে আপনাদিগকে আজি পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখে নাই। মহাভারত-বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরকে আজ আর নিতান্তই আরবোপ-ন্যাস বলিতে সকল সময়ে সকলের সাহস হয় না। ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনা প্রভৃতি বিপুল সাম্রাজ্য আজ আর কাল্পনিক ব্যাসদেবের কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন-সাম্রাজ্য নহে, তাই আজ বলিতেই হয় যে বুঝি বা মহাভারত-বর্ণিত প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত উপন্যাসের নায়ক ছিলেন না; এবং এই রঙ্গপুর যে তাঁহার প্রাচীন কিম্বদন্তীর নর্ম্মপুরী, ইহাও হয়ত মিথ্যা কথা নহে এবং বজ্র-নখর-দীর্ণ দুঃশাসনের হৃদ্‌-রক্ত-রঞ্জিত করে যে মধ্যম পাণ্ডব অলুলায়িত-কুন্তলা কৃষ্ণার কেশ-সংস্কারের কঠোর ক্ষাত্র প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে সেই ভীমসেনের সহিত ঐরাবত-প্রতিদ্বন্দ্বী যোজনপাদের স্কন্ধ-সমারূঢ় ভগদত্তের ভারত-বর্ণিত দ্বন্দ্বযুদ্ধও অলীক কাহিনী না হইতে পারে।

* বিগত ২৮শে ভাদ্র রঙ্গপুরে উত্তরবঙ্গ জমিদার সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক যুগের স্বরাজ্যের স্বাধীনতা-পূর্ণ সম্পদময় দিনের সেই সুখসৌভাগ্যের স্বপ্নস্মৃতি আজ যখন থাকিয়া থাকিয়া রঙ্গপুরবাসীর মনে জাগিয়া উঠে, তখন আনন্দে ও বিষাদে তাঁহাদের হৃদয় কেমন করিয়া অভিভূত হয় তাহা তাঁহারাই জানেন। সুদূর অতীতের এই বিস্মৃতির কুহেলিকাপূর্ণ অস্পষ্ট গৌরব-কথাই রঙ্গপুরের একমাত্র গৌরবের সামগ্রী নহে; ক্ষত্রিয়ান্তকারী কুরুক্ষেত্র সমরের বীরশয়নশায়ী মহারথ ভগদত্তের অবসানের পর বিস্তীর্ণ কামরূপ রাজ্যে আরও কত রাজবংশ অপ্রতিহত প্রভাবে স্বাধীন রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নিশ্চিত রূপে বলা একরূপ দুঃসাধ্য। গৌড়বঙ্গের ঘনায়মান দুর্দ্দিনে দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দীনের সেনাপতি মহম্মদী বক্তিয়ার যখন রাজপুরীর সিংহদ্বারে দেখা দিলেন, তাহার পর হইতেই হিন্দুসাম্রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তাচলের অন্তরালে তাঁহার রশ্মিজাল সম্বৃত করিয়া লইলেন। নানা পতন অভ্যুত্থানের পর দিল্লীর শাসন ছিন্ন করিয়া বঙ্গের পাঠান সুবাদার গৌড়ে যখন স্বাধীন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন হইতে রাঢ় বরেন্দ্র কামরূপ প্রভৃতি রাজ্য গৌড়ের মুসলমান সম্রাটগণের দ্বারাই অল্পবিস্তর শাসিত হইয়া আসিতেছিল। গৌড়েশ্বর হোসেনশাহ যেদিনে গৌড়ের মণিজড়িত মহার্হ সিংহাসনে সমাসীন, ত্রিস্রোতার কূলপরিপ্লাবিনী নির্ম্মল তরঙ্গধারা-ধৌত এই রঙ্গপুরেই খেন রাজবংশের শেষ প্রদীপ, স্বাধীনতা প্রয়াসী, রাজাধিরাজ নীলাম্বর সেদিনে তাঁহার রাজসিংহাসন স্থাপিত করিয়া হিন্দুর নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার কল্পে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন; নীলাম্বরের মনোরথ পূর্ণ হইল না সত্য, কিন্তু সুহ্ম পুণ্ড্র ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের অনন্ত নীলাম্বর তাঁহার কীর্ত্তি-কিরণজালে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং আজি পর্য্যন্ত নানা দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্যের ঘনতিমির-সমাচ্ছন্ন বঙ্গবাসীর চিদম্বর নীলাম্বরের যশঃসূর্য্যের স্তিমিত রশ্মিরেখায় আলোকিত হইয়া উঠে। দিল্লী এবং গৌড়ের মুসলমান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ কামরূপ রাজ্য বহুবার আক্রান্ত হইয়াছে, মুসলমান অধিকারের প্রথম হইতে ইস্‌লাম গৌরবের অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত শত্রুদ্বারা প্রপীড়িত হইয়াও সাগর-বেষ্টিত মৈণাকের ন্যায় কামরূপের শৈলশিখর গুলি মস্তক উন্নত করিয়াই ছিল; আহম্‌ ও কোচবিহার রাজবংশের সমর-গৌরব-কাহিনী মনঃকল্পিত কৈতববাদ নহে। হিমালয়ের সানুদেশ হইতে পূর্ব্বনীলাম্বুধির তটপ্রান্ত পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত, রাজাধিরাজ নরনারায়ণের সুবৃহৎ সাম্রাজ্য ঐতিহাসিকের অলীক স্বপ্ন বলিয়া অশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যাজ্য নহে। জ্ঞাতি-শোণিত-সাগরে সন্তরণপটু আওরঙ্গজীবের সব্যসাচী ফাল্গুনীর ন্যায় রণপণ্ডিত সেনাপতি মীরজুম্‌লার নিষ্ফল কামরূপ আক্রমণ এবং পরাভবের কাহিনী মুসলমান ও বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত সত্য কথা। তরঙ্গভঙ্গ-চপলা ত্রিস্রোতা ও সদানীরা করতোয়ার তোয়শীকর-শীতল এবং মহামায়ার মহাপীঠ স্পর্শপূত এই কামরূপ ভূমির প্রাচীন গৌরব কথার আলোচনা করিতে গেলে স্থান কালের জ্ঞান হারাইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। মহাভারতীয় ভগদত্তের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া, বরেন্দ্রীর পাল ভূপাল ও সেন নরপালগণের দিন পর্য্যন্ত এবং তাহার পরে মুসলমান শাসন-কালের পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারিগণের সৌভাগ্যের সময় হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধ শতাধিকবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সম্পদ যে আনন্দ ও যে সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যে এই বিস্তৃত জনপদবাসীর দিন গিয়াছে, তাহা ভাবিলে আজ মনে হয় উহা বুঝি শাহারজাদী কথিত আরব্যোপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একরাত্রির উপন্যাসের অলীক স্বপ্নকথা। একদিন ছিল, যখন ঊর্দ্ধচূড় মন্দিরের স্বর্ণশিখর-শোভায় মাথার উপরের নীল আকাশ ঝল্‌মল করিতে থাকিত, সুবৃহৎ সরোবর-সঞ্জাত অরবিন্দের মকরন্দলোভাতুর মধুব্রত তাহার বিরামবিহীন গুঞ্জন-গীতিরবে অবিরাম মানবের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়া যাইত, বিপুলকায় দেবায়তনের সন্ধ্যারতির শঙ্খরবে দিগন্তের মহাশূন্য নিত্য মুখর হইয়াই থাকিত, সুভিক্ষের

প্রাচুর্য্যে দরিদ্রের পর্ণশালাতেও নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই রহিত। আজ সে মন্দির ভগ্নশীর্ষ দেব-দেউলের ভিত্তিরও চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায় না, বারিবিহীন তড়াগ দেখিলে মনে হয় যে হৃতগৌরবা ধরণীমাতা তাঁহার হৃদ্‌বিদারী দুঃখ ঐরূপেই তিনি প্রকাশ করিতেছেন।

এরূপ হইল কেন, এমনটা ঘটিল কি করিয়া, আনন্দের কলহাস্যপূর্ণ লক্ষ্মীর শ্রীমন্দির এমন করিয়া ভ্রষ্টশ্রী ও নষ্টগৌরব হইয়া গেল তাহার কারণ কি? যুগে যুগে দেশের গৌরবের ও কল্যাণের যে সুদৃঢ় লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ প্রস্তর নির্ম্মিত চিত্রিত কারুখচিত সুবৃহৎ অট্টালিকা বঙ্গের নভঃপ্রাঙ্গণের সুউর্দ্ধে তাহার গর্ব্বিত শির তুলিয়া ধরিয়া ছিল সে উচ্চচূড়া আজ এমন করিয়া ধরণীর মলিন ধূলিতলে লুটাইয়া পড়িল কেন, এ প্রশ্ন বার বার করিয়া মনের মধ্যে উদিত হয়। কিন্তু সে প্রশ্নের সমাধান সহজ নহে, সকল কথা ভাবিয়া গুছাইয়া স্পষ্ট করিয়া বলাও নানা কারণে সুকঠিন। পরিবর্তন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিক নিয়ম। অভ্যুত্থানের সহিত পতন, আলোকের সঙ্গে ছায়া, জন্মের সহিত মৃত্যু অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে ইহা সত্য কথা; আজ যে নক্ষত্র আকাশে দীপ্তিদান করিতেছে, কাল তাহা অনন্ত অম্বরের কোন দূর দূরান্তরে লুক্কায়িত হইবে; আজ যে নদী তাহার ক্ষীরসদৃশ নীরধারায় উভয় তীরের পল্লীক্ষেত্রে কল্যাণ পরিবেষণ করিতে করিতে নৃত্যের লাস্যলীলায় সিন্ধুসঙ্গমে যাত্রা করিয়াছে, কাল তাহা নীরস পাণ্ডুর বালুকায় পরিপূর্ণ হইয়া পথিকের পদতল দগ্ধ করিতে থাকিবে। আজ যে বনস্পতি ফুল পল্লব কাণ্ড কিশলয়ে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া ফলচ্ছায়ায় সকলের সর্ব্ব প্রকারের তৃপ্তি বিধান করিতেছে, কাল তাহা বজ্রাগ্নি-সন্তাপে বা দাবদাহে দগ্ধ হইয়া যাইবে এ কথা হয়ত সত্য। কিন্তু অচিরকাল পূর্ব্বে যাহা অক্ষুণ্ণ গৌরবে কল্যাণ বর্ষণ করিতেছিল, তাহা যদি অকালে অল্পকালে অপঘাত মৃত্যুর মধ্যে ধ্বংস হইতে থাকে, তবে তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার শক্তি সাধ্য আমাদের থাকুক বা নাই থাকুক, তাহার জন্য অন্তরের মধ্যে বেদনা অনুভূত না হইয়া যায় না।

একদিন ছিল যখন বঙ্গের ভূস্বামিগণের রাজশক্তি তাঁহাদের স্বাধিকারস্থ জনসমূহের কল্যাণবর্দ্ধন-কল্পে নিয়ত নিযুক্ত থাকিত; তাঁহাদের বিস্তৃত রাজ্যের প্রজার নিকট হইতে গৃহীত করসম্ভারে রাজভাণ্ডার যখন পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন তাহা ব্যয়িত হইত দেবায়তনের সদাব্রতে, সরিৎ সরোবরের নির্ম্মলনীরোদ্ধারে, রাজপুরীর অতিথিশালার নির্ম্মাণে ও পরিচালনে এবং অপরাপর মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে, যাহার সম্পূর্ণ ফলভোগী হইতেন রাজা নহে, রাজার অধিকারস্থ আপামর সাধারণ প্রজাবৃন্দ। রাজার মাতৃশ্রাদ্ধ বা কুমার কুমারীগণের বিবাহাদি মঙ্গল সংস্কার কার্য্যে প্রজার নিকট হইতে গৃহীত অর্থ, যখন প্রজা দেখিত ব্যয়িত হইতেছে তাহাদেরই পুরী-পল্লীর ভূরি আয়োজনে, তখন করগ্রহণের ক্ষুদ্র কণ্টকক্ষত তাহার মনকে আর পীড়িত করিতে পারিত না। সেদিনের ধর্ম্মসম্মত সমাজসঙ্গত জনসাধারণের মঙ্গলকার্য্য এক একজন ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছে, কারণ সে কালের ভূম্যধিকারিগণের প্রত্যেকের জমীদারির আয়তন, বর্ত্তমান ইউরোপের অনেক স্বাধীন নরপতির শাসিত রাজ্য অপেক্ষা ন্যূনত ছিলই না, অধিকাংশ স্থলে বৃহত্তরই ছিল এবং স্বল্প হারে প্রত্যেক প্রজার নিকট যে কর আদায় হইত তাহার সমষ্টির পরিমাণ লক্ষ ছাড়াইয়া অনেক স্থলে কোটিতে গিয়া পহুঁছিত। বহুকাল একত্র একদেশে বসবাস করিয়া একচ্ছত্র মুসলমান সম্রাটগণ জাতীয় পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া, অধীনস্থ হিন্দুরাজা ও ভূম্যধিকারিগণের উপরেই দেশের ভালমন্দের ভার দিয়া নিজেরা নিশ্চিন্ত মনে বাদশাহী এবং সুবাদারী পদের গৌরবোচিত রঙ তামাসা ও বিলাসে মনোনিবেশ করিবার অবসর করিয়া লইতেন। হিন্দু মুসলমান দুই জাতি বঙ্গমাতার দুই জনার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে উপবেশন করিয়া তাঁহার স্তন্যে নিরাময় পুষ্টি ও তুষ্টির মধ্যে জীবন

স্থাপন করিয়া দিত—বিধি বিধান বিহীন মন্দির মসজীদ এক সঙ্গে একত্রে তাহাদের স্বর্ণশীর্ষ আকাশে তুলিয়া ধরিত—আরত্রিকের শঙ্খধ্বনি এবং আজানের গগনভেদী রব, এক সঙ্গেই আকাশকে আকুল করিয়া দিত, সর্ব্বমঙ্গলার পূজা এবং সত্যপীরের সিন্নির মানত হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমানভাবে করিত, দোল দুর্গোৎসব ও ইদ মহরমের আনন্দকোলাহলে জাতিনির্বিশেষে সকলেই যোগ দিত। সেদিন আজ গিয়াছে, কালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, পুরাতন রাজশক্তি বিলুপ্ত হইয়া নব শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, রাষ্ট্র পরিচালন নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দেশবাসী সকলের শিক্ষা সংস্কার মতিগতি অভিনব পথে পরিচালিত হইয়াছে, বিধি বিধান, আইন কানুন আজ সমস্তই পূর্ব্বকার বিধি বিধান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সত্য বটে সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষে সুদিনে দুর্দিনে, সম্রাটের রাজকোষে ভূম্যধিকারীদের কর সকল সময়ে নিয়মিতরূপে পঁহুছাইবার ব্যাঘাত ঘটিত এবং সে জন্য ভূস্বামিগণকে সময় সময়ে রাজস্ব-সচিব রেজাখাঁর অভিনব "বৈকুণ্ঠ" দর্শনের পুণ্যার্জ্জনে বাধ্য হইতে হইত, কিন্তু হাল আইনে চৈত্র সন্ধ্যার সুন্দর বাসন্তী সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিরেখা ভূস্বামিগণের চক্ষে "রক্ত সন্ধ্যার" মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল—এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে পুরুষানুক্রমিক ভোগদখলের ভূমি হইতে চিরদিনের জন্য তাঁহারা হাত ধুইয়া কেন উঠিয়া যাইবে, এ যুক্তি তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিতে বহু বিলম্ব ঘটিল; এবং সেই সুযোগে যখন বিস্তীর্ণ ভূভাগ গুলি খণ্ড খণ্ডিত রূপে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে লাগিল, তখন বৈকুণ্ঠের বিত্তবশালী ইন্দ্রতুল্য ভূস্বামিগণও এক রূপ পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইলেন, যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহাতে বর্ত্তমানের সুসভ্যকালের বর্দ্ধিত ও বর্দ্ধনশীল বহুব্যয়সাধ্য নিজ নিজ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই সুকঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল; দেশ, দেশস্থ সমাজ ও সঙ্ঘের কল্যাণ কল্পে মুক্ত হস্তে ব্যয় ত বহু দূরের কথা। তাহার উপর আসিয়াছিল এগার শত ছিয়াত্তর সালের 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী। তদানীন্তন কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ চুয়াত্তরের মূল্যবৃদ্ধি ও পঁচাত্তরের অজন্মা দেখিয়াও বুঝিলেন না যে, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক মুখব্যাদান করিয়া বঙ্গদেশকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, দেশীয় লোকের কথা ও কৈফিয়তে কর্ণপাত করিলেন না," ভীষণ ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তর ব্যাধি পীড়া, মারী মড়ক প্রভৃতি দলবল সহ বঙ্গে প্রবেশ করিয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শব শিবা শকুনি ও হাহাকারের হাট বসাইয়াছিল। সার উইলিয়ম্ হাণ্টারের Rural Bengal পড়িয়া দেখিয়াছি যে, মাত্র একবৎসর-ব্যাপী দুর্ভিক্ষে নয় মাসের মধ্যে বঙ্গের এক কোটী লোক খাদ্যাভাবে এবং পীড়ায় মরিয়া গিয়াছিল। খাজানা আদায় দূরের কথা, তখন খাদ্য দিয়া প্রজার প্রাণ রক্ষা করা ভূম্যধিকারিগণের কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। বঙ্গের বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমূহের বৃহৎ বৃহৎ ভূম্যধিকারি-গণের পুঞ্জীভূত স্বর্ণ রৌপ্যের অস্থাবর সামগ্রীগুলি সেদিনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; উহার পুনর্নির্ম্মাণ কল্পে অর্থব্যয় আর তাঁহাদের সাধ্যে কুলাইল না। অর্থহীন ঐশ্বর্য্যহীন ভূমিহীন হইয়া সেই যে ভূম্যধিকারিবর্গ সর্ব্বপ্রকারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, শিরাসমূহ সেই যে রক্তহীন হইয়া গেল, তাহাতে পুনঃ শোণিত সঞ্চালন আজ পর্য্যন্ত হইতে পারিল না, পারিবে কি না তাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বান্তর্যামী যিনি তিনি ভিন্ন আর কে বলিবে? সেদিনে রাজা প্রজায় আশ্রয় আশ্রিত, উপকারী উপকৃত সম্বন্ধের যে নিবিড় বন্ধন ছিল, অর্থের অনটনে, ক্ষমতার অসদ্ভাবে জমিদারগণ সে সম্বন্ধ আর তেমন করিয়া বজায় রাখিতে পারিলেন না। তাহার উপরে ভূমি সংক্রান্ত প্রজাস্বত্ব বিষয়ক নব নব বিধি বিধানে রাজা প্রজার নৈসর্গিক নিত্য সম্বন্ধকে দিন দিন আরও শিথিল করিয়া পরস্পরকে এত দূরে লইয়া যাইতেছে যে, তাহার চরম ফল চিন্তা করিলে রাজা প্রজা উভয়ের অন্তই শিহরিয়া উঠিতে হয়।

বঙ্গদেশের ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে কেবল মাত্র রাজা প্রজা সম্বন্ধ নহে, অর্থ এবং ক্ষমতার উপর চক্ষু

রাখিয়া আমাদের সমাজ-নিয়মের সৃজন হয় নাই, অপার ঐশ্বর্য্যশালী ভূস্বামীর দুলালী কন্যা নির্ধন ব্রাহ্মণ সন্তানের সহধর্ম্মিণী হইয়া অভাবগ্রস্ত সংসারের কর্ণধার হইবার এবং দরিদ্র পিতার দুহিতার রাজমহিষী হইবার দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে বিরল নহে। জাতিগত নৈসর্গিক এবং সমাজ ও ধর্ম্মগত সর্ব্বপ্রকার ঐক্য বন্ধন থাকিয়াও, অভিজাতবর্গ ও জনসাধারণ আজ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া যে অপরাধ করিতেছেন, তাহার ভীষণ শেষ প্রায়শ্চিত্তের কথা মনে হইলে আতঙ্কে অন্তর কাঁপিয়া উঠে। বর্ত্তমানের শিক্ষা জনিত দেশস্থ জনগণের স্বাধীন মনোবৃত্তির অবাধ স্ফুরণ, অত্যাচারী ভূস্বামীর অযথা অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে প্রজার উত্থিত রোষের প্রদীপ্ত তেজ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু অকারণ অহঙ্কারের বশে উচ্চনীচ জ্ঞান হারাইয়া, সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ও সামাজিক ঐক্যবন্ধন উল্লঙ্ঘন করতঃ ধ্বংসের পথে যাত্রা করিলে সমাজদ্রোহ এবং আত্মহত্যা ভিন্ন আর তাহার কি নাম দেওয়া যাইবে? আর সেই ধ্বংসের পিচ্ছিল পথে আমরা সকলে যাত্রা করিয়াছি, প্রতিপদক্ষেপে গতি দ্রুততর হইতেছে, আজ সে গতিকে রুদ্ধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথ না দেখিলে যে উপলকণ্টকাকীর্ণ গভীর গহ্বরে আমাদের পতন হইবে, সেখান হইতে অনুসন্ধান করিয়া উত্তর কালে কোন প্রত্ন বা জীবতাত্ত্বিক আমাদের বিগত অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপে অস্থি,মাংস কিছুই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন না। অতীতের এই বৃহৎ এবং সুমহৎ প্রতিষ্ঠান চূর্ণ হইয়া সমস্ত সমান হইয়া গেলে যদি সমগ্র দেশের সর্ব্বথা এবং সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণ সাধিত হইত, আমি অক্ষুব্ধ চিত্তে বলিতাম তাহাই হউক, কিন্তু বিশ্বের যেদিকেই নয়ন নিক্ষেপ করা যাইবে, দেখা যাইবে যে ছোট বড় উচ্চ নীচ, সবল দুর্ব্বল সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে; বিপুলকায় বিরাটমূর্ত্তি ভাস্বর সূর্য্য গ্রহের সঙ্গে ক্ষীণতম জ্যোতিষ্কটিরও ঐক্যবন্ধনের সুসম্বন্ধ না থাকিলে সৌরজগতের দিনযাত্রা সুশৃঙ্খলায় চলিত কি না কে জানে? অরণ্যে, কান্তারে, বিশাল বনস্পতির ছায়ায়, আতপতাপ নিবারিত না হইলে ক্ষীণ গুল্ম এবং পেলব কুসুমলতা, পুষ্প সম্ভারে সজ্জিত হইয়া আমাদের নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিত কি না সন্দেহ।

যাহা ভাঙিতে বসিয়াছে তাহার পুনর্যোজনা, যাহাকে প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য মৃত্যু বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে তাহার মধ্যে সঞ্জীবনী সুধার ধারা ঢালিয়া দেওয়া, গতপ্রায় পুরাতন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নব প্রয়োজনের নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া, আজ একের সাধ্য নহে। সেই কথা বুঝিয়াই রঙ্গপুরের ভূস্বামিগণ একত্র হইয়া যে সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার সুমহৎ কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আকর্ষণে আজি সমগ্র উত্তরবঙ্গ যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে ইহা যথার্থই আশাপ্রদ। অল্পদিনের এই নব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যাহা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সময়ের অনুপাতে প্রচুর তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু করিবার এখনও অনেক আছে। এই তরুণী সভা যেদিনে পরিপূর্ণ যৌবন-মণ্ডিতা এবং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা হইয়া সুবর্ণ দর্ব্বী হস্তে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ পরিবেষনক্ষমা হইয়া দাঁড়াইবে, সেদিন কেবল উত্তরবঙ্গ নহে, সর্ব্ববঙ্গের পক্ষেই বড় আনন্দের দিন হইবে।

আদি বিদ্বান কপিলের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে না পড়ে এমন দুঃখ বোধ করি জগতে হয় না, এবং এমন দুঃখও বোধ করি সংসারে নাই যাহা ভারতবর্ষের লোকে কোন না কোনও সময়ে অনুভব করে নাই। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" একথা বোধ করি এই দুঃখের দিক দিয়া দেখিলে ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। কালে কালে ভারতবাসী নানা দুঃখ দৈন্য ক্লেশ সন্তাপের মধ্য দিয়া তাহাদের নিরানন্দময় দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ধীর মন্থর গো-শকট কায় ক্লেশে চালাইয়া আসিয়াছে। সুখের মধ্যে ছিল অনায়াসলব্ধ দুটি মোটা-ভাত আর একখানি মোটা কাপড়। কদাচিৎ কখনও

অজন্মা হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে খাদ্যাভাবে লোক মরিত বটে, কিন্তু সেরূপ দুর্ঘটনা শতবর্ষে একবার ঘটিত কি না তাহাতেও সন্দেহ। নদীমাতৃকা দেবমাতৃকা সুজলা এই ভূমিতে সুফল ফলাইতে কৃষককে অধিক ক্লেশ করিতে হইত না। সামান্য শ্রমলব্ধ যাহা মিলিত তাহাতেই স্বল্পে সন্তুষ্ট শ্রমজীবী, ভক্তকবি রামপ্রসাদের "মন তুমি কৃষিকাজ জাননা" গাহিয়া পল্লীর নীলাকাশকে মুখর করিয়া তুলিত। ইতিহাস বলিয়া থাকে যে জাহাঙ্গীরনগরে শায়েস্তা খাঁ যখন বঙ্গের সুবাদার রূপে মসনদে উপবিষ্ট, তখন টাকায় আটমণ চাউল পাওয়া যাইত। ইতিহাসকে ইতিহাসের মধ্যেই স্থান দিয়া আমার বাল্যকালে প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছি, তাহাও টাকায় এক মণ; দুগ্ধ ততোধিক; শাক সব্জি তরিতরকারির পল্লীতে দাম ছিল না বলিলেও মিথ্যা কথা বলা হইবে না। সহরে আজ চাউল টাকায় তিন সের; নীরমিশ্রিত অখাদ্য গোক্ষীরও তাহাই, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের দিকে তাকাইলে মনে হয় যে মনুষ্য হৃদয়ের মতই সমগ্র দেশ স্নেহশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইতিহাসে স্থান-লাভ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অল্পকালের অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের নিত্য মন্বন্তরের দিন যে ভাবে চলিতেছে, তাহার নিবারণার্থ সম্রাটের রাজশক্তি এবং সমগ্র দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের সর্ব্বপ্রকারের শক্তি একত্র করিয়া প্রযুক্ত না হইলে এ মজ্জাগত মন্বন্তরের ইতিহাস লিখিবার জন্য একটি মানুষও এ মরভারতে থাকিবে কি না সন্দেহ। অর্দ্ধসভ্য ভারতবর্ষকে সুসভ্য পরিচ্ছদে ভূষিত করিবার ভার দেশান্তরের বণিক সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ সমগ্র দেশের নরনারী আদিম নগ্নাবস্থায় বস্ত্র যাচ্ঞা করিতে করিতে তাহাদের অনশনক্লিষ্ট কণ্ঠ শুষ্কপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। বস্ত্র যোগাইবার ভার যাঁহাদের তাঁহারা বৃন্দাবনের বস্ত্রহারী ব্রজবিহারীর মতই কদম্বকাণ্ডে বসিয়া ঈষৎ হাসিলে, অশনের সঙ্গে বসনও দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অন্নবস্ত্রের যে ক্লেশ আজি ভারতে উপস্থিত হইয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষের দ্বিসহস্র বর্ষাধিক কালের ইতিহাসে এমন দুঃসহ দুর্দ্দিন কখনও আসিয়াছে কি না সন্দেহ।

যে কালাগ্নি প্রথমে ইউরোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা সমগ্র পৃথিবীর জল স্থল অন্তরীক্ষ ছাইয়া ফেলিয়া তাহার লেলিহান শিখায় কি ধ্বংসলীলার অভিনয় করিয়াছে তাহা পৃথিবীর হতাবশিষ্ট নরনারীর অবিদিত নাই। মধুকৈটভের মেদ নির্ম্মিতা বলিয়া ধরণীর নাম মেদিনী কি না জানি না, এই পৃথিবীব্যাপী নরহত্যার পরে ধরিত্রীর যে মেদিনী নাম স্বার্থক হইল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একমাত্র সুখের কথা এই যে, যাঁহারা জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে ধরণীর সমগ্র অধিবাসীবৃন্দের সুখ সৌভাগ্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বীয় কৃপাণ কোষমুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই জয় হইয়াছে। যজ্ঞযূপবদ্ধ পশুর ন্যায় যাহারা পাঁচবৎসর ধরিয়া কম্পিতকলেবরে দিন গণিতেছিল, তাহারা আজ শান্তির মধ্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়াছে। ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের কথা এই যে, ভারতের প্রিয়সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য ধর্ম্মের জন্য, জগতের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যখন তাঁহার অপরাজেয় গাণ্ডীবে জ্যা আরোপণ করিলেন, তখন তাঁহার সূর্য্যাস্তহীন ভুবনবিস্তৃত সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তবাসী ভারত-সেনার ডাক পড়িল। মুষ্টিমেয় ইংরাজবাহিনী যেদিন মন্‌স মার্ণ-এর মরণক্ষেত্রে অক্ষয় গৌরব অর্জ্জনের জন্য প্রাণপণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেদিনে তাহাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল শিখ, শিশোদীয় রাঠোরাদি রাজপুত বাহিনী। অন্তরীক্ষ হইতে যখন মৃত্যু অবিরলধারে বর্ষিত হইতেছিল, বিষবাষ্পের মরণ-মেঘ দ্বারা যখন চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃটিশবাহিনী মৃত্যুর অন্ধপথে প্রয়াণ করিতেছিল, তখন বীরমরণের অংশ অর্জ্জনের জন্য সহযাত্রী হইয়াছিল সম্রাটের ভারত-বাহিনী। বঙ্গদেশের পক্ষে আনন্দ সংবাদ এই যে

পলাশী প্রাঙ্গণের বিজয়ী বীর ক্লাইবের "লাল পল্টনের" দিনের পর হইতে সমরক্ষেত্রে সামরিক গৌরব লাভে যে বঙ্গ সন্তানগণ বঞ্চিত হইয়া ছিল, পৃথিবীব্যাপী কাল সমরে যশস্কর মৃত্যুর সেই সিংহদ্বার সম্রাট স্বয়ং উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। সমরভেরী-নিনাদের আহ্বান-সঙ্গীত শুনিয়া বঙ্গজননীর ছায়াশীতল পল্লীপ্রাঙ্গণে কেহ সুখনিদ্রায় নিমগ্ন থাকে নাই, কিশোর তনয়গণকে বীর-সজ্জায় নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইতে বঙ্গজননীগণও অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়েন নাই।

যাহারা সম্রাটের আহ্বানে, সাম্রাজ্যের কর্ত্তব্য পরিপালনে প্রাণ দিবার যোগ্য বিবেচিত হয় নাই, তাহারা অশন বসনের এই দুর্ব্বহ দুঃখের দিনে অনেক স্থলে শক্তি-সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে নিজেকে সম্মানের আসন লাভের যোগ্য প্রমাণিত করিয়াছে। ন্যায়পরায়ণ দয়ালু সম্রাট ও দূরদর্শী বিজ্ঞ মন্ত্রী-সম্প্রদায় আজি ভারতবাসীকে স্বায়ত্বশাসনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন—ভারতের সকল সম্প্রদায় আজ বহুকাল সঞ্চিত আশা ও আকাঙ্ক্ষার সাফল্য লাভের দিন সমাগত দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণকল্পে রাষ্ট্রসভায় যথোপযুক্ত আসন পাইবার জন্য চেষ্টার কাহারই ত্রুটি নাই। এদিনে যদি বঙ্গের ভূস্বামিগণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আলস্যে শৈথিল্যে তাঁহাদের করায়ত্ত প্রায় সিদ্ধিকে ধূলিতলে নিক্ষেপ করেন, চিরবাঞ্ছিত ফললাভে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে কেবল যে স্বার্থহানি ঘটিয়া সকল সম্প্রদায়ের পশ্চাতে একান্তে তাঁহাদিগকে মলিনমুখে দাঁড়াইতে হইবে তাহা নহে, বঙ্গের বর্ত্তমান ভূস্বামিগণের পূর্ব্ব পিতামহদিগের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, উর্দ্ধলোক হইতে সেই সকল কর্ম্মী মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অক্ষম উত্তরাধিকারিগণের উপর যে রোষদীপ্ত অভিশাপের দুর্নিবার বজ্র নিক্ষেপ করিবেন তাহার অগ্নিদাহে আমরা নিঃশেষে ভস্ম হইয়া যাইব।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

এস

শান্ত আজি প্রলয়ের ঝড়,
দূরে গেছে গভীর আঁধার।
স্তব্ধ আজি হৃদয়ের মাঝে—
ভ্রান্ত আশা, ক্লান্ত হাহাকার।
উজলিত দূর নীলিমায়
দীপ্ত শুভ্র ফুটিয়াছে আলো,
বিশ্বের সকলি আজ বুঝি
তোমারে বাসিতে চায় ভালো।

এস তবে নব নব রূপে
আকুল পরাণে মোর সখা!
স্নিগ্ধজ্যোতি-প্রফুল্ল আননে,
একবার দিয়ে যাও দেখা।
বিজন প্রাণের পূজা আজি
এস প্রিয়, করিতে গ্রহণ,
সকল বাসনা পরে মোর,—
রাখ তব অভয় চরণ।

শ্রীসোণামাখা দেবী

অরুণা

সুপ্রশস্ত রক্তরেখা, তোমার শাড়ীর
চারি প্রান্তে গণ্ডী রচি রহিয়াছে ঘিরে।
গোধূলি ললাটে যেন সন্ধ্যাভ্র আবীর
সিন্দুরের বিন্দু যাহা পরিয়াছ শিরে।
কর-পদ্ম কোকনদ ; অধর শোণিমা
তাম্বুলের রাগে বিশ্বে জিনেছে বরণে।
কলুষ পরশ হতে রচিয়াছ সীমা—
করে দুটি লাল রুলী, অলক্ত চরণে।

এলে কি আজিকে দেবী, সর্ব্বাঙ্গ ভূষিয়া
কামনারে বলি দিলা তাহারি রুধিরে?
এলে কি করালী মায়ে পূজায় তুষিয়া
নির্ম্মাল্য প্রসাদী জবা মাল্য লয়ে ফিরে?
ভক্তিভয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে রই আজি,
এ কি রূপে হে ভৈরবী আসিয়াছ সাজি!

শ্রীকালিদাস রায়।

মাষ্টার মহাশায়

(গল্প)

কিঞ্চিদধিক পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ব্বে, বৰ্দ্ধমান সহর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল—এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দুইখানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য—দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস, এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাই-গঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থসন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে শপ্ বিছাইয়া হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুয্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহারাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্রমাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতে-ছিলেন। পার্শ্ববর্তী নন্দীগ্রামেও প্রতিবৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। এ বৎসর গুজব শোনা যাইতেছে, উহারা অন্যান্য বৎসরের মত যাত্রা ত আনিবেই, অধিকন্তু কলিকাতার কোনও ঢপ-ওয়ালীকেও বায়না দিয়া আসিয়াছে। ঢপসঙ্গীত এ অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই। এ গুজব যদি সত্য হয়, তবে গোঁসাইগঞ্জেরও শুধু যাত্রা আনিলে চলিবে না, —ঢপ্ আনিতে হইবে। উহারা কোন্ ঢপওয়ালীকে বায়না দিয়াছে সেই গোপন সংবাদটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার নামটি 'সঠিক' জানিতে পারিলে, বৰ্দ্ধমানে অথবা কলিকাতায় গিয়া খবর লইতে হইবে সেই ঢপওয়ালীর অপেক্ষা কোন ঢপওয়ালী সমধিক খ্যাতিসম্পন্না, এবং সেই বিখ্যাত ঢপওয়ালীকেই গোঁসাইগঞ্জে গাহনা করিবার জন্য বায়না দিতে হইবে; ইহাতে যত টাকা লাগুক্। কারণ, গোঁসাইগঞ্জ-

বাসিগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট ছুটে নাই—এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিন-জন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া, ধপাস্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হীরু দত্ত ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে মোড়লের পো! অমন করে' বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে?"

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা? কি হতে আর বাকী আছে? হায় হায় হায় —কার্ত্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখ্‌বার জন্তে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি, হা রে বিধেতা তোর পোড়া-কপাল!"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রাম-চরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন—"কি হয়েছে কি হয়েছে—সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?"

দীর্ঘশ্বাস-জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল—"নন্দীপুর থেকে। হায় হায়—শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল! হা-রে কপাল!"—বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা বলিলেন—"কেন কেন—নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে?"

"বল্‌ছি। বলবার জন্তেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক কোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে—মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এক ঘটি জল—

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটি আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তাহার পর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরু দত্ত বলিলেন—"এবার বল কি হয়েছে—আর দগ্ধে মের না বাপু!"

রামচরণ বলিল—"কি হয়েছে?—যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড় বড় সহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও না স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা ইস্কুল খুলেছে।"

তিন জনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি আবার? ইস্কুল কি?"

রামচরণ বলিল—"আরে ছাই আমিই কি জানিতাম আগে, ইস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম! ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালকে, ইস্কুল বলে।"

দত্তজা বলিলেন—"ওঃ, ইস্কুল খুলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই খুলেছে—একজন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরুমশায়কে নাকি বলে ম্যাষ্টার। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, ম্যাষ্টার বসে দশ বারজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্ছে।"

হীরু দত্ত গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাষ্টার কোথা থেকে এনেছে—তা কিছু শুনলে?"

"সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্দ্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে—বিনয় চক্রবর্ত্তী। দশটাকা মাইনে, বাসা খোরাক অমনি পাবে। সব খবরই নিয়ে এসেছি।"

বাহিরে এই সময় একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল্‌পিল করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই

অভূতপূর্ব্ব পরাজয় সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল—"এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল। নন্দীপুরের হাতে এ এই অপমান? আমাদের ইস্কুল খোল্‌বার এখন কি উপায় হবে?"

হীরু দত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই সকল, তোমরা কি মনে করেছ—তিন পুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে? কখনই না। এ জীবন থাকতে নয়। আমারও ইস্কুল খুলবো—ওরা বা কি ইস্কুল খুলেছে—আমার তার চতুর্গুণ ভাল ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া দাওয়া করে আমি বেরুচ্ছি। কল্‌কাতা যাবার রেল খুলেছে, আর ত কোনও ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে, ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আস্‌বো। ওরা ১৫৲ দিয়ে মাষ্টার এনেছে? আমরা ২৫৲ টাকা মাইনে দেবো। ওদের মাষ্টারকে পড়াতে পারে, এমন মাষ্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো বসাবো বসাবো—তিন সত্যি করলাম। এখন যাও—তোমরা বাড়ী যাও, স্নানাহার করগে।"

২

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র, বয়স ত্রিশ বৎসরের কাছাকাছি, খর্ব্বাকার কৃষকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে তিনি নাকি ভারি পণ্ডিত। পূর্ব্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়, সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাটসাহেবকে বলিয়া তাঁহাকে ডেপুটি করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সে প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরিও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে! পুরুষস্য ভাগ্যং!—মাষ্টার মহাশয়ের মুখে এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চালচলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

হীরুদত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে, সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্ব্বেই ইস্কুল খুলিল। পনেরো ষোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেনসিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং বুক পুস্তক লইয়া আসিয়াছিলেন—ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনা মূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে ঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোসাইগঞ্জ বলিত—"বর্দ্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি আর পড়াইবেই বা কি!"—নন্দীপুর বলিত—"হলেই বা আমাদের মাষ্টারের বর্দ্ধমানে বাড়ী—তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন তখন কি বর্দ্ধমানে ইংরিজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হত।"

যথা সময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপসঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে, উভয় মাষ্টারের দেখাসাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্ব্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন—"ঐ বেজা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এদ্দিন জানতাম না! ওটা ত মহামূর্খ। ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা একক্লাসে পড়তাম কি না। আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তার পর, আর ত ও ইংরিজি

পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত—মাইনে ছিল সাতটাকা। গেল বছরও ত কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়—তখনও ও ঐ চাকরি করছে।"

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একি শুনছি?"

ব্রজ মাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"একেই বলে কলিকাল! সেকেন বুক পড়ার সময় আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই পড়া ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কি জান না বুঝি? মাষ্টার ক্লাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করতো—ও একদিনও পড়া বলতে পারতো না। মাষ্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও এনসার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বল্লাম। মাষ্টার মশায় আমায় বল্লে, 'দাও ওর কান মলে।' আমি কাণ মলে দিতেই, ওর মুখ চোখ রাগে রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগলো আমি হলাম বামুনের ছেলে, কায়েত হয়ে ও কিনা আমার কাণ মলে' দেয়! সেই অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ ছয় বছর সেই ইস্কুলে পড়ে তবে বেরুলাম।"

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হৃদয় মাষ্টার বলিল—"আমরা ইস্কুলে যে মাষ্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দুজন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে—তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, কার কথা সত্যি কার কথা মিথ্যে।"

এ কথা শুনিয়া ব্রজ মাষ্টার হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল—"অ্যাঁ!—এই কথা বলেছে? এ সব ত বিলকুল মিথ্যে—ফল্‌সো কথা। সেই মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? সে কি আর বেঁচে আছে! গেল বছরের আগের বছর নিমতলার ঘাটে ত তাঁর হেভেন হল! তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভিটেশন খেয়ে এসেছি বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে, একেবারে পুত্রতুল্য—সন ইকোয়েল। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় দাদা বলতে একবারে ইগ্নোরেন্ট—অজ্ঞান।"

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ-প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই-জনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার সভা বসিবে; কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং যাহাতে জয় পরাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবেন, অপরকে তাহা মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়েই তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা, স্থান—উপরি-উক্ত বটবৃক্ষতল, সময়— সূর্য্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দণ্ডকাল।

৩

ধার্য্য দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয় তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টারের পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন—"কি হে মাষ্টার—মুখ রাখতে

পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হৃদয় মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে বল্‌তে না পারে।" ব্রজবাবু বলিলেন—"আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি! এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব, যে তাই শুনেই হৃদয় মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা ত দূরের কথা!" দত্তজা বলিলেন—"দেখ ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।"—কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাষ্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্যাই তিনি ত্যাগ করিবার পথ পাইবেন না।

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল। শপ্, মাদুর, শতরঞ্চি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিয়াছে এবং নিজ গ্রামের সীমারেখার মধ্যে সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ্, মাদুর প্রভৃতি, ঢাক ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

ক্রমে নন্দীপুরও আসিয়া নিজ সীমানার মধ্যে শপ্, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন—মধ্যে এক হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল—কোনও পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া সজোরে ঊর্দ্ধদিকে ছাড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

"আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন"—বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে একটি ছড়ি লইয়া হীরু দত্ত তাহা সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে ছাড়িয়া দিলেন। সকলে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি—গোঁসাইগঞ্জের দিকে নহে—নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চুণ হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হৃদয় মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁর বুকটি দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ হইতে দিলেন না।

হৃদয় মাষ্টার তখন বলিলেন—"আচ্ছা, বল দেখি—এর মানে কি—

"Horns of a dilemma."

সৌভাগ্যক্রমে, ব্রজ মাষ্টার এই কূটপ্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—"এর মানে—

'উভয়-সঙ্কট'

"—কেমন কি না?"

"পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। তাহার পর, ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"শোন হৃদয় বাবু—আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করি! এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি এই দুজন যা ইংরিজিনবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে' তোমায় ঠকিয়ে দেবো সেটা আমি চাইনে। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে

একজন ইংরিজিনবীশ হয়ে, আর একজন ইংরিজি-নবীশের অপমান ত করতে পারিনে! আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি। বেশ হেঁকে উত্তর দাও—যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা—এর মানে কি বল দেখি—তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা এর মানে বল—"I dont know."

হৃদয় মাষ্টার উচ্চৈস্বরে বলিল—"আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলেই মুখ একেবারে পাংশু-বর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল—"হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল হুও—হুও।"

হৃদয় মাষ্টার মহা বিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় গোঁসাই-গঞ্জের ঢাক ঢোল কাড়া নাগরা ও রামশিঙ্গা সমবেত-ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।—তাঁহার কথা আর কাহা-রও শ্রুতিগোচর হইবার উপায় রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জ নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং তন্মধ্যে একজন সেই মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল, হৃদয়মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তথাকার ইস্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে বজ্র মাষ্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারী এবং গ্রামের সকলের অপত্য-নির্ব্বিশেষে ক্ষীর-ননী ছানা ভুঞ্জন করিতে লাগিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রবাসী

আজি প্রভাতের শীতল সমীর
　　অঙ্গ পরশি' ধীরে,
কহিল বারতা, "ওরে পরবাসি,
　　শরৎ এসেছে ফিরে।
বঙ্গজননী ডাকিছে সকলে—
　　কে কোথায় আছে আজ!
এখনো সাঙ্গ হয়নি কি তোর
　　প্রবাসের যত কায?"

উঠিনু চমকি'; একটি বরষ
　　চলিয়া গেছে কি তবে,
এরি মাঝে ধরা নব নব সাজে
　　জানিনা শোভিল কবে!
গিয়াছে আসিয়া নব বসন্ত
　　লয়ে ফুল আভরণ,
আষাঢ়-গগনে নবনীল মেঘ,
　　শ্রাবণের বরিষণ!

হেথা চারি ধারে হেরি নিশ্চল
　　কঠিন শিলার স্তূপ,
কোথায় জননী বঙ্গভূমির
　　অমল শ্যামল রূপ!
কিরণ-খচিত শারদ আকাশে
　　শুভ্র মেঘের মেলা,
কূলে কূলে ভরা তটিনীকূলের
　　কল্লোল সারাবেলা!

আশ্বিনে আজি মা তোর ভবনে
　　বাজে উৎসব বাঁশি,
বিরহীর মুখে উঠিছে ফুটিয়া
　　মধুর মিলন-হাসি।
জানি, কোলে তোর একটুকু স্থান
　　আছে মা আমারো তরে,
ছাড়ি প্রবাসের বেচা-কেনা, তাই
　　ছুটে যেতে চাই ঘরে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

কৌষেয় ও কাষায়

নগর উপান্তে আসি শাক্যসিংহ অশ্বে তাঁর
দিলেন বিদায়,
নিষাদে হেরিয়া পথে, চাহিলেন তার ছিন্ন
বসন কাষায়।
বিস্মিত নিষাদপুত্র; কৌষেয় বাসের লোভে
দিল ছিন্ন বাস।
আনন্দে অধীর হয়ে না জানিয়া তার সনে
দিল মোহ পাশ।
দাঁড়ালেন তথাগত জীবরক্ত-কলঙ্কিত
মলিন বসনে,
জীবের বেদনা রাশি যেন সবি নিজ দেহে
লয়ে তার সনে।
চলিলেন বনপথে। কৌষেয় বসনে ব্যাধ
চলে সাথে সাথে;
প্রভু কন, "ফির মূঢ় কোথা যাও মোর সহ
এ গভীর রাতে?"
ব্যাধ কহে, "মহাশয় কি বসন মোর দেহে
পরাইলে তুমি,
সাধ যায় ধূলি 'পরে লুটাই আনন্দ ভরে
তব পদ চুমি।
চোখে মোর আসে জল, সর্ব্ব অঙ্গ টলমল
রোমাঞ্চিয়া উঠে,
হাতের ধনুক বাণ মাটীতে পড়িছে খসি,
রহেনাক মুঠে।
কেঁদে কেঁদে উঠে বুক, দুপাশের জীবগণে
ভাই মনে হয়,
ফিরিবারে নাহি সাধ, কৃপাভরে সঙ্গে করি
লহ মহোদয়।"
তথাগত ফিরে ক'ন, "এস বন্ধু এস বুকে,
দাও আলিঙ্গন,
মম সাধনার পথে এস হে প্রথম গুরু
অমৃত-নন্দন।
মানব জীবনাংশুক জীবরক্ত বিন্দু দাগে
ঘৃণিত মলিন,
আনন্দ শুভ্রতা দিয়ে এস মোরা করি তায়
আবার নবীন।
কৌষেয়েরে জীর্ণ করি দূর কর জগতের
দম্ভ মোহ দ্বেষ,
কাষায়ে পবিত্র করি রচি এস মানবের
নির্ব্বাণের বেশ।"

শ্রীকালিদাস রায়।

কলিকাতা
১৪-এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফুলবনে

(চিত্রকর—আর্থর হ্যাকর এ-আর-এ)
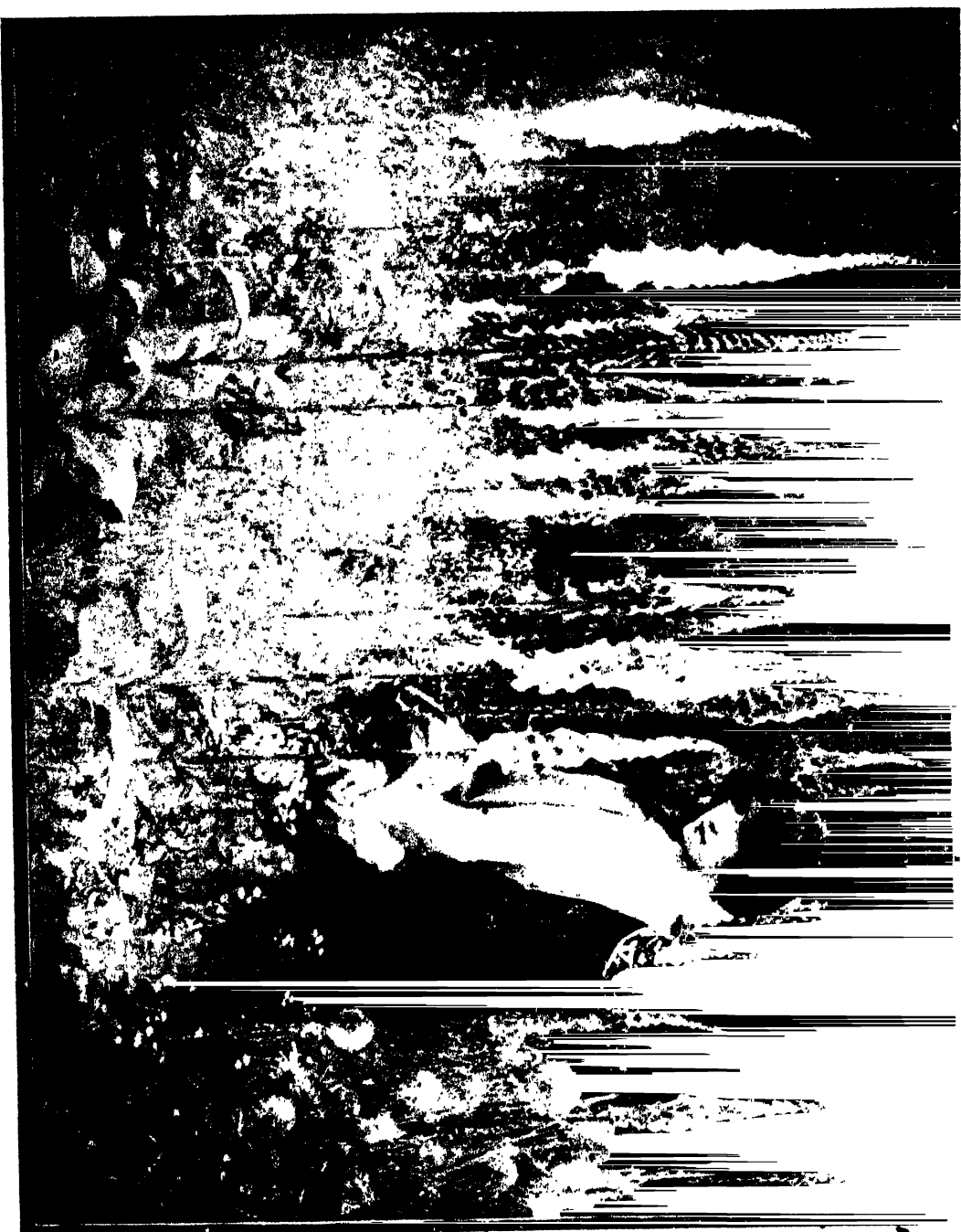
মানসী ও মর্ম্মবাণী

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড — কার্ত্তিক ১৩২৬ সাল — ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছ"

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাবুলিওয়ালা

'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি একশ্রেণীর ছোট গল্পের আদর্শ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। গল্পটিতে ঘটনা কিছুই নাই, পাত্র পাত্রীও যৎসামান্য—গল্পটির সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া কেবল মাত্র একটি অম্লান স্নেহের মাধুর্য্য উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। সুদূর মরুপর্ব্বত-নিবাসী এক প্রবাসী কাবুলিওয়ালার একমাত্র দুহিতৃসঙ্গ-বিচ্যুত বিচ্ছেদ-পীড়িত হৃদয়ের অন্তর্ব্যথা লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে গল্প গাঁথিয়াছেন—তাহা চিরদিন পাঠকের হৃদয়ে গাঁথা হইয়া থাকিবে। স্নেহ প্রভেদ মানে না, অবস্থা সমাজ প্রভৃতির বিচার করে না, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্তের বিরোধ যুক্তি বুঝে না, তাই সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী গৃহের এক ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখিয়া কন্যাবিচ্ছেদ-কাতর কাবুলিওয়ালার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে প্রত্যহই বালিকা মিনিকে দেখিয়া যাইত। তাহার সহিত দুদণ্ড তুচ্ছ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া, তাহাকে আঙুর মেওয়া খাওয়াইয়া সে আপনার পিতৃহৃদয়ের অন্তর্ব্যথা ভুলিবার চেষ্টা করিত। যে দুহিতার একটি হাতের ছাপ—এই স্মরণচিহ্নটুকু মাত্র বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতিবৎসর এই দূর দেশে ব্যবসা করিতে আসিত—তাহারই মুখ-খানি স্মরণ করিয়া সে 'খোখীকে' মেওয়া দিয়া যাইত—'সে ত সওদার জন্য নহে;' তাই মিনির পিতা যখন তাহাকে দাম দিতে গেলেন, সে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। ইতিমধ্যে একদিন এক মারামারি অপরাধের জন্য রহমৎকে দীর্ঘকালের জন্য কারাবাসে যাইতে হয়। মুক্তি পাইয়াই যেদিন সে মিনির খোঁজে তাহাদের বাড়ী উপস্থিত হইল, সেদিন শরৎ প্রভাতে বালিকার বিবাহোপলক্ষে সানাইয়ে করুণ তান ঝরিতেছে, চারিদিকে ব্যস্ততা কোলাহলের অন্ত নাই। রহমৎ মিনিকে দেখিতে চাহিল—তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। কিন্তু "রাঙা চেলীপরা, কপালে চন্দন আঁকা বধূবেশিনী

মিনি" যখন সলজ্জ পদবিক্ষেপে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রহমতের বুকের মধ্যে একটা আঘাত লাগিল। মিনি আর সে বালিকাটি নাই দেখিয়া, মধ্যে আট বৎসরের ব্যবধানের কথা তাহার মনে পড়িল—সে হঠাৎ বুঝিতে পারিল যে তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন করিয়া আলাপ করিতে হইবে। বুকের কাছে তাহার কন্যার হস্তের মসীময় ছাপটুকু অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে, কিন্তু এই আট বৎসরে সে কন্যার কি হইয়াছে কে জানে! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, "কলিকাতার এক গলির ভিতর বসিয়া রহমৎ আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।"

গল্পটিতে আমরা দেখিলাম, সেই চিরপুরাতন চিরন্তন পিতৃস্নেহকেই এক নূতন অবস্থানের মধ্যে চিত্রিত করিয়া, লেখক তাহার সৌন্দর্য্যটুকু আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এ স্নেহের মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না, আমাদের জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে হয়ত তুচ্ছ হইলেও ইহা মহান্, সামান্য হইলেও ইহা অসামান্য, কারণ ইহা চিরন্তন, কারণ ইহার নূতনত্ব ইহার সৌন্দর্য্য কখনও মলিন হইবার নহে। আমাদের চারিদিকে প্রতিদিনই যে রসস্রোত বহিয়া যাইতেছে, প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে যে রসের লীলা নিত্য নূতন ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তাহারই এক অংশকে এইরূপে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দেওয়াই ছোট গল্পের এক প্রধান কার্য্য বলিয়া আমাদের মনে হয়।

এ গল্পটিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে —রবীন্দ্রনাথ এক কাবুলিওয়ালাকে লইয়া এ গল্প রচনা করিয়াছেন। হইতে পারে সে একজন তুচ্ছ কাবুলিওয়ালা, সুদূর মরুপ্রদেশে তাহার জন্ম, বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে একজন বলিয়া তাহার কোনও স্থান নাই—আমাদের সাহিত্যের রাজপথ তাহার জন্য নহে। তথাপি সাহিত্যের একপ্রান্তে তাহার আসন নির্দ্দিষ্ট আছে,—সে তাহার মনুষ্যত্বের আসন; তাহার পিতৃস্নেহের বলে সাহিত্যের দরবারে সে যে আবেদন পেশ করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা সত্য আবেদন আর কি হইতে পারে? এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি আভিজাত্যের বাধা অতিক্রম করিয়া মানবত্বের বিশাল ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটির মধ্যেও কেবলমাত্র এক দরিদ্র পোষ্টমাষ্টার, আর এক অনাথা বালিকা রতন—আর কেহ নাই। এক নিস্তব্ধ নিরালা অপরিচিত পল্লীর মধ্যে, বর্ষার মেঘান্ধকার দ্বিপ্রহরে বা ঝিল্লীধ্বনিমুখরিত বারিপতনশব্দমুখর সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ পোষ্টমাষ্টারের অন্তরে মনুষ্য সঙ্গের জন্য একটা হাহাকার উঠিয়াছে, "হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানব মূর্ত্তি"কে নিকটে পাইবার জন্য অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু উপায় নাই—তাই তাঁহার দাসী বালিকা রতনকে ডাকিয়া তাহার সহিত নিজের ঘরের কথা আলোচনা করিয়া তিনি সান্ত্বনা পাইতে চাহিতেন। রোগশয্যায় যখন পোষ্টমাষ্টারের একটুখানি সেবা পাইতে, "স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করিত" তখন এই বালিকা রতনেরই যত্নে তাঁহার মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইত না। "বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্ত্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথা সময়ে বটিকা খাওয়াইল এবং সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল।" তার পরে, পোষ্টমাষ্টার কাযে বিদায় লইয়া বাড়ী যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রতন একবার তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহিয়াছিল, তাহা হইল না। পোষ্টমাষ্টার তাহাকে যে অর্থদান করিতে চাহিলেন—উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলের মধ্যে বালিকা তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। পোষ্টমাষ্টার চলিয়া গেলেন--সমস্ত পথ হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—"একটি সামান্য

গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।" সেই মর্ম্মব্যথাই গল্পটিকে সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে—পাঠকের হৃদয়েও এই ব্যথা গিয়া আঘাত করিয়াছে!

'আপদ' গল্পে—যাত্রার দলের এক লক্ষ্মীছাড়া ছেলে নৌকাডুবি হইয়া এক ভদ্রসংসারে আশ্রয় পাইল এবং তাহার জীবনে এই প্রথম স্নেহের আস্বাদও পাইল। সমস্ত বাল্যকাল যাত্রার দলে মিশিয়া কাটাইয়া, বাল্যের যা শ্রেষ্ঠ দান—পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ—তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া—তাহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। বয়স যেখানে পৌঁছিতেছিল, হৃদয় সেখানে অনুপস্থিত ছিল,—নিজের সম্বন্ধে তাহার মনে একটা সম্মানের ভাব জাগিবার অবসর পায় নাই;—হঠাৎ স্নেহের বারিধারাসিঞ্চনে তাহার হৃদয় সরস হইয়া উঠিল, আপনাকে সে চিনিতে পারিল। "সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় একথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিত না—আপনাকে এবং আপনার জগৎটাকে সে মনে মনে একটি নবীন আকারে সৃজনে করিয়া তুলিত। কিন্তু এই স্নেহলাভের পর স্নেহের দুঃখও তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। স্নেহের বিন্দুমাত্র অবহেলা লইয়া অভিমান, অভিমানে নিভৃতে অশ্রুবর্ষণ, স্নেহের প্রতিহিংসা প্রভৃতি তাহার মনের শান্তি নষ্ট করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন—যিনি তাহাকে স্নেহ করিতেন তিনি তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন এই ভুল বিশ্বাসে সে তাহার আশ্রয়স্থল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

আপদ

রবীন্দ্রনাথের দুই-একটি গল্পে, আবার, অনেকগুলি ঘটনার সমাবেশও করা হইয়াছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি এইরূপ একটি গল্প। গল্পগুচ্ছের মধ্যে এ গল্পটি অন্যতম। ইহার ঘটনাবলীর মধ্যে সাময়িক কোনও ঘটনার হয়ত ছায়াপাত হইয়াছে—ঘটনাগুলি ইংরাজ শাসনের দুই-চারিটি দোষের দৃষ্টান্তস্বরূপও বলা যাইতে পারে—বাঙ্গালীর আত্মসম্মান জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টাও তাহাদের মধ্যে থাকিতে পারে; সে যাহাই হউক, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। লেখকের কৃতিত্বগুণে ঘটনাগুলির সহিত গল্পের একটা ভিতরের যোগ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে তাহা পরে দেখা যাইবে।

মেঘ ও রৌদ্র

আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে তাঁহার গল্পে, বিশেষতঃ তাঁহার শিশুরাজ্যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে নিছক আনন্দের অবসর দেন নাই—আনন্দের মধ্যে বিষাদেরও অবতারণা করিয়াছেন—হাস্যোচ্ছ্বাস-সংযত করিয়া অশ্রুর বন্যা বহাইয়াছেন। সেই দিক দিয়াই 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প চিরকাল আমাদের মনে গাঁথা হইয়া থাকিবে। মানব জীবনের একটা ট্র্যাজেডির দিক ইহাতে দেখান হইয়াছে। কোথায় কেমন করিয়া যে কি হইয়া গেল তাহা জানা গেল না, কিন্তু যেমনটি ছিল তেমন আর রহিল না। যেখানে প্রভাতের অম্লান রৌদ্র হাসিতেছিল, সহসা একখণ্ড কালো মেঘে সেখানটা অন্ধকার হইয়া গেল। সে অন্ধকার মুছিবার নহে।

এই ক্ষুদ্র জীবন-নাট্যের যবনিকা যখন উত্তোলিত হইল, তখন বর্ষণশ্রান্ত আকাশে খণ্ড মেঘ ও ম্লান রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলিতেছে। লেখক তখনই আমাদিগকে গল্পের পরিণামের জন্য—ট্র্যাজেডির জন্য—প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। যে দুটি প্রাণী—একটি চঞ্চল, অভিমানী, স্নেহশীলা বালিকা, আর একটি সংসারানভিজ্ঞ, শিক্ষিত যুবক—এই যে দুটি প্রাণীর সহিত লেখক আমাদিগের প্রথম পরিচয় করিয়া দিলেন, বর্ষাদিনের ম্লান সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে সেই দুটি প্রাণীর তুচ্ছ খেলা, মান-অভিমান অশ্রুবর্ষণ—মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মত সামান্য বা তুচ্ছ মনে হইলেও সামান্য নহে। লেখক বলিতেছেন—"যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীর মুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে, সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল বিকালের তুচ্ছ হাসি কান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী

সুখ দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল।" নিরীহ প্রকৃতি এবং মুখচোরা ভাবের জন্য শশিভূষণের গ্রামের কাহারও সহিত মেশা হইল না, এবং আইন পাস করিয়াও কোন কর্ম্মে ভিড়া হইল না। একমাত্র গিরিবালাই মনুষ্য-সমাজে তাঁহার সঙ্গী ছিল। তিনি তাহাকে পড়াইতেন, পড়িয়া শুনাইতেন, এবং বালিকার জামের দৈনিক ভাগ পাইতেন; এইরূপে এই দশ বৎসরের বালিকা আর এই এম-এ, বি-এল যুবকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামের দলাদলি, ইক্ষুর চাষ, পাটের কারবার প্রভৃতির বাহিরে ইহারা নিজেদের এক স্বতন্ত্র জগতে বাস করিত। কিন্তু লেখক সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, 'ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোন বিষয় নাই।'

ইতিমধ্যে ঘটনাস্রোত বিপরীত দিকে বহিতে লাগিল। শশিভূষণকে দুই-একটি ঘটনায় বাধ্য হইয়া নির্জ্জনতা হইতে লোকালয়ে আসিবার আয়োজন করিতে হইল এবং আইনের গ্রন্থে অধিকতর মন নিবিষ্ট করিবার প্রয়োজন হইল; বহির্জ্জগতের দিকে তাঁহার দৃষ্টিই রহিল না। গিরিবালা জানালার কাছে আসিয়া ফিরিয়া যায়, তাহার শিক্ষকের জন্য আনীত ফুল, ফল, মিষ্টান্ন তাহারই নিকট জমিতে থাকে—শিক্ষক চাহিয়া দেখেন না। অভিমানে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যায়, পথের পাশে দাঁড়াইয়া বালিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে থাকে। এমনি করিয়াই যেন ট্র্যাজেডির পূর্ব্বলক্ষণ স্বরূপ একটা বিচ্ছেদের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন যখন শশিভূষণের আইনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, মনে পড়িল যে গিরি অনেক দিন আসে নাই—তখন গিরিবালার পাত্রস্থির হইয়াছে, আসিবার আর উপায়ও নাই। বালিকার অভিমান তাহার হৃদয়েই পুঞ্জীভূত হইয়া রহিল, এবার আর তাহা ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। "বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুলফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্খলিত পক্ষিচঞ্চুক্ষত সুপক্ক কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল।" হায়, গিরিবালারই কেবল স্বাধীনতা নাই!

ইহার পরে, দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদের পূর্ব্বে, সেদিন শশিভূষণ গিরিবালার দেখা পাইলেন, সেদিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই, তথাপি তিনি নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তখন চকিতের মত একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে।... গিরিবালা জানিতেও পারিল না যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।" নৌকা ক্রমে দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল। শশিভূষণ চষমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া তাঁহার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

তার পরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে আবার যখন উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন গিরিবালা নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবা বেশধারিণী—এই পাঁচ বৎসরে বালিকা জীবন হইতে প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য্যে উপনীতা। আর শশিভূষণের জীবনেও একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসর কারাবাসের পর আজ তাঁহার গৃহ নাই, সমাজ নাই, আশ্রয় নাই;—জীবন যাত্রার সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—জীর্ণ শরীর ও শূন্য হৃদয় লইয়া আবার কোনখান হইতে নূতন জীবন আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না।

সেদিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল। শশিভূষণ "মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন, সেখানে কি চক্ষে পড়িল? সেই ক্ষুদ্র গরাদে দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ, সেই ডুরে কাপড় পরা ছোট মেয়েটি এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।" সে সুখের জীবন আজ বহুদূরে ফেলিয়া আসিয়াছেন—সেদিনের

স্মৃতি স্বপ্নমাত্র;—আজ আবার ভাগ্যদেবতা তাঁহাকে এ কি দেখাইলেন!

মানুষের এ ভাগ্যপরিবর্ত্তন সংসারে চিরদিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। অতীত দিনের স্মৃতিই, দুঃখের দিনে তাহার একমাত্র সম্বল।

'সমাপ্তি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের আর একটী শ্রেষ্ঠ গল্প। এ গল্পের বালিকা মৃন্ময়ীর কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। স্বাধীন, উচ্ছৃঙ্খল, চঞ্চল, প্রকৃতি এই মেয়েটী শিশুরাজ্যে একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রবের মত ছিল; যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণশিশুর মত নির্ভীক কৌতূহলময়ী, অবিশ্রান্ত অজস্র হাস্য কলোচ্ছ্বাসে ঝঙ্কারময়ী কোনওরূপ নিষেধ বা বন্ধন তাহাকে বেদনা দিত। গ্রামস্থ প্রায় সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত, ভালবাসিত; কিন্তু তাহার দুরন্ত অবাধ্য বালিকা প্রকৃতির অন্তরালে যে একখানি স্নেহময় রমণী হৃদয় সুপ্ত অবস্থায় আছে তাহা একমাত্র যুবক অপূর্ব্বকৃষ্ণ বুঝিয়াছিল। তাহার জীবনচঞ্চল মুখখানি অপূর্ব্বর অন্তরে ছায়াপাত করিয়াছিল; অপূর্ব্ব মৃন্ময়ীকে বিবাহ করিল। বিবাহ করিল বটে, কিন্তু নিজে তাহার স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে চাহিল না। বিবাহের পরও বালিকার প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই—অপূর্ব্ব তাহার উদাসীনতায় ব্যথা পাইত; কিন্তু তাহার কোন ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিত না। তাহার মনে হইত "যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোণার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটীকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়।" রূপার কাঠি হাস্য, আর সোণার কাঠি অশ্রুজল। তাই অবশেষে, একদিন অপূর্ব্ব কলিকাতায় চলিয়া গেল। এতদিনে অপূর্ব্ব দূরে যাওয়াতে মৃন্ময়ী আপনাকে চিনিতে পারিল—তাহার বাল্য ও যৌবনের মধ্যে কবে যে পর্দ্দা পড়িয়া গেছে তাহা জানিতে পারে নাই, আজ হঠাৎ তাহার পরিচয় পাইল। স্বামী যতদিন কাছে ছিলেন, ততদিন নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর তাহার হয় নাই,—চাহিলে দেখিয়া বিস্মিত হইত—তাহার অলক্ষিতে, কোন গোপন মুহূর্ত্তে অপূর্ব্ব তাহার হৃদয়ে ভালবাসার সিংহাসনটীতে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। "অনেক দিনের হাস্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ বিচ্ছেদের অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।" চঞ্চল চপল বিদ্রোহী বালিকা স্নিগ্ধ-গম্ভীর প্রেমময়ী সমবেদনাময়ী রমণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইহার পর কলিকাতায় অপূর্ব্ব ও মৃন্ময়ীর মিলন হইল।

সমাপ্তি

'সমাপ্তি' গল্পের মধ্যে আমরা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের নিদর্শন পাই। এই বিশ্লেষণ, রবীন্দ্রনাথ-রচিত পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু গল্পগুচ্ছের 'দৃষ্টিদান' প্রভৃতি দুএকটি গল্পেও আমরা সে শক্তির যথেষ্ট স্ফুরণ হইয়াছে দেখিতে পাই। যে গল্পে তিনি শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়াছেন—সেখানেই মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়াছে।

'দৃষ্টিদান' গল্পে একটি শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র আছে। এই হিসাবে এই গল্পটিকে আমরা অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের একটী শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'নৌকাডুবি'র পার্শ্বে স্থান দিতে পারি। হিন্দু স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ যে অনাদি কালের সম্বন্ধ, জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ—কেবল এক সামাজিক গ্রন্থিমাত্র নহে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার হাত দিয়া 'নৌকাডুবি'র 'কমলা', 'দৃষ্টিদানে'র 'কুমুদিনী' বাহির হইয়াছে। হিন্দু স্ত্রী স্বামীকে পূজা করে, দেবতার আসনে স্থাপনা করে, তাই সে দেবতার গায়ে যাহাতে কলঙ্ককালিমাটুকু না লাগে, সেজন্য তাহার এত ব্যাকুলতা। স্বামীর মধ্যে সে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে, কিন্তু স্বামীর মঙ্গল সাধনের জন্য, স্বামীকে অধর্ম্মের পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সে স্বামীকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

দৃষ্টিদান

স্বামীর চিকিৎসার দোষে অন্ধ হইয়া কুমুদিনী

ভাবিল—"যখন পূজার ফুল কম পড়িয়াছিল, তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম।"…"এই শান্তি এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম।" তার পরে যেদিন স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল—সেদিন ত্যাগের মাহাত্ম্যে তাহার "দেবীত্বে অভিষেক" হইয়া গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এইখানে তাহার নারীত্বটুকুও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ? এই দেবীত্ব উচ্চলোকের সামগ্রী হইলেও, নারীত্বের সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারিল না। কুমুদিনীর মধ্যে যে নারী আছে, তাহার প্রতি এইরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লেখক তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইতে দিলেন না—এইটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কুমুদিনী বলিতেছে, "সেদিন সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী যে কোনমতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একবারে দংশন করিয়া রহিল, কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না।" নারীত্বের অহমিকাটুকু ছিল বলিয়াই পরে অগ্নি-পরীক্ষা আসিল। লেখক সেটুকু ইঙ্গিত করিয়াছেন। কুমুদিনী বলিতেছে —"একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কুমুদিনীর স্বামী, স্ত্রীকে লইয়া চিকিৎসাব্যবসায়ের জন্য পল্লীগ্রামে গেলেন। স্বামীর প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সহিত স্বামীর অন্তরের বিচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল। পরীক্ষা আরম্ভ হইল; স্ত্রীর আদর্শ তেমনিই আছে, স্বামীর আদর্শ পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। কুমুদিনী বলিতেছে—"স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়;— কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া উঠে যখন মনে করি আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই;—আমি অন্ধ, সংসারের আলোকবর্জ্জিত অন্তর প্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ণ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি, আমার দেবমন্দিরের জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্য দান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শুকায় নাই,—আর আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চির-নবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জ্জনের পশ্চাতে সংসার মরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম্ম বলি, যাহাকে সকল সুখসম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতি দূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম—তাহার পর কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই, অবশেষে আজ আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাই না।"

স্বামী একদিন শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন—আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না। সেই স্বামী যখন স্ত্রীকে ছলনা করিয়া পুনরায় বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ করিলেন—তখন স্ত্রী স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য স্বামীকে ছড়াইয়া উঠিল। স্বামী ধর্ম্মপথ লঙ্ঘন করিয়া অমঙ্গল ঘটাইবেন, পাপের ভাগী হইবেন, তাহা কি হিন্দু স্ত্রী সহ্য করিতে পারে? স্ত্রী বলিল—"যদি আমি সতী হই,তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন তুমি কোন মতেই তোমার ধর্ম্মপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।" স্বামী চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যায় "কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল।" কুমুদিনী তাহার স্বামীর রক্ষার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল না,—স্বামীকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল। স্বামীর মঙ্গলকে, স্বামীর পুণ্যকে স্বামী হইতে বড় করিয়া দেখিল—স্বামীর অপমান, ব্যক্তির অপমান। ব্যক্তির অপমান হউক, স্বামিত্বের—দেবতার আসনে যাঁহার স্থান—তাঁহার যেন অপমান না হয়।

সাধ্বী স্ত্রীর এই প্রার্থনার বলেই স্বামী অধর্ম্মের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে স্ত্রীকে তাহার সমস্ত দাবী, সমস্ত অভিমান ছাড়িতে হইল। একদিন সে দেবতাকে বলিয়াছিল—"হে দেব, আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি ত আমার আছ।" "তুমি আমার আছ", এ কথাও স্পর্দ্ধার কথা—ইহার মধ্যে দাবী আছে—ত্যাগ এখনও সম্পূর্ণ নহে—তাই দেবতা তাহাকে জানাইয়া দিলেন—যে 'আমি তোমার আছি' এইটুকু বলিবার অধিকারই তাহার আছে; সংসারে মানুষের প্রার্থনা চূড়ান্ত নহে—তাঁহার ইচ্ছাই শেষ।

এই গল্পটিতে আমরা দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু স্ত্রীর একটা বিশেষ উচ্চ আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন। গল্পটিকে আমরা একটি ছোটখাট উপন্যাসও বলিতে পারি। অনেকাংশে এই দৃষ্টিদানের অনুরূপ স্ত্রীচরিত্র তাঁহার আরও দুই তিনটী গল্পে দেখিতে পাই।

গল্পগুচ্ছের দুই-একটি গল্পে কৌতুকের এবং একটু হাস্য রসেরও অবতারণা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অধ্যাপক', 'রাজটীকা', 'মুক্তির উপায়' প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'অধ্যাপক', 'রাজটীকা' এই দুটি গল্পের যে হাস্যরস, তাহা প্রভাতকুমারের হাস্যরস নহে। প্রভাতকুমারের হাস্যরস ক্ষুরধারের মত কাটিয়া চলিয়াছে; ঘটনাস্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহারই মধ্যে ঘটনাসংঘাতে হাস্য উছলিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথ হাস্যরসের মধ্যেও বিশ্লেষণ ও ভাবুকতার অবতারণা করিয়াছেন। যাঁহারা কেবলমাত্র হাসিতে চাহেন, তাঁহাদের ইহা হয়ত প্রীতিকর নাও হইতে পারে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার গল্পের নায়ককে এরূপভাবে কল্পনা করিয়াছেন যে হাস্যরস জমাইবার জন্য বিশ্লেষণ ছাড়া উপায় নাই। যেমন 'অধ্যাপক' গল্প। গল্পের নায়ক মহীন্দ্র কবি বা কবিযশ-প্রার্থী, কলেজের অধ্যাপকের তীক্ষ্ণ সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া, মহাকাব্য লিখিয়া

অধ্যাপক

প্রতিশোধ লইবার আশায় গঙ্গাতীরে নির্জ্জন বাগান বাটীতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত। সেখানে কাব্য দূরে রহিল, (অর্থাৎ কোন উপায়েই, অনেক সাধ্য সাধনাতেই কাছে আসিল না) কবি ইতিমধ্যে ভালবাসায় পড়িলেন। ভালবাসা কিন্তু একপক্ষে, উভয়ত নহে। কবি কবির মতই ভালবাসিয়াছেন—কাযেই রবীন্দ্রনাথকেও কবি হৃদয় বিশ্লেষণরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কবির প্রেমের বিকাশ দেখাইতে হইয়াছে। যাহা আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হইবে, কবির চক্ষে তাহা অন্যরূপ;—কবি কেবল ভালবাসিয়াই ক্ষান্ত হন না—প্রেমকে ভাবুকতায় মণ্ডিত করিয়া লইতে চাহেন। প্রেমপাত্রীর প্রতি কথা, প্রতি সলজ্জ দৃষ্টি, প্রত্যেক ভঙ্গিমা, প্রত্যেক পাদবিক্ষেপ হইতে নিত্য নূতন কবিত্ব-সৌন্দর্য্য চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে চাহেন; আমাদের কবি মহীন্দ্রনাথও সেইরূপ ভালবাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই ভালবাসার কৌতুক এইখানে যে, যাহাকে ভালবাসিলেন সে ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানে না, কিংবা জানিলেও সে সংবাদ তাহার কৌতুক ছাড়া আর কোন ভাবের উদ্রেক করে নাই। কবি কিন্তু যখন কিরণের প্রদত্ত চায়ের পেয়ালা হাতে লইতেন, তাহার সহিত কিরণের পাত্রভরা ভালবাসাও গ্রহণ করিতেন; "কিরণ যদি সহজ সুরে বলিত, মহীন্দ্র-বাবু কাল সকালে আস্‌বেন ত," কবি তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে জানিতে পাইতেন—

"কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান!
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।"

এবং কিরণের শাকে বেগুনের ক্ষেতে তদপেক্ষা অতি দুর্লভ অমৃত ফলেরও সন্ধান পাইতেন। এইরূপে ভালবাসা যখন জমিয়া আসিতেছে, তাহার ফল যখন সহজলভ্য হইয়া উঠিয়াছে—সেই সময়ে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, কে এক কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে, মহীন্দ্র বাবুর নাম দ্বিতীয় তৃতীয় কোন বিভাগেই নাই; এবং তখনই পাশের বাড়ীতে গিয়া মহীন্দ্র দেখিলেন—তাঁহার

খ্যাতিস্থানের শনি নবীন অধ্যাপকের সহিত "কিরণ সলজ্জ সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মত ছল-ছল করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।" গল্পের উপসংহার হইল। আমাদের পক্ষে এ উপসংহার কৌতুকজনক হইলেও, আশঙ্কা করি কবি, প্রেমিক মহীন্দ্রনাথের পক্ষে ঠিক সেইরূপ হয় নাই।

'রাজটীকা' গল্পের নায়ক রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু-শেখরের পুত্র উপাধিলোলুপ জমিদার নবেন্দুশেখর,দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া সুন্দরী শ্যালিকা সম্প্রদায় এবং শ্বেতাববর্ষী রাজপুরুষ সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যে কাহার সম্মান রাখিয়া চলিবেন এই সমস্যায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। দুই কুলই বজায় করিয়া চলিতে হইবে, কাযেই এক কূলের কাছে অর্থাৎ শ্যালিকা সম্প্রদায়ে হতভাগ্যকে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল—কিন্তু আবার ধরা পড়িয়া অপমান। অবশেষে ঘটনাচক্রে যে নবেন্দু ইংরাজের এক সখের সহুরে অনেক ব্যয়ে এক ঘোড়দৌড়ের মাঠ করিয়া দিয়া রায় বাহাদুরীর শেষ সোপানের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল—সেই নবেন্দুকে আজ কংগ্রেসে চাঁদা সহি করিয়া কংগ্রেস-দলভুক্ত হইতে হইল। কিন্তু রাজপুরুষের কাছে সম্মান হারাইলেও, মহারাণীর জন্মদিন-রাত্রে নবেন্দু প্রত্যেক শ্যালীর স্বহস্ত-রচিত একগাছি করিয়া পুষ্পমালা কণ্ঠে উপহার পাইয়া যে সম্মান লাভ করিল —শ্যালীদেরই কথায় বলি—ভারতবর্ষে সেরূপ সম্মান আর কাহারও সম্ভব হয় নাই,—ভবিষ্যতে কাহারও হইবে কিনা জানি না।

রাজটীকা

রাজটীকা গল্পে বিশ্লেষণের ভাগ অনেক কম বলা যাইতে পারে। কয়েকটী ঘটনার সাহায্যে এ গল্পে হাস্যরস বেশ সহজেই জমিয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে "মুক্তির উপায়" গল্পটীর নাম করা যাইতে পারে। ইহার হাস্যরসের সহিত প্রভাতকুমারের হাস্যরসের বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। 'অধ্যাপক' গল্পে কৌতুক বা হাস্য যেমন গল্পের উপসংহারে গিয়া জমা হইয়াছে; এ দুটী গল্পে সেরূপ হয় নাই;—মাঝে মাঝে ঘটনাসংঘাতে আমরা অনেকবার হাসিবার সুযোগ পাইয়াছি।

মুক্তির উপায়

'ঠাকুর্দ্দা' গল্পের মধ্যে কতকটা কৌতুক আছে বটে; কিন্তু এক বালিকার অশ্রুজলে সমস্ত কৌতুক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গল্পের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছে। কৌতুকের কথা অতিক্রম করিয়া, হীনদশাগ্রস্ত উচ্চবংশ-সম্ভূত নিরুপায় বৃদ্ধের জন্য তাহার পিতৃমাতৃহীন নাতিনীর যত্ন চেষ্টা, তাঁহার খেয়ালে বাধা না দিয়া তাঁহাকে মনের আনন্দে রাখিবার প্রয়াস—এইটুকুই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে এবং আমাদের মনে চিরকাল গাঁথা হইয়া থাকিবে। আরও দুই চারিটী গল্পে এইরূপ একটু আধটু কৌতুকের অবতারণা করা হইয়াছে—কিন্তু সে সমস্তের আলোচনায় বিশেষ প্রয়োজন নাই। মোটের উপর হাস্যরস গল্পগুচ্ছের মধ্যে অতি অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমরা গল্পগুচ্ছের যতগুলি গল্পের আলোচনা করিলাম, সেগুলি ছাড়া আরও এক শ্রেণীর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্প আছে—যথা 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা', 'মণিহারা', 'জীবিত না মৃত', 'কঙ্কাল' প্রভৃতি। এ গল্পগুলি 'ভূতালোকপন্থী' কথাসাহিত্যের অন্তর্গত। যোগ্যতর ব্যক্তি এগুলি সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন, * সে সুন্দর সমালোচনার পর আমাদের আর কিছু বলিবার নাই।

অবশেষে আর একটি গল্পের উল্লেখ আমরা করিতে চাই—'একটা আষাঢ়ে গল্প'। এ গল্পে রূপকের সাহায্যে লেখক একটী তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। যখন এক দেশে বা সম্প্রদায়ে বাহিরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়, প্রাণের স্পন্দন থামিয়া যায়, কেবলমাত্র বহুদিনকার নিয়ম বা বিধান মানিয়া শৃঙ্খলামতে চলাই তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়, তাহার বাহিরে যে এক অপরিমিত

একটা আষাঢ়ে গল্প

---

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', বৈশাখ ১৩২৫, শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

আশা অভিলাষ উৎসাহ আনন্দের জগৎ আছে তাহা বিস্মৃত হয়—তখন বিদেশ হইতে এক নূতন বার্ত্তা-বিধান হইতে মুক্তির একটা বিপুল আহ্বান আসিয়া সে সম্প্রদায়কে নবজীবনের হিল্লোলে নবজাগরণের উল্লাসে স্পন্দিত করিয়া তুলে। আলোচ্য গল্পে এক তাসের রাজ্যে বিদেশের রাজপুত্র এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইল। "ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিল।" পূর্ব্বের অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্ত্তনীয় গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল! "সংসার প্রবাহ আপনার সুখ দুঃখ, রাগদ্বেষ, বিপদ সম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নব রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল।"

গল্পগুচ্ছে এই যে এক নূতন ধরণের ছোটগল্প-সাহিত্যের উদ্ভব হইল, বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া আছে। প্রতিভাশালী গল্প লেখকের অভাব না থাকিলেও, সাহিত্য হিসাবে ছোট গল্প সর্ব্বথা উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে একথা বলা যায় না। ছোট গল্পও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্তর্গত। রূপক বা দৃষ্টান্ত সাহায্যে ধর্ম্ম বা নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রচারের জন্যই যে ছোট গল্পের আবশ্যকতা তাহা নহে—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ন্যায় ইহার মধ্যেও কল্পনার লীলার সুযোগ আছে, সৃষ্টির অবসর আছে, আর্টের প্রয়োজন আছে, ক্ষণিকের আনন্দের কারণ না হইয়া ইহা চিরন্তন উপভোগের সামগ্রী হইতে পারে। উপন্যাসের যা কার্য্য, ছোট গল্পেরও তাহাই; তবে উপন্যাসের ক্ষেত্র বিস্তৃত, 'অনেকগুলি নরনারী, তাহাদের কার্য্য চিন্তা জীবনসমস্যা,—কোনও একটা বৃহৎ সমাজ, তাহার সমস্যাসমূহ—এই সকল অবলম্বন করিয়া তবে একটা উপন্যাস গঠিত হইয়া উঠে; কিন্তু সামান্য একটু ঘটনা, মানুষের কয়েক দিনের জীবন-ইতিহাস, বিশেষ কোন রসের সৃষ্টি যাহা উপন্যাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না. অথচ সাহিত্যে তাহার মূল্য আছে—এই সকলের জন্য ছোট গল্পের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প--ছোটত্ব এবং গল্পত্ব দুই হিসাবেই—এক একটি গীতি-কবিতার ন্যায়—সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল,মাধুর্য্যে অম্লান—গল্পগুচ্ছের আলোচনায় আমরা তাহা দেখিলাম। আমাদের চারিদিকে ছোট গল্পের সহস্র উপকরণ রহিয়াছে—সে গুলিকে বাছিয়া লওয়াই শিল্পীর কার্য্য। আমাদের জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত বিষয়গুলি ছোট গল্পের বিষয়ীভূত হইলে, ছোট গল্পের এক প্রধান কার্য্য সাধিত হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের একদিকে যে অভাব আছে—প্রভাতকুমারের গল্প-সাহিত্যে তাহার অনুপূরণ হইয়াছে। হাস্যরসেই প্রভাতকুমারের বিশিষ্টতা। "সমাজের কালো দিক্‌টাকে হাসির আলোকে পাঠকের সামনে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।" গল্প সাহিত্যের এই দিকটায় তাঁহার কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ছোটগল্প-সাহিত্যের উন্নতির সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। গল্প আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি মাত্র। আমাদের জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যের শেষ সীমায় এখনও উপনীত হয় নাই। জীবন যত বিস্তৃত, যত বিচিত্র এবং যত অভিনবত্বমণ্ডিত হইবে, গল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রও তঁতই প্রসারিত হইবে। কথাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা কখনই নিরাশ হইব না।

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার।

প্রাকৃত বাঙ্গালা ও তাহার কয়েকটি বিশেষত্ব

বাঙ্গলা ভাষার সংস্কৃতেতর অংশ "প্রাকৃত বাঙ্গলা" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, একথা আমরা প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি (চৈত্র সংখ্যা)। এখানে প্রাকৃত অর্থে সংস্কৃতের অপভ্রংশ নয়, কিন্তু প্রাকৃত বা সাধারণ জনের ভাষা। এই অংশে প্রাকৃত (সংস্কৃতের অপভ্রংশ) ও প্রাকৃতোৎপন্ন শব্দের সংখ্যাই বেশী; কিন্তু ইহার উক্তরূপ নামকরণ সে জন্য করা হইল না। রবীন্দ্রনাথের কথা একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা যাইতে পারে, যে-বাঙ্গালায় আমরা কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি তাহার সংস্কৃতভাগ বাদ দিয়া যাহা থাকে, তাহাকেই আমরা প্রাকৃত বাঙ্গালা বলিতেছি। এই অংশে নানাজাতীয় শব্দের অবাধ গতি ও সংস্কৃত-নিরপেক্ষ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও ইহাই খাঁটি বাঙ্গলা।

প্রথমেই এই অংশের শব্দ প্রকরণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, প্রাকৃতোৎপন্ন শব্দই বহুল পরিমাণে ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এই সকল শব্দের বাঙ্গলায় রূপান্তর, কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই হইয়াছে। সং বধূ—প্রা বহু—বাং বউ। এইরূপ, দধি—দহি—দই। সং হস্তী, হস্ত—প্রা হত্থী, হত্থ—বাং হাতী, হাত; এইরূপ, প্রস্তর, মস্তক—পত্থর, মত্থঅ—পাথর, মাথা। সং অদ্য, অষ্ট, অর্দ্ধ, কর্ণ, কল্য, ঘর্ম্ম, চক্র, যথাক্রমে প্রাকৃত অজ্জ, অট্‌ঠ অদ্ধ, কণ্ণ, কল্ল, ঘম্ম, চক্ক, এবং বাঙ্গলায় আজ, আট, আধ, কান কাল, কারণ, ঘাম, চাক, (ও চাকা)। দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে যুক্তবর্ণ থাকিলে বাঙ্গলায় প্রথমাক্ষর সম্প্রসারিত হইয়া আকারান্ত হইয়া যায়।

কিন্তু এই রূপান্তর-তত্ত্ব আজ আমাদের আলোচ্য নহে। জিজ্ঞাসু পাঠক রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্বিতীয় অধ্যায়, ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'প্রাচীন বাঙ্গলার দুইটি বিশেষত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৯শ ভাগ, ২য় সংখ্যা) দেখিতে পারেন। যোগেশ বাবু তাঁহার শব্দকোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে সোজাসুজি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই প্রণালী অনুসারে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণে অগ্রসর হওয়ায় তিনি যে অনেক স্থলে কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখাইয়াছেন (উক্ত পত্রিকার ২৩শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ও ২৫শ ভাগ ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার "বাঙ্গালা ব্যাকরণে"ও যেখানে কন্‌কন্ টন্‌টন্ নড়নড় প্রভৃতি দ্বিরুক্ত শব্দের আলোচনা করিয়াছেন, সেখানেও দেখি তিনি লিখিয়াছেন যে এই জাতীয় শব্দগুলির মূল সংস্কৃত (১৪৩ পৃষ্ঠা)। এখানেও তিনি ভুল করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। এই শ্রেণীর কোন কোন শব্দ সংস্কৃতমূলক হইলেও প্রাধানতঃই যে সেগুলি ধ্বন্যাত্মক (যাহা অন্যত্র তিনি 'অনুকার-শব্দ' নামে আখ্যাত করিয়াছেন, ২৩৩ পৃষ্ঠা) ও ইঙ্গিতাত্মক অর্থাৎ ইঙ্গিতে বা ঠারে-ঠোরে নানা ভাব প্রকাশক তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শব্দতত্ত্বে' এই মত অনুসারে এই সকল শব্দ বিচার করিয়াছেন, এবং তাহাই সঙ্গত। যোগেশ বাবু কিন্তু সকল শব্দই সংস্কৃতমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। ফলে অর্থ লইয়া তিনি অনেক স্থলে গোলে পড়িয়াছেন এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "ব্যাকরণের তুলাদণ্ডে সকল শব্দ ঠিক বসে নাই।" ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "দলমল দোলে মুণ্ডের মাল।" ইহার উপর যোগেশবাবু টীপ্পনী করিতেছেন, "মালা কাহাকে দলিত ও মলিত করিতেছিল?" আমরা বলি, দল ও মল ধাতু হইতে যে দলমল হইয়াছে তাহা ধরিয়া লইবার কারণ নাই। উহা একটি ইঙ্গিতাত্মক অনুপ্রাসিক দ্বিরুক্ত শব্দ।

যাক্, এ আলোচনায় আর বেশী প্রয়োজন নাই।

এখন এই প্রবন্ধের লক্ষ্যীভূত শব্দাবলীর নিম্নলিখিত রূপ শ্রেণিবিভাগ করা যাইতে পারে।

১। প্রাকৃত। প্রাকৃত শব্দগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম অবিকৃত প্রাকৃত; যথা, ঘর, বাড়ী, দুয়ার (দুআর), তেল, শেজ, শিয়াল (শিআল) ইত্যাদি। দ্বিতীয়, বিকৃত প্রাকৃত। বাঙ্গলা ভাষায় এই পর্য্যায়ভুক্ত শব্দের সংখ্যাই বেশী। উপরে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। আমি (প্রা-আম্হি), তুমি (প্রা—তুম্হি), সে (প্রা—শে) প্রভৃতি বাঙ্গলা সর্ব্বনামও প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন।

২। বৈদেশিক শব্দ। অনেক বৈদেশিক শব্দ আমাদের নিত্য ব্যবহৃত ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী যে-যে জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে, তত্তৎ জাতির ভাষা হইতে কিছু না কিছু সে গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট হইতে আমরা অনেক আরবী ও ফার্সী শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছি। যথা—আইন, আদালত, উকিল, কাছারি, আমির, ওমরা, কাগজ, কলম, খুসী, খবর, খাজনা, নজর, নগদ, নরম, বাজার, মজুর ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ। য়ুরোপীয় জাতিগণের মধ্যে আমরা প্রথমে পর্ত্তুগীজ ও পরে ইংরাজদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। তাহার ফলে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ শব্দ, এবং অনেক ইংরাজি শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। আবার ইংরাজি ভাষার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বৈদেশিক শব্দও কিছু কিছু আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বাঙ্গলায় প্রচলিত ইংরাজি শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলি অবিকৃত আছে, অবশিষ্টগুলি ভাষার প্রকৃতি অনুসারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। প্রথমোক্তের উদাহরণ—উইল, কুইনাইন, কার্পেট, কমিটি, কোট, কলেজ, শ্লেট, পেন্সিল, পিন, নিব, ব্যাগ, বুট, ব্যাঙ্ক, রেল, পকেট, ফ্যাসান, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি। বিকৃত ইংরাজি শব্দের উদাহরণ আপিস, আপীল, আস্তাবল, হাসপাতাল, ডাক্তার, টেক্স, বাক্স, গেলাস, বেঞ্চি, টেবিল, ইস্কুল, টিকিট, বিস্কুট, রসীদ, আরদালী ইত্যাদি। পর্ত্তুগীজ শব্দের তালিকা—আয়া (ayah), আলকাতরা (alcatrao), আনারস (ananas), আতা (ata), নোনা (anona), বালতি (balde), কেদারা (cadeira), কামিজ (camisa), চাবি (chave), ইস্পাত (espada), ফিতা (fita), গরাদে (grade), গুদাম (gudao), গির্জ্জা (igreja), জানালা (janela), নিলাম (leilao), মাস্তল (mastio), পাদ্রি (padre), পেয়ারা (pera), পিপে (pipa), পেরেক (prego), সাবান (sabao), সায়া (saia), বরগা (verga), বেয়ালা (viola)। * এতব্যতীত ফেঞ্চ (জিন্, জেল, ডিপো ইত্যাদি), স্প্যানিশ (কর্ক, মেরুনো, নিগ্রো ইত্যাদি), ইতালিয়ান (ম্যালেরিয়া, গেজেট, ভেলভেট ইত্যাদি), চীনা (চা, চিনি, সাটিন, লিচু), আমেরিকান্ (তামাক, আলপাকা, মেহগ্নি) প্রভৃতি অন্যান্য বৈদেশিক শব্দও ইংরাজির মধ্য দিয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছে। খোকা, খুকী, ধুচুনি, কুলো, মাঝি, মাল্লা, লেপ, বালিশ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বোধ হয় আদিম নিবাসীদের নিকট হইতে গৃহীত।

অতঃপর প্রাকৃত বাঙ্গলার কয়েটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

১। বিভক্তি-চিহ্নের অল্পতা। বাঙ্গলায় বহু-বচনে কারকে ও ক্রিয়াপদে সংস্কৃতের তুলনায় (এমন কি হিন্দী ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার তুলনায়ও) খুব কম বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। আবার এই অল্প সংখ্যক বিভক্তিও কোন কোনটা স্থল-বিশেষে উহ্য থাকিয়া যায়। রা, গুলা (ও গুলি), দের (ও দিগের) বহু-বচন জ্ঞাপক। 'সকল' ও 'সব' যখন এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন অবশ্য এগুলিকে বিভক্তির পর্য্যায়ে ফেলা যায়। 'গণ' ও 'সমূহ' সংস্কৃত শব্দ এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সহিতই এগুলি ব্যবহৃত হয়। এই সকল খাঁটি বাঙ্গলা বিভক্তি সংস্কৃত শব্দের অন্তে বসে; যথা বন্ধুরা, পুরুষগুলা (অবজ্ঞার্থে), ধনীদের।

* শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন প্রদত্ত তালিকা হইতে—"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বৈশাখ।

কারকে দেখা যায় যে এক 'এ' বিভক্তি সকল কারকেই চলে। যথা লোকে বলে (কর্ত্তা), আমায় (আমাএ) বল (কর্ম্ম), চোখে দেখ (করণ), সুপাত্রে কন্যা দিবে (সম্প্রদান), লোভে (লোভ হইতে) পাপ পাপে মৃত্যু (অপাদান), ঘরে আছে (অধিকরণ)। এখানে আমরা যোগেশবাবুকে অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের সব কয়টি কারকই লইয়াছি। কিন্তু বাঙ্গলায় সম্প্রদান ও অপাদান রাখিবার প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম, করণ ও অধিকরণেই উক্ত দুই কারকের অর্থ প্রকাশ করা যাইতে পারে। 'সুপাত্রে' সুপাত্রকে অর্থে কর্ম্ম কিংবা ন্যস্তার্থে অধিকরণ হইতে পারে। 'লোভে' হেত্বর্থে করণ হওয়ায় বাধা নাই।

উক্ত 'এ' (ও তাহার রূপান্তর য়) বিভক্তি ব্যতীত বাঙ্গলা কারকে 'কে' ও 'তে' এই দুইটিমাত্র বিভক্তি আছে। 'কে' প্রধানতঃ কর্ম্মে এবং সময় সময় কর্ত্তা ও অধিকরণেও দৃষ্ট হয়। যথা হরিকে মারিল (কর্ম্ম), আমাকে যাইতে হইবে (কর্ত্তা), আজকে যাইব (অধিকরণ)। 'তে' কর্ত্তা, করণ ও অধিকরণে চলে। যথা, আমাতে তোমাতে ইহা করিব (কর্ত্তা), ছুরীতে কাট (করণ), নদীতে মাছ আছে (অধিকরণ)।

সম্বন্ধে 'র', 'এর' ও 'কার' এই কয়টি বিভক্তি প্রচলিত, তন্মধ্যে 'কার' বিভক্তি-যুক্ত শব্দ বিশেষণবৎ হইয়া যায়। যথা—এখানকার, আগেকার।

ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে যোগেশবাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি লিখিতেছেন, "সংস্কৃত ভাষার তুলনায় বাঙ্গলা ভাষা কত সোজা! ধাতুর গণভেদ প্রায় নাই, ক্রিয়াপদেয় একবচন বহুবচন ভেদ নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালা আসামী (ও ওড়িয়া ভাষা), হিন্দী ও মারাঠীকে হারাইয়াছে। হিন্দী ও মরাঠীতে ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদও করিতে হয়। (বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৩১ পৃঃ)।

২। দ্বিরুক্ত শব্দ বাঙ্গলা ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব, ইহাতে অসংখ্য জোড়া শব্দের ব্যবহার। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা হইয়াছে। অন্য কোন ভাষায় বোধ হয় এত বেশী শব্দদ্বৈতের প্রচলন দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই জাতীয় শব্দগুলিকে নিম্নরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ। যথা বন্ বন, ভন্ ভন্, মিউ মিউ, ঘেউ ঘেউ, ঝন ঝন, ঝুপ ঝুপ, ঢক ঢক, কলকল, ছলছল, মড় মড়, ঝর ঝর ইত্যাদি। "আজি বারি ঝরঝর ভরা বাদরে।" ইংরাজিতেও এইরূপ imitative শব্দ আছে কিন্তু সংখ্যায় কম।

"বাংলা ভাষার একটী অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। যে সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।" (শব্দতত্ত্ব, ২৮ পৃষ্ঠা) যথা—কন কন, কট কট, কর কর, কুট কুট, ঝিন ঝিন, দর দর, ধক ধক ইত্যাদি। "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়াণি।" "ঝিকিমিকি করে আলো ঝিলিমিলি পাতা।"

(খ) ইঙ্গিতাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ। উপরে যে সকল শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি প্রধানতঃ অর্থহীন ধ্বনিমাত্র। আমাদের ভাষায় আর একশ্রেণীর যুগল শব্দ আছে যেগুলির মূলে অনুপ্রাসের ক্রিয়া বর্ত্তমান এবং একটি অর্থযুক্ত শব্দের সহিত তাহারই এক অর্থহীন বিকৃত রূপ যুক্ত হইয়াছে। "একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের পশ্চাতে একটা অনির্দ্দিষ্ট আভাস জুড়িয়া দেওয়া এই শ্রেণীর জোড়া কথার কাজ।" (শব্দতত্ত্ব, ১০৩ পৃষ্ঠা)।

এই সকল শব্দের সাহায্যে নানা রূপ ভাবপ্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ 'ভাষার ইঙ্গিত' নাম দিয়াছেন। উদাহরণ যথা—চুপচাপ, ঘুষঘাষ, তুকতাক, কাটাকুটি, ঘাঁটাঘুঁটি, ঠিকঠাক, মিটমাট, সেজেগুজে, মেখেচুখে, বাসন কোসন, চাকর বাকর ইত্যাদি।

ট দিয়া আমরা যে সকল অর্থহীন শব্দ তৈরী করিয়া অর্থযুক্ত শব্দের সহিত ব্যবহার করি, সেগুলিও এই শ্রেণীর। যথা জলটল, বইটই ইত্যাদি। কখনও কখনও স ও ম টএর স্থান অধিকার করে, তখন

অর্থও কিছু ভিন্ন হইয়া যায়। যথা, জড়সড়, মোটা-সোটা, রকমসকম, চটেমটে, রেগেমেগে, তেড়েমেড়ে ইত্যাদি।

কয়েক স্থলে বিকৃত রূপটা আগে বসে। যথা, অলি গলি, অন্ধি সন্ধি, আশ পাশ, হাবু ডুবু ইত্যাদি।

(গ) পরস্পরকৃত ক্রিয়ার ভাব-ব্যঞ্জক। এই শ্রেণীর যুগ্ম শব্দের দ্বিতীয়টি কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে, এবং দুইয়ে মিলিয়া একটা পরস্পর-কৃত ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে। এই সকল শব্দের প্রথমাংশ আকারান্ত ও দ্বিতীয়াংশ ইকারান্ত হয়। যথা, গলাগিলি, বলাবলি, জড়াজড়ি, বকাবকি, দলাদলি, কাছাকাছি, জানাজানি, মারামারি, মুখোমুখি, (মুখা-মুখি), খুনোখুনি (খুনাখুনি) ইত্যাদি। সংস্কৃতে কেশাকেশি, দন্তাদন্তি প্রভৃতি দ্বিরুক্ত শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি কেবল পরস্পর প্রহার অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং এই প্রহার ক্রিয়ার প্রহরণ রূপে ব্যবহৃত বস্তুটির দ্বিত্ব হয়। যোগেশবাবু এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে বহুব্রীহি সমাসের কোঠায় ফেলিয়াছেন। আমাদের মতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

(ঘ) সমার্থক শব্দদ্বৈত। সাধারণতঃ এই সকল জোড়া শব্দের হয় দুইটিই সংস্কৃত শব্দ, নয় একটি সংস্কৃত অপরটি খাঁটি বাঙ্গলা। যথা—লোকজন, ক্রিয়াকর্ম্ম, মায়া মমতা, শক্ত সমর্থ, লজ্জা সরম, ভয়ডর, চিঠিপত্র, ছাই ভস্ম, কাজ কর্ম্ম ইত্যাদি। কখনও কখনও দুই ভাগই খাঁটি বাঙ্গলা হয়। যথা—ছাই পাঁশ, ছোট খাটো, ধর পাকড়, বলা কওয়া ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর কতকগুলি জোড়া শব্দের দুইটিই ঠিক একার্থবোধক নয়, যদিও অর্থটা কাছাকাছি বটে। যথা—আলাপ পরিচয়, কথাবার্ত্তা, আমোদ আহ্লাদ, ভাবভঙ্গি, চালচলন, বনজঙ্গল, কাণ্ডকারখানা ইত্যাদি।

সমার্থ বোধক না হইলেও এক জাতীয় দুইটি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়া তাহাদের অর্থের অতিরিক্ত ভাব প্রকাশ করে। যথা—ঘটি বাটি, পড়ুয়া গুণী, কানা খোঁড়া, পথ ঘাট, শাক ভাত, হাতি ঘোড়া ইত্যাদি।

'পত্র' শব্দ যোগে কতকগুলি জোড়া শব্দ তৈরী হয়। যথা—তৈজসপত্র, জিনিসপত্র, খরচপত্র, বিছানা-পত্র ইত্যাদি।

এই পর্য্যায়ে যে সকল জোড়া শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল, সমাসবদ্ধ শব্দ হইতে সেগুলির প্রভেদ এই যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথার জুড়িগুলি যেন "চির দাম্পত্যে বাঁধা।" শুধু তাহাই নহে। শব্দগুলির স্থান চির-দিনের মত নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, অদলবদল করিয়া বসাইতে পারা যায় না। অনেক স্থলে শব্দাতিরিক্ত ভাব প্রকাশ করে।

(ঙ) সংস্কৃতে যেমন বীপ্সা প্রভৃতি কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে শব্দের দ্বিরুক্তি হয়, বাঙ্গলাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু নানারূপ বিভিন্ন অর্থে। সংস্কৃতে এরূপ বিচিত্র শব্দদ্বৈত নাই। নিম্নে কয়েক প্রকারের উদাহরণ দেওয়া গেল।

বীপ্সায় (Distributively) যথা—মধ্যে মধ্যে, পথে পথে, ঘরে ঘরে ইত্যাদি।

পরস্পর সংযোগবাচক যথা—বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, মানুষে মানুষে ইত্যাদি।

সংলগ্নতাবাচক—যথা, সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে, পেটে পেটে, পিছনে পিছনে। ইত্যাদি।

প্রকর্ষ বাচক—যথা, গরম গরম, ঠিক ঠিক ইত্যাদি।

পৃথক্ সত্তা জ্ঞাপক—যথা, নূতন নূতন, লাল লাল, মোটা মোটা, লম্বা লম্বা ইত্যাদি। আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে এই শ্রেণীর হইলেও ঈষৎ ভিন্নার্থ-বোধক।

ঈষদূনতা, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি ভাবব্যঞ্জক—মেঘ মেঘ, শীত শীত, পড় পড়, ভাসা ভাসা, হাসি হাসি, যাব যাব, উঠি উঠি।

এই শ্রেণীর শব্দদ্বৈতের এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই পর্য্যায়ের শ্রেণী বিভাগ ও উদাহরণগুলি রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' হইতে গৃহীত হইল।

৩। **বাঙ্গলা শব্দে আকার বাহুল্য**। বাঙ্গলা ভাষার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব

এই যে, প্রাকৃত হইতে যে সকল শব্দ আমরা বাঙ্গলায় পাইয়াছি সেগুলির অধিকাংশেই হয় আন্তক্ষর নয় শেষাক্ষর আকারান্ত। প্রাকৃতোৎপন্ন ব্যতীত অন্যান্য অনেক শব্দেও এই বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। সাধারণতঃ বিশেষ্যপদে প্রথমাক্ষরে ও বিশেষণে শব্দের শেষে আকার দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষ্যপদে।—প্রথমে বিশেষ্য পদগুলি আলোচনা করা যাক। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শব্দের দ্বিতীয়াক্ষরে যুক্তবর্ণ থাকিলে বাঙ্গলায় প্রথমাক্ষর সম্প্রসারিত হইয়া আকারান্ত হইয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণও সেখানে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমাক্ষর অনুস্বারযুক্ত হইলে তাহা বাঙ্গলায় আকারান্ত হইয়া যায়। যথা, বাঁশ (বংশ), হাঁস (হংস)। দ্ব্যক্ষর বিশিষ্ট কয়েকটি শব্দে দুইটি অক্ষরই আকারান্ত হইয়া গিয়াছে। যথা, পক্ষ, পত্র, চক্র, মঞ্চ, বক্র, গর্ত্ত যথাক্রমে পাখা, পাতা, চাকা, মাচা, বাঁকা, গাড়া হইয়া গিয়াছে। যুক্তাক্ষরহীন বিশেষ্য পদের বাঙ্গলার শেষে আকার যুক্ত হইয়াছে। যথা, হীরক—হীরঅ—হীরা, হৃদয়—হিঅঅ—হিয়া, শৈবাল—সেবল—শেওলা, লৌহ—লোহ—লোহা। এইরূপ সংস্কৃত তল, গল, মল, ছল, মাম, বাস, কাণ হইতে তলা, গলা, মলা, ছলা, মামা, বাসা, কাণা হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে দেহা, লেহা (স্নেহ) প্রভৃতি পদ বিরল নহে।

বিশেষণে।—খাঁটি বাঙ্গলায় অধিকংশ বিশেষণ যে আকারান্ত সে সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "সাহিত্য" পত্রে আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।—সাধারণ শব্দ। যথা—লম্বা, সোজা, বাঁকা, কাণা, খোঁড়া, কুঁজা, কালা, শুক্‌না, কাঁচা, পাকা, তিতা, মিঠা ইত্যাদি। সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দগুলি বাঙ্গলায় আকারান্ত হইয়া গিয়াছে। যথা—মরা, পুরা, ছেঁড়া, ধোয়া, মাজা, আক্রা (অক্রেয়), ভাঙ্গা ইত্যাদি। সংস্কৃতের নঞর্থ বাচক অ-উপসর্গ বাঙ্গলায় অনেক স্থলে আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। যথা—আধোয়া, আমাজা, আকাচা, আঁকাড়া।

সমাসে।—বাঙ্গলায় বহুব্রীহি বা তৎপুরুষ সমাস করিয়া যে সকল বিশেষণ শব্দ পাওয়া যায় সেগুলিও সাধারণতঃ আকারান্ত। যথা—লক্ষ্মীছাড়া, পাশকরা, হাতকাটা, মনগড়া, স্বপ্নে-দেখা, মা হারা, ঘরপোড়া ইত্যাদি।

ক্রিয়া পদে।—যখনই কোন ক্রিয়াপদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তখনই তাহা আকারান্ত হইয়া যায়। যথা—করা, ধরা, খাওয়া, পাওয়া, লেখা, পড়া, শোয়া, বসা ইত্যাদি। সমস্ত অসমাপিকা ক্রিয়া আকারান্ত। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলায় আ, না, অনা, আনা প্রভৃতি অনেকগুলি আকারান্ত কৃৎ প্রত্যয় আছে। আ, যথা—ঝরা, কাচা, ভাঙ্গা। না, ও অনা যথা—রান্না, কান্না, ধর্‌না, দেনা, পাওনা, কুটনা, বাটনা বাজনা, খেলনা ইত্যাদি। আনা, যথা—বাবুয়ানা, সাহেবিয়ানা, মুন্সিয়ানা ইত্যাদি।

৪। **বাঙ্গলার উচ্চারণ ও বানান**। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলার একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, ইহাতে অধিকাংশ স্থলে বানানের সঙ্গে উচ্চারণের মিল নাই, বিশেষতঃ খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলির বাঙ্গলা উচ্চারণে। সংস্কৃতের সমগ্র বর্ণমালা বাঙ্গলায় গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু অনেকগুলি বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই। ঈ, ঊ, ষ, স, ণ, য ও অন্তস্থ ব এগুলি বাঙ্গলায় নিরর্থক বানান-সমস্যা জটিল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। শুধু যে বর্ণমালা লইয়া গোলযোগ তাহা নহে। এসব বর্ণের উচ্চারণ ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ ভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, অধিকাংশ শব্দই আমরা লিখি একরকম উচ্চারণ করি অন্য রকম। এই কারণে, বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ অন্যান্য যাবতীয় ভাষার ব্যাকরণ হইতে সহজ হইলেও, এই এক উচ্চারণ বিভ্রাটের জন্য ইহা বিদেশীর নিকট অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হইবে। শব্দের আন্তক্ষরের অকার ও একার কখন যে ওকার ও অ্যা

রূপে উচ্চারিত হইবে তাহা কোন নিয়মদ্বারা নির্দ্ধারিত করা একরূপ অসম্ভব। 'কর দেখি' লিখিতবৎ উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু উহাই আবার একটু পরিবর্তন করিলে লেখার সঙ্গে উচ্চারণের আর মিল থাকে না, যেমন, 'করি দেখ'। আবার গণ, রণ, ক্ষণ শব্দগুলিতে আদ্যক্ষর অকারান্তই উচ্চারিত হয়, কিন্তু ধন, জন, মন, বন, মন, পণ প্রভৃতি এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলির প্রথমাক্ষরের উচ্চারণ 'ও'। * আবার যদি শেষোক্ত শব্দগুলির অন্ত্যবর্ণ ন স্থানে ল হয় তাহা হইলে উচ্চারণও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যথা, ধল ('কেশে ফুল ধল বেণে' মনোমোহন বসু), জল,মল,বল, পল; এইরূপ তল দল, গল ইত্যাদি। শুধু ল কেন, ন, ণ ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যঞ্জন শেষে থাকিলেই এইরূপ হইবে, যথা তট, বট, নর, বর। কিন্তু উচ্চারণ সমস্যা এইখানেই শেষ হইল না। যেই এই সকল শব্দের অন্ত্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণে ই, ঈ, উ, ঊ, এই কয়টি স্বরের যোগ হয়, অমনই আবার আদ্যক্ষরে উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়। যথা, জলীয়, মলিন, বলী, দলিত, তরু, তটিনী ইত্যাদি।

শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ লেখায় অকারান্ত হইলেও উচ্চারণে সাধারণতঃ যে হসন্ত তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা শুধু বাঙ্গলার বিশেষত্ব নয়। হিন্দী, মারহাটি প্রভৃতি ভাষাতেও এইরূপ হইয়া থাকে। হিন্দীতে আবার শব্দের মধ্যস্থিত অকারান্ত ব্যঞ্জনে হসন্ত উচ্চারণ হয়। যথা, সার্‌দা, মাল্‌তী, জগ্‌দীশ, পর্‌মাত্মা। সে যাহা হউক, শব্দের অন্তে যদি অকারান্ত যুক্তাক্ষর থাকে তাহা হইলে অকারের উচ্চারণ হয়।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে, বিদেশীর পক্ষে আমাদের ভাষার উচ্চারণ আয়ত্ত করা কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং ইংরাজি অভিধান মাত্রেই যেমন শব্দের উচ্চারণ দেওয়া থাকে, বাঙ্গলা অভিধানগুলিও সেইরূপ pronouncing dictionary হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ, মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গলা ভাষার প্রতি এখন সমগ্র সভ্যজগতের দৃষ্টি পড়িয়াছে। লণ্ডন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা হইতেছে। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস যে অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণ দিয়াছেন।

যাঁহারা বাঙ্গলা বানানের সংস্কার করিয়া উচ্চারণের অনুযায়ী করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই চেষ্টা প্রশংসনীয় বলিতে পারা যায়না, কারণ তাহাতে অনর্থক নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। আবার যাঁহারা সংস্কৃতোৎপন্ন শব্দমাত্রই সংস্কৃতের মত বানান করিতে বদ্ধ পরিকর, তাঁহারাও অনাবশ্যক জটিলতার জন্য দায়ী। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাণান সমস্যা'য় বানানের বানান 'বাণান' লিখিয়া সত্যসত্যই সমস্যাটা অনাবশ্যক রূপে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন। 'বর্ণন' হইতে বানান হইয়াছে বলিয়া কি রেফ্ চলিয়া গেলেও মূর্দ্ধণ্য ণ থাকিবে? এইরূপ, কর্ণ, পর্ণ হইতে উৎপন্ন কান, পান শব্দেও মূর্দ্ধণ্য ণ থাকিতে পারে না। মোট কথা, যে সকল শব্দের কোন বিশেষ বানান বাঙ্গলা ভাষায় বরাবর চলিয়া আসিয়াছে, সে সকল শব্দের সেইরূপ বানান রাখাই সঙ্গত, সংস্কৃতানুযায়ী করিতে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। কাজ, শেজ প্রভৃতি শব্দও ইহার উদাহরণস্থল। সংস্কৃত অনুসারে কায শেয লিখিবার আবশ্যকতা দেখি না। প্রবন্ধান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

বাঙ্গলা ভাষার এই সকল বিশেষত্ব আলোচনা করিলে ইহার স্বরূপটি বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় প্রভেদ কোন্‌খানে, সংস্কৃত ব্যাকরণ খাঁটি বাঙ্গালা অংশে প্রযুক্ত হইতে পারে না কেন, ভাষার গতি কোন্ দিকে—এ সব প্রশ্নেরও মীমাংসা হইয়া যায়। *

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

* যোগেশবাবু বলেন, ধন, জন প্রভৃতি শব্দের আদ্যক্ষর 'যেমন অকারান্ত লিখি তেমন অকারান্ত পড়ি'। (বাং ভা, ২৭৩ পৃষ্ঠা) কিন্তু তাহা কি ঠিক? পূর্ব্ববঙ্গে ঐরূপ উচ্চারণ বটে, রাঢ়ে নহে।

* ভাগলপুর শাখাপরিষদে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষা

বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে এখন উচ্চশিক্ষার বহুল প্রসার নানা কারণেই প্রয়োজন। এ দেশে শিক্ষা এতদিন অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য, কেবল মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ অতি অল্পলোকই করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা আমাদের শত বক্তৃতায় শত আবেদনেও কর্ণপাত করেন নাই, আমাদের সেই ভাগ্যবিধাতাগণ সহসা রবীন্দ্রনাথের বীণার ঝঙ্কারে চমৎকৃত হইয়া যখন বলিলেন, তাই ত! ভারতবর্ষ তবে অসভ্য নয়, যখন তাঁহারা জগদীশচন্দ্রের প্রচারিত নবীন সত্যকে বরণ করিতে যাইয়া স্বীকার করিলেন যে ভারতবর্ষের লোক এখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ; তখন হইতে বিদেশে বহুকাল পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা গুলি ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন বিবিধ কারণে। কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রচার অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্ত্তনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন সরকারী আফিস চালাইবার জন্য ইংরাজী শিক্ষিত কেরাণী, সরকারী আদালতে বিচার করিবার জন্য ইংরাজী শিক্ষিত হাকিম, চিকিৎসার জন্য ইংরাজী শিক্ষিত চিকিৎসক, এবং যেখানে এই সকল কেরাণী আমলা হাকিম প্রভৃতি সৃষ্টি হইবে সেই সকল বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য ইংরাজী শিক্ষিত বহু গুরু মাষ্টারের প্রয়োজন ছিল। তাই এতকাল আমরা ইংরেজের লিখিত কেতাব পড়িয়া, ইংরাজের প্রচারিত মতবাদ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিয়া, ইংরাজী সভ্যতার মূলসূত্রগুলি যত্ন সহকারে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। রাজনীতি ক্ষেত্রেও আমাদের জাতীয় জীবনের ধারা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করি নাই। মিল ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের বাক্যই ছিল আমাদের চরম অবলম্বন। স্বায়ত্ব শাসনের জন্য ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতেও আমাদের কখনও মনে হয় নাই যে আমরাও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারি, অথবা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

বোধ হয় এই ভাবেই আমাদের জীবন কাটিয়া যাইত, যদি ইংরেজ চিরকাল সমান ভাবে আমাদিগকে চাকরী যোগাইতে পারিতেন। কিন্তু বিদেশের সঙ্গে দেশের পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই আমাদের অভাবের মাত্রাটা দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিল, এবং উপার্জ্জনের চেষ্টা যে পরিমাণে বাড়িল, টাকার মূল্যটা তার দ্বিগুণ বেগে কমিয়া গেল। ইতিমধ্যে ইংরাজ সরকারের আফিসে, ইংরাজ সওদাগরের দোকানে, রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর ষ্টেশনে, সরকারী বেসরকারী বিদ্যালয়ে, আদালতে হাঁসপাতালে যত চাকরী ছিল, উমেদার জুটিয়া গেল তাহা হইতে অনেক বেশী। দেশে একদিকে হইল অসন্তোষের উৎপত্তি, অন্য দিকে পড়িয়া গেল ভবিষ্যতের ভাবনা। লর্ড মিলনার বিলাত হইতে আমাদের এখানকার সরকারী উপদেশ দিলেন, যে কয়েকটি লোকের চাকরীর সংস্থান করিতে পার, সেই কয়েকটিকেই ইংরাজী শিক্ষা দেও, বাকী সব কামার কুমার সুতার চামারের কায শিখুক। কিন্তু দেখা গেল যে ঐ সকল কাযেও বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয়, এবং সেখানেও বিশেষ বিভাগে বিশেষ প্রকারের শিক্ষা আবশ্যক। আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারিলাম না। তখন আমরা বিলাতী শিক্ষার মহিমায় ইংরাজের নিকট দাবী করিলাম—স্বায়ত্ত-শাসন। সরকার বলিলেন, তোমরা অযোগ্য; বেসরকারী ইংরেজ বলিলেন, তোমরা অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য। আত্ম-অভিমানে বড় আঘাত লাগিল—আমাদের বেদ,

উপনিষদ, কাব্য অলঙ্কার, নাটক প্রভৃতি সমস্ত তাল পাতার এবং তুলট কাগজের জীর্ণ পুস্তক বাহির করিয়া দেখাইলাম; তাঁহারা অনুকম্পার হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, কিছু বলিলেন না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি আমাদের এ-পুরুষের ক্ষমতার প্রমাণ বলিয়া জগতের আদালতে গৃহীত হইল না। এমন সময় ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র একেবারে জগতের সম্মুখে ভারতের বাণী প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইলেন।

তাঁহাদের প্রতিভা বিরাট, কীর্ত্তি অমর, কিন্তু তাঁহারা অমর নহেন। সে দুর্দ্দিন অতি সুদূর হউক যেদিন আমরা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্রকে আর দিগ্বিজয়ে পাঠাইতে পারিব না; কিন্তু সে দুর্দ্দিনের আগমন অবশ্যম্ভাবী। আর একথা ভুলিলেও চলিবেনা যে ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুইটিমাত্র। দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, জাতীয় দাবী বলবত্তর করিতে হইলে, আমাদের আরও অনেক বিশ্ববিজয়ী বিখ্যাত পণ্ডিত সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারতের তপোবনের স্থান আজ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিকার করিয়াছে, সুতরাং মনীষার উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের। কবি-প্রতিভা ভগবানের দান, কিন্তু পাণ্ডিত্য-লাভ পুরুষকারের আয়ত্তাধীন। বাছিয়া বাছিয়া দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল তরুণ যুবকদিগের পুরুষকারকে জ্ঞান-মার্গে নিয়োজিত করিতে হইবে।

ভারত-কলঙ্কের মোচন প্রথম করিয়াছেন বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্গালী জগদীশচন্দ্র। আর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে একটি পণ্ডিতসঙ্ঘ সৃষ্টি করিবার প্রথম চেষ্টা করিয়াছেন বাঙ্গালী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার নায়কতার বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বহু নবীন পণ্ডিত বিজ্ঞান ও সাহিত্য ক্ষেত্রে গবেষণা করিয়া নব নব সত্যের আবিষ্কার করিয়া বিদেশে ভারতের দাবী দৃঢ়তর করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বাস্তবিকই জাতিভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, হিন্দু ও মুসলমান, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, মারাঠা ও গুজরাটী আজ এক সঙ্গে, আশুতোষের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের সন্ধানে ছুটিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার আবর্ত্তে পড়িয়াছে। তাহার তপোবনের স্থান অধিকার করিয়াছে প্রাসাদ ও অট্টালিকা, তাহার হোম-ধূম-স্নিগ্ধ পত্রমর্ম্মরের স্থান অধিকার করিয়াছে আজ বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোক; কিন্তু ভারতের সেই সনাতন ভিক্ষাবৃত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সে কালের গুরু দরিদ্র শিষ্যের নিকট দেবদুর্ল্লভ দক্ষিণা কখনও কখনও দাবী করিতেন; গুরুভক্ত শিষ্য স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল খুঁজিয়া গুরুর অভীষ্ট পূর্ণ করিতেন। তাই ভরসা হয় এই উতঙ্ক, উপমন্যু, উদ্দালকের দেশে আশুতোষের আরব্ধ ব্রত অর্থাভাবে ব্যর্থ হইবে না।

ভারতের নলান্দার দশসহস্র অধ্যাপক ও ছাত্রের ব্যয় কেবল রাজ-অনুগ্রহে নির্ব্বাহিত হয় নাই, দরিদ্র গৃহীর ঘরে বৌদ্ধভিক্ষু যখন বুদ্ধের নামে ভিক্ষা পাত্র লইয়া উপস্থিত হইতেন, ভারতের গৃহী কখনও তাঁহাকে বিমুখ করেন নাই। ভারতের রাজা ও প্রজার, ধনী ও দরিদ্রের সমবেত দানে প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা ও নলান্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জগতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। বাঙ্গালী! দেবী সরস্বতী আজ তোমার দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত, আজ তাঁহারই হস্তে তোমার ভবিষ্যৎ ন্যস্ত; তাঁহাকে বিমুখ করিও না। গ্রীক সরস্বতী মিনার্ভা কেবল বিদ্যার দেবী ছিলেন না—তিনি যুদ্ধেরও দেবী। এই গ্রীক-কল্পনার মূলে যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে, আজ তাহা আর কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যুদ্ধে বল, বাণিজ্যে বল, আজ আর বাণীর অনুগ্রহ ব্যতীত বিজয় লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই আজ সর্ব্বস্বপণ করিয়া বঙ্গদেশে বীণাপাণির আরাধনার সময় আসিয়াছে। য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি বহু ধনীর অর্থে সমৃদ্ধ, ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলি বহুকাল ধনীর অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। কাশীর হিন্দু-

বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়ের বিখ্যাত কলেজ এবং পুণার ভারতীয়-মহিলা-বিদ্যাপীঠ স্থাপনে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট হইতে যে পরিমাণে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, ভারতের রাজা মহারাজা, শেঠ মহাজনগণের নিকট তদনুপাতে কিছুই পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাহার এই অর্থকষ্টের সময় দরিদ্রের নিকটই হাত পাতিয়াছিলেন; আশা আছে দরিদ্রেরাই "মিটাইবে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।" তাহাদেরই "শ্রেষ্ঠ দানে" বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধনার পথ সুগম হইবে; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট পণ্ডিতসঙ্ঘ একদিন জগতের সম্মুখে ভারতের সভ্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিয়া সেই দানের সার্থকতা প্রমাণ করিতে পারিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

অপরাজিতা

(উপন্যাস)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লাক্‌সারে।

তথায় জগন্নাথ বেণিসার বিধবা স্ত্রী ও তাহার সধবা কন্যা আলোক জ্বালিয়া, অপরাজিতাকে চিনিল; চুপি চুপি কি কথা কহিল; অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে আমার দিকে গুপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া হাসিল; এবং আমাদিগের জন্য দোকান ঘরের পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহাতে দুইখানা কম্বল বিছাইয়া দিল।

একখানা কম্বলে, আমি উপবেশন করিলাম।

অপরাজিতা অপর কম্বলে উপবেশন করিয়া, অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া, তাহার পেটক: খুলিল; এবং তাহার মধ্য হইতে বাতি ও দীপশলাকা বাহির করিয়া কক্ষমধ্যে আরও একটি আলো জ্বালিল। পরে একখানি বিছানার চাদর আমার কম্বলের উপর বিছাইয়া, কাপড়ের একটি ছোট পুটুলি বালিশের পরিবর্ত্তে তাহাতে স্থাপিত করিয়া বলিল—"এই শেষ রাত্রে, তুমি এইটি মাথায় দিয়া একটু ঘুমাইয়া লও। আমি বাহিরে যাইয়া, বেণে বুড়ীর সহায়তায়, আমাদের জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিব।"

আমি, আমার পূর্ব্ব রাত্রের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া বলিলাম—"না, তুমি ব'স; আমার কিছু কথা আছে, সকল কাযের আগে তোমাকে তাহা শুনিতে হইবে।"

"সে, কাল তখন গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া, সারা দিনমান ধরিয়া শুনিব। এখন তুমি ঘুমাও।—আমি বাহিরে যাইয়া, মুখ হাত ধুইয়া, চারিটি রান্না চড়াইয়া দিই।"—এই বলিয়া, আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, কেরোসিনের প্রদীপটি লইয়া, সে বাহিরে চলিয়া গেল।

তাহার আদেশে নিদ্রা আসিয়া যেন আমার চোখের পাতা টিপিয়া ধরিল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন প্রভাত-আলোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন অপরাজিতা আসিয়া সংবাদ দিল, "ছয়টা বাজিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করিব?"

অপরাজিতা। উঠিয়া মুখ ধোও, মুখ ধুইয়া কাপড় পড়।

আমি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বস।

অপরাজিতা। না, খাইতে বস।

আমি। কি রাঁধিয়াছ ?

অপরাজিতা। তুমি যাহা ভালবাস ;—সেই, সেই রকম মুগের ডাল, আর ভাত, আর আলু দিয়া, বেগুন দিয়া, বড়ি দিয়া একটা…

আমি। বড়ি কোথায় পাইলে ?

অপরাজিতা। বড়ি ও আমসী হরিদ্বার হইতে আনিয়াছিলাম। আমসীর অম্বল রাঁধিয়াছি। আর একটি জিনিষ তোমার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি। বল খাইবে ?

আমি। মাছ রাঁধিয়াছ না কি ?

অপরাজিতা। মাছ এখানে এই ভোরের বেলায় কোথায় পাইব ?

আমি। তবে কি ?

অপরাজিতা। বল খাইবে ?

আমি। খাইব।

অপরাজিতা। তোমার জন্য গোটাকতক পাণ সাজিয়াছি। বল খাইবে ?

তাহার সেই সুধাপূর্ণ মুখের সেই আগ্রহময় প্রশ্নের অন্য উত্তর ছিল না। আমি বলিলাম, "খাইব।" আমার উত্তর শুনিয়া, বুঝিলাম সে মহা আনন্দিতা হইল। আনন্দ-জ্যোতিতে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া বলিল—"আমি তোমার জন্য ভাত আনি। তুমি বাহিরে যাইয়া, মুখ ধুইয়া স্নান করিয়া এস।"

আমি কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অপরাজিতার কাণ্ড! একটা নাপিত জলভাণ্ড লইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আমার হাজামৎ করিবে।

সে আমার অবশিষ্ট কেশগুলির পুনঃ সংস্কার করিল ; দশ আনা ছ' আনা হিসাবে তাহা কর্ত্তন করিয়া, আমাকে নববিবাহিত একটি নব্য বাবু করিয়া তুলিল। আর দীর্ঘ নখগুলি কাটিয়া দিল। ক্ষোরাচারে আমার চিবুক চিক্কণ করিয়া দিল। তাহার পর, আমাকে ইঁদারার নিকট লইয়া আমার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, আমার গাত্র ও মস্তক সাবান অনুলেপনে মার্জ্জিত করিয়া, আমার যোগধর্ম্মের 'বোটকা গন্ধ' একেবারে লোপ করিয়া দিল।

স্নানান্তে পরিধান জন্য অপরাজিতা তাহার পেটক মধ্য হইতে আমাকে নূতন বসন বাহির করিয়া দিল ; এবং নাপিতকে একটি রজতমুদ্রাদ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিল।

সুগন্ধি সাবান অনুলেপনে স্নাত ও নববস্ত্র-পরিহিত হইয়া, আমি পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, অপরাজিতা বুরুস, চিরুণী ও সুগন্ধি তৈলের শিশি লইয়া আমার সমীপবর্ত্তিনী হইল, এবং আমাকে তাহার হস্তস্থিত বুরুস ইত্যাদি দেখাইয়া বলিল—"এই দেখ, ইহা তোমার জন্য কিনিয়া আনিয়াছি। এস তোমার মাথা আঁচড়াইয়া দিই।"

আমি মুস্কিলে পড়িলাম। কি করিব? রাত্রের সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। না, এ পাপ পথে আর অগ্রসর হইব না। অপরের পরিণীতা কুলকামিনীকে দিয়া আর কোন মতে কেশবিন্যাস করান হইবে না। একটু দূরে সরিয়া বলিলাম—"না, না, মাথা আঁচড়াইতে হইবে না। তোমার সহিত কতকগুলি কথা আছে, তাহা আগে শুন।"

"মাথা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে শুনিব।"—এই বলিয়া, সে আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, আমাকে কম্বলের বিছানার উপর বসাইল।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"না না, তোমার আঁচড়াইতে হইবে না ; আমাকে চিরুণী দাও, আমিই আঁচড়াইতেছি।"

সে আমার সম্মুখে একখানা আয়না রাখিল ; এবং গন্ধতৈলের শিশি হইতে কয়েক ফোটা গন্ধতৈল আপন পদ্মবৎ করতলে গ্রহণ করিয়া, তাহা আমার কেশে মাখাইয়া দিতে দিতে কহিল—"আজ আমার জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। একদিন নিজের কেশ বিন্যাস করিতে করিতে বলিয়াছিলাম, যদি কখন তোমার রুক্ষ কেশ মুণ্ডিত করিয়া, কখন তাহা গন্ধ-

তৈলে সিক্ত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার কেশবিন্যাস ও সিন্দুর পরা সার্থক হইবে। যাহা বলিয়াছিলাম, আজ তাহা করিলাম। আজ আমার সিন্দুর পরা সার্থক হইল।"

সেই কোমল করস্পর্শে, সে আনন্দোজ্জ্বল মুখের সেই মধুর কথায় আমি প্রায় গতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তথাপি কতকটা বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া আমি বলিলাম—"তুমি পরস্ত্রী, তোমাকে লইয়া পলায়ন করা আমার ভাল হয় নাই।"

সে বুরুস দিয়া চিরুণী দিয়া আমার কেশবিন্যাস করিতে করিতে কহিল—"তাহা বিচার করিবার এখন আর সময় নাই। তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া লও, নহিলে গাড়ী ধরিতে পারিবে না—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাক্‌সারেই থাকিতে হইবে।"

আমি আহার করিতে বসিয়া বলিলাম—"যদি ধরা পড়ি, দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

সে জিজ্ঞাসা করিল—"তরকারিটা কেমন হইয়াছে? বেণে বুড়ীর নিকট হইতে কিছু লঙ্কার আচার আনিয়া দিব কি?"

আমি বলিলাম—"তরকারি ও ডাল, দুইই ভাল হইয়াছে; তোমার রান্না কবে মন্দ হয়? আর লঙ্কার আচার?—দাও একটুও আনিয়া; আমসীর অম্বলের সহিত তাহা মন্দ লাগিবে না।"

অপরাজিতা একটা মৃৎপাত্রে অতি সুদর্শন বিম্ববিনিন্দিত চারিটি লঙ্কার সুরস আচার আমার ভোজন পাত্রের পার্শ্বে রাখিল।

আহা আহা, তোমরা যদি কখনও ভাঁজকরা কম্বলে বসিয়া, অপরাজিতার রান্না আম্‌সীর অম্বলের সহিত বেণিয়া বুড়ীর লঙ্কার আচার খাইতে,—সেই স্বর্গীয় ঝাল অম্ল মধুর রসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের আর বয়োবৃদ্ধি হইত না; চুল পাকিত না, দাঁত পড়িত না, গাত্রচর্ম্ম শিথিল হইয়া যাইত না। সেই অন্ন খাইয়া আমি কারাদণ্ডের ভয় ভুলিয়া গেলাম। পুলিশ, লালপাগড়ী কারাগারের লৌহদণ্ড সমস্তই সেই অম্লরসে বেমালুম হজম হইয়া গেল।

নির্ভয়ে আহার সমাধা করিয়া, আমি অপরাজিতা প্রদত্ত তাম্বুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে, অপরাজিতা বেশ-পরিবর্ত্তন ও আপন আহার সমাধা করিয়া লইল এবং অতি অল্প সময় মধ্যে পেটকাভ্যন্তরে বস্ত্রাদি পুরিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

রাত্রের মুটেকে বলা ছিল; সে যথাসময়ে আসিয়া পেটকটি গ্রহণ করিল। আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টেশনে আসিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া, আমি অপরাজিতাকে বলিলাম—"দেখ, আমার আর কাশী যাইবার ইচ্ছা নাই।"

"কোথায় যাইবে?"

"আবার হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইব।"

"কেন?"

"সেখানে তোমাদের বাড়ীতে তোমাকে পৌছাইয়া দিয়া, আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব।"

"আমাকে বিবাহ করিবে না?"

"না; আমার সহিত তোমাকেও কলঙ্কিনী করিব না। যাহাতে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়, এমন কায করিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

তাহার প্রসন্ন ললাট কুঞ্চিত করিয়া, অপরাজিতা আমার মুখের দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল। বুঝি আমার মুখমণ্ডলে আমার অন্তরের ছায়া দেখিতে চেষ্টা করিল। আমার অন্তরের ভাব বুঝিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল না। বুঝিয়া, সে একটু ভ্রূকুটি করিল এবং একটু হাসিয়া বলিল—"তোমার কোন ভয় নাই। আমাকে হরণ করার জন্য, তোমাকে কখন রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে না;—কে তোমার বিপক্ষে রাজদ্বারে অভিযোগ করিবে? আর হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইবার কথা বলিতেছ?—সেখানে আমি কাহার কাছে যাইব?"

"কেন, তোমার পিতামাতার কাছে।"

"আমরা সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা হরিদ্বার ত্যাগ করিবেন; এখান হইতে সাতটার সময় যে গাড়ী গিয়াছে, তাহাতেই তাঁহারা যাইবেন।"

"কোথায় যাইবেন?"

"বোধ হয়, দেরাদুন বা মসুরি পাহাড়ে যাইবেন।"

"তোমার পলায়নের কথা জানিতে পারিয়াও কি মসুরি যাইবেন?"

"আরও নিশ্চয় যাইবেন; আমাকে খুঁজিবার জন্য যাইবেন। আমি আমার বিছানার উপর একখণ্ড কাগজে লিখিয়া আসিয়াছি যে আমি দেরাদুন যাইতেছি কোন ভয় নাই, শীঘ্রই সংবাদ দিব। ঐ কাগজ পাইয়া, তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন, দেরাদুন যাইবেন। এবং দেরাদুনে আমার সন্ধান না পাইয়া তাঁহারা নিশ্চয় মনে করিবেন যে আমি মসুরি গিয়াছি। অতএব তাঁহাদের মসুরি যাইতেই হইবে। ইত্যবসরে কাশীতে যাইয়া, তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া একবারে দখল করিয়া ফেলিবে, এবং বাবাকে সংবাদ দিবে যে তাঁহার কুমারী কন্যাকে তুমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়াছ। আমি জানি, বাবা তাঁহার একমাত্র ও আদরের কন্যাকে, কেবলমাত্র অকুলীনের দ্বারা 'বিবাহিতা বলিয়া ত্যাগ করিতে পারিবেন না। কাযেই তোমাকেও তাঁহার গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ গাড়ী আসিল। চল আমরা গাড়ীতে উঠি। একটা নির্জ্জন কামরা খুঁজিয়া লও; বেশ গল্প করিতে করিতে যাইব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আত্মপ্রকাশ।

প্রভাতবায়ু ভেদ করিয়া, সুদূর লাকসার ছাড়িয়া গাড়ী যখন পূর্ব্বমুখে ছুটিল, তখন আপনাকে স্বদেশাভিমুখ মনে করিয়া, আমি কতকটা পুলকিত হইয়া পড়িলাম। এক অভিনব উল্লাসে আমার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। গাড়ীর গবাক্ষ দিয়া দেখিলাম, প্রভাত সূর্য্যের অপ্রখর কিরণে স্নাত হইয়া, প্রান্তরসীমান্তবর্ত্তী বৃক্ষ সকল নৃত্য করিতেছে; শষ্পশয্যায় গাভী সকল শয়ান রহিয়াছে; নদীতীরে মহিষী সকল দল বাঁধিয়াছে; রেলপথের অদূরে ক্ষুদ্র পল্বল পার্শ্বে সারস সকল ক্রীড়া করিতেছে; টেলিগ্রাফের তারে, বিচিত্র বর্ণের পক্ষী সকল বসিয়া, যেন গীতিময় পুষ্পের মালা গাঁথিয়াছে।

ধরণীর আনন্দ-হিল্লোলে, রৌদ্রময় আকাশের অসীম উদারতায়, আমার মুগ্ধহৃদয় সহসা প্রভাতের শতদলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সেই শুভমুহূর্ত্তে আমি সহসা দেখিতে পাইলাম যে আমার হৃদয়মধ্যে, পদ্মমধ্যে কীটের ন্যায় রাশি রাশি ছলনা এখনও লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমার যথার্থ পরিচয় এখনও আমি হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছি। বক্ষে এই ছলনা লইয়া, আমি কিরূপে আমার হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিব? অতএব আমি স্থির করিলাম, সর্ব্বাগ্রে অপরাজিতাকে আমার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিব।

আত্মপরিচয় প্রদানে উদ্যত হইয়া, গাড়ীর গবাক্ষ হইতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, অপরাজিতা বেঞ্চের উপর শুইয়া গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। প্রায় সারা রাত্র জাগিয়া আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া নিশ্চয় সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এক্ষণে গাড়ীর আন্দোলনে ও বায়ুর শীতল স্পর্শে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায়, সে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে জাগাইলাম না; পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার সেই আন্দোলিত দেহশোভা দেখিতে লাগিলাম।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে, গাড়ী নজীবাবাদ জংসনে পৌঁছিল। তথায় খাদ্যবিক্রেতাগণ খাদ্যপূর্ণ ডালি লইয়া প্লাটফরমে বিচরণ করিতেছিল। আমি এক ফলওয়ালার নিকট হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ন্যাসপাতি ক্রয় করিলাম; এবং অপরাজিতার জাগরণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

নজীবাবাদ হইতে গাড়ী ছাড়িবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে অপরাজিতা জাগ্রত হইয়া বলিল—"খুব ঘুমাইয়াছি।"

আমি বলিলাম—"কাল রাত্রজাগরণে তুমি ক্লান্ত হইয়াছিলে; এই নিদ্রায় তোমার অনেকটা ক্লান্তি দূর হইল।"

সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি একটু ঘুমাইলে না কেন?"

আমি বলিলাম—"না, আমি জাগিয়া, পথের নানা দৃশ্য দেখিতেছিলাম। দেখ, তোমার জন্য কেমন ন্যাসপাতি কিনিয়া রাখিয়াছি।"

সে বলিল—"তুমি খাও, আমি এখন কিছু খাইব না। আমার বাক্সে ছুরি আছে, দাঁড়াও বাহির করিয়া দিই, কাটিয়া খাইবে।"

আমি ন্যাসপাতি কাটিয়া, তাহা চর্ব্বণ করিতে করিতে কহিলাম—"তোমার সহিত কথা আছে। এতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলে বলিয়া বলিতে পারি নাই।"

অপরাজিতা প্রভাতের ন্যায় আবার ললাট কুঞ্চিত করিয়া ভ্রূকুটি করিল; বলিল—"আবার কি কথা?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আমার পরিচয় কিছু জান?"

সে। খুব জানি। না জানিলে পিতামাতাকে ছাড়িয়া, কে তোমার সহিত হাসিমুখে একাকিনী বিদেশে যাইত? প্রাণপণে ভালবাসিলেও, অপরিচিতের আহ্বানে তাহার সহিত পলাইতাম না। তোমার পরিচয় আমি খুব জানি।

আমি। আমার কি পরিচয় জান?

সে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তোমার সমুদয় পরিচয়ই আমি জানি।

আমি। তাহা কি?

সে। জানি যে হরিদ্বারে তুমি যোগী ছিলে,—লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল, গৈরিক বসন। এখন সে দাড়ি, সে বসন ভগবানের কৃপায় অথবা প্রেমের পরম মহিমায় গঙ্গালাভ করিয়াছে; সে চুল ছোট হইয়াছে, তাহাতে গন্ধতৈল মাখাইয়া, আমি বাঁকা টেরি কাটিয়া দিয়াছি;—এখন তুমি নবীন নাগর হইয়াছ। কাশীতে যাইয়া বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপায়, তুমি আমার প্রাণেশ্বর হইবে। ইহাই তোমার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পরিচয়। কেমন?"

আমি। আমার পিতামাতা কে, আমি কোন দেশের লোক—এ সকল কিছু জান কি?

সে। সবই জানি। সবই বাবাজীর নিকট শুনিয়াছি; আমিও শুনিয়াছি, বাবাও শুনিয়াছেন। তোমার বাড়ী বাঙ্গালা দেশে, শান্তিপুরের কাছে হরিপুরে। তোমার বাবার নাম ৺উমেশচন্দ্র রায়।

আমি। সব মিথ্যা; উহার এক বর্ণও সত্য নয়। আমি 'রায়' বামুন নই, আমার বাবা 'রায়' বামুন ছিলেন না, আমার চৌদ্দপুরুষ 'রায়' বামুন ছিল না।

সে। সর্ব্বনাশ! বল কি? বামুন নও? তবে তোমরা কি জাতি? মুসলমান না কি? সর্ব্বনাশ! তুমি আমাদের বাড়ীতে আহার করিলে, আমি যে তোমার পাতে খাইয়া ফেলিয়াছি! ও মা! কি হইবে? আমার একবারে জাত গেছে! কাশীতে যাইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে দশটা ডুব দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

আমি। না, না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।—আমি মুসলমান নহি।

সে। সর্ব্বরক্ষে! তাহা হইলে তুমি কি?

আমি। আমি ব্রাহ্মণ এবং বন্দ্যোপাধ্যায়,—ভগীরথ বাঁড়ুর্য্যের সন্তান।

সে। আমাদের পাল্টিঘর! হায়, হায়! এ কথা আগে বল নাই কেন? শুনিলে বাবা নিশ্চয় তোমার সহিত আমার বিবাহ দিতেন। আমাদের পলায়নের কোন আবশ্যক হইত না; এবং শুভকর্ম্মটা একমাস আগে হইয়া যাইত।

আমি। আমার পিতার নাম ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে। তবে বাবাজীর নিকট কেন মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে?

আমি। দুর্বুদ্ধি। মনে করিয়াছিলাম, বাবাজীর নিকট মিথ্যা পরিচয় দিলে, বাবাজী আর আমার মাকে হরিদ্বারে আনাইয়া কিম্বা আমাকে তাঁহার নিকট

পাঠাইয়া, আমার যোগধর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন না। আমি নিরাপদে যোগী হইয়া উঠিব।

সে। তোমার মা আছেন ?

আমি। আমি যখন বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তখন তিনি জীবিতা ছিলেন। পুত্রহারা হইয়া, এখনও বাঁচিয়া আছেন কিনা বলিতে পারি না।

সে। তুমি তাঁহাকে ফেলিয়া আসিয়া ভাল কর নাই। আমাদের বিবাহের পর তুমি আমাকে হরিপুরে তাঁহার কাছে লইয়া যাইও।

আমি। আমার বাড়ী হরিপুরে নহে।

সে।—তবে কোথায় ?

আমি। কলিকাতায়,—শ্যামবাজারে। আমি স্বপ্নেও জানি না, হরিপুর কোথায়।

সে। তবে আমাকে কলিকাতায় সেই শ্যামবাজারেই লইয়া যাইও।

আমি। না, সেখানে তোমার যাওয়া হইবে না। আমি কাশীতে বা পশ্চিমাঞ্চলের অপর কোন সহরে বাস করিব। সেই স্থানেই মাকেও লইয়া আসিব। দেশে, শ্যামবাজারে আর কখনও বাস করা হইবে না।

সে। কেন ?

আমি। দেশে আমার একটা ভয়ঙ্কর বিঘ্ন আছে।

সে। কি বিঘ্ন ?

আমি। কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে কালীঘাট নামক একটা ভয়ঙ্কর স্থান আছে। সেই স্থানের এক ব্রাহ্মণকুমারীর সহিত বাল্যকালে আমার বিবাহ হইয়াছিল।

সে। বল কি ? পাকাপাকি বিয়ে ? মাগী এখনও বেঁচে আছে নাকি ? কি জ্বালা ! তোমার সন্ধানে সন্ধানে সে নিশ্চয় কাশীতে আসিবে। গন্ধে গন্ধে তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে।—মেয়েমানুষ জাত এমন নয় ; দশক্রোশ তফাত থেকে স্বামীর সন্ধান পায় ! তাহার পর তোমাকে পাইয়া, একবারে দখল করিয়া বসিবে। তখন আমার দশায় কি হইবে ?

আমি। তোমার কোন ভয় নাই ;—তুমি চিরকাল আমার একমাত্র আদরিণী থাকিবে। তাহাকে আমি কখনও গ্রহণ করিব না।

সে। সে কোন কাযের কথা নয়। তাহাকে গাঁটছড়া বাঁধিয়া বিবাহ করিয়াছ ; কিরূপে ত্যাগ করিবে ? গাঁটছড়ার বাঁধন, বড় কঠিন বাঁধন ! তুমি কেন সে পোড়ামুখীকে বিবাহ করিয়াছিলে ?

আমি। আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি তাহাকে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করি নাই।

সে। বিবাহের মন্ত্র ত বলিয়াছিলে।

আমি। না, মন্ত্রও উচ্চারণ করি নাই।—সে কটমট মন্ত্র প্রায় কোন বরই উচ্চারণ করিতে পারে না ; পুরোহিতের কথায় সায় দিয়া যায়।

সে। বিবাহের পর তাহাদের বাড়ীতে যাইতে ?

আমি। না, একবারও যাই নাই।

সে। তবে সে পোড়ারমুখীর কথা কেন তুলিলে ? একটা সতীনের জ্বালা কেন আমার বুকে জ্বালাইয়া দিলে ?

আমি। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আজ হঠাৎ আমার মনে হইল, যে তোমার কাছে আমার কোন কথা গোপন রাখা উচিত নয়। তাই সকল কথা তোমাকে বলিলাম। এখন তুমি আমার যথার্থ পরিচয় পাইলে ; জানিলে যে আমার জীবন ছলনাময় ; জানিলে যে আমি কৃতদার। এখন যদি তুমি মনে কর যে এই বিবাহিত মিথ্যাবাদী বরকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সুখকর হইবে না, তাহা হইলে, তুমি তাহা বলিবামাত্র আমরা মুরাদাবাদে নামিয়া পড়িব ; এবং হরিদ্বারে বাবাজীকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানিব, তোমার বাবা এখন কোথায় আছেন ;—তিনি নিশ্চয় বাবাজীকে সে কথা বলিয়া গিয়াছেন। তোমার বাবা কোথায় আছেন তাহা জানিয়া, আমি তোমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিব। এবং তাঁহার নিকট ও বাবাজীর নিকট আপনার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, দেশে

বিদেশে, তোমার কয়েকদিনের অতুলন ভালবাসার কথা ভাবিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইব।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আমি অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি হইলাম।

গাড়ী মুরাদাবাদে আসিয়া পৌছিল। মস্ত ষ্টেশন। প্লাটফরমে অনেক দোকান। খাদ্যদ্রব্য ক্রয় জন্য আমি প্লাটফরমে নামিলাম। পুরী ও তাহার সহিত কিছু কুমড়ার তরকারি কিনিলাম, আলুর দম কিনিলাম, দইবড়া কিনিলাম, মিঠাই কিনিলাম, গরম গরম চীনের বাদামভাজা কিনিলাম; এবং একে একে সকল জিনিষ অপরাজিতার নিকট গাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।

খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া অপরাজিতা বলিল—"ইহাই আমাদের দুইজনের যথেষ্ট হইবে। আর কিছু লইতে হইবে না। কেবল কিছু দুধ লও।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুধ লইব; কিন্তু পাত্র কোথায়?"

অপরাজিতা মুরাদাবাদী বাসনের দোকান দেখাইয়া দিল। সেখানে, রঙ্গের কলাইকরা বহুবিধ সুদৃশ্য পিত্তল পাত্র বিক্রীত হইতেছিল। অপরাজিতার অনুরোধক্রমে, আমি একটী গেলাস, একটি লোটা আর একটি ছোট বাল্‌তি ক্রয় করিলাম। একটি পয়সা দিয়া পাণিপাড়ের নিকট হইতে বাল্‌তি পূর্ণ করিয়া জল লইলাম। লোটাতে দুগ্ধ কিনিয়া রাখিলাম। গেলাসটি জলপূর্ণ করিয়া গাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম। এইরূপে অপরাজিতার সহিত, বিবাহের পূর্ব্বেই আমি গাড়ীতেই সংসার পাতিলাম।

তাহার পর দুই দিনের পুরাতন একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র, একটি পুস্তকের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম; এবং অপরাজিতা খাদ্যদ্রব্য সকল বেঞ্চের উপর একটি শালপাতায় সুসজ্জিত করিয়া দিলে, আহারে মনোনিবেশ করিলাম।

আহার অর্দ্ধসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার আহার হইলে, অপরাজিতা আহার করিয়া বলিল—"কুলীন বামুনের উচ্ছিষ্ট কি মিষ্ট!"

দুধ, কিছু মিষ্টান্ন ও সকালের সেই ন্যাসপাতি রাত্রের আহার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল।

অপরাজিতা সকালে যে সকল পাণ সাজিয়াছিল, এখনও তাহার কতকগুলি তাহার নিকট ছিল। সে তাহা হইতে দুইটি পাণ লইয়া একটি আমাকে দিল একটি আপনি খাইল।

পাণ খাইয়া, আমি সংবাদপত্র লইয়া, দুনিয়ার সংবাদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম।

পড়িলাম, যোধপুরে বড়লাট সাহেবের বক্তৃতা; লাট বাহাদুর, আহারাদির পর, নাবালক মহারাজার অভিভাবকের মহা সুখ্যাতি করিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন এবং অবশেষে মহারাজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সবান্ধবে মদ্যপান করিয়াছেন। পড়িলাম, আমেরিকার মহাসভায় সভাপতির জ্বালাময়ী বক্তৃতা। পড়িলাম বাঙ্গালায় লাটসভায় এক বাঙ্গালী সদস্যের অভ্রভেদী বক্তৃতা। পড়িলাম ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর কূটনীতিময়ী বক্তৃতা। বুঝিলাম মাতা বসুমতী বক্তৃতা হইয়াছেন।

কলিকাতার সংবাদ পড়িয়া বুঝিলাম যে কেল্লার সময়গোলক ঠিক একটার সময় পড়ে নাই, বার সেকেণ্ড পরে পড়িয়াছে; এক বালিকা মোটরগাড়ীর তলায় পড়িয়া মরিয়াছে; আগুন লাগিয়া এক পাটের গুদাম পুড়িয়া গিয়াছে; এক চীনে, চোরাই আফিম রাখায় ধরা পড়িয়াছে; গঙ্গার পুল বেলা দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

আদালতের সংবাদ পড়িয়া জানিলাম, যে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে, এক সঙ্গীন মকর্দ্দমা চলিতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে শ্যামপুর নামক এক গ্রামে, মাসিক আট টাকা ভাড়ায় এক দ্বিতল বাড়ী লইয়া, পাঁচটি যুবক তাহাতে বাস করিত। এই যুবকগণ একটা পিস্তল, একটা খুক্‌রী, দুইটা ছুরী, তিনটা কাঁচি ও তিনটা লাঠি লইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের

বিপক্ষে, মহা সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পুলিশের অদম্য চেষ্টায় পাপিষ্ঠেরা সকলেই ধরা পড়িয়াছে। একজন কেবল পুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া পশ্চিমাঞ্চলে কোথায় পলাইয়াছে। কেবল তাহাকে ধরিবার জন্য পুলিশ পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছে; আশা করা যায় যে পলাতক পাপিষ্ঠ শীঘ্র ধৃত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইবে। পাপিষ্ঠেরা সুঁড়োর এক বাগানবাড়ীতে বারুদ প্রস্তুতের কারখানা খুলিয়াছিল। সেখানে খানাতল্লাসী করিয়া, পুলিশ অর্দ্ধমণ কয়লা, একপোয়া গন্ধক, প্রায় ছয় ইঞ্চি চওড়া ও আট ইঞ্চি লম্বা একখানি সীসার পাত এবং সন্দেহজনক অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যে চারিজন লোক ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক সুবোধ ব্যক্তি রাজসাক্ষী হইয়া, অনেক লোমহর্ষক ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছে। যে বাটীতে পাপিষ্ঠগণ বাস করিত, তাহাতে একখানি কাগজ পাওয়া গিয়াছে; বুঝা গিয়াছে যে এই সকল লোকও রাজদ্রোহ ব্যাপারে সংসৃষ্ট। এই সকল লোকের নাম পুলিশ আপাততঃ প্রকাশ করিবে না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মকর্দ্দমা চালাইতেছেন কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার বাবু ও সরকারি উকীলবাবু; আর আসামীদের পক্ষে আছেন, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, ইউ, এন, দাস। পুলিশ আরও কতকগুলি সাক্ষী-প্রমাণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আরও কিছুদিনের সময় প্রার্থনা করিলে, আদালত পনের দিনের জন্য মকর্দ্দমা মুলতবি রাখিয়াছেন। আসামীগণ হাজতে বাস করিতেছে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে পড়িলাম, চীন দেশের লোকেরা আফিম খাইয়া, বড় দুর্ব্বল ও দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িতেছে। অতএব জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির চেষ্টা করা উচিত যে ইহারা যেন আর আফিম খাইতে না পায় এবং ইহাদের দেশে যেন আফিমের চাষ একবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টেরও সহায়তা করা উচিত। পরে, সম্পাদক মহাশয় জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিয়াছেন যে এই মহা প্রাচীন চীন জাতি যাহাতে ক্রমশঃ নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া, ক্রমে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত না হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীর বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

সম্পাদকের এই মন্তব্য পাঠ করিয়া, আমার সন্দেহ হইল যে চীন জাতির এই মহা প্রাচীনত্ব বুঝি আফিমের প্রসাদেই ঘটিয়াছে। অন্যপক্ষে, আলিপুরের সংবাদ পড়িয়া, আমার মনে সন্দেহ হইল না যে অবিলম্বে আমি নিজে ঐ ঘটনায় বিজড়িত হইব।

সংবাদপত্র পাঠ সমাধা করিয়া, আমি নানা বিষয়ে অপরাজিতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার সুমিষ্ট ও রহস্যময়ী কথা সকল শুনিয়া, শ্রবণ জুড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম সেই অল্পবয়সে সে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে।

রাত্রি আটটার সময়, গাড়ী বেরিলী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল।

এতক্ষণ আমরা গাড়ীর কামরাটি দুইজনে উপভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু বেরিলীতে দুইটি ভদ্রলোক ও একটি উত্তরীয়াবৃতা মহিলা আমাদের কামরায় আরোহণ করিলেন। ভদ্রলোক দুইটির মধ্যে, একজন হ্রস্বকায় বৃদ্ধ—সুগৌরতনু, জাতিতে পশ্চিমদেশীয় ক্ষেত্রী। অপর প্রবীণ ব্যক্তি, তাঁহার পুত্র; মহিলাটি পুত্রবধূ। এ সকল সংবাদ বৃদ্ধ আপনিই আমাকে প্রদান করিলেন।

তাহার পর বৃদ্ধ বলিলেন—"আমরা বেশী দূর যাইব না। সাহজাহান্‌পুরে নামিব। সেখানে আমার ছেলে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌। সেখানে আমার তিন পৌত্র আছে। আমার অসুখ হওয়ায়, আমার ছেলে, আমার পুত্রবধূকে লইয়া, আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল। এখন আমার অসুখ ভাল হইয়াছে। এখন আমি কয়েকদিনের জন্য সাহজাহান্‌পুরে যাইয়া থাকিব। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিব না। দেশে না থাকিলে, চলে না। বাড়ী ঘর দ্বার মাটী হইয়া যায়, খাজনা পত্র আদায় হয় না। আপনাকে ত বাঙ্গালী দেখিতেছি;—আপনি কতদূর যাইবেন?"

আমি ভাবিলাম, একজন পরস্ত্রীকে লইয়া পলায়নের সময়, একজন অপরিচিত লোকের নিকট সত্য সংবাদ দেওয়া হইবে না। কি জানি, যদি কোন গোলযোগ ঘটে! অতএব আমি পুনরায় আমার পুরাতন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি বলিলাম—"আমরা ফয়জাবাদ যাইব।"

বৃদ্ধ। ওঃ! সেইখানেই বুঝি আপনারা থাকেন? কি করেন?

আমি। আমি কোন কায কর্ম্ম করি না। আমার শ্বশুরের সেখানে ঔষধের দোকান আছে। সেখানে তাঁহার নিকট, তাঁহার কন্যাকে পৌঁছাইয়া দিব।

বৃদ্ধ। এইটি বুঝি তাঁহার কন্যা—আপনার স্ত্রী? আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?

আমি। আমরা গাজিয়াবাদ হইতে আসিতেছি।

বৃদ্ধ। বেশ, বেশ। আপনার নামটি কি বলিলেন?

আমি। আমার নামটি এখনও আমি আপনাকে বলি নাই।

বৃদ্ধ। বলিবার কিছু বাধা আছে কি?

"কিছু না।"—এই বলিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে, আমি একবার আপন মনে ভাবিয়া লইলাম; কি মিথ্যা নাম বলিব? এবার আপনাকে 'রায়' বামুন করা হইবে না। এবার বলিব, কার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। না না, মুখোপাধ্যায় বলা হইবে না।—অপরাজিতারা মুখোপাধ্যায়; মুখোপাধ্যায়ের সহিত মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় না। গাঙ্গুলি বলিতে হইবে;—বেগের গাঙ্গুলিরা ভারি কুলীন। কার্ত্তিকচন্দ্র গাঙ্গুলি?—না, হরিদ্বারের সেই 'কার্ত্তিকচন্দ্র' নামটা লুকাইতে হইবে। ভাবিয়া বলিলাম—"আমার নাম, অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি।"

নামটা শুনিবামাত্র, বৃদ্ধের পুত্র একবার আমার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন এই দৃষ্টিপাতের অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। পরে উহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ইংরাজ কবি-শ্রেষ্ঠ সেক্সপীর যে বলিয়াছিলেন—'নামে কিছু আসিয়া যায় না, গোলাপ অন্য নামেও মধুর হইত'—তাহা কেবল কবিত্ব মাত্র; এই গন্ধময় সংসারে নামে বিলক্ষণ আসিয়া যায়!

আমার নাম শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"আপনারা ব্রাহ্মণ; আমরা ক্ষেত্রী;—আমার নাম সদানন্দ সায়গাল; আমার ছেলের নাম, পুরুষোত্তম সায়গাল। আমার এই এক পুত্র; আর তিন পৌত্র। বড় পৌত্র আপনার সমবয়স্ক হইবে। আমরা সাহজাহান্‌পুরে নামিয়া গেলে, আপনি বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিবেন। রাত্রে আর এ গাড়ীতে লোক উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সকালে গাড়ী লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলে, যদি দুই একজন লোক উঠে। তা' লক্ষ্ণৌ-এ আপনারা নামিয়া, ফয়জাবাদের গাড়ীতে চড়িবেন। ফয়জাবাদের গাড়ীর জন্য লক্ষ্ণৌএ আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। তা' বেশ হ'বে, সেইখানে আপনারা স্নানাহার করিয়া লইতে পারিবেন।

বৃদ্ধের বাক্যস্রোত বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার বাক্যাপেক্ষা দ্রুতগামী গাড়ী, হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ করিয়া সাহজাহানপুরে আসিয়া পৌঁছিল। তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়াছে। বৃদ্ধ, তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। ষ্টেশনে ডেপুটীবাবুর দুইজন ভৃত্য এবং একজন চাপরাসী উপস্থিত ছিল; তাহারা আসিয়া জিনিষপত্র সব গ্রহণ করিল। এক ভৃত্যকে একটি ক্ষুদ্র হাঁড়ি উঠাইতে দেখিয়া, বৃদ্ধ সেই হাঁড়িটি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—বাবু, বাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখিতে হইবে। এই হাঁড়িতে আমার পুত্রবধূর প্রস্তুত কিছু জলখাবার আনিয়াছিলাম। আপনার সহিত গল্প করিতে করিতে, এবং ক্ষুধার অভাবে, উহা আর খাওয়া হয় নাই। এখন উহা বহিয়া, বাটীতে লইয়া যাওয়া বৃথা; সেখানে আমাদের রাত্রি ভোজন প্রস্তুত আছে। উহা আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে, আমার মহা তৃপ্তি হইবে। আপনার চেহারাটা অনেকটা আমার জ্যেষ্ঠ-পৌত্রের মত বলিয়া, আপনার প্রতি আমার একটা স্নেহের আকর্ষণ জন্মিয়াছে।"

অগত্যা কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া, আমি সেই খাদ্যভাণ্ড গ্রহণ করিলাম।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, অপরাজিতা আমার দিকে ফিরিয়া, হাসিয়া বলিল—"গাঙ্গুলি মহাশয়, প্রণাম হই; আপনার গাজিয়াবাদের বাটীর কুশল ত?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন? মিথ্যা পরিচয় দেওয়াটা কি ভাল হয় নাই?"

সে। কার্ত্তিকচন্দ্র ও অনিলকৃষ্ণ,—এই দুই নামই উহাঁদের নিকট সমান অপরিচিত, কাযেই অনিলকৃষ্ণ না বলিয়া, কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলে কোনও ক্ষতি হইত না। বরং মিথ্যা পরিচয় জন্য, কোনও না কোন ক্ষতির আশঙ্কা রহিল।

আমি। ঐ দেখ, আসল কথাটাই তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমার আসল নাম, কার্ত্তিক-চন্দ্র নহে; ও'টা আমার জাল নাম।

সে। তবে তোমার আসল নাম কি অনিলকৃষ্ণ?

আমি। না, উহাও নকল নাম। আমার আসল নাম, সুশীল—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; আমার পিতার নাম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহা ত তোমাকে বলিয়াছি; আমার ঠাকুরদাদার নাম গদাধর বন্দ্যো-পাধ্যায়; আমার প্রপিতামহের নাম, শান্তিরাম স্মার্ত্ত-বাগীশ।

সে। তোমার সেই কালীঘাটওয়ালীর নাম কি?

আমি। সে অশ্রাব্য নাম তোমার শুনিয়া কায নাই।

সে। কি নাম?

আমি। মেনি।

সে। না, তোমার মিছা কথা।—মানুষের নাম কি মেনি হয়? ও ত বিড়ালের নাম। লালমুখো বাঁদর-গুলাকেও মেনি বাঁদর বলে।

আমি। সত্যই তাহার ঐ নাম।

সে। আর তোমার মিথ্যা কথা বলিতে হইবে না। এস, জলখাবার খাও!

এই বলিয়া, সদানন্দ সয়গালের প্রদত্ত হাঁড়িটির মুখে যে সরাখানি ছিল, তাহা আমার হাতে দিয়া, হাঁড়ির ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট কচুরি ও ক্ষীরের মিঠাই বাহির করিয়া আমাকে খাইতে দিল। আমি তাহা আহার করিয়া, মুরাদাবাদের দুগ্ধ পান করিলাম। তাহার পর অপরাজিতা আহার করিল।

তাহার পর, গল্প করিতে করিতে আমরা নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। ভোর রাত্রে, লক্ষ্ণৌএ আসিয়া, আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কালিদাসের নাটকে বিহঙ্গ-পরিচয়

(মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞানশকুন্তল)

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাই যে রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার চিত্র দেখিয়া তাহার দর্শন-লাভ করিবার জন্য বয়স্তের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা উপায় স্থির করিলেন। রাজসভায় গণদাস ও হরদত্ত নামক দুইজন নাট্যবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। গণদাসের শিষ্যা মালবিকা। হরদত্তেরও শিষ্য ছিল। আদেশ হইল যে রাজা ও রাণীর সমক্ষে শিষ্যদিগের নর্ত্তননৈপুণ্য দেখিয়া শিক্ষকদিগের বাহাদুরির পরিচয় লওয়া হইবে। নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনি শ্রুত হইল। রাজা অস্থির হইয়া উঠিলেন; মৃদঙ্গবাদ্য শুনিবার জন্যই যেন তিনি সভায়

যাইতেছেন এই প্রকার ভান করিলেন। কিন্তু সুচতুরা রাণী বুঝিতে পারিলেন আসল ব্যাপারটা কি,—রাজা অন্য-নায়িকা দর্শন করিতে ইচ্ছুক। স্বগত বলিলেন —আর্য্যপুত্রের কি অশিষ্ট ব্যবহার! এদিকে মৃদঙ্গের শব্দ শুনিয়া পরিব্রাজিকা বলিলেন,—

জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ূরৈ-
রুদ্‌গ্রীবৈরনুরসিতস্য পুষ্করস্য।
নির্হ্রাদিন্যুপচিতমধ্যমস্বরোত্থা
মায়ূরী মদয়তি মার্জ্জনা মনাংসি॥

কি মধুর সঙ্গীত! ঐ শব্দ শুনিয়া মেঘগর্জ্জনভ্রমে ময়ূরগণ আনন্দে উদ্‌গ্রীব হইয়া শব্দ করাতে মৃদঙ্গধ্বনির সহিত উহা মিশ্রিত হইতেছে; সুতরাং মধ্যম স্বরজাত মূর্চ্ছনা উত্থিত হইয়া হৃদয়কে উল্লসিত করিতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে গণদাস-শিষ্যা মালবিকা ছলিত নামক একখানি নাটকের অভিনয়ে নর্ত্তকীর ভূমিকায় আসরে অবতীর্ণা হইলেন। মুগ্ধ রাজা তাহার নাচের ভঙ্গী দেখিয়া তদ্‌গতচিত্ত হইয়া নর্ত্তকীর দেহের চারুতা সম্বন্ধে এইরূপ স্বগতোক্তি করিলেন,—

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্দ্ধম্॥

পরিব্রাজিকা বলিলেন—যাহা দেখিলাম, সমস্তই অনিন্দনীয়। গণদাস উৎকৃষ্ট নর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদূষক ব্রাহ্মণ-হিসাবে কিছু দক্ষিণা চাহিলেন; বলিলেন—"আমি শুষ্ক মেঘগর্জ্জিত অন্তরীক্ষে জলপানের ইচ্ছা করিয়া চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" আচার্য্য গণদাসের সহিত মালবিকা প্রস্থান করিল। হরদত্ত অভিনয় প্রদর্শন করিতে চাহিল। রাজা ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে শোনা গেল—"মহারাজের জয় হউক। মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত,

পত্রচ্ছায়াসু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাং
সৌধান্যত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দ্বেষিপারাবতানি।
বিন্দুক্ষেপানপিপাসুঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্বারিযন্ত্রং
সর্ব্বৈরুস্রৈঃ সমগ্রস্ত্বমিব নৃপগুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ।

হংসগণ দীর্ঘিকাস্থিত পদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ায় মুকুলিত নয়নে অবস্থান করিতেছে; রবিকর প্রখরতর হওয়াতে পারাবতগণ আর পূর্ব্ববৎ সৌধবলভিতে বিচরণ করিতেছে না। ঘূর্ণ্যমান জলযন্ত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত বারিকণা দেখিয়া পিপাসার্ত্ত ময়ূরেরা সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। হে রাজন্! আপনি যেমন সর্ব্বগুণে সম্পূর্ণ, সপ্তাশ্ব সূর্য্যদেবও সেইরূপ সমগ্র রশ্মিতে দীপ্যমান।

ভোজন বেলা উপস্থিত হইয়াছে; হরদত্তকে বিদায় করা হইল। দেবীর সহিত পরিব্রাজিকাও প্রস্থান করিলেন। বিদূষক রাজাকে বলিলেন—"আপনার কার্য্য সাধনার্থ অবসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে। জ্যোৎস্না যেমন মেঘরাজিতে অবরুদ্ধ হয়, মালবিকা এখন সেইরূপ হইয়াছেন; তাঁহার দর্শনলাভ এখন রাণী ধারিণীর অনুমতি-সাপেক্ষ। শ্যেন পক্ষী যেমন প্রাণিবধস্থানের নিকটে আমিষলোভে বিচরণ করে, মালবিকারূপ আমিষলোভে লুব্ধ হইয়া আপনিও সেইরূপ করিতেছেন।"

তৃতীয় অঙ্কে রাজা ও বিদূষক একটি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই প্রমোদবন যেন বায়ুভরে ঈষৎ বিকম্পিত পল্লবরূপ অঙ্গুলিসঙ্কেতে উৎকণ্ঠিত রাজাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। বায়ুস্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া তিনি বলিলেন—"নিশ্চয়ই বসন্তঋতু আবির্ভূত হইয়াছে। সখে! দেখ,

আমত্তানাং শ্রবণসুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।

উন্মত্ত কোকিলেরা শ্রবণসুখকর রব করাতে বোধ হইতেছে যেন বসন্ত সদয়ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ইত্যাদি * * *।

এমন সময়ে মালবিকা সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। রাজা বয়স্যকে বলিলেন,—এখন আমি জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব। সারস পক্ষীর উচ্চধ্বনি শ্রবণ করিয়া তরুরাজি-সমাবৃত নদী নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া

পথিকের হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তোমার মুখে প্রিয়তমা সমীপগতা শুনিয়া আমার অবসন্ন চিত্তও সেইরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মালবিকার সখী বকুলাবলিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ও মালবিকার আলাপ পরিচয়ের মাঝখানে সহসা কুপিতা রাণী ইরাবতীর আবির্ভাব; একটা মহা গোলমালের মধ্যে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়িয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে রাজা দুই একটি কথার পর বয়স্যকে মালবিকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদূষক উত্তর দিলেন, 'বিড়ালে ধরিলে কোকিলার যে অবস্থা হয়, মালবিকারও সেই অবস্থা।' মালবিকা দেবীর পরিচারিকা কর্ত্তৃক বকুলাবলিকার সহিত ভূগর্ভস্থ কোষাগার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছে। রাণীর দাসী মালবিকা যে রাজার প্রণয়পাত্রী হইবে ইহাই রাণীর ক্রোধের কারণ। বিষণ্ণ রাজা বলিলেন,—হায়!

মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে॥

মধুরকণ্ঠী কোকিলা ও ভ্রমরী উভয়ে যেমন বিকসিত সহকার-কুসুমের সংসর্গে থাকে, উহারা উভয়েও সেইরূপ একত্র বাস করিত। এখন প্রবল পুরোবাতের সঙ্গে অকালবৃষ্টি তাহাদিগকে কোটরগত করাইল।

কিন্তু সুচতুর বয়স্য কৌশল করিয়া স-সখী-মালবিকার উদ্ধারসাধন করতঃ তাহাদিগকে সমুদ্রগৃহে রাখিয়া আসিয়া রাজাকে তথায় লইয়া আসিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্রম্ভালাপের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিদূষক দ্বাররক্ষক হইয়া রহিলেন। সহসা সখী নিপুণিকাকে সঙ্গে লইয়া রাণী ইরাবতী সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিছুই গোপন রহিল না। বয়স্য আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"হায়! কি অনর্থ উপস্থিত! বন্ধনভ্রষ্ট গৃহপালিত কপোত বিড়ালীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল।" কিন্তু একটা তুচ্ছ ঘটনায় রাজা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী একটা বানরের ভয়ে অত্যন্ত ভীতা হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রাণী অনুনয় করিয়া বলিলেন—কুমারীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আর্য্যপুত্র ত্বরান্বিত হউন।

পঞ্চম অঙ্কে বৈতালিক বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের যশোগান করিতেছে—

পরভৃতকলব্যাহারেষু ত্বমাত্তরতির্মধুং
নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেষনঙ্গ ইবাঙ্গবান্।

—অঙ্গবান অনঙ্গের মত আপনি বিদিশাতীরস্থ উদ্যানে শোভা বিস্তার করিতেছেন, যেমন রতি-সহচর মন্মথ পরভৃতকলকূজনে বসন্তের আবির্ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এদিকে দৈবক্রমে যে মালবিকার চরণস্পর্শে অশোক তরু প্রস্ফুটিতপুষ্পভারনম্র হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে আর বন্দিনী করিয়া রাখা চলে না; রাণী তাহাকে বধূবেশে সজ্জিত করিয়াছেন; এবং পরিব্রাজিকা ও পরিজন সমভিব্যাহারে তাহাকে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা মালবিকাকে দেখিয়া আপনাআপনি বলিতেছেন—

অহং রথাঙ্গনামেব প্রিয়া সহচরীব মে।
অননুজ্ঞাতসম্পর্কা ধারিণী রজনীব নৌ॥

—আমি চক্রবাক এবং প্রিয় মালবিকা সহচরী চক্রবাকী; দেবী ধারিণী যেন রাত্রি স্বরূপিণী—যাহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমাদের উভয়ের মিলন হইতে পারে না।

অতঃপর মহাকবি সুকৌশলে রাজার নিকটে মালবিকার বংশপরিচয় করাইলেন;—কেমন করিয়া মালব-রাজকুমারী মালবিকা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া, অবশেষে বিদিশারাজ-ভবনে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন তাহারই বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, তদ্দেশীয় দস্যুরা পৃষ্ঠদেশে ময়ূরপুচ্ছ আভরণরূপে ব্যবহার করিত।

তূণীরপট্টপরিণদ্ধভুজান্তরাল-
মাপাষ্ণিলম্বিশিখিপিচ্ছকলাপধারি।

ইহার পর রাত্রিস্বরূপিণী রাণী ধারিণী, চক্রবাক-

মিথুনরূপ মালবিকাগ্নিমিত্রের মিলনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। ইরাবতীর কোপ প্রশমিত হইল।

ইহাই মালবিকাগ্নিমিত্রের গল্পাংশ। পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, নায়ক-নায়িকা বর্ণনাপ্রসঙ্গে কেমন সহজে ময়ুর, চাতক, কোকিল, সারস, গৃহকপোত, রথাঙ্গ প্রভৃতি পাখীগুলি আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিকেই আমরা পূর্ব্বে উর্ব্বশী-পুরূরবার সম্পর্কে পাইয়াছি। আবার নবীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে শকুন্তলার উপাখ্যানে উহাদিগের দর্শনলাভ করিবার আশা আছে। অতএব অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকখানির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বিহঙ্গগুলির সম্যক পরিচয়লাভের চেষ্টা করিব।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে দ্রুত পলায়মান মৃগের অনুসরণে তপোবন-সান্নিধ্যে সমাগত রাজা দুষ্মন্ত ঋষিগণ কর্ত্তৃক সহসা আশ্রমমৃগের হননে বাধা পাইয়া, কুলপতির আশ্রমদর্শনের অভিলাষে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সারথিকে বলিলেন—"সূত! কেহ না বলিলেও, এটি যে তপোবন তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।" সারথি জিজ্ঞাসা করিল—"কিরূপ?" রাজা বলিলেন—"তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না?" এখানে—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ কচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

—যে বৃক্ষকোটরের মধ্যে শুকপক্ষী নীড় রচনা করিয়াছে, তাহার মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীবার শস্যগুলি তরুমূলে পতিত রহিয়াছে; যে সকল উপল সাহায্যে ইঙ্গুদীফল ভগ্ন করা হয় তাহাতে সংলগ্ন ফলনির্য্যাস তপোবনের সূচনা করিয়া দিতেছে। বিশ্বাস উপগম হেতু নিশ্চল হইয়া মৃগগণ রথশব্দ সহ্য করিতেছে; আশ্রমবৃক্ষের বল্কলশিখা হইতে জলক্ষরণে রেখাঙ্কিত তোয়াধারপথগুলিও তপোবনের সূচনা করিতেছে।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে মৃগয়াশীল রাজার সহচর বিদূষক মৃগয়ার কঠোরতায় অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া বিরক্তভাবে আপনা-আপনি বলিতেছে—"হা অদৃষ্ট! এই রাজার বয়স্য হয়ে আমি মারা গেলাম। একে ঐ মৃগ, ঐ বরাহ, ঐ শার্দ্দূল এই ভাবে দৌড়াদৌড়িতে হায়রান; খাদ্য পানীয় জোটে না, গায়ের ব্যথায় রাত্রে ঘুম হয় না; তাতে আবার প্রভাত হতে না হতেই শকুনিলুব্ধকগণের অরণ্যময় ভীষণ চীৎকারে জেগে উঠি।"

তৃতীয় অঙ্কে প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া, সখী শকুন্তলার মনোভাব রাজা দুষ্মন্তের নিকট জ্ঞাপনার্থ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে প্রণয়পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে তিনি ঐ পত্রকে পুষ্পে ঢাকিয়া দেবতাপ্রসাদচ্ছলে রাজার হাতে দিবেন। প্রত্যুত্তরে শকুন্তলা বলিলেন যে তিনি কি লিখিবেন তাহা স্থির করিয়াছেন, লেখার উপকরণ পাইলে লিখিতে পারেন। প্রিয়ম্বদা বলিলেন—"এই শুকোদর সুকুমার নলিনীপত্রে আপনার নখ দ্বারা লিখিয়া ফেল।" পত্র লেখা হইল, কিন্তু প্রেরণের প্রয়োজন হইল না। বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন রাজা অতঃপর আত্মগোপন অনাবশ্যকবোধে দেখা দিলেন। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পরস্পর প্রণয়ালাপের আনুকূল্যার্থ সখীদ্বয় ছল করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ স্থায়ী হইল না। সহসা নেপথ্যধ্বনি শ্রুত হইল—"চকবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্ঠিআ রঅণী।" চক্রবাকবধূ! আপনার সহচরকে আমন্ত্রণ কর, রাত্রি উপস্থিত।

চতুর্থ অঙ্কে কুলপতি কণ্ব শকুন্তলার অনুরূপ বরলাভে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিতেছেন, এমন সময়ে শিষ্য শার্ঙ্গরব মুনিকে বলিলেন—"ভগবন্! শকুন্তলার এই বনবাস-বন্ধু তরু-সকল তাহার গমনে অনুমোদন করিতেছে, কারণ পরভৃতকূজনছলে উহারা প্রত্যুত্তর দিতেছে

অনুমতগমনা শকুন্তলা
তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতং কলং যথা
প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম্॥

সখী প্রিয়ম্বদা বলিলেন—শকুন্তলাই যে কেবল আসন্ন বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন তাহা নহে; সমস্ত তপোবন-ব্যাপী বিরহ পরিলক্ষিত হইতেছে, যেহেতু

উগ্গলিঅদব্ভকবলা মিআ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরা।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও।—

—মৃগগণ মুখের গ্রাস ফেলিয়া দিতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে; লতা সকল স্বকীয় পাণ্ডুপত্র ত্যাগ-চ্ছলে যেন অশ্রুমোচন করিতেছে।—কিয়ৎকাল পরে শকুন্তলা অনসূয়াকে বলিলেন—"সখি! দেখ নলিনী-পত্রান্তরালে অন্তর্হিত সহচরকে দেখিতে না পাইয়া আতুরা চক্রবাকী যেন এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, 'দুক্করঅহং করোমি', এতক্ষণ যে আমার প্রিয়-বিরহে অতিবাহিত হইল ইহা কি কঠোর! অনসূয়া উত্তর দিলেন—এ রকম মনে কোরো না, সই! যেহেতু এ—

এসা বি পিএণ বিণা গমেই রঅণিং বিসাঅদীহঅরং।
গরুঅং পি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেদি॥

—প্রিয়বিরহে বিষাদ-দীর্ঘতরা রজনী আশায় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়।

নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে লইয়া গৌতমী ও শার্ঙ্গরব রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। শকুন্তলার পরিচয় পাইয়াও রাজা দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। শকুন্তলা অগত্যা সমভিব্যাহারী গুরুজনের অনুরোধে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া রাজার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য যে সকল পুরাতন কাহিনীর উত্থাপন করিলেন, রাজা তাহাতে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"হে গৌতমি! তপোবনে লালিত হইয়াছেন বলিয়া যে ইনি ছলনা জানেন না তাহা না হইতেও পারে; কারণ মানুষেতর জীবের স্ত্রীজাতির মধ্যে যখন অশিক্ষিতপটুত্ব দেখা যায়, তখন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্না নারীর মধ্যে যে তাহা প্রকটিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাত-
মন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি॥

—এই নিমিত্তই আকাশমার্গে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে পরভৃতা স্বীয় অপত্যগুলি অন্য পক্ষীর দ্বারা পোষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের সূচনায় রাজপুরুষেরা ধীবরের নিকটে রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া তাহার প্রতি ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিল—"অরে চোর! তোর দণ্ড-বিধানার্থ রাজ-আজ্ঞা বহন করিয়া আমাদের স্বামী আসিতেছেন। এখন তুই গৃধ্রবলিই হইবি অথবা কুক্কুরের মুখে যাইবি।" এদিকে চূতমুকুল অবলোকন করিয়া পরভৃতিকা ও মধুকরিকা পরিচারিকাদ্বয় বসন্তের আগমনে উৎফুল্ল হইয়াছে। মধুকরিকা জিজ্ঞাসা করিল—"লো পরভৃতিকে! তুই আপনাআপনি কি গুন্‌গুন্ করিতেছিস্?" সে উত্তর করিল—"চূতমুকুল দেখিয়া পরভৃতিকা উন্মত্তাই হইয়া থাকে।" উভয়ের কথোপ-কথনের মাঝখানে সহসা কঞ্চুকী আসিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিল—রাজা বসন্তোৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাসন্তিক তরুগুলি এবং সেই তরু-গুলিকে আশ্রয় করিয়া যে পাখীগুলি থাকে তাহারা পর্য্যন্ত রাজার আজ্ঞা পালন করিতেছে, আর তোরা দুইজন ইহার কিছুই জানিস্ না?—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎকোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্॥

—চূতকলিকা বহুদিন নির্গত হইয়াছে কিন্তু পরাগ জন্মে নাই; কুরুবক-পুষ্প বৃন্ত হইতে বহির্নিগত হইয়াও কোরকাবস্থাতেই আছে; শিশির ঋতু চলিয়া গেলেও পুংস্কোকিলের কণ্ঠস্বর কণ্ঠমধ্যেই বিলীন হইয়া রহিয়াছে * * *।

অঙ্গুরীয়ক দর্শনে রাজা দুষ্মন্তের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি শকুন্তলার প্রতি আপনার অন্যায় ব্যবহারের জন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। দিন দিন তিনি এত উন্মনা হইতেছেন দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্ত বয়স্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল।

রাজার স্বহস্ত-লিখিত শকুন্তলার প্রতিকৃতির বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বয়স্য রাজাকে মাধবী-মণ্ডপে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে এখনই চতুরিকা তথায় প্রতিকৃতিটি লইয়া আসিবে। এমন সময়ে চিত্রপট-হস্তে চতুরিকা রাজসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি ব্যগ্রভাবে চেটীর হস্ত হইতে ছবিখানি লইয়া, বয়স্যকে ছবির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন—সৈকতলীন-হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী নদী এইখানে অঙ্কিত হওয়া উচিত * * *। রাণী বসুমতী আসিতেছেন ইহা চতুরিকার মুখে শুনিয়া বিদূষক বলিল —আমি মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের এমন জায়গায় এই চিত্রপট লুকাইয়া রাখিব যেখানে পারাবত ব্যতীত (১) আর কেহই জানিতে পারিবে না। কিন্তু বেচারা মাধব্য কার্য্যকালে বিপন্ন হইয়া পড়িল। কোনও অদৃশ্য প্রাণী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সহসা সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কি বিপদ ঘটিল তাহা জানিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া কঞ্চুকী দেখিয়া আসিয়া রাজসমীপে কাঁপিতে কাঁপিতে জানাইল যে, যে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদশিখরে গৃহনীলকণ্ঠ অনেকবার বিশ্রাম করিয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তথা হইতে কোনও অপ্রকাশিত মূর্ত্তি আপনার বয়স্যকে পীড়ন করিতে করিতে কোথায় লইয়া গিয়াছে—

তস্যাগ্রভাগাদ্‌গৃহনীলকণ্ঠৈ-
রনেকবিশ্রামবিলঙ্ঘ্যশৃঙ্গাৎ।
সথা প্রকাশেতরমূর্ত্তিনা তে
কেনাপি সত্ত্বেন নিগৃহ্য নীতঃ॥ (২)

রাজা ভয় নাই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ-হস্তে বয়স্যকে অদৃশ্য শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বলিলেন—শত্রু যেই হউক, আমার শর তাহাকে সংহার করিয়া মাধব্যকে রক্ষা করিবে; হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে সলিলাংশ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধকে গ্রহণ করে।

যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষতি চ দ্বিজম্।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ॥

তৎক্ষণাৎ মাধব্যকে ছাড়িয়া দিয়া মাতলি রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং দেবরাজের সন্দেশ জ্ঞাপন করাইয়া রাজা দুষ্মন্তকে সুরলোকে লইয়া গেলেন।

নাটকের সপ্তম অঙ্কে, দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা পালন করিয়া রাজা মাতলির সহিত রথাধিরূঢ় হইয়া আকাশপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন; রথচক্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা বলিলেন—আমরা মেঘমণ্ডলে অবতরণ করিয়াছি। ঐ দেখ!

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভি-
র্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে সীকরক্লিন্ননেমিঃ॥

—রথচক্রের বিবর হইতে নিষ্পতনশীল চাতককুল এবং বিদ্যুৎপ্রভামণ্ডিত রথাশ্বগণ সহজেই সূচনা করিয়া দিতেছে যে, আমাদের রথ বারিগর্ভোদর মেঘের উপর দিয়া আগমন করিতেছে এবং তন্নিমিত্ত ইহার চক্রপ্রান্ত সীকরসংসিক্ত হইয়াছে।

অধঃ-প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিভিন্ন প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে রাজা মাতলিকে মারীচাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উহা দেখাইয়া মাতলি বলিতে লাগিলেন—"ঐ দেখুন মহর্ষি কশ্যপ সূর্য্যবিম্বের দিকে চাহিয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার

(১) এই পাঠ বোম্বাই-সংস্করণে আদৌ দৃষ্ট হয় না। মহা-মহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন-সঙ্কলিত নাটকে দেখা যায়।

(২) ন্যায়পঞ্চানন সঙ্কলিত নাটকেই এই শ্লোক দেখা যায়।

মূর্ত্তি বল্মীকাগ্রে নিমগ্ন রহিয়াছে; বক্ষঃস্থলে সর্পত্বক্ বিজড়িত; কণ্ঠদেশ জীর্ণ লতাপ্রতান-বলয়ের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে; স্কন্ধলগ্ন জটামণ্ডলীর মধ্যে শকুন্ত-নীড় রচিত রহিয়াছে।—

বল্মীকাগ্রনিমগ্নমূর্ত্তিরুরসা সংদষ্টসর্পত্বচা
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থসংপীড়িতঃ।
অংসব্যাপিশকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ॥

অতঃপর নাটকমধ্যে আর কোনও বাস্তব পক্ষীর উল্লেখ আমরা পাই না। কেবলমাত্র একটি মৃত্তিকা-ময়ূরের কথা আছে যাহার প্রলোভনে শকুন্তলাতনয় সিংহ-শিশুর উৎপীড়নক্রীড়া হইতে বিরত হইল। বর্ণচিত্রিত মৃন্ময়ূরটিকে তাপসীর উটজ হইতে আনা হইল। তাপসী কহিলেন—সর্ব্বদমন! শকুন্তলাবণ্য দর্শন কর। শব্দসাদৃশ্যে বালক বলিয়া উঠিল—মা কোথায়? তাপসী উত্তর দিলেন—আমি এই মৃত্তিকা ময়ূরের সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। বালক বলিল —এই ময়ূরটি আমার বড় পছন্দ হয়। অতঃপর উহা গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল।

এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে যে বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র নায়কনায়িকার background রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অনেকগুলি পাখীর সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেমন নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তপোবনের বৃক্ষকোটরে শুকপক্ষীর গৃহস্থালীর যে আভাস এখানে পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বাংশে সত্য কি না দেখিতে হইবে। কোটরমধ্যে নীবারধান্য আনয়নের আবশ্যকতা কি এবং আহারান্তে তাহার হেয়াংশ বর্জ্জন করা শুকের অভ্যাস কি না? তাহার উদর সুকুমার পদ্মপত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয় কি না তাহাও বিচার্য্য। কোকিল-রব অথবা "পরভৃত-বিরুত", কোথাও বা কণ্ঠমধ্যে বিলীন পুংস্কোকিলস্বর, কোকিলবধূর অশিক্ষিতপটুত্ব—অন্তরীক্ষগমনের পূর্ব্বে অপর পক্ষী কর্ত্তৃক আপন সন্তান প্রতিপালনের নিপুণ ব্যবস্থা প্রভৃতি পরভৃৎরহস্যের জটিল কথাগুলি বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রের রথাঙ্গ এখানে চক্রবাকবধূ অথবা চক্রবাকীরূপে দেখা দিয়াছে —"এষাপি প্রিয়েণ বিনা গময়তি রজনীং বিষাদদীর্ঘতরাম্" চাতকের সঙ্গে মেঘের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক এ নাটকেও আছে। এখানে নূতন পরিবেষ্টনের মধ্যে ময়ূরগণ "পরিত্যক্ত-নর্ত্তনঃ।" যে পারাবতকে আমরা মেঘদূতে গৃহবলভিতে আশ্রয় লইতে দেখিয়াছি, সেই পারাবত গৃহনীলকণ্ঠের সহিত প্রাসাদশিখরাগ্রভাগে বিরাজ করিতেছে। স্রোতোবহা মালিনী-তটে সৈকতলীন হংসমিথুনের ছবি আমাদিগকে মুগ্ধ করে; নাটকবর্ণিত হংসের নীরমিশ্রিত দুগ্ধপানভঙ্গী স্বতন্ত্রভাবে বিচার-সাপেক্ষ। এই সমস্ত ছোট বড় সুন্দর পাখী মহাকবি-রচিত তিন-খানি নাটকের মধ্যেই তাহাদের রূপে মাধুর্য্যে ও লীলা-ভঙ্গীতে মানবাবাস, রাজপ্রাসাদ অথবা তপোবন চিত্রকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। কেবল যে হিংস্র ও অসুন্দর পাখীর চৌর্য্যবৃত্তির কথা বিক্রমোর্ব্বশীতে পাওয়া যায় এবং যাহার নামোল্লেখ করিয়া নগররক্ষক শকুন্তলা নাটকে ধীবরকে ভয় দেখাইতেছে,—সেই গৃধ্রের কথাও বিহঙ্গতত্ত্বহিসাবে বাদ দেওয়া চলিবে না। এইবার আমরা একে একে কবিবর্ণিত পাখীগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

চিরমুক্তি

ছিন্ন ঝুলি বয়ে বয়ে দীর্ঘ সারাদিন
ধূলি ধূসর সাজে,
যাচ্ঞা-করুণ আঁখি দুটি, চরণ শক্তি হীন,
চলে পথের মাঝে ;
লুপ্ত হ'য়ে আসে আলো, সন্ধ্যা আসে নামি
মগ্ন করি ধরা,
কাঙ্গাল সে যে, নাইতো তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানি
শান্তি স্নেহ ভরা।
দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা শেষে শুষ্ক মলিন মুখ
ফেরে তরুর তলে,

ভিক্ষা ঝুলি রিক্ত কাঁধে জীর্ণ ভাঙ্গা বুক
সিক্ত আঁখি জলে ;
ধূলি মাঝে ছিন্ন আঁচল যখন সে বিছায়
সারাদিনের পরে,
ব্যর্থ শ্রমের সকল দুঃখ অশ্রুবেদনায়
বক্ষ ওঠে ভরে ;
এম্‌নি ক'রে ব'য়ে ব'য়ে দীর্ঘ জীবন ভার
দিনের পরে দিন,
তরুমূলে বিছিয়ে নিল চির শয়ন তার
অশ্রু ব্যথা হীন।

শ্রীঅমিয়. দেবী।

লয়লা-মজনু

লয়লা-মজনু গল্পটি বঙ্গদেশে কেবল মুসলমান-সমাজেই প্রচলিত। হিন্দু-সমাজের লোকেরা এ গল্পের কথা অল্পই জানেন। কারণ, গল্পটি অরব দেশীয়। অরবী, পার্সী সাহিত্যে—অতএব উর্দ্দু সাহিত্যেও বিশেষরূপে পরিচিত। অনেকের ধারণা এ গল্পটি প্রাচীন কাল্পনিক উপকথা বা উপন্যাস মাত্র ; কিন্তু অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে গল্পটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, এবং যদিও ভিন্ন ভিন্ন লেখকেরা আপনার রুচি অনুসারে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তথাপি মূল আখ্যানটি এখনও অবিকৃত আছে।

মজনু শব্দের অর্থ পাগল, কোন লোকের নাম নহে। এই গল্পের নায়কের নাম ক্যাস্ (মতান্তরে মহদী), প্রেমে পাগল বলিয়া মজনু ; নায়িকার নাম লয়লা। উভয়ে অরব দেশের নজ্‌দ (Nejd) প্রদেশের কোন নগরে একই বংশে জন্মগ্রহণ করে। গল্পের আরম্ভ অর্থাৎ ক্যাস্ ও লয়লার প্রথম পরিচয়, খলীফ মোয়াবিয়ার (Moaviya) রাজত্বকালের (৬৬১-৬৮০ খৃঃ) শেষাংশে ও গল্পের শেষ অর্থাৎ উভয়ের মৃত্যু, প্রথম মর্‌ওয়ানের (Merwan I) রাজত্বকালের (৬৮৩-৭০৫ খৃঃ) প্রথমাংশে অর্থাৎ ৬৮৪ কিংবা ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে। পার্সী ভাষাতে এই গল্প নানা লেখকে লিখিয়াছেন, কিন্তু ইরাণের কবি নিজামী ও দিল্লীবাসী কবি অমীরখুসরুর কবিতার মত আর কাহারও কবিতা প্রসিদ্ধ হয় নাই। নিজামী কবিতার "লয়লা-মজনু" ও খুসরু "মজনু-লয়লা" নামকরণ করিয়াছেন। ভারতের নানা ভাষাতে অমীর খুসরুর "মস্‌নবী মজনু-লয়লা"র অনুবাদ বা সারাংশ রচিত হইয়াছে কিন্তু ভারতের নিয়মমত প্রথমে নায়িকার নামই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অমীর খুস্‌রু যদিও ইহাকে

প্রকারান্তরে অরব দেশীয় গল্প বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি অনেকটা আপনার সময়ের স্থান, কাল ও সমাজের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন। খুসরু ১২৫৩এ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাসবংশীয় সম্রাটদের সভার রাজকবি ও একটি উজ্জল রত্ন ছিলেন। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে পদ্যে এই গল্প শেষ করেন ও ১৩২৫এ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুস্তকে ২৬৬০টি বয়েৎ (Couplet) ছিল, কিন্তু আধুনিক পুস্তকে কিছু কম পাওয়া যায়। অলীগড় ইনস্‌টিটিউট হইতে যে পরিশোধিত সংস্করণ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ২৬০৮টি বয়েৎ আছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন, তিনি অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি দেখিয়া এইগুলি পাইয়াছেন, বাকি ৫২টি পান নাই।

আদি অরবী গল্পে নায়ক ও নায়িকা নজ্‌দের বনে মেষ চরাইত। সেই বনে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। প্রেমের অঙ্কুর এই পত্রপুষ্প-শোভিত বনে, কিন্তু খুসরুর পুস্তকে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রেম আরম্ভ হয় পাড়ার মৌলবী সাহেবের মকতবে বা পাঠশালায়। কারণ ভারতে সম্ভ্রান্তবংশীয় বালক-বালিকার মেষ চরান হাস্যকর হয়। নজ্‌দের বনে কিছু বিশেষত্ব ছিল এবং এখনও আছে। নজ্‌দ দেশ মরুভূমি-বেষ্টিত, কিন্তু ছোট ছোট জলাশয়, পাহাড় ও বনে পূর্ণ। বনে, ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গে বা সমতলক্ষেত্রে বারমাস হরিৎপত্র ভূষিত ছোটবড় বৃক্ষে নানাপ্রকার ফুল ফুটিয়া থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে সুকণ্ঠ পাখীর দল সুমধুর কাকলির দ্বারা কবি ও প্রেমিকের মন মুগ্ধ করে। স্থানে স্থানে নানা প্রকার বর্ণে চিত্রিত হরিণের দল চরিয়া বেড়ায়। এ দেশকে স্বর্ণমৃগের দেশ অথবা সীতার দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটী বন বলিলে অন্যায় হয় না। বিস্তৃত অরব দেশে নজ্‌দ অপেক্ষা মনোরম স্থান আর নাই। এই বনে একপ্রকার অগুরুর বড় বৃক্ষ জন্মায়, তাহাকে অরবী ভাষায় অর্ অর্ বলে। পবনদেব এই অর্ অর্ বৃক্ষের সুগন্ধ বহুদূরে শ্রান্ত পথিকের কাছে লইয়া যান। কবি ও প্রেমিকের বাসোপযোগী এই বনে ক্যাস ও লয়লা উভয়ে আপনার মেষ চরাইতে আসিত। এখানেই এই বালক-বালিকার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ভারতে যে বয়সে বালিকারা যৌবনে পদার্পণ করে, অরব দেশে জলবায়ুর গুণে তাহা অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বেই করিয়া থাকে। নয় দশ বৎসর বয়সে গর্ভবতী ও দশ এগার বৎসরে পুত্রবতী অরব দেশে সচরাচর দেখা যায়। এ ঘটনার ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অরব দেশে পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। অতএব যে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বালিকা বনে মেষ চরাইতে আসিত, তাহার বয়স আট বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভব নহে। মেষ চরাইত বলিয়া তাহাদের কৃষক বংশীয় বলা যায় না। এই ঘটনার অল্প পূর্ব্বে হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাব হয়। তিনি যখন বাল্যাবস্থায় বনে মেষ চরাইতেন, তখন তাঁহার পিতামহ কোরেশের প্রধান বা রাজা। নজ্‌দের বনে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালক বালিকারা মেষরক্ষা করিত, কিন্তু লয়লা অন্য সঙ্গীদের উপেক্ষা করিয়া ক্যাসের সহিত গল্প করিতে ও নির্জ্জনে বেড়াইতে এত ভালবাসিত যে, অন্য বালকেরা ঈর্ষাপূর্ব্বক লয়লার পিতাকে নানা প্রকার সত্য মিথ্যা কথা বলিল। লয়লার পিতা কন্যার ও আপনার কলঙ্কের ভয়ে তাহাকে বনে যাইতে নিষেধ করিলেন। লয়লা পর্দ্দাতে আবদ্ধ হইল।

ক্যাস ২।৪ দিবস লয়লার পথ চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার সঙ্গী বালকেরা তাহাকে অপ্রিয় সংবাদ শুনাইয়া দিল যে লয়লা এখন পর্দানশীন হইয়াছে, তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ সম্ভব নহে। ক্যাস এতদিন জানিতে পারে নাই যে বালিকা লয়লা তাহার হৃদয়ের কতটা অধিকার করিয়াছিল। এখন তাহার বিরহে মেষরক্ষা ও আহার বিহার ত্যাগ করিল। তাহার পিতা, মাতা, আত্মীয় কুটুম্বেরা তাহাকে কোন প্রকার সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। ক্যাস লয়লাকে একবার দেখিতে পাইবার আশায় লয়লাদের পাড়ায় সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। লয়লার প্রতিবেশীরা ক্যাসের আচরণে বিরক্ত হইয়া প্রথমে উপদেশ দিলেন এবং যখন উপদেশ বিফল হইল তখন উত্তম মধ্যম প্রহার

দিলেন। ক্যাস উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়ায়, গ্রামের বালকেরা তাহার গায়ে ধূলা মাটি দেয়; পাগলকে আরও ক্ষেপাইয়া তোলে। লয়লার পিতা, ক্যাসের আচরণে, কন্যার অবাধ্যতায়, সমাজে অপমানের ভয়ে দিন দিন বিরক্ত ও ক্যাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্যাসের পিতামাতা, বিশেষতঃ তাহাদের গোত্রপতি (কবীলার সরদার) নোফল তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহারা তাহাকে বুঝাইয়া যখন কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন একদিন তাহার পিতা ও নোফল কয়েকটি বন্ধু সঙ্গে লইয়া লয়লার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

লয়লা বালিকা; কিন্তু প্রেম তাহার হৃদয়ে এত গভীর ক্ষত উৎপাদন করিয়াছে যে, এখন ক্যাসকে না পাইয়া এবং পর্দ্দাতে আবদ্ধ হইয়া দিবারাত্রি ছটফট করিতে লাগিল। তাহার পিতা আপনার ও বংশের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে পাত্রস্থা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালিকা, তাহার অন্যস্থানে বিবাহের উদ্যোগ দেখিয়া আরও ক্ষিপ্তা হইয়া উঠিল। তাহার পিতা কোনরূপে শাসন করিতে না পারিয়া আরও চটিয়া গেলেন।

এই সময়ে ক্যাসের পিতা ও নোফল বন্ধুদল সহ একদিন লয়লার বাটী আসিলে, অরব দেশের রীতি-অনুসারে লয়লার পিতা আপনার রাগ ও বিরক্তি দমন করিয়া হাসিমুখে তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিলেন। তখন ক্যাসের পিতা আপনার পুত্রের রূপ, গুণ ও বিদ্যার বর্ণনা করিলেন, আপনার ধনের পরিচয় দিলেন এবং লয়লাকে পুত্রবধূ রূপে চাহিলেন। অন্য সময়ে হয়ত লয়লার পিতা ইহাতে কৃতার্থ হইতেন, কিন্তু কন্যার আচরণে এত চটিয়া ছিলেন যে, ক্যাসের পিতার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কি বলিব আপনি এ সময়ে আমার আমার অতিথি, নতুবা আপনার ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি দিতাম। আপনি এমন বালককে জামাতৃপদে বরণ করিতে বলেন, যে আমাকে ও আমার কন্যাকে দেশে ও সমাজে দুর্ণামগ্রস্ত করিয়াছে; আমার কুমারী কন্যার সুনামে কলঙ্কলেপন করিয়াছে।" ক্যাসের পিতা এরূপ উত্তরের আশা করেন নাই। এ উত্তরে স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু সে সময়ে তিনি অতিথি বলিয়া কথা কাটাকাটি করা উচিত বিবেচনা করিলেন না; অতএব তিনি ব্যথিত হৃদয়ে আপন বাটী চলিয়া গেলেন। নোফল কিন্তু এ অপমান পরিপাক করিতে পারিলেন না; তিনি লয়লার পিতাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি তিনি আপনার অপমানসূচক কথাগুলি ফিরাইয়া না লয়েন, তবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সর্দারের পিতার সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে হইবে। লয়লার পিতার ক্রোধ, এ কথায় উপশমিত না হইয়া আরও বাড়িয়া গেল। তিনি নোফলের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু ক্যাসকে কখনও কন্যাদান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি রাগের বশে আপনার জেদ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে গিয়া কন্যার সুখ দুঃখ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে দোষও দেওয়া যায় না, এ অবস্থায় পড়িলে অনেক পিতাই পারেন না।

ক্যাসের পিতামাতা আবার পুত্রকে বুঝাইলেন, কিন্তু হয় পাগল ইচ্ছা করিয়া বুঝিল না, নয় তাহার বুঝিবার ক্ষমতাই ছিল না। তাঁহাদের সকল উপদেশ যখন বৃথা হইল, তখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে ক্যাসের উন্মত্ততা ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য একবার তীর্থযাত্রা করিবেন। তাঁহারা উষ্ট্রপৃষ্ঠে ক্যাসকে লইয়া তিন চার শত মাইল ফলহীন মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মক্কার পবিত্র মন্দির মসজিদ-উল-অহরামে আসিলেন। মক্কার প্রধান মসজিদকে কাবা বলে। তাহার উপর একটি কালো কাপড়ের আবরণ বা গেলাফ দেওয়া থাকে। তীর্থযাত্রীরা এই গেলাফ ছুঁইয়া আল্লাতালার কাছে কায়মনোবাক্যে যাহা প্রার্থনা করেন তাহা সফল হয়। ক্যাসের পিতা ক্যাসকে এই কাবার নিকট আনিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—

এই গেলাফ ছুঁইয়া প্রার্থনা কর, "আমার মন হইতে লয়লার চিন্তা দূর হউক," তাহা হইলেই ঈশ্বরের কৃপায় তোমার মন চিন্তাশূন্য ও পবিত্র হইবে। ক্যাস, গেলাফ ছুঁইয়া মুখে মুখে কবিতা বাঁধিয়া প্রার্থনা করিল। সে কবিতার অনুবাদ—"হে আমার সর্ব্বশক্তিমান (ঈশ্বর), আমার প্রিয়ার প্রেম আমার হৃদয় হইতে কখনও বাহির করিয়া লইও না। যে ঈশ্বরের সেবক আমার প্রার্থনার সহিত আমীন (Amen) বলিবে, তাহাকে যেন ঈশ্বর কৃপা করেন।" তীর্থযাত্রার ব্যয় ও কষ্টের পর উন্মাদ পুত্রের ব্যবহারে তাহার পিতা মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। নোফল ক্যাসকে শৈশবাবধি পুত্রবৎ ভাল বাসিতেন। তিনি অন্যপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আপন রূপবতী, গুণবতী, যুবতী কন্যার সহিত ক্যাসের বিবাহ দিলেন। ভাবিলেন, এইবার যুবতীর প্রেমে ক্যাসের মন হইতে বালিকার প্রেম দূর হইবে। কিন্তু কি যে ঘটনা ঘটিল মজনু বুঝিতেও পারিল না; নোফলের কন্যার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। মজনুকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিবার যুবতীর সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল।

লয়লা যখন শুনিল, তাহার পিতা নোফলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, এবং ক্যাসের সহিত বিবাহে সম্মত হয়েন নাই, তখন বালিকা ঘোর উন্মাদিনী হইয়া উঠিল। তাহাকে এখন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তাহার পিতা সমাজে আপনার মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য, নগরের এক সুরূপ ধনবান যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। লয়লার বর চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিল না যে, সে তাহার স্বামী। উন্মাদিনীকে গৃহবাসিনী করিতে না পারিয়া, বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিল। লয়লা আবার পিত্রালয়ে উন্মাদিনী ও বন্দিনী রূপে ফিরিয়া আসিল।

এই রূপে কিছুকাল কাটিলে, একদিন লয়লার সখীরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নগরের উপকণ্ঠে এক বাগানে বেড়াইতে লইয়া গেল। ঘটনাক্রমে নগরের কয়েকটি যুবক, যাহারা এক কালে লয়লার সহিত বনে মেষ চরাইত এবং লয়লার সমস্ত পূর্ব্বকাহিনী জানিত, উদ্যানের পাশের পথ দিয়া নানাপ্রকার প্রেমসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল। আরব দেশের লোক প্রায়ই কবিতারচনা করিতে পারে; শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই কবিতাপ্রিয়। ক্যাস লেখাপড়া শিখিয়াছিল, ঈশ্বরদত্ত কবিত্বশক্তিও বেশ ছিল, উন্মাদ অবস্থাতে লয়লার নাম সংযোগ করিয়া বিরহ ও প্রেমের অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিল; এই কবিতাগুলি সে পথে পথে গাহিয়া বেড়াইত। কতকগুলি কবিতা এখনও পাওয়া যায়; যদি সেগুলি বাস্তবিক ক্যাসের রচনা হয় তবে তাহাকে একজন উচ্চদরের কবি বলিতে হইবে। বালকেরা ক্যাসের রচিত কবিতা উচ্চৈস্বরে গান করিতেছিল। উদ্যান মধ্যে লয়লা আপনার নাম ও ক্যাসের উক্তি শুনিতে পাইয়া, সখীদের বাধা দিবার পূর্ব্বেই, বালকদের কাছে ছুটিয়া আসিল। লয়লা ক্যাস সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। এই বালকেরা, বহুপূর্ব্বে বনে উপেক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া চটিয়া ছিল। আরবেরা প্রতিহিংসা ও অপমান কখন ভুলিতে পারে না। তাহারা এখন লয়লাকে মিথ্যা-সংবাদ শুনাইয়া দিল—"পাগলা ক্যাস চার পাঁচ দিন হইল তোমার বিরহে উন্মাদ হইয়া মরিয়া গিয়াছে।" তাহাদের একটু আমোদ করা ছাড়া, হয়ত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বিরহ বিধুরা লয়লা সুন্দরী এই কথা শুনিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহার সখীরা চেতনা দানের চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিল, লয়লার প্রাণ-পাখী তাহার প্রেমাস্পদের সহিত স্বর্গে মিলিত হইবার আশায় কখন্ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যথা সময়ে, লয়লার গোর দেওয়া হইল।

মজনু-ক্যাসকে এখন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তাহার পিতা মাতা তাহার আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিয়াছেন। সে অবসর পাইলেই হয় বনে গিয়া লয়লাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, নতুবা লয়লার পিত্রালয়ের পল্লীতে গিয়া পথে পথে গান করিয়া বেড়ায়। নগরের

বালকেরা তাহার গায়ে ধুলা মাটি দেয়, কেহবা প্রহার করে, কেহ বা দুটা মিষ্ট কথা বলে। একদিন তাহার বালক সঙ্গীরা বলিল, "তুমি আর কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াও? লয়লা ত অমুক দিন মারা গিয়াছে, অমুক স্থানে তাহাকে গোর দেওয়া হইয়াছে।" ক্যাস স্থির হইয়া কথাগুলি শুনিল, যেন সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে না। যখন বুঝিতে পারিল, তখন দৌড়িয়া লয়লার গোরস্থানে উপস্থিত হইল। নূতন গোর খুঁজিতে কষ্ট হইল না। নগরের বালকেরা তাহার পিছনে পিছনে গিয়াছিল। তাহারা দেখিল, ক্যাস লয়লার গোরের উপর শুইয়া স্বরচিত বিরহ ও বিরহের পর মিলনের কবিতা তন্ময় ভাবে গান করিতেছে। যখন ক্যাসের গান অনেকক্ষণ শুনিতে পাওয়া গেল না, তখন বালকেরা নিকটে আসিয়া দেখিল, ক্যাসের আত্মা তাহার প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে, লয়লার গোরের উপর ক্যাসের প্রাণহীন দেহটি পড়িয়া আছে। লয়লার গোরের নিকট ক্যাসের গোর দেওয়া হইল। দুইটি প্রণয়ী পাশাপাশি চিরনিদ্রায় ঘুমাইতেছে। উভয়ের মৃত্যু ৬৪ বা ৬৫ হিজরী (৬৮৩ ও ৬৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) হইয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যে যদিও লয়লা-মজনুর গল্প সশরীরে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, তথাপি বঙ্গের অনেক লেখক এই গল্পের ছায়া অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। অরবী পার্শী ও উর্দ্দু সাহিত্যে প্রেমের আদর্শ বর্ণনা করিতে হইলেই লয়লা-মজনুর উপমা দেওয়া হয়।

ক্যাস জঙ্গল মেঁ অকেলা হ্যা, মুঝে জানে দো।
খুব গুজরেগী জো মিল ব্যাঠেঙ্গে দীবানে দো॥

বনে ক্যাস একা আছে, আমাকে যাইতে দাও। দুই পাগল একত্র হইলে বেশ সময় কাটিবে॥

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হল?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠ্‌চে রজনীগন্ধা, বাসর-ঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নবধূর মত. কোন্‌খানে ফুট্‌ল ভোরবেলাকার বনমল্লিকা?

জাগ্‌ল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যার জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা জুঁইফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জান্‌লা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেচে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েচে, পূবের দিকে মুখ করে চলেচে; ওদের কপালে লেগেচে সকালের আলো, ওদের পারাণীর কড়ি এখনো ফুরোয়নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জান্‌লায় জান্‌লায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সাম্‌নে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বল্‌লে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।" ওদের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হ'ল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েচে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সাম্‌নের পথে কি আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কি ছিল কানে কানে বলাবলি করচে; বলতে বলতে কথা

বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে আকাশে উঠেচে সপ্তর্ষি।

সূর্য্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্ব্বাদ করে চলে যাক্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোগল চিত্র

মুসলমান আইনে জীবিত বস্তুর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ থাকিলেও, কতিপয় মোগল বাদশাহ চিত্রবিদ্যার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। বাদশাহ বাবর জীবিত বস্তুর চিত্রাঙ্কনে উৎসাহ না দিলেও, চিত্রবিদ্যানুরক্ত ছিলেন। হুমায়ুন অল্প সময়ই সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার পক্ষে পিতৃপদাঙ্কানুসরণ সম্ভব হয় নাই। বাদশাহ আকবরই পুরাতন রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া জীবিতের চিত্রাঙ্কনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই আজ্ঞানুযায়ী দরবারস্থ চিত্রকরগণ প্রতিকৃতি-চিত্র আরম্ভ করিয়াছেন। দরবারের খ্যাতিবৃদ্ধির জন্য এবং নিজের আকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্যও আকবর চিত্রকরদিগকে উৎসাহ দিতে থাকেন। আকবরীয় যুগ, প্রতিকৃতিরই যুগ—হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর চিত্রকরই বহুভাবে তাঁহার ও দরবারস্থ অন্যান্য সকলের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। আবুল ফজল, "আইন আকবরী"তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই আকবর চিত্রবিদ্যায় অনুরক্ত ছিলেন এবং শিক্ষা ও আমোদ উভয় দিক হইতেই ইহাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রতি সপ্তাহেই সকল চিত্রকরের নৈপুণ্য নিদর্শন তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করা হইত। চিত্রানুযায়ী তিনি সকলকে পুরস্কৃত করিতেন এবং কোন শিল্পী অধিকতর নিপুণতা দেখাইলে তাঁহার মাসোহারা বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। চিত্রকরগণের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিরও এই সময় উন্নতিসাধন করা হইয়াছিল, এবং এই সকল দ্রব্যের যথোপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। রং-মিশ্রণের উৎকর্ষ দেখা দিয়াছিল। জাহাঙ্গীরও চিত্রবিদ্যার সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। চিত্রকরগণ তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং বাদশাহ ইহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। অবশ্য এ হিসাবে শাহ-জাহান সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আওরংজেব অন্যান্য বিষয়ে গোঁড়া হইলেও, এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

বাঁকিপুরের খোদাবকস্ লাইব্রেরীতে "পাদিশাহ-নামা" নামে একখানি বহু মূল্যবান গ্রন্থ আছে। মোগল চিত্রপদ্ধতির ইহা যে অমূল্য নিদর্শন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর একখানি পাণ্ডুলিপি—"তৈমুরের ইতিহাস"—তৈমুরের ইতিহাসের ন্যায় অন্য কোন পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর অন্য কোন পাঠাগারে আছে বলিয়াও কেহ বিদিত নহেন। অনেকে মনে করেন যে ইহা আকবরের জন্যই চিত্রিত হইয়াছিল। শাহজাহান এই পাণ্ডুলিপিকে অত্যন্ত আদরের চক্ষে দেখিতেন।

পাণ্ডুলিপিখানি ৩৩৮ পৃষ্ঠার; আকারে ১৫$\frac{৩}{৪}$ × ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ; প্রতি পৃষ্ঠার মার্জ্জিনেই সুবর্ণের লতাপাতা; মধ্যে বিচিত্র চিত্রাবলী। একখানি ছবি ছাড়িয়া পাতা উল্টাইতে ইচ্ছা হয় না। কোনখানি ছাড়িয়া কোন্‌খানি দেখিবে, দর্শক তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। মনে হয়, শিল্পী বুঝি এইমাত্র তুলি রাখিয়া উঠিয়া গিয়াছে। চিত্র সমূহের কমনীয়তা, লালিত্য, মাধুর্য্যের অবধি নাই। মোগল চিত্রাঙ্কন যে উৎকর্ষের

চরমে উপনীত হইয়াছিল, ৩৩৮ পৃষ্ঠার এই পাণ্ডুলিপির ১২ খানি ছবি দেখিলে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। চিত্রকরগণের নাম অনেকগুলি ছবিতে রহিয়াছে। ইহাদের অনেকের নাম আবুল ফজল উল্লেখ করিয়াছেন—সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত—সকলেই আকবরের দরবারের চিত্রকর।

আমরা এই সঙ্গে প্রকাশিত চিত্রগুলির যৎসামান্য পরিচয় নিম্নে দিতেছি। এই চিত্রগুলির উল্লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। এক-রঙা চিত্রে —এক রঙা কেন—বহু বর্ণের চিত্রেও সে দেবদুর্লভ রঙের চিত্র দেখান সম্ভবপর নহে। অধ্যাপক সমাদ্দার তাঁহার 'সমসাময়িক ভারতের'র ঊনবিংশ ও একবিংশ খণ্ডে কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি বহুবর্ণে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি খোদাবকস্ লাইব্রেরীর "পাদিশাহনামা", তৈমুরের ইতিহাসের চিত্রের বর্ণ প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, নিপুণ চিত্রকরের তুলিতেও বুঝি তাহা প্রকাশ পায় না।

আমরা প্রথম চিত্র 'শাহানামা' হইতে উদ্ধৃত করিলাম এবং শেষোক্তখানি "পাদিশাহনামা" হইতে দিলাম। অপর পাঁচখানি উল্লিখিত "তৈমুরের ইতিহাস" হইতে গৃহীত। উপরেই লিখিয়াছি যে, বহুবর্ণের চিত্রের প্রতিলিপিতেও সে অমূল্য চিত্রাবলীর আদর্শ আইসে না। বারান্তরে আমরা "মানসী"র পাঠকবর্গকে ২১ খানি ছবির প্রতিলিপি বহুবর্ণে দেখাইবার প্রয়াস পাইব।

প্রথম চিত্র—খোদাবকস্ লাইব্রেরীর "শাহনামা" হইতে। পারস্যের অন্যতম বাদশাহ লারাসপের সিংহাসনাধিরোহণ।

দ্বিতীয় চিত্র—আকবরের জন্ম—হুমায়ুন-মহিষী হামিদাবানু বেগম ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর আকবরকে প্রসব করেন; হুমায়ুন সে সময় সিংহাসনচ্যুত; তাড়িত। হামিদা পালঙ্কের উপর শায়িতা; ধাত্রী ক্রোড়ে সদ্য প্রসূত শিশু। নবপ্রসূত শিশুদৃষ্টে অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ আহ্লাদিতা। এদিকে একজন পরিচারিকা, দৈবজ্ঞের নিকট আকবরের জন্মের সময় ও ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন। চিত্রের নিম্নভাগে, অমরকোট হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরস্থ হুমায়ুনের নিকট টার্ডিবেগ নামক অমাত্য সুসংবাদ আনয়ন করিয়াছেন।

তৃতীয় চিত্র—হুমায়ুনের জন্ম। বাবর অমাত্য পরিষদবর্গকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করিতেছেন।

চতুর্থ চিত্র—চম্পানির দুর্গের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের অভিযান। এই ঘটনা ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। বৈরাম খাঁ ও অন্যান্য ৩৯ জন পার্শ্বচর সহ হুমায়ুন দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন।

পঞ্চম চিত্র—আকবর কর্ত্তৃক চিতোর অবরোধ। এই অবরোধ সময়েই জয়মল্ল গুপ্তভাবে আকবর কর্ত্তৃক নিহত হন। চিত্রের দক্ষিণেই বন্দুক হস্তে আকবর।

ষষ্ঠ চিত্র—আকবরের মৃগয়া।

সপ্তম চিত্র—রাজকুমার খুর্‌রমের (পরে শাহজাহান) শুভ বিবাহ। কথিত হয় যে, চিত্রের বামদিকে উপবিষ্টা প্রথমা নারীই নূরজাহান। চিত্রের দক্ষিণে উপবিষ্ট প্রথমই খুর্‌রম্ এবং দ্বিতীয় জাহাঙ্গীর।

শ্রী—

১। জারাস্‌পের সিংহাসনাধিরোহণ

২। আকবরের জন্ম

হুমায়ূনের জন্ম

৪ । চম্পানিরের দুর্গে

• ৫। চিতোর অবরোধ

৮। আকবরের মৃগয়া

৭। শাহজাহানের শুভ বিবাহ
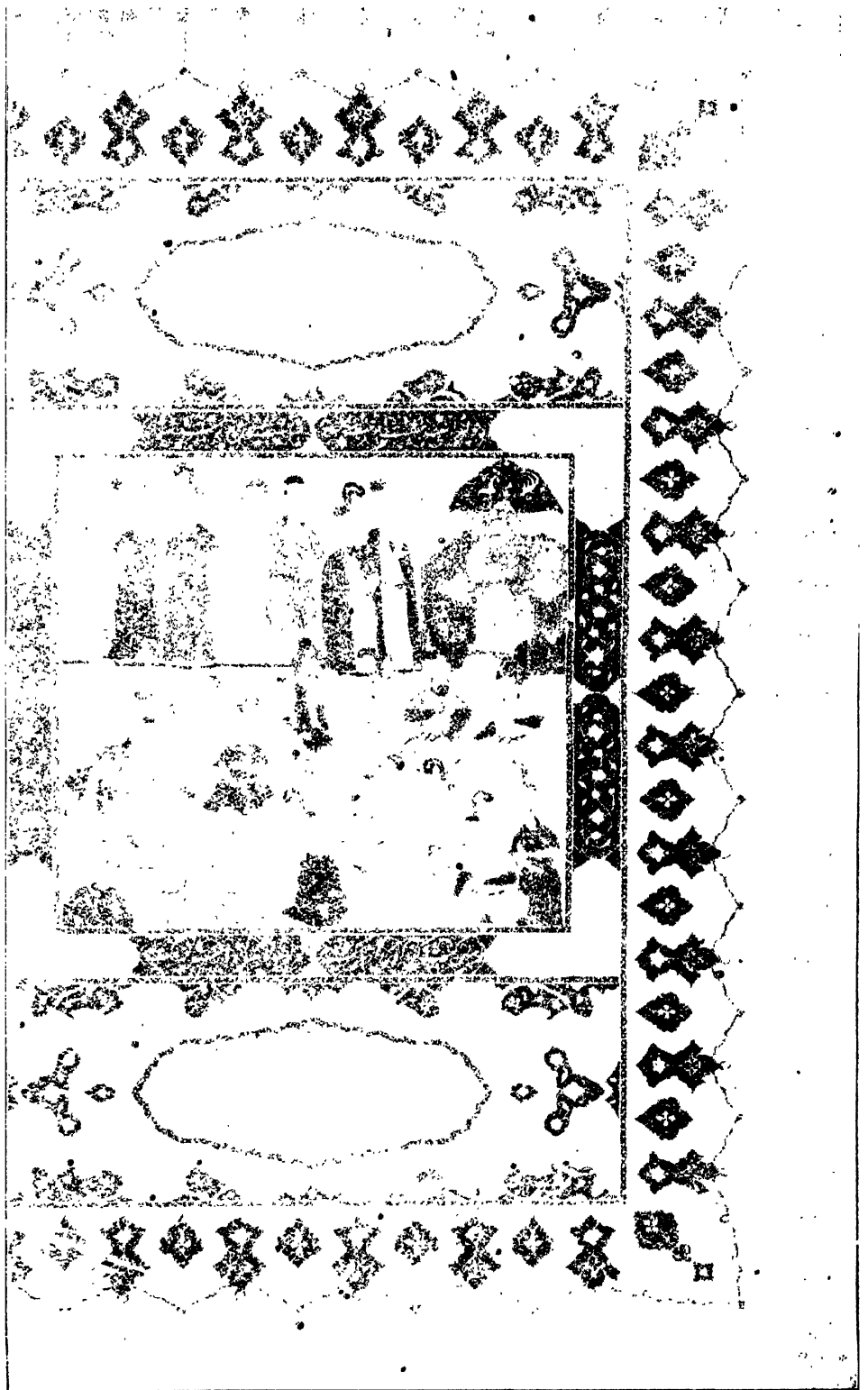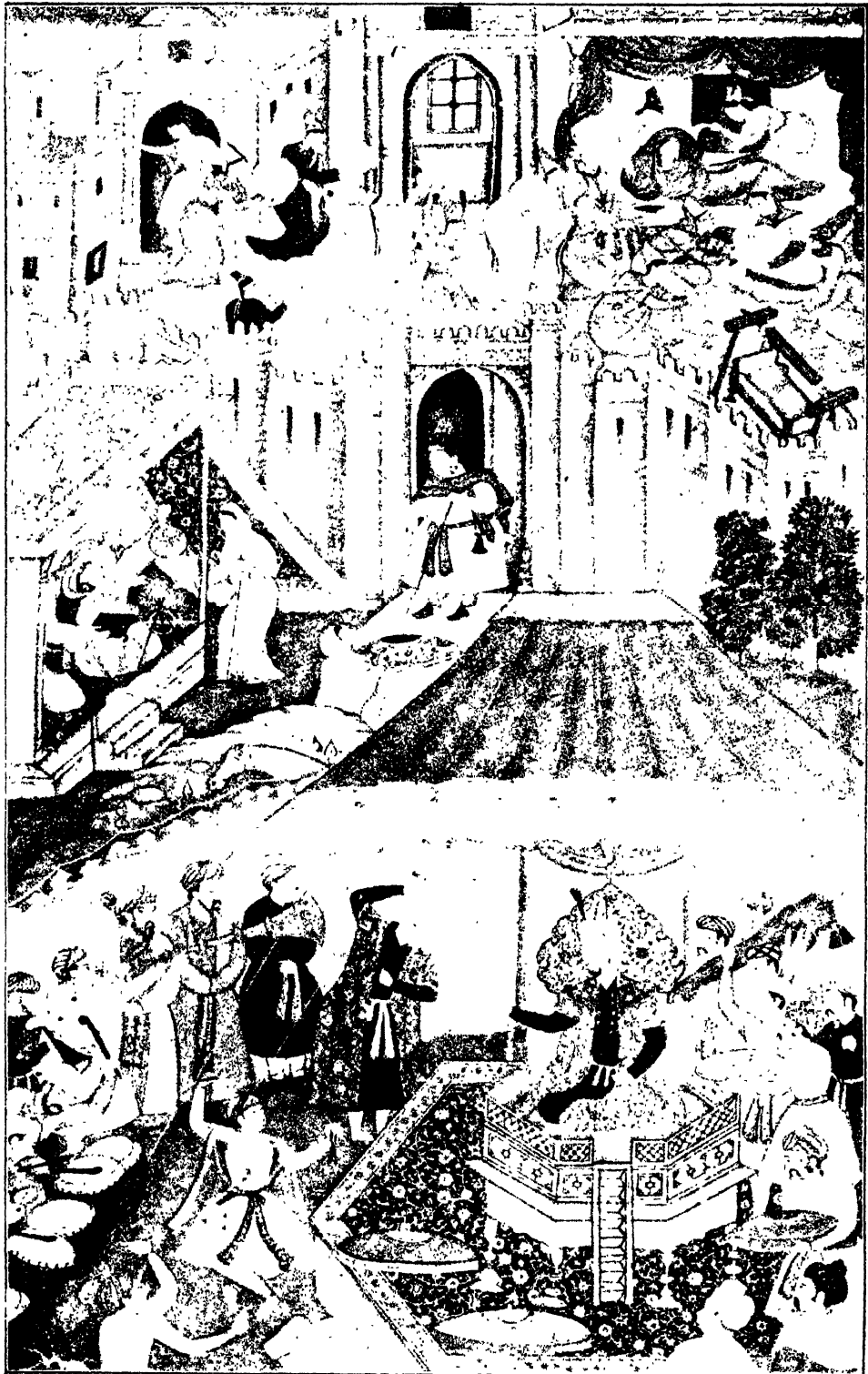
গৈরিকের দেশে

বাল্যকাল হইতেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমার বড় প্রিয়। আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে কখনও ভয়ে জড়সড়, কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠকালে আমি পর্য্যটকের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যাই। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-লেখকের আমার মত ভক্ত পাঠক বিরল। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'প্রবাসচিত্র', 'হিমালয়', 'পথিক' প্রভৃতি কত আগ্রহে কতবার পড়িয়াছি বলিতে পারি না। আমার দুর্ব্বল শরীরে কখনও যে পর্য্যটক হইতে পারিব না তাহা জানি, সেইজন্য 'দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাই'। উত্তরাখণ্ড সম্বন্ধে এমন পুস্তক নাই, যাহা আমি পাঠ করি নাই। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া আমার অবস্থা কতকটা Don Quixote এর ধরণের হইয়াছিল। আমি স্বপ্নে কেদারনাথ বদরীনাথ দেখিতাম; গঙ্গোত্রীর সীকরসিক্ত শীত বায়ু অনুভব করিতাম; এবং অসীম অনাস্বাদিত সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতাম। 'করিতাম' বলিলে সত্য বলা হইল না, এখনও করি।

সেবার বদরী কেদার যাইবার একান্ত বাঞ্ছা হইল এবং বন্দোবস্তও করিলাম। কিন্তু গাড়োয়ালে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট যাত্রী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য যাইবার সৌভাগ্য ঘটিল না। কাযেই (গত বৎসর) পূজার বন্ধে অন্ততঃ একবার হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি দর্শন করিতে বড়ই ইচ্ছা হইল।

বিজয়া দশমীর রাত্রিতে উপসন হইতে শ্রীশ্রী৺ মঙ্গলচণ্ডী মাতাকে প্রণাম করিয়া গোশকটে "বলগনা" ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। ক্রোশ চার গিয়াই হঠাৎ গোশকটের সশব্দে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে পতন এবং (আমার মূর্চ্ছা না হইলেও) পায়ের উপর তীব্র আঘাত। পা কাটিয়া গিয়া অবিশ্রান্ত রক্তপাত হইতে লাগিল। পটি বাঁধিয়া অতি কষ্টে রক্ত বন্ধ করিলাম, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণার কিছুতেই উপশম হইল না। রাত্রি-প্রভাতে ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখিলাম, ২।৩ স্থান কাটিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম যাত্রার প্রথমেই যখন এতটা বিঘ্ন, তখন আর যাইয়া কায নাই—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই।

পরক্ষণেই চঞ্চল মনকে বুঝাইলাম এবং 'দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি শ্রীহরি' বলিয়া বর্দ্ধমানগামী রেলগাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। বেলা চারিটার সময় বর্দ্ধমানে পঁহুছিলাম। পাছে এখানে আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিদায়ে বাধা ঘটে, সেইজন্য একেবারে হরিদ্বারের টিকিট করিয়া একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণেই উঠিয়া পড়িলাম, এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা করিতে দেরী সহিল না। এ গাড়ী ২।৩ ঘণ্টা আগে ছাড়িতেছে, কিন্তু পঁহুছিবে এক্সপ্রেসের অর্দ্ধঘণ্টা পরে। আমি কিন্তু গাড়ী পাইয়াই আনন্দিত, সময়ের জন্য ব্যগ্র নহি।

আমার সঙ্গে একটি ব্যাগ ও সামান্য বিছানা। অত্যধিক আগ্রহে আমি সামান্য জলযোগ করিতেও ভুলিয়াছি। গাড়ীতে উঠিয়াই যেন কৃতার্থ। এই গাড়ীতেই জনৈক সাহিত্য বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ—তিনি দেওঘর যাইতেছিলেন। তিনি বিজয়ার কোলাকুলি ও আশীর্ব্বাদ দিলেন এবং একদিন তাঁহার দেওঘর 'কুঞ্জ' ভবনে অতিথি হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি এখন 'সুদূরের পিয়াসা'—পথে কোথাও থামিতে স্বীকৃত হইলাম না। তিনি ট্রেণের সহযাত্রীদিগের নিকট অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের অপব্যয় করিয়া আমার পরিচয় দিলেন; তাঁহারা তাঁহাদের 'কামরা'তেই একজন 'জলজ্যান্ত' কবি যাইতেছেন জানিয়া কোনও রূপ শঙ্কা অনুভব করিলেন কি না জানি না। দিল্লির ইলেক্‌টিসিয়ান্—মহাশয় আমাকে তাঁহার সহিত দিল্লি হইয়া হরিদ্বার যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমার টিকিট সবে মোগলসরাই থাকায় তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে একটি

হাস্যকর ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মধুপুরে যখন সকলেই নামিয়া যান, তখন একটি ভদ্রলোক একটি নূতন কাগজের বাক্সে আতার বীজ, আপেলের খোসা প্রভৃতি আবর্জ্জনা ভরিয়া, ফেলিয়া দিতে ভুলিয়া যান। বাঁকিপুরে একটি ভদ্রবেশী লোক আমাদের গাড়ীতেই উঠিলেন। কথায় বার্ত্তায় বুঝিলেন ঐ বাক্সটি বে-ওয়ারিস্ মাল। তিনি যখন 'আরা' ষ্টেসনে নামিলেন, তখন বিনা দ্বিধায়, নিতান্ত আপনার করিয়া সেই কাগজের বাক্সটি বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ধীরে অবতরণ করিলেন। ব্যাপার দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। লোকটা উহার মধ্যে অন্ততঃ একযোড়া আনকোরা জুতারও আশা করিয়াছিল— কিন্তু যখন বাক্স খুলিয়া দেখিবে তখন তাহার আশা প্রকৃত প্রাপ্যই পাইবে।

পরদিন গাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিল। তখনও আমার পায়ে অসহ্য বেদনা। কাশীতে নামিয়া, ক্ষতস্থান চিকিৎসক দ্বারা ড্রেস করাইয়া, ৯॥টায় আউধ্ রোহিলখণ্ড পঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী কাশীর পুলের উপর আসিল। সেথান হইতে কাশীধামের কি রমণীয় শোভা! অসংখ্য মন্দির শোভিতা, গঙ্গাচ্কূলা পুণ্যভূমিকে দেখিলেই প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়। ঐ অকামীর কাম্য দেবভূমিকে ছাড়াইয়া যাইতে যেন কি এক বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। ঐ কাশীধামের মণিকর্ণিকার ঘাটের ঠিক উপরেই একটি বাড়ীতে ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে পিতামাতার শ্রীচরণতলে অয়েকদিন কাটাইয়া গিয়াছি। আজ বারবার সেই কথাই মনে পড়িতে লাগিল। বারাণসীকে বারবার ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। কাশীর পর গাড়ী একেবারে প্রতাপগড়ে থামে, অনেকদূর পরে ষ্টেশন। কাশীর পরই প্রকাণ্ড প্রান্তর, বহুদূরব্যাপী—ধূ ধূ করিতেছে। এ বৎসর জলাভাবে একেবারে শস্যহীন। প্রতাপগড়ে আসিয়া আমি 'এলাহাবাদ দেরাডুন through গাড়ীতে' আরোহণ করিলাম। এথানি এ মেলেই সংযোগ করিয়া দেয় এবং 'লুকসরে' গিয়া ট্রেন বদল করিতে হয় না।

পথে লক্ষ্ণৌ দেখিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেথানে ভয়ানক ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে শুনিয়া আর সাহস করিলাম না। এথানে দেখিলাম ষ্টেশনে কতকগুলি আতা বিক্রয় করিতেছিল। কবিবর দেবেন্দ্রনাথের 'লক্ষ্ণৌ' আতা নামক সুন্দর কবিতাটী পড়িয়া এথানকার আতার উপর আমার বিশেষ ভক্তি ছিল। যদিও ষ্টেশনে যে আতা বিক্রয় করিতেছিল তাহা কবিবর্ণিত আতার অতি দুর্ব্বল সংস্করণ, তথাপি অগ্নি চড়াদরে দুইটি থরিদ করিলাম এবং আস্বাদে অতুল আনন্দ পাইলাম। সহযাত্রীরা আমার দেখাদেখি অনেকেই কিনিলেন কিন্তু উহাতে কিছুই নূতন স্বাদ পাইলেন না।

এই লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে হরিদ্বারগামী কতকগুলি যাত্রী উঠিলেন। শুনিলাম ইহাঁরা কলিকাতায় লোহার কারবার করেন। লুকসর পঁহুছিতে রাত্রি প্রায় ১টা হইল; সেথানে আমাদের গাড়ী দেরাডুন মেলে সংযুক্ত করিয়া দিল এবং রাত্রি ৩টার সময় আমরা হরিদ্বার ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সেথানে রাত্রে কুলী কি গাড়ী কিছুই পাওয়া গেল না, আমি সামান্য মোট নিজেই স্কন্ধে করিয়া রেলওয়ের অতি সন্নিকটে এক ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। এটিকে ধর্ম্মশালা বলা চলে না। এটি সরাই, এথানে ভাড়া লইয়া যাত্রী রাখা হয়। এ প্রদেশে ধর্ম্মশালায় এ নিয়ম নাই।

প্রত্যূষে এক টোঙ্গা ভাড়া করিয়া একেবারে 'হরি-কি-পেরি' ঘাটের উপর গিয়া নামিলাম। তখন বেশ একটু শীতল ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছিল। সেথানে দৈনিক একটাকা ভাড়া দিয়া ত্রিতলের উপর এক গম্বুজ ঘর ভাড়া লইলাম। কলিকাতার যাত্রী সাধারণতঃ রায় সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালা বাহাদুরের সুন্দর ধর্ম্মশালাতেই উঠেন। কিন্তু আমি একেবারে গঙ্গার অতি সন্নিকটে থাকিতে চাই, সেই জন্য ব্রহ্মকুণ্ডের উপরেই 'হাভেলি আতরকর' নামক যে একটী

প্রকাণ্ড ভবন আছে তাহারই সুর্ব্বোচ্চ গম্বুজ ঘরটি পছন্দ করিয়া ভাড়া লইলাম।

আমি একা, সঙ্গে কেহ নাই, সমস্ত জিনিষপত্র ঘরে রাখিয়া, কুলুপ না থাকায় গৃহস্বামিদত্ত কুলুপ দিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম। এখানে বহু পাণ্ডা আমায় ধরিলেন, বড় বড় খাতা লইয়া সকলে হাজির হইলেন, অবশেষে আমার পূর্ব্বপুরুষদের নাম মিলাইয়া ঠিক হইল আমি পাণ্ডা আশারাম লকড়িয়ালার যজমান।

এখানকার পাণ্ডারা অতি ভদ্র, যাত্রীকে কোনরূপ পীড়াপীড়ি করেন না। আমাদের পাণ্ডা হরিদ্বারে থাকেন না, তিনি থাকেন 'জ্ওলাপুরে'। তাঁহার দুইটী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী সমস্ত কার্য্য করেন।

আমি মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করিয়া পবিত্র হইলাম। হৃদয়ে কি এক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। গঙ্গা মায়ির আরত্রিক এক দর্শনীয় ব্যাপার। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়াছিলাম, ইহা তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই কম মধুর লাগিল না।

আমি পুণ্যস্নান করিয়া, ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। হরিদ্বার সাহারাণপুর জেলায়, গঙ্গার ঠিক উপরে অবস্থিত। গঙ্গার প্রধান স্রোত চণ্ডীপাহাড়ের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাকে নীলধারা বলে। চণ্ডীপাহাড় শিভালিক গিরিমালার একটি অংশ। এখানে অনেকগুলি তীর্থ আছে, তন্মধ্যে 'হর-কি-পেরি' বা ব্রহ্মকুণ্ডই প্রধান। এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবার জন্য কুম্ভ ও অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে সন্ন্যাসীর দলে কত হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হইত। এই সকল নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্ট এখানে প্রায় একশত ফুট প্রশস্ত ও বহুসোপানবিশিষ্ট এক ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এবং দূরে বাঁধ দিয়া জলপ্রবাহ যাহাতে সর্ব্বদা প্রবাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই বাঁধান ঘাট যেন ইহার প্রাচীনত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেখানে দাঁড়াইলে অনেকটা খিদিরপুরের ডকের কথা মনে পড়ে। তীর্থের প্রাচীনতা যে তাহার অর্দ্ধেক মহিমা!

এখানকার তীর্থাদির কথা বহু লোকেই বর্ণনা করিয়াছেন আমি তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহিনা।

হরিদ্বারে হরির অপেক্ষা হরেরই যেন প্রাধান্য অধিক। হওয়াও স্বাভাবিক। হাজার হউক, ইহা হরের শ্বশুরবাড়ী। দুই মাইল দূরে দক্ষরাজের গৃহে সতীর পিত্রালয়। এই দক্ষরাজ শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাঁহার যজ্ঞের শোচনীয় পরিণামের কথা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। এখানে দক্ষেশ্বর শিবের নিকট যে সতীকুণ্ড আছে, অনেকের মতে সতী সেখানে দেহত্যাগ করেন নাই। যজ্ঞ হইয়াছিল কনখলের মাইল দুই-এক পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড প্রান্তরের উপর। সেখানে 'সতীকুণ্ড' নামক একটী ক্ষুদ্র সরোবর বিদ্যমান আছে। আমি পরদিন অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ক্ষুদ্র সরোবরটী পানিফলে ও কণ্ঠকে ভরা, জল অতীব কষায়। ঘাটটী বাঁধানো।

নিকটে একটি ঢিপের উপর দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। ভাবিলাম, এই ভূমিতে যুগযুগান্তর পূর্ব্বে কি এক বিরাট করুণ দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল। ঐ যেখানে একগাছ ফুল লইয়া তরুটী বিরাজ করিতেছে, কে বলিতে পারে ঐ খানে বিষ্ণুর আসন পাতা ছিল না; ঐ যেখানে আর একটী বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, হয়ত ঐখানেই স্বর্ণচন্দ্রাতপের দণ্ড প্রোথিত ছিল। আর আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, তাহারই উপরে হয়ত দেবরাজ ইন্দ্র বা অন্য কোন দিক্‌পালের আসন ছিল। সভয়ে সে মৃত্তিকায় প্রণাম করিলাম। এইস্থানে যে পবিত্র মাতৃদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল তাহারই স্মৃতি লইয়া আজ সমস্ত ভারত কৃতার্থ। আমার জন্মভূমি সুদূর বঙ্গের এক ক্ষুদ্র পল্লীও সেই সতীদেহের অংশ হইতে বঞ্চিত হয় নাই, এজন্য সত্যই গর্ব্ব বোধ করিতে লাগিলাম। এই শূন্য প্রান্তরে দাঁড়াইলে, কিংবা দক্ষঘাটে দাঁড়াইলে, সেখানে যে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সহজেই বোধ হয়। মেঘে যেন আজিও সে দিনের হোম ও চিতার ধূম ঘনীভূত হইয়া

লাগিয়া রহিয়াছে। পবন যেন সে হবির্গন্ধে আজিও ভরপুর।

কনখলও হরিদ্বারের ন্যায় পুণ্যভূমি। "স্নাত্বা কনখলে তীর্থে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" কনখল খুব প্রাচীন জনপদ। মহাকবি কালিদাস এই কনখলের পথেই তাঁহার মেঘকে 'অলকায়' পাঠাইয়াছিলেন।

কনখলে আর একটি দেখিবার জিনিষ—লাণ্ডোরার রাণীর প্রতিষ্ঠিত 'রাধাকৃষ্ণ' মূর্ত্তি। মন্দিরটী গঙ্গার ধার হইতে গাঁথিয়া তোলা। অতি সুন্দর। এমন সুন্দর যুগলমূর্ত্তি খুব কমই দেখিয়াছি। এখানে ঠাকুর ঠাকুরাণীকে দেখিয়া যেন প্রাণ জুড়াইল। একেবারে নয়নাভিরাম মূর্ত্তি।

এখানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আর একটি দেখিবার বস্তু। স্বামী কল্যাণানন্দ ও তাঁহার সহযোগী ব্রহ্মচারীবৃন্দ যেরূপ যত্নে আতুরকে শুশ্রূষা করিতেছেন, তাহা দেখিলে প্রকৃতই আনন্দ হয়। তাঁহাদের কাছে 'শিবালয়ে সেবালয়ে' এক হইয়া গিয়াছে।

আমি কনখলে ৫।৭ দিন ছিলাম। কনখলে শেঠ সুরযমলের (ইনি কলিকাতায় রায় বাহাদুর সুরযমল নহেন) একটী অতি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে—ইহা বন্দোবস্তে ও পরিচ্ছন্নতায় অতুলনীয়। আমি ইহারই একটি কক্ষে ছিলাম।

এখান হইতে আমি হরিদ্বার হইয়া হৃষিকেশ যাত্রা করি। শ্রীযুক্ত জলধর বাবু লিখিয়াছেন, "হৃষিকেশের গঙ্গার শোভা যে দেখে নাই সে জীবনে সুন্দর কিছু দেখিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে না।" হৃষিকেশকে আমি বহুদিন হইতে ভালবাসি, ভক্তি করি। দেশে দুই একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কত আনন্দ করিয়াছি, এখন তাঁহাদের দেশ গৈরিকের রাজ্য দেখিব ইহাতে হৃদয় উল্লাসিত হইয়া উঠিল। হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ ১৪ মাইল পথ, এখন পুল হওয়ায় রাস্তার কোন কষ্ট নাই। আমি টোঙ্গায় রওনা হইলাম। পথে 'সত্যনারায়ণ' দর্শন করিলাম। ইহাও বাবা কালী কম্বলীওয়ালার একটি আশ্রম। এখানে ঔষধালয় আছে, তথায় ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। এখানে জলস্রোতে জাঁতা চালাইয়া আটা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাই হৃষিকেশে প্রতিদিন সাধুসেবায় ব্যয়িত হয়।

ইহার কিছুদূরে এক মাতাজীর আশ্রম আছে, তাঁহাকে সাধারণে খুব ভক্তি করে এবং টোঙ্গা ও একাওয়ালারাও অত্যন্ত সম্মান করে। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মাতাজী আমাকে 'চা' পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি দেরী হইবে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রওনা হইলাম।

হরিদ্বার হইতে আহার করিয়া রওনা হইয়াছিলাম। বেলা ২॥টা ৩টায় হৃষিকেশ পঁহুছিলাম। মাত্র ২॥ ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

আমি হৃষিকেশে বাবা কালী কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতেই উঠিলাম। এখানে ইঁহার একটু পরিচয় না দিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। বাবা কালীকম্বলীওয়ালা একজন সাধু। তিনি বহুদিন গতাসু হইয়াছেন। তিনি কালো কম্বল পরিধান করিতেন বলিয়া বাবা কালী কম্বলীওয়ালা নামেই খ্যাত। এক্ষণে তাঁহার দুই শিষ্য আছেন। এক রামনাথ ও অন্য আত্মপ্রকাশ-কালা-কম্বলীওয়ালা। রামনাথ 'সত্যনারায়ণ' 'হৃষিকেশ' 'কেদারনাথ' 'বদরিনাথ' প্রভৃতি তীর্থে ও পথের অধিকাংশ স্থানেই ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের মালিক। আর আত্মপ্রকাশ স্বর্গাশ্রম স্থাপন করিয়া বহু সন্যাসীর অভাব মোচন করিয়াছেন। হৃষিকেশ ধর্ম্মশালায় ৫০০শত হইতে ২০০০ সাধু সেবা হয়। প্রত্যহ ঠিক সময় সব প্রস্তুত হয়। সাধুদিগকে সাধারণতঃ ৬খানা ৮খানা বড় রুটী, ১ পাত্র ডাল (মুগের কিন্তু দেখিতে কলায়ের মত) এবং শাক (তরকারী) দেওয়া হয়। রুগ্নদিগকে পথ্য দুগ্ধ ঔষধ দেওয়া হয়। যাহারা খাদ্য স্পর্শ করেন না তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া দিবার লোক বন্দোবস্ত আছে। আশ্রমে গাভী আছে, অসংখ্য কর্ম্মচারী আছে, অতি সুন্দর ব্যবস্থা।

আমি এ ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলাম, কারণ সমস্ত গাড়ী

এইখানেই দাঁড়ায়। বাজারও অতি নিকট, একেবারে পাশেই। কিন্তু এখান হইতে গঙ্গা একটু দূরে এবং হিমালয়ের বিরাট দৃশ্যও নয়নগোচর হয় না। সেই জন্য আমি একেবারে ত্রিবেণী সঙ্গমের উপর রায় বাহাদুর লালা জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রাসাদতুল্য ধর্ম্মশালার একটী সুন্দর কক্ষে আশ্রয় লইলাম। এখানে ভিড় কম—সম্মুখেই গঙ্গার করুণাময়ী মূর্ত্তি এবং অতি নিকটেই হিমালয়ের গম্ভীর দৃশ্য। জ্যোৎস্নালোকে আমি আত্মহারা হইয়া সেই সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতাম।

হৃষিকেশে ভরতজীর মন্দির ও রামজীর মন্দির আছে। ভরতজীর মন্দিরটী প্রাচীন। ইনি রামচন্দ্রের ভ্রাতা 'ভরত' নহেন—যাঁহার নামে "ভারতবর্ষ" ইনি সেই ভরত।

হৃষিকেশ দেরাদুন জেলায়, স্থানীয় ভাষায় ইহাকে ঋষিকেশ বলে। এখানে একটী পোষ্ট আফিস আছে; হৃষিকেশে কোন গৃহস্থ অধিবাসী নাই। যাত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক নাই। এটীকে মুসলমান আমলে 'ফকিরাবাদ' বলিত কারণ এখানে কেবল সন্ন্যাসীর বাস। ইহা গৈরিকের রাজ্য, অগৃহীর গৃহ। অসংখ্য সুন্দর অট্টালিকা রহিয়াছে—সমস্তগুলিই ধর্ম্মশালা। ৫।৬ শত সন্ন্যাসী এখানে সর্ব্বদাই বাস করেন। হৃষিকেশের অন্তর্গত ঝারিতে (ঠিক গঙ্গার উপরে এক জঙ্গল) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে সন্ন্যাসীগণ বাস করেন। প্রায় প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক কুটীর। এখানে ১৩।১৪ জন বাঙ্গালী সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সকলেই অল্পবয়সী এবং ৮।১০ বৎসর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। হৃষিকেশ এবং এই ঝারির মধ্যে বর্ষাকালে একটী জলধারা প্রবাহিত হয়। তাহার নাম 'চন্দ্রভাগা'। ইহাতে যখন বন্যা আসে তখন ইহা পার হওয়া ক্লেশকর ও বিপদজনক। একবার ইহা পার হইতে একটী সাধু ভাসিয়া গিয়া প্রাণ হারাণ। নিজ হৃষিকেশের মধ্যেও অনেক সাধু বাস করেন। ত্রিবেণীর উপর এক বটবৃক্ষতলে একটী সন্ন্যাসী থাকেন। এক ন্যাংটা বাবা এখানে ঘুরিয়া বেড়ান—তিনি মৌনী, শুনিলাম তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। কতলোক তাঁহাকে পয়সা ও খাদ্য দিতেছে, ভ্রুক্ষেপও নাই। কখনও ছেলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, কখন রৌদ্রে বা হিমে পড়িয়া বালকের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। আমি তাঁহাকে এক সময় একটি বৃক্ষতলে গভীর নিদ্রিত দেখিলাম। সে কি প্রশান্ত সুষুপ্তি! নিতান্ত কচি ছেলে যেমন নিদ্রা যায়, ঠিক সেইরূপ নিদ্রা। মধ্যে মধ্যে ওষ্ঠে হাস্য ও রোদনের 'দেয়ালা' হইতেছিল, তাহা দেখিতে বড়ই মনোরম। কোন্ ত্রিদিবের ছবি সে বক্ষে তখন জাগিতেছিল, জানিনা। শ্যামের বংশীর কোন্ প্রাণ-মাতানো সুর তাঁহার প্রাণে পশিতেছিল কে বলিতে পারে! চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। এমন সুন্দর নিদ্রা আমি কখনও দেখি নাই।

আমি ৫।৬ দিন হৃষিকেশে ছিলাম, প্রধান কার্য্য ছিল কেবল ঝারিতে সন্ন্যাসীবৃন্দের শুভদর্শন লাভ করা এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা। প্রভাতে উঠিয়াই বহির্গত হইতাম, বেলা দ্বিপ্রহরে ফিরিতাম। বেলা ৩টায় বাহির হইয়া সন্ধ্যার পর ধর্ম্মশালায় আসিতাম। কত আনন্দেই এ ছয়দিন কাটিয়াছিল।

হৃষিকেশে ৺প্রণবানন্দ স্বামীর একটী আশ্রম আছে, তাহাতে তাঁহার তিনজন শিষ্য সম্প্রতি বাস করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বেই পঞ্চবটী আশ্রম নামে একটী আশ্রমের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা আমি দর্শন করিয়া আসিয়াছি। এখন সংবাদ পাইয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমি যখন হৃষিকেশ যাই, তখন তাঁহার শিষ্যগণ অন্য একটী আশ্রমে থাকিতেন। সেইখানেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। ব্রহ্মচারী কালিকানন্দ ও অসীমানন্দকে দেখিয়া প্রকৃতই আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহারা অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই আমাকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইলেন। সেই পুরাতন ঋষি বালকদের ন্যায় সারল্য, তেমনি নিষ্কলঙ্ক মুখকান্তি। এক মুখ কুন্দ ফুটাইয়া সেই মধুর হাস্য। তাঁহারা আমাকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করায় আমি কৃতার্থ বোধ করিলাম। তাঁহাদের আগ্রহে, তাঁহাদের আশ্রমেই আমি দুইদিন

আহার করিলাম। সে অমৃত আস্বাদ জীবনে আর গ্রহণ করিতে পারিব কি না সন্দেহ। যে কয়টি দ্বিপ্রহর তাঁহাদের আশ্রমে কাটাইয়াছি তাহা আমার জীবনের অমর মুহূর্ত্ত।

ঝারিতে অনেকগুলি বঙ্গালী সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ গীরানন্দ একজন। ইহাঁরা স্বামী মুক্তানন্দের শিষ্য। ইনি বেশ লেখাপড়া জানেন এবং অল্পদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ঝারির অধিকাংশ সন্ন্যাসীই অগ্নি স্পর্শ করেন না। ইহাঁদের আহার সাধু কালী কম্বলীয়ালার সদাব্রত জোগান। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে হিংসা, দ্বেষ একেবারে নাই, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। এই বাঙ্গালী সাধু-সম্প্রদায় তৈজসপত্র ব্যবহার না করিয়া, আমাদের দেশের বাউলদের মত, নারিকেলের পাত্র গ্রহণ করেন বলিয়া শিখ ও অন্য সম্প্রদায়ের সাধুগণ রুষ্ট হন এবং ঘৃণা করেন। যাহাতে ঝারিতে তাঁহাদের স্থান না হয় তজ্জন্য চেষ্টাও করেন, কিন্তু বাঙ্গালী সাধুগণ এ সব উৎপীড়ন উপেক্ষা করিয়া সেইখানেই থাকেন।

একবার একটী সাধুর (বাঙ্গালী) ঘরে অগ্নি লাগে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাঁরা অগ্নি স্পর্শ করেন না। অগ্নির কারণ নির্দ্দেশের সময় অন্য সম্প্রদায়ের ২।৪জন সাধু বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালী সাধু মাছ ভাজিয়া খাইতে গিয়াছিল তাই চালে আগুন লাগিয়াছে।" বাঙ্গালী সাধুগণও সন্দেহ করেন যে এ চালে আগুন লাগাইয়া দেওয়া ঐ কয়জন "সাধু"রই কার্য্য। যাহা হউক এখন আর সে উপদ্রব নাই। তাঁহারা মোটের উপর সুখেই আছেন। এ সকল সন্ন্যাসীই সেই প্রাতঃস্মরণীয় সাধুকুলপতি বাবা কালী কম্বলীওয়লার সদাব্রত হইতে নিয়মিত আহার্য্য পান।

দুঃখের বিষয়, এই প্রদেশে বাঙ্গালীর কোন কীর্ত্তিই বিদ্যমান নাই। বাঙ্গালীর দানশীলতার পরিচয় এ স্বর্গভূমে প্রবেশ করে নাই। একটী সামান্য ধর্ম্মশালা কি সদাব্রতও নাই। আবার মনে হয়, আমাদের রাজা মহারাজদের একটী ধর্ম্মশালাও থাকিলে বাঙ্গালী সাধুদের বিশেষ সুবিধা ও আনন্দের কারণ হয়। সাধুগণও এ অনুযোগ করিলেন।

এই ঝারিতে "নেপালীবাবা" নামে এক সাধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি হৃষিকেশে কোন্‌স্থানে গঙ্গার শোভা অতুলনীয়, তাহারই অনুসন্ধানে গঙ্গার তীরে তীরে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে নেপালী বাবার আশ্রমের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার গঙ্গার শোভা সত্য সত্যই জীবনে দর্শনীয় বটে। সম্মুখে উচ্চ হিমালয়, নিম্নে স্ফটিকস্রোতা তটভূমিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড যুগ যুগ ধরিয়া পড়িয়া আছে। যেন অসংখ্য যোগী গৈরিক বসনে আবৃত হইয়া ধ্যানে মগ্ন আছেন, যেন অসংখ্য অহল্যা কোন্ পাদস্পর্শে মুক্ত হইবার আশায় অনাদিকাল হইতে পড়িয়া আছে। আমি বহুক্ষণ ধরিয়া গঙ্গার এই অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া নেপালীবাবার আশ্রমে প্রবেশ করিলাম।

বাবাকে অভিবাদন করায় তিনি মধুর কণ্ঠে কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং কোথা হইতে আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর নানা কথা হইতে লাগিল। তিনি আমাকে নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি এখানে এই আশ্রমে ৪০ বৎসর আছেন। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন ইহাঁর দৈনন্দিন পূজা আরাধনা শেষ হইয়াছিল। কাযেই সাধারণ লোকের ন্যায় আগ্রহের সহিত দেশের কথা শুনিতে চাওয়ায় এবং সংসারিক সংবাদ লওয়ায় আমি তাঁহার ঠিক প্রকৃতি বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইলেও সংসারের প্রতি ইহাঁর বিশেষ টান আছে। কিন্তু তার পরদিন বৈকালে আসিয়া কেমন করিয়া সে ভ্রম গেল তাহা বলিতেছি।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন। আমি ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। তখন 'নেপালীবাবা' গঙ্গা পানে মুখ করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বসিয়া আছেন। একঘণ্টা আমি দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহার পূজা শেষ হইলে

আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িল; আমাকে নিকটে যাইতে অনুমতি করিলেন। তখন বোধ হয় তিনি হরিনাম বা মালা করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কয়েকটি ফুল পড়িয়াছিল। আমি ভাবিলাম উনি বোধ হয় হাতে করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন। দেখিলাম সেই ফুলের উপর তাঁর দৃষ্টি বদ্ধ, এদিকে আমার সহিত কথা কহিতেছেন। আমি সেই ফুলের কাছেই বসিয়াছিলাম, হঠাৎ ফুলের উর্দ্ধ দিয়া একবার হাতটি সরাইলাম। তাহাতে সাধুবাবা কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কেবল্ "মাৎ কর্না বেটা" এই কথাটি বলিলেন। কিন্তু আমি বুঝিলাম, নিশ্চয়ই এক দারুণ অপরাধের কার্য্য করিয়াছি এবং কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তিনি স্নেহস্বরে যাহা বলিলেন, তাহার কথাগুলি ঠিক স্মরণ নাই, তবে তাহার ভাবটী এই, "বৎস তোর হস্ত সঞ্চালনে দেবতা সরিয়া গেলেন।" আমি শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইলাম। এবং দুঃখে ও পুলকে দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, চক্ষে জল আসিল। এই কয়টী ফুলের উপর সাধু তাঁহার আরাধ্য মুর্ত্তিকে স্থাপন করিয়া এত সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ছিলেন! দেবতার সঙ্গে দেহীর, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মধুর সম্মিলনে আমি বাধা দিলাম বলিয়া মনে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেবতার এত কাছে বসিয়া ছিলাম, তাঁহার গায়ের বাতাস আমার বুকে লাগিয়াছে জানিয়া বুকে শান্তি পাইলাম। দেবতার এত কাছাকাছি বসা জীবনে কি মরণে হইবে কিনা সন্দেহ। এ কি কম সৌভাগ্য! সন্ধ্যা সমাগমে আমি নেপালী বাবার নিকট বিদায় লইয়া ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং সমস্ত রাত্রি ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

হৃষিকেশ হইতে একদিন প্রাতে লছমনঝোলা দর্শনে গেলাম। এখান হইতে তিন মাইল হইবে। পথে কৈলাস আশ্রমে বহু সোপান অতিক্রম করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ইহার কিছুদূর গিয়াই পর্ব্বতবক্ষে রামাশ্রম নামক সুন্দর পুস্তকালয়। আমি সেখানে পুস্তকালয়টী দর্শন করিলাম। এখানে একটী বাঙ্গালী সাধুর সহিত পরিচয় হইল। তিনি কেদার বদরী গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী ত দর্শন করিয়াছেনই, অধিকন্তু অতি দুর্গম গোমুখী তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি নেপালের একজন উচ্চ সৈনিক পুরুষের সঙ্গে গিয়াছিলেন, ১৫।১৬ জন ছিলেন। তিনি বলিলেন সে পথে নিবিড় জঙ্গল। দিনে রাত্রি বোধ হয়। অসংখ্য কস্তুরী মৃগ, তাহাদের গন্ধে বন আমোদিত। গোমুখীতে তিনি নীলতুষার দেখিয়াছেন এবং সেখানে উর্দ্ধে চাহিলে সত্যই মনে হইতেছিল মেঘগুলি তুষার হইতেছে এবং তুষারগুলি মেঘ হইতেছে। অবিরত ভীষণ কামান গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ সর্ব্বদা শ্রুত হইতেছে। যেন সেখানে পঞ্চভূত একাকার হইয়া যাইতেছে। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের একখানি খাতায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া পাঠ করিলাম। তারপর তিনি আমাকে লছমনঝোলা দর্শন করিয়া তাঁহারই নিকট প্রসাদ পাইতে অনুমতি করিলেন। আমিও স্বীকৃত হইলাম।

এইখান হইতে নৌকাযোগে পরপারে স্বর্গাশ্রম ঘাটে অবতরণ করিলাম। ঘাটেই একটী আবৃত কাষ্ঠমঞ্চে এক মৌনী বাবা ধ্যানমগ্ন আছেন জানিলাম, আমি উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। এই স্বর্গাশ্রম, বাবা কালী কমলীওয়ালার অন্যতম শিষ্য আত্মপ্রকাশের প্রতিষ্ঠিত। এখানেও বহু সন্ন্যাসী আহার্য্য পান। এখানে বনের মধ্যে অসংখ্য কুটীরে সাধুগণ বাস করেন। এ আশ্রম মণিকূট পর্ব্বতের পাদদেশে। এ প্রদেশের প্রত্যেক সেবাব্রতের দ্বার অতিক্রম করিলেই, "আইয়ে মেরা নারায়ণ," "আইয়ে মেরা গেহ দেহ পবিত্র করনেওয়ালা" প্রভৃতি বলিয়া সাদরে আহ্বান করেন। দানেও কি বিনয়!

এখান হইতে লছমন ঝোলা গমন করিলাম। এ স্থানের পূর্ব্বের ভীষণতা আর একেবারেই নাই। এখন সুন্দর ঝোলা পুল। পুলের পার্শ্বে বাঙ্গালী সাহিত্যিক "পরিব্রাজক" যে কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া ছিলেন তাহাও এখন আর নাই, এবং যে বৃক্ষতলে একনিশা কাটাইয়া গিয়া-

ছেন, যেখানে অসহ্য বৃশ্চিক দংশনে যন্ত্রণায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় নষ্ট হইয়াছে। আমি কল্পনায় একটী বৃক্ষকে সেই বৃক্ষ স্থির করিয়া তাহার তলেই বসিলাম এবং তাঁহার সেই রাত্রির কথা মনে করিতে লাগিলাম।

এই লছমন ঝোলার ঠিক উপরেই লছমনজীর মন্দির। নিম্নে ধ্রুবঘাট। এখানে লক্ষ্মণের মূর্ত্তি বড়ই মনোরম। এ প্রদেশের সকল মূর্ত্তিই প্রায় এক-প্রকার, তথাপি যেন লাবণ্যে এটির বিশেষত্ব আছে। এই খানে উপরে পুলের পথে আর এক বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। বহুদিন সন্ন্যাস লইয়াছেন। তিনি ও-প্রদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। আমার জন্মপল্লীতেও তাঁহার শুভ পদার্পণ হইয়াছিল। উপর হইতে লছমনঝোলা সেতুতে আসিবার রাস্তায় পাহাড়ী ভিখারী ভিখারিণী দাঁড়াইয়া থাকে; তাহারা "এ শেঠজী" বলিয়া একটী পয়সা ভিক্ষা করে। না পাইলেও দুঃখ নাই। লছমনঝোলা সেতুর উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। গঙ্গা এখানে বাঁকিয়া আসিয়াছেন, সেতুর মধ্যভাগে এখনও এত ঝড় লাগে যে তাহাই অসহ্য। প্রাচীন কালে দড়ি বা লতার সিঁড়ি যে কি ভাবে দুলিত তাহা অনুভব করা যায়। অসংখ্য যাত্রীর যে পদস্খলন হইয়া মৃত্যু হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? এইখান হইতে বদরীনাথের পথ গিয়াছে। আমি কতকদূর গিয়া একটী চটীর নিকট হইতে প্রণাম করিয়া ফিরিলাম। যেন এ-জন্মে একবার বদরি কেদার দর্শন ঘটে, পথের নিকট ইহাই প্রার্থনা করিলাম। পথ দেখিয়াই যেন কত আনন্দ হইতে লাগিল!

প্রণাম করিয়া ফিরিলাম। ফিরিতে বেলা ২টা হইল। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর আহার প্রস্তুত করিয়া আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। আমি স্নান করিয়া যে পরমান্ন ও অন্ন ব্যঞ্জন খাইলাম, তাহা দেবতার প্রসাদ বটে, নতুবা এমন অমৃতের আস্বাদ আসিল কোথা হইতে! সে আস্বাদ এখনও মুখে লাগিয়া আছে।

বৈকালে হৃষিকেশে ফিরিয়া আসিলাম। শীতকালে এখানে সন্ন্যাসীর সংখ্যা সময় সময় ১৫০০।২০০০ হাজার হয়। যখন গঙ্গাতটে সাধুবৃন্দ সন্ধ্যাবন্দনায় বসেন তখন সমস্ত তটভূমি গৈরিক বসনে ভরিয়া যায়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল গৈরিকের ছড়াছড়ি। কোন কোলাহল নাই, সব নীরব নিস্তব্ধ—যেন সমস্ত পুণ্যভূমি গৈরিকবসন-পরিধানা গৌরীর ন্যায় তপস্যায় নিরত।

আমি যেদিন হৃষিকেশ ত্যাগ করিব, তাহার পূর্ব্ব-রাত্রে ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি। অর্দ্ধরাত্রে জানালা খুলিয়া দেখি, বরফের ন্যায় শীতল বায়ু বহিতেছে এবং বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আসিতেছে। দেখিলাম, ত্রিবেণীর বটবৃক্ষতলে ঝড়ে ও জলে ধুনি নিবিতেছে জ্বলিতেছে, আর, সাধু তেমনই বসিয়া আছেন। সে রাত্রিতে ঘরের ভিতর লেপ চাপাইয়াও শীত যাইতেছিল না, অথচ তিনি সেই বৃক্ষতলেই বসিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগকে আমরা অনেকেই ভণ্ড বলি। কিন্তু এই গভীর রাত্রিতে তীব্র-শীত বায়ুর দংশন সহ্য করিয়া ভণ্ড সাজিবার কি কারণ তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারিনা। সেই রাত্রে সেই দৃশ্য দেখিয়া আমার মন কেন যে ব্যাকুল হইয়া উঠিল বলিতে পারিনা। ভগবান যে সহজে মিলি-বার দ্রব্য নন! তিনি যে কত দুর্লভ, কত কৃচ্ছ্র-সাধন-সাপেক্ষ তাহা যেন বুঝিতে পারিলাম। ইহা অপেক্ষা কত দারুণতর রাত্রি ঐ সাধুর উপর দিয়া বছর বছর গিয়াছে। এত করিয়াও সে "নিদারুণ মাধবের" দেখা পাইতে কত যুগ যে লাগিবে কে বলিতে পারে! আর, আমরা ঘরে বসিয়াও তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে সময় পাইনা—অথচ ভক্ত হই-বার স্পর্দ্ধাও রাখি।

হৃষিকেশ হইতে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

আমি এ গৈরিকের দেশে একটী জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি—এখানে আমার কিছুই অপরিচিত বোধ হয় নাই। সর্ব্বত্রই স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছি। ধর্ম্ম-শালার অধ্যক্ষের নিকট অপ্রত্যাশিত আদর এবং সাধুগণের নিকট তাঁহাদের দুর্লভ প্রসন্ন হাস্য ও

আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি। কোনও যুগান্তর পূর্ব্বে দূর জন্মান্তরে এখানে বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল কি না ভগবান জানেন, কিন্তু একটা জননান্তর-সৌভাগ্য ইহার সঙ্গে আমার ছিল ইহাই বারবার আমার মনে হইতেছিল। প্রত্যেক পথ যেন আমার পরিচিত, বহুবার চলা ফেরার পথের মত পুরাতন। লোকগুলির মুখও যেন কত পরিচিত। 'তপোবন' গ্রামের কয়েকটী লোকের সঙ্গে আলাপ হইল; তাহারা বলিল, "আপনাকে ত এখানে হামেসা, দেখি।" কথাটা সত্য। দেহ লইয়া না আসিলেও মন লইয়া এখানে যে বহুবার, আসিয়াছি তাহা স্বীকার করিবই। আর এক কথা—এ আমাদের দাদা-মহাশয়ের দিদিমার দেশ, মা জগদম্বার বাপের বাড়ী। এস্থান আমার অপরিচিত হইতেই পারে না। জন্মের পূর্ব্ব হইতে ইহার সহিত সম্বন্ধ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

হেমচন্দ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমালোচনায় 'বৃত্রসংহার'।

তুলনামূলক সমালোচনা। আমাদের দেশে যে ক্ষুদ্র জনপদে কতকগুলি জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় অট্টালিকামাত্র বর্ত্তমান আছে, সেখানে যদি কেহ পাশ্চাত্য আদর্শে একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মিত করেন, তাহা হইলে জনসাধারণ স্বভাবতঃই প্রথমে বিপুল বিস্ময়ে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে। যাঁহারা নূতনত্ব ভালবাসেন, তাঁহারা পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকাগুলির প্রতি একবারও চাহিয়া দেখেন না, থাকুক তাহাতে আমাদের জাতীয় সভ্যতার অভিব্যক্তি, আমাদের জাতীয় আদর্শের নিদর্শন, আমাদের জাতীয় প্রতিভার স্ফূর্ত্তি। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতার ও সাধনার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া নূতন আদর্শের প্রশংসায় আত্মহারা হন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা ধীর, বিচক্ষণ এবং সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা সহজে আত্মহারা হন না। নূতন পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত বলিয়াই তাঁহারা উহার সর্ব্ববিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য রুচি প্রাচ্য রুচি হইতে বহু বিষয়ে বিভিন্ন। তাঁহারা হয়ত স্বীকার করিবেন যে নূতন প্রাসাদের কক্ষগুলি সুপ্রশস্ত, উহাতে আলোক ও বায়ুর গতি অনাহত, কিন্তু তাঁহারা হয়ত ইহাও জিজ্ঞাসা করিবেন যে "প্রাসাদটী কি আমাদিগের জাতীয় রুচির অনুযায়ী এবং ব্যবহারোপযোগী? উহাতে চণ্ডীমণ্ডপ কোথায়, পূজার দালান কোথায়, অতিথিশালা কোথায়? সাহেবী ফ্যাশানের বাটীতে সাহেবীভাবে থাকিলে বাস করা চলে, কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহারাদি রক্ষা করিতে গেলে উহাতে ত চলে না। উহা নয়নাভিরাম হইতে পারে, কিন্তু উহাতে আমাদিগের কাজ চলে না।"

উভয় পক্ষের বিরোধের মধ্যে যদি আর কোনও শিল্পী অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সুনিপুণ সংমিশ্রণে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করেন এবং সেই আদর্শানুযায়ী এক বিচিত্র ব্যবহারোপযোগী প্রাসাদ নির্ম্মিত করেন, তাহা হইলে জনসাধারণের মনে প্রথমতঃ তাদৃশ বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন না তাঁহারা বলিয়া উঠেন, "এরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ আর কি এমন শক্ত কাজ? এই

ত সেদিন একজন একটি প্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়া গিয়াছেন, এ তাঁহার 'দেখা-দেখি' তৈয়ারী করা হইয়াছে বইত নয়।" কিন্তু যে দুই চারিজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক অভিনিবেশ সহকারে এই শিল্পীর কার্য্য নিরীক্ষণ করেন তাঁহারা সেই শিল্পীর প্রতিভার যথোচিত সমাদর করেন। দ্বিতীয় প্রাসাদটি যে প্রথম প্রাসাদটীর অনুকরণে প্রস্তুত নহে তাহা তাঁহারা জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন এবং প্রথমটির কি কি অভাব ছিল দ্বিতীয়টিতে সেই সেই অভাব কিরূপ বুদ্ধি ও কৌশলে নিরাকৃত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত করিয়া শেষোক্ত শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেন।

মানবসমাজ পরিবর্ত্তনশীল। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে বাটীতে সুখে বাস করিত, এক্ষণে তাহাতে বাস করিতে পারে না। প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব দূর করিবার জন্য নূতন আয়োজন করিতে হইতেছে। সকল বিষয়ে আদর্শ দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

যদি একটা বাঁধা ধরা আদর্শ থাকিত, তাহা হইলে তাহার সহিত তুলনা করিয়া আমরা বলিতে পারিতাম এই প্রাসাদটি কতদূর আদর্শানুযায়ী হইয়াছে। কিন্তু যেখানে আদর্শ পরিবর্ত্তনশীল সেখানে যে প্রাসাদটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহার সহিত নবনির্ম্মিত প্রাসাদটীর তুলনা করিয়া দেখি কোন্‌টি কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

মধুসূদন যখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন, তখন পাশ্চাত্য 'এপিক্' কাব্যের আদর্শে রচিত এই তথাকথিত মহাকাব্যখানি দেখিয়া জনসাধারণ বিস্মিত হইয়াছিল। পরে যখন হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রকাশিত হয়, তখন জনসাধারণ তাদৃশ বিস্মিত হয় নাই। যাঁহারা না পড়িয়া সমালোচনা করেন কিংবা যাঁহারা হেমচন্দ্রের প্রতি অহেতুকী ঈর্ষাবশতঃ অন্ধপ্রায়, তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "উহাতে আর নূতন বস্তু কি আছে? হেমচন্দ্র ওস্তাদ মাইকেলের অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র. সুতরাং সকল অনুকারীর ন্যায় বৃত্রসংহার রচয়িতার স্থান মেঘনাদবধ রচয়িতার নিম্নে।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বরদাচরণ প্রভৃতি সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকগণ 'বৃত্রসংহারে' এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছেন যাহা মেঘনাদবধে নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব এবং যাহাতে বিশ্ববাসী মাত্রেরই উপভোগ্য মহাকাব্যের চিরন্তন অমৃতরস অভিসিঞ্চিত আছে।

'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা বিখ্যাত মনীষিগণ কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমরা তাহা দেখিব।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, "হেমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে মধুসূদনের সহিত হেমচন্দ্রের তুলনা করা কর্ত্তব্য।" আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত। কারণ মহাকাব্য প্রণয়নে মাইকেল ভিন্ন আর কোন আধুনিক কবি হেমচন্দ্রের সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয় নহেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যাহাই বলুন না কেন, স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" প্রকাশের পর নবীনচন্দ্রকে মহাকবির আসনে বসাইতে কেহ যে নিষ্ফল চেষ্টা পাইবেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাকাব্যের স্বরূপ। তুলনা করিতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, 'মেঘনাদ বধ' ও 'বৃত্রসংহার' একজাতীয় কি না? সাধারণতঃ উভয় কাব্যকেই মহাকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। কিন্তু মহাকাব্য কাহাকে বলে?

পাশ্চাত্য এপিক্ কাব্যের তিনটী প্রধান লক্ষণ আছে। বর্ণিত বিষয়টি (১) এক হইবে (২) মহান্ হইবে (৩) উপাদেয় হইবে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ প্রাচ্য মহাকাব্যের লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে॥

অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ সর্ব্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্॥
চত্বারস্তত্রবর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং ভবেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা॥
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ত্তনম।
একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ॥
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে॥
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ।
সন্ধ্যাসূর্য্যেন্দুরজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ॥
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নমৃগয়াশৈলর্ত্তুবনসাগরাঃ।
সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ॥
রণপ্রয়াণোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ॥
কবের্ব্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয় কথয়া সর্গনাম তু॥
—ইতি সাহিত্যদর্পণম্।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় সাহিত্য-দর্পণকারের উপরিলিখিত লক্ষণগুলি এই :—

"কাণ্ডবিভক্ত কাব্যশাস্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নায়ক, হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্ত-গুণান্বিত কোন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে। সৎকুলোদ্ভব একবংশজাত কতকগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে পারে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তি এই কয়টি রসের মধ্যে একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। বৃত্তান্তটি ইতিহাসোদ্ভব বা সজ্জনাশ্রয় হইবে। উহাতে সমস্ত চতুর্ব্বর্গ ফল কিংবা কোন একটি ফল থাকিবে। উহার আদিতে নমস্কার আশীর্ব্বাদ কিম্বা বস্তুনির্দ্দেশ থাকিবে। কখন কখন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধু-দিগের গুণকীর্ত্তনে উহার আরম্ভ হয়। সমস্ত পদ্যে একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে। কখন কখন উহাতে নানা ছন্দোময় সর্গ দৃষ্ট হয়। উহা নাতিস্বল্প ও নাতিদীর্ঘ হইবে। উহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। সর্গান্তে ভাবী সর্গের কথাসূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, ঋতু, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিচ্ছেদ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে উহাতে বর্ণিত হইবে। কবির নামে, কিম্বা বৃত্তান্তের নামে, কিম্বা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। সর্গের মধ্যে যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়, তাহারই নামে সর্গের নাম হইবে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যদর্পণকারের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, "উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহার মর্ম্মগত তাৎপর্য্য কি, তাহার প্রাণগত ভাব কি—সে বিষয়ের কোন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উহাতে কেবল বাহ্য আকার ও বাহ্য উপকরণের কথাই আছে।"

কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুনশ্চ লিখিয়াছেন, "এপিক্ কাব্যের যে সকল লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হই-য়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এপিক্ কাব্যগত বিষয়টি এক হইবে, মহান্ হইবে এবং উপাদেয় হইবে। যদিও সাহিত্যদর্পণকার ঠিক এইরূপ কথায় মহাকাব্যের লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাঁহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে য়ুরোপীয় এপিকের সার মর্ম্মটি কোন প্রকারে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ বিকাশ আপনা হইতেই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিয়াছেন, মহাকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকা চাই, উহাতে য়ুরোপীয় এপিক্ কাব্যের কার্য্যগত একত্বও সূচিত হইতেছে। তাহার পর সাহিত্যদর্পণে যে আছে :—সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য্য, রণপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় মহাকাব্যে বর্ণনীয়—তাহার তাৎপর্য্য এই, একটি মহৎ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং সেই বর্ণনা উপাদেয় করিতে হইলে কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক।"

মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' প্রাচ্য মহা-

কাব্যের আদর্শে রচিত হয় নাই। উহা পাশ্চাত্য এপিক্ কাব্যের আদর্শেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপীয় এপিকের লক্ষণানুসারে মেঘনাদবধের সমালোচনা করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন :—

(১) উহাতে কাব্যগত বিষয়ের একত্ব নাই। "মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধ সাধনা কিম্বা শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভ উহার কোন্‌টি কাব্যগত বিষয় তাহা বুঝা নাও যাইতে পারে। কারণ কবি, মেঘনাদের বধসাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার করেন নাই, তাহার পরেও লক্ষ্মণের শক্তিশেলের ঘটনা আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়া অনেকটা নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। অ্যারিষ্টটলের নিয়মানুসারে ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে।"

(২) বর্ণিত বিষয়ের মহত্ব নাই। "কবি, লক্ষ্মণ কিম্বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নায়করূপে নির্ব্বাচন করায় তাঁহার কাব্যগত মহত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাবণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ পাশব বীরত্বেই আদর্শস্থল, কিন্তু যে বীরত্বের সহিত ক্ষমা দয়া ন্যায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, সেই বীরত্বগুণে ভূষিত উন্নতচরিত্র মহাপুরুষই মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মূলগ্রন্থে যে সকল চরিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই মূলগ্রন্থের বর্ণিত উন্নত-চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? বিশেষতঃ যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির আরাধ্য দেবতা—সেই রামলক্ষ্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত? রামলক্ষ্মণ থাকিতে মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক করা যাইতে পারে না—মহাকাব্যের উপযুক্ত অত বড় মহান চরিত্র রামায়ণে কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কাব্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া রাবণ কিংবা মেঘনাদকে নায়ক করিবার ত কোন অর্থই পাওয়া যায় না।"**"আসল কথা, চরিত্রের মহত্ব বিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?"

(৩) বর্ণনার উপাদেয়তা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন, "মেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উহা সুখপাঠ্য। * * কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা হইতে যে আমোদ পাই—সাধারণ মানবপ্রকৃতিসুলভ আড়ম্বরপ্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজপথে ঘোর ঘটা করিয়া, বাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া, যখন চাকচিক্যময় গিল্‌টির সাজে সুসজ্জিত কোন প্রতিমাকে বাহির করা হয়—তখন যেরূপ সেই দৃশ্য সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়—মেঘনাদবধ কাব্য পড়িয়া অনেক সময়ে আমরা যে আমোদ পাই, সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ঐ প্রকারের আমোদ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস অতি বিরল, কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কারে উহা পরিপূর্ণ। কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে আমোদ উচুদরের নহে, উহা চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।"

যাঁহারা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তাঁহারা সকল সময়ে চিরনির্দ্দিষ্ট পথে চলেন না, তাঁহারা তাঁহাদের অপূর্ব্ব শক্তিদ্বারা নূতন নূতন পথ প্রস্তুত করেন, সুতরাং মহাকাব্যের চিরনির্দ্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণগুলি নাই বলিয়া কিংবা অতি অল্প মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মেঘনাদবধকে মহাকাব্য পর্য্যায়ভুক্ত না করিলে সুবিচার করা হইবে না। মহাকাব্যের প্রাণ কোথায় এবং সেই প্রাণ 'মেঘনাদবধে' আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। প্রতিভার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয়

হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরম পুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য চরিত্রের উদার মহত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে! সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! * * *

"কিন্তু আজকাল যাহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশি রাশি খট মট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধ বর্ণনা মাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাঁহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।*

"হেমবাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এই রূপ নামমাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্ব্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্ত্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতেই পারে না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্ব্বত্র চরিত্র-বিকাশ চরিত্র মহত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুভ্র-তুষার-ললাটে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্ব্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্ত্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

"হীন, ক্ষুদ্র, তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্ম্মের ফলে বৃত্রের সর্ব্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয়মাত্র

* নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' পাঠে এ বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্রসংহারের নিম্নে পলাশীর যুদ্ধের স্থান নির্দ্দেশ করায় নবীনচন্দ্র বিশেষ প্রীত হন নাই এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যখন নবীনচন্দ্রকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করেন "আপনি পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য কি খণ্ড কাব্য বলেন?"—তখন নবীনচন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমি উহাকে অকাব্য বলি।"

কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংস ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয়-গৌরব কীর্ত্তিত হয়—গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরব কল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনার কোন্‌খানে সেই উদ্দীপনী শক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই। একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনাই নাই, সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে? মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখ দুঃখের সহায় হইতে পারেন না, আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক হইতে পারেন না। কখন কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্মকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে,—চন্দ্রশেখরের চরিত্রে অমরতা আছে,—যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে শায়িত, তখনো প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিবে! * * *

"আর একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্‌ মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন 'I despise Ram and his rabble' সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্‌ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব-জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীকে কিরণদান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কা-বর্ষণ করিয়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্‌ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

"একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদ বধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্য চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সঙ্গীত তাহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি। হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল;—মাইকেল ভাবিলেন মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায় ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণা করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর, পীড়িত, কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটা কতক দীন দরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য

যতপ্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া হওয়া উচিত. হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া মহাকাব্যের একটা কাঠাম প্রস্তুত করিয়া লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহজভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয়দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য, এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না!

"আমি মেঘনাদ বধের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া, তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।"

'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় আমরা কিছু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম। আমরা পাঠকগণের সহিত একত্র বৃত্রসংহার পাঠ করিয়াছি, এক্ষণে বৃত্রসংহারের আর কোনও বিশেষ পরিচয় না দিলেও উপরি উদ্ধৃত সমালোচনা পাঠে তাঁহারা নিশ্চয়ই মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের জাতিগত পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের ন্যায় বৃত্রসংহারকে কেন নামমাত্র মহাকাব্য বলিয়া মনে করেন না, তাহাও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন, "কিবা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের সুপরিচিত পুরাতন সূত্র, কিবা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অধুনাতন বিচার-ব্যবস্থা,—যেদিকে দৃষ্টি কর, যে দেশের সাহিত্যসমালোচকদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লও, বৃত্র-সংহার সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন একখানি মহাকাব্য আর কোন দিনও ফুটে নাই; ভবিষ্যতে যে ফুটিবে এমন বেশী আশা নাই। যে সকল কাব্য ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য বলিয়া সম্মানিত, তাহারও সকল খানিতেই বৃত্র-সংহারের তুলনা নাই।"

ছন্দঃ। হাতী ও ঘোড়ার তুলনা হয় না,'মেঘনাদ-বধ' ও 'বৃত্র-সংহারে'র জাতিগত পার্থক্য স্বীকার করিলে আর তুলনা করা উচিত নহে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র,রবীন্দ্র ও কালীপ্রসন্নের অভিমতও সর্ব্বজনগ্রাহ্য না হইতে পারে। যাঁহারা তাঁহাদের মতের পোষকতা করেন না তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে, 'লড়াই বর্ণনাই' মহাকাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মেঘনাদবধ একটি মহাকাব্য।

প্রথমতঃ দেখা যাউক মেঘনাদবধ ও বৃত্র-সংহারের আকৃতিগত কোনও পার্থক্য আছে কি না। পুস্তকদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে উভয় কাব্যের ছন্দঃ এবং ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ও হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ এক নহে। মধুসূদনের যে দোষগুলি হেমচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় দেখাইয়াছিলেন, সেগুলি সযত্নে বৃত্রসংহারে নিরাকৃত হইয়াছে। সুপণ্ডিত ৺বরদাচরণ মিত্র মহাশয় তদ্বিরচিত "The English Influence on Bengali Literature" শীর্ষক প্রস্তাবে যথার্থই লিখিয়াছেন "His" (Michael Madhu Sudan Dattas) defects have been corrected without his beauties being impaired in the later works of Baboo Hem Chandra Banerjea." অধিকন্তু মেঘনাদবধে ছন্দোবৈচিত্র্য নাই, বৃত্রসংহারে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, "বৃত্রসংহারে ছন্দবৈচিত্র থাকাতে লাভ হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে। মাইকেলের কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে।" পক্ষান্তরে, চন্দ্রনাথ বসু বলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ "আমার

মিষ্ট লাগে না। আমার মনে হয় ঐ ছন্দে কবিতা লিখিয়া মাইকেল একটা জঞ্জাল ঘটাইয়াছেন। সেই সেকালের পয়ার ও ত্রিপদী আমার বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু এখন ঐ সকল সোজা সরল ছন্দ বড়ই ঘৃণিত, একরকম মূর্খের ছন্দ বলিয়া পরিত্যক্ত। হেমচন্দ্র মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন। মাইকেলের হেঁপায় না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বৃত্রসংহারখানা পয়ারে লিখিয়া বঙ্গে যথার্থ ই বাঙ্গালীর প্রিয় একখানা বাঙ্গালা কাব্য রাখিয়া যাইতেন। আর সেই কাব্যখানাকে বাঙ্গালী জাতীয় এবং স্বদেশী কাব্যজ্ঞানে পুলকিত হইত।" দেখা যাইতেছে "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" পাঠকগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, সাহিত্যগগনের যে প্রদীপ্ত ভাস্করের প্রতিভার প্রতিফলিত জ্যোতিঃতে সাহিত্যাকাশের অনেক চন্দ্র একদা জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল এবং যাঁহার প্রতিভারশ্মিসংহরণের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক চন্দ্রের প্রতিভাজ্যোতিঃ অত্যাশ্চর্য্য ও দ্রুত ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ * অভিমতের সহিত অধিকাংশ পাঠক একমত হইবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন; "ইউরোপে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠক মাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্ত্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্য সকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র্য এবং লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বৃত্রসংহার সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "এই পুস্তকে ছন্দ মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর দুইরূপই আছে। তন্মধ্যে আবার প্রকারভেদ আছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ হইবে ভাবিয়া কবি অমিত্রাক্ষরছন্দের চারি পঙ্‌ক্তিতে বাক্যশেষ করিয়াছেন। ফলতঃ মেঘনাদবধের ছন্দ অপেক্ষা বৃত্রসংহারের ছন্দ অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

ভাষা। মধুসূদনের কাব্যের পরম অনুরাগী স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র তুলনায় সমালোচনা করিয়া একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বৃত্রসংহার প্রকৃতই মহাকাব্য। ইহাতে প্রেম, বীরত্ব এবং স্বার্থত্যাগের যে সকল আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ এবং অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। ভাবের সম্পদ বৃত্রসংহারে মেঘনাদবধের ভাবসম্পদের অপেক্ষা কম নহে, ছন্দের সম্পদও কম নহে, তবে ভাষার সম্পদ দেখিতে গেলে মেঘনাদবধ কাব্যকেই প্রাধান্য দিতে হয়।"

* কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করেন। সাহিত্যসেবক ৺নিত্যকৃষ্ণ বসু একস্থানে লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের একটা দুর্ব্বলতা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। তিনি যেরূপ স্বাধীনতা ও সতর্কতার সহিত অপরিচিত গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতেন, পরিচিত বা আশ্রিত লেখকদিগের সম্বন্ধে সেরূপ করিতে পারিতেন না। * * * দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গদর্শন সম্পাদক কৃত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং গঙ্গাচরণ সরকারের সমালোচনা উল্লিখিত হইতে পারে। যেখানে এই আশ্রিতানুরাগের সম্পর্ক নাই, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিয়া কেবল সাহিত্য ও সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপায় কি? গঙ্গাচরণের 'ঋতুবর্ণনে'র উচ্চ প্রশংসা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাও পিতৃভক্ত পুত্র অক্ষয়চন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। তাই অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গভাষার লেখকে' 'পিতাপুত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার দোষ দেখাইয়া পিতাকে certificate দিয়াছেন। ঋতুবর্ণনের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু একটি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রের 'বিদ্যুৎ' ও গঙ্গাচরণের 'বিদ্যুতে'র তুলনা করিয়াছিলেন এবং উভয়ের কাব্যের পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মেঘনাদবধে যত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ আছে বৃত্রসংহারে তত নাই, একথা শতবার স্বীকার্য্য। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যতপ্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, মাইকেল তাহা করিয়াছেন। কিন্তু অভিধান দেখিয়া কতকগুলি দুরূহ শব্দ সংগ্রহ করিলেই কি কাব্যের উৎকর্ষবৃদ্ধি হয়? কাব্যের প্রাণ সরলতা, স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতায়, কেবলমাত্র অলঙ্কারে ও শব্দাড়ম্বরে নহে। কুৎসিতা রমণীকে অধিক অলঙ্কার পরাইলেই সে সুশ্রী হইবে না, পক্ষান্তরে যে স্বভাব-সুন্দরী সে দুই-একখানি অলঙ্কার পরিলেও সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হইবে। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন, "অর্থই বাক্যের শরীর; শব্দাদি অলঙ্কার স্বরূপ। সেই শরীরের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া অলঙ্কারের প্রতি যত্ন করা বুদ্ধিজীবি জন্তুর লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যের তাদৃশ আদর কেন? আর নলোদয়ের অনাদরই বা কেন? এই প্রশ্নের আলোচনা করিলে অনায়াসে বোধ হয় যে নলোদয় শব্দের ঘটা মাত্র; তাহাতে কাব্যের লেশমাত্র নাই; এবং তন্নিমিত্তই তাহা শকুন্তলাদির তুল্য হইতে পারে নাই।"

আমাদের মনে হয়, কোনও কবির শব্দসম্পদ আছে কিংবা তিনি এ বিষয়ে দরিদ্র তাহা বিচার করিতে গেলে, তদ্বিরচিত কাব্যে কতগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা গণিবার প্রয়োজন নাই। দেখিতে হইবে শব্দের দারিদ্র্যজনিত তাঁহার ভাব প্রকাশের কোন প্রত্যবায় ঘটিয়াছে কি না। যদি রামপ্রসাদ তাঁহার গীতিকবিতায় সরল ও সহজ শব্দের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শব্দাড়ম্বরহীনতার জন্য নিশ্চয়ই তিনি নিন্দনীয় হইবেন না। পক্ষান্তরে, যদি অভিধান দেখিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়াও কেহ ভাব প্রকাশে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি কেবল অধিক সংখ্যক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অযথা প্রশংসা প্রাপ্ত হইবেন না। হেমচন্দ্র স্বয়ং 'বৃত্রসংহারে'র 'বিজ্ঞাপনে' তাঁহার সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞতার নিমিত্ত আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার উচ্চ ভাবসমূহ প্রকাশের জন্য কখনও তিনি উপযোগী শব্দের অভাব অনুভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। পক্ষান্তরে মাইকেল অনেক স্থলে অনুপযোগী শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে ভারতচন্দ্রের সহিত মাইকেলের তুলনা করিবার সময় মধুসূদনের কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা উদার সমালোচক হেমচন্দ্রও, ভারতচন্দ্রের শব্দের উপর আধিপত্যের প্রশংসা করিয়া মাইকেল সম্বন্ধে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "বোধ হয় তিনি পদবিন্যাসকালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করেন না।"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কলির ছেলে

(গল্প)

প্রতাপপুরের জমিদার বাবু সুদীর্ঘ দুইটি বছর পরে যে দিন বাড়ী আসিলেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য গ্রামের আবাল-বৃদ্ধদের ভিতরে বেশ একটু সোরগোল পড়িয়া গেল। ছোট বড় সকলেরই মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, সতীশকে যেন কি একটা অসাধারণ দেখা যাইবে। কিন্তু উচ্চ বিদ্যায় ভূষিত কুড়ি একুশ বছরের এই ছেলেটিকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল এ আবার কি? জমিদারের ছেলে, নিজে জমিদার, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত! কলিকাতার মত বিলাসের লীলাক্ষেত্রে থাকিয়াও মানুষ কি এমন থাকিতে পারে? ছেলেটির সৌন্দর্য্যও যেন সর্ব্ব-সাধারণ হইতে অনেক অধিক। সতীশের বড় বড় চক্ষু দু'টিতে এবং প্রসন্ন হাস্যময় মুখখানিতে একটা সুললিত নবীন সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল।

কয়েকদিন পর বিস্মিত গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের সীমা চরমে না পৌঁছিয়া থাকিতে পারিল না। ইংরাজি কলেজে পড়িয়া ছেলেদের যে মাথা খারাপ হইয়া যায়, গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ একথা বড় গলাতে ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। জমিদারের ছেলে, নিজে জমিদার, সে কিনা গ্রামের হাড়ি বাগ্‌দিদের বাড়ী দিন রাত্রি ঘুরিয়া বেড়ায়! যে ছোটলোকদের ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ ছুঁয়ে দিলে স্নান করেও শরীর 'শুচি' বোধ হয় না, সতীশ কি না সেই ছেলেদের নিয়ে লেখা পড়া শিখাইতে যত্ন করিতেছে। ছি ছি! কি ঘেন্নার কথা!

গ্রামের বয়োবৃদ্ধ হরিশ মজুমদার মহাশয় ওরফে গ্রামবাসীদের সরকারী 'ঠাকুরদা' সেদিন তাঁহার বহু-মূল্য সময়টুকু নষ্ট করিয়া জমিদার বাড়ী আসিয়া ডাকিলেন "সতীশ"। সতীশ স্মিতমুখে উঠিয়া ঠাকুর্দ্দাকে আদর করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর্দ্দা কি মনে করে?"

ঠাকুর্দ্দা তাঁহার গম্ভীর মুখখানি আরও গম্ভীর করিয়া একটু উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—"তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি ভায়া, তোমার কি তা ভাল লাগবে? তোমাদের একটু মন্দ দেখলেই যে এ বুড়োর প্রাণ কেঁদে উঠে ভাই! তোমার বাবা ত আমার একটা কথাও কোন দিন অমান্য করেন নি। জ্যাঠা মশায় বলে প্রাণ দিতেন। তুমি তাঁরই ছেলে কিনা, তাই তোমাকে বলতে আসা।" বৃদ্ধের চক্ষের জল অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল।

সতীশ বিনীত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে কি বলবেন ঠাকুর্দ্দা, আদেশ করুন।"

ঠাকুর্দ্দা সতীশের কথায় মনে মনে একটু খুসী হইলেন। ছেলেটি কলেজে পড়িয়া উচ্ছন্নে গেলেও কথাগুলি বেশ মিষ্ট। ঠাকুর্দ্দা একটু কাসিয়া, চাদরের প্রান্তে চক্ষু দুইটি মার্জ্জনা করিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, "তোমাদের একটু ক্ষতিও আমার সহ্য হয় না। গাঁয়ের মধ্যে শুনছি, তুমি নাকি প্রজাদের কাছ থেকে এক বৎসরের খাজনা নেবে না, এটা কি ভাল কায ভায়া? বসে খেলে রাজার রাজ্য ফুরিয়ে যায়, তো জমিদারী।"

সতীশ হাসি মুখে কহিল, "হাঁ, ঠাকুর্দ্দা ঠিক কথাই শুনেছেন। এবার দেশে যে আকাল হ'য়েছে, গরীব-দের এতে পেটে ভাত জোটানই কঠিন, জমিদারকে খাজনা দেবে কোথা থেকে! আমি আমাদের সব প্রজাকেই বলে দিয়েছি এ আকালের বছর তা'দের খাজনা দিতে হবে না।"

ঠাকুর্দ্দা তাড়াতাড়ি সতীশের কথায় বাধা দিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন, "তুমি যা ভাল বোঝ কর ভাই, আমার 'বাজে' বলেই বলতে এসেছিলাম, নইলে গাঁয়ের আর কারোও মাথাব্যাথা হয় না। আর একটা কথা, তুমি গাঁয়ের ছোট লোকদের সাথে অত

মেলামেশা কর এটা কি ভাল ভাই? তোমার বাপ ঠাকুরদাদাকে দেখে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত, আর তোমাকে দেখে কেউ গেরাজ্যিই করে না। সেদিন দেখি কি না লালু জেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হেঁসে হেঁসে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ছে। এতে কি ভাই সম্মান থাকে?"

সতীশ ঠাকুর্দ্দার যুক্তি তর্কের কথা শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিভরা মুখে সে কহিল, "এই কথা ঠাকুর্দ্দা? এতেও তা'দের একটুও দোষ নেই। আমি যে সকলকে আমার সাথে ঐরকম ব্যবহার করতেই বলে দিয়েছি। সম্মানের কথা বল্‌ছেন, ভয়ে সম্মান করার চেয়ে ভক্তিতে ভালবাসা আমার বেশী ভাললাগে।" বৃদ্ধের যত সদ্-বুদ্ধি ও সৎ-চেষ্টা মাঠে মারা গেল দেখিয়া তিনি বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ সব 'কলির ছেলে—যা'ক জাহান্নমে।"

২

আশ্বিনের স্নিগ্ধ প্রভাত। আগমনীর একটা আনন্দ ছবি প্রভাতের রৌদ্রে নদীর স্বচ্ছ জলে ও শ্যামল বৃক্ষ চূড়ায় ঝলমল করিতেছিল। গৃহ-পার্শ্বের ছোট শেফালী গাছটি ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। রায়দের ননীবালা, লাহিড়ীদের পটলী, মিত্রদের বাণী, ছোট ছোট ডালা লইয়া নিবিষ্ট মনে ফুল কুড়াইতেছিল। কাহার আগে কে বেশী ফুল কুড়াইতে পারে, বারবার পরস্পরের ডালার প্রতি চাহিয়া সেটুকুও লক্ষ্য রাখিতেছিল। সতীশ বারান্দার এক কোণে দাঁড়াইয়া আকাশে রৌদ্র ও মেঘের লুকোচুরি খেলার দিকে চাহিয়া ছিল এমন সময় তাহার ভাই যতীশ আসিয়া ডাকিল, "দাদা! মা, তোমাকে ডাকছেন।

ভিতরে গিয়া দেখিল, তাহার জননী সদ্যস্নাতা অন্নপূর্ণা সিক্ত কেশরাশি পিঠের উপর ফেলিয়া একখানি বৃহৎ পুষ্পপাত্রে পূজার ফুলগুলি সাজাইতেছেন। সতীশ বলিল, "মা, আমাকে তুমি ডাক্‌ছিলে?"

অন্নপূর্ণা স্নেহ-বিগলিত স্বরে কহিলেন, "ডেকেছিলাম, কাল সমস্ত রাত জেগে মড়া পুড়িয়ে তোর মুখখানি বড় শুকিয়ে গেছে, একটু ঘুমুগে।"

সতীশ হাসিমুখে উত্তর করিল, "এত বেলায় কি ঘুম হয় মা! কল্যাণীদের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে এসে, খেয়ে দেয়ে ঘুমুলেই হবে।"

অন্নপূর্ণা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমি ত আর এ বেলা কল্যাণীদের ওখানে যেতে পারছি না। বিকেল বেলা যাব। তুই শীগ্‌গির গিয়ে ওদের খবরটা নিয়ে আয়।"

অন্নপূর্ণা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মানুষের এমন দুরদৃষ্টও হয়, আহা! মোহিনীর কথা মনে করতেই পারছি নে।"

রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে সতীশ ভাবিতে লাগিল, এই মানব জীবনের স্থায়িত্ব! কাল যে ছিল, আজ সে নাই, তাহার অস্তিত্ব টুকুও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ত মানব জীবনের পরিণাম, ইহারই জন্য এত হিংসা এত দ্বেষ, এত অহঙ্কার! জলের বুদ্বুদ জলেই মিলাইয়া যায়, তবুও লোক বুঝিতে চাহে না। ভবনাথ ভট্টাচার্য্য কালও এইখানে তাঁহার কত যত্নের কত সাধের সংসারেই ছিলেন। কিন্তু আজ আর তাঁহার একটু চিহ্নও নাই, সমস্তই ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। শুধু তাঁহার অনাথা পত্নী, অরক্ষণীয়া কন্যা ও বালক পুত্রের বুকে যে চিতাগ্নি জ্বলিতেছে তাহার নির্ব্বাণ নাই।

কয়েকখানি খড়ো ঘর ঘেরা একটি পরিস্কার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সতীশ ডাকিল, "কাকীমা"!

সদ্যোবিধবা মোহিনী তখনও ধূলিশয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন। যে শোকের আগুনে আজ তাঁহার বক্ষ পুড়িতেছিল, তাহার দাহিকা শক্তি এখনও ম্লান হয় নাই। দরিদ্র-কুটীরের অর্দ্ধছিন্ন মলিন শয্যায় শুইয়া একটি তের চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে অনবরত

চক্ষু মুছিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গেই বসন্ত-গুটিকা। পদতলে সাত আট বছরের একটি নধর-কান্তি বালক কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বালকের নিদ্রিত বদনে অশ্রুরেখাগুলি এখনও শুকায় নাই। এ দৃশ্য দেখিয়া সতীশের আয়ত নয়ন দুইটি হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার নির্ম্মল কপোলে ঝরিয়া পড়িল। সতীশ অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল, "শিবু!"

ভূলুণ্ঠিতা রোরুদ্যমানা মোহিনী সতীশকে দেখিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—"তোর কাকাকে কোথায় রেখে এলি সতু, কাল রাতে যে নিয়ে গেলি আর ফিরিয়ে আন্‌লি না কেন? আমাদের কি দশা হবে সতু, আমরা কোথায় যাব বাবা!"

সতীশ মোহিনীকে একটি সান্ত্বনার কথাও কহিতে পারিল না। শুধু নীরবে আপনার অশ্রুসিক্ত নয়ন দু'টি মুছিতে লাগিল।

একটু পরে মোহিনী একটু শান্ত হইলে সতীশ ধীরে ধীরে কহিল, "কাকীমা, তোমরা এত অধীর হলে চলবে কি করে? তুমি অমন করে কাঁদলে কল্যাণীর অসুখ যে আরও বাড়বে। উঠে শিবুকে খেতে দাও, আর কল্যাণীর গায়ে ঔষধ দিয়ে দাও।"

সতীশের কথায় মোহিনী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কল্যাণীর গায়ে আর ঔষধ দিয়ে কি করব সতু! ও ভাল হ'লে শরীরের ও দুর্দ্দশা দেখে কে ওকে ঘরে নেবে বাবা!"

মোহিনীকে শান্ত করিয়া, কল্যাণীর ক্ষত শরীরে ঔষধ লেপন করিয়া সতীশ যখন গৃহে ফিরিতেছিল তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি।

৩

সুখে দুঃখে সকলেরই দিন কাটিয়া যায়; মোহিনীর দিনগুলিও কাটিতেছিল। মায়ের নীরব হৃদয়-ভারের সাথে সাথে কল্যাণীরও বয়স ক্রমে বাড়িয়াই উঠিতেছিল। কন্যার দিকে দৃষ্টি পড়িলেই মোহিনীর দুইটি চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়া যায়। সেই সুন্দর কমনীয় মুখখানির একি রূপান্তর হইয়াছে! নিদারুণ বসন্ত রোগ কল্যাণীর সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া আপনার রাক্ষসী ক্ষুধার চিহ্ন তাহার মুখখানিতে রাখিয়া গিয়াছে। এ যে বিধাতার অভিশাপ স্বরূপ, কে ইহাকে গ্রহণ করিবে? সহায়-সম্পদহীনা বিধবা ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছিলেন না। গ্রামবাসী কাহারও নিকট একবিন্দু সহানুভূতি পাইবার আশা নাই। অনাথা বিধবা দেখিয়া, গ্রামের দলপতিগণ কল্যাণীকে শীঘ্র বিবাহ না দিলে মোহিনীকে এক ঘরে করিবেন, রোষ-কষায়িত লোচনে একথা দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে জানাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। যে গৃহের অযাচিত করুণায় মোহিনীর তাপদগ্ধ হৃদয়খানিতে শান্তিবারি বর্ষিত হইত, আজ ছয়টি মাস হইল সে গৃহের দরজাও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্নপূর্ণা ও সতীশ তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

সে দিন প্রভাতে কল্যাণীর ঘুম ভাঙ্গিতে একটু দেরী হইয়াছিল। মোহিনী তাড়াতাড়ি করিয়া কল্যাণীকে সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখেন, আজ বেলা হইয়া যাওয়াতে গ্রামের রঙ্গিণীগণ ঘাটে বসিয়া পরস্পর নানারূপ কথোপকথন করিতেছে। ইহাদের তীব্র দৃষ্টি এবং কল্যাণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহাদের দুশ্চিন্তার আভাস পাইয়া মোহিনী স্বতঃই কল্যাণীকে ইহাদের চোখের আড়ালে রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। প্রতিদিন গ্রামখানি যখন সুপ্তিতে মগ্ন থাকিত, সেই সময় মা ও মেয়ে ঘাটের কায সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন। আজ বেলায় আসিয়া পড়িয়াছেন, এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। কল্যাণী ব্যথিত নতমুখে নদীর জলে নামিয়া যখন কাপড় কাচা আরম্ভ করিল, সেই সময় নদীর কূলে উপবিষ্টা রঙ্গিণীগণ এ উহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাস্য করিতেছিল। তরঙ্গিণী সম্প্রতি কলিকাতায় স্বামীর বাসা হইতে শুভাগমন করিয়াছে, সুতরাং গ্রামবাসিনীগণের মধ্যে তাহার গৌরবই বেশী হইবার কথা। তরঙ্গিণী মোহিনীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "কল্যাণীর বিয়ের কি হল ছোট খুড়ি?

পাত্র টাত্র ঠিক হয়েছে ?” নয়নতারা পিতলের কলসী বালুদ্বারা ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল, “হ্যাঁ লো হ্যাঁ, পাত্র রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুল চন্দন নিয়ে কাঁদচে। লোকের আর মরবার যায়গা নেই কিনা।” তরঙ্গিণী মনের মত উত্তর পাইয়া উৎফুল্লস্বরে বলিল, “সত্যি মেজ বৌ, কল্যাণীর যা রূপ হয়েছে, ওতে ঘাটের মড়াও বুঝি চোখ ফেরাবে না।”

এমন সময় ঘাটে একটী নবাগতার শুভাগমন দেখিয়া হাস্যবদনা বধূরা ঘোমটার কাপড় একটু টানিয়া সংযত হইয়া বসিল। নবাগতা বামা পিসির অসীম প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ হেন রমণীরত্নকে দেখিয়া মোহিনী মনে মনে শঙ্কিত হইলেন। বামা পিসি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কাংস্য বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন; “বলি ও ছোটবৌ, মেয়ে যে ধিঙ্গী হয়ে উঠেছে চোখে দেখতে পাওনা ? ঐ বুড়ো মেয়ে সামনে রেখে তোমার যে মুখে অন্নজল রোচে এই আমি ধন্যি বলি।” কম্পিত কণ্ঠে মোহিনী বলিল, “কি করব দিদি, আমার ত চেষ্টার কসুর নেই, কত সম্বন্ধ আসে কিন্তু একটাও হয় না।” মোহিনীর কথায় বাধা দিয়া তরঙ্গিণী বলিল, “হবে কি করে ছোট খুড়ি, তোমার কথা শুনে হাসি পায়, এমন রূপের ধুচুনী মেয়ে তোমার, এর জন্যে ত আর কার্ত্তিক আসতে পারে না।” বামা পিসি তাঁহার ঝিঙ্গার-বিচি বিনিন্দিত দন্তপাটী বিকশিত করিয়া কহিলেন, ‘ঠিক বলেছিস তরী, যেমন গেছো পেত্নী, তেমনি হনুমান জুটবে ছাড়া আর কি ? ছেলে আবার ওঁর পসন্দই হয় না।”

বামা পিসির কথার তরুণীদের মুখে হাস্য-গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল। মোহিনীর মুখখানি দেখিয়া তরঙ্গিণীর বোধ হয় একটু দয়া হইতেছিল।

৪

মোহিনীর দেবর কালীপদ বাবু আসিয়াছেন। বহুদিন পর দূর সম্পর্কীয় দেবরটাকে দেখিয়া মোহিনী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। এ তবুও ত নিজের লোক। মোহিনী তাহাকে সাদরে আসন বিছাইয়া বসাইয়া, একটী একটী করিয়া পুত্রকন্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, “ঠাকুরপো, তুমি যখন এসে পড়েছ, কল্যাণীর একটা গতি না করলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না ভাই। তুমি যদি আমাদের উপায় করে না দাও, তা’হলে আমাদের যে জাত যাবে ঠাকুর পো।”

দেবর কালীপদ ভ্রাতৃবধূকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, “বৌ, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি যখন এসে পড়েছি তখন আর তোমার ভয় নেই। কালীশর্ম্মা কার্য সাধন না করে যান না নিশ্চয় জেন। আমি বিয়ের সম্বন্ধ তোমাদের জানাতেই এসেছি, এই শ্রাবণ মাসে বিয়ের দিনও ঠিক করে এসেছি।”

দেবরের কথায় আশ্বস্ত হইয়া মোহিনী আশাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “কোথায় কার সঙ্গে ঠিক করেছ ঠাকুরপো ?”

দেবর যখন বিবাহের কথা এবং পাত্রের রূপ গুণ বয়সের ফর্দ্দ দাখিল করিলেন, তখন মোহিনী আর চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া বর্ষার প্লাবন বহিয়া গেল। পাত্র আর কেহই নহে, তাঁহার নিজেরই শ্বশুর মহাশয়। ষাইট বৎসর বয়সের বরের কিছুদিন হইল পত্নী বিয়োগ হইয়াছে, কাসরোগগ্রস্ত বৃদ্ধের একটি নিজের লোক না থাকায় ঠিক মত সেবা যত্ন হইতেছে না। তাই বৃদ্ধ অনুগ্রহ করিয়া কল্যাণীকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন।

মোহিনী দেবরের হাত দুটী ধরিয়া মিনতি পূর্ণ কণ্ঠে কহিল, “ঠাকুরপো তুমি এত কষ্টই যখন করলে, আর একটু চেষ্টা করে যদি অন্য কারু সঙ্গে”—

কালীপদ বিরক্তভাবে হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, “আমার যা চেষ্টা আমি খুব করেছি। এটা হাতছাড়া হলে তোমার মেয়ের যদি আর পাত্র জোটে, তখন আমার নাক কাণ কেটে কুকুরের পায়ে

ফেলে দিও। যে বিয়ের কথা শুনে তোমার কান্না পেল, সেই বিয়ে দেবার জন্যেই কত জনের বাপ আমার হাতে পায়ে ধরেছিল। আমি তাদের সরিয়ে দিয়ে তোমার জন্যেই ছুটে এলাম। এতেও তোমার এত আপত্তি! এ বিয়ে ত সুখের। ঘরে খাবার আছে, অন্নবস্ত্রের কষ্ট নেই। ঘরে গিয়ে একেবারে গিন্নী হওয়া। আমার স্ত্রী ছাড়া তাঁর আর ছেলেমেয়েও নেই। কোন গোলমাল নেই। খেয়ে দেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। তা যখন তোমার ভাল হ'ল না, আমি আর কি করব বল।"

কয়েকদিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মোহিনী এই বিবাহে আর অমত করিতে পারিলেন না। এ পাত্র হাতছাড়া হইলে সত্যই যদি আর পাত্র না পান, তখন কি করিবেন! শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিবাহের দিনও ধার্য্য হইয়া গেল।

কল্যাণীর বিবাহে মত দিয়া মোহিনী পুনর্ব্বার ধূলিশয্যায় লুটাইয়া স্বামীর জন্য আকুল রোদনে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে মোহিনী সতীশের মার পত্র পাইলেন, তাঁহারা শীঘ্রই দেশে ফিরিতেছেন। তিনি আরও খবর দিয়াছেন, যদি সমস্ত ঠিকঠাক হয় তবে শ্রাবণ মাসের মধ্যেই সতীশের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা। রমণী লাহিড়ীর মেয়ে কনকলতার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

আষাঢ় মাস। আকাশে নববর্ষার মেঘ সাজিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের নদীটী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, বর্ষা সমাগমে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে, খণ্ড খণ্ড কালো মেঘগুলি কি যেন একটা মহা আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অন্নপূর্ণা একখানি বেনারসী শাড়ী ও আরও কতকগুলি জিনিষ হাতে করিয়া ডাকিলেন, "কল্যাণি!

কার্য্যরতা কল্যাণী আনন্দ মুখরিতস্বরে বলিল, "ওমা, জ্যাঠাইমা এসেছেন।"

মোহিনী ভূলুণ্ঠিত হইয়া অন্নপূর্ণার পদধূলি মাথায় লইয়া বলিলেন, "দিদি, তুমি কাল রেতে এসেছ শুনে, আমিই আমিই আজ সকালবেলা যেতে চেয়েছিলাম, তুমি আবার কষ্ট করে এসেছ দিদি!"

অন্নপূর্ণা হাসিমুখে কহিলেন, "আমি তোমার বাড়ী এসেছি বলে তোমার রাগ হল নাকি মোহিনী!"

মোহিনী ব্যথিত স্বরে বলিল, "ছিঃ ওকথা বলো না দিদি। এ কুঁড়েয় তোমার পায়ের ধুলো—সে যে আমার সৌভাগ্য। ছেলেরা সব ভাল আছে দিদি?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "ভালই আছে। যতী আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল, সতু আরও ক'দিন পর আসবে।"

তীর্থের অনেক গল্প করিয়া, কল্যাণীর বিবাহের বিবরণ শুনিয়া, বাড়ী গিয়া অন্নপূর্ণা বিষণ্ণ হৃদয়ে কল্যাণীর ভবিষ্যৎ-জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই মোহিনীর বর্ষাসিক্ত প্রাঙ্গণ হইতে ডাক আসিল—"কাকীমা!"

মোহিনী বাহিরে আসিয়া স্নেহ-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "সতু কবে এলি? ভাল আছিস তো! ও কল্যাণী, তোর সতুদাদা এসেছে, বারান্দায় মাদুরটা পেতে দিয়ে যা ত।"

সতীশ মোহিনীকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই দেখিল, কল্যাণী মাদুর লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকক্ষণ সে মোহিনীর নিকট বসিয়া, কত দেশের কত গল্প করিতেছিল; কি একটা কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা! কল্যাণীর নাকি বিয়ে ঠিক করেছ? আমি বাড়ী এসে মার কাছে সব শুনেছি।"

সতীশের কথায় মোহিনীর নয়ন দুটী হইতে বড় যাতনার অশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। চক্ষু দুইটি মুছিয়া ভগ্নস্বরে মোহিনী কহিলেন, "কি করব বাবা, আর কতদিনই বা দেরী করা যায়!"

সতীশ কোন কথাই কহিল না। নীরবে নতমুখে বর্ষাসিক্ত মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। মোহিনী অনিমেষ লোচনে সতীশের নীরব সমবেদনাপূর্ণ তরুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া, নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন। হায়, সংসারের তাপদগ্ধা দুঃখিনী মোহিনী, তোমার এ দুরাশা কেন?

৬

গভীর রাত্রে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সতীশের ঘুম আসিতেছিল না। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বারিধারা ঝরিতেছিল। গৃহ-পার্শ্বস্থ বকুল গাছ হইতে বকুল ফুলের ভিজা গন্ধখানি গায়ে মাখিয়া সতীশের মাথার নিকটে মুক্ত গবাক্ষ পথে চঞ্চল বাতাস ছুটাছুটি করিতেছিল। সতীশ ভাবিতেছিল কল্যাণীর কথা। আহা, পিতৃহীনা কল্যাণী! কাহার অভিশাপে তাহার সমস্ত জীবনটি ব্যর্থ হইতেছে! তাহার অপরাধ কি?

হঠাৎ সতীশের মনে হইল—কল্যাণীর স্নিগ্ধ নয়নের সরল দৃষ্টি। কে বলে কল্যাণী দেখিতে একটুও ভাল নহে! পল্লীর নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এক দরিদ্রের গৃহস্থ প্রাঙ্গণে স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে আজ যে মুর্ত্তিতে সতীশ কল্যাণীকে দেখিয়া আসিয়াছে, সে যে স্নেহ-বিগলিত গৃহলক্ষ্মীর মত। সে বৃহৎ বিপদ-ভরা কালো নয়ন দু'টির স্নিগ্ধ দৃষ্টি যে প্রভাতের শুকতারার মত, তেমনি স্বচ্ছ তেমনি উজ্জ্বল। সে দৃষ্টি যেন কোথায় কোন্ সুনীল দেশের কি রহস্যে মগ্ন হইয়া আছে। সতীশের মনে হইতেছিল, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন কল্যাণীর সেই নীল নয়ন দু'টার ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে। সে মনে মনে বলিল, হায় তোমার ও বিষাদ পাণ্ডুর বদনে হাস্যচ্ছটা ইহ জীবনের মত নিবিয়া গিয়াছে! ও ব্যর্থ জীবনের বোঝা কেমন করিয়া বহিবে কল্যাণী? ইহার কি প্রতিকার নাই! সতীশের অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন স্থির কণ্ঠে কহিল,—প্রতিকার আছে বই কি? তোমার হাতেই প্রতিকার আছে।

ভোরের বেলা তন্দ্রাঘোরে সতীশ স্বপ্ন দেখিল, বিবাহের বেশে সজ্জিতা কল্যাণী আসিয়া যেন তাহার সেই বৃহৎ চক্ষু দুইটী সতীশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিতেছে, 'দ্বার খুলিয়া দাও, আমি আসিয়াছি।'

সন্ধ্যা। আজ আর আকাশে মেঘের রেখাও নাই। শুক্লপক্ষের দশমীর চাঁদ সুনীল আকাশে রূপার থালীর মত ঝক্‌মক্ করিতেছিল। সতীশ ডাকিল, "মা!"

অন্নপূর্ণা তাঁহার শয়ন গৃহে কি একটা কায হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আয় সতু, এইখানে বসবি।"

সতীশ অন্নপূর্ণার অধিকৃত মাতরের এক প্রান্তে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মা সতীশের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এমন মুখ ত ছেলের এক দিনও দেখেন নাই। প্রভাত-পদ্মের মত তাহার প্রফুল্ল মুখখানিতে যে হাসির দীপ্তিটুকু লাগিয়াই থাকে। দয়ার্দ্র সুকোমল হৃদয়খানি পর দুঃখে আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু সে তো এমন নয়। সে যে প্রভাত-পদ্মের উপর শিশির বিন্দুর মত ঝলমল করে।

পুত্রের বিষাদ-কাতর মুখখানি দেখিয়া অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি পীড়া অনুভব করিতেছিল। তিনি শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, "তোর ত অসুখ হয় নি সতু, মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন?"

সতীশ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "না অসুখ হয় নি, আমার একটা কথা শুনবে বল।"

অন্নপূর্ণা স্নেহ-বিগলিত স্বরে কহিলেন, "কবে তোর কোন কথা না শুনেছি সতীশ?"

"আচ্ছা মা, রমণী বাবুর মেয়েটীকে তোমার কি খুব পসন্দ হয়েছে?"

অন্নপূর্ণা সোৎসাহে কহিলেন, "কনকের কথা বলছিস্? কনককে আমার বড় পছন্দ হ'য়েছে। আমার কথা বলি কেন, কনককে যে দেখেছে তারই

পছন্দ হ'য়েছে। সেদিন যতী দেখে এসে বল্লে, অমন সুন্দর মেয়ে সহজে মেলে না।"

অন্নপূর্ণার কথা শুনিয়া সতীশের বদ্ধ ওষ্ঠে একটু মৃদু হাস্যরেখা খেলিয়া গেল। সে একটু চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আচ্ছা মা, যতীর সঙ্গেই তার বিয়ে দাও না কেন ?"

বিস্মিত নয়ন দুইটী সতীশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া মা কহিলেন, "সতীশ তোর কি একটুকুও বুদ্ধি নেই, পাগলের মত কি যে বলিস তার ঠিক নেই !"

সতীশ স্থির গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "স'ত্যি মা, আমি এ বিয়ে কিছুতেই করতে পারব না।"

পুত্রের ব্যাকুল কণ্ঠের কথা কয়েকটী শুনিয়া অন্নপূর্ণার সুকোমল হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, সতীশ এ বিবাহে কেন অনিচ্ছুক তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি তাহাকে ভৎ'সনা করিয়াছেন। যে সতীশ মায়ের একটু কষ্টও সহিতে পারে না, ভ্রমেও মায়ের অপ্রিয় কাযে হস্তক্ষেপ করে না, এ ত সেই সতীশ। সে অনেকটা একগুঁয়ে খামখেয়ালী বটে, কিন্তু সে খেয়াল যে কত উচ্চ, কত মহান্, অন্নপূর্ণা তাহা ভাল করিয়াই জানেন। স্নেহে করুণায় তাঁহার হৃদয়খানি দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "সতীশ কেন তুই এ বিয়ে করতে চাচ্ছিস না? এ মেয়ে না হয় যতীর সঙ্গেই বিয়ে দেব, কিন্তু তোর বিয়ে না হ'লে কি যতীর বিয়ে হ'তে পারে ?"

সতীশ নতমুখে উত্তর করিল, "আমি একেবারে বিবাহ করব না এ কথা ত তোমায় বলিনি মা।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তা'হলে এ তারিখে আর হবে কি করে? নূতন করে মেয়ে খুঁজতে হ'বে, তা'দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে হ'বে !"

মার কথায় বাধা দিয়া সতীশ কহিল, "মেয়ে আর খুঁজতে হবে না মা, আর কথাবার্ত্তার কথা বলছ, তারও দরকার হ'বে না। তুমি যা করবে তাই হবে, মা।"

অন্নপূর্ণা মনে মনে কৌতূহলী হইতেছিলেন। সতীশ কার কথা বলিতে চায়, কৈ কোনও পরিচিত মেয়ের কথা ত অন্নপূর্ণার স্মরণ হয় না। তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "কার কথা বলছিস সতু ?"

সতীশ কথা কহে না।

মা'র পুনঃ পুনঃ আহ্বানে, নত মস্তকে লজ্জিত কণ্ঠে সতীশ উত্তর করিল, "কল্যাণী"।

অন্নপূর্ণার হাস্য-বিকসিত মুখখানি নিমেষের জন্য মলিন হইয়া গেল। একটু চিন্তার পর তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "সে কেমন করে হবে সতীশ? রাস্তার লোকেও যে ওকে ঘরে নিতে চায় না।"

"রাস্তার লোকে যা না পারে, তা তুমি পার মা।"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন, "আমি পারি সতু কল্যাণীকে ঘরে আনতে। আমার একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু তাকে এ বাড়ীতে এনে, তার অনাদর অবহেলা আমি কিছুতেই সইতে পার্‌ব না সতীশ!"

"মা, তুমি যদি তাকে আদর করে স্নেহের চোখে দেখ, তা'হলে এ সংসারে এমন কেউ নেই যে তাকে অনাদর করবে।"

অন্নপূর্ণা ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আমার কথা বলিস কেন সতু, আমি কল্যাণীকে কি চোখে দেখব সে আমিই জানি। আমি তোর কথা বলছি। তুই ছেলেমানুষ; সংসারের কতটুকুই বা বুঝতে পারিস? আজ ঝোঁকের মাথায় যা করছিস, চিরদিন কি তোর মন এমনিই থাকবে! হয়তো তোর জীবনে কল্যাণী একদিন বিষময় হয়ে উঠবে। তুই কি চিরদিন তাকে সমানভাবে ভালবেসে আদর যত্নে রাখ্‌তে পারবি?"

সহসা সতীশ বালকের মত মায়ের দুইখানি পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "মা, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সবই পার্‌ব।"

অন্নপূর্ণা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, ভূলুণ্ঠিত পুত্রের মুখখানি আপনার উদ্বেগপূর্ণ বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

পল্লীর আহ্বান

এবার ফিরাও আঁখি!
ওরে ও ভ্রান্ত, অন্ধ-তিয়াস
এখনো মিটিল্ নাকি?
ওরে বনপাখী, তেয়াগি কানন
হেমপিঞ্জর করেছ বরণ,
আপনি চরণে আঁটিয়া শিকলি
আপনা দিয়েছ ফাঁকি!

আলেয়ার আলো চাহি'
কণ্টক-বন করি বিচরণ,
মরু-প্রান্তর বাহি',
হারালে নিখিল বিত্ত তোমার
চির জীবনের চির সাধনার,
হায় পথহারা নিঃস্ব ভিখারী
আজি আর কিছু নাহি!

এবার তো হল শেষ,
মিথ্যার লাগি' বৃথা হানাহানি
বিফল দ্বন্দ্ব-দ্বেষ;
যুগ যুগ ধরি যত আয়োজন,
সুখের ছলনে দুঃখ বরণ,
স্বার্থের পায়ে অর্ঘ্য রচন,—
ধ্বংসের অবশেষ!

ওরে পিঞ্জরবাসি!
ওরে নগরের বন্দীশালার
আনন্দ অভিলাষি!
পাষাণের বুকে কোমল সরস
কেমনে লভিবি স্নিগ্ধ পরশ?
বিমাতার ঘরে কে পিয়াবে হায়
মায়ের স্তন্যরাশি?

কোথা মানুষের প্রাণ?
কঠিন পুঞ্জ-পাষাণের তলে
নির্ঝর কলগান?
ধূম্র ধূলির আঁধার-কারায়
আলোকের হাসি পলকে হারায়,
দ্বন্দ্ব-মুখর পিঞ্জরে কোথা
বিহগের কলতান?

ফিরে আয় ফিরে আয়!
ছায়া-সুশীতল স্নিগ্ধ শ্যামল
পল্লীর বনছায়!
কল্লোলময়ী তটিনীর তীর
বিহঙ্গ-গীতি-মুখর সমীর,
শস্যক্ষেত্র-শ্যাম-সম্পদে,
অবারিত নীলিমায়!

ওরে তৃষাতুর প্রাণ!
ফিরে আয় আজি মাতৃ-গেহের
সুধায় করিতে স্নান!
দেবমন্দিরে, তুলসীতলায়,
আম্রকাননে আয় ফিরে আয়,
জননীর স্নেহে, প্রেয়সীর প্রেমে,
ত্যজি লাজ অভিমান!

ফিরাও ফিরাও আঁখি,
আকাশে বাতাসে বাজে আহ্বান
ওগো পিঞ্জর-পাখী!
আজো পল্লীর নিচোলাঞ্চল
চির-সুগভীর স্নেহ-চঞ্চল,
এস স্তন-সুধা-বঞ্চিত শিশু
যুগ যুগ ভুলে থাকি'!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

নয়নমণি

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাস, বেলা ৯টা বাজিয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে। কাশী, বাঙ্গালী টোলায় একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গৃহে দ্বিতলের রন্ধনশালায় ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা একটি মেয়ে, বঁটি পাতিয়া বসিয়া কুটনা কুটিতেছে। মেয়েটি সুন্দরী। চোখ দু'টি বেশ ডাগর, কিন্তু যেন বড় বিষণ্ণ। পরিধানে একখানি চৌড়া লালপাড় শাড়ী। স্নান হইয়া গিয়াছে, আর্দ্র কেশগুলির অধিকাংশ পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া রহিয়াছে, দুই চারি গুচ্ছ স্কন্ধ বেড়িয়া সম্মুখে আসিয়া বক্ষের নিকট দুলিতেছে। দুই হাতে দুইগাছি ডায়মণ কাটা সোণার বালা আর কতকগুলি রেশম চুড়ি, বাঁ হাতে একটি সোণা বাঁধানো "সাবিত্রী লোহা", উপর হাতে দুই গাছি আঙুরপাতা প্যাটার্ণ কুকুরমুখো তাগা, গলায় একগাছি ছোট চেন-হার।

মেয়েটি কুটনা কুটিতেছে—অদূরে চুল্লীর উপর পিতলের কড়াইয়ে সেরখানেক দুধ চড়ানো আছে। কয়লাগুলি এখনও ভাল করিয়া ধরিয়া উঠে নাই, অল্প অল্প ধূম বাহির হইতেছে। একে মেঘ করিয়া গুমট হইয়া রহিয়াছে, ছোট ঘরখানিতে উনান-ভরা কয়লা পুড়িতেছে—মেয়েটির কপালে ক্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। দ্বারের বাহিরে একটি শাদা বিড়াল চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছে। মেয়েটি কুটনা কুটিতে কুটিতে এক একবার তাহার সেই বিষণ্ণ আয়ত চক্ষু দুটি তুলিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে বিপরীত দিকের বারান্দা পানে চাহিতেছে; তথায় কম্বলের উপর তাহার বৃদ্ধ পিতা বসিয়া আপন মনে হরিনামের মালা ফিরাইতেছেন।

আলু বেগুন উচ্ছে ও কাঁচকলাগুলি কোটা হইয়া গেল। মেয়েটি তখন উঠিয়া, একটি ভাঙ্গা পাখা লইয়া চুল্লীর মুখে মৃদু মৃদু বাতাস দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কয়লাগুলি গণ্‌গণ্‌ করিয়া ধরিয়া উঠিল। এমন সময়ে বারান্দা হইতে বৃদ্ধ হাঁকিলেন—"নয়ন।"

মেয়েটির নাম নয়নমণি। "কেন বাবা?"—বলিয়া সে দ্বারের বাহিরে গেল।

বৃদ্ধ বলিলেন—"একটু তামাক সেজে দিতে পার মা?"

"দিই বাবা"—বলিয়া নয়নমণি ক্ষিপ্রপদে অপর বারান্দায় পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তথা হইতে আবশ্যক উপকরণগুলি লইয়া আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল। দুধটুকু ইতিমধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নয়ন তখন তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিয়া, হাতা দিয়া দুধ নাড়িতে লাগিল।

ওদিকে তামাকু-পিয়াসী বৃদ্ধ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। হাঁকিলেন—"তামাক সাজা হল?"

"যাই বাবা"—বলিয়া নয়নমণি কলিকাটি উঠাইয়া লইয়া ফুঁ দিতে দিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। হুঁকাটি দ্বারের কোণে দাঁড় করানো ছিল, তাহাতে কলিকাটি বসাইয়া পিতার হস্তে দিল।

বৃদ্ধ ধূমপান করিতে লাগিলেন। নয়ন জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার হরিনাম হয়েছে বাবা?"

"হয়েছে।"

"দুধও জ্বাল হয়েছে। নিয়ে আসি?"

"দাঁড়াও—তামাকটা আগে খেয়ে নিই।"

"আচ্ছা, আমি ততক্ষণ দুধটুকু জুড়োতে দিইগে বাবা।"—বলিয়া নয়ন রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ বসিয়া আরামে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

এই বৃদ্ধের নাম হরিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, নিবাস যশোহর জিলার দুর্জাপুর গ্রামে। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট

আপিসে চাকরি করিতেন, দশ বৎসর পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ইঁহার পুত্র নাই; তিন কন্যা—রতনমণি, গৌরমণি, এবং এই নয়নমণি। বড় এবং মেঝ মেয়ে বিধবা—ইঁহার নিকটেই থাকে। ছোট মেয়ে নয়নমণি সধবা হইয়াও বিধবা; বিবাহ হইবার একবৎসর পরে ইহার স্বামী কোথায় পলাইয়া গিয়াছে; অদ্যাবধি তাহার কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। সে আজ চারি বৎসরের কথা। ইহার কয়েকমাস পরে, বুড়ার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। এই সকল ব্যাপারে মনের দুঃখে হরিকিঙ্কর দেশের বাড়ী বাগান জমিজমা বিক্রয় করিয়া, কাশীতে এই বাড়ীখানি কিনিয়া, মেয়ে তিনটিকে লইয়া আজ তিন বৎসর কাশীবাস করিতেছেন।

নয়নমণি কড়াই নামাইয়া, সেই ফুটন্ত দুধ হাতায় করিয়া একটি বড় পাথরের খোরায় ঢালিতে লাগিল। পোয়া দেড়েক দুধ লইয়া, কড়াইটি সরাইয়া, তারের 'ঢাকা' চাপা দিয়া একটি কোণে রাখিল। খোরাটি অল্প অল্প হেলাইয়া, পাখার বাতাস করিয়া, দুধটুকু জুড়াইল। পরে একটি কাঁসার বাটিতে সেটুকু ঢালিয়া পিতার নিকট লইয়া গেল।

বৃদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক'টা বাজল?"

নয়ন একটু সরিয়া, পিতার শয়ন ঘরের দেওয়ালে সংলগ্ন ক্লকটির পানে চাহিয়া বলিল—"সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। প্রায় পৌনে দশটা।"

"উঃ—এত বেলা হয়েছে! আকাশটা মেঘলা করে রয়েছে কিনা, তাই বেলা বোঝা যাচ্ছে না।"—বলিয়া তিনি দুগ্ধটুকু নিঃশেষিত করিলেন।

নয়নমনি জল লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার হাত মুখ ধোয়াইয়া তাঁহাকে গামছা দিল।

হাত মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা, এত বেলা হয়ে গেছে, দশটা বাজে, রতনমণি গৌরমণি এখনও স্নান করে ফিরলো না কেন? এত দেরী ত কোনও দিন হয় না।"

"ফিরবে এখনি, বোধ হয় কোথাও ঠাকুর-টাকুর দেখতে গেছে"—বলিয়া নয়নমণি পিতার জন্য পান আনিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দশাশ্বমেধ ঘাটে সহস্র সহস্র নরনারী—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টি, মাড়োয়ারী—স্নান করিতেছে। বৃদ্ধগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে করিতে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া, শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া, প্রস্তর সোপানে আহ্নিক করিতে বসিতেছেন। অনেকে ঘাটওয়ালাদের নিকট গিয়া দুই এক পয়সা দিয়া, কপালে ফোঁটা তিলক লইয়া প্রস্থান করিতেছে।

রতনমণি ও গৌরমণি স্নানান্তে ঘাট হইতে উঠিল। রতনের বয়স চল্লিশ হইয়াছে, গৌরমণি যুবতী, উভয়ের বিধবা বেশ। রতনের শ্যামবর্ণ দেহখানির মধ্যে স্বাস্থ্য যেন টলমল করিতেছে, মাথার চুলগুলি পুরুষ মানুষের মত ছোট, ভ্রূযুগল-মধ্যে ক্ষুদ্র একটি উল্কির চিহ্ন, হাতে ভিজা গামছা। গৌরমণি ক্ষীণাঙ্গী, রঙটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর, কক্ষে গঙ্গাজলপূর্ণ ছোট একটি পিতলের কলসী।

দশাশ্বমেধের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া, দুটি বোনে কালীতলার দিকে চলিল। সেখানে তরকারীর বাজার বসিয়াছে। চলিতে চলিতে রতনমণি কোনও দোকান হইতে দুই ফালি বিলাতী কুমড়া, কোনও দোকান হইতে শাক, বেগুন প্রভৃতি কিনিয়া গামছাখানিতে বাঁধিয়া লইতে লাগিল। বাজার করা শেষ হইলে, দুই বোনে বাঙ্গালীটোলার একটি গলি ধরিয়া চলিল।

কিছুক্ষণ চলিয়া সহসা উভয়ে পথের মাঝে দাঁড়াইল। সম্মুখে অদূরে একটি শিবমন্দির, তাহারই উচ্চ বারান্দায় ভস্মমাখা দেহ এক সন্ন্যাসী বসিয়া; নিম্নে পথের উপর, গলাখোলা কোট গায়ে এক বাঙ্গালী যুবক দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছে। দুই ভগিনী সেই

যুবকটির পানে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

রতনমণি মৃদুস্বরে বলিল—"হাঁলা, ও কে বল্ দেখি?"

গৌরমণি লোকটিকে আর এক নজর দেখিয়া উত্তর করিল—"আমাদের বিনোদ না?"

রতন বলিল—"সেই ত! আমি ত দেখেই চিনেছি। আচ্ছা চল্ দিকিন, একটু এগিয়ে ভাল করে' দেখি।"

গৌরমণি বলিল—"নিশ্চয়ই সে-ই, দিদি। দেখছ না, ঠিক সেই রকম মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে, হাত নেড়ে নেড়ে কথা কচ্চে—ও বিনোদই বটে।"

রতনমণি বলিল—"আচ্ছা চল্না,—একটু কাছে যাই। ওলো দেখ্ দেখ্ আমাদের পানে তাকাচ্চে, মুখ নীচু কল্লে। আমাদের চিনেছে বোধ হয়।"—বলিয়া রতনমণি দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যুবক তাঁহাকে প্রণামান্তর বিদায় লইয়া,হন্‌হন্ করিয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। রতনমণি চীৎকার করিয়া উঠিল—"বিনোদ—ও বিনোদ—যাও কোথা—বলি শোন শোন।"

যুবক তথাপি থামিল না। রতনমণি তখন প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল—"ওগো—ও কোট গায়ে বাবুটি—দাঁড়াও—পালাও কোথা—কনেষ্টবোল—এ কনেষ্টবোল!"

বলা বাহুল্য,সে গলির ত্রিসীমানায় কোনও কনষ্টেবল্ ছিল না। যুবক কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিল; দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় কি আপনি ডাকছেন?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ"—বলিয়া হাঁফাইতে হাঁপাইতে রতনমণি কাছে আসিয়া পৌঁছিল। পথচারী দুই-একজন নরনারীও ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দাঁড়াইল। যুবকের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রতনমণি জিজ্ঞাসা করিল—"কবে এলে বিনোদ?"

যুবক বলিল—"আমি ত এইখানেই থাকি।"

"কোথায় থাক?"

"বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে। কিন্তু এ সকল কথা আপনি আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমি ত আপনাকে চিনিনে। তা ছাড়া, আমার নামও বিনোদ নয়। আমার নাম সুধীর—শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু।"

রতনমণি বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার আর চালাকি করতে হবে না। তুমি বিনোদ নও! তুমি সুধীরচন্দ্র বসু—কায়েত! তুমি কায়েত যদি, তবে কোটের গলার ফাঁক দিয়ে ঐ পৈতে দেখা যাচ্চে কেন?"—পথচারী লোকেরা নিকটস্থ হইয়া, সত্যই লোকটির গলায় পৈতা আছে কি না দেখিবার জন্য গলা বাড়াইল।

যুবক সহসা কোটের ফাঁকে হাতে দিয়া পৈতাটি ভিতরে ঢুকাইয়া বলিল—"আজ্ঞে, আজকাল কায়েতরাও পৈতে নিচ্চে যে। কায়েতরা আসলে ক্ষত্রিয় কিনা! আপনার ভুল হয়েছে, আমার নাম বিনোদ নয়। একটু তাড়াতাড়ি আছে—আচ্ছা এখন তবে চল্লাম।"—বলিয়া যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া পদবিক্ষেপ আরম্ভ করিল।

রতন এক লম্ফে অগ্রসর হইয়া, যুবকের কোটের পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া বলিল—"খবর্দার—এখান থেকে এক পা নড়েছ কি চেঁচামেচি করে' লোক জড় করব।"—পাঁচ সাতজন পথচারী লোক তৎপূর্ব্বেই সেখানে জমিয়া গিয়াছে।

যুবক সেই লোকগুলির পানে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া, একটু রুষ্টস্বরে বলিল—"আপনি দেখছি বিষম ভুলে পড়ে' গেছেন। চেঁচিয়ে লোক জড় করে' আর কেলেঙ্কারী করবেন না, কি চান আপনি বলুন। আমি কিন্তু আপনাকে চিনিও না—দোহাই আপনার।"

রতনমণি বলিল—"তা চিন্‌বে কেন? নিজের স্ত্রীর বড় বোন্‌কে চিন্‌বে কেন? এই তোমার ছোট শালী গৌরমণি—একে চেন, না তাও চেন না? চেনাচেনি পরেই হবে না হয়, এখন বাড়ী এস দিকিন। বাবা আজ তিন বচ্ছর হল কাশীবাস করেছেন। নদীয়া

ছত্রে আমরা থাকি। 'আমরা তিন বোনেই এখানে আছি। বিয়ে করে' তার পরের বছরেই যে বাড়ী-থেকে পালালে, যাকে বিয়ে করলে তার দশাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছিলে কি?"

জনতার মধ্য হইতে কেহ বলিল—"আঁ! ভারি অন্যায় ত!"—কেহ বলিল, "বউ বোধ হয় পছন্দ হয় নি, তাই পালিয়েছে।"

যুবক গম্ভীরভাবে বলিল—"আপনি বল্‌ছেন আমি আপনার ছোট বোনকে বিয়ে করেছি?"

"শুধু আমি বলব কেন? গাঁ-সুদ্ধ লোক সবাই বলবে যে তুমি আমার বোন নয়নমণিকে আজ পাঁচবছর হল বিয়ে করেছ।"

যুবক ক্ষণমাত্র কাল কি ভাবিল। তাহার পর, মুখের বিরক্তভাব পরিবর্ত্তন করিয়া, জনতার দিকে, সহাস নয়নে একবার নেত্রপাত করিয়া, ব্যঙ্গস্বরে বলিতে লাগিল—"ওঃ—তা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল আমি অবিবাহিত। নামটি কি বল্লেন—নয়নমণি?—নামটি মিষ্টি বটে। তা, আমাকে ভগিনীপতি বলেই যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, আমায় নিয়ে চলুন না, বেশ ত! নয়নমণি দেখতে কেমন বলুন দেখি—বয়সই বা কত?"—বলিয়া যুবক ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাস্য করিয়া রতনমণির দিকে চাহিল। জনতার মধ্য হইতেও হাসি টিটকারী শুনা গেল।

রতনমণি রাগে ফুলিতেছিল, তাহার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছিল, প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না। অবশেষে তীব্রস্বরে বলিল—"তোমার ও-সব নেকামি রাখ বলছি! তুমি কি ভেবেছ ঐরকম ইয়ার্কির কথা বল্লেই আমি ভয় পেয়ে যাব, মনে করব কি জানি তা হলে এ বোধ হয় আমাদের সে বিনোদ নয়! (যুবকের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া) রত্নী-বামনীর চোখে ধুলো দিতে পারে এমন মানুষ, এখনও জন্মায়নি, বুঝলে?"

জনতার মধ্য হইতে একজন চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—"হাঁহাঁ—শক্ত ঘানি!"

যেদিক হইতে এই শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে একবার সরোষ কটাক্ষ করিয়া রতনমণি যুবককে বলিল—"আচ্ছা তুমি যদি বিনোদ নও—তবে হাতটি একবার পাত দিকিন।"

যুবক বলিল—"কেন, হাত পাতব কেন? কিছু দেবেন না কি?"

"হাাঁ, দেবো। হাত পাত। ভাবছ কি? কোনও ভয় নেই,হাতটি পাত না। পাত পাত!"—জনতার মধ্যে ঔৎসুক্যবশতঃ একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

যুবক হাত পাতিল। রতন, ভগিনীর কলসী হইতে এক অঞ্জলি গঙ্গাজল লইয়া যুবকের হাতে দিয়া বলিল—"আচ্ছা, এইবার বল আমার নাম সুধীরচন্দ্র বসু, আমার নাম বিনোদ চাটুয্যে নয়।"

যুবক জল ফেলিয়া দিয়া, কোঁচার খুটে হাতটি মুছিতে মুছিতে রুষ্টভাবে বলিল—"আপনার ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করুন, না ইচ্ছে হয় না করুন। কাশীতে গঙ্গা-জল হাতে নিয়ে আমি দিব্যি করতে যাব কেন?"

রতন বলিল—"হেঁহেঁ—এখন পথে এস ত চাঁদ! যা হোক, ধর্ম্মভয়টা এখনও আছে দেখছি। আর কথা বাড়াচ্চ কেন, চল বাড়ী চল। সোমত্ত বউ তোমার, তাকে তুমি কি দোষে পরিত্যাগ করলে বল দেখি! দিনে রেতে চোখে তার জল শুকোয় না। সোণার অঙ্গখানি কালি হয়ে গেছে! বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখে তাকে একবার দেখবে চল।"

যুবক বলিল—"দেখুন, এখন ত আমার সময় নেই। আপনারা এখন বাড়ী যান, ঠিকানাটা বরং বলে দিয়ে যান, আমি ওবেলা আসবো এখন। নদে' ছত্তর বল্লেন না? কত নম্বর?"

রতন ভেঙ্গাইয়া বলিল—"আর নম্বরে কায নেই! নম্বর জেনে নিয়ে ও-বেলা উনি আসবেন! আমার কচি খুকীটি পেয়েছ কি না!"

জনতা হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"ছেড় না বামুনগিন্নী, মৎলব ভাল নয়, ফাঁকি দেবে।"—একজন বখাটে যুবক গাহিয়া উঠিল—

—"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এল না—আ।"

ইহাদের প্রতি সরোষ কটাক্ষপাত করিয়া, যুবকের দিকে ফিরিয়া রতন স্বাভাবিক স্বরে বলিল—"দেখ, ও সব চালাকি রাখ। ভাল চাও ত আমার সঙ্গে বাড়ী এস। নইলে আমি পুলিস ডাকবো, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি হাঁ!"

যুবক বলিল—"আ। এখন কিছুতেই আপনার সঙ্গে যেতে পারব না—আপনি পুলিসই ডাকুন আর যাই করুন।"—বলিয়া সে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদিও সেই ছোট্ট গলি, তথাপি আগে পিছে আশে পাশে এতক্ষণে অন্ততঃ ১৫।২০ জন লোক জমা হইয়া পড়িয়াছিল। একজন বলিয়া উঠিল—"আহা যানই না মশাই—মেয়ে মানুষটি কি রকম দেখেই আসুন না। হায় হায়, আমাদের কেউ ডাকে না রে!"

রতন দেখিল, এখানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া কথা কাটাকাটি করিয়া আর কোনও লাভ নাই—জনতা বাড়িতেছে এবং তাহারা অপমানসূচক মন্তব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধীরভাবে যুবকের পানে চাহিয়া বলিল—"কোথা আছ বল্লে?"

"অগস্ত্যকুণ্ডে—বিশ্বনাথ মিশনের সেবাশ্রমে। আপনি বিশ্বাস করুন, ও-বেলা আমি আসবো। এখন আমায় রেহাই দিন—দোহাই আপনার। দেখছেন ত!"—বলিয়া যুবক জনতার দিকে নেত্রপাত করিল।

রতন বলিল—"নিশ্চয় আসবে? আমরা থাকি ডি-২৬ নম্বর নদীয়া ছত্রে। তিন সত্যি কর যে আসবে।"

যুবক বলিল—"তিন সত্যি করছি—আসবো, আসবো, আসবো। ও-বেলা ৫টার সময় নদে' ছত্তরে আপনার ডি-২৬ নম্বর বাড়ীতে আসবো। আপনাদের বাড়ীতে অন্য লোকেরাও আছেন ত? তাঁরা বোধ হয় আমায় দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি আপনাদের বিনোদ নই। তখন আমায় রেহাই দেবেন ত?"

রতন বলিল—"পরের কথা পরে হবে। আমি বিশ্বনাথ সেবাশ্রম চিনি। যদি না আস, পাঁচটার পর আমি কিন্তু সেখানে গিয়ে তার হাঙ্গাম বাধিয়ে দেবো;—গলায় গামছা দিয়ে তোমায় হিড়হিড় করে' টেনে নিয়ে আসবো। রত্নী বাম্নী সোজা মেয়ে নয়!"

"আসবো আসবো। এখন বাড়ী যান।"—বলিয়া যুবক গমনোদ্যম করিল।

রতন বলিল—"আর একটা কথা। কোন্ দিকে মুখ করে রয়েছ বল দেখি?"

যুবক বলিল—"কেন? [illegible] দিক।"

"বাবা বিশ্বনাথের মন্দির এখান থেকে খাড়া দক্ষিণ। বাবার মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা আমার সমুখে তুমি তিন সত্যি করেছ—সেইটি মনে রেখ। আমি আর এ হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে তোমায় কি বল্‌বো এখন [illegible] জান আর তোমার ধর্ম্ম জানে!"—শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে রতনের গলার স্বর যেন ভারি হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল।

"ঠিক আসবো। ডি-২৬ নম্বর নদীয়া ছত্তর। প্রণাম।"—বলিয়া যুবক জনতা ভেদ করিয়া প্রস্থান করিল। দুই ভগিনীও বিষণ্ণ মনে গৃহাভিমুখে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কন্যাদ্বয়ের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর সন্দিগ্ধভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—"আস্‌তে ত বল্লে, কিন্তু সে যদি বিনোদ না হয়?"

রতনমণি গৌরমণি উভয়ে জোর করিয়া বলিল—সে যে বিনোদ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"কিন্তু, অত করে' তোমরা বল্লে, তবু শেষ পর্য্যন্ত নাম পরিচয় সে স্বীকার করলে না কেন?"

রতন বলিল—"তা ত বলতে পারিনে না,বাবা। তার মনে একটা বৈরাগ্য হয়েছিল, তাই না সে সংসার ছেড়ে পালিয়েছে! ভাবলে, এরা [illegible] এখন আমায় বিনোদ

বলেই চিন্‌তে পারে, তা হলে ধরপাকড় আরম্ভ করবে—আবার কি শেষে সেই সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাব! তাই মিথ্যে করে বল্‌ছে আমি সুধীর বোস্।"

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন—"সাধু পুরুষ!—সংসার বন্ধনে বড় ভয়, কিন্তু মিথ্যেটি মুখে আটকায় না।"—কিন্তু তাঁহার এ ব্যঙ্গের ভাব অধিকক্ষণ রহিল না; আবার গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

গৌরমণি বলিল—"আর একটা কথা ভেবে দেখুন বাবা! সত্যই যদি সে সুধীর বোস্ হ'ত, তা হলে, দিদি যখন তার হাতে গঙ্গাজল দিয়ে বল্লে—'বল আমি সুধীর বোস, আমি বিনোদ নই'—তখন সে গঙ্গাজল ফেলে দিয়ে হাত মুছে ফেল্লে কেন?"

বৃদ্ধ ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"পাগলী! ওতেই কি প্রমাণ হল সে বিনোদ! কাশী হেন স্থান, এখানে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে দিব্যি করে', সত্যি কথা বল্‌তেও অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। বেশ করে' ভেবে চিন্তে দ্যাখ্—শেষকালে চৌদ্দ পুরুষকে নরকে ডোবসনে যেন।"

পিতার এই অবিশ্বাসে রতন একটু চটিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল—"আমরা এত করে' বলছি তবু আপনার মনের সন্দেহ যাচ্ছে না বাবা! আমাদেরই কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই একবারে! আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, সে বিনোদ।"

কন্যাকে কুপিত দেখিয়া হরিকিঙ্কর বলিলেন—"পাঁচ বছর আগে তোমরা তাকে দেখেছিলে—সেই বা ক'দিন? মাঘ মাসে বিয়ে হল, জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীবাটায় এসেছিল—তিনটি দিন ত মোটে ছিল। তার পর, জন্মাষ্টমীর ছুটিতে একবার এসেছিল। এক দিন না দু'দিন ছিল বুঝি?"

গৌর বলিল—"একদিন এক রাত ছিল।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তবেই ত, বোঝ দিকিন! তিন দিন আর এক দিন চার দিন, এই ত তোমাদের তার সঙ্গে পরিচয়। আমি বরঞ্চ তাকে তোমাদের চেয়ে বেশীবার দেখেছি। যখন ছেলে দেখতে গিয়েছিলাম, তার পর আশীর্ব্বাদের সময়, তার পর বিয়ের পর নয়নকে সেখান থেকে আনতে গিয়ে। সে যাই হোক আসবে ত বলেছে—আসুক, দেখি।"

রতন বলিল—"আপনিও দেখলেই তাকে চিন্‌তে পারবেন বাবা! তবে আগেকার চেয়ে মাথায় একটু ঢেঙা হয়েছে, রঙটাও যেন একটু ফর্সা হয়েছে—পশ্চিমে রয়েছে কি না! কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলার স্বর, সেই কথা কবার ভঙ্গি।"

পিতাকে সযত্নে আহার করাইয়া, নিজেরা খাইয়া, সংসারের কাযকর্ম্ম সারিয়া গৌর ও নয়ন পাশের ঘরটিতে গিয়া তিন বোনের জন্য তিনখানি মাদুর বিছাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিল। রতনমণি পিতাকে শোয়াইয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিল, কিছুক্ষণ পরে পাণের ডিবা ও সুর্ত্তির কৌটা হাতে করিয়া সেও আসিয়া প্রবেশ করিল। নিজের মাদুরে বসিয়া দুই চারিটা অন্য কথার পর বলিল—"নৈনি, তোর বাক্সে সেই যে সাবান ছিল সে কি আছে?"

নয়ন বলিল—"আছে। কেন দিদি?"

"বের করে রাখিস। আর, এই চাবি নে, বাবার ঘরের আলমারি খুলে দুটো টাকা বের করে আন্ ত।"

গৌরমণি দিদির কৌটা হইতে দুইটি সুর্ত্তিগুলি লইতে লইতে বলিল—"কেন দিদি? এখন টাকা কি হবে?"

রতন বলিল—"যাই, সরোজিনীর দেওরকে দিয়ে একটা স্নেজলী, আরও দুই একটা জিনিষ টিনিষ আনাই।"

গৌর জিজ্ঞাসা করিল—"স্নেজলী কি?"

নয়নমণিও কৌতূহলের সহিত দিদির মুখপানে চাহিয়া রহিল। রতন বলিল—"স্নেজলী জানিসনে! এই যে কাঁচের কৌটাতে থাকে, আজকালকার মেয়েরা সাবান টাবান মেখে, মুখে তাই মাখে—তাকে স্নেজলী বলে।"

একটু ভাবিয়া নয়নমণি বলিল—"স্নেজলী—মা

হেজলীন, বল? সেই শাদা ফুলের মত—বেশ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আছে? সেই হেজলীনের কথা বলছ বুঝি?"

রতন বলিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ হেজলীই বুঝি বলে!"

গৌরমণি হাসিতে লাগিল, বলিল—"হা-হা রেজলী! রেজলী কি! হেজলীনকে বলে রেজলী! দিদি যেন চণ্ড—তেলাকুচো রঙ! হা-হা!"

রতন বলিল—"যা যা—আর ঠাট্টা করতে হবে না। আমি সেকেলে মানুষ, অতশত কি জানি! আমাদের আমলে ও-সব ওঠেও নি, আমরা জানিওনে। আজ কালকার ছুঁড়িগুলো মুখে মাথে দেখতে পাই, তাই ভাবলাম যে একটা আনিয়ে নি। যা-যা নয়ন, টাকা দুটো বের করে নিয়ে আয়।"

নয়নমণি উঠিল না, মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিল। রতন রাগিয়া নিজে উঠিয়া টাকা বাহির করিয়া, সরোজিনীদের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সেই গলিতে কাছেই তাহারা থাকে।

প্রভাতের মেঘ-মেঘ ভাবটা কাটিয়া গিয়া এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গুমোটও কাটিয়া গিয়াছে—জানালা দিয়া ঝুরঝুর করিয়া শরতের মিষ্ট বাতাস আসিতেছে। গৌরমণি তাহার মাদুরখানি জানালার নিকট সরাইয়া লইয়া শয়ন করিল এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া গেল।

নয়নমণি শুইয়া রহিল, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। সে কেবল আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। এত দিনের পর, বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণা কি তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন! এতদিন ধরিয়া মনে মনে গোপনে সে যাহা প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে, আজ কি তাহা পূর্ণ হইবে?

কিন্তু—আবার মনে হইল, সত্যই কি তিনি? যদি তিনি না হন! দিদিরা দুইজনেই বলিতেছেন বটে, কিন্তু বাবা যে বিশ্বাস করিতেছেন না। কিন্তু বাবা ত দেখেন নাই, দিদিরা দেখিয়াছে। আচ্ছা, আসুন ত, নয়নও দেখিবে। বিবাহের পর শ্বশুরালয় গিয়া তিনটি দিন সেখানে থাকিয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে। জামাই ষষ্ঠীর সময় আসিয়াও তিনি তিনদিন ছিলেন—আর একবার আসিয়াছিলেন সেই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে। তিন আর তিনে ছয় আর একে সাত—এই সাত রাত্রি সে স্বামীকে কাছে পাইয়াছিল—কিন্তু লজ্জায় কখনও চোখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিতে পারে নাই। তবে দিনের বেলায়, আড়ালে থাকিয়া দুই চারিবার তাঁহাকে সে দেখিয়াছে—তাহাতেই স্বামীর মুখখানি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখ কি ভোলা যায়? যথার্থই যদি তিনি হন, তবে "আমি অমুক নই আমি সুধীরচন্দ্র বসু" বলিলেই কি নয়নমণিকে তিনি ঠকাইতে পারিবেন? কখনই না। সে, দেখিলেই তাঁহাকে চিনিবে। এখন বাবা বিশ্বনাথের কৃপায়, সত্যই যদি তিনি হন—তবেই। নহিলে—পোড়া কপাল ত পুড়িয়াইছে!

আবার নয়নমণির এ কথাও মনে হইল—যদি তিনিই হন, অথচ কোন মতেই সে কথা স্বীকার না করেন, কিংবা আত্মপ্রকাশ করিয়াও, গৃহী হইতে—নয়নকে গ্রহণ করিতে—সম্মত না হন? নয়ন ভাবিল —"তবু ত তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইব! এই সহরেই তিনি রহিয়াছেন, তাহাও ত জানিয়া মনকে একটু স্থির করিতে পারিব। বড়দিদি মাঝে মাঝে গিয়া তাঁহাকে খবরটাও ত আনিয়া দিতে পারিবেন!"

এইরূপ নানা চিন্তায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। পাশে পিতার ঘরে ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিল। নয়ন মনে মনে বলিল—"আর দু' ঘণ্টা। দু' ঘণ্টা পরে অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!"

কিয়ৎক্ষণ পরে রতনমণি অঞ্চলে কয়েকটি প্রসাধন সামগ্রী লইয়া প্রবেশ করিল। দেওয়াল আলমারিতে সেগুলি সাজাইয়া রাখিয়া, গৌরমণিকে ডাকিতে লাগিল—"গৌরী, ওলো ওঠ ওঠ। বেলা যে পড়ে এল। নৈনিকে ওঠা, গা মুখ ধুইয়ে ওর চুলটুল বেঁধে দেবার যোগাড় দ্যাখ্। আমি ততক্ষণ কয়লায় আগুন দিইগে, একটু জলখাবার তৈরী করতে হবে ত!"

দ্বিতীয়বার শব্দ আসিল—"বাড়ীতে কে আছেন ?" রতনও রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল—"সাড়া দিন—সাড়া দিন বাবা। নৈলে সে তিনটি বার ধর্ম্মডাক ডেকে, হয়ত চলেই যাবে।"

গলির উপর যে জানালা খুলিয়াছে তাহার নিকটেই বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিলেন, হাঁকিলেন—"কাকে চান আপনি ?" উত্তরে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি কাণ খাড়া করিয়া রহিলেন।

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল—"হরিকিঙ্কর বাবু এই বাড়ীতে থাকেন ?"

"হাঁ হাঁ—আসছি"—বলিয়া তিনি নীচে নামিবার জন্য বাহির হইলেন। রতন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল—"বাবা, আপনি থাকুন, আমি গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছি। কিন্তু বাবা (রতন হাত দুটি যোড় করিল) দোহাই আপনার, সে নিজের পরিচয় যতই অস্বীকার করুক, আপনি যেন তার উপর চটে উঠে কিছু তাকে বলবেন না। আপনি শুধু দেখুন, সে যথার্থ বিনোদ কি না। আপনার মন যদি নিঃসন্দেহ হয়, তখন, আর যা করবার আমরা করবো।"—বলিয়া রতন প্রায় ছুটিয়া, সিঁড়ি নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

যুবক রতনকে দেখিবামাত্র বলিল—"দেখুন, আমি সত্যরক্ষা করেছি।"

রতন বলিল—"এস ভাই এস। তুমি যে ফাঁকি দিয়ে পালাবে না, সে বিশ্বাস আমার ছিল। চল, উপরে চল।"

সদর দরজা বন্ধ করিয়া, আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়া রতন হঠাৎ দাঁড়াইল। বলিল—"দেখ ভাই, একটা কথা বলে দিই। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হলেই তাঁকে প্রণামটা কোরো। নৈলে তিনি চটে যান—বুড়োমানুষ কিনা!"

যুবক বলিল—"আমার আবার শ্বশুর কে আছে? আমি ত আপনাকে বলেছি আমি অবিবাহিত!"

রতন বলিল—"হল! আবার বুলি ধরলে বুঝি? আচ্ছা শ্বশুর নাই হলেন, ব্রাহ্মণ ত—প্রাচীন হয়েছেন, পুণ্যের শরীর, জপ তপ নিয়ে আছেন, তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একটা প্রণাম করলে কোনও দোষ আছে কি?"

"না, তা দোষ নেই—প্রণাম করবো এখন। কিন্তু একটা কথা। আমায় দয়া করে' একটু শীঘ্র ছেড়ে দিতে হবে। আমার অনেক কায আছে।"—বলিয়া যুবক রতনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর শয়নকক্ষের দ্বারদেশে হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া সিঁড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। আগন্তুক তাঁহার চক্ষুগোচর হইবামাত্র তিনি বারান্দায় বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। যুবক আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা—চিরজীবী হও"—বলিয়া বৃদ্ধ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন।

শয়নকক্ষে, জানালার কাছে মাদুর বিছান ছিল। বৃদ্ধ, আগন্তুককে লইয়া গিয়া সেখানে বসাইলেন। বলিলেন—"তোমার শরীর ভাল আছে ত?"

যুবক, তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া, উত্তর করিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কাশীতে কতদিন আসা হয়েছে?"

যুবক পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল—"বছর দুই হবে।"

"বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে আছ শুনলাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি সেখানে কি কর?"

"রোগীদের চিকিৎসা করি। সেবা শুশ্রূষা করি।"

"মাইনে দেয়?"

"আজ্ঞে না। সেখানে খাই দাই থাকি। হাত খরচ বলেও সামান্য কিছু দেয়। এই কাযেই জীবন উৎসর্গ করেছি।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সেবাশ্রম ব্যাপারটা কি?"

যুবক বলিল—"এই যে সেবাশ্রম, এটা বিশ্বনাথ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশের অনেক বড় বড়

লোক—রাজা মহারাজা সব এই মিশনের পৃষ্ঠপোষক। কাশীতে এসে যারা পীড়িত হয়ে পড়ে, সহায় সম্পত্তি নেই, ওঁরা তাদের ঐ সেবাশ্রমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান্, সেবাশুশ্রূষা করান্। হাঁসপাতালের মত আর কি।"

বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাশীতে আসবার আগে কোথায় ছিলে বাবা?"

"নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতাম।"

"তোমার বাপ মা বেঁচে আছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"তুমি বাড়ী যাওয়ার আগেই তাঁরা গত হয়েছিলেন, নয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়ীতে এখন কে কে আছেন?"

"তা জানিনে।"

বৃদ্ধ এক একবার আকুল নয়নে ছেলেটির পানে চাহেন, আবার ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কি চিন্তা করেন। দেওয়ালে ঠেসান হুঁকাটি লইয়া, কলিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, আগুন নিবিয়া গিয়াছে। বলিলেন—"বাবা, তুমি একটু বস, তামাকটা সেজে আনি।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পার্শ্বের ঘরে যাইবামাত্র রতনমণি গৌরমণি উভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, আমাদের বিনোদ নয়?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"অনেকটা ত সেই রকমই বোধ হচ্ছে—কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি বাবা?"

"কিন্তু—ঠিক ত বুঝতে পারছিনে! নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে যে মা! গলার স্বরটা তারই মতন যেন বোধ হচ্ছে; আর, সেই রকম মাথা দুলিয়ে কথা কয়। কিন্তু, ও রকম ত অনেকেরই দেখেছি।"

"মুখ চোখ?"

"মুখ চোখ? হ্যাঁ তাও কতকটা যেন তারই মত। কিন্তু—কিন্তু—আমার চোখের সে জ্যোতি যে আর নেই! তা ছাড়া, আজ চার বছর তাকে দেখিনি। আমি ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে মা!"

গৌরমণি ম্লানমুখে চক্ষু নত করিল। রতনমণি বলিল—"সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলার স্বর—তবু আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না—এযে আপনার অন্যায় বাবা!"

বৃদ্ধ একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তা, কি করব মা? বাবা বিশ্বনাথই জানেন।"

গৌরমণি বলিল—"তা হলে—এখন কি করা যায়? ওকে কি ছেড়ে দেব?"

"ছেড়ে দেবে?—কিন্তু যদি—সেই হয়! হাতছাড়া করাটা! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে! তোমরা যা ভাল বোঝ তা কর বাছা। একটু তামাক সেজে দাও খাই।"—বলিয়া সেইখানে তিনি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

পিতাকে তামাক সাজিয়া দিয়া, গৌরমণি আগন্তুকের জলযোগের জন্য আসন বিছাইল, রতনমণি খাবার সাজাইয়া আনিতে গেল। বৃদ্ধ আসিয়া আগন্তুককে ডাকিয়া আনিলেন—সে আসিয়া, কিঞ্চিৎ আপত্তির পর জলযোগে বসিল। গৌরমণি নিকটে রহিল।

তামাকু সেবনান্তর, বৃদ্ধ নিজ কক্ষে গিয়া জামা গায়ে দিয়া কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া লাঠিহস্তে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রতন জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় চল্লেন বাবা?"

"আমি একবার বিশ্বনাথ দর্শন করে আসি।"

রতন বলিল—"ওকে একটু বোঝাবেন না?"

"তোমরা বোঝাও—যা ভাল হয় কর।"

রতন বলিল—"আমরা ত বোঝাব; কিন্তু সে শুনবে কি? আপনি থাকলে—"

"না না, সে আমি পারব না। আমার মনটা ভারি অশান্ত হয়েছে। আমি এখন মন্দিরে গিয়ে বাবার

পায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকব।"—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

রতন তাঁহার পথ আগলাইয়া বলিল—"শুনুন বাবা। আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে এই বিনোদ। আমরা দুই বোনে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি না পারি, তবে একটা মতৎলব ঠাউরেছি—আপনার হুকুম পেলে তা করতে পারি।"

"কি, বল।"

"নয়নকে ওর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিই। আমাদের কথায় ওর যদি মন না গলে—নয়নের মুখখানি দেখে গলতেও পারে। দেখুক, কি মহা নিষ্ঠুরের কায সে করেছে।—আপনি কি বলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"নয়নের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে বলছ? সেটা কি ঠিক হবে? কি জানি। একটু ভাবি দাঁড়াও। দূর হক্‌গে—আমার মাথাই ঘুলিয়ে গেছে। দুর্ব্বল-মাথা—বুদ্ধিও দুর্ব্বল। হরি হে! সে তোমরা যা হয় কর। বেশ করে বুঝে দেখ, যদি মনে তোমাদের কোনও সন্দেহ না থাকে, তবে দেখা করাও। আচ্ছা, নয়নকে একবার এখানে ডাক।"

রতন গিয়া নয়নকে লইয়া আসিল। বৃদ্ধ ব্যাকুল-নেত্রে মেয়ের অবনত মুখখানির প্রতি চাহিয়া, তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা বিশ্বনাথ তোমার রক্ষা করুন। সীতা, সাবিত্রী তোমায় তাঁদের পায়ের ধুলো দিন।"—বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

রতন ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কখন ফিরবেন বাবা?"

"আরতির পর"—বলিয়া তিনি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন।

জলযোগ শেষ হইলে রতনমণি আগন্তুককে পিতার কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল, গৌরমণি ডিবায় ভরিয়া পাণ আনিয়া দিল। দুই ভগিনী মেঝের উপর বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল।

রতন বলিল—"তা হলে, কি ঠিক করলে ভাই?"

যুবক বলিল—"কিসের কি ঠিক করলাম?"

"ছুঁড়িটিকে কি ভাসিয়ে দেবে? সেই কি ধর্ম্ম?"

যুবক বলিল—"এখনও কি আপনাদের ভ্রম গেল না? এখনও আপনারা মনে করছেন আমি আপনাদের ভগিনীপতি? আপনার বাবা আমায় দেখে কি বল্লেন?"

রতন বলিল—"তিনিও তোমায় চিনেছেন—তুমি বিনোদ।"

যুবক বলিল—"না, আমি আপনাদের বিনোদ নই। কেন মিছে আমায় ধর পাকড় করছেন?"

দুই বোনে তখন যুবককে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিল। বলিল—"ভাই, অনেক দিন তোমায় দেখিনি বটে, কিন্তু আপনার লোককে কি মানুষ ভোলে? সেই মুখ, সেই চোখ, সব সেই। সে কলকাতা ক্যাম্বেল ইস্কুলে ডাক্তারী পাশ করেছিল, তুমিও এখানে ডাক্তারীই করছ। তারও বাপ মা ছিল না, তোমারও নেই। কেন মিছে আমাদের ভোলাচ্ছ ভাই?"—কিন্তু তথাপি কিছুতেই যুবক স্বীকার করে না যে সে বিনোদ।

এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। যুবক বলিল—"এখন তবে আমায় বিদায় দিন।"

রতন বলিল—"একটু বোস। বাবা ফিরে আসুন।"—বলিয়া সে উঠিয়া, বাতিটা জ্বালিয়া দিয়া বাহিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাকিল—"গৌরী, শোন্।"

গৌরমণিও চলিয়া গেল—যুবক একা রহিল। একবার সে ভাবিল, এই সুযোগে পলায়ন করি। উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময় দ্বারের নিকট মলের ঝুম ঝুম শব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী, তৎপশ্চাৎ গৌরমণি দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৌরমণি বলিল—"ভাই, এত করে আমরা সকলে মিলে তোমাকে বোঝালাম, কিছুতেই তুমি শুনলে না। দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে, যার চিরজীবনের সুখ-দুঃখের ভার তুমি নিয়েছ, তুমি তাকে পরিত্যাগ করলে

তার উপায় কি হবে—সেইটে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে, যদি যেতে ইচ্ছা হয় যাও।”—বলিয়া গৌরমণি বোনটিকে ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া, কবাট টানিয়া ঝম্ করিয়া শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

যুবক মাদুরের উপর বসিয়া ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া উঠিল। নয়নমণি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া,গলবস্ত্র হইয়া, তাহাকে প্রণাম করিয়া অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবক নির্নিমেষ নয়নে, এই যুবতীর সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—“তুমি আমায় চিন্‌তে পারছ ?”

নয়নমণি নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—“হাঁ।”

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—“আমি কে ?”

নয়ন অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল—“আমার স্বামী।”

“বেশ চিনেছ ?”

নয়নমণি আবার নীরবে মাথা হেলাইল।

যুবক মৃদুস্বরে বলিল—“কিন্তু আমি ত তোমার স্বামী নই।”

নয়ন এবার মুখখানি তুলিল। বলিল—“তুমি আমার স্বামী নও একথা তুমি বোলো না। আমাকে যদি তুমি পায়ে না রাখ, ফেলে দিতেই চাও, বরং বল ‘তুমি আমার স্ত্রী নও।’—তুমি আমার ইহকালের—আমার পরকালের সম্বল।”—কথাগুলি শেষ হইবামাত্র তাহার চক্ষু দুইটি হইতে ঝরঝর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। তাহার দেহখানি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

যুবক বলিল—“বস বস! নইলে পড়ে যাবে। বস—এ কি বিপদে পড়লাম!”—বলিয়া নিজে সে মাদুরের উপরে বসিল।

নয়ন মেঝের উপর বসিয়া, বামহস্তের উপর মাথাটি ঝুঁকাইয়া দিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবক বলিল—“কেঁদনা কেঁদনা, চুপ কর। তোমার সমুখে কি বিপদ তা তুমি বুঝতে পারছ না? ধর আমি যদি বলি, আচ্ছা হ্যাঁ—আমিই তোমার স্বামী, তোমায় নিয়ে ঘরকন্না করি—তার পর যদি প্রমাণ হয়ে যায় আমি তোমার স্বামী নয়, আমি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত নয়—আমি কায়েত, আমার নাম সুধীরচন্দ্র বসু—তখন কি সর্ব্বনাশটা হবে বল দেখি। এটা তুমি ভাবছ না ?”

নয়ন তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিয়া বলিল—“তুমি আমার স্বামী।”

যুবক মুখ নীচু করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—“আমি এখন চল্লাম। এ সব ভয়ানক অন্যায় কথা। একজন পরস্ত্রীর সঙ্গে এ রকম ভাবে”—বলিয়া সে উঠিয়া জুতা পায়ে দিল।

নয়ন বলিল—“কি করে যাবে ? বাইরে যে শিকল বন্ধ।”

“তাও ত বটে।”—বলিয়া যুবক থামিল।

নয়ন বলিল—“বস। যদি যেতেই হয়, যেও, আমরা ত তোমায় ধরে রাখতে পারব না। একটা কথা আমায় বলে যাও। তুমি যে বিয়ে করে আমায় পরিত্যাগ করে চল্লে, আমার উপায় কি হবে ?”

যুবক বসিল না। বলিল—‘সে আমি কি জানি ?”—বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কবাটে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল—“দুয়ারটা খুলে দিন।”

কেহ দুয়ার খুলিবার কোনও লক্ষণ দেখাইল না। ক্রমে যুবক অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত পদাঘাত করিয়া সে চীৎকার জুড়িয়া দিল। তখন রতনমণি আসিয়া শিকল খুলিল।

যুবক বলিল—“এরকম সব, ভারি অন্যায় আপনাদের! আমি চল্লাম।”

রতনমণি বলিল—“সেইটেই কি তোমার ধর্ম্ম হল ?”

“আমার ধর্ম্ম আমি জানি।”—বলিয়া যুবক হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় হরিকিঙ্কর বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। গৌরমণি তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হল ?”

গৌরমণি সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে, পিতাকে সকল কথা বলিতে লাগিল।

বৃদ্ধ নিজ শয়নকক্ষে আসিয়া, জামা জুতা ছাড়িয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিতে করিতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"এখন বোধ হচ্চে, আমার মনে যা সন্দেহ ছিল, সেইটিই ঠিক—সে আমাদের বিনোদ নয়। তোমরা এত করে বল্লে, নয়ন পর্য্যন্ত অত কাঁদাকাটি করলে, সে যদি বিনোদ হত, তা হলে অন্ততঃ নিজের পরিচয়টা স্বীকার করে' বলত, আমি আর সংসারী হব না, কেন তোমরা আমায় এত আকিঞ্চন করছ! যা হোক, নয়নকে সে ছোঁয়নি ত?"

গৌর বলিল—"নয়নের কাছে শুনলাম, সে মাদুরে বসে' ছিল, নয়ন নীচে ছিল। প্রণাম করেছিল, তাও পায়ে হাত দেয় নি!"

"ভাগ্যিস্ ছোঁয়নি। কাল তোমরা যখন গঙ্গাস্নান করতে যাবে, নয়নকেও নিয়ে যেও—ও-ও যেন একটা ডুব দিয়ে আসে। ছি ছি কি লজ্জার কথা! বাবা বিশ্বনাথ ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন।"—বলিয়া বৃদ্ধ উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, একদিন বেলা নয়টার সময়, বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর সেই মাত্র সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া কন্যা-প্রদত্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নয়ন সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় নিম্নে উঠান হইতে শব্দ শুনিতে পাইল—"এ দাই, বাবু হ্যায়?" দাই বলিল—"বাবু উপরমে—যাও না!"

নয়ন বারান্দার প্রান্তে রেলিঙের নিকট গিয়া নীচে চাহিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—একমাস পূর্ব্বে, স্বামী বলিয়া সাশ্রুনয়নে যাহার পদপ্রান্তে সে বৃথা লুটাইয়াছিল—সেই আবার আসিয়াছে।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইবামাত্র নয়ন তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া আশ্রয় লইল।

যুবক আসিয়া পৌঁছিবামাত্র হরিকিঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে?"

যুবক জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল—"আজ্ঞে আমি।"—বলিয়া ঢিপ্ করিয়া তাঁহাকে একটা প্রণাম করিল।

"কে?" জিজ্ঞাসা করিলেও পূর্ব্বেই বৃদ্ধ তাহাকে চিনিয়াছিলেন, এবং তাহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কোনও আশীর্ব্বাদ না করিয়া, কঠোরস্বরে বলিলেন—"তা, এ মেয়েছেলের বাড়ী, কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ তুমি ঢুকে পড়লে কোন্ আক্কেলে?"

তাঁহার মুখভঙ্গি দেখিয়া যুবক একটু শঙ্কিত হইল। বলিল—"নীচে দাই বাসন মাজছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বল্লে আপনি বারান্দায় বসে আছেন—যা হোক্ আমার দোষ হয়ে গেছে, মাফ্ করবেন।"

একথায় বৃদ্ধের মন যেন একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, বস। এখন কি মনে করে এসেছ?"

"আজ আপনার কাছে, সে দিনের অপরাধের আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি—আমায় আপনি মাফ্ করুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"কেন? ক্ষমা কিসের?"

যুবক বলিল—"নিজের পরিচয় গোপন করার অপরাধ। আপনারা সেদিন এত করে আমায় বল্লেন, আমি তখন কিছুতেই স্বীকার করলাম না যে আমি আপনার জামাই বিনোদ। আমার ভারি অপরাধ হয়ে গেছে, আমায় মাফ করুন।"—বলিয়া সে মুখখানি নীচু করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ ওষ্ঠযুগল গুটাইয়া, ব্যঙ্গভরে বলিলেন—"সেদিন অত সাধাসাধি, কিছুতেই স্বীকার করলে না যে তুমি বিনোদ, বল্লে আমি সুধীর বোস, আমি কায়েত—আর একমাস যেতে না যেতেই তুমি বিনোদ চাটুয্যে হয়ে গেলে? হঠাৎ এ মতটা বদলাবার কারণটা শুনতে পাই কি?"

যুবক বলিল—"ভেবে চিন্তে দেখলাম, বিবাহিতা

স্ত্রীকে এ রকমভাবে ভাসিয়ে দিলে সেটা ঘোর অধর্ম্ম হয়।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তাই কি? না, মতটা বদলাবার অন্য কিছু একটা বিশেষ কারণ ঘটেছে?"

"আজ্ঞে, আর কি কারণ ঘট্‌তে পারে। আমিই বিনোদ—এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই।"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত যুবকের পানে তাচ্ছিল্যভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তুমি যে বিনোদ, তার প্রমাণ?"

যুবক মুখ তুলিল। বলিল—"একমাস আগে আপনারা সকলেই আমাকে নিঃসন্দেহে বিনোদ বলেই চিনেছিলেন, এর বেশী আর কি প্রমাণ হতে পারে?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—"আমি তখন তাই মনে করেছিলাম বটে, স্বীকার করি; তবে গোড়া থেকেই মনে একটু সন্দেহ যে না ছিল তা নয়। বাপু হে, তুমি যদি সত্যি আমার জামাই বিনোদ হতে, তবে সেই দিনই স্বীকার করতে। অত করে আমরা সবাই তোমায় সাধাসাধি কর্‌লাম—মেয়েটা পর্য্যন্ত তোমার কাছে গিয়ে কেঁদে মাটী ভিজিয়ে দিলে, তুমি সত্যি বিনোদ হলে সে রকম করে কখনই তাকে ফেলে যেতে পারতে না! বামুন কায়েথে ত পারেই না, চণ্ডালেও পারে কি না সন্দেহ।"

যুবক কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কাযটা আমি চণ্ডালের মতই করেছি বটে, স্বীকার করি। যা হয়ে গেছে, তার ত আর চারা নেই। এখন, কি হলে আপনার মনের সন্দেহ যায় তাই বলুন। আমায় সব কথা জিজ্ঞাসা করুন—আমাদের গ্রামের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা—আপনার যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করুন।"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত লোকটির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেনারস ব্যাঙ্কে তোমার কি কোনও আলাপী বন্ধুবান্ধব চাকরি করে?"

"না। কেন?"

"তাই বলছি। ব্যাঙ্কে আমার যে হাজার কয়েক টাকা আছে, সে খবরটি কি করে পেলে তুমি, বল দেখি বাপু?"

যুবক বলিল—"আজ্ঞে, সে সব কোন খবরই ত আমি জানিনে। আর, সে খবরে আমার দরকারই বা কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দরকারই যদি নেই, তবে তুমি কি লোভে আজ আমার জামাই সেজে এসেছ শুনি? তোমার চালাকি আমি কি কিছু বুঝতে পারছিনে ভেবেছ? এই সময়ের মধ্যে দেশে গিয়ে, সব সুলুক সন্ধান খবর বার্ত্তাগুলি জেনে এসেছ, যাতে আমরা তোমায় কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে ঠকে না যাও। জোচ্চোর কাঁহেকা!"

একথা শুনিয়া যুবক একটু গরম হইয়া, একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল—"ওকি কথা বলছেন আপনি! আমি জোচ্চোর?"

বৃদ্ধ রাগিয়া বলিলেন—"তুই জোচ্চোর, তোর বাপ জোচ্চোর, তোর চৌদ্দপুরুষ জোচ্চোর! নিকালো হিঁয়াসে।"—বলিয়া তিনি কম্পিতহস্তে সিঁড়ির দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

যুবক উঠিল। জুতা পরিতে পরিতে বলিল—"অন্যায় সন্দেহ করে আমায় তাড়ালেন। শেষে পছ্‌তাতে হবে এর জন্যে।"

"হয় হবে। তুমি সরে পড়।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে যুবক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বাটীর বাহির হইয়া, গলির মধ্যে অল্পদূর অগ্রসর হইতেই দেখিল, রতনমণি গৌরমণি দুইজনে গঙ্গাস্নান করিয়া, গামছায় তরীতরকারী বাঁধিয়া ফিরিতেছে। যুবক নিকটস্থ হইয়া বলিল—"দিদি, আমার অপরাধ তোমরা ক্ষমা কোরো। সেদিন তোমাদের সঙ্গে আমি বড়ই কুব্যবহার করেছি। আমিই তোমাদের বিনোদ।"

যুবকের কথার স্বর ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া উভয় ভগিনী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। রতন বলিল—"যাচ্ছ কোথা, বাড়ী চল।"

যুবক বলিল—"বাড়ীতেই গিয়েছিলাম। বাবা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, তিনি আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

রতন বলিয়া উঠিল—"অ্যাঁ? বল কি? কি বল্লেন তিনি?"

যুবক কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল—"বল্লেন তুই জোচ্চোর, আমার টাকার লোভে জামাই সেজে এসেছিস্। আমার বাপ চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত তুলে গাল দিয়েছেন।"

রতন ও গৌর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। রতন হঠাৎ যুবকের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"ভাই, তুমি বাবার উপর রাগ কোরোনা—তিনি বুড়োমানুষ, চোখে ভাল দেখতেও পান না, তাই তিনি তোমায় চিনতে না পেরে ঐ সব কথা বলেছেন। লক্ষী ভাইটি আমার, রাগ কোরো না। তুমি এখন সেবাশ্রমে যাচ্চ ত? সেখানে তুমি থেক, আমি ওবেলা গিয়ে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।"

যুবক বলিল—"না দিদি ছেড়ে দিন, আর আমি আস্‌বো না দিদি। ঢের হয়েছে। বাবা বিশ্বনাথের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম, সংসার সুখের লোভে সে সংকল্প ছেড়ে দিয়ে আসছিলাম, বাবা বিশ্বনাথ তাই আমার জন্যে এই চাবুকের ব্যবস্থা করেছেন। চাবুক খেয়ে, আবার তাঁরই পায়ে ফিরে যাচ্ছি।"—বলিয়া যুবক ঝুঁকিয়া,রতন ও গৌরমণির পদস্পর্শ করিয়া, হন্ হন্ করিয়া চলিল।

রতন ও গৌরমণি তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, পিতা হাতের উপর মাথাটি নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। গৌরমণি রান্নাঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও দিদি, শীগ্‌গির আয়, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"কি কি" বলিয়া রতন সেইদিকে ছুটিল। বৃদ্ধও উঠিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন, নয়নমণি ঘরের মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

রতন বলিল—"বাবা, রাগের মাথায়, জামাইকেও তাড়ালে, মেয়েটারও প্রাণবধ করলে?"—বলিয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে সে বসিয়া পড়িয়া, নয়নমণির মাথা কোলে তুলিয়া লইল। গৌরমণি জল আনিয়া মূর্চ্ছিতার মুখে চোখে ঝাপ্টা দিতে লাগিল। রতনমণি খুব জোরে তাহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। বৃদ্ধ হতাশ ভাবে সেখানে বসিয়া, মুখে শুধু হায় হায় করিতে লাগিলেন।

প্রায় পনেরো মিনিট শুশ্রূষার পর নয়নমণির মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল।

রতনমণি ও গৌরমণি সারাদিন পিতাকে অনেক বুঝাইল। তাহারা বলিল—"সে যখন বল্লে যে আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমায় পরীক্ষা করুন, দেখুন আমি সত্যি আপনার জামাই কি না, তখন তাকে গালমন্দ দিয়ে তাড়ানো ঠিক হয়নি। আপনি বল্‌ছেন যে সে টাকার লোভে, এই একমাস দেশে গিয়ে সমস্ত খবর সন্ধান জেনে তৈরি হয়ে এসেছে। বেশ ত, এমন ঢের কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারা যেত, যা আসল বিনোদ ছাড়া আর কেউ জানে না। অন্য কথায় কায কি, নয়নের সঙ্গেই সাত রাত্তির সে একত্র ছিল ত? নয়নই তাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারত, যার উত্তর আসল বিনোদ ছাড়া কেউ বলতে পারে না।"

অবশেষে বৃদ্ধ সম্মত হইলেন। বলিলেন, আচ্ছা বেশ, তাহাকে আবার ডাকিয়া আনা হউক, রীতিমত পরীক্ষান্তে যদি মনের সন্দেহ দূর হয়, তবে তাহাকে জামাই বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া, বিকালে ৪টার সময় মহোল্লাসে রতনমণি বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে গিয়া সন্ধান লইয়া জানিল, তথায় সে যুবক সকলের নিকট বিনোদ চট্টোপাধ্যায় নামেই পরিচিত ছিল; অদ্য বেলা দুইটার সময় জিনিষপত্র লইয়া, গাড়ী ডাকিয়া সে ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে, কোথায় যাইবে কাহাকেও বলিয়া যায় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কন্যার মুখে এই সকল সংবাদ শুনিয়া, বৃদ্ধ শিরে

করাঘাত করিয়া বলিলেন—"হায় হায়! রাগের বশে এ কি কায করে বসলাম!" অনুশোচনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। রতনমণি তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল—"আপনি আর কি করবেন বাবা? যার অদৃষ্টে যা আছে, তাই ত হবে; সে ত কেউ রদ করতে পারবে না—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও না।"

একদিন কাটিল, দুইদিন কাটিল। এ দুইদিন নিয়মিত সময়ে তিনি আহারে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া থাকিয়াছে। রাত্রে নিদ্রা হয়না, উঠিয়া বিছানায় বসিয়া থাকেন, আর হায় হায় করেন। তৃতীয় দিনে, বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে গিয়া তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদের কোনও সংবাদ তাহারা পাইয়াছে কি না। তাহারা বলিল কোনও সংবাদই তাহারা পায় নাই। নয়নমণির বিশীর্ণ পাণ্ডুর দেহখানি ও ম্লান মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহার বুকের ভিতরটা হাহাকার করিতে থাকে।

চতুর্থ দিনে তিনি রতন ও গৌরমণিকে ডাকিয়া বলিলেন---"আমার বোধ হয়, মনের খেদে কাশী ছেড়ে আর কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে সে আশ্রয় নিয়েছে। এখানকার বাড়ী বন্ধ করে, চল আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই—যদি কোথাও আবার তার দেখা পাই।"

দুই তিন দিন ধরিয়া পিতা ও কন্যাদ্বয়ের মধ্যে এই বিষয়ে বাদানুবাদ চলিল। রতন বলে—"আপনার এই দুর্ব্বল শরীর, এ অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান কি আপনার শরীরে সইবে? বিদেশ বিভুঁইয়ে যদি কোনও অসুখ বিসুখ হয়ে পড়ে—তা হলে আমরা মেয়েমানুষ, আপনাকে নিয়ে অতন্তরে পড়ে যাব যে! সে কাশী ছেড়ে গিয়েছে, আবার হয়ত ফিরে আসবে। মাঝে মাঝে সেবাশ্রমে গিয়ে খবর নিলেই হবে—দিন কতক দেখাই যাক না।"

এইরূপে একমাস কাটিল। দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি একদিন বৃদ্ধ পূজা আহ্নিক সারিয়া, দুগ্ধপান করিয়া নয়নমণিকে বলিলেন—"আমি একবার অগস্ত্যকুণ্ডে যাচ্ছি, ঘণ্টাখানেক পরে ফিরবো।" দাই নিয়ে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, বৃদ্ধ তাহাকে বলিয়া গেলেন—"আমি বেরুচ্ছি, ছোটদিদিমণি একলা রইল, বড়দিদি মেঝদিদি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুই বাড়ীতে থাকিস্, কোথাও যেন যাস্ নি।"—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

নয়নমণি রান্নাঘর বন্ধ করিয়া, পিতার ঘরে আসিয়া তাঁহার মহাভারত খানি লইয়া, মেঝের উপর বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পড়িবার পর, দাই নিম্ন হইতে আসিয়া বলিল "ছোটদিদিমণি, ডাকওয়ালা এই রেজেষ্টারি চিঠি নিয়ে এসেছে; রসিদ লিখে দাও।"

নয়ন চিঠিখানা হাতে করিয়া দেখিল, তাহার নামেরই চিঠি। উপরে বাঙ্গালায় স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে শ্রীমতী নয়নমণি দেবী। তাহার পর, নীচে ইংরাজিতে কি সব আছে তাহা নয়ন পড়িতে পারিল না।

এ চিঠি কে লিখিল? নয়নকে কেহ ত কোনওদিন চিঠি লেখেনা! যাহা হউক, কম্পিত হস্তে রসিদে সহি করিয়া চিঠিখানি খুলিয়া দেখিল, একখানি দশ টাকার নোট তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তখন চিঠিখানি সে পড়িতে লাগিল—

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ
শরণং

আমিনাবাদ,
লক্ষ্ণৌ।
২২শে অগ্রহায়ণ।

নয়নমণি,

তুমি আমার এ পত্র পাইয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবে, কারণ বিবাহের পর পাঁচ বৎসর মধ্যে কখনও তোমাকে আমি কোনও পত্র লিখি নাই, এই প্রথম।

যেদিন প্রথম রাস্তায় তোমার দিদিদের সহিত দেখা হয়, সেদিন বিকালে তোমাদের বাড়ী যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যাইতে বাধ্য হইয়া-

ছিলাম, কারণ সত্যবদ্ধ হইয়াছিলাম এবং দ্বিতীয়তঃ, আমি না যাইলে বড়দিদি সেবাশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিয়াছিলেন ; সেবাশ্রমে সকলেই আমার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত ছিল, সুতরাং ধরা পড়িতাম। সেদিন বিকালে আমি তোমাদের কাশীর নদীয়া ছত্তরের বাড়ীতে গিয়া মহাপাষণ্ডের মত তোমাদের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, কিছুতেই স্বীকার করি নাই যে আমি সেই বিনোদ। তুমি যখন আমার কাছে বসিয়া কাঁদিয়াছিলে, তখন এক একবার আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে স্বীকার করি ; কিন্তু আমি তখন বাবা বিশ্বনাথের সেবার জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, গৃহী হইলে আমার ব্রতভঙ্গ হইবে এই ভাবিয়া অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসি।

চলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু যে ব্রতের জন্য তোমাদের সহিত এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া আসিলাম, সে ব্রতে আমি আর মন দিতে পারিলাম না। সারাদিন কেবল তোমার সেই অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটি স্মরণ হয়,—যে কাযে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছিলাম, সে কাযে আর মন লাগে না। তোমার সেই মুখখানি, সেই কথাগুলি কেবলই মনে পড়ে—আর বুকের মধ্যে কেমন হুহু করিতে থাকে। কাযের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তোমায় ভুলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কেবলই মনে হয়, দীন দুঃখী ও আর্ত্তের সেবাশুশ্রূষার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া যাহাকে চিরজীবন রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার উপায় কি করিলাম! নিজ ধর্ম্মপত্নীকে চিরদুঃখে ডুবাইয়া, আমি এ কি ধর্ম্ম পালন করিতে বসিয়াছি!

এক মাস কাল নিজের মনে অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমি যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ধর্ম্ম নয়, ঘোর অধর্ম্ম। তাই সেদিন ৯টার সময়, নিজ প্রকৃত পরিচয় দিয়া, তোমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আবার গৃহবাসী হইবার অভিপ্রায়ে তোমাদের বাড়ী গিয়াছিলাম। বাবার সঙ্গে আমি যখন বসিয়া কথা কহিতেছিলাম, তখন রান্না-ঘর হইতে তোমার চক্ষু দুইটি একবার মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাবা আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তুমি স্বকর্ণে সমস্তই শুনিয়াছ। তাহার পর, মনের ধিক্কারে সেখান হইতে আমি চলিয়া আসি। পথে দিদিদের সহিত দেখা হয়, তাঁহাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি। কেবল তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ আমি পাই নাই—এই পত্রে তাহা করিতেছি। তুমি সেদিন আমায় বলিয়াছিলে, "আমি তোমার স্ত্রী হই না হই, তুমি আমার স্বামী।" তোমার স্বামীর পূর্ব্ব আচরণের সমস্ত অপরাধের তুমি ক্ষমা কর, তোমার নিকটে এই আমার প্রার্থনা।

আমি এখানে বলরামপুর হাঁসপাতালে ডাক্তারী চাকরি গ্রহণ করিয়াছি। তোমার বাবা আমায় তাড়াইয়া দিলেও, আমি তোমার স্বামীই রহিলাম। যদি কখনও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা কর, আমার কাছে আসিতে চাও, তবে লিখিও, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। আমার প্রথম উপার্জ্জন হইতে দশটি টাকা এই পত্রমধ্যে তোমায় পাঠাইয়া দিলাম, তুমি গ্রহণ করিলে সুখী হইব এবং আমার উপার্জ্জন সার্থক হইবে। কিন্তু কি জানি, বাবা যদি এ টাকা তোমায় লইতে না দেন, তবে বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে ইহা পাঠাইয়া দিও।

তুমি যে আমায় পত্র লিখিবে, এ আশা করা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। আমি মাঝে মাঝে তোমায় চিঠি লিখিব। বাবার যদি অমত না হয়, তাহা হইলে দিদিরা যেন দয়া করিয়া মাঝে মাঝে আমায় তোমার সংবাদটা দেন। তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইও।

তোমার হতভাগ্য স্বামী
বিনোদ।

নয়নমণির তখনও পত্রপড়া শেষ হয় নাই, রতনমণি ও গৌরমণি গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নয়ন পত্রখানি তাহাদিগকে দেখাইল। পত্র পড়িয়া রতনমণি আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিল। গৌরমণি বলিল----"বাবা এলে তাঁকে এ চিঠি দেখিয়ে, কালই আমরা সকলে লক্ষ্ণৌ যাই চল।"

অল্পক্ষণ পরে, বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাড়ী আসিয়া বলিলেন—"ওরে রত্নী, আমার আলমারিটা খোল্ দেখি চট করে?"

"কেন বাবা, কি হয়েছে?"—বলিয়া রতন চাবি বাহির করিল।

বৃদ্ধ অধীর হইয়া বলিলেন—"ওরে খোল্ খোল্ —কথা পরে হবে এখন।"

রতনমণি আলমারি খুলিবামাত্র, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহার একটা স্থান হইতে এক বাণ্ডিল পুরাতন কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে বিনোদের লেখা পাঁচ বৎসরের পুরাতন একখানি পত্র পাওয়া গেল। সেই পত্রখানি খুলিয়া, বৃদ্ধ নিজ পকেট হইতে একখানি তাজা পত্র বাহির করিয়া, দুইখানি পাশাপাশি মেঝের উপর রাখিয়া মিলাইতে লাগিলেন। কন্যাদ্বয়কে বলিলেন—"দেখ্ দেখি—দুই চিঠিই এক হাতের লেখা নয়?"

রতনমণি গৌরমণি নূতন পত্রখানি তুলিয়া দেখিল, তাহাও বিনোদ লক্ষ্ণৌ হইতে সেবাশ্রমে লিখিয়াছে, বেতন পাইয়া আশ্রমের সাহায্যকল্পে পত্রমধ্যে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধ বলিলেন—"আজ ওদের ওখানে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, একটু আগেই তারা এই চিঠি পেয়েছে। চিঠি দেখেই হঠাৎ আমার মনে হল, আমার কাছেও তার দুই একখানি চিঠি ত আছে, হাতের লেখা মিলিয়ে দেখি না। তাই চিঠিখানি তাদের কাছে চেয়ে নিয়ে, ছুটতে ছুটতে এসেছি। আমার ত ভাল নজর হয় না, তবু মনে হচ্ছে, দুই লেখা এক। তোরা বেশ করে দেখ্ দেখ্ —তোদের কি মনে হয় বল্ দেখি?"

রতন হাসিয়া বলিল—"একই লেখা বাবা। এই দেখুন, বিনোদের আর একখানি চিঠি একটু আগেই এসেছে, নয়নকেও বিনোদ প্রথম মাইনে পেয়ে দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।"—বলিয়া পত্রখানি সে পিতার হাতে দিল।

বৃদ্ধ পত্রখানি হাতে লইলেন, কিন্তু পড়িলেন না; ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"জয় বাবা বিশ্বনাথ! এমনি কৃপা যেনচিরদিন থাকে বাবা!" তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পরদিন সকলে মিলিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভূতের আবির্ভাব

(প্রতীচ্যে)

আমাদের দেশের ন্যায় পাশ্চাত্য দেশেও সরলমতি তরলপ্রকৃতি বালিকা হইতে বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত কোনও কোন স্ত্রীলোকের উপর দেবতা বা অপদেবতার আবির্ভাব হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এক সময়ে তাহাদের কেহ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু অনুসন্ধান সমিতির শিক্ষিত ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য সভ্যমহোদয়গণ পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এবং এই সকল মহিলাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া, যাঁহারা ঘোর নাস্তিক ছিলেন,

পরলোক মানিতেন না এবং আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা এখন আস্তিক হইয়াছেন। মানুষ মরিয়াও যে থাকে, তাহাদের অস্তিত্ব এককালে ধ্বংস হয় না, একথাও তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন।

বিজ্ঞানাচার্য্যগণের মত পরিবর্ত্তন বড় সহজে হয় নাই। তাঁহারা দেখিয়াছেন,:—

(১) কোন ব্যক্তি নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষাই জানে না, তাহার উপর কোন ভিন্ন দেশীয় দেবতা বা অপদেবতার আবির্ভাব হইলে তখন সে সেই বিদেশীয় ভাষা লেখে এবং সেই বিদেশীয় ভাষায় কথা বলে।

অনারেবল্ আই, ডাবলিউ, এডমণ্ড সাহেব আমেরিকার একজন অতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) ছিলেন। তাহার কন্যা লরার উপর কখন কখন অপদেবতার আবির্ভাব হইত। লরা নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষাই জানিত না; কিন্তু তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নয় দশটা ভাষায় কথা বলিতে শুনা গিয়াছে।

একদিন এডমণ্ড সাহেবের বাড়ীতে একটী বড় রকমের মজ্‌লিস্ হইয়াছিল এবং সে মজ্‌লিসে অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গ্রীসের কোন একটী ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত পূর্ব্বে এড্‌মণ্ড বা তাঁহার কন্যা লরা কাহারও পরিচয় ছিল না। এই দিন কন্যা লরার উপর উক্ত আগন্তুকের পূর্ব্বপরিচিত গ্রীস দেশীয় কোন অপদেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল। লরা তাহাকে জানিত না বা চিনিত না। অপদেবতা লরার মুখে তাহার বন্ধুর সহিত অনর্গল গ্রীক ভাষায় কথা কহিয়াছিল এবং সেই সকল কথা শুনিয়া আগন্তুকও সেই অপদেবতাকে নিজ বন্ধু বলিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছিলেন।

Miracle and Modern Spiritualism, p, 178.

(২) কোন একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির উপর কখন কখন অপদেবতার আবির্ভাব হইত এবং সে সময় তাহার জ্ঞান চৈতন্য লোপ হইয়া মোহাবিষ্ট ভাব (Trance) উপস্থিত হইত। এই ভাবের অবস্থায় একদিন একজন দার্শনিক পণ্ডিতের সহিত "ঈশ্বরের ভবিষ্যৎজ্ঞান ও পুরুষকার" সম্বন্ধে উক্ত অশিক্ষিত ব্যক্তির তর্ক হইয়াছিল; তর্কে পণ্ডিতগণকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।

সার্জ্জেণ্ট কক্‌স সাহেব বলেন, তিনি এইপ্রকার ভাবের অবস্থায় উক্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অতি কূট প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং সে অতি বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ন্যায় মার্জ্জিত ভাষায় সেই সকল প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়াছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহাকে সামান্য কোন একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার সে কথার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা হয় নাই।

"What am I", Vol. II. p. 242.

(৩) অতীন্দ্রিয় দর্শন ও শ্রবণ শক্তির বলে মিডিয়মের সহিত প্রেতাত্মার দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার কথাও মিডিয়ম শুনিতে পায়। একথা জনসাধারণে বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু কোন প্রেতাত্মা কোন জড়বস্তু ধরিয়া ঊর্দ্ধে নাড়াচাড়া করিলে, কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইলে বা পেন্সিল ধরিয়া কিছু লিখিয়া গেলে উপস্থিত সকলে প্রেতাত্মাকে দেখিতে না পাইলেও, তাহারা দেখিয়াছে:—

(ক) একটী জড়বস্তু শূন্যের উপর হেলিতেছে দুলিতেছে।

(খ) শূন্যের উপর বাদ্যযন্ত্র ঝুলাইয়া রাখা আছে এবং তাহাতে গানের গৎ বজিতেছে।

(গ) পেন্সিল খাড়া হইয়া আপনা হইতে লিখিয়া যাইতেছে।

Dialectical Report, p. 143.

একখানি শ্লেটের উপর অতি ক্ষুদ্র একটী পেন্সিল রাখিয়া অপর একখানি শ্লেট ঢাকা দিলে তাহাতে লেখা হওয়ার শব্দ শুনা গিয়াছে এবং কয়েক মিনিট পরে শ্লেটখানি উঠাইয়া লইয়া

তাহাতে ভৌতিক তত্ত্বের নানা কথা লেখা হইয়াছে ইহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

(৪) কোন চিত্রকরের প্রেতাত্মা আসিয়া নানা রঙ ফলাইয়া ছবি আঁকিয়া দিয়াছে এবং রঙ সে সময় ভিজা থাকিতে দেখা গিয়াছে।

(৫) প্রেতাত্মাগণ যে-কোন আকার ধারণ করিতে পারেন। জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের যে আকার ছিল, অনেক সময় তাঁহারা সেই আকারে আত্মীয় স্বজনের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন। অনেকে তাঁহাদের সেই আকার দেখিয়াছে এবং তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া না গেলে অনেক আত্মীয়স্বজন তাঁহাদের সেই চির-পরিচিত স্বর শুনিতে পাইয়াছে।

প্রেতাত্মাগণ তাঁহাদের আবির্ভাব হওয়ার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাদের পোষাক, হাতের ছড়ি, ফুল, ফল রাখিয়া গিয়াছেন এবং প্রেত অন্তর্দ্ধান হওয়ার পর ঐ সকল দ্রব্যও শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; তবে কোন প্রেত প্রকৃত কোন ফুল ফল রাখিয়া গেলে তাহা সেই অবস্থাতেই থাকিয়াছে।

(৬) কোন কোন ব্যক্তি প্রেতসিদ্ধ হইয়াছেন এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল সিদ্ধপুরুষের নিকট প্রেতেরা আজ্ঞাবহ থাকিয়া নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকে।

বড় বেশী দিনের কথা নয়, হোসেনখাঁ নামক কোন ব্যক্তি কলিকাতার বড় বড় মজলিসে বসিয়া আদেশ করামাত্র বিদেশীয় ফল ফুল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিত। সমুদ্রবক্ষে জাহাজে বসিয়া উইলসন্ হোটেল হইতে তাহাদের মার্কামারা ডিসে করিয়া গরম গরম নানাবিধ আহারীয় সামগ্রী আনিয়া হাজির করিয়া দিয়াছিল।

ডেভেনপোর্ট নামক দুই ভাইকে দড়াদড়ি দিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলেও, কোন অপদেবতার সাহায্যে তাহারা বন্ধনমুক্ত হইত এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্রাডল (Bradlaugh) প্রভৃতি বিখ্যাত নাস্তিকগণের সাক্ষাতে ডাক্তার স্যাক্সটন্ নামক কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের বাড়ীতে উক্ত ভাই দুইটীকে চেয়ারে বসাইয়া, তাহাদের কোটের উপর দড়ি দিয়া বাঁধিয়া প্রত্যেক গাঁটের উপর শীলমোহর করা হয় এবং তাহারা নড়িতে না পারে এজন্য তাহাদের জুতাসমেত পা কাগজের উপর রাখিয়া পায়ের চারিধারে পেন্‌সিল দ্বারা দাগ দেওয়া হয়। বন্ধন খুলিবার জন্য নড়া চড়া করিয়া পা উঠাইলে পুনরায় যথাস্থানে সেই পা রক্ষা করা কঠিন হইবে এই বিবেচনায় এই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু শীলমোহর করা বন্ধন যে অবস্থায় ছিল তাহাই থাকিল, অথচ ভ্রাতৃদ্বয়ের গায়ের কোট উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং দূরে কে যেন তাহা রাখিয়া দিল।

Miracle - and Modern Spiritualism, p. 178.

ডানিয়েল হোম নামে একজন বিখ্যাত মিডিয়ম ছিলেন। তিনি অগ্নিকুণ্ড হইতে একখণ্ড অগ্নি হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; কখন বা সেই অঙ্গারখণ্ড মাথার উপর রাখিয়া তাহার ধারে চূড়া বাঁধিয়াছেন। হোম্ সাহেব নিজের প্রস্তাব ও অমানুষিক শক্তি দেখাইবার জন্য সেই অঙ্গার মাথা হইতে নামাইয়া আপন জামার পকেটে রাখিয়াছেন; আর কেহ সেই অঙ্গারখণ্ড স্পর্শ করিলে তাহার হাত পুড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু হোম সাহেবের মাথার চুল ও জামার পকেট অবিকৃত রহিয়াছে।

মিঃ ক্রুকস্ এবং আরও অনেক বিজ্ঞানবিৎ বড় বড় পণ্ডিত এই সকল ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু কোন্ শক্তির বলে হোম সাহেব জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া এইভাবে খেলা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা নিরাকরণ করার ক্ষমতা কাহারও হয় নাই।

(৭) প্রেতের আবির্ভাব হইলে মিডিয়ম সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রেত মিডিয়মের হাত ধরিয়া কাগজে নিজ পরিচয় লিখিয়া দিয়াছে। কতকাল হইল যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার জন্মমৃত্যুর সন তারিখ, তাহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা

লিখিয়া দিয়াছে। প্রেত ইহলোক হইতে বিদায় হওয়ার পূর্ব্বে তাহার সহিত মিডিয়মের কিছুমাত্র জানাশুনা ছিল না, অথচ তাহার হাত দিয়া যাহা লেখা হইয়াছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিল হইতে দেখা গিয়াছে।

উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে কাহারও স্বামী বা স্ত্রী, পিতামাতা, ভ্রাতা বা ভগিনীর আত্মা আসিয়া মিডিয়মের মুখ দিয়া অথবা তাহার হাত ধরিয়া এমন গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়াছে যে আর কেহ সে কথার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পরিলেও, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সেই কথা বলা হইয়াছে তিনি তাহা বুঝিয়াছেন এবং মিডিয়মের ভিতর তখন তাঁহার সেই আত্মীয় বিরাজ করিতেছেন ভাবিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন।

(৮) ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সকল মিডিয়ম দেখা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিসেস্ পাইপার নামক কোন ভদ্র মহিলাকে স্যর অলিভর লজ্ সাহেব নিজের বাড়ীতে রাখিয়া বিধিমতে তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার উপর মাঝে মাঝে একপ্রকার অমানুষিক শক্তির আবির্ভাব হইত; সে শক্তি জড় শক্তি নয়। এই শক্তির আবির্ভাব হইলে তাঁহার নিজের সত্তার লোপ হইত এবং সে অবস্থায় বিবি পাইপার স্ত্রীজাতিসুলভ হাবভাব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত ভাষায় জ্ঞানবানের মত কথা বলিতেন।

মিসেস্ পাইপার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যেন কোন আত্মিকের সাহায্যে—

(ক) দূরে—বহুদূরে কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে তাহা বলিয়া দিতেন।

(খ) খামে বদ্ধ শীলমোহর-করা কোন পত্র তাঁহার হাতে দিলে তাহা অনায়াসে তিনি পড়িয়া দিতেন।

(গ) কোন সামগ্রী তাঁহার হাতে দিলে সে দ্রব্য কাহার এবং কিরূপে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা তিনি বলিতে পারিতেন।

(ঘ) তাঁহার অপরিচিত কোন পরিবারের নাম উল্লেখ করিলে সে পরিবারের মধ্যে কোন্ সময়ে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তিনি বলিয়া দিতেন।

(ঙ) যে সকল বিষয় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও জানাশুনা নাই তাহাও তিনি বলিতে পারিতেন।

ইহাঁর অলৌকিক কার্য্যাবলীর অনেকগুলি উদাহরণ, Survival of Man নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

আত্মিকের আবির্ভাব হইলে মিডিয়মের তখন কিছু চৈতন্য থাকে না। সেই অচেতন অবস্থায় আত্মিক মিডিয়মের মুখে কথা কয় এবং তাহার হাত ধরিয়া নিজের বক্তব্য বিষয় লিখিয়া দেয়। কোন কোন আত্মিক মিডিয়মের জ্ঞান হরণ না করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে এবং তাহার মনের অগোচরে কত কি লিখিয়া যায়। এ লেখা যেন মিডিয়মের হাতে আপনা হইতেই বাহির হয় এজন্য ইহাকে Automatic writing বলে।

জুলিয়া এবং এলেন দুইটী সমবয়স্কা যুবতী। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বড় ভালবাসা এবং আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। তাহারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যদি পরলোক থাকে এবং জীবনান্তে সে লোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিবার যদি কোন পথ বা উপায় থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারই অগ্রে মৃত্যু হউক, অপরের নিকট উপস্থিত হইয়া পরলোকের ব্যাপার সমস্ত প্রকাশ করিয়া মনের সংশয় দূর করিয়া দিবে। কিছুদিন পরে জুলিয়ার মৃত্যু হইল; তাহার বিচ্ছেদ এলেনের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল; জুলিয়ার কোন সংবাদ না পাইয়া এলেনের মনে হইল মানুষ মরিলে বুঝি আর কিছুই থাকে না, থাকিলে জুলিয়া নিশ্চয়ই দেখা করিত।

একদিন রাত্রে হঠাৎ এলেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে দেখিতে পাইল, তাহার শয্যাপার্শ্বে জুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার দেহ হইতে একপ্রকার দিব্য জ্যোতি বাহির হইয়া সমস্ত ঘর আলোকিত করিয়াছে। জুলিয়া

কিছুক্ষণ সহাস্যবদনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এলেন বুঝিল, জুলিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কোন কথা ত বলিল না! কয়েক মাস পরে জুলিয়া আর একরাত্রে এলেনকে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু এবারেও তাহার সহিত কোন কথা হইল না। এলেন ভাবিল, জুলিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে কোন কথা বলিতে আসিয়াছিল, হয়ত সে তাহার প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, এলেন শুনিতে পায় নাই। তাহার মন প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল।

Review of Reviews পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেবের সহিত জুলিয়ার পরিচয় ছিল তাহা এলেন জানিত। জুলিয়ার সহিত তাহার যে ভাবে ও যে অবস্থায় দেখা হইয়াছিল, এলেন তদ্‌বিষয় ষ্টেড্ সাহেবকে জানাইল। ষ্টেড্ সাহেব একজন উচ্চদরের মিডিয়ম ছিলেন; পরলোকগত ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ এবং কথাবার্ত্তা হইত। ষ্টেড্ সাহেব জুলিয়ার আত্মাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং এলেনকে তাহার কোন কথা বলিবার থাকিলে তাহা তিনি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

জুলিয়া ষ্টেড্ সাহেবের হাত ধরিয়া, পরলোক সম্বন্ধে এলেনকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিল তাহা পুস্তকাকারে "জুলিয়ার পত্র" (Letters from Julia) নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের ভূমিকায় ষ্টেড্ সাহেব লিখিয়াছেন—"Sitting alone with a tranquil mind, I consciously placed my right hand with the pen held in the ordinary way at the disposal of Julia and watched with keen and sceptical interest to see what it would write."

"একা স্থির চিত্তে বসিয়া আমি আমার দক্ষিণ হস্তে কলমটি সহজভাবে ধরিয়া, তাহা জুলিয়াকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম এবং কি লেখা হয় তাহা দেখিবার জন্য অবিশ্বাস ও আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

এই পুস্তক পড়িয়া কেহ হয়ত বলিতে পারেন, জুলিয়ার পত্রগুলি সমস্তই ষ্টেড সাহেবের কল্পনাপ্রসূত; তাঁহার অজ্ঞাতসারে এবং তাঁহার মনের অগোচরে যে এই সমস্ত পত্র লেখা হইয়াছে একথা হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। পৃথিবী-বিখ্যাত সম্পাদক মহামতি ষ্টেড্ সাহেব নিজে লিখিয়া, মিথ্যা করিয়া জুলিয়ার নাম দিয়া যে এই সমস্ত পত্র প্রকাশ করিবেন, ইহা কোন রকমেই বিশ্বাস করা যায় না।

এ প্রকার আপনা হইতে লেখা (Automatic writing) ষ্টেড সাহেবেরই হাত দিয়া বাহির হইয়াছে তাহা নহে। মিঃ উইলিয়ম ষ্টেণ্টন্ মোজেস্ একজন অতি পবিত্র চরিত্রবান্ নিষ্ঠাবান্ পুরুষ; তিনি বহুকাল যাবত ভৌতিক তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকার পর, তাঁহার হাত দিয়াও এ প্রকার অনেক লেখা বাহির হইয়াছে এবং সেগুলি Spirit Teaching নাম দিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাত দিয়াও বড় বড় আত্মিকের অনেক লেখা বাহির হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত "নব্যভারত" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কোন লোকের হাতের লেখা একই ছাঁদের হইয়া থাকে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আত্মিকের আবির্ভাব হইলে তাঁহারা যখন মিডিয়মের হাত ধরিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন সেই এক ব্যক্তির হাত হইতে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদের লেখা বাহির হইতে দেখা গিয়াছে।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে সকল সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা ধার্ম্মিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের আত্মিকেরা আসিয়া নিজ নিজ জন্মমৃত্যুর সন তাহাদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের মত (মিডিয়মের মত-বিরুদ্ধ হইলেও) তাহার হাতে প্রকাশ করিয়াছেন।

Spirit Identity, Appendix I. p. 78.

উপরে যে সকল অলৌকিক ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে, অপদেবতার

আবির্ভাব হইয়াছে অনুমান করা যায়; কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ হয়ত অপদেবতার আবির্ভাব হওয়ার কথা বিশ্বাস করিবেন না। এজন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

একটী পেন্‌সিল বক্রভাবে থাড়া হইয়া কাগজের উপর লিখিয়া যাইতেছে।

পেন্‌সিলটী জড় পদার্থ, সরল বা বক্রভাবে তাহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই এবং আপনা হইতে পেন্‌সিলের মুখ হইতে লেখা বাহির হইবে ইহাও সম্ভব নয়। ঘটনাটী সম্পূর্ণ অলৌকিক, কিন্তু অনেক পদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত, কৃতবিদ্য লোক এ প্রকার ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

কাগজের উপর পেন্‌সিলে লিখিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইলে, আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে কোন অদৃশ্য জ্ঞানবান্ পুরুষ পেন্‌সিল ধরিয়া লিখিয়া যাইতেছেন ইহা অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে না।

আমরা স্থূল দৃষ্টির সাহায্যে স্থূল বস্তু দেখিয়া থাকি। আমরা পেন্‌সিল থাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিতেছি, পেন্‌সিল হইতে লেখা বাহির হইতেছে দেখিতেছি; অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে তিনি তাঁহার দিব্য চক্ষুর বলে লেখককে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন ও তাহার আকৃতি বলিয়া দিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার কথাও হয়ত অনেকের বিশ্বাস হইবে না।

সকলের না থাকুক, কোন কোন লোকের যে অতীন্দ্রিয় দর্শন-শক্তি আছে, তৎসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা)

আমরা যাহা দেখিতে পাই না, তাহা কথন ছিলনা বা নাই, একথা বলা যায় না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের অতিরিক্ত (Ether) ইথার নামে আর একটী ভৌতিক পদার্থ আছে; উক্ত পদার্থ এত সূক্ষ্ম যে স্থূল দৃষ্টিতে তাহা দেখা যায় না। দেখা না গেলেও উক্ত পদার্থ যে আছে ইহা বিজ্ঞানসম্মত সত্য কথা।

মৃত্যুর পর যে দেহে আমরা পরলোকে যাইয়া বাস করি, তাহা এই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ইথার পদার্থে গঠিত, এজন্য উক্ত দেহের নাম হইয়াছে সূক্ষ্ম দেহ (Etherial body)।

ক্যামেরা (Camera) নামক যে যন্ত্রের সাহায্যে ফটোগ্রাফ উঠান হয়, সে যন্ত্রে অতি সূক্ষ্ম বস্তুও প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কোন সময়ে এক ধনাঢ্যের কন্যা কোন বিখ্যাত ফটোগ্রাফারের নিকট চেহারা তুলিতে গেলে, ছবিতে তাহার মুখের উপর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ পড়িতে দেখা গিয়াছিল; বার বার তিনবার এই দাগ সংযুক্ত ছবি উঠিলে, ফটোগ্রাফার অত্যন্ত লজ্জিত হইল এবং মেয়েটীও তাহার ক্যামেরা থারাপ বলিয়া রাগভরে চলিয়া গেল। সেই রাত্রে তাহার বসন্ত হইয়া সমস্ত মুখ ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটী যথন চেহারা উঠাইতে বসে তথনই তাহারই মুখে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বসন্তের দাগ পড়িয়াছিল; ফটোগ্রাফার তাহা দেখিতে না পাইলেও তাহার ক্যামেরা সেই দাগ ধরিয়াছিল।

ফটোগ্রাফের ক্যামেরায় অপদেবতাগণের সূক্ষ্মদেহ প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের চেহারা উঠিতেছে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে প্রথম অপদেবতার ফটোগ্রাফ তুলা হয়, তার পর ১৮৭২ সালের মার্চ্চ মাসে মিঃ গুপি নামক এক ভদ্রলোক, প্রাচ্য দেশীয় দীর্ঘাকার এক অপদেবতা স্ত্রী-মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়া বসেন। যে চেহারা উঠে তাহাতে উক্ত স্ত্রীমূর্ত্তি ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া যেন আশীর্ব্বাদ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়।

Miracles and Modern Spiritualism p. 195—196.

তাহার পর, পরলোকগত অনেক আত্মীয় বন্ধুর ফটোগ্রাফে চেহারা উঠিয়াছে। মিঃ হাউইট্ (William Howitt) সাহেবের দুইটী ছেলে অনেক দিন হইল

মারা যাওয়ার পর, ফটোগ্রাফে তাহাদের অবিকল চেহারা উঠিয়াছে।

Spiritual Magazine, October, 1873.

ওয়ালেস্ সাহেব (Sir Alfred Russel Wallace) কোন সময়ে তাঁহার নিজের ফটোগ্রাফ তুলিতে বসিলে, তিনবার তাঁহার নিজের চেহারার সঙ্গে তিনটী চেহারা উঠিয়াছিল; তার মধ্যে একটী তাঁহার মৃতা জননী।

Miracle and Modern Spiritualism. p. 169.

আমাদের দেশে কোন সখের ফটোগ্রাফার তাঁহার আত্মীয় দুইটী স্ত্রীলোকের ফটোগ্রাফ তুলিতেছিলেন, একটী দালানের সম্মুখে স্ত্রীলোক দুইটীকে পাশাপাশি বসাইয়া, তাহাদের ফটোগ্রাফ লওয়া হয় এবং চেহারা উঠান শেষ হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত দুইটী স্ত্রীলোকের পশ্চাদ্‌ভাগে আর একজন তাহাদের দুই স্কন্ধে দুইখানি হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরণে একখানী শাড়ী, গলায় হার, হাতে গহনা; তাহার দেহখানি অতি স্বচ্ছ। আমরা এই ফটোগ্রাফখানি দেখিয়াছি। হঠাৎ দেখিলে ছবিতে দুইটী স্ত্রীলোক পাশাপাশি বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিলে তাহাদের পশ্চাতে যে আর এক স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমরা শুনিয়াছিলাম, এই স্ত্রীমূর্ত্তি অপর দুইজন স্ত্রীলোকের অতি নিকট আত্মীয়; অতি অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

পিতামাতা, পুত্রকন্যা, স্বামীস্ত্রী, বা অন্য আত্মীয়-স্বজন, যাহাদের কত কাল হইল মৃত্যু হইয়াছে, ফটোগ্রাফে যদি তাঁহাদের চেহারা উঠান যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে আছেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা যে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর কোনই কারণ থাকে না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

চির-অপরাধী

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালকের বন্ধুত্ব।

দুইটি বালকে কথোপকথন করিতেছিল। একটির বয়স পঞ্চদশ, অপরটির দশ।

"দ্বারিকদা, তুমি তাহলে আর পড়বে না?"

"না ভাই।"

"আমায় যে বাবা বলেছেন, কুষ্টের বড় ইস্কুলে পড়তে হবে। তুমি তাহলে পড়বে না কেন?"

"আমার বাবা বুড়ো হয়ে এসেছেন, আমি এ সময়ে তাঁকে সাহায্য না কল্লে একা তাঁর কষ্ট হবে। আর, চাষবাস দেখতে গেলে বেশী লেখাপড়া কি করে করব বল?"

"তাহলে আমিও বাবাকে বল্‌ব, আমিও কাযকর্ম্ম শিখব, আর পড়ব না।"

"তা কি হয় পাগল! তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, ভাল লেখাপড়া না শিখলে লোকে যে তোমাদের নিন্দে করবে।"

"আর তোমাদের?"

"আমরা কৃষক, লেখাপড়া শিখি আর না শিখি, চাষবাস যদি না করি তাহলেই লোকে নিন্দে করবে।"

"সত্যি দ্বারিকদা, তুমি যাবে না, কুষ্টের বোর্ডিংয়ে

একা থেকে কিন্তু পড়তে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। এর চেয়ে যদি ফেল হতাম, তাহলে এক বছর বেশ দুজনে এখানে পড়তাম।"

"ছিঃ, ও কামনা কি করতে আছে। বেশতো, তুমি ভাল ইংরিজি শিখে যখন বাড়ী আসবে, আমাকেও শেখাবে। তারপর কলেজের সব পড়া শেষ করে এসে, আমাদের গাঁয়ের সবাই যাতে কিছু কিছু শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। আমার মত চাষার ছেলেরাও যেন বাদ না পড়ে।"

"আবার দ্বারিকদা! জান ও রকম করে বল্লে আমার কষ্ট হয়!"

"আচ্ছা ভাই আর বলব না। কিন্তু ভেবে দেখ, চাষা কথাটা তো গা'ল নয়। চাষা মানে যে চাষ করে। নয় কি?"

"তা, লোকে তো আর ও ভাবে কথাটা সব সময়ে ব্যবহার করে না।"

তারপর দুটি বন্ধু মিলিয়া মাঠের দিকে বেড়াইতে বাহির হইল। ইহাদের মধ্যে প্রথমটির নাম কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয়টির দ্বারিকচন্দ্র ঘোষ—জাতিতে গোয়ালা। উভয়েরই বাড়ী এই পাটুলি গ্রামে। এখানকার মাইনর স্কুল হইতে এবার দুজনেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। একজনে পড়িবে না, আর অন্যটিকে পড়িবার জন্য বিদেশে যাত্রা করিতে হইবে—এই চিন্তা উভয়কেই কাতর করিতেছিল। আসন্ন বিচ্ছেদকে সম্মুখে রাখিয়া কেহই তৃপ্তি পাইতেছিল না।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল। তখন দুই বন্ধু গৃহের দিকে ফিরিল। বাহুদ্বারা পরস্পরের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া দুইজনে অন্ধকার পথে ফিরিতে ফিরিতে, তাহাদের আসন্ন বিচ্ছেদকে এই করিয়া সহনযোগ্য করিয়া লইল যে, প্রায় প্রতি শনিবারে কৃষ্ণধন বাড়ী ফিরিবে এবং তাহার পঠিত অংশগুলি সব দ্বারিককে বলিয়া দিবে, এইরূপে বিদ্যার্জনে দ্বারিকের বিঘ্ন ঘটিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বারিকের সাহস।

তারপর বৎসর চারি পাঁচ কাটিয়াছে। গুডফ্রাইডের ছুটিতে কৃষ্ণধন দুইদিন হইল বাড়ী আসিয়াছে। বেলা আন্দাজ চারিটার সময় দ্বারিক আসিয়া ডাকিল—"কেষ্ট বাড়ী আছ?"

কৃষ্ণধন ভিতর হইতে উত্তর দিল, "এস দ্বারিকদা, আছি।"

দ্বারিক ভিতরে আসিল।

কৃষ্ণধন দ্বারিকের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছু খবর আছে।"

দ্বারিক একটু গম্ভীরমুখে বলিল, "সত্যিই খবর আছে; চল বাইরে যাই।"

তখন দুইজনে বহির্বাটিতে আসিয়া বসিল। কৃষ্ণধন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

"আজ আবার সেই বাবু ক'জন এসেছেন।"

"সেই ঘোষপুকুরেরই?"

"হ্যাঁ।"

"তাদের সেদিন পাড়ার লোকেরা কত করে বারণ কল্লে তবু এলেন তাঁরা?"

"গরীবের বারণে কে কবে কাণ দেয় বল!"

"এ ভারী অন্যায়; আজ তাঁদের যেমন করে হোক্ বাধা দিতেই হবে।"

"চল তবে এইবেলা যাই। প্রথমে ভাল কথার চেষ্টা করতে হবে; তাতে না হয়, অগত্যা অন্যপথ নিতে হবে।"

কৃষ্ণধন বাড়ীর ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি জামা জুতা পরিয়া আসিল। দুইজনে তখন ঘোষপুকুর উদ্দেশে গমন করিল।

এই পুকুরটী গ্রামের মধ্যস্থানে অবস্থিত এবং ইহার জল ভাল বলিয়া দ্বারিক ও কৃষ্ণধনের চেষ্টায় গ্রামবাসীরা এই জল শুধু পানীয়ের জন্য ব্যবহার করে। স্নানাদির জন্য অন্য পুকুর আছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে

কয়েকটী বাবু মিলিয়া এই পুকুরে মাছ ধরিতে আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা গ্রামের জমিদারের বন্ধুলোক, এজন্য গ্রামবাসীরা ভয়ে কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু পল্লীনারীরা অপরাহ্লে জল লইতে আসিয়া, দূর হইতে চশমাধারী, দীর্ঘকেশ ও ক্ষীণ কলেবর বাবুদিগকে দেখিয়া, শূন্য কলসী লইয়াই গৃহে ফিরিয়াছিল। তার পর সন্ধ্যা অতীত হইলে বাবুরা চলিয়া গিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, তবে তাহারা জল আনিতে সাহস করিয়াছিল।

এ সংবাদ অবগত হইয়া, তাহার পরদিন দ্বারিক ঐ সময়ে আসিয়া বাবুদের বিনীতভাবে বলিয়াছিল যে এ পুকুরে মেয়েরা বিকালে জল লইতে আসে এবং তাঁহারা এ সময়ে এখানে থাকিলে তাহাদের বড়ই অসুবিধা হয়। তাঁহারা যদি অন্য পুকুরে যান, বা এই পুকুরেই দুপুরে আসিয়া অপরাহ্লে চলিয়া যান, তাহা হইলে সকলেরই সুবিধা হয়।

এইরূপে বাধা পাইয়া বাবুদের আত্মাভিমান বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। উত্তরে তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, তাঁহারা বাঘ ভালুক ইত্যাদি কিছুই নহেন এবং মানুষ, তাহা পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, ধরিয়া খাওয়া তাঁহাদের ব্যবসা নহে। কাযেই মেয়েদের আসিতে বাধা কি? যদি তাহাদের এতখানিই লজ্জাশীলতা, তাহারা যেন সকালে বা দুপুরে জল লইয়া যায়।

দ্বারিক তখন দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল যে এরূপ কথা, এরূপ কার্য্য, যাঁহারা আপনাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচয় দেন, কখনই তাঁহাদের উপযুক্ত নহে। আপন আপন মান রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাঁহারা যদি পল্লীকৃষকের সম্মান না রাখেন, পল্লীবাসীরাও তাঁহাদের সম্মান রাখিবে না এবং সে ব্যবস্থা উভয় পক্ষের কাহারও প্রীতিকর হইবে না।

বাবুরা তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত উঠিলেন এবং অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন তাঁহারা আসিবেনই, চাষারা যাহা করিতে পারে তাহাই যেন করে।

দ্বারিক সে কথায় কাণ দেয় নাই, কারণ তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার পর দুই তিন দিন বাবুরা আসেন নাই; আজ আবার কি ভাবিয়া দেখা দিয়াছেন।

আজ যখন দ্বারিক, কৃষ্ণধন ও গ্রামের আর একটী যুবককে লইয়া মহিষপুকুরে আসিল, তখন বাবুরা সবেগে মৎস্য-মৃগয়া আরম্ভ করিয়াছেন। গতবার আসিয়াছিলেন তিনজন, এবার ছয়জনে একটু দলপুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

দূর হইতে দ্বারিকদের আসিতে দেখিয়া, যাঁহারা পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন দ্বারিকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, বোধ হয় পূর্ব্ববারের ব্যাপারটা বলিয়া দিলেন। নবাগতদের মধ্য হইতে একজন একটা এয়ার গান আনিয়াছিলেন। সেটা মাটির উপরই পড়িয়া ছিল। বাবুটি তাড়াতাড়ি সেটা হাতে তুলিয়া লইলেন। দ্বারিক এয়ার গান চিনিত। বাবুকে শস্ত্রপাণি হইতে দেখিয়া সে শুধু একটু হাসিল।

নিকটে আসিয়া দ্বারিক বলিল, "আপনাদের সেদিন এত করে' বারণ কল্লাম, আবার আজ এসেছেন কি বলে! আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের ব্যাভার কি এ রকম হওয়া উচিত?"

এয়ারগানধারী বাবুটি বলিলেন, "ব্যাপারটা কিসে খারাপ হ'ল ঘোষের পো, যে তুমি মুড়ুলি কত্তে এলে?"

দ্বারিক বলিল, "আপনাদের বাড়ীর মেয়েরা যেখানে স্নান করেন বা জল তোলেন, সেখানে যদি আমরা কেউ দাঁড়িয়ে থাকি, আপনারা তখন কি করেন, বলুন তো?"

বাবুটি ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "তা হলে তাদের চাবকে দোরস্ত করি।"

ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াও দ্বারিক বলিল, "তা হলে জানবেন, চাবুক না থাকলেও বাঁশের লাঠির অভাব এখানে হবে না। আর, ওই এয়ার গানটা দিয়ে বাড়ীতে পায়রা তাড়াবেন, ওটা দেখিয়ে আর আমাদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করবেন না।"

বাবুটি ইহাতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। কোন উত্তর আর চট্ করিয়া মুখে তাঁহার যোগাইল না।

তখন অপর একটি বাবু তাঁহার সাহার্য্যার্থ আসিলেন। তিনি খুব উগ্রস্বরেই বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে কথা কইতে এসেছ? একি তোমার একার পুকুর যে মানা করতে এসেছ? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে শেখনি?"

দ্বারিক একটু তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "আজ্ঞে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে খুব জানি, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে কি করে কথা কইতে হয় তা এখনও শিখে উঠতে পারিনি।"

"কি শালা ভেমো গয়লা কোথাকার!"—বলিয়া একটি বাবু সহসা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণধন তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে রুখিয়া দাঁড়াইল। একটা হাতাহাতির উপক্রম হইয়া উঠিল।

দ্বারিক কৃষ্ণধনকে বাধা দিয়া আপনার লাঠিগাছটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—"বেশী কথা বাড়াবেন না। যদি ভাল চান তো এখনি এখান থেকে সরে পড়ুন।"

দ্বারিকের মূর্ত্তি দেখিয়া একজন বুদ্ধিমানের মত বলিল—"চল হে, চল, আজ যাওয়া যাক। নরহরি বাবুকে বলে এর শোধ তোলা যাবে।"—নরহরি বাবু জমিদারের ম্যানেজার।

ছিপ, এয়ার গান ইত্যাদি লইয়া বাবুরা স্থানত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় একজন শুধু বলিয়া গেলেন —"ভেবনা তোমাদের ভয়ে যাচ্চি। এর একটা প্রতিবিধান করতে হবে বলেই আমরা উঠ্‌লাম।"

ইহার উত্তরে দ্বারিক শুধু একটু হাসিল মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষক দম্পতী।

দ্বারিক আজ অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া, মাথা হইতে বাজারটা নামাইয়া বলিল, "বৌ, শীগ্‌গির একটু তামাক দে ত, আজ ভারি হায়রানি হয়েছে।"

দ্বারিকের স্ত্রী দ্রৌপদী তখন চুলগুলি মাথায় চূড়াকারে বাঁধিয়া রন্ধনে নিযুক্তা ছিল। স্বামীর আহ্বান শুনিয়া সে হাত ধুইয়া ও মাথায় একটু কাপড় তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিল।

দ্বারিক তখন শয়নগৃহের দাওয়ায় বসিয়া, মাথায় "বিড়া" করিবার বস্ত্রখণ্ড দিয়া বাতাস খাইতেছিল। দ্রৌপদী ঘরের ভিতর হইতে পাখাখানি আনিয়া স্বামীর নিকটে দিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তো খুব সকালে ফিরেচ?"

গামছা দিয়া ঘামটা বেশ করিয়া মুছিয়া দ্বারিক বলিল—"আরে, প্রায় সব অদ্দেক দামে বিক্রি করে এসেছি। চারটে টাকা ঠিক আজ হত, আর কোথায় পেলাম ন'সিকে!"

"তা, একটুর জন্য কেন অদ্দেক দামে দিলে? আর একটু দেরী করলেই তো হ'ত।"

"আরে, সাধে কি দিলাম। তোলার জ্বালায় আর নায়েবের অত্যাচারে। টোলের তোলা, জমিদারের পুরুতের তোলা, ম্যানেজারের তোলা, নায়েবের তোলা, চারিটা ঠাকুরবাড়ীর তোলা—এই করেই অর্দ্ধেক জিনিষ উঠে যাবে, তার বেচবো কি! তা, নিবি বাপু, যা হাতে করে দেবো তাই নে! তা নয়, সব সেরা জিনিষগুলি নিতে হবে। যেন সব নায়েবের পুষ্যিপুত্তুর!"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া দ্রৌপদী রান্নাঘর হইতে আগুন লইয়া আসিল। দাওয়া হইতে হুঁকা লইয়া তাহার উপর কলিকাটী বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে স্বামীর হাতে দিল। মনের আক্রোশ মিটাইয়া হুঁকায় দুই একটা টান মারিতেই দ্বারিকের মেজাজ একটু নরম হইয়া আসিল।

দ্রৌপদী তখন জিজ্ঞাসা করিল—"তা নায়েব কি অত্যাচার করেছে বলছিলে?"

"সেই কথাই ত বল্‌ছিলাম। প্রথমে যেতেই, এক বামুনঠাকুর পাকা কলা এক ছড়া পছন্দ করে নিয়ে দাম দিচ্ছেন, এমন সময় নায়েবের চাকর এসে খপ্ করে সেই ছড়ায় হাত দিয়েছে। তাকে ভাল করে বল্লাম—

এ ছড়া ঠাকুরমশাই নিয়েছেন, তোমাকে অন্য কলা দিচ্ছি। সে তাই শুনে রোক্ করে বলে কিনা, তা হোক ওই কলাই আমার চাই, নায়েব মশায়ের দরকার। আমারও রাগ হয়ে গেল, বল্লাম—এ কলা আমি খদ্দেরকে বেচেছি, কার সাধ্য এর থেকে একটা কলা নেয়। নিতে হয় অন্য ছড়া থেকে নেও, নইলে পাবে না। সে আর কলা নিলে না, শাসিয়ে গেল—কেমন করে তুমি এই বড়বাজারে বেচ্‌তে আস আমি দেখে নেব। ঠাকুর মশায় ভালমানুষ, বল্লেন, না হয় বাপু এঁর থেকেই নায়েবের তোলা দেও, আমি আর এক ছড়া বেচে নিচ্ছি। বউনির সময় দেবতা ব্রাহ্মণে যা নিয়েছেন তা কি আমি আর কাউকে দিতে পারি! তাঁকেই সেই কলা দিয়ে দিলাম।"

একটু চিন্তিত হইয়া দ্রৌপদী বলিল—"নায়েবের লোককে রাগিয়ে দিলে, শেষে আবার গোলমাল বাধিয়ে না বসে।"

কল্পনায় খুব ক্রোধ দেখাইয়া দ্বারিক বলিল—"ভারি বয়েই গেল তা হলে। মোল্লার দৌড় ত মসজিদ্ পর্য্যন্ত, না হয় ও বাজারে যাব না। আর দু পা এগিয়ে মুখুয্যেদের বাজারে যাব।"

"সে তো ঠাকুরতলায়; আবার একক্রোশ বেশী হাঁট্‌তে হবে।"

"তা হয় হবে। শরীর ভাল থাক্, দু'দশ ক্রোশ পথ হাঁট্‌তে ভয় করিনে।"

দ্রৌপদী স্বামীর সুস্থ সবল ও কর্ম্মঠ দেহের প্রতি সগর্ব্বে চাহিয়া বলিল—"মা দুগ্‌গা তোমার দেহটা যেন ভাল রাখেন"—বলিয়া রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। একটু পরেই ছোট একটি পাথরের বাটীর একবাটী সরিষার তেল আনিয়া স্বামীর কাছে রাখিয়া বলিল—"তুমি তা হলে নেয়ে এস, রান্না হয়ে গিয়েছে।"

সেই একবাটী তেল বেশ করিয়া গায়ে মাখিয়া, দ্বারিক বড়পুকুরে স্নান করিতে গেল।

দ্বারিক ঘোষ জাতিতে গোয়ালা। বাটবছর তাহাদের নাবালক হইবার প্রকৃত বয়স, এই অপবাদ সত্ত্বেও হরিপুরের গোয়ালারা দ্বারিক ঘোষকে ২০ বছরেই সাবালক রায় দিয়াছিল; এবং পাশের গাঁয়ের প্রহ্লাদ ঘোষ এই বয়সেই মাত্র কুড়িগণ্ডা টাকা পণ লইয়া দ্বারিক ঘোষের সহিত তাহার দশ বছরের মেয়ে দ্রৌপদীর বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিল। আত্মীয় প্রতিবেশী সকলেই তখন বলিয়াছিল—"দ্বারিকের বাপ নটবরের কপাল ভাল; সস্তায় অতবড় মেয়ে পেয়ে গেল। ওর যা অবস্থা, তাতে পেল্লাদ ঘোষ পঞ্চাশ গণ্ডা টাকা খুব আদায় করতে পারত। তুমিও যেমন, ও জলেই জল বাধে!"

বিবাহের পূর্ব্বে দুই একজন প্রহ্লাদ ঘোষের বাড়ী আসিয়া তাহার দারুণ ক্ষতি ও মতিভ্রমের কথা তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে ষাটগণ্ডা টাকা দাবী করিবার পরামর্শ দিয়াছিল। প্রহ্লাদ ঘোষের মনও যে ওদিকে একটু ঝোঁকে নাই তাহা নয়। কিন্তু প্রহ্লাদ-গৃহিণী সে কথা শুনিয়াই তর্জ্জন করিয়া স্বামীকে বলিয়াছিল—"কেমন বেয়াকেলে নোক গো তুমি! আমার সবে এই একটা মেয়ে। কার জন্যে টাকা নিতে হবে? কে ভোগ করবে শুনি? শেষে বেশী টাকা চাইতে গিয়ে, অমন সোণার সম্বন্ধটা ঘুচিয়ে এস! ওসব হবে টবে না। কিছু রেখে মেয়েকে গহনা দিতে হবে। ও মিন্‌সেগুলোকে তাড়িয়ে দেও। ওরা নোক ভাল নয়; দেখ্‌চনা দু কোশ হেঁটে ভাঙ্গচি দিতে এসেছে। মরণ আর কি!"

অতি সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরাল হইতে প্রহ্লাদ-গৃহিণীর এই কথাবার্ত্তা শুনিয়াই, নটবরের প্রতিবেশীরা তৈয়ারী তামাক ত্যাগ করিয়াই উঠিয়া পড়িয়াছিল।

এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে তথাকথিত ভদ্রসমাজের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। ছেলের বিবাহে ও মেয়ের বিবাহে পণ লওয়া দুই-ই প্রকৃতপক্ষে সমান অপকর্ম্ম। শেষেরটি মন্দের ভাল; কারণ পয়সা অভাবে ছেলের বিবাহ না ঘটিলে কোন সমাজেই ছেলের বা ছেলের বাপের জাতিনাশের ব্যবস্থা দেয় না। কিন্তু প্রথমটি ভীষণতর ও বড়ই সাংঘাতিক এবং সমাজের চক্ষে

উহা যে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তাহা মৃত সমাজের স্পন্দনহীনতারই পরিচয়।

দ্বারিকের বিবাহের দুই বৎসর পরেই নটবরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। দ্বারিকের মা পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন।

দ্বারিক পিতার ক্ষেত খামার সবই বজায় রাখিয়াছে। বাড়ীতে আটটী গাই গরু। সকালে দুধ যোগান দিয়া এবং দুপুরে ওপারের 'চক্কত্তি' বাবুদের বাজারে 'তরকারীপাতি' বেচিয়া দ্বারিক বেশ দুপয়সা রোজগার করে।

দ্বারিকের বয়স এখন ত্রিশ, দ্রৌপদীর কুড়ি। দুজনেরই অটুট স্বাস্থ্য। যৌবনের উৎসাহ, বল, অনুরাগ তাহাদের জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের একটিমাত্র দুঃখ ও অভাব—আজিও তাহারা নিঃসন্তান।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-সমালোচনা

সারনাথের ইতিহাস। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ প্রণীত। ।৵+২+২+১২৮+।৴• পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গ্রন্থকার বারাণসীতে অধ্যয়নকালে মধ্যে মধ্যে সারনাথে গমন করিতেন ও সারনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভারতী, আর্য্যাবর্ত্ত, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী, মানসী প্রভৃতি পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ধারাবাহিক ভাবে অন্যান্য উপাদান লইয়া এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির প্রারম্ভে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী ক্ষুদ্র একটি ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সারনাথের ঐতিহাসিক প্রাধান্যের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধগণের মহাতীর্থ চারিটি, কপিলবাস্তু, বুদ্ধগয়া, কুশীনগর ও সারনাথ। পালি গ্রন্থসমূহে সারনাথ নাম দেখা যায় না। মিগদায়, মিগদাব বা ইসিপতন এই নামেই পালিগ্রন্থ সমূহে, সারনাথ অভিহিত। সারনাথের বহু কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া ছিল, খননের ফলে ও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া খননলব্ধ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হওয়াতে, এখন সর্ব্বসাধারণের নিকট সারনাথের গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, "সারনাথের মিউজিয়ম ও ধ্বংসাবশেষ ঐতিহাসিকের ও প্রত্নতত্ত্ববিদের একটী অবশ্য দর্শনীয় শিক্ষাগার।"

কি কি কারণে সারনাথের এত প্রাধান্য তাহা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সারনাথে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। এইখানেই তাঁহার চারিটি মহাসত্যের প্রথম প্রচার। সেই বিষয় স্মরণ করিয়াই পরে এইখানে অশোক অনুশাসন স্তম্ভ গঠিত হয়, কনিষ্কের সময় বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়, গুপ্তরাজগণের সময় বুদ্ধপ্রতিমা নির্ম্মিত হয়, বৌদ্ধতান্ত্রিকযুগে তারাদেবী, মারীচী প্রভৃতি মূর্ত্তি গঠিত হয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার A History of fine Art in India and Ceylon গ্রন্থে ১৪৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে অশোকের কর্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় ভাস্কর্য্যবিদ্যার ইতিহাস এক সারনাথে প্রাপ্ত মূর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ হইতেই গঠিত হইতে পারে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকারের গঠন প্রণালী ও শিল্পের এরূপ একত্র সমাবেশ অন্যত্র দুর্লভ। অন্য হেতু ছাড়িয়া দিলেও এই একমাত্র কারণেই সারনাথের ইতিহাস সর্ব্বসাধারণের সমাদরের যোগ্য।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধর্ম্মের মূর্ত্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলেও সারনাথের সংগ্রহ পরিদর্শন অপরিহার্য্য। বৌদ্ধ জাতকের ঘটনাবলী এখানে বিবিধ প্রস্তরফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে, এই সকল হইতে মিথলজি সংক্রান্ত নানাবিষয় প্রকটিত হইতে পারে। কেবল তাই নহে, সারনাথে আবিষ্কৃত বহু লিপি হইতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকটি মূল্যবান্ উপাদান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। "এই সারনাথে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের

সময়ের ব্রাহ্মীলিপি, খ্রীষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর গুপ্তলিপি, এমন কি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর দেবনাগর লিপি ও বঙ্গলিপি এখনও স্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।" (ভূমিকা ১ম পৃষ্ঠা)। এই সকল কারণে আলোচ্য গ্রন্থখানি বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পাঠকের কৌতূহলতৃপ্তি ও জ্ঞানলাভের সহায়ক হইবে।

প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে সারনাথের প্রাচীন নামগুলির অর্থ ও উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার Senart এর মত গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, পালিসাহিত্যে 'ইসিপতন' নামে সারনাথ অভিহিত। 'ঋষিপত্তন' হইতে 'ইসিপতন' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ঋষিগণের পত্তন বা বাসস্থান ইহাই ঋষিপত্তনের অর্থ। অপভ্রংশে ঋষিপত্তন ঋষিপতন-রূপে পরিণত হয়। প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে ঋষিপত্তন ঋষিবদনরূপে উচ্চারিত হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে এই সাধারণ অর্থ গৃহীত না হইয়া এক গল্প সৃষ্টি করিয়া এই নামের ব্যাখ্যা করা হয়। গল্পে আছে, ঋষিগণ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের শরীর এইস্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই কারণে এই স্থানের নাম ঋষিপতন বা ইসিপতন।

পালিসাহিত্যে সারনাথের আর একটি নাম মিগদায় বা মিগদাব। মৃগদাব অর্থে মৃগের বিচরণ ক্ষেত্র বন। পরে এই সরল অর্থও নিম্নলিখিত রূপক গল্পে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত এক মৃগের আত্মোৎসর্গ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে এই স্থানের মৃগ বধ করা হইবে না। মৃগগণকে এই ভূখণ্ড 'দায়' করা (বা দান করা) হইল বলিয়া ইহার নাম মৃগদায় হইয়াছে।

সারনাথ নামটি আধুনিক। শারঙ্গনাথ শব্দ হইতে সারনাথ নামের উৎপত্তি। শারঙ্গনাথের অর্থ মৃগরাধিপতি। ইহাও মৃগপরিপূর্ণ বনের উপযুক্ত সংজ্ঞা। পরে কিন্তু এই স্থলে এক মহাদেবের মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং মহাদেবের শারঙ্গনাথ নাম প্রদত্ত হয়। ইহা বৌদ্ধ তীর্থকে হিন্দুতীর্থে পরিণত করিবার প্রয়াস বলিয়া অনুমিত হয়।

বৃন্দাবন বাবু বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থখানিতে সারনাথের প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ অবধি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি পালি-গ্রন্থ, অনুশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি আলোচনা করিয়া গবেষণার ফল সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। সারনাথ-সংক্রান্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। আশা করি শুধু ঐতিহাসিকের নিকট নহে, সারনাথযাত্রী মাত্রেরই নিকট এই গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

প্রজাপতি (গল্পগ্রন্থ)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বি-এ প্রণীত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ১৬৬ পৃষ্ঠা। শ্রীবাদলচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।৹

ইহা একখানি গল্পপুস্তক; কিন্তু এই রহস্যময় নাম করণে গ্রন্থকারের বাহাদুরি আছে। আমরা প্রথমে নাম দেখিয়া ইহার উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে পারি নাই। আজকালকার শিক্ষিতা হাব-ভাব-বিলাসময়ী উদ্দেশ্যহীনা বঙ্গীয়া রঙ্গিনীগণকেই লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার উক্ত নাম মনোনীত এবং তদনুরূপ চরিত্র অবলম্বন করিয়া আধুনিক সমাজের সামান্য অংশ প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থকার তিনটি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।—১ম, "বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা-স্বরূপ আমাদের বংশধরগণ অন্য সকল অংশে হৃদয়বান হইয়াও ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে কিরূপ অবলম্বনহীন ও লক্ষ্যশূন্য জীবনযাপন করিতে বাধ্য হন ইহাতে আভাসে তাহা দেখাইবার প্রয়াস" ২য়, "পার্থিব ভালবাসা পরিণামে অবিশ্বাসীকেও কিরূপে জগৎস্বামীর শরণাপন্ন করিতে বাধ্য করে, তাহা ইঙ্গিতে প্রদর্শন" এবং ৩য়, "আধুনিক জীবন-সংগ্রামে যে আলালের ঘরের দুলালের স্থান নাই, জীবিত জাতির জননী হইতে হইলে আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মীগণের তাহা বুঝা কর্ত্তব্য; সে কর্ত্তব্যও ইঙ্গিতে প্রদর্শন।" গ্রন্থকার তাঁহার কল্পিত ইংরাজী শিক্ষিত বিলাত-প্রত্যাগত সমাজ-হিতৈষী অসিতকুমার ও উচ্চ-শিক্ষিতা স্বেচ্ছাচারিণী অরুণা এই দুইটী প্রধান নায়ক-নায়িকার চরিত্রের উন্মেষণ দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। তবে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এরূপ সমাজের বিরাট সম্পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত করা দুষ্কর; অসিতকুমারের চরিত্র উজ্জ্বল করিবার অভিলাষে আধুনিক শিক্ষিত লক্ষ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণের চিত্র অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার পার্শ্বে অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। আশা করি গ্রন্থকার তাঁহার পরবর্ত্তী প্রয়াসে বিশদভাবে ইহা প্রদর্শন করিবেন। এখনকার সমাজে ঐরূপ চরিত্রের পূর্ণ বিশ্লেষণ অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা বেশ মার্জ্জিত, প্রাঞ্জল ও গ্রাম্যতাদোষ বর্জ্জিত। ছাপা ও বাঁধাও সুন্দর।

"বাণীসেবক।"

গান।—দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস। শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, ১৪৮, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেটে মুদ্রিত ও ১৯ নং রামচাঁদ নন্দীর লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী ১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৹

বহিখানি কতকগুলি ভগবদ্-বিষয়ক গানের সমষ্টি। রচয়িতার যখন যেরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছে সেইরূপ ভাবের গান রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। অধিকাংশ গানই "আগমনী" ও "বিজয়া"র ভাব অবলম্বনে রচিত। গানগুলি মোটের উপর আমাদের ভালই লাগিল। বেশ ভক্তিভাবপূর্ণ এবং রচনাও ভাল। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত "বঙ্গবাসী" সম্পাদক বিহারীবাবু বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাণীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নানাবিষয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করিতেছেন ইহা বড়ই আনন্দের কথা। আমরা পাঠকগণকে নমুনাস্বরূপ দুইটী গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

বিভাস—দ্রুত ত্রিতাল।

(১) "এই ত আবার আসতে হল, না, এসে কি থাকতে পার।
কাঁদলে ছেলে মা মা বলে দৌড়ে এসে কোলে কর॥
"মায়াতীতা" "পাষাণী" নামের কর কিসের অহঙ্কার।
ছেলের এক বিন্দু অশ্রু দেখে ঝরে আঁখি অনিবার॥
তবে আর কেন মাগো মিছামিছি গুমর কর।
ছেলে তোমায় চায়না, তবু ছেলের জন্য ভেবে মর॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

"যদি জেগেছে চিনেছে মা তোমায়।
দেখো যেন অবসাদে আর না ঘুমায়॥
দেখিয়া তোমার মুখ, ঘুচে গেল সব দুখ,
আশায় নাচে মা বুক, দেখো যেন আর না পিছায়॥
আকাশ মেদিনী জুড়ে,—সাধনার সৌধ-চূড়ে,
আজি যে নিশান উড়ে, ঝড়ে যেন পড়ে নাহি যায়॥"

পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা ভাল। পাঠকগণ এই পূজার সময়ে এক একখানি ক্রয় করিয়া "আগমনী" গানগুলি উপভোগ করিতে পারেন। গানগুলির ভাবানুসারে শ্রেণীবিভাগ এবং একটি সূচিপত্র থাকিলে ভাল হইত।

বিধান-গীতিমালা। শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ প্রণীত। কলিকাতা, ১এ নং রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবলক্রাউন, ১৬ পেজী, ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৹।

এখানি কতকগুলি ধর্ম্মভাবোদ্দীপক গীতির সমষ্টি। রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া গানগুলি রচনা করিয়াছেন। ভাষা ও রচনায় লালিত্যে এবং ভাবের মাধুর্য্যে গানগুলি বেশ সরস, সজীব এবং ভাবময় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচয়িতা চিন্তাশীল, ভাবুক এবং কবি। তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি যে প্রকৃত প্রাণ ও দরদ দিয়া রচিত, গানগুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যুগপৎ ভক্তি ও কবিত্ব রসের সংমিশ্রণে গানগুলি এতই মধুর ও উপভোগ্য হইয়াছে যে, আগ্রহের সহিত পাঠ না করিয়া থাকা যায় না। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তিবিষয়ক গানে অধিক মাত্রায় কবিত্বের প্রভাব অথবা কবিত্বের দিকে লক্ষ্য থাকিলে, গান প্রাণস্পর্শী হয় না। আমাদের আলোচ্য গানগুলিতে যে সে দোষ স্পর্শ করে নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইহাই গানগুলির বিশেষত্ব। আমরা ভক্ত এবং প্রেমিক কবির দুইটি গান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ তাহার পরিচয় গ্রহণ করিবেন :—

ঝিঁঝিট।

"কাছে এসে ধীরে ডেকে গেলে ফিরে,
আমার দুয়ারে সাড়া না পেয়ে।
কত আপনার তুমি যে আমার
তব পানে তবু দেখিনি চেয়ে।
উন্মাদ আমি অধীর পরাণে,
বাহিরিনু পথে আকুল নয়নে,
সুখে গান গাই শতদিকে ধাই,
হেসে যাই ভেসে তরণী বেয়ে।
কখন্ ঘনায়ে এল গো আঁধার,
সীমা রেখাহীন কাল পারাবার,
ফিরি দিশেহারা, কোথা ধ্রুবতারা
পার কর পেয়া পারের নেয়ে।"

শ্রমজীবীদিগের উপলক্ষ্যে।

"উঠাও তাদের হাত ধরে আজি অভাবে যাহারা ম্লান।
কর্ম্ম জ্ঞানের আলোকে শুনাও নব জীবনের গান।
হেসনা বিজ্ঞ, নহে ছেলেখেলা, অজ্ঞ বলিয়া করিওনা হেলা,
আছে অধিকার মানুষ হবার, মূক যারা ম্রিয়মাণ।
কলিজা কাটিলে এক মত রাঙ্গা, একমত সব প্রাণ।
সমাজ শাসন-দলন-দমন জাতিকুল অভিমান।
দরদী প্রেমের তীর্থ-সলিলে করুক পুণ্যস্নান।
পঙ্ক হইতে, অঙ্কে তুলিয়ে, দাও ইহাদের ললাটে বুলিয়ে
স্নেহের পরশ, করুক সরস এই সব ছোট প্রাণ,
লভিবে শিক্ষা, লভিবে দীক্ষা, লভিবে ঋদ্ধি মান।"

আশা করি পুস্তকখানি পাঠকগণের নিকট সমাদর লাভ করিবে। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

সীতানাথ বা গৃহস্থ সন্ন্যাসী—(উপন্যাস) শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা ১৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী" প্রেসে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবলক্রাউন, ১৬ পেজী, ৩০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৸০

ইহা একখানি গার্হস্থ্য উপাখ্যান। সুচিন্তিত ও সুলিখিত। গ্রন্থকার নিবেদনপত্রে বলিয়াছেন—"কাল্পনিক কথা যেরূপ হইলে জনানুরঞ্জনের যোগ্য হইয়া থাকে, এ গ্রন্থ সেরূপ নহে; সুতরাং ইহা দ্বারা কাহারও চিত্তরঞ্জন হইবে এমন আশা করা যায় না।" আমরা বলি, বক্ষ্যমান উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া কাহারও "চিত্তরঞ্জন" হউক বা না হউক, ইহা দ্বারা পাঠক-সাধারণের যে প্রভূত শিক্ষা ও উপকারলাভ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সংসারে ধর্ম্মের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তাহারই একটা সুস্পষ্ট চিত্র গ্রন্থকার এই উপন্যাসে অতি বিশদ-ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। আখ্যানাংশ পুরাতন হইলেও বর্ণনাকৌশল, চরিত্র-সমাবেশ ও চরিত্রাঙ্কন-পটুতা এবং রচনা-মাধুর্য্যে গ্রন্থখানি যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি সরস ও উপভোগ্য হইয়াছে। গৃহস্থ সন্ন্যাসী সীতানাথের সংসারে সীতানাথ স্বয়ং, দেবচরিত্র দৌহিত্র অমর এবং অমরের প্রথমা পত্নী (যিনি ভাগ্য বিপর্য্যয়ে কিছুকাল নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় থাকিয়া পরে সীতানাথের সংসারে "মায়া" এই ছদ্মনামে পুনর্ম্মিলিতা হন) পতিপ্রাণা পদ্মা—এই তিনটিই শ্রেষ্ঠ চরিত্র। অপরদিকে সয়তানের চিত্র—তাঁহার জামাতা তারাচাঁদ, তারাচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুটিলা ও মুখরা রাধারাণী, এবং তাঁহাদের আদালের ঘরের দুলাল দুশ্চরিত্র মাণিকচাঁদ। তারপর অমরের দ্বিতীয় পক্ষের দুর্ব্বিনীতা ও গর্ব্বিতা স্ত্রী ধনীকন্যা প্রভা। এই সকলকে লইয়াই সীতানাথের সংসার বা দেবাসুরের অভিনয় ক্ষেত্র। এই দেবাসুরের অহরহ সংগ্রামে গ্রন্থকার নরদেবতা সীতানাথের চরিত্রে যে অসাধারণ চিত্তবল, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা এবং সত্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, মনে হয় তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। সীতানাথের মহিমামণ্ডিত চরিত্র সর্ব্বত্রই অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। অপরাপর চরিত্রগুলিও কোনও খানেই স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করে নাই—যথোপ-যোগীই হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা বেশ সৌষ্ঠবতাসম্পন্ন, মিষ্ট ও সরস। আমরা এরূপ অতিরঞ্জনবর্জ্জিত, শিক্ষাপ্রদ উপাদেয় পুস্তক খুব কমই পাঠ করিয়াছি।

এই প্রশংসিত গ্রন্থখানির সম্বন্ধে আমাদের একটু অনুযোগ আছে। আজন্ম মিতভাষী আদর্শ পুরুষ সীতানাথের, মৃত্যুর অন্তিমশয্যায় দীর্ঘকালব্যাপী একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা-কারে লম্বা উপদেশ প্রদান আমাদের নিকট কেমন বিসদৃশ এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। তিনি এতকাল নীরব জীবনে দৃষ্টান্ত দ্বারা যে মহৎ শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট নহে কি? আমাদের বিবেচনায় সেই অল্পভাষী নীরব-কর্ম্মীকে আর বহুভাষী ও মুখর না করিলেই ভাল ছিল।

যাহা হউক, আমরা এই শিক্ষাপ্রদ সুরচিত উপন্যাসখানি সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকখানি প্রচার করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষালাভের সুযোগ দান করিয়াছেন। পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই খুব মনোরম।

হাতেখড়ি।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুল প্রেসে মুদ্রিত ও ময়মনসিংহ হইতে শ্রীমোহিতমোহন ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০

এখানি হস্তলিখন প্রণালী শিক্ষা দিবার বহি। বেশ বড় বড় সুন্দর অক্ষরে বর্ণমালা—অসংযুক্ত ও যুক্তাক্ষর,—বানান, ফলা, ছোট ছোট বাক্য ইত্যাদি মুদ্রিত হইয়াছে। শতকিয়া গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি অঙ্কের আদর্শও আছে। শেষভাগে ইংরাজি হস্তলিখন প্রণালীও দর্শিত হইয়াছে।। বহিখানি ছোট ছেলেমেয়ে-দের কাযে লাগিবে। মলাটের চিত্রখানি মনোরম। মূল্য খুবই কম হইয়াছে।

"কমলাকান্ত।"

কলিকাতা

১৪-এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ওমর খৈয়ামের সাকী

চিত্রকর—শ্রীবাব্লনজা।

(গয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত লাল মহাশয়ের সৌজন্যে)

Manasi Press.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল

২য় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও পরলোকতত্ত্ব

কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এ নিয়ম ভৌতিক জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও লক্ষিত হয়। শিশিরকুমারের সহোদর হীরালাল আত্মহত্যা করেন; সেই হইতেই শিশিরকুমার প্রেতাত্মবাদ (Spiritualism) অনুশীলনে প্রণোদিত হন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার সফলতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ভ্রাতৃবিয়োগ জনিত হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াই তিনি পরলোকতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একান্ত মনে প্রেতাত্মবাদ আলোচনায় ফলে তিনি যখন পরলোকগত সহোদরের আত্মার সহিত কথোপকথনে কৃতকার্য্য হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না; তাঁহার জননী ও সহোদর-সহোদরাগণের হৃদয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজ পরিবারের মধ্যেই এই মহাতত্ত্ব প্রচারে তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সেই তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করিয়া শোকতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিবার জন্য শিশিরকুমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

প্রেতাত্মবাদ শিক্ষার জন্য শিশিরকুমার আমেরিকায় গমন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে স্বনামধন্য স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় তিনি বটীতে বসিয়াই প্রেতাত্মবাদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রেতাত্মার আমন্ত্রণ জন্য তিনি তাঁহার জননী, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত চক্র (Circle) করিয়া বসিতেন। তাঁহাদের এই চক্রে, বাহিরের কোনও লোক থাকিত না। গৃহের এক নির্জ্জন কক্ষে তাঁহারা একটী গোলাকার টেবিলের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া, পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া একান্ত মনে সমস্বরে ঈশ্বরের স্তুতিগানে নিযুক্ত হইতেন। বিশেষ একাগ্রতার সহিত চক্র করিয়া বসিলেও, প্রথম দুই-দিন তাঁহারা কোনও আত্মার আবির্ভাব লক্ষ্য করেন নাই। ইহাতে শিশিরকুমার একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "প্রাণের ভাই হীরালাল ব্যতীত জীবন ধারণ অসম্ভব। ইচ্ছামত যদি হীরালালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারি তাহা হইলে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি

লাভ করিব।" যে মৃত্যু প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানব জীবনকে শান্তিহীন করিয়া তুলে, সেই মৃত্যুকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে, শিশিরকুমার প্রেতাত্মবাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আশায় নিরাশ হইলে হৃদয় স্বভাবতঃ উৎসাহশূন্য ও ব্যথিত হয়। প্রথম দুই দিবস চক্র করিয়া বসিয়া শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ যখন তাঁহাদের মধ্যে কোনও আত্মাকে আনয়ন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা চিন্তিত ও বিশেষ ভাবে দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় দিবস স্তুতিগানের সময় শিশিরকুমারের এক সহোদরের শারীরিক ও মানসিক ভাবে একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হইল। প্রথমে তিনি হস্ত দ্বারা টেবিলে আঘাত করিতে ও শেষে কাঁপিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যেন কিছু ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার তাড়াতাড়ি একটী পেন্‌সিল লইয়া তাঁহার সহোদরের অঙ্গুলির মধ্যে দিলেন, এবং একখানি কাগজ তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

শিশিরকুমারের আবিষ্ট ভ্রাতা লিখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, কেবল দাগ টানিয়া কতকগুলি কাগজ নষ্ট করিলেন। শেষে তিনি কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। এই তৃতীয় দিবসের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে না, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই শিশিরকুমার ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত চক্র করিয়া বসিলে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সহোদরের শরীরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইল। সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপ না হইলেও তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তাঁহার হস্তে একটী পেন্‌সিল দেওয়া হইলে তিনি কাগজের উপর তাঁহার পরলোকগত সহোদর হীরালালের নাম লিখিলেন। হীরালালের নাম দেখিয়া শিশিরকুমার বুঝিলেন যে হীরালালের আত্মাই তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। আনন্দে শিশিরকুমার, তাঁহার জননী ও ভ্রাতা ভগিনীগণের নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইল। তখন মিডিয়ম (medium) ধীরে ধীরে স্বহস্তে তাঁহার জননী ও সহোদর-সহোদরাগণের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া, আবেগভরে সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

পারিবারিক চক্রে পরলোকগত সহোদর হীরালালের আত্মার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার পরলোক-তত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন। জন্মান্তরে তাহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলিতেন যে মৃত্যুর পর মানব ইহজগতের ন্যায় পরজগতেও বর্ত্তমান থাকিয়া আপন আপন কার্য্যানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। চক্র করিয়া বসিলে শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্ত-কুমারের ও শ্রীযুক্ত মতিবাবুর শরীরেই অধিকাংশ সময় প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইত। চতুর্থ দিনের চক্রে হীরালালের আত্মা আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আমি এখন যেখানে অবস্থান করিতেছি, তাহা জড়জগৎ অপেক্ষা সহস্রগুণে মনোরম। এখানে আসিলেও ভগবান কিম্বা তাঁহার অনুগৃহীত কোনও আত্মার সহিত এখনও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এখানে নাস্তিক আত্মার অভাব নাই; তাহারা এখনও ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। কোনও মানবের শরীর আশ্রয় না করিলে আমি স্থূল জগতে দেখিতে পাই না।"

শিশিরকুমারের পারিবারিক চক্রে হীরালালের প্রেতাত্মা ব্যতীত, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পরিচিত ও অপরিচিত বহু উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর আত্মারও আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই সকল প্রেতাত্মার মধ্যে কেহ কেহ মিডিয়ম দ্বারা জানাইলেন যে, "জীব আপন আপন কার্য্যানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। শরীরে কোনও ব্যাধি আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমন কষ্টের সীমা থাকে না, সেইরূপ পাপানুষ্ঠান করিলে

আত্মারও দুঃখ কষ্ট ও অশান্তির সীমা থাকে না। নরক যন্ত্রণা কবির কল্পনা নহে; মরজগতে মানব ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক কলুষিত জীবন যাপন করিলে পরজগতে যে তাহার আত্মাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার যাহারা পাপকার্য্য করিয়া অনুতপ্ত না হইয়া বরং অহঙ্কার করে এবং তাহাদের কার্য্যের জন্য ভগবানকে নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাদের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।"

মৃত্যুর পর মানবের আত্মা পরজগতে বর্ত্তমান থাকে, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও স্বচক্ষে একটী ঘটনা দেখিয়া একথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সে ঘটনাটি এই। রায় বাহাদুরের গ্রামের একটী বয়স্ক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের একটী বিধবা কন্যা ছিলেন; তিনি বয়সে তাঁহার বিমাতা অপেক্ষা বড় ছিলেন। একদিন অপরাহ্নে কন্যা বিমাতার কেশ-বিন্যাস করিতে করিতে হঠাৎ 'সতীন খাবো সতীন খাবো' বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া তাঁহার বিমাতার গণ্ডদেশে দংশন করিলেন। দংশন যন্ত্রণায় বিমাতা অস্থির হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীর সহায়তায় অগ্রসর হইলে, কন্যা বিমাতাকে ছাড়িয়া দিয়া, অতি তীব্র ভাষায় পিতাকে বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। লোকের বিশ্বাস এই বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার শরীরে তাঁহার গর্ভধারিণীর আত্মা আবির্ভূত হইয়াই স্বামীর ও সপত্নীর প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রেতাত্মবাদ আলোচনা দ্বারা শিশিরকুমার যখন প্রেতাত্মার সহিত কথোপকথনে কৃতকার্য্য হইলেন; তখন তিনি আনন্দের সহিত এই সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺আনন্দমোহন বসু ও নিজের কনিষ্ঠা ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকারকে জানাইলেন। তাঁহারা সাধারণের নিকট প্রচারার্থ এই সংবাদ অবিলম্বে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের পত্র প্রকাশিত হইলে দেশে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। প্রেতাত্মবাদসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে শিশিরকুমারের নিকট এত পত্র আসিতে লাগিল যে, তাঁহার পক্ষে যথাসময়ে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রেও প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ চক্র করিয়া বসিয়া প্রেততত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। চক্রে উচ্চ ও নীচ উভয় শ্রেণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইত। কৃষ্ণনগরে কতকগুলি যুবক কৌতুহল-পরবশ হইয়া প্রেততত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চক্রে কেবল নীচশ্রেণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইত। যুবকগণ কারণ অনুসন্ধান জন্য শিশিরকুমারকে পত্র লিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার নিজ পরিবারিক চক্রে আবির্ভূত প্রেতাত্মাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাইয়াছিলেন,—"আমগাছ ও তেঁতুলগাছ একই মাটী হইতে রসগ্রহণ করে, কিন্তু আম সুমিষ্ট ও তেঁতুল টক কেন?"—শিশিরকুমার ইহার অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হইল—"কৃষ্ণনগরের যুবকগণ কেবল কৌতুক করিবার জন্য চক্র রচনা করিয়া থাকে, সেইজন্য সেখানে কেবল নীচ শ্রেণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। উচ্চ শ্রেণীর আত্মার সহিত কথোপকথন করিতে হইলে যুবকগণকে ধীর, স্থির ও প্রার্থনাপরায়ণ হইতে হইবে।" শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদর-সহোদরাগণ পবিত্রভাবে চক্র করিয়া বসিতেন বলিয়াই তাঁহাদের চক্রে উচ্চশ্রেণীর প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইতেন; নীচ শ্রেণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব অতি অল্পই লক্ষিত হইত।

স্বীয় পরিবারিক চক্র ব্যতীত শিশিরকুমার অন্য কোন চক্রে বড় যোগদান করিতেন না। কেবল যশোহরে একবার একটি চক্রে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যশোহরে একদিন সুপ্রসিদ্ধ

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাপ্তাবসর সব্‌জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শিশিরকুমার চক্র করিয়া বসিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর শরীরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইল। প্রথমে তিনি টেবিলে আঘাত করিতে লাগিলেন, শেষে যেন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিলেন। সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "দীনবন্ধু দেখিতেছি চালাকি করিতেছে।" শিশিরকুমার তাঁহাদিগকে মৃদু তিরস্কার করিয়া, মিডিয়মের হস্তে একটি পেন্‌সিল দিলেন ও তাঁহার সম্মুখে একখণ্ড কাগজ রাখিলেন। প্রথমে অকৃতকার্য্য হইলেও, মিডিয়ম শেষে লিখিলেন, "কুরল সরকার।" সভ্যগণের মধ্যে কেহই এই লেখার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। দীনবন্ধু চৈতন্যলাভ করিয়া লেখা দেখিয়া বলিলেন—"কুরল সরকার আমাদের গোমস্তা ছিলেন, দীর্ঘকাল পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" চক্রে বসিবার সময় কুরল সরকারের কথা তাঁহার মনে আদৌ উদয় হয় নাই। অন্য একদিনের চক্রে গিরিশচন্দ্রের শরীরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার হস্তে পেন্‌সিল ও সম্মুখে কতকগুলি কাগজ দেওয়া হইল। প্রথম দাগ টানিয়া কতকগুলি কাগজ নষ্ট করিয়া শেষে তিনি মিল্টনের নাম লিখিলেন। মহাকবি মিল্টনের নাম দেখিয়া সভ্যগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা মিডিয়মকে একটি লাটিন কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিলে, পাঁচঘণ্টা কাল চেষ্টার পর মিডিয়ম লাটিন ভাষায় একটি অসম্পূর্ণ কবিতা লিখিলেন। গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য সভ্যের মধ্যে কেহই লাটিন জানিতেন না, সুতরাং মিডিয়ম যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্টর সুপণ্ডিত মিষ্টার ক্লার্ক বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ যশোহরের উপস্থিত হন। তাঁহাকে চক্রের কথা কিছু না বলিয়া, কাগজখানি দেখান হইয়াছিল; তিনি তাহা পাঠ করিয়া বলেন, ইহা একটি অসম্পূর্ণ লাটিন কবিতা, কিন্তু ইহাতে অনেক ভুল রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের শরীরে পাঁচঘণ্টাকাল প্রেতাত্মার আবির্ভাব ছিল; আরও দীর্ঘকাল থাকিলে পাছে মিডিয়মের কষ্ট হয়, সেজন্য পাঁচঘণ্টা পরে চক্র ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলে হয়ত কবিতাটী নির্দ্দোষ ভাবে লিখিত হইত।

হেমন্তকুমার ও মতিবাবুর ন্যায়, শিশিরকুমারের তৃতীয় পুত্র পয়সকান্তি ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুহাসনয়নাও মিডিয়মের শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কোমলস্বভাব-বিশিষ্ট লোকেরাই ভাল মিডিয়ম হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ রিভিউ অব রিভিউজের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় ডবলিউ, টি, ষ্টেড (W. T. Stead) মহোদয় শিশিরকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারকে মিডিয়ম করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শিশিরকুমার শেষকালে যখন তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে লইয়া চক্র করিয়া বসিতেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শীঘ্রই আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। চক্র করিয়া বসিয়া শিশিরকুমার মিডিয়মকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন এবং তাহার যে উত্তর পাইতেন, তাহা তিনি লিখিয়া রাখিতেন। আমরা নিম্নে তিনটী চক্রের প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিলাম। এই তিনটী চক্রেই শ্রীমতী সুহাসনয়না মিডিয়ম ছিলেন। শিশিরকুমারের ভাষাই আমরা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়াছি, কেবল দুই এক স্থানে আবশ্যক মত দুই একটি শব্দ সংযোগ করিয়াছি।

১

এই চক্র শিশিরকুমারের পিতার প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন। তুমি কে?

প্রথমে কোনও উত্তর নাই। পরে মিডিয়ম কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর—"আমি তোমার বাবা। আমি তোমায় সাবধান করিতে আসিয়াছি, কারণ তোমায় শীঘ্র আসিতে হইবে। অতএব ধর্ম্মে মতি দাও।"

প্র। ধর্ম্মে মতি কিরূপে দিব ?

উ। সংসার ছাড়।

প্র। আমি কি বৃন্দাবন যাইব ?

উ। তা নয়, গৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া দিবানিশি পাদপদ্ম সেবা কর।

প্র। বাবা, আমি ভাবিতাম মরিয়া তোমার চরণ ধরিয়া তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিব, কারণ তোমাকে কত তাচ্ছীল্য করিয়াছি।

উ। আমার ক্ষমা না চাহিয়া তাঁহাকে (ভগবানকে) ডাকো। তোমার মা দশবৎসর কি কঠোর করিয়াছিল তা কি তুমি জান না ? তুমি সেখানে এখানে উভয়স্থানে ধন্য হও। আমি যাই। এই মিডিয়ম আমাকে সহ্য করিতে পারিতেছে না। তুমি কাঁদিতেছ কেন ? কাঁদিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ, ইহা স্বার্থপরতা। কাঁদিবার কারণ কি ? সব পাবে, সুখময় !

প্র। আপনি কি দাদাদের সঙ্গে আছেন ?

উ। আমি আর তোমার মা একত্রে আছি। একত্রে আর ভিন্ন কি ! বলিতে গেলে সকলে একত্রে আছি। আমি যাই, আর থাকিতে পারিতেছি না।

২

এই চক্রে শিশিরকুমারের দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়।

প্র। আমি কবে মরিব ?

উ। আম সে সব জানিনা। ভগবান উহা জানিতে দেন না। তিনি (বাবা) যে 'শীঘ্র' বলিয়াছেন, তাহার মানে দুবৎসর হইতে পারে, চারি বৎসর হইতে পারে। তিনি যখন এলেন, তখন চারিপাশে আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম।

প্র। এস আমোদ করি। তুমি আর তোমার দিদি ইহার মধ্যে ভাল কে ?

উ। দিদি ভাল।

প্র। তা ত তুমি বলিবেই। তোমার দিদি কবে সাধন ভজন করিল ? তুমি কত সাধন ভজন করিয়াছ।

উ। দিদি আজ ৪০ বৎসর সাধন ভজন করিতেছেন। তুমি ভাব যে তিনি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন ? আর আমি যে সাধন ভজন করি সে প্রথমে, আমি তাহার পর পাষাণ হইয়াছিলাম। (ক্রন্দন)

প্র। কাঁদিতেছ কেন ?

উ। একটা কথা মনে করিয়া কান্না আসিল। তোমাকে বলিয়া দুঃখ দিব না।

প্র। এতদূর বলিলে ত, তবে বল।

উ। যেদিন আমি আসি, সেদিন বিকাল বেলা প্রাণ ছটফট করিতেছিল। ইচ্ছা ছিল তোমাকে বুকে করিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যাই।

প্র। (কষ্ট প্রকাশ করিলাম)।

উ। তোমাকে বলিয়া অন্যায় করিলাম।

প্র। ও সব কথা যাক্। এস আমোদ করি। এস হাসি। তুমি আর তোমার দিদি, ইহার মধ্যে কে বেশী রূপবতী ?

উ। (হাস্য) তুমি বল দেখি কাহাকে তুমি বেশী ভালবাস ? (হাস্য) কাল দিদির অনেক কথা বলিবার বাকি ছিল। বলিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছে। আমি অনেক বলিলাম যে তুমি যাও, তবু আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিল। ছিদাম (১) তো পাগল হইয়াছে। সে রোজ আসিতে চায়।

প্র। আসিতে দাওনা কেন ?

উ। তাহার আসিতে আমাদের সম্পূর্ণ সাহায্য প্রয়োজন। ফুলিকে (২) আমি মত সহজে ইন্‌ফ্লুয়েন্স করিতে পারি, দিদি তাহা পারেন না। কারণ সে আমার মেয়ে। আমি ওখানে ভাবিতাম যে, তুমি আমার স্বামী অতএব আমার সামগ্রী; তাহাতেই

(১) ছিদাম শিশিরকুমারের একটী পুত্র ; অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়।

(২) ফুলি (মিডিয়ম) শিশিরকুমারের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুহাসনয়নার ডাকনাম।

তোমাকে তাচ্ছীল্য করিয়াছি। মনে আসিলেও মুখে করিতাম না। ভাবিতাম জোর আমার। হরিমোহনকে (৩) দেখিও। তাহার বড় অবনতি হইয়াছে। তুমি না পার তোমার দুই ছেলেকে বলিও।

প্র। তাহারা আমার কথা শুনে না!

উ। শেষকালে আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতাম যে ভগবান ছয় মাস আমাকে স্বাস্থ্য দেও, আমি একবার স্বামিসেবা করিব।

(এইখানে আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা লেখা হয় নাই।)

* * * *

প্র। আবার কান্না কাটনা আরম্ভ করিলে?

উ। না। আমি না লিখিয়া কেন কথা কহিতেছি জান? তুমি কৃপণ লোক, তোমার কাগজ খরচ হইবে না।

প্র। কাল ভুবন (৪) আসিয়া যাহা লিখিল তাহাতে বুঝিলাম যে, সে এখন আর বোকা নাই।

উ। চিরকালই বোকা থাকিবেন? যে প্রাণ হইতে কথা বলে তাহার কথায় বোকামী থাকিবে কেন? আমি যাই। ...দের অধিকক্ষণ থাকিবার নিয়ম নহে।

প্র। তোমার কি অধিকক্ষণ থাকিতে কষ্ট হয়?

উ। ঠিক তা নয়। ভগবান কৃপা করিয়া এরূপ কথা কহিতে সুবিধা দিয়াছেন; আমাদের উচিত নয় যে বহুক্ষণ এইরূপ করি।

মিডিয়মের চৈতন্য হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার শরীরে এক দুশ্চরিত্রা কুলি রমণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইল। মিডিয়ম লাফাইয়া উঠিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। শিশিরকুমার তাঁহার কন্যার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিলে, মিডিয়ম তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়াছিল। অনেক চেষ্টার পর মিডিয়মের চৈতন্য হইয়াছিল।

৩

এই চক্রেও শিশিরকুমারের দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়।

প্র। অত ভয় কর কেন? আমারা থাকিতে ভয়?

উ। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, একটা পতিতা স্ত্রীলোক কয়েকদিন আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমরা আসিতে দিই নাই। সেদিন হঠাৎ প্রবেশ করিয়া ফেলিল, আমরা তখনই তাহাকে তাড়াইতাম, কিন্তু একটু সময় লাগে।

প্র। কেমন করে তাড়ালে?

উ। আমরা রুক্ষভাবে চাহিলাম, তাহাতেই সহ্য করিতে পারিল না। সে মাগী একটা চা-বাগানের মেয়ে-কুলি। তাহার চরিত্র মন্দ হয়। তাহার স্বামীকে বিষ খওয়াইয়া মারে। তাহার অবস্থা দেখিলে ভয়ও হয়, দুঃখও হয়।

প্র। তাহাকে ভাল উপদেশ দাও না কেন?

উ। ক'দিন দিয়াছি, তা সে কাণে করেনা। শুন, তোমাদের মধ্যে ঝগড়া, দ্বেষ, হিংসা আছে। যে সব লোক কুইচ্ছা পৃথিবী হইতে লইয়া আসে, তাহা সহজে অতিক্রম করিতে পারে না: কাযেই যে মন্দ কায করে, সে মন্দ লোক অনেক দিন থাকে। তাহার মন্দ অভ্যাস সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। আমি এক কথা তোমাদের বলিয়া রাখি, একথা তুমি সকলকে বলিও। ওখানে যাহা এক বৎসরে হয়, এখানে তাহা কুড়ি বৎসর লাগিবে।

প্র। তোমার দিদিকে আসিতে দিলেনা কেন?

উ। তিনি কাছে দাঁড়াইয়া।

প্র। তোমার দিদির সহিত ঝগড়া বাঁধাইয়া দিব দেখিবে?

(৩) হরিমোহন—শিশিরকুমারের শ্যালক।

(৪) ভুবন—শিশিরকুমারের প্রথমা স্ত্রী ভুবনমোহিনী।

উ। কখন নয়। অসম্ভব। তিনি যে কত ভাল তাহা তুমি অনুভব করিতে পারনা। তিনি ৪০ বৎসর তোমার পথ চাহিয়া আছেন।

প্র। তোমরা মেয়েমানুষ হইয়া পেত্নীকে তাড়াইলে কি করিয়া ?

উ। এখানে মেয়েমানুষ পুরুষ বিভিন্ন নাই। যে যত ভাল, তাহার তত শক্তি। আমি পরম ভাগ্যবতী তোমাকে পাইয়াছিলাম।

প্র। আমাকে না পাও, কেদার হালদারকে পাইতে।

উ। (হাস্য) কেদার হালদার নয়, নামটা ভুলিয়া গিয়াছি।

প্র। ওখানকার সমুদয় কথা বল।

উ। তুমি প্রশ্ন কর, আমি বলিতেছি।

প্র। তোমরা কিরূপে দিন কাটাও।

উ। হাসি, কাঁদি, গল্প করি, বেড়াই, ঘুমাই।

প্র। তোমরা কি ঘুমাও ?

উ। ঠিক ঘুম নয়, একরূপ বিশ্রাম করি।

প্র। দাদাদের সঙ্গে কি দেখা হয় ?

উ। সর্ব্বদা দেখা হয়, কিন্তু দিদির সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা একত্র থাকি।

প্র। আমার মনে হয়েছে। তাহার নাম চণ্ডী হালদার।

উ। (উচ্চহাস্য) ঠিক।

প্র। তুমি কি এখন ফুলিকে খুব কায়দা করিয়াছ ?

উ। সম্পূর্ণরূপে।

প্র। সে পেত্নীটা এসেছিল কেন ?

উ। বাঁদরামি করিতে।

প্র। তুমি কি ফুলিকে ঠিক কায়দা করিয়াছ ?

উ। হাঁ, করিয়াছি।

প্র। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা উত্তর করিতে পারিবে ?

উ। হাঁ পারিব।

প্র। যা ফুলি না জানে ?

উ। হাঁ পারিব।

উ। তুমি এমন কথা বল যাহা ফুলি না জানে।

উ। দেখ, বোটে যাওয়ার কথা, হাঁসখালিতে থাকার কথা, ইহা তোমার যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কর।

প্র। বোটে তোমরা কে কে গিয়াছিলে ?

উ। তুমি, আমি, পীযষ, পাঁড়ে, রাখালের মা। এই দেখ, পাঁড়ে ও রাখালের মায়ের কথা ফুলি কিছুই জানে না।

(প্রকৃত কথা পাঁড়ে, চণ্ডী হালদার ও রাখালের মায়ের কথা মিডিয়ম কিছুই জানিতেন না। শিশির-কুমারের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে, চণ্ডী হালদারের সহিত কুমুদিনীর বিবাহের কথা হইয়াছিল, সেইজন্য শিশির-কুমার রহস্য করিয়া চণ্ডী হালদারের নাম করিয়া-ছিলেন।)

শিশিরকুমার প্রেতাত্মবাদ আলোচনা করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। এদেশে প্রেততত্ত্ব প্রচারে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক আবর্ত্তে পতিত হইয়া প্রথমে তিনি ও তাঁহার সহোদরগণ প্রচার-কার্য্যে আপন আপন শক্তি সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করিবার অবসর পান নাই। তবে তাঁহারা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহাও নহে।

যাহা হউক, রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার প্রেততত্ত্ব প্রচারে পুনরায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রেতাত্মবাদ আলোচনার সুবিধা হয়, সেই জন্য তিনি "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন" (Hindu Spiritual Magazine) নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ পত্র প্রকাশ করিলে দেশবাসিগণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, শিশিরকুমার মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়কে একখানি

চিঠি লিখিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর শিশির-কুমারকে ভালরূপ জানিতেন। তিনি শিশির-কুমারকে প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত পত্র প্রকাশিত হইলে দেশের একটি অভাব দূর হইবে এবং দেশবাসিগণ তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে। চিঠিতে তিনি শিশিরকুমারের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে মহারাজের চিঠিখানি উদ্ধৃত করিলাম—

My Dear Shishir Babu,

I have read with great interest the cutting you have enclosed. I should indeed be only too glad to have the opportunity of expressing myself what I think of the all important work about to be set on foot and about the unquestionably competent hand who is to undertake the same.

The 'Hindu Spiritual Magazine' will certainly meet a want that has long been sadly felt, and will, I am sure, be hailed with joy by every one who feels a craving for occult knowledge and spiritual research. I can hardly think of any other Hindu gentleman so well qualified as yourself to edit a magazine of the kind. Knowing you as I do to be a man of exceptional intelligence and of a highly cultured mind, with rare originality of conceptions which belong to a man of genius, as also with what energy and earnestness you have devoted your life to the study and dissemination of spiritual knowledge, I have every reason to hope that your project will be attended with success. True it is that you are widely known as a political character; that is by reason of your long connection with the 'Amrita Bazar Patrika'; but the author of so many religious works, breathing deeply of devotional feelings and high spirituality, should be even more widely known in connection with spiritual culture.

The importance of such a magazine can never be over-estimated. It has been very aptly said by that great statesman Gladstone, that Psychical Research is the greatest and the most important subject that can engage the attention of man. I know too with what energy and singleness of purpose you work when you take a matter in hand. Moreover the work of the proposed 'Magazine' will be a labour of love with you, into which you are sure to put your whole heart; and with the stock of your personal experiences in the Psychic line, the magazine will not fail to command all the elements of success. Besides, such a periodical, the only one of its kind in our country, will be a suitable vehicle to convey to the public in a collected form the researches and experiences of others who are given to labour in the field of Psychic research.

Yours sincerely

(Sd.) Jotendra Mohan Tagore.

শিশিরকুমারের সম্পাদকতায় ১৯০৬ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাসে "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রেতাত্মবাদ আমাদের দেশে নূতন না হইলেও, আলোচনার অভাবে ইহা ক্রমে

দেশবাসিগণের নিকট নূতন হইয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়াই যে প্রেততত্ত্ব ভারতবর্ষে পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার পত্রিকা প্রকাশিত হইলে এ দেশীয় ও বিদেশীয়গণ তাহা অতি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় তত্ত্বের পুনরালোচনায় এ দেশবাসিগণ ক্রমে ক্রমে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। ইহা পাঠ করিয়া এডুকেশনিষ্ট, পাঞ্জাবী, ষ্টেটস্‌ম্যান, কাটিঙার টাইমস্, করাচী ক্রনিকল্, পাওয়ার এণ্ড গার্ডেন সিটিজেন, হিন্দু, লাইট, মাইশোর ষ্টাণ্ডার্ড, বেহার হেরাল্ড, মান্দ্রাজ মেইল, টাইম্‌স্ অব আসাম, রিভিউ অব রিভিউজ, ইণ্ডিয়ান নেশন প্রভৃতি বহু এ দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদপত্র ইহার আবশ্যকতা এবং এরূপ পত্রিকা পরিচালনে শিশিরকুমারের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা এই সকল মত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থকার ডাক্তার জে এম পিবল্‌স্ এম-এ, এম্-ডি, পি এইচ ডি, (J. M. Peebles M.A., M.D, Ph. D.) জগতের অধ্যাত্মবাদিগণের অগ্রণী ছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তিনি "স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন" পাঠ করিয়া শিশিরকুমারকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের পত্রিকায় তিনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। একবার তিনি শিশিরকুমারকে তাঁহার পত্রিকার প্রশংসা করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

My Dear Brother,

You last 'Hindu Spritual Magazine' reached me safely by the Oriental Mail. It is the best number upon the whole that you have yet issued, and its contents are interesting, instructive and very valuable. I read it with a great degree of pleasure.

I take the liberty of sending you an article or the rather extracts from a lengthy lecture that I delivered at one of our great American camp meetings on a Sunday. I suppose there were nearly 2000 people present. The meeting was held in a very beautiful grove near some mineral springs with charming surrounding scenery.

I have not yet given up the idea of coming to India late this autumn. My heart and soul often go to that land of Aryans, land of Vedas, and those magnificent poems that taught a future immortal existence; and that further taught that happiness could be obtained in the world only through obedience to law, and the aspiration to be good, and pure, and spiritually minded.

Very cordially yours,
(Sd.) J. M. Peebles M.D.

Battle Creek
Mich, Sept 14.

P. S. As signs and tokens now indicate, I shall reach India in December. I sail from London in about two weeks.

১৮০৭ খৃঃ অঃ ৮টা জানুয়ারী তারিখে ডাক্তার পিবল্‌স্ কলিকাতায় আগমন করেন। মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের আমন্ত্রণে তিনি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া টেগোর ক্যাসেলে (Tagore Castle) অবস্থান করিয়াছিলেন। ডাক্তার পিবল্‌স্ মহারাজ বাহাদুরের প্রাসাদের হলে প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে

একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমেরিকা ও ইউরোপে সুপরিচিত হইলেও, ভারতবর্ষে জনসাধারণের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন না। মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর তাঁহার পিতার প্রতিনিধি-স্বরূপ একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গের নিকট ডাক্তার পিবলসের পরিচয় প্রদান করেন। ডাক্তার পিবলসের বক্তৃতা শিশিরকুমারকে প্রেতাত্মবাদ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। প্রেতাত্মবাদ আলোচনার ফলে শিশিরকুমার কলিকাতায় বহু ইংরাজ নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে মিষ্টার ও মিসেস আর্মিটেজের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচার কার্য্যে তাঁহারা শিশিরকুমারকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মিসেস আর্মিটেজ একজন শক্তিশালিনী মিডিয়ম ছিলেন। তাঁহার স্বামীর যত্নে ও চেষ্টায় কলিকাতায় সাইকিক্যাল সোসাইটী (Psychical Society) নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ বাহাদুরের প্রাসাদে ডাক্তার পিবলসের সভাপতিত্বে ১৯০৭ খৃঃ অঃ ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় এক সভার অধিবেশন হয়। প্রেতাত্মবাদ প্রচারই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া সমিতি গঠিত হইয়াছিল—

পৃষ্ঠপোষক—মহারাজ বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে সি এস আই।

প্রেসিডেন্ট—ডাক্তার জে এম পিবলস্।

ভাইস প্রেসিডেন্ট— { মিষ্টার জে জি নিউজেন্স ও বাবু শিশিরকুমার ঘোষ

সম্পাদক— { বাবু পীযূষকান্তি ঘোষ ও মিষ্টার সি সি আর্মিটেজ।

সভ্যগণ—মিষ্টার ডবলিউ এফ্ ক্যারোল, ডাঃ মনিয়র এম বি, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু মতিলাল ঘোষ, মিষ্টার এন এন ঘোষ, রায় বাহাদুর নিরঞ্জন মুখার্জ্জী, মিঃ জে মুখার্জ্জি, বাবু জয়চন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ হেমচন্দ্র সেন, মিঃ জি ডুবার্ণ ও বাবু প্রেমতোষ বসু।

শিশিরকুমার-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন এখনও তাঁহার উপযুক্ত সহোদর স্বনামখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ ও শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ম্মী শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু শিশিরকুমার যে শক্তি তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বর্গারোহণের পর হইতে যেন ক্রমশই হীন হইয়া পড়িতেছে। প্রেতাত্মবাদ প্রচারে শিশিরকুমার যাহা করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে শিশিরকুমারের কার্য্যের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

মোহিনী বিদ্যা (হিপ্‌নটিজম্) যে ভারতবর্ষের অজ্ঞাত নহে, তাহা তন্ত্রগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফ্রান্সে প্রথমে মিষ্টার মেস্‌মার (Mr. Mesmer) মোহিনী বিদ্যা প্রচার করেন। তাঁহার নাম হইতেই মেস্‌মেরিজম্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আলোচনার অভাবে আমাদের দেশের বহু তত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। শিরশিশিরকুমার মোহিনী বিদ্যার চর্চ্চায়ও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু একদিনের ঘটনা হইতেই তিনি এই চর্চ্চায় বিরত হন। শিশিরকুমার তাঁহার এক ভগিনীকে মেস্‌মেরাইজ করিতেন। তাঁহার সেই ভগিনী প্রথমে সামান্য নিদ্রানুভব করিয়া, শেষে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িতেন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া একদিন শিশির তাঁহার ভগিনীকে বহুক্ষণ ধরিয়া মেসমেরাইজ করিয়াছিলেন। ভগিনী নিদ্রাভিভূতা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি ঘুমাইয়াছ?" প্রশ্নের কোনও উত্তর হইল না। শিশিরকুমার উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া যখন কোনও উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন। শেষে তিনি ভগিনীর হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন

যে স্পন্দন নাই, ব্যস্ত হইয়া বুকে হাত দিয়া দেখিলেন তাহাও স্পন্দনহীন। শিশিরকুমার অধীর না হইয়া স্থিরভাবে ভগিনীর চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে শিশিরকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি ঘুমাইয়াছ?"

উত্তর। আমি মরিয়াছি।

প্রশ্ন। মরিয়াছ। তুমি কি বলিতেছ?

উত্তর। হাঁ, আমি মরিয়াছি। মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে যায়, আমি সেইখানে আসিয়াছি।

শিশিরকুমার তাঁহার ভগিনীর উত্তর শুনিয়া ভীত হইলেন। তিনি তাঁহাকে মৃতদেহে প্রত্যাগমন করিতে বলিলে তাঁহার ভগিনী অস্বীকার করিয়া উত্তর করিলেন,—"আমাকে ফিরিবার জন্য বলিতেছ কেন? মৃত্যু মানব-জীবনের একটা পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয়।"

ব্যথিত হৃদয়ে শিশিরকুমার বলিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তুমি কি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে আমার হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যাইবে!"

উত্তর। আমি যেখানে আসিয়াছি সেস্থান স্থূল-জগৎ অপেক্ষা সহস্রগুণে মনোরম। আমি অতি সহজেই এখানে আসিয়াছি; তুমি আমাকে ভালবাস, তবে কেন স্বার্থপরবশ হইয়া আমাকে পুনরায় দুঃখময় স্থানে টানিয়া লইয়া যাইতে চাও?

শিশিরকুমার উক্ত উত্তর শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং শেষে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন—"তুমি যদি ফিরিয়া না আইস, তাহা হইলে আমাকে হয়ত ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া শিশিরকুমারের ভগিনীর আত্মা তাঁহার শরীরে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হইল এবং শেষে তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন। কাহারও কাহারও নিকট এইরূপ ঘটনা অলৌকিক বলিয়া অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আমরা ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। শিশিরকুমারের জীবন-কথা সংগ্রহের জন্য আমরা তাঁহার এই ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, অনেক কথার পর তিনি সজল নয়নে বলিয়াছিলেন—"আমার সেজ দাদার কথা কি বলিব? তিনি আমাকে স্বর্গ দেখাইয়াছিলেন।"

অনেক সময় সাধুসন্ন্যাসিগণ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে হাত বুলাইয়া তাহাকে নিরাময় করিয়া দেন, এইরূপ দেখা গিয়াছে। একথার মূলে যে আদৌ সত্য নাই, তাহা নহে। শিশিরকুমার একবার আহারের অনিয়মে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হন। একথা তিনি পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও বলেন নাই। তাঁহার দেহ ক্রমশই অবসন্ন হইতে লাগিল এবং শেষে নাড়ী ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন তিনি মতিবাবুকে ডাকিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য বলিলেন। শিশিরকুমার সহোদরের বুকে আশ্রয় হইয়া বলিলেন—"মতি, আমার কলেরা হয়েছে।" মতিবাবু শুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। শেষে তিনি একরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে শিশিরকুমারের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যেক হস্ত সঞ্চালনে শিশিরকুমার সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি দেখিলেন যে তাঁহার শরীরে কোন গ্লানি নাই, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। শিশিরকুমারের বিশ্বাস যে, তাঁহার বিপদ দেখিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন উচ্চ-শ্রেণীর প্রেতাত্মা মতিবাবুর শরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনা সম্বন্ধে শিশিরকুমার তাঁহার Hindu Spiritual Magazine এ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

"Here is a personal experience of

mine, which, whenever I think of it, gives me a thrill. I had taken some indigestible food, and that made me sick. I committed another outrage while suffering from acute diarrhœa ; and this time found that I had brought upon myself cholera, the real disease. * * * I felt that I was going to faint away from exhaustion, and the griping of the stomach. * * * * My pulse was then sinking rapidly. My younger brother Matilal, who was with me sitting apart, had no idea of the danger which had overtaken me. I called him to my side, told him to sit behind my back, so that I could lean upon him. He did as he was bid. I told him with great difficulty that I had got cholera ; and a strange thing happened immediately after. His hands and limbs began to shake, and he showed by other signs that he was beside himself. It seemed that he had been suddenly overtaken by convulsion I was so surprised that I could not utter a word, even to ask what the matter was with him. He however soon after regained some control over himself, and then he began to make passes on my back with his right hand. I then perceived that he was making mesmeric passes and doing this while in an unconscious state himself. I had practised hypnotism but he had never done so. I realised then what the matter was. It was this : I was in danger, and a good spirit was trying to nip my disease in the bud by these mesmeric passess. My brother was a good medium ; a good spirit possessed him, so that he became unconscious for the time being and was in that state while making the passes to cure me. Every pass of his was followed by relief,—immense relief. I felt as if by these passes my brother was infusing into me new life, nay, strength and ecstasy. A little before, I was going to faint from fatigue and divers sorts of uneasy sensations ; two minutes after, I felt strong, happy and disposed to go to sleep. I addresed, not my brother, but the spirit—"Thanks, I am all right" ; and then fell asleep under an uncontrollable influence, from which I awoke quite refreshed—a new man. I know that God and his angels take care of us."

শ্রীঅনাথনাথ বসু ।

সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ ও বেদান্ত

পুরুষের স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের মত তুলনা করিয়া দেখিতে হইলে, অগ্রে দেখিতে হয় এই দুই দর্শন পুরুষের সহিত বিশ্বজগতের কিরূপ সম্বন্ধ অবধারণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই প্রবন্ধে, পুরুষ-বিচার স্থগিত রাখিয়া সাংখ্যের অচেতন প্রধানবাদের সহিত বেদান্তের চেতন জগৎ-কারণবাদ তুলনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

১। সাংখ্যের জগৎকারণ প্রধান ও পুরুষ।

সাংখ্য জগৎ-কারণ-বাদের ইতিপূর্ব্বে সবিস্তার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখন সেই সব প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত একসঙ্গে করিয়া উল্লেখ করিলেই চলিবে।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্বরূপকে কার্য্যকারণ-প্রবাহ রূপেই অবধারণ করিয়াছিলেন। এখানে কার্য্যকরণের পারম্পর্য্য ছাড়া 'অকস্মাৎ' বা 'দৈবাৎ' বলিয়া কিছুই নাই। যে কার্য্যসত্তার (phenomena) কোনই দৃষ্ট কারণ প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তাহার কোন অ-দৃষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ কারণও অবশ্যই আছে। এইরূপে কার্য্যকারণাত্মক জগৎ বিচার করিতে করিতে সাংখ্য অবশেষে এক আদি কারণ— 'অমূল মূলে'—ঠেকিয়াছিলেন, যেখানে সমস্ত কার্য্যকারণ 'পরিনিষ্ঠা' বা সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। জগতের সেই পরিনিষ্ঠা বা আদি কারণ হইতেছে অচেতন প্রধান বা মূল প্রকৃতি। তাহাই বিশ্বের নির্ম্মাণ-ধাতু ও মূল উপাদান।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, শুধু উপাদান হইলেই কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসত্তা উৎপন্ন হয় না। শুধু মাটী হইলেই ঘট জন্মলাভ করে না। মাটীকে ঘটাকারে পরিণত করিতে হইলে একজন কুম্ভকারের জ্ঞান ও শক্তির প্রয়োজন হয়। এইজন্য পণ্ডিতেরা বলেন, ঘটসৃষ্টির পক্ষে মৃত্তিকা হইতেছে "উপাদান-কারণ" এবং কুম্ভকার তাহার "নিমিত্ত-কারণ"। সেইরূপ বিশ্বসৃষ্টির উপাদান-কারণ হইতেছে অচেতন প্রধান, এবং তাহার নিমিত্ত-কারণ হইতেছে পুরুষ।

সৃষ্টির এই যে নিমিত্তকারণ পুরুষ, ইনি সাংখ্যমতে কোনও পৃথক ও স্বতন্ত্র "পুরুষবিশেষ"—ঈশ্বর নহেন। তেমন কোন ঈশ্বর আছেন বলিয়া সাংখ্য মানেন না। যে ঈশ্বরকে সাংখ্য 'সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা' ঈশ্বর বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিনি "পুরুষবিশেষ" (individual) ঈশ্বর নহেন, তিনি "পুরুষ-সামান্য" ঈশ্বর। অর্থাৎ বৃক্ষলতা ও কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য ও দেবাদিলোক যেথায় যে কোন চৈতন্য দৃষ্ট হইতেছে তাহাই সাংখ্যের পুরুষ ও ঈশ্বর। অতএব ঈশ্বর হইতেছেন "পুরুষ-সামান্য" এবং সেই "পুরুষ-সামান্য" ঈশ্বর হইতেছেন আদিত্য মণ্ডলবৎ। যেমন অনেক তেজকণা একসঙ্গে করিয়া আমাদের অসংখ্য রশ্মিময় সূর্য্যমণ্ডলের ধারণা হয়, তেমনই অনেক চিদ্রশ্মিময় সাংখ্যের এই চিদাদিত্যমণ্ডল ঈশ্বর। প্রত্যেক মুক্ত ও অমুক্ত আত্মা এই চিদাদিত্যমণ্ডলের অন্তর্গত। এবং সমষ্টিগত বিশ্বচৈতন্যই বিশ্ব-পুরুষ। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন তাঁহারা 'বন-ন্যায়ে' পুরুষকেই ঈশ্বর বলেন। অর্থাৎ অনেক বৃক্ষকে একসঙ্গে করিয়া আমরা যেমন তাহাকে 'বন' বলি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যেমন বৃক্ষের অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র 'বন' নাই— এবং বনও যাহা বৃক্ষও তাহা, সেইরূপ পুরুষ সমষ্টি ঈশ্বরও যাহা পুরুষও তাহা। কেন না বনের প্রত্যেক বৃক্ষই যেমন এক এক সম্পূর্ণ বৃক্ষ, তেমনি পুরুষ সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টি পুরুষও এক এক অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মস্বভাব পুরুষ।

এই যে পুরুষ যিনি সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ হইয়াছেন —তিনি নিষ্ক্রিয় পুরুষ, এবং কুম্ভকারের ন্যায় নিজ হাতে গড়িয়া পিটিয়া জগৎকে খাড়া করিয়া তুলিতেছেন না। কুম্ভকারের দৃষ্টান্তকে বেশি চাপ দিলে তাহা

হইতে বেশি পরিমাণে সাংখ্য-তৈল বাহির হইবে না। সৃষ্টিকে বিশ্বধাতু প্রকৃতি নিজেই গড়িয়া তুলিতেছে। পুরুষ তাহাতে নিমিত্ত মাত্র হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। সৃষ্টির সহিত পুরুষের এই যে অধিষ্ঠান সম্বন্ধ, ইহা বুঝাইতে হইলে অন্য উপমা ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়। সেই দৃষ্টান্ত হইতেছে অয়স্কান্ত মণি ও লৌহের দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত 'অবৈজ্ঞানিক' দৃষ্টান্ত হইতে পারে—কিন্তু তাহা দ্বারা সাংখ্যের মূল প্রতিজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিতে কোনই বাধা হয় না। কারণ উপমা প্রমাণ নহে—তাহার দ্বারা প্রমেয় বিষয় স্পষ্টতর করা হইয়া থাকে মাত্র।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়াছিলেন, নিষ্ক্রিয় অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্য মাত্র লাভ করিয়া লৌহ যেমন প্রবর্ত্তনশীল হয়, তেমনি নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত মাত্র হইয়া প্রকৃতি সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। (সাং দঃ—১।৬৮) শুধু প্রবর্ত্তনা নহে, পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি যেন পুরুষের অখণ্ড জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই বিশ্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাতেই প্রকৃতির অচেতন ক্রিয়া, যেন কোন চৈতন্যের দ্বারা অভিসন্ধিত, সচেতন জ্ঞানক্রিয়াবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং পক্ষান্তরে প্রকৃতি-কার্য্যের অধিষ্ঠাতা, পুরুষ হইয়াছেন বলিয়া, পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন স্বভাব হইলেও নিজেই যেন কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।

তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবৎ ইব লিঙ্গম্।
গুণ কর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তা ইব ভবতি উদাসীন॥

সাংখ্যকারিকা ২০।

—"সেই জন্য পুরুষসংযোগবশতঃ অচেতন প্রধান সচেতনবৎ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং বিশ্বকার্য্যে গুণসকলের প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হইলেও উদাসীন এবং অকর্ত্তা পুরুষই যেন কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।" এই অধিষ্ঠান-সম্বন্ধের অন্য উদাহরণও আছে। সৈন্যবল নিজের শক্তি দ্বারা যুদ্ধ করিয়া জয় পরাজয় লাভ করে, কিন্তু সৈন্যবলের কার্য্যের ফলভোগী রাজা বলিয়া, সৈন্যকার্য্য রাজার কার্য্য বলিয়া কথিত ও পঠিত হয়। তেমনি প্রকৃতি কার্য্যের ভোক্তা পুরুষ বলিয়া, পুরুষই প্রকৃত কার্য্যের ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত হয়েন।

পুরুষের জগৎ-রচনার এই সান্নিধ্য-কর্ত্তৃত্ব বা অধিষ্ঠান-কর্ত্তৃত্বের প্রত্যক্ষ উদাহরণ আমরা প্রত্যেকেই। আমাদের এই দেহে যতক্ষণ চৈতন্য অধিষ্ঠিত থাকে, ততক্ষণই ভোগায়তন দেহের নির্ম্মাণকার্য্য চলিয়া থাকে, এবং এই দেহে চৈতন্য অনধিষ্ঠিত হইলে এ দেহের "পূতিভাব প্রসঙ্গ" উপস্থিত হয়। এবং শরীর, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি অচেতনভাবে কার্য্য করিলেও সেই সকল কার্য্য, নিষ্ক্রিয় ও সচেতন পুরুষের কার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। বিশ্বনিখিলের সৃষ্টিকার্য্যও সেইরূপ বিশ্বপ্রকৃতির অচেতন কার্য্য, কিন্তু বিশ্বচৈতন্য সেই কার্য্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন বলিয়া তাহা বৈশ্বচৈতন্য ঈশ্বরেরই কার্য্য বলিয়া পঠিত ও কথিত হয়। এবং পক্ষান্তরে, বিশ্বপ্রকৃতির যাহা অচেতন কার্য্য তাহা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানের দ্বারা অধিষ্ঠিত কার্য্য বলিয়া, তাহা অচেতন কার্য্য হইলেও সচেতন কার্য্যবৎ প্রতীয়মান হয়।

অতএব বিশ্বের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর বা পুরুষ-সামান্যের অন্তর্গত প্রত্যেক যে জীব-পুরুষ তাহারাই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ। এবং এই জন্যই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ এক হিসাবে আমরাই প্রত্যেকে এবং যে বুদ্ধি-বোধপরিচ্ছিন্ন পুরুষ "আমি" পদবাচ্য হইয়াছেন—তিনি বুদ্ধি-পরিচ্ছেদের মধ্যেও সেই অখণ্ড ও পূর্ণ জ্ঞান নির্ব্বিকার ব্রহ্মচৈতন্যই রহিয়াছেন বলিয়া এই "আমি"র বিশ্বকর্ত্তা হইতে কোনই বাধা নাই।

২। সাংখ্য ও বেদান্তের বিচারবিধি।

বেদান্ত সাংখ্যের এই জগৎ কারণ-বাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন, ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান, এক ও অদ্বিতীয় কারণ। তাঁহার মতে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও অচেতন প্রধান নাই, তাহা থাকিতে পারে না।

কেন যে থাকিতে পারে না ইহা দেখাইবার জন্য বেদান্তদর্শন যত সূত্র খরচ করিয়াছেন, অন্য কোন বিবাদাস্পদ বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় তাহার অর্দ্ধেক সূত্রও খরচ করেন নাই। সাংখ্যের অচেতন-বাদ বেদান্তের প্রাণে বড়ই বাজিয়াছিল।

এই সাংখ্যবাদের বিরুদ্ধে বেদান্ত-যুক্তি সকলকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। একভাগে ব্রহ্মসূত্রকার উপনিষদ্ সকলের মন্ত্রের সঙ্গত ও সমন্বয়যুক্ত অর্থ অবলম্বনে সাংখ্যবাদ নিরস্ত করিতেছেন। অন্যভাগে "তর্ক-বলেন", তিনি সাংখ্যের "তর্ক-জনিত আক্ষেপ" পরিহার করিতেছেন।

সাংখ্য যে শ্রুতি-বিরুদ্ধ ইহা সাংখ্য নিজে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এইজন্য তিনিও শ্রুতির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নিজের মত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা অবশ্যই বেদান্তের ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলে না। অতএব শ্রুতির হৃদ্গত অর্থ সাংখ্যেরই অনুগত কিম্বা বেদান্তেরই অধিগত ইহার মীমাংসা না হইলে এই দুই যুধ্যমান দর্শনের বিরোধের মীমাংসা হয় না। কিন্তু সে মীমাংসার ধৃষ্টতা আমাদের নাই—এবং সে মীমাংসার প্রয়োজনও দৃষ্ট হয় না। কেননা শ্রুতির যাহা বক্তব্য ছিল, শ্রুতি বহুকাল হইল বলিয়া খালাস হইয়াছেন। এবং শ্রুতির সেই অর্থকে সমধিক বশম্বদ ভাবে কে মানিয়া চলিতে পারিয়াছেন, সাংখ্য না বেদান্ত, ইহার 'সার্টিফিকেট' বেদান্তের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, বোধ হয় প্রাচীন সাংখ্যের পক্ষে তত প্রয়োজন ছিল না। বাদরায়ণ মুনির ন্যায়, কপিলও যে শ্রুতি ধরিয়া তাঁহার দর্শন গড়িতে প্রতিশ্রুত ছিলেন ইহার একান্তই প্রমাণাভাব।

সাংখ্যের প্রচলিত এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক দলিল, সাংখ্যদর্শনের মধ্যে সাংখ্য যুক্তি-বিধির যে 'ধারা' দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় তর্ক করিবার সময় সাংখ্য প্রায় শ্রুতি-নিরপেক্ষ হইয়াই তর্ক করেন। তাঁহার নিজের অঙ্গীকার মতে সাংখ্য মনন-শাস্ত্র (Reasoning Science)। কিন্তু সেই মনন শাস্ত্রের স্বাধীন সিদ্ধান্তকে শ্রুতির সঙ্গে মিলাইয়া দিবার জন্য সূত্রকার একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন। ইহাতে সময়ে সময়ে শ্রুতির অর্থের উপর কতটা অযথা পীড়ন উপস্থিত হয়, তাহার একটি নমুনা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে আত্মার আনন্দ-স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে কেবল-চিৎস্বরূপ আত্মা আনন্দময় হইতে পারেন না, "দ্বয়োর্ভেদাৎ"—চিদ্রূপ ও আনন্দ রূপের ভেদবশতঃ। অর্থাৎ আনন্দ প্রকৃতির গুণ, পুরুষের স্বরূপ নহে। অতএব এখানে স্পষ্টই সাংখ্যের সঙ্গে শ্রুতির বিরোধ ঘটিতেছে। কিন্তু সাংখ্যের দর্শনকার তাহা কিছুতেই মানিবেন না। তিনি আনন্দশ্রুতির এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, শ্রুতি "গৌণ" অর্থে আনন্দ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, "মুখ্য" অর্থে করেন নাই। অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইলে, সাংখ্যের মুক্ত আত্মা যে উদাসীন চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই উদাসীন স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি আত্মার আনন্দময় দশার কথা বলিয়াছেন। শ্রুতি মুখ্য অর্থ ছাড়িয়া দিয়া এমন গৌণ অর্থে কেন আনন্দ শব্দ প্রয়োগ করিতে গেলেন, ইহার কারণ দর্শাইতে গিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—"বিমুক্তি-প্রশংসা মন্দানাম্।" (সাং দঃ—৫।৬৮)—ইহা মন্দমতিগণকে মুক্তির পথে লওয়াইবার জন্য মুক্তির প্রশংসা মাত্র। বলা বাহুল্য ইহা শুধু শ্রুতিপীড়ন নহে, ইহার মধ্যে একটু শ্রুতি-অবমাননারও গন্ধ আছে।

বেদান্তে এরূপ "গা-জোরি" শ্রুতি ব্যাখ্যার দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব যদি নাও থাকে, তবে ইহা নিশ্চিত যে এমন শ্রুতি ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। কেন না বেদান্ত উত্তর-মীমাংসারূপে শ্রুতির জ্ঞান-কাণ্ডেরই মীমাংসা করিতেছেন, কোনও অভিনব মত-বাদের সৃষ্টি করিতেছেন না। তাঁহাকে সাংখ্যের ন্যায় "মনন" দ্বারা কোনই তর্কসিদ্ধ 'থিওরি' গড়িতে হইবে না, শ্রুতির 'থিওরি' কি ছিল ইহাই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তিনিই যথার্থ শ্রুতিব্যবসায়ী, কিন্তু

সাংখ্যাদি দর্শনকারগণ শ্রুতির সখের সওদাগর মাত্র।

বেদান্ত ঠিকই বলিয়াছেন, তর্কের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রুতির সঙ্গত অর্থের গরমিল হইলেই, সেই অর্থকে 'ফেরফার' করিয়া তর্কের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলাইয়া দিলে, তর্কেরই প্রাধান্য মানা হয়, শ্রুতির প্রাধান্য মানা হয় না। কিন্তু বেদান্ত শ্রুতি ও তর্কের দাবির আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, (বেদান্ত নিজে অনেক স্থানে তর্ক মাত্র হইলেও) তর্কশাস্ত্রকে একেবারে রসাতলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এমন কি কপিলাদি তার্কিকের "নির্ম্মোক্ষ" বা পরিত্রাণ হইতে পারে কি না তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।—"তর্ক-অপ্রতিষ্ঠানাৎ অন্যথা অনুমেয়মিতি চেৎ, এতদপি অনির্ম্মোক্ষঃ" (বেঃ দঃ—২।১।১২)—তর্কে প্রতিষ্ঠান হইল না বলিয়া সঙ্গত আগমের অর্থকে অন্যভাবে অনুমান করিয়া লইতে হইবে ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে কেবল তর্কেরই বা পরিত্রাণ কোথায়? কেবল তর্কের যে পরিত্রাণ নাই ইহা দেখাইবার জন্য ভাষ্যকারগণ কণাদ ও কপিলেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বলিয়াছেন—কপিল ও কণাদ দুইজনেই পণ্ডিত এবং দু'জনেই তার্কিকও বটেন। অথচ দু'জনের তর্কে মধ্যে মধ্যে মতভেদ হইয়া গিয়াছে। এখন পরিত্রাণ যে হইবে, তাহা কাহার তর্কে, কপিলের না কণাদের?

এমন কি যাঁহার নিজের তর্কশক্তি জগতের মধ্যে এক অতুলনীয় পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার, সেই তর্কসম্রাট্ শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত এতদুপলক্ষে বলিয়াছেন, তর্ক ছাই, প্রত্যক্ষ ও অনুমান কোন প্রমাণের মধ্যেই নহে, কেবল শ্রুতির বচনই একমাত্র সত্য প্রমাণ!

ইহা শুনিয়া জগতের তর্ক ও স্বাধীন বিচারণা যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায় নাই ইহা শ্রুতি ও বিচারণা উভয়ের পক্ষেই শুভকর হইয়াছিল। আমরা জানি, এক দিন বেদান্ত তর্ক করিয়াই কণাদের পরমাণুবাদকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া জাহান্নমে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল তর্ক অবলম্বনে, পরমাণুবাদের জন্য কণাদ যে সমুচ্চ সত্যের আসন নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, নিঃসংসয়ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, সেই সুপ্রতিষ্ঠ আসন কোনও শ্রুতিসিদ্ধ আসন হইতেই কম মর্য্যাদাসম্পন্ন নহে।

ফল কথা, বেদান্ত মতে, বিচার অন্ধ সাজিয়া যতক্ষণ শ্রুতির হাত ধরিয়া চলিবে ততক্ষণই ঠিক পথে চলিবে, শ্রুতির হাত ছাড়িয়াছে কি খানায় পড়িয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বেদান্তও কখন কখন এমনি নিরাশ্রয় ও অসহায় যুক্তি-বিধি ধরিয়া, কেবল 'তর্কবলেন' সাংখ্যের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাঠক নিম্নে তাহার একটি নমুনা দেখিতে পাইবেন। শঙ্কর বলিয়াছেন, "অবধারিত আগমের অর্থে" এবম্বিধ কেবল তর্ক চালাইলেও কোন দোষ হয় না। আমরা প্রণত মস্তকে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া, অধিকন্তু ভাবে বলিতে ইচ্ছা করি যে, "অনবধারিত আগমের অর্থে"ও কেবল তর্ক চালাইলে এই কলিকালে বড় বেশী দোষ হয় না। অন্যত্র তাহার প্রমাণ আছে।

৩। চেতন ও অচেতন।

সাংখ্য বলিয়াছিলেন, কার্য্যকারণক্রমে অচেতন হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং চৈতন্য হইতেও অচেতন উৎপন্ন হইতে পারে না, কেন না অচেতনের মধ্যে চৈতন্যের কোনই লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, চেতন হইতে অচেতন "বিলক্ষণ"। বেদান্ত পূর্ব্বপক্ষে সাংখ্য কথিত চেতন অচেতনের 'বিলক্ষণতা' অবধারণ করিয়া উত্তরপক্ষে বলিতেছেন—"দৃশ্যতে তু (বেঃ দঃ ২।১।৬)"—কিন্তু তাহা ত দেখা যায়, অর্থাৎ অচেতন হইতেও চেতনের উৎপত্তি হইতে ত দেখা যায়। কোথায় দেখা যায়? শঙ্কর দেখাইতেছেন—"লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যঃ বিলক্ষণানাম্ কেশনখাদীনাম্ উৎপত্তিঃ, অচেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ গোময়াদিভ্যঃ বৃশ্চিকাদি-উৎপত্তিঃ"—"লোকে চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরুষ হইতে চেতন-বিলক্ষণ নখলোমাদির

উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং অচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ গোময় (পচা গোবর) হইতে বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়।"

ইহা শুনিয়া পাশ্চাত্য ও আধুনিক জৈব-তত্ত্ব-বিভাগে যে অট্টহাস উপস্থিত হইবে তাহা আমরা অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারি। কারণ, বেশী দিনের কথা নহে এই হাস্যরসিকগণই Theory of spontaneous generation প্রভৃতি অদ্ভুত নাম দিয়া এই পচা গোবর-বাদকেই মাথায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এতদুপলক্ষে সাংখ্যশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যে বিস্ময়ের লোমহর্ষণ উপস্থিত হইতে পারে তাহা সর্ব্বথাই অনুপেক্ষণীয়। কেন না "লোকে" জীবদেহকে চেতন ও পুরুষ বলিতে পারে, কিন্তু সাংখ্য নিশ্চয়ই জীবদেহকে চেতন বলেন না। দেহ ত দূরের কথা, সাংখ্যমতে বুদ্ধি, মন, অহঙ্কারাদিও অচেতন। এবং গোময় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা যদি বেদান্তের সত্য দৃষ্টান্ত হয়, তবে সাংখ্যের সঙ্গে বেদান্তেরও গোময়ত্ব লাভ করিতে বোধ হয় দেরী হইবে না।

বেদান্তের এই সাংখ্য-বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তে, সাংখ্য যে কিছুমাত্র কাবু হইয়া পড়িতেছেন না, বলা বাহুল্য, ইহা শঙ্করের লোকোত্তর-প্রতিভায় অবিদিত থাকে নাই। কিন্তু তিনি তর্ক করিতেছেন:—"হাঁ, সাংখ্য বলিতে পারেন বটে জীবদেহ চেতন নহে, অচেতন বলিয়াই তাহাকে সাংখ্য সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এবং গোময়ও অচেতন পদার্থ, তাহা হইতে অচেতন বৃশ্চিক-দেহ উৎপন্ন হওয়ায়, ইহা সাংখ্যের কোনই বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতেছে না। কিন্তু জীবের সজীব দেহ ও নখলোমাদির মধ্যে 'মহান্ পারিণামিক বিপ্রকর্ষ' রহিয়াছে। এবং গোময় ও বৃশ্চিক-দেহের মধ্যে পরিণামের প্রভেদও বড় কম নহে। সাংখ্য যদি বলেন সে প্রভেদ কোনই দুস্তর্য্য প্রভেদ নহে—তবে ইহাও বলিতে হয় যে কার্য্যকারণের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ (apparent) সাদৃশ্য না থাকিলে—আমাদের কার্য্যকারণাত্মক "প্রকৃতি-বিকৃতি জ্ঞানই" এককালে অবলুপ্ত হইয়া যায়। যে কোন "বিকৃতি"কে যে কোন "প্রকৃতি" হইতে উৎপন্ন বলিতে কোনই বাধা থাকে না। সাংখ্য যদি প্রত্যুত্তরে বলেন অচেতন দেহ হইতে অচেতন নখলোম উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাতে ত' সাদৃশ্য-হীন কার্য্যকারণ বলিয়া কিছুই নাই। ভাষ্যকার তাহার জবাবে বলিতেছেন—"বাপু! তবে সত্ত্বাদি লক্ষণযুক্ত ব্রহ্ম হইতে সত্ত্বাদি লক্ষণযুক্ত আকাশাদি ভূত উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে, তোমার বিচারের মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় কেন?" এইরূপে ঘোরতর তর্ক করিতে করিতে, শঙ্কর অবশেষে বেদান্তের মর্ম্ম-তন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার দিয়াছিলেন,—তর্কের জন্য তত নহে, যত সেই ঝঙ্কারের জন্য—আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তিনি বলিতেছেন—"এই যে জগৎ, ইহা যে ব্রহ্ম-প্রকৃতিক নহে ইহাই বা কে বলিতে পারে? 'কিং হি যৎ চৈতন্যেন অনন্বিতম্—তৎ অ-ব্রহ্ম প্রকৃতিকম্ ইতি ব্রহ্ম-কারণ-বাদিনাম্ প্রত্যুদাহ্রিয়েত?' —এমন কোন্ জিনিস্ আছে যাহা চৈতন্য-অন্বিত নহে? তাহা কোন্ জিনিস যাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ব্রহ্মকারণ-বাদী বেদান্তকে সাংখ্য বলিতে পারেন, এই জিনিস্ ব্রহ্ম-প্রকৃতিক নহে? সাংখ্য যে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত (Inference) লইয়া বড়াই করেন, সেই অভ্যুপগম সিদ্ধান্তেও সিদ্ধ হয় যে সমস্ত বস্তুজাত তাহা ব্রহ্মস্বভাব।"

ইহা তর্ক নহে, যুক্তি নহে, ইহাই বেদান্তের মর্ম্ম-বাণী ও প্রাণের কথা,—এ জগৎ অচেতন নহে। ইহাই বেদান্তের সাধারণ রাগিণী যাহা তাঁহার সমস্ত যুক্তিতন্ত্রের বিচিত্র ছন্দোবন্ধের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইতেছে। এই যে সৃষ্টি,—যাহা প্রতি পদক্ষেপে এক আশ্চর্য্য কৌশল, ও অচিন্ত্য জ্ঞানের কাহিনী উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে, যাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমোঘ ও অপরাহত শক্তি প্রকম্পিত হইতেছে, তাহা কি একটা অন্ধ মৃত নির্জ্জীব অচেতন জড়-পিণ্ড মাত্র? আধুনিক জড়বিদ্যার ক্ষুদ্র জড়বাদ, হয়ত বেদান্তের এই সত্য ও উদার মর্ম্মবাণীকে সর্ব্বথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কিন্তু—"বজ্রে

তোমার বাজে বাঁশী, সে কি সহজ গান!”—ইহাকে জানিবার জন্য যে এক উচ্চতম বিজ্ঞান আছে, তাহা ‘লীডেন জার’ ও ‘বুনসেন্ সেলের’ দ্বারা সর্ব্বদাই অপরাহত। জীন্ পল্ ও কার্লাইল ইহাকেই Scienceর মধ্যে বিরাট্ Ne-science বলিয়াছিলেন। এবং সত্যার্থ দ্রষ্টা জড়-বৈজ্ঞানিকই কি এই সৃষ্টির সত্যবাণীকে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন? যিনি বলিয়াছিলেন—“Every Atom is Animate and Living. Without assuming a soul of every Atom, the commonest and most general phenomena of Chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, attraction and repulsion, desire and aversion, must be common to all Atoms or Atom-masses, for movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of compounds can be explained only by attributing to them sensation and will”.*—তিনি একজন আদিম বর্ব্বর নহেন, তিনি আধুনিক জড়বিদ্যারই একজন অদ্বিতীয় মহারথ। হেকেলের এই উক্তির মর্ম্মের সঙ্গে, পাঠক বেদান্ত সূত্র মিলাইয়া দেখুন—“সৃষ্টিতে যে বিচিত্র রচনা কৌশল বিদ্যমান তাহা কোনও অচেতনের কার্য্য হইতে পারে না” (বেঃ দঃ—২।২।১)। “যাহা অচেতন কখনই স্বতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।” (বেঃ দঃ—২।২।২) ইত্যাদি।

তবে কি সাংখ্য এই বিচিত্র জগৎ-কৌশল, এবং স্বতঃ সঞ্চারিণী জগৎশক্তি সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন সৃষ্টি অচেতন? তাহা কখনই নহে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান এবং আমাদের দেশের প্রাচীন নাস্তিকবাদ যাহাকে ‘স্বভাব’ কিম্বা Nature বলিয়া গোঁজামিল দিয়া যান, তাহাকে সাংখ্য শুধু ‘প্রকৃতি’ বলেন নাই—তাহাকে ‘ঈশ্বরের দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রকৃতি’ বলিয়াছিলেন। লুপ্ত ষষ্ঠিতন্ত্র বলিয়াছিলেন—“পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ত্ততে”—পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, বিশ্ব-কারণ প্রকৃতি সাংখ্যমতে অচেতন। কেন?—কারণ, জগৎ যে জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিতেছে—তাহা জগতের পক্ষে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় জ্ঞান, তাহা তাহার উপাদান কারণের নিরিচ্ছ শক্তি। অর্থাৎ জড়-সৃষ্টিতে কোনই “স্বয়ংপ্রকাশ যোগ” নাই বলিয়াই সৃষ্টি অচেতন, সে ‘জানে না’ বলিয়াই জড়, তাহা জীব-চৈতন্যের ন্যায় কাহাকেও ‘বিষয়’ করিতে পারে না বলিয়া ‘বিষয়ী’ নহে, ‘বিষয়’ মাত্র। সে ‘ভোক্তা’ নহে বলিয়াই ভোগ্য, সে দ্রষ্টা নহে বলিয়াই দৃশ্য। অতএব চেতন ও অচেতনের নির্দ্দেশক, এবং একমাত্র নির্দ্দেশক হইয়াছে এই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ভাব, এই ভোক্তা ও ভোগ্যভাব, এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাব।

বেদান্ত এই সাংখ্যযুক্তির অনিবার্য্য বেগ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বলিতে পারেন নাই যে, ভোগ্য ও ভোক্তৃভাব জগতে নাই। কিন্তু কি বলিয়াছিলেন? বলিয়াছিলেন—এই ভোগ্য ও ভোক্তৃভাব, লৌকিক ভেদমাত্র, পারমার্থিক ভেদ নহে। এবং দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন,—সাগর ও তরঙ্গের অতথ্যাগত ভেদ, যাহা লৌকিক ভেদ বুদ্ধি তথ্যভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু সাংখ্য ইহার উত্তরে বলিতে পারিতেন যে, সাগর ও তরঙ্গে যে ভেদ, সে ভেদ যে অতথ্য ইহা জানিবার জন্য কোনই আর্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় নাই। লৌকিক বুদ্ধিই জানিয়াছিল এ ভেদ অতথ্য। কিন্তু জগতে এমন কোন জ্ঞান বিদ্যমান, যাঁহা চেতন ও অচেতনের, ভোগ্য ও ভোক্তার, প্রভেদ মুছিয়া দিতে পারে?

কিন্তু এ সব তর্কের কথা; তর্ক নহে, বেদান্তের তত্ত্ব কথাই আমাদের বিচার্য্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিবিধ ও বিচিত্র ভেদরূপে বিশ্বের মূল ধাতু যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, সাংখ্য তাহাকেই মহৎ সৃষ্টি বা হিরণ্যগর্ভ-সৃষ্টি নাম দিয়াছিল। বেদান্ত বলিতে চাহেন সেই ভেদ কোনও বাস্তবিক ভেদ নহে। “তদনন্যত্বম্ আরম্ভনাদি শব্দাদিভ্যঃ”—শ্রুতিকথিত ‘আরম্ভনাদি’ শব্দ

* Haekel's Perigeneses, p. 35.

হইতে জানা যায় এই সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে অন্য নহে।

উদ্দালক আরুণি, তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৎস! বলিতে পার, এমন কোন্ বিষয় আছে যাহাকে জানিলে জগতের সমস্ত বিষয়কেই জানা হয়? পুত্র ইহার উত্তর দিতে পারিল না। তখন ঋষি বলিলেন, ব্রহ্মই সেই বিষয় যাঁহাকে জানিলে জগতে আর কিছুকেই জানিতে বাকী থাকে না। দৃষ্টান্ত দিয়া পুত্রকে ইহা বুঝাইবার জন্য ঋষি বলিয়াছিলেন—"সৌম্য! যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন, সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ,—বাচা আরম্ভনং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্ ইতি"—হে সৌম্য! যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডজ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত মৃত্তিকার পদার্থকে জানা যায়। অর্থাৎ যাহাকে আমরা বাক্যের দ্বারা, উৎপন্ন বিকার নামীয় ঘটশরাবাদি বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া থাকি তাহা যে মৃত্তিকামাত্র ইহাই সত্য। তেমনি একমাত্র ব্রহ্মকে বিদিত হইলেই, নামরূপে উৎপন্ন এই বিকার-জাতকেও জানা হয়। কেননা, সমস্ত মৃদ্-বিকার পদার্থ সকল যেমন মৃদাত্মক, তেমনি এই নামরূপের জগৎও ব্রহ্মাত্মক।

বর্ত্তমান যুগের ঋষি, উদ্দালক আরুণির এই আর্ষ যুক্তিকে, অন্যদিক দিয়া এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন—

> "তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
> নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
> সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
> দেখা যেন সদা পাই!"

কিন্তু ঋভু-লোকের এই ঐক্যতান হইতে নামিয়া আসিয়া, বিচারের স্থির সৌরালোকে এই আর্ষ তত্ত্বকে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তত্ত্ব-বৈকুণ্ঠের সর্ব্ব-পান্থ-সেবিত ইহাই প্রশস্ত রাজপথ।

জগৎকার্য্য-কারণের অভিন্নতা সম্বন্ধে বেদান্তের যাহা সিদ্ধান্ত তাহা অনুধাবন করিবার পূর্ব্বে, আমরা স্বগত-ভাবে বলিয়া রাখিতে পারি, এই কার্য্যকারণ প্রসঙ্গে সাংখ্য বলিয়াছিলেন—"কার্য্যকারণ-বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য"—বিশ্বরূপতার মধ্যে কার্য্য-কারণের বিভাগ ও অবিভাগ হইতে জানা যায়, কার্য্যও সত্য কারণও সত্য। অর্থাৎ ঘট যে মাটী ইহাও সত্য এবং ঘট যে ঘটই, অন্য কিছু নহে, ইহাও সত্য। সংসারে যত বাজে লোক, বোধ হয় তাঁহাদেরও এই মত। কিন্তু মহাজনেরা একদম ধরিয়া বসিলেন, ঘট সত্য না মিথ্যা ইহার সাফ্ জবাব চাই। ইহারই একটি প্রসিদ্ধ জবাব হইতেছে—

৪। মায়াবাদ।

বেদান্তের সাংখ্য-বিরোধী যুক্তি হইতেই শঙ্করাচার্য্যের জগৎ-প্রথিত মায়াবাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ বিধিবদ্ধ (Systematised) আকারে বর্ত্তমান ছিল কিনা সংশয়-স্থল। বোধায়ন, দ্রামীড় গুহদেব প্রভৃতি বেদান্তের যে সব পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম পাওয়া যায়, রামানুজের মতে, তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী ছিলেন। পদ্মপুরাণকার মায়াবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইহা অসৎ-শাস্ত্র ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। মহাদেব শঙ্করাচার্য্যের রূপ ধরিয়া ইহা কলিতে প্রচার করিয়াছিলেন।" বিজ্ঞানভিক্ষু-প্রমুখ উত্তরকালের সাংখ্য ও বেদান্তাচার্য্যগণ মায়াবাদিগণকে "নবীন বেদান্তী" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড যে জগৎ-মিথ্যা-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা কেহই বলিতে পারিবেন না। এই সকল কারণে মনে হইতে পারে যে শঙ্করের লোকোত্তর প্রতিভা হইতেই বৈদান্তিক মায়াবাদ ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তা' বলিয়া ইহা সত্য নহে যে মায়াবাদের কোনই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শাখা পল্লব, শঙ্কর-পূর্ব্ব-যুগে এদেশে আদৌ ছিল না।

"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"—ইহাই মায়াবাদের আদ্য ও অন্ত্য প্রতিজ্ঞা। কিন্তু 'জগৎ-মিথ্যা' বলিতে, মায়া-বাদের মতে 'জগৎ শূন্য'—নহে। বৌদ্ধেরাই বলিয়া-

ছিলেন 'জগৎ শূন্য', কিন্তু মায়াবাদ তাহা বলেন নাই। তাঁহার মতে জগৎ শূন্য নহে, কিন্তু জগৎ "কোন-কিছু" বটে। এবং সেই 'কোন-কিছুর' স্বরূপ, অন্য যা' কিছু বল' তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে রূপে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়, ঠিক্ সেই রূপটিই তাহাদের স্বরূপ হইবে না। কেন না আমাদের লৌকিক বুদ্ধি শতবার সর্পে রজ্জুভ্রম করিবে, কিন্তু কখনই তাহার জগৎদৃষ্টে ব্রহ্মভ্রম হইবে না। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন, জগৎ জগৎ নহে, জগৎ ব্রহ্ম। অতএব শারীরক ভাষ্যের মতে—"সর্ব্বব্যবহারাণাম্ প্রাক্ ব্রহ্মাত্মতা বিজ্ঞানাৎ সত্যত্বম্ উপপত্তেঃ, স্বপ্নব্যবহারস্য প্রাক্ প্রবোধাৎ ইব"—যেমন জাগরিত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত স্বপ্ন-ব্যবহারকে সত্য বলিয়া মনে হয়, তেমনি ব্রহ্ম-জ্ঞান উদয় হইবার পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ-ব্যবহারকে সত্য বলিয়াই জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব আমাদের যে প্রপঞ্চ জগৎ-জ্ঞান, তাহা আমাদের এক রকম জাগ্রৎ-স্বপ্ন।

কিন্তু স্বপ্ন বলিয়া 'এ জগৎ যে 'কিছুই-না', তাহা নহে। "ন হি স্বপ্নাৎ উত্থিতঃ, স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশন-উদক-স্নানাদি কার্য্যং মিথ্যা ইতি মন্যমানঃ, ন তৎ অবগতিমপি মিথ্যা ইতি মন্যতে"—যে ব্যক্তি স্বপ্ন হইতে উত্থিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট সর্পদংশন ও উদকস্নানাদি কার্য্য মিথ্যা বলিয়া মনে করে—সে সেই স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্নের অবগতিকেও মিথ্যা মনে করে না। অতএব স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হইলেও এ জগৎ সত্তামূলক (positive) কোন-কিছু, যাহার ব্রহ্ম-জাগরণেও 'অবগতি' থাকে। এবং শুধু অবগতি নহে, শঙ্কর বলিয়াছেন, স্বপ্নের ন্যায় এ জগতের কোনরূপ 'সত্য ফল'ও থাকিতে পারে। স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, স্বপ্নে শোভনা স্ত্রী দর্শন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়; কৃষ্ণদন্ত পুরুষকে স্বপ্নে দেখিলে স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু হয়। এ সকল মিথ্যা-স্বপ্নের সত্য ফল। অতএব জগৎ মিথ্যা বলিয়া জগৎ একান্ত অসৎ নহে। এবং জাগতিক মিথ্যা রূপরসের "অবগতি সাধনায়" দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সত্য ফলও লাভ হইতে পারে। মরীচিকা জল নহে বলিয়াই মরীচিকা মিথ্যা—কিন্তু উষর ক্ষেত্ররূপে মরীচিকারও এক সত্য-অস্তিত্ব আছে। সেইরূপ জাগতিক রূপরস, কোনও প্রকৃত রূপ রস নহে বলিয়াই তাহারা মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্ম-রূপে তাহাদেরও এক সত্য অস্তিত্ব আছে।

তবে কি অদ্বৈতবাদ বলিতে চাহেন যে ব্রহ্মই জগদাকারে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন? শঙ্কর বলিতেছেন, তাহা কখনই হইতে পারে না। ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য, দেশকালে তাঁহার কোনও রূপান্তর ও বিকৃতি অসম্ভব,—তিনি অনাদি অনন্তকাল পরিবর্ত্তনহীন একই নিত্য-রূপে বিরাজ করিতেছেন। তবে ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলার কোন্ অর্থ হইতে পারে? কারণের যখন কোনই কার্য্য নাই, ঈশ্বরের যখন কোনই 'ঈশিতব্য' নাই, তখন ঈশ্বর জগৎ-কারণ বলার কোন্ তাৎপর্য্য হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন—"অবিদ্যাত্মক নামরূপের বীজ, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই নামরূপে 'ব্যাকৃত' হইতে পারে, অন্যথায় পারে না। কেন না শ্রুতি বলিয়াছেন যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সাংখ্যের অচেতন প্রধান বা অন্য কিছু হইতে তাহা হয় না।"—অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতে চাহেন, ঈশ্বর কূটস্থ ও অপরিণামী বলিয়া তিনি জগদাকারে পরিণাম লাভ করেন নাই। কিন্তু তথাপি তিনি জগৎকারণ; কেননা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ শক্তিকে আশ্রয় না করিয়া জগৎ নামরূপে কখনই "ব্যাকৃত" হইতে পারে না।

তাহা হইলে "অবিদ্যাত্মক নামরূপের বীজ" ত ঈশ্বর হইতে দ্বৈততত্ত্ব হইয়া পড়ে! বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ টিঁকে কি করিয়া?—শারীরক ভাষ্য ইহার ব্যাখ্যা দিতেছেন—"এই নামরূপের অবিদ্যা বীজ, ইহা অনির্ব্বচনীয় রূপ। ইহা ঈশ্বরের 'আত্মভূত ইব' ঈশ্বরের মায়াশক্তি, কিন্তু ঈশ্বর নহে, 'তাভ্যাম্ অন্যঃ ঈশ্বরঃ'—ঈশ্বর নামরূপ হইতে অন্য।"

ইহা বলিলেও মন মানে না। মিথ্যাকে সত্যের

শক্তি, অন্ধকারকে আলোরই 'আত্মভূতঃ ইব' বলিয়া বুঝাইলেও দ্বৈতবাদ নিরস্ত হয় না। সেই জন্য অদ্বৈতবাদ, তর্কের এই চরম বটিকা অবশেষে আমাদের প্রতি ব্যবস্থা করিতেছেন—"এবম্ অবিদ্যাকৃত-নামরূপ-উপাধি অনুরোধী ঈশ্বরঃ ভবতি, ব্যোম ইব ঘটকরকাদি-উপাধি-অনুরোধী"—অর্থাৎ আকাশ যেমন কোন বাস্তবিক পরিণাম লাভ না করিয়াও, ঘটাদির মধ্যে উপাধি-অনুরোধী ঘটাকাশ হইয়া থাকে,তেমনি ব্রহ্মও কোন বাস্তবিক পরিণাম লাভ না করিয়া অবিদ্যাকৃত নামরূপের উপাধি-অনুরোধী অবিদ্যাবীজ জগৎ-কারণ হইয়াছেন।

এই ত গেল অদ্বৈতবাদের জগৎ-কারণ ঈশ্বর-বাদ। কিন্তু রামানুজ স্বামীর দ্বৈতবাদ অন্য কথা বলিয়াছে। দ্বৈতবাদের যুক্তি সংক্ষেপতঃ এই :

(১) ব্রহ্মই জগৎ-কারণ। প্রকার-ভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ—চিৎ-ব্রহ্ম ও অচিৎ-ব্রহ্ম।

(২) অচিৎ ও অব্যক্ত ব্রহ্মই জগদাকারে ব্যক্ত হইয়াছেন। এবং অব্যক্ত চিৎ-ব্রহ্মই জীবরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন।

(৫) মীমাংসা

সাংখ্য ও বেদান্তের এই বিরুদ্ধ জগৎ-কারণবাদের মধ্যে যে বাস্তবিক কোনই বিরোধ নাই, অথবা কেবল সংজ্ঞা-মাত্রেরই প্রভেদ আছে, ইহা বুঝিবার জন্য কোনও অসাধারণ ধীশক্তির প্রয়োজন হয় না। এবং সাংখ্যের দর্শনকার যে বহুকাল পূর্ব্বে ইহা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহা মীমাংসার পক্ষে পরম সুখের, তথা নিরাপদের বিষয়।

অদ্বৈতবাদ বলিতেছেন, "নামরূপের অবিদ্যাবীজ"ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎকারণ, এবং কূটস্থ শুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎকারণ নহেন। কিন্তু তথাপি শুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলিতে হইবে, কেননা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞশক্তি ব্যতিরেকে নামরূপের বীজ কথনই "ব্যাকৃত" হইতে পারে না। দ্বৈতবাদ বলিতেছেন, ব্রহ্মের এক অচেতন-স্বরূপ বা অচিৎ 'প্রকার ভেদ' আছে। জগৎ সেই অব্যক্ত ও অচিৎ-স্বরূপেরই ব্যক্তরূপ।

অতএব কি অদ্বৈতবাদ, কি দ্বৈতবাদ, কেহই একথা বলিতে পারেন নাই যে কার্য্যকারণসূত্রে শুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য হইতেই 'নাম-রূপের অবিদ্যা-বীজ' অথবা ব্রহ্মের 'অচিৎ-ভেদ' উৎপন্ন হইয়াছে। জগতের কার্য্য-কারণ-বিচারকে তাঁহারা 'অবিদ্যা' কিংবা 'অচেতন-ব্রহ্মের' ওদিকে আর কোন ক্রমেই ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই। সাংখ্যও তাহা পারেন নাই। অতএব সাংখ্য যেখানে বলিয়াছেন অচেতন প্রধান, বেদান্ত ঠিক সেইখানেই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম বলেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন অবিদ্যা বা অচেতন ব্রহ্ম।

আমরা পরম বিস্ময়ের সহিত অবগত হইয়া থাকি যে সাংখ্যের দর্শনকার এই জগৎ-কারণ-বিষয়ক সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভেদকে কেবল "সংজ্ঞামাত্র" বা নাম মাত্রের প্রভেদ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "একত্র পরিনিষ্ঠা, ইতি সংজ্ঞামাত্রম্। সমানঃ প্রকৃতেঃ দ্বয়ম্।" (সাং দঃ ১।৬৮—৬৯)। যখন একস্থানে গিয়া আমাদিগকে কার্য্যকারণের পরিনিষ্ঠা বা পর্য্যবসান মানিতেই হইয়াছে, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল সংজ্ঞা বা নাম লইয়াই প্রভেদ। অর্থাৎ জগতের যাহা মূল কারণ, 'অমূলমূল'—তাহাকে বেদান্ত অচেতন ব্রহ্ম কিম্বা অবিদ্যা-বীজ বলিয়াছেন। সাংখ্য তাহাকে প্রধান বা প্রকৃত বলিয়াছেন। ইহাতে শুধু সংজ্ঞারই প্রভেদ লইয়াছে, মূল কারণের প্রভেদ হয় নাই। অতএব প্রকৃতি-বিচারে আমাদের দুই পক্ষই সমান।

তাহার পর বিরোধের অবশিষ্ট থাকে এইটুকুমাত্র —সেই জগৎকারণ সচেতন না অচেতন। সাংখ্য যদিও সেই কারণকে অচেতন বলিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই বলিয়াছেন তাহা চেতনের দ্বারা "অধিষ্ঠিত"। বেদান্ত যে কারণে জগৎকারণকে সচেতন বলিয়াছেন, সাংখ্য অবিকল সেই কারণই প্রকৃতিকে পুরুষাধিষ্ঠিত বলিয়াছেন। এবং 'চৈতন্যমূলক' এবং 'চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত' এই দুই বিশেষণের মধ্যেও বোধ হয় 'সংজ্ঞামাত্রের' অতিরিক্ত কোনই বিশেষ প্রভেদ নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

অপরাজিতা

(উপন্যাস)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবাজীর তসবীর ও গুণ্ডার ভয়।

লক্ষ্ণৌয়ে গাড়ী চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করিবে।

আমরা হাত মুখ ধুইয়া, স্নান করিয়া লইলাম। আজ আর্শি ও বুরুশ লইয়া, গন্ধতৈল মাখিয়া নিজেই কেশবিন্যাস করিলাম।

কিছু খাদ্যদ্রব্য লইব কিনা অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"আমরা বেলা আটটার আগে রায়বেরিলিতে পৌছিব। সেখানে গরম গরম ভাল লুচি পাওয়া যায়, সেইখানেই খাদ্য সামগ্রী কিনিলে চলিবে।"

চামেলীর আতরের তীব্র গন্ধযুক্ত একটি অর্দ্ধ মলিন চাপকান পরিয়া, এবং মস্তকে একটি তৈলসিক্ত রঙ্গীণ টুপি ধারণ করিয়া, এক মুসলমান ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজী, তস্‌বীর কিনিবেন? ভাল ভাল পুরাতন তস্‌বীর! আকবর বাদশাহের তসবীর, জাহাঁগীর বাদশাহের তসবীর, নূরজাহাঁ বেগমের তস্‌বীর।" এই বলিয়া, সে আমাকে কতকগুলি চিত্র দেখাইল। চিত্রগুলি ছোট ছোট এবং দেশীয় চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত। আমি সেগুলি তাহার নিকট হইতে লইয়া, অপরাজিতাকে দেখাইলাম। অপরাজিতা একখানি চিত্র পছন্দ করিল। সেখানি মহারাষ্ট্রপতি, মহাবীর শিবাজীর চিত্র। আমি একটাকা মূল্যে ছবিখানি ক্রয় করিয়া কোটের পকেটে রাখিলাম।

তাহার পর ঠিক উপরোক্ত প্রকার চাপকান আদি পরিধান করিয়া, এক পুতুলওয়ালা আসিল। এক টাকায় ষোলটা পুতুল—ভিস্তি, সহিস্, চাপরাসী প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। আমরা পুতুল কিনিলাম না;—অপরাজিতা বলিল যে পুতুল খেলার বয়স আর তাহার নাই। না কিনিলেও, পুতুলওয়ালা আমাদের সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের কি বাঙ্গলা দেশে বাড়ী?"

আমি বলিলাম—"হাঁ, আমার বাঙ্গলাদেশে বাড়ী।"

সে। বুঝি, তীর্থভ্রমণে আসিয়াছেন?

আমি। হাঁ।

সে। লক্ষ্ণৌ হইতে বোধ হয় কাশী যাইবেন?

আমি। হাঁ।

সে। অনেক বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী, এই লক্ষ্ণৌ হইতে ফায়জাবাদ হইয়া, অযোধ্যায় যায়, পরে কাশী যায়। আপনারা বোধ হয় অযোধ্যায় যাইবেন না?

আমি। না।

আমার সহিত আরও কিছু বাক্যালাপ করিয়া, সে চলিয়া গেল।

যথসময়ে, বংশীধ্বনি করিয়া, গাড়ী ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া, রায়বেরিলীর দিকে ছুটিল। সৌভাগ্যক্রমে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনেও আমাদের কামরাতে অন্য আরোহী আরোহণ করে নাই। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় নানারূপ প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। সে প্রেমালাপের কতকটা তোমরা শুনিয়া লও।

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল—"ওগো গাজিয়াবাদ-নিবাসী গাঙ্গুলি মহাশয়! তোমার সেই কালীঘাট-ওয়ালী মেনিটি দেখিতে কেমন?"

আমি। আমি বহু বৎসর তাহাকে দেখি নাই; এখন তাহার কিরূপ শ্রী হইয়াছে বলিতে পারিব না।

অপরাজিতা। যখন দেখিয়াছিলে, তখন তাহার কেমন রূপ ছিল?

আমি। তখন তাহার বয়স মোটে সাত বৎসর।

সাত বৎসরের মেয়ের আবার রূপ কি? তখন তাহার নূতন দাঁতও উঠে নাই।

অপরাজিতা। দন্তহীন রূপ রূপই নয়; সে রূপের কামড় নাই। এখন বোধ হয় তাহার দাঁত উঠিয়াছে এবং সে কামড়াইতে শিখিয়াছে। এখন তাহার বয়স কত?

আমি। এখন বোধ হয় তাহার আঠার বৎসর কি উনিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। তোমার বয়স কত?

অপরাজিতা। ছি ছি! এমন কথা আর কখনও কোন কুলকামিনীকে জিজ্ঞাসা করিও না। ভদ্রসমাজে স্ত্রীলোকের বয়স জিজ্ঞাসার প্রথা প্রচলিত নাই। তোমার এ প্রশ্ন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও মর্ম্মভেদী। আমাদের বয়স জানিবার কাহারও অধিকার নাই।

আমি। আমি দুই দিন পরে তোমার দখলিকার হইব, অতএব আমার সকল কথা জানিবারই অধিকার আছে।

অপরাজিতা। কেবল বয়সটি জানিবার অধিকার নাই।

আমি। তবু বল না, তোমার বয়স কত?

অপরাজিতা। আচ্ছা, তুমি একটা আন্দাজ কর।

আমি। আমার মনে হয়, তোমার বয়স কুড়ি বৎসর হইয়াছে।

অপরাজিতা। ছি! ও কথা বলিতে আছে? মেয়েমানুষ কুড়িতে পড়িলেই যে বুড়ী হইয়া যায়। এ জন্য মেয়েমানুষের কখনও কুড়ি বৎসর হয় না; উনিশ বৎসরের পর তাহাদের আর বয়োবৃদ্ধি ঘটে না।

আমি। আর যে মেয়ের বিয়ে না হয়, হিন্দুসমাজে তাহাদের বয়স দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করে না। কেবল তাহারা 'বাড়ন্ত' মেয়ে বলিয়া, অল্প বয়সে বেশী হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়ে।

অপরাজিতা। অতএব যতদিন আমার বিবাহ না হয়, ততদিন আমিও দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী; পশ্চিমের জল হাওয়া, এবং আটার, অকালে বপুমতী হইয়া পড়িয়াছি। কেমন? আচ্ছা, তুমি বলিলে, তোমার মেনির বয়স উনিশ বৎসর। তাহার পর বল, তোমার সেই ফোকলা মেনির গাত্রবর্ণ কিরূপ ছিল।

আমি। সুগৌর। কিন্তু তোমার ন্যায় সুন্দর নহে। তাহার গৌরবর্ণ শ্বেতপুষ্পের ন্যায়; তোমার গৌরবর্ণ চপলালোকের ন্যায়। তাহার চক্ষু বড় ছিল।

অপরাজিতা। আমার চেয়ে?

আমি। বোধ হয় তোমার চেয়ে বড় ছিল। তাহার চোখ ভয়চকিতা কুরঙ্গীর চক্ষের ন্যায়। তোমার কৌতুক ও রহস্যময় নয়ন ক্রীড়ারত সফরীর ন্যায়;—উহার কটাক্ষাঘাতে আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি।

অপরাজিতা। আমাকেও তুমি কম জর্জ্জরিত কর নাই।

আমি। পুরুষ কটাক্ষাঘাত করে না।

অপরাজিতা। খুব করে। গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে আসিয়া, স্নানার্থিনী কুলকামিনীগণকে কটাক্ষাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া, শিবপূজার মন্ত্র ভুলাইয়া দেয়।

এইরূপ মধুর প্রেমালাপে সময়াতিবাহিত করিয়া, অতিসুখে, আমরা বেলা আটটার সময় রায়বেরিলীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া, খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ কালে, আমি চারিজন আরোহীকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলাম। তাহারা আমাদেরই পার্শ্বের কামরা হইতে নামিয়া, আমার মত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, আবার গাড়ীতে উঠিল। লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত, ঐ কামরাতে চারিটী মুসলমান রমণী ও একটী প্রবীণ মুসলমান ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা লক্ষ্ণৌয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর এই চারি ব্যক্তি কখন ঐ কামরায় উঠিয়াছিল, তাহা আমি বা অপরাজিতা কেহই জানিতে পারি নাই। এই চারিব্যক্তিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার কারণ এই যে, তাহাদের চারিজনেরই পরিচ্ছদ ঠিক

একরূপ। তাহাদের সকলেরই পরিধানে সাদা মোটা ধুতি; সকলেরই গাত্রে, মোটা সাদা জিন কাপড়ের লম্বা কোট; এবং সকলেই উত্তরীয়-বিহীন। তাহাদের দেহাকৃতিও প্রায় একরূপ। আরও দেখিলাম, লোকগুলির সহিত কোন প্রকার মোট-পুটালি নাই। লোকগুলি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে বুঝিতে পারিলাম না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, আহার করিতে করিতে আমার মনে সন্দেহের উদয় হইল। ঐ লোকগুলি একদল চোর নহে ত? অপরাজিতার অর্থ ও অলঙ্কারের সন্ধান পাইয়া, কৌশলে বা বলে তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদের সঙ্গ লইয়াছে না কি?

প্রতাপগড় ষ্টেশনে আসিয়া আমার ঐ সন্দেহটা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। দেখিলাম, গাড়ী হইতে নামিয়া, আমাদের কামরার দিকে তাকাইয়া, তাহারা চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতেছে। একবার একজন আমাদের কামরার খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া, চকিতনেত্রে কামরার ভিতরটা দেখিয়া লইল। অপরাজিতার কথা মত, প্রতাপগড়ের উৎকৃষ্ট পাণ কিনিবার জন্য, আমি একবার প্লাটফরমে অবতরণ করিলে, উহাদের একজন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পানওয়ালার নিকটে গেল; এবং আমার পাণ কেনা হইলে, আমারই সঙ্গে গাড়ীর দিকে আসিল। আমার একবার ইচ্ছা হইল যে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলাম, এরূপ জিজ্ঞাসায় সত্য পরিচয় পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; বরং আমার সহিত আলাপ করিবার একটা সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

হরিদ্বারে আমার এক সহাধ্যায়ীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে কাশীতে একদল দুষ্ট লোক বাস করে; ইহারা চুরি প্রবঞ্চনা ও শঠতা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। কখনও কখনও ইহারা নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সংসারানভিজ্ঞ সরল তীর্থযাত্রিগণ, ইহাদের উৎকৃষ্ট শিকার; নানারূপ কৌশলে ইহারা তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করে; কখন কখন তীব্র-মাদক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্য আহার করিতে দিয়া, তাহাদিগকে জ্ঞানহীন করিয়া, তাহাদের ধনরত্ন নির্ব্বিঘ্নে অপহরণ করে। কখন কখন ইহারা বহুদূর হইতে, তীর্থযাত্রিগণের সঙ্গ লইয়া থাকে; এবং অত্যদ্ভুত চাতুরীজালে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া, তাহাদের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লয়; পরে ঐ সকল সংবাদের সহায়তায় তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। লোকে এই দুষ্টগণকে কাশীর গুণ্ডা বলে। গুণ্ডাগণের কীর্ত্তিকথা, কাশীধামে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

আমার আশঙ্কা হইল, এই চারিজন, বুঝি বা, কাশীর গুণ্ডা; উহারা, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য, লক্ষ্ণৌ হইতে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে। কাশীতে যাইয়া, এই দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিব, তাহা ভাবিয়া আমি বিশেষ ভীত হইয়া পড়িলাম। আমি, আমার ভয়ের কথা অপরাজিতাকে বলিলাম।

সে বলিল—"আমিও উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছি। উহারা দুষ্ট লোক বটে। কিন্তু কাশীতে উহারা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কাশীতে আমার অনেক আত্মীয় আছেন। এই কাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনেই আমার একজন কাকা কায করেন; তিনি অত্যন্ত চতুর;—কেহ তাঁহাকে ঠকাইতে পারে না।"

আমি। সর্ব্বনাশ! তোমার এই সুচতুর কাকা যদি তোমার সহিত আমাকে দেখিয়া ফেলেন, তাহা হইলে, তিনি আমার পক্ষে কাশীর গুণ্ডা অপেক্ষা কম ভয়ঙ্কর হইবেন না! লগুড়-তাড়নে তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা অপহরণের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইবেন।

অপরাজিতা। তোমার কোন ভয় নাই; কাকা বা গুণ্ডা কেহই তোমার অনিষ্ট করিবে না। কাকাকে তুমি জান না; ভারি মজার লোক। হয়ত, তুমি আমাকে লইয়া আসিয়াছ বলিয়া, কত আহ্লাদ করিবেন। আর, তিনি থাকিতে গুণ্ডারা তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আমি। আমার কেশাগ্রের জন্ত আমার চিন্তা নাই। আমি ভাবিতেছি, তোমার অর্থ তোমার অলঙ্কার কিরূপে রক্ষা করিব, কিরূপে এই নরঘাতকদের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিব! ইহাদের কবলে পড়িলে তোমার কাকা কি একা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন?

অপরাজিতা আমার প্রশ্নের কি উত্তর দিতে যাইতেছিল। কিন্তু আমার আর সে উত্তর শুনা হইল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি রাজদ্রোহের আসামী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছদে লিখিত আমার শেষ প্রশ্ন আমি যখন অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, গাড়ী তখন বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিয়াছিল। গাড়ী থামিবামাত্র, দুইজন কনষ্টেবল্ আমাদের কামরার নিকটে আসিয়া, দরজার হাতল ঘুরাইয়া, হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি?"

কনষ্টেবল্দের দেখিয়া, অপরাজিতার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। সে ভয়চকিতনেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সেই চারিজন গুণ্ডাকৃতি ব্যক্তিও কনষ্টেবল্দের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, তাহার কোটের পকেট হইতে একটি টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া, তাহা পাঠ করিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু পুরুষোত্তম সারগাল ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পিতার নিকট তুমি তোমার কি নাম বলিয়াছিলে?"

বুঝিলাম সেই চারি ব্যক্তি কাশীর গুণ্ডা নহে, পুলিসের লোক। আরও বুঝিলাম, আমার অনিলকৃষ্ণ নামে পুলিশ নিশ্চয় কিছু মধুর সন্ধান পাইয়াছে। বলিলাম—"নাম বলিয়াছিলাম, অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি।"

"তুমি কাশী আসিতেছ;—অথচ, তাহার কাছে বলিয়াছিলে, ফারজাবাদে যাইতেছ। তোমার আসল বাড়ী কোথায়?"

আমি স্থির করিলাম, আর মিথ্যা বলিব না। বলিলাম—"কলিকাতা, শ্যামবাজারে।"

"শ্যামবাজার, না শ্যামপুর?"

"শ্যামবাজার।"

"ও একই কথা; শ্যামবাজারও যা', শ্যামপুরও তাই।—তুমি রাজদ্রোহের আসামী; তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।"

আমি সহসা রাজদ্রোহের আসামী হইয়া, হতভম্ব হইয়া পড়িলাম; এবং অপরাজিতার কাতর দৃষ্টি অবলোকন করিয়া, মনোমধ্যে বিলক্ষণ ব্যথা অনুভব করিলাম। কি বলিব, কি করিব, ঠিক করিতে না পারিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

উহারা গাড়ীর দরজা খুলিয়া আমাকে বলপূর্ব্বক গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। এবং দুইজন, দুই দিক হইতে আমার হস্তধারণ করিলে, অপর দুইজন আমার আমার পকেট ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিল;—দেখিল, কোথাও কোন দ্রব্য লুকায়িত আছে কি না। বলাবাহুল্য, উহারা কোন দ্রব্যই প্রাপ্ত হইল না। কেবল, আমার পকেট হইতে, শিবাজীর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ও সেই নাশপাতি কাটা ছুরিখানি গ্রহণ করিল। তাহার পর, উহারা আমার নিকট ট্রাঙ্কের চাবি চাহিল। আমি বলিলাম—"উহার চাবি আমার নিকট নাই; উহা আমার নহে।"

যেখানে দাঁড়াইয়া পুলিসের লোক আমাকে উপরোক্ত প্রকারে লাঞ্ছিত করিতেছিল, তাহার চারিদিকে একটি দুইটি করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহারা আমাকে ও পুলিসের লোককে এরূপভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছিল যে অপরাজিতা গাড়ীর যে কামরায় বসিয়াছিল, তাহা আমাদের দৃষ্টিপথের সম্পূর্ণ অন্তরালে পড়িয়াছিল। সেখানে আমার আকস্মিক বিপদ ও অযথা লাঞ্ছনা

দেখিয়া, অপরাজিতা কি করিতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই; বুঝিতেও পারি নাই।

ট্রাঙ্কের চাবি সম্বন্ধে আমার উত্তর শুনিয়া, পুলিসের লোক বলিল—"ট্রাঙ্কের ভিতর কি আছে, তাহা আমাদের দেখিতেই হইবে। চাবি না পাইলে, অগত্যা উহা ভাঙ্গিয়া দেখিব।"

সমবেতগণের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাহস পূর্ব্বক বলিলেন—"ট্রাঙ্ক অন্য লোকের,—স্ত্রীলোকের; তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নাই; তাহার জিনিষ তোমরা কেন ভাঙ্গিয়া খানাতল্লাসী করিবে?"

পুলিস চোখ ঘুরাইয়া বলিল—"তুমি কে? সন্দেহ হইলে, আমরা যে কোনও লোককে গ্রেপ্তার করিতে পারি, যে কোনও লোকের বাক্স খুলিয়া দেখিতে পারি। তুমি আমাদের উপর কথা চালাইবার কে? তুমি আমাদের কাযে বাধা দিলে, আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিব।"

ভদ্রলোকটি সুবুদ্ধি বোধ হইল,—আত্মানং সততং রক্ষেৎ—এই অতিবৃদ্ধ, বিজ্ঞ সংস্কৃত উপদেশটি তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল। তিনি আর উচ্চবাচ্য না করিয়া, নিম্নস্বরে আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বলিলেন—"এই পুলিশের অত্যাচারে দেশের সর্ব্বনাশ হবে।" এই বলিয়া, তিনি অদৃশ্য হইলেন।

তখন পুলিস বীরদর্পে জনতাভেদ করিয়া, অপরাজিতার ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু কামরার নিকটে যাইয়া, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহারা অপরাজিতা বা ট্রাঙ্ক কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহারা অন্য কামরা অনুসন্ধান করিল; আমাকে সঙ্গে লইয়া, গাড়ীর প্রত্যেক কামরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, এবং প্ল্যাটফরমের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইল; কিন্তু অপরাজিতা বা তাহার ট্রাঙ্কের কোন সন্ধানই পাইল না।

অপরাজিতা ও ট্রাঙ্কের অনুসন্ধানে পুলিশ ব্যর্থ-মনোরথ হইলে, প্রথমটা আমার মনে একটু আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু অনুসন্ধানের উত্তেজনা একটু প্রশমিত হইবার পরেই আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাকে বিপদে ফেলিয়া সে আপন ইচ্ছায় কখনই পলায়ন করে নাই। নিশ্চয় সে অর্থ ও অলঙ্কারসহ কোন দুষ্ট কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে; কাশীতে এরূপ দুষ্টের অভাব নাই! মহা আশঙ্কায়, ব্যাত্যাবিতাড়িত সাগরোর্ম্মির ন্যায়, আমার হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল; সে আন্দোলনের আঘাতে, আমার বক্ষপঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। চিন্তায় মস্তক মধ্যে যেন অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। হায় হায়, এতদূরে আসিয়া, তাহাকে হারাইলাম! কূলে আসিয়া আমার সুখতরী ডুবিয়া গেল!

অপরাজিতার ভাবনায়, আমি নিজের বিপদের ভাবনা ভুলিয়া গেলাম। কে তাহাকে হরণ করিল? কোথায় সে? তাহাকে না দেখিয়া, আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। যদি পুলিসের অত্যাচারিগণ দৃঢ়বলে আমার হস্তধারণ করিয়া না থাকিত, তাহা হইলে, আমি পথে পথে ছুটিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতাম; তাহার অন্বেষণে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতাম; সাগর মথিত করিয়া দেখিতাম, কোথায় আমার সেই 'সাগরছেঁচা' মাণিক লুকাইত আছে।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও যখন পুলিস অপরাজিতার ট্রাঙ্কের সন্ধান পাইল না, তখন তাহারা আমাকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানাখানি দেখাইয়া বলিল—"চল, তোমাকে থানায় যাইতে হইবে।"

আমি পরওয়ানাখানি দেখিলাম। চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ঐ পরওয়ানাতে সহি করিয়াছেন। উহাতে শ্যামপুর নিবাসী অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলিকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম আছে। মজ্জমান ব্যক্তির নিকট তৃণ যেমন, তেমনই ক্ষুদ্র একটু আশাবলম্বন করিয়া, আমি বলিলাম—"আমার বাড়ী শ্যামপুর নহে,—শ্যামবাজার।"

পুলিশ পূর্ব্বের ন্যায় বলিল—"তাহাতে কিছু

আসিয়া যায় না ; শ্যামপুর ও শ্যামবাজার একই কথা। চল থানায় চল।"

আমি বলিলাম—"আমার সহিত একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, আমি তোমাদের সহিত যাইব না।"

আমার কথার প্রত্যুত্তরে, সেই গুণ্ডাকৃতি চারিজনের মধ্যে একজন বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, কি একটা অশ্লীল কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথা, তাহার বর্ব্বর মুখবিবর হইতে সম্পূর্ণ নির্গত হইবার পূর্ব্বেই, আমি তাহার বাক্য-রোধ করিলাম। আমাকে যাহারা ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের কবল হইতে এক উন্মত্ত উত্তেজনায় মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাকে মুক্ত করিয়া, আমি সবেগে তাহার মুখে চপটাঘাত করিলাম। বাবাজীর মল্লক্রীড়াক্ষেত্রে, আমার করতল যে বললাভ করিয়াছিল, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, বর্ব্বর ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইল।

ইহার ফল যাহা হইবার, তাহাই হইল। পরক্ষণেই আমি ছয়জন কর্ত্তৃক ধৃত হইলাম এবং প্রহৃত হইলাম। পুনরায় আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া, সমবেত অনেক বঙ্গবাসী সবেগে অগ্রসর হইয়া, পুলিশকে তিরস্কৃত করিলেন এবং মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কেহ লগুড়, কেহ বেত্র, কেহ ছত্র উদ্যত করিয়া পুলিশের দিকে ধাবিত হইলেন। একটা মারমারি ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া পড়িল।

সে জনসংখ্যার সম্মুখে, পুলিস আপনাদের অক্ষমতা বুঝিয়া, আমাকে লইয়া ত্বরিতপদে প্লাটফরমের বাহির হইয়া পড়িল। তথায় তাহারা গাড়ীভাড়া করিল; এবং আমাকে নিগড়বন্ধনে নিপীড়িত করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া থানার দিকে ধাবিত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতাল নয়,—খুড়শ্বশুড়।

থানাবাড়ী বারান্দায়, আরাম চৌকিতে বসিয়া, সটকার দীর্ঘ নলের রজত-নির্ম্মিত মুখনলটিতে মুখ লাগাইয়া, নিমীলিত নেত্রে দারোগা বাবু ধূমপান করিতেছিলেন। দেখিলাম, তিনি দারোগা বটেন, কিন্তু রোগা নহেন। তাঁহার দেহের আয়তন অতি বিপুল। এতদ্দেশীয় মাতঙ্গগণ সে বিপুলাঙ্গের তুলনা নহে ; সে দেহের তুলনা করিতে হইলে, উত্তর মহাসাগর হইতে তিমি নামক মৎস্যের আমদানি করিতে হয়। থাক,—এখন এই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। অপরাজিতার বিরহে, পুলিসের প্রহারে আমি এখন বড়ই জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

নাসিকারন্ধ্র হইতে কুণ্ডলিকৃত ধূমরাশি ধীরে ধীরে উদ্গিরণ করিয়া স্তিমিতনেত্রে দারোগা বাবু আমার প্রহরিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কলিকাতা আলিপুরের আসামী ?"

তাহারা বলিল—"হাঁ।"

তখন দারোগা বাবু আমাকে রাত্রের জন্য হাজত ঘরে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দিলেন। ইহা জেলখানার হাজত নহে ; থানাগৃহেই একটি ঘর।

আমি হাজত ঘরে প্রবেশ করিলে প্রহরীরা আমার নিগড়বন্ধন খুলিয়া লইল। মুক্ত হইয়া, সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে আমি দেখিলাম, হাজত ঘরের ভিত্তিগুলি আলকাৎরার দ্বারা কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত ; এবং ঐ ঘরে কয়েকখানি লৌহ-নির্ম্মিত খট্টায় কৃষ্ণবর্ণ কম্বলের বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে। আমার জন্য একটি বিছানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রহরীরা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। বলাবাহুল্য, ষ্টেশনে সেই মারামারির কথাটা প্রহরীরা যুক্তিপূর্ব্বক গোপন করিয়াছিল।

আমি বিছানায় বসিয়া, ভাবিতে লাগিলাম কিরূপে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাইব ? উদ্ধার পাইয়া কিরূপে অপরাজিতার সন্ধান পাইব ? অপরাজিতার সন্ধান না পাইলে, কিরূপে জীবনধারণ করিব ? মহা দুঃখে আমার চোখ ফাটিয়া জলধারার পর জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মানুষ যখন নিরুপায় হইয়া পড়ে, তখন সে

ভগবানকে মনে করে। মনে করে, তাঁহাকে কাতর-কণ্ঠে ডাকিলে, তিনি নিরুপায়ের সহায় হ'ন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে ডাকিলাম—"হে ভগবান! হে দয়াময়! আমাকে অনন্তবিপদে নিক্ষেপ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কেবল আমার অপরাজিতাকে অনাহত রাখিও। কেবল বলিয়া দাও, কোথায় অপরাজিতা? অপরাজিতা কোথায়? হরি; মধুসূদন, তোমার দয়াময় নাম সার্থক কর; বল, কোথায় অপরাজিতা?" কাঁদিতে কাঁদিতে, ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে, অবসন্ন হইয়া কম্বলশয্যায় শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, স্মরণ নাই। কারাগারের দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ শুনিয়া, উঠিয়া বসিলাম। ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে আশা জাগিয়া উঠিল। মনে হইল ভগবান সত্যই দয়াময়; তিনি আমার কাতর প্রার্থনা অবহেলা করিতে পারেন নাই; আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য দেবদূত পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেখিলাম, দেবদূতের হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন এবং তাহার পশ্চাতে অন্য এক ব্রহ্মদূত গলায় উপবীত ঝুলাইয়া, হস্তে একটা পাত্র বহন করিয়া আনিয়াছে। আমি যে উদ্ধারের আশায় অভিভূত হইয়াছিলাম, তাহার নেশা কাটিয়া গেলে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে ব্যাপার আর কিছুই নয়;—ব্রাহ্মণ পাচক, আমার জন্য রাত্রের আহার লইয়া আসিয়াছে—হালুয়া, রুটি!

বিছানা হইতে উঠিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলাম, এবং অতি পিপাসা নিবারণার্থ, যথেষ্ট জলপান করিয়া বিছানায় আসিয়া, পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। দ্বাররক্ষক দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কক্ষে পুনরায় ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে বিছানায় পড়িয়া,—আশ্চর্য্যের বিষয়—এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। বোধ হয়, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আমি নিদ্রিত ছিলাম।

তাহার পর, আবার দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে, আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম, মুক্তদ্বারে তিনজন প্রহরী, একজন ভদ্রবেশী শ্মশ্রুমুখ বাঙ্গালীকে ধরিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালী বাবুটি টলিয়া পড়িতেছেন, ও নানা প্রকার অসম্বদ্ধ বাক্য অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতেছেন। প্রহরীরা অতিকষ্টে তাঁহাকে সংযত রাখিয়াছে। দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনি মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে সংজ্ঞাশূন্য হওয়ায় প্রহরীরা তাঁহাকে রাজপথ হইতে ধরিয়া আনিয়াছে। অনেক চেষ্টার পর, প্রহরীরা কোনক্রমে তাঁহাকে আমার খট্টার নিকটবর্ত্তী অন্য এক খট্টায় শায়িত করিল; পরে নানারূপ হাস্য কৌতুক করিতে করিতে, কারাদ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর, কয়েক মিনিটের মধ্যে, সমস্ত থানাগৃহ নিঝুম অন্ধকারে নীরবে ঘুমাইয়া পড়িল। পৃথিবী জনকোলাহলশূন্য হইয়া, অত্যন্ত নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। আমি কিন্তু বিনিদ্র থাকিয়া, চারিদিকে নিরাশার ঘোর অন্ধকার অবলোকন করিতে লাগিলাম!

কিয়ৎকাল এই ভাবে অতীত হইবার পর, সহসা আমার শায়িত দেহের উপর একটা গুরুভার দ্রব্য পতিত হওয়ায়, আমি চমকাইয়া উঠিলাম। হস্তচালনা করিয়া অনুমানে বুঝিলাম, একটা লোক আমাকে ঘেরিয়া, আমার শয্যায় আসিয়া শুইয়াছে। লোকটার গাত্র হইতে সুরার তীব্র গন্ধ নির্গত হওয়ায়, আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে পার্শ্ববর্ত্তী শয্যা হইতে নেশার ঘোরে, মাতালটা আমার বিছানায় আসিয়া শুইয়াছে। আমি তাহাকে ঠেলিয়া, আমার শয্যা হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু লোকটা নড়িল না; আমার শয্যায় শুইয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে জিজ্ঞাসা করিলাম —"কি বলিতেছ?"

মাতাল বলিল—"খ—খব্—খবদার।"

আমি। কি?

মাতাল। আমি, আমি; খবরদার আমাকে অপমান ক'র না। আমাকে খাতির করিবে; আপনি মহাশয় বলিবে। আমি কে জান?

আমি। না, কে তুমি?

মাতাল। আবার 'তুমি'?—বল, 'কে আপনি?'

আমি। কে আপনি ?

মাতাল। তোমার বাবা।

আমি। কেন অকারণ গালি দিতেছেন ? আপন বিছানায় যাইয়া শয়ন করুন।

মাতাল। আমার নাম কি জান ?

আমি। কি ?

মাতাল। মহাদেব। শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়, আসিস্টাট ষ্টেশন মাষ্টার, বেনারস্ ক্যাণ্টমেণ্ট ষ্টেশন। মহাদেব কার্ত্তিকের কে ?

আমি। বাবা।

মাতাল। তাহা হইলে আমি তোমার বাবা হইলাম কি না ?

আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, লোকটা সত্যই মাতাল কি না। কই ইহার কথায় ত আর কোন প্রকার জড়তা নাই। এ ব্যক্তি আমার হরিদ্বারের নামটি কিরূপে জানিল ? বিস্ময়ে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে ?"

মাতাল। আমার যথার্থ পরিচয় এই যে আমি মাতাল নই; মাতলামী আমার ভান মাত্র। আমি মহাদেব; আমি কার্ত্তিকের সন্ধানে বাহির হইয়াছি।

আমি। সন্ধান পাইয়াছেন ?

তিনি। এই যে কার্ত্তিক বাবাজী আমার পার্শ্বেই শুইয়া রহিয়াছেন।

আমি। আমার নাম আপনি কিরূপে জানিলেন ?

তিনি। বাবাজীর নাম, ধাম, ও গুণপণা,—মহাদেবের কিছুই অবিদিত নাই।

আমি। আমার কি গুণপণা জানেন ?

তিনি। সমস্ত।

আমি। আমি হঠাৎ কিরূপে রাজদ্রোহী হইলাম, বলিতে পারেন ?

তিনি। শোন, আমি দুই তিন ঘণ্টাকাল অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা সমস্তই তোমাকে বলিব। তাহা বলিবার জন্যই, আমি মাতাল সাজিয়া ধরা দিয়া, কৌশলে এই হাজত ঘরে আসিয়াছি। নতুবা আমার চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও মাতাল হয় নাই। যদি পারিতাম, আজ রাত্রেই তোমার উদ্ধার করিতাম। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। এজন্য সেই অসম্ভব কাযের চেষ্টা করিব না। সোজা পথেই তোমাকে উদ্ধার করিব।

আমি। কেন আমার জন্য এত করিবেন ? আপনি আমার কে ?

তিনি। আমি তোমার পিতা না হইলেও, পিতৃস্থানীয়। কিন্তু আমার পরিচয় পরে দিব। এখন, তোমার বিপদটা কিরূপ তাহাই আগে বলিব।

আমি। যদি তাহা জানিতে পারিয়া থাকেন, আমাকে বুঝাইয়া দিন।

তিনি। কলিকাতার পূর্ব্বদিকে শুঁড়ো; শুঁড়োর দক্ষিণে শ্যামপুর গ্রাম। সেই গ্রামে, একটি বাটীতে কয়েকটি দরিদ্র বালক বাস করিয়া, শিয়ালদহের এক স্কুলে পড়িত। এই দরিদ্র বালকগণের উপর পুলিসের একটু নজর পড়িল;—কলিকাতায় এত বাড়ী থাকিতে, ইহারা এই নির্জ্জন পল্লীতে আসিয়া বাস করিতেছে কেন ? পুলিস উপরিওয়ালাকে রিপোর্ট করিল একদল রাজদ্রোহী বালক ঐ বাটীতে বাস করিতেছে; সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তাহারা গীতা ও যুগান্তর পড়ে; তাহাদের নিকট অনেক অস্ত্র শস্ত্রও আছে। পুলিস যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নয়, ইহা প্রমাণ করা ব্যতীত ঐরূপ রিপোর্ট দিবার আর অন্য কারণ ছিল না। রিপোর্ট পড়িয়া উপরিওয়ালারা হুকুম দিলেন, পাকড়াও। কিন্তু সেই বালকগণ সুচতুর; তাহারা পুলিসের গুপ্ত উদ্দেশ্য বুঝিল। ইহার পর, তাহাদিগকে পাকড়াও করা সম্ভব হইল না। সে বাড়ীতে তের জন লোক বাস করিত; পুলিস কোঁমর বাঁধিতে না বাঁধিতে, তাহারা সকলেই পলাইল; পুলিসের লোক একটি লোককেও ধরিতে পারিল না। যে জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রতি এ কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা ভাবিল, তাহাদের এই অকর্ম্মণ্যতার জন্য তাহাদের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে। অতএব

তাহারা পল্লীবাসী তিনজন নিরীহ লোককে, এবং তাহাদের পরিচিত এক পাণওয়ালাকে রাজসাক্ষী করিয়া, চালান দিল; এবং রিপোর্ট করিল যে ঐ বাড়ীতে মোট পাঁচজন লোক বাস করিত; তাহাদের মধ্যে ঐ চারিজন ধরা পড়িয়াছে; এবং বাকী একজন পলায়ন করিয়াছে। যে পলায়ন করিয়াছে, রাজসাক্ষীর নিকট জানিতে পারা গিয়াছে যে তাহার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি এবং তাহার পিতার নাম অজানিত। এই কাল্পনিক অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলিকে ধরিবার জন্য, হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দেশে দেশে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে।

আমি। বাল মুরাদাবাদ ষ্টেশনে একখানি সংবাদপত্র কিনিয়াছিলাম, তাহাতে আলিপুর আদালতের সংবাদে, ঐরূপ এক মোকর্দ্দমার কথা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে পলাতক আসামীর নাম লিখিত ছিল না। তাহা লিখিত থাকিলে, আমি ঐ নাম গ্রহণ করিতাম না এবং অকারণ আমার এই কষ্টভোগ ঘটিত না।

তিনি। শুনিলাম, তুমি শাহজাহানপুরে ডেপুটী বাবুর পিতার নিকট ঐ অপূর্ব্ব নাম বলিয়াছিলে। কেন বলিয়াছিলে, জানি না;—ইহাকেই বোধ হয়, লোকে বিধিলিপি বলে। ডেপুটী বাবু তোমার ঐ নাম শুনিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়াই নানাস্থানে তার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, পুলিস তোমাকে লক্ষ্ণৌ হইতে নজরবন্দিতে আনিয়াছিল।

আমি। পুলিসের লোক কিরূপে বুঝিল যে আমি ঐ নাম বলিয়াছি?

তিনি। অতি সহজে। প্রথমতঃ ডেপুটীবাবু যে তার করিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে তোমার সহিত একটা বড় ট্রাঙ্ক ও একজন স্ত্রীলোক আছে। পরে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে, এক পুতুলওয়ালার দ্বারা, পুলিশ তোমার কোন কোন সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল। ঐ সংবাদে, ঐ ট্রাঙ্কে, আর ঐ স্ত্রীলোকে পুলিস তোমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল।

আমি। ঐ স্ত্রীলোক কোথায়? আপনি যখন এত সংবাদ জানেন, তখন অবশ্য তাহার সংবাদ অবগত আছেন। সে কোথায়? আমি তাহার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি।

তিনি। ব্যাকুল হইবারই কথা। তোমার ব্যাকুলতা নিবারণের জন্যই, ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া শুঁড়ীর দোকানে ঢুকিয়া, আধ বোতল লইয়া, কাপড়ে চোপড়ে মাখিয়াছিলাম; এবং ধরা পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বোতলটি মাথায় দিয়া রাস্তার ধুলায় শুইয়া ছিলাম। সেও তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে।

আমি। তাহাকে আপনি দেখিয়াছেন? বলুন, কোথায় সে?

তিনি। সে আমার ষ্টেশনের কোয়ার্টারে, তাহার খুড়ীর নিকট শুইয়া আছে।

আমি মনে মনে ডাকিলাম, "জয় জগন্নাথ! তুমি যথার্থ পতিতপাবন। তুমি যথার্থই বিপন্নের কাতর প্রার্থনা শুনিতে পাও; শুনিয়া তোমার অচিন্তনীয় উপায়ে, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তোমার জয় হউক! আমি যেন আর কখন তোমার করুণায় অবিশ্বাস না করি।"

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

হেমচন্দ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমালোচনায় 'বৃত্রসংহার।'

আদর্শের মহত্ত্ব। আমরা 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র বাহিরের দিকটি—তাহাদের আকৃতিগত বৈষম্য সম্বন্ধে—কাব্যদ্বয়ের ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধে—সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমরা এক্ষণে কাব্যদ্বয়ের ভিতরের দিকটি দেখিব। তাহাদের নৈতিক আদর্শ, ভাবসম্পদ ও শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন একস্থানে লিখিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের কবি হৃদয় বীরজনসুলভ কঠোরতায় ও সাধুতায় পরিপূর্ণ, ইহাই বঙ্গীয় কাব্যজগতে হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাঁহার কবিতা পাষাণের মত কঠোর অকুটিল, অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু নীরস নহে। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে এইরূপ আর একজন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারবি। হেমচন্দ্র একালের কবি নহেন। এই বাঙ্গালী কবির হৃদয় প্রাচীন গ্রীক কবির উপাদানে গঠিত। তাঁহার বিষাণ একালে বাজিলেও, প্রাচীন 'হেলিকন' পর্ব্বতের আমদানী। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাচীন হোমর, টাসো, দান্তে, পিণ্ডার প্রভৃতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন × × × প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় তাঁহার সঙ্গীতধ্বনি অতিমানব ঘটনাবলম্বনে, উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নিম্নস্থ জনমানবকে লক্ষ্য করিয়া ঝরিতেছে। তাঁহার সমস্ত চেষ্টায় নৈতিক লক্ষ্য ও মানব মনের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্য বিদ্যমান। হেমচন্দ্রের সাহিত্যিক আদর্শ মহান্। তিনি শুধু সরস্বতীর প্রিয়পুত্র নহেন, প্রিয় সেবক। নানা বিদেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়া তিনি আমাদের দীনা বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার সারস্বত জীবন সর্ব্বত্র মৌলিক কবিত্বময় না হইলেও, তাহা মহত্ত্বের উজ্জ্বলতায় চিরদিন উদ্ভাসিত থাকিবে।"

বাস্তবিক মধুসূদনের আদর্শ অপেক্ষা হেমচন্দ্রের আদর্শ উচ্চতর ছিল। অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় একস্থানে যথার্থই লিখিয়াছেন যে হেমচন্দ্র নিজের "অজ্ঞাতসারে চিরদিন মানবীয় উচ্চভাবের উদ্দীপনা ও উৎকর্ষে মনুষ্যকে দেবত্ব দিতে দেবদূতের ন্যায় চেষ্টা করিয়াছেন। সূর্পণখার হাবভাব, তারার প্রণয়-লালসা, ব্রজাঙ্গনার রতিবিলাস, প্রমীলার গিরিশৃঙ্গসমা সুউচ্চ কুচযুগের শোভা বা অধরে মধুর হাসি হেমচন্দ্রকে আকর্ষণ করে নাই।"

মধুসূদনের বিকৃত শিক্ষা ও আদর্শের জন্যই তাঁহার কাব্যের অপকর্ষতা ঘটিয়াছে একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

চরিত্র-চিত্রণ। যেখানে মহৎ আদর্শ নাই, মহৎ অনুষ্ঠান নাই, সেখানে মহৎ চরিত্র কি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে পারে?

সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই।"

প্রথম বর্ষের "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধে'র চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, যথাযথ চরিত্রচিত্রণে মাইকেল একবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা সেই বিস্তৃত প্রবন্ধ হইতে

অংশ বিশেষ উদ্ধার করিনু,কিন্তু পাঠক মাত্রকেই আমরা মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, কারণ এরূপ নির্ভীক ও নিরপেক্ষ কাব্যসমালোচনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

মাইকেল কোনও পত্রে লিখিয়াছেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in 'মেঘনাদ' is with the Rakhshasas! And that is the real truth. I despise Ram and his rabble, but the idea of রাবণ elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow." রবীন্দ্রনাথ বলেন, মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভভাগে "মধুকরী কল্পনা দেবী"র যে এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি হইল?" তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, "রাবণকে মাইকেল মহান্ চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রী-প্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রি সদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু 'কোমল সে ফুলসম' করিয়া গড়িয়াছেন।" মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাবণ কাঁদিতেছেন—

> এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
> বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে,
> অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে"—ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,"রাণী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয় গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়,তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, নিহত হইল, ঐশ্বর্য্যশালী জনপূর্ণ কনক লঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি:যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসান অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত।** যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় ত কি বুঝিব? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবেন, না সভাসুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন; কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শাণ প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্ব্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন! কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই ত, তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে "এ ভবমণ্ডল মায়াময়" আর তিনি উত্তর দিবেন "তাহা জানি তবু জেনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ!" যখন রাবণ বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া বলিতেছেন "যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুল সাধ এ শয়নে সদা" তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্ত্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান্ ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাঁহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

> "নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস।
> পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ॥
> নিশান্তে গগন পথে ভানুর ছটায়।
> বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায়॥
> ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন পরে।
> বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য পদ ভরে।"

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন

ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন তখন রাবণ কহিলেন, "এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারম্বার" কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন—*

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে,
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ,
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও,
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানব তিলক! ইত্যাদি

ইহার মধ্যে ভয় ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি "প্রভঞ্জন" "কলম্বকুল" প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্র, সমস্ত পাঠ করিয়া তোমার মন ভাবগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাব প্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা চরিত্র চিত্রে কি অভাব কি হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাঁহারা ভাসিয়া যান, কবিতার হৃদয় দেখেন না কবিতার শরীর দেখেন।"

ভক্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রনিরতা লক্ষ্মীর চরিত্র, ইন্দ্রজিতের ষড়যন্ত্রের সংবাদ শুনিয়া যে ইন্দ্র বলেন, "পন্নগ অশনে নাগ নাহি ডরে যত, ততোধিক ডরি তারে আমি" সেই দেবরাজের চরিত্র চিত্রিত করিতে মাইকেলের অক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। মাইকেলের চরিতকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, 'রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে কবি যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে মর্ম্মাহত হইতে হয়।' বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে কবি বলাইয়াছেন—

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধসাজ ত্যজিনু তখনি;
মূঢ় যে মাটায় সখে হেন বাঘিনীরে।

বিভীষণকে ডাকিয়া তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে কহিতেছেন—

"এবে কি করিব, কহ, রক্ষকুলমণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগ পালে?"

লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পাঠাইতে রাম বলিতেছেন

"হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল বীরকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেবনর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।"

"ভিখারী" রাঘব কেবলই কাঁদিতেছেন, "কেমনে ফেলিব এ ভ্রাতৃরতনে আমি এ অতলজলে?"

লক্ষ্মণ সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "কবি যে কেবল বীরোচিত ঔদার্য্যে ও মহত্ত্বে লক্ষ্মণকে কাপুরুষবৎ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা নয়; শারীরিক বলেও তিনি তাঁহাকে শিশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন। ক্রুদ্ধ মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতেও আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। সে অবস্থাতেও

"মায়াময়ী মায়া বাহু প্রসারণে,
ফেলাইল দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে,
করপদ্ম সঞ্চালনে।"

কবি নিরস্ত্র মেঘনাদকে লক্ষ্মণ দ্বারা যেরূপে হত্যা করাইয়াছেন তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। যোগীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে কবি মেঘনাদবধে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার কাব্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিবে।"

মাইকেলের দেবচরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, "ইচ্ছাপূর্ব্বক মধুসূদন রাক্ষস-পক্ষের

* আবার সেই "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"—পংক্তিটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিবার জন্য অক্ষয়চন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথও এই অংশটি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলেন ইহা নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

শৌর্য্য বীর্য্য মহিমাময় করিয়াছেন। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইলেও মাইকেলের মহেশ-মহেশ্বরীর চিত্র হেমচন্দ্রের ঐ সকল চিত্র অপেক্ষা অধিকতর দেবতার মত।" হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার একত্র পাঠ করিবার পর তাঁহার সৃষ্ট দেবচরিত্র সম্বন্ধে পাঠকগণকে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মাইকেল মহেশ্বরীর চরিত্র কিরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে এইরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন :

"ইন্দ্রের অনুরোধে পার্ব্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্ত্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,

"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যেথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা ; চল ত্বরা করি।"

"বাছা" কহিলেন—

"কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিনী,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবী, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেবসহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি,
ছদ্মবেশী হৃষিকেশ ত্রিভুবন হেরি,
হারাইল জ্ঞান সবে এ দাসের শরে।
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য ; নাগদল নম্র শির ; লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি,
অচল হৈল হেরি উচ্চ কুচযুগে।
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর ?"

'বাছা'র সহিত 'মাতা'র কি চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন ? মলম্বা অম্বরের উদাহরণ দিয়া মদন কথাটি আরো কেমন রসময় করিয়া তুলিলেন দেখিয়াছেন ?"

কালিদাস সংযমী মহেশ্বরের চিত্রে মহেশ্বরের যে কঠোর আত্মসংযম প্রকাশ করিয়াছেন, যোগীন্দ্রনাথ বলেন, "মধুসূদনের হরধ্যানভঙ্গে তাহার কিছুই নাই। কামদেবের অস্ত্রাঘাত মাত্র তাঁহার (মুহূর্ত্তপূর্ব্বে "বাহ্যজ্ঞান হত" "তপঃসাগরে নিমগ্ন") মহাদেব অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাসলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিত্রে মধুসূদন কেবলই সংযমী মহাদেবের চরিত্রের মহত্ত্ব নষ্ট করেন নাই, ভগবতীরও চরিত্রের হীনতাসাধন করিয়াছেন। মহাদেবের তপোবিঘ্ন সম্বন্ধে কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তিনি পবিত্রচিত্তে মহাদেবের পূজার জন্য তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য কামদেব দেবকার্য্য উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, মহাদেবের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদবধের পার্ব্বতী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যানভঙ্গ করিয়াছেন। যিনি স্বয়ং তপশ্চারিণীগণের অগ্রগণ্যা এবং জগতে সহধর্ম্মিণী নামের আদর্শস্বরূপা তাঁহার চরিত্র এরূপভাবে চিত্রিত করা মধুসূদনের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।"

বিজাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদনের পক্ষে ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত করা বরঞ্চ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের দেবতাগণের চরিত্র যদি মাইকেলের আদর্শানুযায়ী হয় তাহা হইলে বৃত্রসংহার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের মূল্য কত তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

সর্ব্বাপেক্ষা সুচিত্রিত ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার চরিত্র মধুসূদন সর্ব্বত্র যথেচ্ছরূপে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার স্থান

নাই। রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা হইতে অংশ বিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করিব।

"যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

"কোথায় প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করী-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মন না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ! তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি!"

"হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্য কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই রঙ্গরসের কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্যচাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

"প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

"—লঙ্কাপুরে, শুনলো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে।
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব কুলসম্ভবা আমরা, দানবী,—
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে।
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে রাঘবের হেরি বীরপনা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে;" ইত্যাদি

"প্রমীলা লঙ্কায় যাউন্ না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন না কেন, তাহাতে ত আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সূর্পনখা পিসীর মদন মদের কথা, নয়নের গরল, অধরে মধু লইয়া সখীদের সহিত ইহাকি দেঙ্‌মাটা কেন?

যখন কবি বলিয়াছেন—

"কি কহিলি বাসন্তি? পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"

"যখন কবি বলিয়াছেন—

"রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী প্রমীলা"

তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্ব্বিত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক্ ঠারিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া ঢল ঢলভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোনমতে ভাল লাগে না!"

আমরা বাহুল্য ভয়ে মধুসূদনের চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম না। হেমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি যথোপযুক্তরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, কারণ হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে সামান্য একটি ঘটনা, সামান্য একটি আবরণের দ্বারা সুনিপুণ নাট্যকারের ন্যায়—প্রকৃত শিল্পীর ন্যায়—তাঁহার চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়াছেন, আমরা এই কাব্যের নাটকত্ব সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"এই কাব্যে বৃত্রাসুর, রুদ্রপীড়, ঐন্দ্রিলা, ইন্দুবালা, ইন্দ্র, জয়ন্ত, অনল, বরুণ, শচী, দধীচি মুনি প্রভৃতি অতি সুন্দর ও যথোপযুক্তরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। বৃত্র ও রুদ্রপীড়ের বীরত্ব, ঐন্দ্রিলার গর্ব্ব ও দুরভিলাষ পূরণের বাঞ্ছা, ইন্দুবালার মনের কোমলতা, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সহিষ্ণুতা, অনলদেবের ঔদ্ধত্য, বরুণের গাম্ভীর্য্য, দধীচির লোকহিতার্থ প্রাণত্যাগ, বিশ্বকর্ম্মার বজ্র নির্ম্মাণ—এ সকল ব্যাপার পাঠ-

মাত্র চিত্তমধ্যে যেন অঙ্কিত হইয়া যায়। রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালা মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার স্থানীয়। আরাধ্য রুদ্রপীড় কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রজিতের অনুরূপ হইলেও ইন্দুবালা প্রমীলা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্‌বিধ পদার্থ। ইন্দুবালার পতিপ্রেম, পতিকৃত সামরিক নিষ্ঠুর কার্য্যের চিন্তায় মনের সেই সেই ভাব, পরদুঃখকাতরতা, পতির নিধন শ্রবণেই মৃত্যু—এ সকল কোমলতা ও মধুরতার একশেষ।"

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "মধুসূদন যেরূপ রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র বিকৃত করিয়া জাতীয় শ্রদ্ধার পাত্রদিগকে অশ্রদ্ধেয় করিয়াছেন এবং কাব্যখানি অহিন্দুভাবাপন্ন করিয়াছেন—মঠ বা মন্দিরের ইষ্টক দ্বারা মস্‌জিদ্ উত্থিত করিয়াছেন, হেমচন্দ্র সেরূপ করেন নাই। তাঁহার দেবগণ দেবত্ববিহীন হন নাই, অথচ তিনি অসুরগণের প্রতিও কোন তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন নাই বরং দৈত্যরাজ বৃত্র, রাক্ষসরাজ রাবণ হইতে উচ্চতর কল্পনার পরিচয় দিতেছে।"

দেবাসুর উভয় পক্ষের প্রতি সমান সহানুভূতির উদ্রেক করা সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন, যেমন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বক্ষম সেক্ষপীয়রের চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয় কবি বলিয়াছেন "Stronger Shakespeare felt for men alone", যেমন উপন্যাসসম্রাট স্কট ও স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ প্রণয়নে অধিকতর ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, সেইরূপ হেমচন্দ্র স্ত্রী পুরুষ উভয় চরিত্রই তুল্যভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে হেমচন্দ্র নায়িকাগণের চরিত্রই অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য—

"যে সকল তত্ত্ব কাব্যের বিষয় তাহা মানবচরিত্রে নিহিত; অতি মানুষ চরিত্রের বিষয় আমরা কিছু জানি না। এই জন্য যেখানে মনুষ্যপ্রণীত কাব্যে দেবগণের অবতারণ দেখা যায়, সেইখানেই দেবগণ মনুষ্যাকল্প;—মানুষের ছাচে ঢালা। মহাভারতে, পুরাণে, ইলিয়দে, পারাডাইজ লষ্টে সর্ব্বত্রই দেবগণ হৃদয়ে মনুষ্যোপম, মানুষিক রাগ, দ্বেষ, দয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। হেমবাবুর সুরাসুর সুরী অসুরাগণ ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য। বাহ্যচিত্র মনুষ্যালোকাতীত, আভ্যন্তরিক চিত্র মানবানুকারী। তাঁহার সুরাসুরগণ অতিপ্রাকৃত শারীরিক শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য মাত্র।

"সমুদায় নায়ক নায়িকার মধ্যে শচীর চরিত্রেই মনুষ্যচরিত্র হইতে কিছু দূরতাপ্রাপ্ত—এই খানেই দৈবচরিত্রের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই শচীচরিত্রের অনবনত এবং অনবনমনীয় মহিমা সমালোচিত করিয়াছি। শচী মানুষীর ন্যায় পুত্রবৎসলা—মানুষীর ন্যায় দুঃখবিদগ্ধা, অতিপীড়িতা—অবনীর কঠিন মাটী তাঁহার পায়ে ফুটে, ইন্দ্রের সহিত মেঘবিহারের স্মৃতি নৈমিষারণ্যে তাঁহার মর্ম্মদাহ করে—তথাপি শচী বিপদে অক্ষোভ্যা, ভয়ে অসঙ্কুচিতা, আপনার চিত্তগৌরবে দৃঢ়সংস্থাপিতা, স্থৈর্য্যে এবং গাম্ভীর্য্যে মহিমাময়ী। সকল নায়ক নায়িকাদিগের মধ্যে শচীর চরিত্রই অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত প্রণীত হইয়াছে। বাঙ্গালাসাহিত্যে এরূপ উন্নত স্ত্রীচরিত্র কোথাও নাই। মেঘনাদবধের প্রমীলা ইহার সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয়া নহে। শচীর পার্শ্বে ইন্দুবালা দেবদারুতলায় নব মল্লিকার ন্যায় সিংহীর অঙ্কলালিত হরিণশিশুর ন্যায় অনির্ব্বচনীয় সুকুমার। শচীর পর ইন্দুবালার চরিত্রই মনোহর। বস্তুতঃ কাব্যমধ্যে, নায়িকাদিগের চরিত্রগুলিই উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়স্থল। শচী ইন্দুবালা, ঐন্দ্রিলা এবং চপলা সকলেই সুচিত্রিত এবং সুপরীক্ষিত।"

নাটকত্ব। বৃত্রসংহার একাধারে কাব্য ও নাটক। বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন, "বৃত্রসংহারের একটি গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে এবং গীতিকাব্য আছে। হেমচন্দ্র এই কাব্যে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকাব্যের ন্যায় সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কল্পনা করিয়াছেন। 'আর্য্যদর্শনে'র একজন সুবিজ্ঞ সমালোচক

লিখিয়াছেন, "তাঁহার কল্পনার চমৎকার চিত্র সকল দেখিলে বাস্তবিক তাঁহার কবিত্বশক্তির সমূহ প্রশংসা করিতে হয়। রণজনিতশ্রমে ক্লান্ত জয়ন্ত নিশীথে বনমধ্যে নিদ্রিত আছেন এবং চন্দ্রবিভাও তাঁহার মুখ-মণ্ডলে ক্ষণিক নিদ্রা যাইতেছে, ইন্দ্রাণী আসিয়া যখন সেই দৃশ্যের শোভা সম্ভোগ করিতেছেন, সেই একটি সুন্দর ও গভীর দৃশ্য। দানবরমণী ঐন্দ্রিলা যখন নন্দন কাননে বসিয়া আছেন, আর চারিদিকে সুরসুন্দরীগণ তদীয় বিলাস রচনায় নিরত আছে, সেই একটি চমৎকার দৃশ্য। চপলা যখন মদনের সহিত রহস্য করিতেছে, সেই একটি পরম রমণীয় দৃশ্য। ভীষণ যখন চপলার রূপে বিমোহিত হইয়া গেল, সেই একটি চিত্রকরের দৃশ্য। তৎপরে ভীষণ মায়াকাননে ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য যখন বিগলিত-হৃদয় হইয়া গেল, সেই ভাব বর্ণনা দ্বারা কবি কেমন চমৎকার কৌশলে সমস্ত দেবকন্যা অপেক্ষাও ইন্দ্রাণীর রূপের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন কুমেরু গিরি ছাড়িয়া কৈলাসাভিমুখে উঠিতে লাগিলেন, নিম্নে ধরাতল কেমন দেখিতে লাগিল, সেও একটি সুমহৎ দৃশ্য কল্পনা। বাস্তবিক এই সমস্ত দৃশ্যই তাহার কাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই প্রকার কতিপয় পুষ্প তাঁহার রণশোণিতরঞ্জিত ভয়ানক শ্মশানভূমির রচনামধ্যে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে।"

ভাষা ও ভাবের সংযম। কেবল সুন্দর দৃশ্যের কল্পনায় এবং সুন্দর চিত্রগুলি সুন্দরভাবে সংস্থাপনেই কবি কৃতিত্ব প্রদর্শিত করেন নাই, তাঁহার কাব্যের ভাষার আশ্চর্য্য সংযম ও গূঢ় নাটকীয় কৌশল স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিয়াছে। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বৃত্রসংহার কাব্যে ভাষার আশ্চর্য্য সংযম আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গূঢ় নাটকীয় কৌশলে কবি আমাদিগের নিকট দুই একটি ইঙ্গিতে সৌন্দর্য্যের অবতারণা করেন। বৃত্রের সভায় শচী আনীত হইলেন। তাঁহাকে ঐন্দ্রিলার দাসী করা হইবে। দৈত্যরাজের এই ঘটনায় বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই, কিন্তু শচীকে দেখামাত্র, উগ্রপ্রকৃতি দৈত্যরাজ অনন্যগতি হইয়া—

"চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র, উঠি দাঁড়াইলা।"

"বৃত্র যত বড় অসুরই হউন না কেন, দেবগণের প্রতি তাঁহার যতই ঘৃণা থাকুক না কেন, সৌন্দর্য্য তাহার প্রাপ্য সম্ভ্রম ও পূজা যেন সজোরে আদায় করিয়া লইল। এইরূপ কৌশলপূর্ণ অবস্থার সংস্থান দ্বারা কবি তাঁহার বর্ণনাগুলি সংক্ষিপ্ত ও সার্থক করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা যতই দীর্ঘ ও বেসুরা হউক না কেন, কিছুতেই বিরক্তিকর হয় না। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এ বিষয়ে বাঙ্গালীর অসামান্য ধৈর্য্যের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কবি হেমচন্দ্র অতি অল্প কথায় সৌন্দর্য্যের আভাস দিয়া পাঠকের কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্বোধিত করিয়া দিয়াছেন। শচীর সৌন্দর্য্যবর্ণনা দুই একটি কথায় শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "ঘোর ক্ষিপ্ত ও উন্মাদ" শচীর মুখ দেখিলে স্তব্ধ হইয়া পড়িত। ধন্য সেই সৌন্দর্য্য, যাহা চৈতন্যহীনের চৈতন্যের উন্মেষ করিতে পারে! যাঁহারা প্রতি ছত্রে ভাবিয়া পড়িবেন, কবি তাঁহাদিগের নিকট বেশী ধরা দিবেন। মেঘনাদবধের শব্দার্থ খুঁজিতে পাঠক কখনও কখনও থামিতে পারেন, কিন্তু বৃত্রসংহারের ভাবার্থ ও কাব্যগত নিপুণতা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পাঠককে অনেকবার থামিতে হইবে। এই ভাষার সংযম ও উচ্ছ্বাস-সম্বরণ-শক্তির জন্য কাব্যখানি একটু কঠোর শ্রী ধারণ করিয়াছে। শচী-পুত্র জয়ন্ত রুদ্রপীড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন; দৈত্যগণ এখনই শচীকে ঐন্দ্রিলার দাসী করিবার জন্য স্বর্গে লইয়া যাইবে; মৃতকল্প পুত্রের মুখ দেখিয়া শচীর মুখ 'বারিভারাক্রান্ত মেঘের' মত হইল, অথচ উন্নত 'কঠোর অশ্রু নেত্রে' স্খলিত হইল না। তুষারশুভ্র নৈরাশ্যের ন্যায় তিনি সেই স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন, "মলিন প্রস্তর-মূর্ত্তি অর্দ্ধ অচেতন।"

অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতাপন্ন কবি এই স্থান উপলক্ষ করিয়া বেহদ্দ কান্নার সুরে আমাদিগকে পাগল করিয়া ছাড়িতেন। এই সংযম শক্তিই হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব, এই গুণে তাঁহার চরিত্রগুলি অখণ্ড মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে। * * * *

"এই কাব্যখানিতে নাটকীয় কৌশল অনেক স্থানে লক্ষিত হইবে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঐন্দ্রিলা শচীকে দাসী করিবেন, শচী তাঁহার 'বসনভূষাতাম্বুল-বাহিনী' হইবেন, "অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ" —জগৎ-পূজ্যা দেবরাণীর এই অপমানে জগৎ ব্যথিত হইল। পাপের একটা সীমা আছে, বৃত্র আজ তাহা অতিক্রম করিল। এই ঘটনায় সহসা রুদ্র ভক্তের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার ক্রোধে 'ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব'গুলি ব্যোমপথে মিশিতে লাগিল ও ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। বৃত্রাসুর তাঁহার ভাবী সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাস বুঝিতে পারিলেন তাহা একটি কথায় কবি গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন,

'নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল।'

পলকহীন চক্ষু অপেক্ষা নির্ভীকত্বের কল্পনা উচ্চ হইতে পারে না। দৈত্যের ভাগ্যবিপর্য্যয় একটি পলক-পাতে সূচিত হইয়াছে, কবি অধিক কথা বলেন নাই।

"দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দৈত্যগণ পর্য্যস্ত হইয়াছে, অসংখ্য দৈত্য-শরে স্বর্গের অঙ্গন আবৃত। এই সময়ে ত্রিলোকভীতিকর শিবের শূল হস্তে বৃত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া শূল নিক্ষেপ করিলেন। নভঃপথে পরিভ্রাম্যমান শূল অলৌকিক জ্বালা ও তেজ বিচ্ছুরিত করিয়া ছুটিল। দেবগণ তিষ্ঠিতে না পারিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তখন

'প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল
ঘুরি অন্তরীক্ষময় লক্ষ্য না পাইয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র করে।'

এবং সেই ত্রিশূল-আলোকে,—

'দেখিলা অদূরে হয়ে ধূলি-বিলুণ্ঠিত
দনুজ-বিজয়কেতু, নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা।'

অধ্যায় শেষে এই চিত্রটি একটি সঙ্গিহীন সমুন্নত শৈল-শৃঙ্গের মত বোধ হয়; অথচ উহা কত অল্প কথায় চিত্রিত!

"রুদ্রপীড় বধে উন্মত্ত বৃত্র ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের প্রতি সেই সর্ব্ব-সংহারক ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছেন, সমস্ত দেবমণ্ডলী জয়ন্তকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মহা আশঙ্কায় দেবগণ উৎকণ্ঠিত। এই সময়ে—

'বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমান মার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে।'

"এই আকস্মিক শুভ ঘটনার জন্য পাঠক প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যরূপে মনের উপর ক্রিয়া করে। এই কৌশল হেমচন্দ্র সর্ব্বত্র দেখাইয়াছেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বজ্র গড়িতেছিলেন কিন্তু বজ্র নির্ম্মিত হইলে শিল্পী,

'না পারি ধরিতে ছেড়ে দিল অকস্মাৎ।'

বজ্র কিরূপ ভীষণ তাহা এই একটি কথায় কবি বুঝাইয়া দিলেন।"

সুরুচি ও নৈতিক সাবধানতা। শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে মধুসূদন তাঁহার কাব্যে স্থানে স্থানে কুৎসিৎ রুচির পরিচয় দিয়াছেন। পার্ব্বতীর অভিসার বর্ণনা, সূর্পনখার মদনমদের কথা লইয়া প্রমীলার রসিকতা প্রভৃতি কাব্যের কতদূর হীনতা সাধন করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। বিনা প্রয়োজনে

ধকধকে রত্নাবলী কুচযুগ মাঝে
পীবর। দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধুকালে

কিম্বা

মরে নর কালফণি নখর দংশনে,

কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণি
মণিময় হেরি তারে কামবিষে জ্বলে পরাণ।

ইত্যাদি পদ সন্নিবেশিত করিয়া মাইকেল তাঁহার বীররসপ্রধান কাব্যের কি সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের বোধগম্য নহে। মাইকেল তাঁহার চরিত্রেও যেমন সংযমের পরিচয় দেন নাই, তাঁহার কাব্যেও সেইরূপ সংযমের অভাব। যেখানে সতী প্রমীলা চিতারোহণ করিতেছেন, সেখানেও কবির দৃষ্টি সরু কটি ও সুউচ্চ কুচযুগে নিবদ্ধ

"মলিন দৌহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি। কবচ ভাবিয়া
সে সুউচ্চ কুচযুগে গিরিশৃঙ্গ সম।"

বৃত্রসংহারে হেমচন্দ্র যে সুরুচি ও নৈতিক সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই কাব্যে প্রেমের বাহুল্য নাই, বাঙ্গালা কাব্যের পক্ষে ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রথম যে অধ্যায়ে ঐন্দ্রিলা ও বৃত্র পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন সেখানে প্রেমের সুদীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্ত্তে অসুর-রমণীর বিশাল অভিমানের চিত্র দেখিয়া পাঠক চমৎকৃত হই-হইবেন। শচী অলোকসামান্যা রূপবতী, তাঁহাকে হস্তগত করিয়া অসুরের যে একটা প্রণয়-পিপাসা জাগিয়া উঠে নাই ইহা বড় সৌভাগ্য। শচী দৈত্যদের হস্তে অশেষরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু যে লাঞ্ছনায় কাব্যের গৌরব বিনষ্ট হইত, তাহা হইতে কবি সাবধানে শচীকে রক্ষা করিয়াছেন। বৃত্র আসুর তেজ ও আসুর দর্পের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সে কুনীতিপরায়ণ নহে। এই জন্যও অসুর হইলেও বৃত্র কাব্যের নায়কোপযোগী হইয়াছে। প্রেমের অভাবে এই কাব্যে বাঙ্গালী পাঠক একান্ত শূন্যতা অনুভব করিবেন। যেখানে ঐন্দ্রিলা বসনভূষণে সুন্দরী সাজিয়া দৈত্যরাজের মন হরণ করিতে চেষ্টিত, সেখানেও তাঁহার দৃঢ় অভিপ্রায় বিদ্যমান, প্রেমের ছদ্মবেশে আমরা সেখানেও ত্রিভুবনবিজয়িনী আকাঙ্ক্ষার অভিনয় দেখিতে পাই। রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা প্রেমিকা কিন্তু বিশ্বস্তিত, নির্ভীক সারল্য এবং ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার প্রেমের জীবন, ঔপন্যাসিক প্রেমিকাগণ হইতে তিনি স্বতন্ত্র এবং গৌরবজনক আসনের যোগ্যা। অসুরবালাগণ মৃত স্বামীদিগের শব দেখিয়া যে বিলাপ করিতেছেন, তাহাতেও কবির নৈতিক সাবধানতা দৃষ্ট হইবে। কোন রমণী—"ধীরে তুলি শিশুকরে কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠে সে কোমল করে! হায় কেহবা ধরিছে, পতির অধর-দেশে শিশুর অধর।" কিন্তু কোন স্থানেই রমণীগণ নিজেরা অভিনেত্রী সাজেন নাই, শিশুরা শবের কণ্ঠে লগ্ন হইয়া জননীদের মর্ম্মস্পর্শী শোকের অভিনয় করিয়াছে। মূল কথা কবি কাব্যের মর্য্যাদা সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন, কোথাও কোন চাপল্য প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপ সংযম বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব। কবি দীর্ঘ রূপবর্ণনার বিরোধী কিন্তু সহসা কোন বিশেষ অবস্থার সংস্থানে কাব্যোক্ত কোন চরিত্রের অসাধারণ স্ফূর্ত্তি পাইলে সেই চিত্রের উপর পর্য্যাপ্তরূপ আলোক আসিয়া পড়ে। কবিকে সেই বিশেষ বিশেষ ঘটনায় উচ্ছ্বাসিত মূর্ত্তি অবশ্যই আঁকিতে হইবে। ঐন্দ্রিলাকে যেখানে বৃত্র 'বামা তুমি' বলিয়া ঈষৎ অবজ্ঞা দেখাইয়াছিলেন, সেখানে অভিমানিনী পৃষ্ঠলম্বিত বেণী দোলাইয়া আহত ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীকে অনেক দর্পের কথা কহিয়াছিলেন, সেই স্থানে কবি উপমার উপর উপমা দিয়া ক্রুদ্ধা মানিনীর সেই সময়ের মূর্ত্তিটি আঁকিয়াছেন। যেখানে জয়ন্ত দৈত্যদিগের আস্ফালন শুনিয়া যুদ্ধোদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে কবির আর একটি চিত্রাঙ্কনের সুযোগ হইয়াছে। কি সাগ্রহ প্রতীক্ষায় জয়ন্ত যুদ্ধের রব শুনিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা উপর্য্যুপরি উপমা প্রয়োগে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই কাব্য কখনও যে সাধারণের প্রিয় হইবে, আমাদের সে ভরসা অল্প। ইহাতে পাঠককে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ দেবলোকে বিহার করিতে হয়। চিন্তাশীলতায় এতটা প্রবর্ত্তনের জন্য পাঠক প্রস্তুত থাকিবেন না। কবি বন্যফুলের

মত রাশি রাশি কবিত্বকুসুম কাব্যের পত্রে পত্রে ছড়াইয়া রাখেন নাই, পাঠকের অনায়াসলব্ধ পুরস্কার জুটিবে না। কবি বহুসংখ্যক পুষ্প নিষ্পেষিত করিয়া পুষ্পসার সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন, বহু গালন জল ঘনীভূত করিয়া তুষারের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার নিবিড়তার জন্য এই কাব্য সাধারণ পাঠকের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু এই কাব্যের অনন্যসাধারণ সংযম, পৌরুষ এবং গূঢ় নাটকীয় কৌশল বহু সম্মানের যোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্যে ইহার স্থান স্বতন্ত্র, কিন্তু বিশেষ গৌরবান্বিত। সাধারণ পাঠক ইহাকে আদর না করিলেও ইহা স্বীয় অখণ্ড সৌন্দর্য্যদর্পে মৌনভাবে স্বীয় নির্জ্জনস্থানে ভাবুক মণ্ডলীর পূজার প্রতীক্ষা করিবে।"

বর্ণনাশক্তি। মাইকেল তাঁহার কাব্যে অনেক বিষয় যথাযোগ্যরূপে বর্ণিত করিতে পারেন নাই। প্রথমেই রাবণের সভার যে বর্ণনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ বলেন তাহাতে গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব, তাহা রাবণের সভা নহে, যেন নাট্যশালার বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর,'

"ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কি একটি মহান্ গম্ভীর চিত্রই অঙ্কিত করিবেন, অন্য কোন কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না; সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক্, কবি কহিলেন—

'বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে'

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে কেহই এইরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না।"

মাইকেল কৈলাস শিখরের যে বর্ণনা করিয়াছেন—

'মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন মাধবের শিরে।
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণ ফুল শ্রেণী
শোভে তাহে আহা মরি পীতধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত বারি-রাশি স্থানে স্থানে
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ।'

রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না 'শিখিপুচ্ছ চূড়া যথা মাধবের শিরে।' মাইকেল ভাল এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখিপচ্ছ, পীতধড়া, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোন কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।"

মাইকেলের এই সকল "টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা"র ও হাস্যজনক উপমার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমালোচনায় বিস্তারিত ভাবেই দিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে সে সকল পুনঃপ্রদর্শিত করিতে গেলে 'পুঁথি যায় বেড়ে।' হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাঠকগণ অনেক পাইয়াছেন, এস্থলে 'আদর্শের' একজন সুবিজ্ঞ সমালোচকের অভিপ্রায় নিয়ে পুনঃ প্রকটিত করিলেই যথেষ্ট হইবে:—

"হেমচন্দ্রের বর্ণনা তাঁহার কবিতার প্রধান গুণ। তাঁহার কল্পনা যেমন উচ্চ ও গভীর, তাঁহার বর্ণনা তেমনি ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতে ও গভীরতর হইতে থাকে। তাঁহার বর্ণনায় ওজস্বিতা ও জীবিতভাব অনুভূত হয়। তাঁহার চিত্রসকল বর্ণে বর্ণে উচ্ছলিত দেখায়। তিনি ভাব সকলকে একে একে দলে দলে প্রবাহের মত আনিয়া ফেলেন। স্থির হইয়া দেখিতে পারি না, মনে সকল ভাবের অঙ্কপাত হয় না। কিন্তু

সমুদায় বর্ণনায় মনে একটি উচ্চভাবের উদ্রেক হয়। মন প্রমত্ত হয় না কিন্তু অধস্তন প্রদেশ হইতে উথলিয়া উঠে। একদা উচ্চে উঠিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। স্বর্গের দিকে নয়ন উন্মীলিত হয়। কবির বর্ণনার প্রভাব মনে উদিত হইতে থাকে।"

নৈতিক সৌন্দর্য্য ও লোকশিক্ষা।

কেহ কেহ বলেন,উত্তম কাব্যের প্রধান লক্ষ্য লোক-শিক্ষা, অপর কেহ কেহ বলেন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। 'সৌন্দর্য্য কি?'—তাহা সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিৎ সঞ্জীবচন্দ্র এই রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

"কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্যও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। কিন্তু কিসের সৌন্দর্য্য? কোন্ আকার ধরিয়া সৌন্দর্য্য কাব্যমধ্যে অবতরণ করিবে? যদি কাব্য না হইয়া ভাস্কর্য্য বা চিত্রবিদ্যা হইত, তাহা হইলে সহজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইত। রতির রূপ বা রুদ্রপীড়ের বল প্রস্তরে খোদিত হইত—নন্দনকাননের শোভা, বা সুমেরুর মাহাত্ম্য পটে বিকসিত হইত। কিন্তু গঠন বা বর্ণের সৌন্দর্য্য মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নহে—মনের সৌন্দর্য্য ইহার উদ্দেশ্য। কেবল পর্ব্বতের শোভা, রমণীর রূপ বা আকাশের বর্ণ ইত্যাদির দ্বারা মহাকাব্য গঠিত হইতে পারে না। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যই এইরূপ কাব্যের উদ্দেশ্য। মানসিক বা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য, কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। অতএব কার্য্যের বিবৃতি লইয়া এ সকল কাব্য গঠিত করিতে হয়। যে কার্য্য সুন্দর তাহাই কাব্যের বিষয়। কিন্তু কোন্ কার্য্য সুন্দর? ইহার মীমাংসা করিতে গেলে 'সৌন্দর্য্য কি?' তাহার মীমাংসা করিতে হয়। তাহার স্থান নাই—তাহার সময় এ নহে। তবে অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কোন মহদ্ধর্ম্মের সঙ্গে যে কার্য্য কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহাই সুন্দর। কার্য্যটি নীতিসঙ্গত না হইলেও হইতে পারে, তথাপি কোন সুপ্রবৃত্তি বা সুনীতির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাহি। সুন্দর কার্য্যই সুনীতিসঙ্গত। অতিভীষণ কার্য্যও এইরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হইলে সুন্দর হইয়া উঠে। যখন দেখা যায় যে কেবল ধর্ম্মানুরোধেই পরশু-রাম মাতৃহত্যারূপ মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই মহাপাপও সুন্দর হইয়া উঠে।

"কার্য্য অনেক সময়েই স্বতঃসুন্দর হয় না। অন্য কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াই সুন্দর হয়। রাম কর্ত্তৃক সীতা ত্যাগ স্বতঃ সুন্দর নহে, অনেক ইতর ব্যক্তি আপনার পরিবারকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু রামসীতার পূর্ব্বপ্রণয়, রামের জন্য সীতা যে দুঃখ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যে কারণে রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন, এই সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াই সীতাত্যাগ সুন্দর কার্য্য।—'সুন্দর' অর্থে 'ভাল' নহে। অতি মন্দ কার্য্যও সুন্দর হইতে পারে। এই রামকৃত সীতাবর্জ্জন ও পরশুরামকৃত মাতৃবধ ইহার উদাহরণ। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, যেখানে সম্বন্ধ বিশেষেই কার্য্যের সৌন্দর্য্য, তখন সে সৌন্দর্য্য ঐ সম্বন্ধের। আরও বিবেচনা করিতে হইবে—যে কার্য্য পরম্পরার যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে কতক-গুলি নিত্য। যেগুলি নিত্যসম্বন্ধ সেগুলি নিয়ম বলিয়া পরিচিত। ঐ নিয়মগুলিই নৈতিকতত্ত্ব। যদি কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধটি সৌন্দর্য্যের আধার হয়, তবে ঐ নৈতিকতত্ত্বগুলিও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিক অনেকগুলি কঠিন ও দুরূহ নৈতিকতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ—অপরিমিত মহিমময়। প্রতিভাশালী কবির হৃদয়ে পরিস্ফুট হইলে তাহা কাব্যে পরিণত হয়। নৈতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য; কিন্তু সৌন্দর্য্য নৈতিক তত্ত্বে নিহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন।

"মনুষ্যজীবন * সৌন্দর্য্যের উৎস—অতএব মনুষ্য-জীবনই কাব্যের বিষয়। কোটিরূপধারী মনুষ্যজীবন

* কাব্যের নায়ক মনুষ্যকল্প দেবতা হইলেও এ কথায় কোন ব্যত্যয় নাই।

কখন এক কাব্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না—এইজন্য কাব্যমাত্রে মনুষ্যজীবনের এক-একটী অংশ মাত্র ব্যাখ্যাত হয়। রামায়ণে রাজধর্ম্ম, মহাভারতে বিরোধ, ইলিয়দে ক্রোধ এবং মিলটনে অপরাধ। রোমিও জুলিয়েটে যৌবন, ম্যাক্‌বেথে লোভ, শকুন্তলায় সরলতা, উত্তরচরিতে স্মৃতি। সকলগুলিই নৈতিক বা মানসিক তত্ত্ব। তদ্বিরহিত শ্রেষ্ঠ কাব্য নাই।

"হেমবাবু মনুষ্যজীবনের যে মূর্ত্তি লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পরম সুন্দর। বাহুবলের শাস্তা ধর্ম্ম; ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অত্যাচার ঈশ্বরের অসহ্য; পুণ্যের সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ। এ তত্ত্ব সৌন্দর্য্যে পরিপ্লুত; যে প্রকারে ইহাকে স্থাপন কর, যে ভাবে ইহাকে দেখ, আলোকসম্মুখী রত্নের ন্যায় ইহা জ্বলিতে থাকে। হেমবাবু এই তত্ত্বকে এতদূর প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, যে ইহার দ্বারা অদৃষ্টও খণ্ডিত হইল; ত্রিভুবনজয়ী বৃত্রের আলয়ে রমণীর অপমান দেখিয়া ত্রিদেব—তিনমূর্ত্তিতে পরমেশ্বর—অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন—অকালে বৃত্রের নিধন হইল।"

বৃত্রসংহার যেমন নৈতিক সৌন্দর্য্য তেমনই শিক্ষায় পরিপূর্ণ। মেঘনাদবধে এ সৌন্দর্য্য—এ শিক্ষা নাই। বৃত্রসংহারের প্রধান শিক্ষা, মাননীয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকার মহোদয়ার ভাষায়, "পৃথিবীর সকল বল তখনই জয়শালী হয়, যতক্ষণ তাহা ন্যায়, সত্য ও পুণ্যের উপরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধর্ম্ম আসিয়া মিলিত হইলেই, যত বড় শক্তি হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সংসারে পুণ্যের জয় হইবে, ইহা যেমন সত্য, অধর্ম্মের ক্ষয় হইবে, ইহাও তেমন অনিবার্য্য।"

হেমচন্দ্রের কাব্যের অদ্ভুত সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র কিন্তু বলেন যে, তাঁহার জ্বালাময়ী কবিতায় "আমরা স্বধর্ম্ম শিক্ষার উপাদান পাই না।" অক্ষয়চন্দ্রের "স্বধর্ম্ম" কি তাহা আমরা বিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে দেবগণের গভীর স্বদেশবাৎসল্যে, ইন্দ্রের কঠোর সাধনায়, দধীচির মহান্ আত্মত্যাগে, শচীর দৃঢ় নির্ভরতায় ইন্দুবালার অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রেমে, সর্ব্বোপরি মহাকাব্যের যে মহতী নৈতিক শিক্ষার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল তাহাতে, কেবল হিন্দুর নহে, বিশ্বমানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার প্রচুর উপাদান আছে।

মাইকেলের নিকট ঋণ।—বৃত্রসংহারের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে উহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার স্থান নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে একটি বিষয়ে কিছু বলা উচিত। অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে হেমচন্দ্র মাইকেলের অনুকারী, বৃত্রসংহার মেঘনাদবধের অনুকরণে রচিত; মেঘনাদবধ না হইলে বৃত্রসংহার হইত না, মাইকেলের নিকট হেমচন্দ্র অনেক পরিমাণে ঋণী।

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, দুইটী কাব্যই বীররসপ্রধান, এতদ্ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্যই নাই। ভাষায় ও ছন্দে, চরিত্রচিত্রণে, নাটকত্বে, ঘটনাসংস্থানে, ভাষার ও ভাবের সংযমে, বর্ণনায়, নৈতিক সৌন্দর্য্যে ও শিক্ষায় বৃত্রসংহারের আদর্শ মেঘনাদবধের আদর্শ হইতে পৃথক্ এবং অনেক উচ্চ স্থানে সংস্থিত। হেমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি অনেক স্থলে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাব সঙ্কলন করিয়াছেন। যদি তিনি মাইকেলের নিকট কিয়ৎপরিমাণেও ঋণী হইতেন, তাহা হইলে, যাঁহারা তাঁহার প্রকৃতি জানেন, তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে হেমচন্দ্র মাইকেলের নিকট ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আসল কথা এই, মাইকেল স্বয়ং একজন প্রধান অনুকারক, এবং মাইকেল এবং হেমচন্দ্রের কাব্যদ্বয়ের কোন স্থানে যদি মিল্টনের প্রভাব সমানভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে একজন অপরের নিকট ঋণী বলা যায় না। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক

রাজনারায়ণ বাবু একস্থানে যথার্থ ই বলিয়াছেন, "এসিয়া কিম্বা ইউরোপ খণ্ডের এমন কোন কবি নাই, যাঁহাকে মাইকেল মধুসূদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল-রচনা শক্তি বিষয়ে, মোটা ধুতি ও দোজা পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শোভন ধুতি ও উড়ানী পরিধান-কারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোট পেণ্ট্‌লান পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন সন্দেহ নাই।" মাইকেলের নিরপেক্ষ চরিতকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় কোন্ কোন্ চরিত্র বা দৃশ্য কোন্ কোন্ পাশ্চাত্য কাব্য হইতে অন্ধভাবে অনুকৃত এবং সেই অন্ধ অনুকরণের জন্য স্থানে স্থানে তাঁহার কাব্যের কিরূপ অপকর্ষতা ঘটিয়াছে তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। পাঠকগণ জানেন যে মিল্‌টনের Paradise Lost এর প্রথম ছয় সর্গ হেমচন্দ্রের B. A. পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক ছিল। মিল্‌টনের "ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাজগাম্ভীর্য্য ও রচনার জমজমাট" তরুণ বয়স হইতেই যে তাঁহার মনে প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল ইহা অস্বাভাবিক নহে।

'মেঘনাদবধ' 'বৃত্রসংহারে'র পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সেই জন্যই কেহ কেহ মনে করেন বৃত্রসংহারের কবি মাইকেলের নিকট ঋণী। অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট পরবর্ত্তী লেখকগণের কোন কোন বিষয়ে ঋণ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কেবলমাত্র এক হিসাবে হেমচন্দ্রকে, মাইকেলের নিকট ঋণী বলিতে পারা যায়। যেমন মাইকেলের বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার, কদাচার ও অসংযতেন্দ্রিয়তা, জাতীয় আদর্শে অবজ্ঞা ও বিজাতীয় আদর্শের অন্ধ অনুকরণ অনেকের চক্ষু ফুটাইয়াছিল এবং তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণাম অনেককে জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছিল, সেইরূপ, হয়ত, মাইকেলের কাব্যের অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর, অসংযত ভাব ও ভাষা, স্থানে স্থানে কদর্য্য রুচির পরিচয়, জাতীয়তার অভাব, এবং পাশ্চাত্য কবিগণের অন্ধ অনুকরণ, হেমচন্দ্রকে সাবধান ও সতর্ক করিয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যে বৃত্রসংহারের স্থান।—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, একস্থানে বৃত্রসংহার সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, "রসের এবং ভাবের উদ্দীপনায়, স্থিরীকরণে যথোপযুক্ত সংযম এবং একাগ্রতা এই কাব্যের সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কুত্রাপি কবির চাঞ্চল্য অথবা দুর্ব্বলতার পরিচয় নাই। সর্ব্বদিক বিবেচনা করিলে এই কাব্যকে বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পূর্ণ সুগঠিত এবং সুলিখিত কাব্য বলা যাইতে পারে।" রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র বলেন, "সাধারণ পাঠক মেঘনাদ-বধের ক্ষিপ্র ও মুখর অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুবর্ত্তী হইয়া পক্ষপাতী হইবেন, কিন্তু মনস্বী পাঠক বৃত্র-সংহারের বাক্যপল্লবহীনতার মধ্যে মৌন বাণীর পরম কৃপা অনুভব করিবেন। চরিত্রসমূহের তেজ, গাম্ভীর্য্য, অভিমান এবং কাব্যের বিষয় ও অবস্থার সংস্থান সমস্তই অসাধারণরূপ গৌরবান্বিত। কবি সর্ব্বত্রই আমাদের দৃষ্টি অতি উচ্চ লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভার বরপুত্রগণ, যাঁহারা চিরদিন বাঙ্গালীর মানসরাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে প্রভুত্ব করিবেন, তাঁহারা সকলেই বৃত্রসংহারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একমত,—তাঁহাদের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই আমরা প্রকটিত করিয়াছি। আমাদিগের বিশ্বাস, চিন্তাশীল এবং রসজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই বঙ্গের কার্লাইল রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সহিত অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করি-বেন যে, "হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার মধুসূদনের মেঘনাদবধ হইতে তুলনায় অনেক উচ্চে অবস্থিত" এবং তাঁহার সহিত সমস্বরে কহিবেন, "বৃত্রসংহার সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মহাকাব্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন একখানি মহাকাব্য আর কোন দিনও ফুটে নাই, ভবিষ্যতে যে ফুটিবে এমন বেশী আশা নাই।"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

ভর্ত্তু

(গল্প)

"পিঙ্গলে—বাবু।"

হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া যে বারো তের বছরের ছেলেটিকে প্রতিদিন সংবাদপত্র বিক্রয় করিতে দেখা যাইত, আজও সে তেমনি নিত্যকার নিয়মে খরিদ্দারের আশায় প্রত্যেক পথযাত্রী ও ট্রামযাত্রী ভদ্রলোকের উদ্দেশে হাতের খবরের কাগজখানি আগাইয়া ধরিতেছিল। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যাইত, প্রতিদিনের মত আজ কিন্তু তাহার সে সতেজ উৎসাহ ভাব নাই। সেদিনকার বর্ষার আকাশের মতই তাহার চোখে মুখে ক্লান্তিজনিত কেমন একটা বিষণ্ণভাব মাখিয়া ছিল। ভাদ্রের শেষাংশ—তবু বৃষ্টির এবছর আর বিরাম নাই। আকাশ ভরা কেবল মেঘ আর জল। পথ কর্দ্দমাক্ত। কালীতলার মোড়ে জল জমিয়া সেই জল এখান অবধি ঠেলিয়া আসিয়াছিল, এখন কমিতে সুরু হইয়াছে। তবু পথে লোক চলাচলের শেষ দেখা যাইতেছে না। ট্রামগাড়ী একখানির পর একখানি যেন মন্ত্রবলে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘণ্টা বাজাইয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছে। ছেলেটি অভ্যাসবশে একবার করিয়া অগ্রসর হইয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়ায়, ব্যাকুল উৎসুকনেত্রে প্রত্যেক গাড়ীখানির ভিতর পর্য্যন্ত উঁকি দিয়া চাহিয়া দেখে, মুখে অভ্যস্ত বুলী—"বাবু—পিঙ্গলে" বলে, কিন্তু মন ও দৃষ্টি যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। আবার সে ফুটপাথের উপর গ্যাসপোষ্টে হেলান দিয়া বিরসমুখে ক্লান্তভাবে দাঁড়ায়।

শুধু আজ নয়, প্রায় দুই বৎসর দিনের পর দিন, সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এই এক কাযে একই ভাবে সে কাটাইতেছে। শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস যখন তাহার জীর্ণ পঞ্জরের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিত, গায়ের আবরণ ময়লা বোম্বাই চাদরখানি বা তাহার হাতের খবরের কাগজের গরম গরম খবরগুলি কিছুতেই যখন তাহার শীত নিবারণ করিতে পারিত না, তখন দুই কাঁধে হাত দিয়া শীত হইতে সে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিত। শিশিরপাত, বর্ষার ধারা বা গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের রৌদ্রতাপ এই ছেলেটির শরীরে মনে বেদনা দিয়া তাহার কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারিত না।

ছেলেটির নাম ভর্ত্তু। গয়া জেলায় তাহার দেশ,—দেশ সে কখন চক্ষেও দেখে নাই। এবং সংসারে আপন জন বলিতে এক বুড়া "দাদা" ছাড়া তাহার আর কেহই ছিল না। এই দাদাটিও তাহার খুব বেশী আপন নহে, বাপের দূর সম্পর্কীয় খুড়া জেঠা এমনি কেহ হইবে। অন্ধ বৃদ্ধ এখন তাহার ঘাড়ের বোঝামাত্র। মার কথা তার মনেও পড়ে না। মা না থাকায় তাহার মনে বিশেষ দুঃখবোধও ছিল না। সে দেখিয়াছে,—ছেলেদের মায়েরা তাহাদের যত্ন যেমনই করুক, সেই সঙ্গে "এ কোরনা ও কোরনা ওখানে যেওনা ওর সঙ্গে মিশো না"—এমনি সব নানা হাঙ্গামে তাহাদের দুঃখও দেয় খুব। সেবার হোলির দিন অমৃৎ কাদা মাখিয়া হোলি খেলিয়াছিল বলিয়া, তাহার মা কাণ দুইটা ধরিয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিয়া গালে দুই চড় বসাইয়া দিল। পরে অবশ্য বেশম লাগাইয়া স্নান করাইয়া, সাফ কাপড় গোলাপী রংকরা চাদর এবং জরী লাগান টুপী পরাইয়া, পয়সা মিঠাই দিয়া তাহার রাগ ভাঙ্গাইয়া খেলিতে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু ভর্ত্তুর গায়ের কাদা তাহার গায়েই শুকাইয়া রহিল, তাহাকে কেহ সাফ করিয়াও দেয় নাই, চড়ও কসায় নাই। পথের ধারে ভর্ত্তু যখন দাঁড়াইয়া থাকে, সে দেখিতে পায়, কোন মা যদি ছেলের সঙ্গে চলিলেন, তবেই সর্ব্ব-

নাশ!—"ঐ ট্রাম, ঐ গাড়ী, ঐ কাদা—নোংরা" আরও কত কি জঞ্জাল যে তাঁহাদের ননীর পুতুলদের জন্য পথে পথে জমান আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভর্ত্তুর মা নাই, তাহার ও সব কোন বালাই নাই, কাদা লাগিয়া লাগিয়া তাহার কাপড়খানির রং পর্য্যন্ত যে কাদার রং হইয়া গিয়াছে সেজন্য কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না কেন সে তার কাপড়খানি ধোপাঘরে দেয় নাই? সারাদিন না খাইয়া থাকিলেও কেহ যখন খাইতে ডাকে না, তখনই এক একবার তাহার মনে হয় মা থাকিলে মন্দ হইত না, খাবারের ভাবনাটা সেই ভাবিত,—ভর্ত্তুকে আর ভাবিতে হইত না।

বাপের কথা একটু একটু যেন মনে পড়ে। সে তখন যেন খুব ছোট। বাপ তাহার তরকারির বাজরা মাথায় লইয়া প্রতিদিন হাটে যাইত। ছোট একখানি রাঙ্গা সাড়ীর কৌপীন পরিয়া, গলায় ঘুন্সীতে একরাশ মাদুলী কবচ ঝুলাইয়া সে তাহাদের বাড়ীর সাম্নের রাস্তাটিতে সঙ্গীদের সহিত খেলা করিত, আর পথের পানেই চাহিয়া থাকিত। বাপ যখন খালি বাজরা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিত, প্রথমেই তাহার ছোট মুঠি ভরিয়া মুড়ী মুড়কি আর দুই গালে একরাশ চুমা দিয়া তাহাকে কোলে করিত। তার পর কবে কে জানে ভর্ত্তুর চোখের উপর হইতে ঝাপ্সা ঝাপ্সা সে স্মৃতির দৃশ্যও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের ভাঙ্গাচোরা ঘরখানিতে সে আর তার বুড়া দাদা। মনে পড়ে এই অন্ধের হাত ধরিয়া পথে পথে কতদিন সে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে। একবার এই অন্ধকে বাঁচাইতে গিয়া, গাড়ীর চাকায় তাহার ডান পা খানির হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাহাকে মেডিকেল কলেজে লইয়া যায়। সেখানে সে ছয় সপ্তাহ ছিল। বাপের অস্পষ্ট স্মৃতি ছাড়া, তাহার জীবনের স্মরণীয় সেই একমাত্র ঘটনা! হাঁসপাতালে থাকিতে কেনই যে লোকে ভয় পায় ভর্ত্তু ত তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না। খাসা ঘর; খাটিয়ার উপর গদি, মাথায় দিবার তাকিয়া, সাফ কাপড়, ঘড়ির কাঁটার মত সময় মাপিয়া রুটি, দাল, ভাত, সবই খাইতে পায়, নিজে হাতে রাঁধিতে ত হয়ই না, কি রাঁধিব, চাউল কোথায়, কাঠ কোথায় সে ভাবনাও ভাবিতে হয় না। যদি ভাঙ্গা হাড় যোড়া না লাগিত, পায়ের যন্ত্রণা সারিয়া না যাইত, ভর্ত্তু হয়ত মনে মনে খুসীই হইত। তবু সেখানে সব সুখ থাকিলেও একটা মস্ত দুঃখ ছিল—সেই বুড়া দাদার ভাবনা। সে বেচারা অন্ধ নিরুপায়! কে তাহাকে দুই মুঠা চাউল সিদ্ধ করিয়া দিতেছে—কে জানে? সে চাউলও ত আবার তাহাদের ভাণ্ডারে মজুত নাই, সেও যে "সুরদাসকো দয়া কর দাতা" বলিয়া বার্দ্ধক্যজীর্ণ অন্ধের হাত ধরিয়া পদে পদে বিপদসঙ্কুল পথে পথে ভিক্ষা করিয়া তাহাকে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। তাই হাঁসপাতালের ঔষধ পথ্য সেবায় কৃতজ্ঞচিত্ত ভর্ত্তু সম্পূর্ণরূপে এত সুখের মধ্যেও শান্তি পাইত না। মনটি তাহার সেই চিরদিনের অসংস্কৃত অমার্জ্জিত কুঁড়েখানির জন্যই ছটফট করিতে থাকিত।

সেদিন—যেদিন সে "মেটিয়া কালিজ" হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসে, সেদিন সকালবেলা কতকগুলি বাঙ্গালী খৃষ্টান মহিলা তাহাদের ওয়ার্ড পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন—কি সুন্দর তিনি! আর, কি মিষ্ট তাঁর কথাগুলি! সকলের সঙ্গেই তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কথা বলিতেছিলেন। ভর্ত্তুর পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিয়াছিলেন, "তবিয়ৎ কেইসা বাচ্চা?" ভর্ত্তু সসম্ভ্রমে জানাইয়াছিল, সে সারিয়া গিয়াছে এবং আজই সে "আস্পাতাল" হইতে "ছুটি" পাইবে। শুনিয়া হাসিমুখে তিনি বলিয়াছিলেন—"বহুৎ খুস হোঙ্গে! লেকেন্ ইয়াদ রাখনা লেড়কে, বদমাসী দিলদাগী বিলকুল ছোড় দেনা। ইমান্‌কো সবসে বড়া সমঝনা—তব না আস্‌লী আদমী বন্ যাওগে।"

ভর্ত্তু মাথা নীচু করিয়া কেবল একটুখানি হাসিয়াছিল। কথার উত্তর না দিলেও, কথাগুলি যে তাহার প্রাণের ভিতর পৌঁছিয়াছে, সে তাহার সকৃতজ্ঞ সজল দৃষ্টিতেই ব্যক্ত হইতেছিল।

নারীদল চলিয়া গেলেও ভর্ত্তু ব্যাকুল চোখে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। মনের ভিতরটা কি এক অস্পষ্ট অব্যক্ত সুখের ব্যথায় যেন পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, সেই মিষ্টভাষিণী প্রিয়দর্শনা নারীর পায়ের তলায় পড়িয়া সে একবার প্রাণ ভরিয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া লয়। একবার চীৎকার করিয়া বলে—এমন মিষ্ট কথা কেহ কখনও তাহার সহিত কহে নাই, সে আজ ধন্য হইয়াছে। কিন্তু চিরাভ্যস্ত সঙ্কোচ দীন বালকের মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে দিল না। গরীব ভিখারী সে, "হট যাও" "সরিয়া দাঁড়া" যাহার প্রাপ্য,—হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিবার বাতুলতার মত রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিবার সাহস সে কেমন করিয়া করিবে? পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি এক গণ্ডূষ জল পানে তৃপ্ত না হইয়া যেমন দ্বিগুণ পিপাসায় কাতর হয়, ভর্ত্তুর চিরদিনের স্নেহবঞ্চিত পিপাসী চিত্ত এই বিন্দুমাত্র স্নেহের স্বাদ অনুভবে তেমনি অতৃপ্ত স্নেহতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

হাঁসপাতালের বাহিরে আবার সেই অবাধ যাত্রা! সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া ভিক্ষান্বেষণ, বুড়া দাদা বাতের ব্যথায় আর পথ চলিতে পারে না। অন্ধকে যাহারা দয়া করিতেন, বালককে তাঁহারা দয়া করিয়া ভিক্ষা দিতে চাহেন না। তাহার কারণ যে দাতার মনে দয়ার অভাব তাহা নহে। ভেজালের বাজারে আসল নকল চিনিতে পাছে ভুল করিয়া ঠকিয়া যান, সেই ভয়ই বোধ করি বেশী। পুরাণ বন্ধু কিষণ আশ্বাস দিয়া কহিল, "ভয় কি, দুটা পেট বইত নয়, পথ থেকেই কুড়িয়ে বাড়িয়ে চালিয়ে নিবি। আমার সঙ্গে কাযে লাগ্, দেখবি কোন দুঃখু থাক্‌বে না। বুদ্ধি থাক্‌লে আবার রোজগারের ভাবনা—হুঁ!"

উপার্জ্জনের তালিকা শুনিয়া ভর্ত্তু নিরাশ হইল। চুরি—ছিঃ! চুরি সে করিবে না। কিষণ তাড়া দিয়া কহিল, "ওঃ কি আমার যুধিষ্ঠির রে! রাস্তায় পড়ে থাক্‌লে কুড়িয়ে নিতে যদি দোষ না থাকে, তুলে নিলেই কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে শুনি? কাঁচি দিয়ে কুচ করে পকেটটি কেটে নিলাম, ভিড়ের ভেতর অন্যমনস্ক পেলে, হলগে পকেট থেকে আস্তে আস্তে ঘড়িটা, মনিব্যাগটা, হলগে রুমালখানা কি চশমাখানা তুলে নিলাম। এই বইত না! মেহনৎও বেশী নেই, পেটও অনায়াসে ভরবে।" ভর্ত্তু কিন্তু বন্ধুর এ অমূল্য উপদেশ ও অমোঘ প্রলোভন জয় করিল। না—সে চোর গাঁটকাটা হইবে না। তাহাতে না খাইয়া যদি তাহাকে মরিয়া যাইতে হয় সোভি আচ্ছা। তাহার মন বলিতেছিল, আবার সেই সুন্দরী দয়াবতী বাঙ্গালী মেয়ের সহিত দেখা হইবে। তখন মুখ তুলিয়া উঁচু মাথায় দাঁড়াইয়া সে বলিতে পারিবে—তাঁহার কথা রাখিয়াছে, পেটের দায়ে সে চুরী করে নাই; সে সৎপথে থাকিয়া মানুষ হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

কিছুদিন অর্দ্ধাশন অনশনে থাকিয়া, ভিক্ষালব্ধ পয়সার কিছু জমাইয়া, অনেক চেষ্টায় সে আজ দুই বৎসর এই সংবাদপত্র বিক্রয়ের কাযটি জোগাড় করিয়াছে। চেষ্টা রাখিলে হয়ত ইহার চেয়ে ভাল কাযও কিছু জুটিতে পারিত। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, আবার তাঁহাকে সে দেখিতে পাইবে। আর, তাঁহার দেখা পাইবার সব চেয়ে সহজ উপায় তাহার পক্ষে এইটিই। তিনি কোথায় থাকেন ভর্ত্তু জানেনা, সুধু শুনিয়াছিল সেদিন সঙ্গিনীকে তিনি বলিতেছিলেন, "হ্যারিসন রোডের ট্রামে ওঠাই আমার সুবিধা।" সেদিনকার তাঁহার সেই কথাগুলি ভর্ত্তুর এখন জপমালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, প্রয়োজন অপ্রয়োজনেও সে এই পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। যখন কাগজ বিক্রির সময় নয়, তখনও সে অকারণে পথের ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। সময়াভাবে কতদিন স্নান হয় না, আহার হয় না। রাত্রে ঘুমাইয়াও সে শান্তি পায় না, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠে।

কিন্তু সেদিন দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার পর তাহার নিরাশাক্ষুব্ধ চিত্ত সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে আর পারে না। এমন করিয়া দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকা—এ যে আর সহ্য হয় না। নিরাশায়

অন্ধকার যতই জগাট বাঁধিয়া উঠে, বক্ষপঞ্জর ততই বেদনায় টনটন করিতে থাকে। সকালবেলাকার লবণ সংযুক্ত পান্তাভাত রুটি এত দুঃখের মধ্যেও কেমন করিয়া যে কখন জীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। এই লক্ষ্মীছাড়া পেট যদি না থাকিত, সে এই কাগজ বিক্রীর দায় এড়াইয়া নিজের কুঁড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মেজের উপর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। সেখানে সে চীৎকার করিয়া কাঁদুক, মাটিতে মাথা কুটিয়া রক্ত বহাক, যা খুসী করুক—কেহ কিছু বলিবে না, কোন খবর লইবে না। তাহার অন্ধ সঙ্গী দাদাটিকেও সে আজ দুইদিন জন্মের মত বিদায় দিয়াছে। পোড়া পেটের ভাবনা না থাকিলে আজ সে মুক্ত—সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত।

"পিঙ্গলে,—বাবু"—ভর্ত্তু তাহার অভ্যস্ত বুলি মুখে উচ্চারণ করিলেও মনে মনে বলিতেছিল, "এই শেষ! তিনি আসেন আজ ভাল, না আসেন আমার কাগজ বিক্রীর আজ পিণ্ডদান।"

ভর্ত্তুর মন চিন্তাসাগরের অতলে তলাইয়া গেলেও, দৃষ্টি তাহার পথবাহীদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কত রকমের কত লোক পথ দিয়া আসিতেছে যাইতেছে। ঐ একজন কলেজের ছেলে, বোধ হয় বই পড়িতে পড়িতেই পথ চলিতেছে। এখনি যে মোটর বা গাড়ীর তলায় দুখানা হবেন সে হুঁস নাই। ভর্ত্তু অগ্রসর হইয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিবার জন্য কহিল—"পিঙ্গলে"। ছেলেটি তাহার পানে না চাহিয়াই মাথা নাড়িয়া জানাইল, অনাবশ্যক। তা হউক, ভর্ত্তুর কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে ত। ছেলেটি বই মুড়িয়া পথের পানে চাহিয়া চলিতেছে, সেই ঢের।

দুটি ছেলের হাত ধরিয়া একজন ঝি আসিতেছিল। পাছে ছেলে দুটি কাদা জল মাখে তাই তাহাদের দুখানা হাত ধরিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া ফুটপাথের উপর তুলিবার হ্যাঁচকানিতে ছেলে দুটি চীৎকার করিতেছিল। ভর্ত্তু ব্যর্থ রোষে ঝিয়ের পানে চাহিয়া দেখিল, প্রতিবাদের সাহস হইল না। ঐ একজন স্ত্রীলোক আসিতেছেন না? ঘুরাইয়া শাড়ী পরা, পায়ে জুতা, হাতে ছাতি—তিনিই কি? তেমনই সুন্দর মুখ, তেমনই চলিবার ধরণ—ঐ যে বাঁ-হাতে ঘড়ী পরা, নিশ্চয়ই তিনি—আর কেউ নন। "জয় হনুমানজি!" ভর্ত্তুর এতদিনের সাধনা, এত দুঃখ পাওয়া, তবে সার্থক হইয়াছে। সে তবে সত্যই আজ মাথা তুলিয়া উঁহার পানে চাহিয়া বলিতে পারিবে, বড় দুঃখে পড়িয়াও সে অন্যায় কর্ম্ম করে নাই, না খাইয়া থাকিয়াছে তবু চুরি করে নাই। জয় কালীমাঈ!

রেশমী শাড়ীর প্রান্তদেশ বামহস্তে ধরিয়া, কাদায় জুতা বাঁচাইয়া মহিলাটি যথেষ্ট সন্তর্পণে পথ চলিতেছিলেন। দৃষ্টি তাঁহার ট্রামের পথের উপর। ভর্ত্তু আনন্দে হাতের কাগজগুলির কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া, সেগুলি মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়াই তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেল। "আমি—আমি—সেই যে দেখেছিলেন আমাকে"—আনন্দের আতিশয্যে তাহার রুদ্ধকণ্ঠে আর স্বর বাহির হইল না।

রমণী একবারে ঘোর অবজ্ঞাভরে তাহার পানে চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে পুনরায় ট্রামের রাস্তার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। ভর্ত্তুকে তখনও স্থিরভাবে কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাচ্ছিল্যভরে কহিতেন—"ইউ ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে।"

"শুনেন মা আমি ভিকিরি নই, এই দেখুন না আমার কাগজ পড়ে রয়েছে—আমি—আমি সেই ছোট ছেলে—হাঁসপাতালে—"

রমণী তীব্রস্বরে বাধা দিয়া কহিলেন—"বস্—বস্ কর, চলা যাও আবি। পয়সা নেহি মিলেগা।"

শব্দ করিয়া ট্রাম আসিয়া পড়িল। রমণী দ্রুতপদে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিয়া বস্ত্রাদি সাবধানে যথাবিন্যস্ত করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ছাতাটি মুড়িয়া পাশে রাখিয়া, রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে হাওয়া খাইতে লাগিলেন। ঘণ্টা দিয়া ট্রাম চলিতে সুরু করিল।

ভর্ত্তু স্তম্ভিত অভিভূত ভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃষ্টিধারার সহিত মাথার উপর কাহার শীতল কর-স্পর্শে সচকিত হইয়া সে মুখ ফিরাইল। পাড়ার নিষ্কর্ম্মা কনসার্টপার্টি দলের সভ্য নিতাই, গঙ্গাস্নান করিয়া ভিজা কাপড় পরিয়াই বাড়ী ফিরিতেছিল। হাতে গামছায় কতকগুলি পূজোপকরণ। নিতাই স্নেহকোমল স্বরে কহিল, "ভর্ত্তু যে, এমন করে দাঁড়িয়ে কেন রে? মুখখানা শুকিয়ে একেবারে আম্‌সি হয়ে গেছে যে—খাসনি বুঝি কিছু? আজ জন্মাষ্টমীর পূজা হচ্চে বাড়ীতে, ঠাকুরের প্রসাদ পাবি, চল। খাবিনি বই কি, তোর ঘাড় খাবে—চল। কাগজগুলো ফেলে দিয়েছিলি কেন রে? দেখ ত জলে কাদায় একেবারে মাটি হয়ে গেছে। এই যে আমি কুড়িয়ে এনেচি। নে ধর—আর আমার সঙ্গে আয়।"

মেঘে যিনি বজ্র বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে শীতল জলধারাও দিয়াছেন। শূন্যকে পূর্ণ করা তাঁহারই কায।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগর হইতে প্রকাশিত "The Costume of Hindostan, by Balt. Solvyns of Calcutta" নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পত্রিকায়, (১) তবলা, (২) ঢোলক, (৩) তানপুরা বা তম্বুরা, (৪) সেতারা, এবং আষাঢ় সংখ্যায় বীণা বা বীণ, (৬) বেহালা বা সারিন্দা, ও (৭) সারেঙ্গি—ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের এই ছবিগুলির অনুলিপি আমরা মুদ্রিত করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় (৮) জলতরঙ্গ, (৯) পাখোয়াজ, (১০) স্বরমঙ্গল ও (১১) কাড়া—এই চারিখানি চিত্র প্রকাশ করিলাম; এবং আগামী পৌষ অথবা মাঘ সংখ্যায় (১২) নাগরা, (১৩) ঢাক ও (১৪) জগঝম্প—এই ছবিগুলি ছাপিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১১১ বৎসর পূর্ব্বে একজন ভারত-প্রবাসী ইংরাজ চিত্রকর ভারতীয় বিষয়গুলি কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য—নচেৎ অধিকাংশ বাদ্যযন্ত্রই সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত, কেবল মাত্র বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

এই চিত্রকর প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রের সহিত একটু বর্ণনাও যোজনা করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। এই বর্ণনাগুলিতে স্থানে স্থানে অদ্ভুত ও হাস্যজনক কথাও আছে। ঢোলক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইহা মহাভারত পাঠের সময় বাজে।" —"বেহালা, যাহাদের সঙ্গীতে কাণ নাই এবং বিচার শক্তিই নাই, তাহারাই সাধারণতঃ বাজাইয়া থাকে। অন্ধলোকেরা ইহা বাজাইয়া পথে পথে বেড়ায়।" সেতার সম্বন্ধে বলেন—উপযুক্ত বাদকের হস্তে ইহার ধ্বনি মানবচিত্তের ঘোরতর বিক্ষোভ শান্ত করিতে সমর্থ; ইহা শোক দুঃখ প্রশমনের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ("The Sittara is said to be capable of tranquilising the most boisterous disposition, to which purpose it has often been applied, as well as to sooth distress and affliction")। পাখোয়াজ সম্বন্ধে

(৩৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র (৮)—জলতরঙ্গ

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র (৯)—পাখোয়াজ

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র (১১)—কাড়া

লিখিয়াছেন, ইহা বাজাইবার সময় বাদকগণ নানাপ্রকার অদ্ভুত ও হাস্যজনক মুখভঙ্গি করিয়া থাকে। ("make the most absurd and ridiculous grimaces")। কাড়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের সময় কাড়া বাজানো হয়। তিন দিন দুর্গাদেবীর পূজা হয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যা হইতে, পূজার পরিবর্ত্তে দেবীকে গালিমন্দ দেওয়া আরম্ভ হয়; হিন্দুরা প্রতিমাখানি স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে নানারূপ গালিগালাজ ও অপমান করিতে করিতে, গঙ্গাতীরে গিয়া জলে ফেলিয়া দেয়। ("On the third evening however, their adoration is changed into curses and execrations; they take their idol on their shoulders, load it with every ignominy, and carrying it to the banks of the Ganges, throw it into the river.)" নাগরা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"কোনও বৈষ্ণবের মৃত্যু হইলে, তাহার স্ত্রীকে জীবন্ত সমাধি দিবার সময় নাগরা বাজানো হইয়া থাকে। সমাধি দিবার প্রথা—একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে বৈষ্ণবের শবদেহ ও তাহার জীবন্ত বাষ্টমীকে ফেলিয়া মাটিচাপা দেওয়া হয়, এবং সেই সময়ে প্রবল বেগে নাগরা বাজানো হইয়া থাকে।" ঝম্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—এই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী প্রভৃতি fanaticগণ, উপর হইতে প্রেকের বিছানা, ছুরি, তরওয়াল, খোঁচা প্রভৃতির উপর লাফাইয়া পড়ে, সেই জন্য ইহার নাম "ঝম্প"। ঢাক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইহা বিবাহের সময় বাজাইতে হয়।" অধিকাংশ বাজনার নিন্দা করিয়াছেন, কেবল তানপুরা, সেতার ও বীণাবাদন সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

Solvyn সাহেবের গ্রন্থের নাম "ভারতীয় পরিচ্ছদ" হইলেও, উহাতে অনেক বিষয়েরই চিত্র আছে। এবৎসর বাদ্যযন্ত্রগুলির চিত্র শেষ করিয়া, আগামী (দ্বাদশ) বর্ষে ঐ গ্রন্থ হইতে অন্যান্য বিষয়ের চিত্র আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনার্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রাচীন ভারতে উদ্যান

জগতে সর্ব্বত্রই উদ্যানের আদর আছে, কিন্তু প্রাচীন ভারতে উদ্যানের যে ভাবের আদর ছিল তেমন আর কোনও দেশেই ছিল না বা নাই এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। হিন্দু গৃহস্থের জন্য যেভাবে জীবন যাপনের ব্যবস্থা ছিল তাহাতে উদ্যান তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কেন তাহা পরে বলিতেছি। জগতের অন্য দেশে উদ্যানের যথার্থই আদর আছে, কিন্তু উদ্যান বলিতে সে সকল স্থানে উপভোগের ভাবই অধিক প্রকাশিত হয়। মূলভাবে উদ্যানের সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। উদ্যানজাত ফুল ও ফল ভোগের বস্তু, অতএব ভোগপরায়ণ ব্যক্তির কাছে উহা আদরণীয় হইয়াছে। উদ্যান প্রতিষ্ঠায় যে কোনও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, বা উহাতে যে কিছু পুণ্য আছে, সে চিন্তা সে কথা কাহারও মনে আসে না। সেখানে সৌখীন লোক সখ মিটাইতে বা গৃহশোভা বর্দ্ধিত করিবার জন্য উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। ভারতেও উদ্যান বা আরাম বিলাসিতার পরিপোষক ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ প্রাচীন ভারতে মানুষের উপভোগের শক্তিও প্রচুর পরিমাণে ছিল। এখন বরং নানা কারণে ক্রমশঃ আমাদের সেই

শক্তির হ্রাস হইতেছে। তখন, যখন পুরুষেরা সংসারে প্রবিষ্ট হইত, তখন ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয় সবল থাকিত, শরীর সুস্থ ও পুষ্ট থাকিত, কাযেই বিষয়োপভোগের প্রবৃত্তি ও শক্তি দুই সতেজ থাকিত। ইহাদের জন্য আরাম নিতান্তই প্রয়োজন হইত। ফুল যে ভোগের একটা অতি আবশ্যক উপকরণ সে কথা তখনকার সাংসারিকেরা বেশ বুঝিতেন।

কিন্তু ভারতে উদ্যানের মূল প্রয়োজন ছিল ধর্ম্মার্থ। ফুল না হইলে দেবতার পূজা, পিতৃপূজা—এসব কিছুই হইত না, কাযেই প্রত্যেক গৃহস্থকে উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিতে হইত। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা আরাম প্রতিষ্ঠা এই কারণে ভারতে ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে গণিত ছিল। আরাম প্রতিষ্ঠা পূর্ত্তকার্য্যের মধ্যে গণ্য ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি এই নির্দ্দেশ ছিল যে, যেন সে নিজগৃহের বামভাগে আরাম প্রতিষ্ঠা করে। (অগ্নিপুরাণ ২৪৭ অঃ ২৫)। অগ্নিপুরাণে আরও উক্ত আছে—

"পাপনাশঃ পরাসিদ্ধিঃ বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠয়া।"

অর্থাৎ বৃক্ষ ও আরাম প্রতিষ্ঠা করিলে মানুষের পাপ নষ্ট হয় এবং সে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। আরাম-প্রতিষ্ঠা পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া পরাশর তাঁহার বৃহৎসংহিতায় ঐ কার্য্যের জন্য শুভাশুভ তিথির নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বৃক্ষের উপকারিত্ব সম্বন্ধে প্রাচীনকালের ধারণা বড় উচ্চ ছিল। অগ্নিপুরাণে আছে—

দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরোরগগুহ্যকাঃ।
পশুপক্ষিমনুষ্যাশ্চ সংশ্রয়ন্তি মুদা দ্রুমান্॥

দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর উরগ গুহ্যক পশু পক্ষী মানুষ—সকলেই আনন্দে বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃক্ষজাত কোন্ বস্তুতে কাহার তৃপ্তি হয় তাহাও পুরাণে বর্ণিত আছে যথা—পুষ্প দ্বারা দেবতারা, ফল দ্বারা পিতৃগণ, ছায়া দ্বারা মানুষ পক্ষিগণ। অতএব পুরাণকার বলিতেছেন—

তস্মাৎ সুবহবো বৃক্ষাঃ রোপ্যাঃ শ্রেয়োঽভিবাঞ্ছতা।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ তে পুত্রা ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ॥

—এই হেতু যিনি শ্রেয়ঃকামী তিনি অনেক বৃক্ষ রোপণ করিবেন এবং তাহাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিবেন; কারণ তাহারা ধর্ম্মতঃ পুত্রসদৃশ।

যে কার্য্য দ্বারা পরোপকার সাধিত হয়, সেই কার্য্যই প্রাচীনকালে প্রাচীন সভ্যতায় পুণ্য বা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণিত হইত। বৃক্ষের দ্বারা ঐ কার্য্য সাধিত হয়, তাই পুরাণকার বৃক্ষের অত আদর করিয়াছেন। পুরাণ বলিতেছেন—

কিং ধর্ম্মবিমুখৈর্মর্ত্তৈঃ কেবলং স্বার্থহেতুভিঃ।
তরুপুত্রা বরং যে তু পরার্থৈকানুবৃত্তয়ঃ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
পরেষামুপকুর্ব্বন্তি তারয়ন্তি পিতামহান॥
ছেত্তারমপি সংপ্রাপ্তং ছায়াপুষ্পফলাদিভিঃ।
পূজয়ন্ত্যেব তরবো মুনিবদ্দ্বেষবর্জ্জিতাঃ॥

—"স্বার্থপরিপোষক মর্ত্ত্য সন্তানের দ্বারা কি ফল লাভ হইবে? বরং পরার্থসাধক তরুপুত্রেরা ভাল, ইহারা পত্র পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল ও কাষ্ঠ দানে পরের উপকার করে, এবং পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন করে; ইহারা ছেদককেও মুনির ন্যায় দ্বেষবর্জ্জিত হইয়া ছায়া পুষ্প ও ফল দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করে।"

বৃক্ষ সম্বন্ধে এমন উচ্চধারণা আর কোনও দেশে আছে কি? আমরা জানি যে এখনও অনেক গৃহস্থকন্যা, বিশেষতঃ প্রাচীনারা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকে পুণ্যকর্ম্ম ভাবিয়া ঐ কার্য্যের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের মনে বৃক্ষের ভোগ-প্রবৃত্তি পরিপোষণের প্রয়োজনীয়তা-টাই বেশী পরিস্ফুট হইতেছে না কি? আমরা যেমন সকল বিষয়েই ভোগপরায়ণ অতএব একদেশদর্শী হইতেছি, এ বিষয়েও তাহাই হইতেছি; ফলে বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা বা আরাম প্রতিষ্ঠা এখন একটা বাবুয়ানির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এ কার্য্যের অন্তর্গত ধর্ম্মভাবই ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কাযেই বাগান এখন সখের বস্তু, তাই যাহার সখ করিবার ক্ষমতা নাই, সে আর

বাগানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে না। দেশ হইতে উদ্যান ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিয়াছে।

বৃক্ষসম্বন্ধীয় পুরাণোক্তি হইতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার আদর্শটি পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে; ত্যাগই সেই আদর্শের ভিত্তি, পরোপকার সেই সভ্যতার মেরুদণ্ড।

বৃক্ষসম্বন্ধে এই প্রকার উচ্চ ধারণার ফলে বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং বৃক্ষ পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এবং বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ (Practical Botany) এবং উদ্ভিজ্জতত্ত্ব (Theoretical Botany) বেশ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদে আমিষ ও নিরামিষ দুইবিধ চিকিৎসার উল্লেখ আছে, যাহা এখন বিস্মৃতির কবলে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (অগ্নিপুরাণ ও বৃহৎ সংহিতা) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ ৬৪ কলার অন্তর্গত একটি কলার মধ্যেও গণিত হইয়াছিল দেখিতে পাই। (কামসূত্র, ১—৩৩ দ্রষ্টব্য)। প্রত্যেক উদ্ভিদের বর্গ (genus) এবং জাতি (species) ও তাহার প্রত্যেক অংশের অর্থাৎ পত্র পুষ্প ফল প্রভৃতির গুণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। (সুশ্রুত সংহিতা ও অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থ এই সকল দ্রষ্টব্য)।

আধুনিক আয়ুর্ব্বেদশিক্ষায় উদ্ভিজ্জতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় না, এই জন্য অনেক পরিমাণে ইহার প্রতিপত্তির লাঘব হইতেছে। এতৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা জন্য অনেক চিকিৎসক ঠিক ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন না ও পারেন না। অতএব এ বিষয় রীতিমত শিক্ষার আবার প্রবর্ত্তন হওয়া বিধেয়।

তরুলতার সহিত যে আত্মীয় ভাবের কথা পুরাণে প্রকটিত হইয়াছে, প্রাচীন কাব্যেও তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। মহাকবি কালিদাস এই আত্মীয়তার বিশেষ ও সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং
পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং
স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ॥

রঘুবংশ, ২।৩৬

যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ॥

মেঘদূত—উত্তর মেঘ, ১৪

অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্
ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥

কুমারসম্ভব, ৫।১৪

অনসূয়া। হলা সউন্দলে! তত্তোবি তাদকস্সবস্স আশ্রমরুক্খয়া পিঅদরেত্তি তক্কেমি। জেণ ণোমালিআ-কুসুমপেলবাবি তুমং এদাণং আলবালপূরণে ণিউক্তা।
(সং—অয়ি শকুন্তলে তত্তোঽপি তাত কাশ্যপস্য আশ্রম-বৃক্ষাঃ প্রিয়তরা ইতি তর্কয়ামি। যেন নবমালিকা-কুসুমপেলবাপি ত্বং এতেষামালবালপূরণে নিযুক্তা।)
শকুন্তলা। হলা অনসূএ! ণ কেঅলং তাদণিওও এব্ব। অত্থি মে সোদরসিণেহোবি এদেসু।
(সং—অয়ি অনসূয়ে ন কেবলং তাতনিয়োগ এব। অস্তি মে সোদরস্নেহোঽপি এতেষু।)

অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১ম অঙ্ক।

তরুলতার সহিত এই নিবিড় আত্মীয়তার ভাব মহাকবি অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে উজ্জ্বলতররূপে ফুটাইয়াছেন। শকুন্তলা যখন আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তখন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমতরুর কাছে শকুন্তলাকে বিদায় দিবার অনুমতি চাহিতেছেন, শকুন্তলা তাঁহার লতা-সখীদের সস্নেহ আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিয়া কত দুঃখ করিতেছেন। যেন তাহারা সজীব—যেন তাহাদেরও সুখদুঃখ-বোধ আছে! তা, সে কথা, আমরা এখন জগদ্বিখ্যাত স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু কালিদাসাদি মহাকবি—যাঁহারা জগতের অন্তঃকরণটী বুঝিতে পারিতেন ও

দেখিতে পাইতেন, যাঁহাদের প্রাণ প্রকৃতির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা ছিল, তাঁহারা অনেক আগেই বুঝিয়াছিলেন, এবং মহাকবি অবশ্য ইহাও জানিতেন যে তাঁহারও বহুপূর্ব্বে মনু বলিয়া গিয়াছেন—

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥"

আচার পদ্ধতির মধ্যে আমরা এমনি আর একটী বৈজ্ঞানিক অনুশাসন দেখিতে পাই। আধুনিক বিজ্ঞানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে রাত্রে বৃক্ষগণ Carbonic acid gas পরিত্যাগ করে যাহা মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র খুলিলে দেখিতে পাই, মনু আচার প্রকরণে বলিয়াছেন—

"রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।" ৪-৭৩

অতএব আমরা দেখি যে বৃক্ষসম্বন্ধে অশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রাচীন ভারতে সঞ্চিত হইয়াছিল। একটু ভাবিয়া দেখিলে আরও বুঝা যায় যে, আজকাল যে আমরা প্রাচীন আচার বলিলেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিয়মাবলী মনে করিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে চাই, তাহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক নহে, কারণ ঐ আচারগুলির মূলে হয় কোনও নীতি নয় কোনও স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রচ্ছন্ন আছে। প্রাচীনকালে ধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল থাকায় প্রত্যেক আচার ধর্ম্মান্তর্গত হইয়া গিয়াছিল, এবং সেই জন্যই উহার প্রভাবও সামান্য বৈজ্ঞানিক বিধি অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল। অন্ততঃ সাধারণ লোকের মনে বৈজ্ঞানিক বিধান অপেক্ষা ধর্ম্মের শাসন বেশী ফলপ্রদ সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এখন আমরা স্বাস্থ্যের সকল নিয়মই প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি এবং তদ্দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছি তাহা কি সত্য নহে?

তড়াগ আরাম প্রভৃতি যাহা প্রাচীনকালে পরার্থে উৎসৃষ্ট হইত, তাহাদিগকে পণ্যবস্তু বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মের অন্তরায়-সাধনও নিষিদ্ধ ছিল। তড়াগ বা আরাম বিক্রয়কে মনু উপপাতকের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। পুরাণও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। (মনু ১১—৬২ এবং অগ্নিপুরাণ ১৬৮—৩১)

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আরামে কোন্ কোন্ বৃক্ষরোপণদ্বারা রোপকের পুণ্যাতিরেক হয় তাহাও পুরাণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়াছে। এখানেও একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক বৃক্ষের উপকারিতার অনুপাতে পুণ্যের তারতম্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১০২)

২

এখন আমরা প্রাচীন ভারতে ভোগাধার উদ্যান সম্বন্ধে অর্থাৎ ভোগের দিক হইতে উদ্যান সম্বন্ধে ধারণা কিরূপ ছিল তাহারই পরিচয় লইব। কোনও দিনই ভারতে গৃহস্থের পক্ষে ভোগ নিষিদ্ধ ছিল না; কোনও দিনই ভারতবাসীরা সকল পার্থিব সুখ বর্জ্জিত হইয়া কেবল অধ্যাত্ম চিন্তাতেই মগ্ন ছিল না। যাঁহারা একথা মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। মনুতে গৃহস্থের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের যে বিধান আছে, তাহাতে গৃহস্থের পক্ষে ভোগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করা আছে। তবে অধর্ম্মজনক উপায়ে অর্থার্জ্জন নিষিদ্ধ এবং গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান অবহেলা না করার শিক্ষা অবশ্যই সেখানে বেশী স্পষ্ট। স্মৃতিকারেরা বুঝিতেন যে সেবার অভাব বা নিষেধ দ্বারা ভোগপ্রবৃত্তি কখনই সঙ্কুচিত হইতে পারে না, তবে ভোগের সহিত জ্ঞানের প্রয়োজন। মনু বলিয়াছেন—

"ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥ ২-৯৬

অতএব জীবনে ভোগের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া, সেই প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করাই তাঁহারা সমীচীন বোধ করিতেন। কিন্তু একথা বলিতে পারি না যে তাঁহাদের প্রযত্ন সর্ব্বতোভাবে সফল হইয়াছিল। ভারতে এমন দিন আসিয়াছিল যখন বিলাসিতার এত অধিক প্রসার হইয়াছিল যে, তাহার বিবরণ

পাঠ করিলে আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় বিলাসিতার বিবরণ বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্রে অনেক পরিমাণে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের তখন আর্থিক অবস্থা এত স্বচ্ছল ছিল যে বিলাসীরা নিজের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এই উপলক্ষ্যে কলাশিল্পের বিশেষ উন্নতিও হইয়াছিল। সুস্থ শরীর, সবল মন, সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম—এ সকল বিষয়ভোগের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে; তাহার উপর অর্থস্বচ্ছলতা এবং কবিত্ব-পরিপোষক শিক্ষা ও শিল্প-চর্চ্চা—কাযেই ভোগের সকল অঙ্গই পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

যে উদ্যান প্রিয়মনোরঞ্জনের সুন্দর আধার, সেই উদ্যানের প্রতি যে তখনকার লোকের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। উদ্যান এবং উদ্যানানুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপারে তাহারা অজস্র অর্থব্যয় করিত; নানা উপায়ে উদ্যানকে শোভিত করিবার চেষ্টা করিত, ক্রমশ আমরা ঐ সকলের পরিচয় লইব।

উদ্যান তখনও তিন প্রকারের ছিল—(১) বৃক্ষবাটিকা (২) পুষ্পবাটিকা ও (৩) শাকবাটিকা। আমরা "সেকালের গৃহিণীপনা" * প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে সুগৃহিণীকে এই তিন প্রকার উদ্যানেরই যত্ন করিতে হইত। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, উদ্যান জলের কাছে স্থাপিত হওয়া উচিত। এটা Practical wisdom—কার্য্যকরী বুদ্ধিমাত্র। বাৎস্যায়নের নির্দ্দেশানুসারে নাগরিকগণের পক্ষে গোষ্ঠীতে সন্ধ্যা যাপন যেমন কর্ত্তব্য, তেমনই প্রত্যহ অপরাহ্ণে উদ্যান ভ্রমণ ও উদ্যানভ্রমণের চিহ্ন ধারণও কর্ত্তব্য ছিল। (কামসূত্র ১।৪) উদ্যানবিলাস বিষয়ক যে সকল আমোদ অনুষ্ঠিত হইত তাহা পরে বলিতেছি, আপাততঃ উদ্যানশোভা-সাধনের যে যে উপায় ছিল তাহাই বলি। বলা বাহুল্য যে এই কার্য্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত, অবস্থানুসারে সকলেই অকুণ্ঠিত ভাবে এই কার্য্যে অর্থব্যয় করিত। ঐ শোভাগুলির বিষয় পর্য্যায়ক্রমে বলিয়া যাই।

(ক) গৃহ-দীর্ঘিকা।

উদ্যানের প্রধান শোভা গৃহ দীর্ঘিকা। এখনও এ বিষয়ে অনেকেরই দৃষ্টি আছে, কিন্তু পল্লীগ্রামে গৃহ-দীর্ঘিকার ব্যবহার অনেকটা অপব্যবহারে দাঁড়াইয়াছে, সেইজন্য আমাদের পল্লীগুলি এখন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে। স্মৃতি ও পুরাণ পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে দীর্ঘিকার জল কোনও প্রকারে অপবিত্র ও অপরিষ্কার করা নিষিদ্ধ ছিল। (বিষ্ণু সংহিতা ৫-১০৫, ৬০-১৫; যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ১৩৭; উশনস সংহিতা—৩৫-৪০ দ্রষ্টব্য) তখনকার দিনে এই গৃহ-দীর্ঘিকা শুধু স্বাস্থ্যকর নয়, মনোরম হওয়াও অবশ্যম্ভাবী ছিল। জল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ত হইতই, এতদ্ভিন্ন উহার শোভা-বিস্তারের জন্য যত্নের ত্রুটী হইত না। পদ্ম, কুমুদ-কহ্লার প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পুষ্প উহাতে প্রস্ফুটিত থাকিয়া উহার সুষমা-সম্পাদন করিত; শ্বেত রাজ-হংসরাজি উহার বুকের উপর ভাসিয়া বেড়াইয়া সকলের নয়ন চরিতার্থ করিত। ইহার সোপানশ্রেণী বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত হইত। বিরহী যক্ষ নিজ আলয়ের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছে—

> বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা।
> হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদুর্য্যনালৈঃ॥
>
> মেঘদূত, উত্তরখণ্ড, ১৫।

মৃচ্ছকটিক নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বসন্তসেনার বৃক্ষবাটিকা ও গৃহ-দীর্ঘিকার বিবরণ পাঠেও তখনকার বিলাসী-দিগের উদ্যানসংলগ্ন সকল বস্তু সম্বন্ধে ব্যয়বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস রঘুবংশে ও কুমার-সম্ভবে সুসজ্জ গৃহ-দীর্ঘিকার উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্যান-ক্রীড়ার মধ্যে বাৎস্যায়নও জলক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন, বিলাসিতার হিসাবে ইহাই গৃহ-দীর্ঘিকার প্রধান প্রয়োজন। কালিদাস রঘুবংশের ঊনবিংশ

* "মানসী ও মর্ম্মবাণী", আশ্বিন ১৩২৫।

সর্গের ৯ম ও ১০ম শ্লোকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। নবম সর্গে, ষোড়শ সর্গে ও অষ্টাদশ সর্গেও সুশোভিত বিহঙ্গসমাকুল গৃহ-দীর্ঘিকার বর্ণনা আছে।

ঐ দীর্ঘিকার মধ্যে গ্রীষ্মকালে শরীর স্নিগ্ধ করিবার জন্য গূঢ়গৃহ, যাহাকে সমুদ্রগৃহও বলিত, বিলাসী-বিলাসিনীদের তৃপ্ত্যর্থ নির্ম্মিত হইত। ১৯শ সর্গের ৯ম শ্লোকে ঐ গুপ্ত-গৃহের উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ সর্গে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও (মেঘদূত, ঋতুসংহার) একপ্রকার গৃহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে ধারাগৃহ বা ধারাযন্ত্র গৃহ বলিত, উহাকে ইংরাজীতে Shower bath room বলা যায়। ঐ গৃহে বিলাসীরা ধারা স্নান করিত, উহার সহিত গৃহ-দীর্ঘিকার খুব নিকট সম্পর্ক ছিল। ঐ দীর্ঘিকা হইতেই জল টানিয়া লইয়া গিয়া যন্ত্র-সাহায্যে ধারাগৃহে ঐ জল বহু ধারায় উন্মুক্ত করিবার কৌশল ছিল।

(খ) জলযন্ত্র।

গৃহ-দীর্ঘিকা-সংক্রান্ত আর একটি উদ্যান-শোভা-বর্দ্ধক বস্তু ছিল "জলযন্ত্র" অর্থাৎ ফোয়ারা (fountain)। রত্নাবলীর প্রথম অঙ্কে জলযন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথম অঙ্কেও ঘূর্ণায়মান জলযন্ত্রের কথা আছে।

এতাবৎ আমরা উদ্যান ও গৃহদীর্ঘিকা সংক্রান্ত চারিটি শিল্পের পরিচয় পাইলাম—১ সমুদ্রগৃহ, ২ ধারা-গৃহ, ৩ জলযন্ত্র, ৪ সোপানে শিলা-বিন্যাস। এইবার উদ্যানের অপরাপর শোভোপকরণের পরিচয় লইব।

(গ) ক্রীড়া-পর্ব্বত।

উদ্যানের মধ্যে একটি কৃত্রিম শৈল, যাহাতে ময়ূরাদি পক্ষী বিচরণ করিবে এবং যদ্দ্বারা সখের শৈল-বিহারকার্য্য সম্পন্ন হইবে—প্রাচীন সমৃদ্ধ উদ্যানের একটি অঙ্গ ছিল বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ মহাকবি কালিদাসের সময়ে যে ওটা একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল, তাহা তাঁহার কাব্য পাঠে বেশ বুঝা যায়। কালিদাসের বিলাসী অগ্নিবর্ণের

> অংসলম্বিকুটজার্জ্জুনস্রজ-
> স্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ।
> প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষভূৎ
> কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ॥ (১৯-৩৭)

তাঁহার তারকাসুর

> উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি ক্ষুণ্ণানি হরিতাং খুরৈঃ।
> আক্রীড়পর্ব্বতাস্তেন কল্পিতাঃ স্বেষু বেশ্মসু॥

মেঘদূতের যক্ষের ভবনে একটি সুসজ্জিত ক্রীড়া-পর্ব্বত ছিল—ঐটা তাঁহার গৃহ-দীর্ঘিকার তীরে অবস্থিত ছিল।

> তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ।
> ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ॥

সেই শৈলের উপর কুরুবক পরিবৃত মাধবী-মণ্ডপ, চপল-কিসলয় সমন্বিত রক্তাশোক ও বকুল বৃক্ষ ছিল এবং ঐ সকলের মাঝখানে ময়ূরের বাসের নিমিত্ত স্বর্ণনির্ম্মিত বাসদণ্ড ছিল। এখনও কোনও কোনও সমৃদ্ধিশালীর উদ্যানে কৃত্রিম শৈল দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৮৮৪ সালে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র শৈল ও তাহার সহিত জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখান হইয়াছিল।

(ঘ) বাসদণ্ড।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে পক্ষীর বিলক্ষণ আদর ছিল। পক্ষিপালন ও পক্ষিযুদ্ধ দর্শন একটা আমোদের মধ্যে গণ্য ছিল। পালিত পক্ষীর ভিতর প্রসিদ্ধ ছিল গৃহ-ময়ূর, পারাবত, কোকিল, শুক, সারিকা, লাবক, কপিঞ্জল, সারস, রাজহংস। (মৃচ্ছকটিক চতুর্থাঙ্ক)। উদ্যানে পক্ষিযুদ্ধ দর্শন করা তখনকার বাবুদের নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে ছিল। (কামসূত্র, ১-৪)

উদ্যানে ময়ূরের জন্য বাসদণ্ড নির্ম্মিত হইত, ক্রীড়া-শৈলের কথা বলিবার সময়ই আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। এই বাসদণ্ড নির্ম্মাণে অনেক অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা যক্ষের বর্ণনা হইতে পাওয়া যাইতেছে—

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ॥

রঘুবংশে অযোধ্যা-রাজলক্ষ্মী কুশের কাছে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—

বৃক্ষেশয়া যষ্টিনিবাসভঙ্গান্
মৃদঙ্গবাদ্যাপগমাদলাস্যাঃ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ
ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্॥

(ঙ) লতাকুঞ্জ।

বাৎস্যায়ন উদ্যানের মধ্যে লতাকুঞ্জ নির্ম্মাণের বিধান দিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যনাটকে ত লতাকুঞ্জের ছড়াছড়ি আছেই; তার পর গীতগোবিন্দের "চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্" বাঙ্গালীর কাণে ও প্রাণে চিরদিন মধু ঢালিতেছে ও ঢালিবে। প্রেমপ্রবণ ভারতে প্রেমিক-প্রেমিকার লীলা নিকেতন লতাকুঞ্জের—জয়দেবের ভাষায় মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জের— আদর ত থাকিবেই, পরন্তু জগতের সর্ব্বত্রই লতাকুঞ্জের আদর আছে।

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে,

যেখানে সরস বসন্তে হরি ক্রীড়া করিয়াছিলেন সেই লতাকুঞ্জ ভারতবাসীর প্রাণে আনন্দের সৃষ্টি করিবে বৈকি!

(চ) পীঠিকা।

লতাকুঞ্জের মধ্যে ও উদ্যানের অন্যত্র সুন্দর বেদিকা বা পীঠিকা প্রস্তুত করাও উদ্যানশিল্পের অন্তর্গত একটা শিল্প ছিল। বাৎস্যায়ন তদীয় কামসূত্রে পীঠিকা বা স্থণ্ডিলময়ী পীঠিকা নির্ম্মাণের বিধান দিয়াছেন (কাম-সূত্র ১-৪)। চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে নবম কলা "মণি-ভূমিকা কর্ম্ম" ঐ স্থণ্ডিলময়ী পীঠিকা-সংক্রান্ত শিল্প। (কামসূত্র ১৩]। বিক্রমোর্ব্বশীর দ্বিতীয় অঙ্কে ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের ষষ্ঠ অঙ্কে মণিময় শিলাপট্টযুক্ত মাধবীকুঞ্জের পরিচয় পাই। ইহাও প্রেমিক-প্রেমিকার একটা বাঞ্ছনীয় বস্তু ছিল।

(ছ) দোলা।

এইবার আমরা উদ্যান-শোভার শেষ অঙ্গের কথা বলিব। "দোলা" দুই প্রকারের—১ সহজ দোলা, ২ প্রেঙ্খণা দোলা অর্থাৎ ঘূর্ণায়মানা দোলা, (বোধ হয় ইহাই এখন নাগরদোলায় পরিণত হইয়াছে)। কাম-সূত্রে (১-৪) প্রেঙ্খণ দোলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কালিদাস এই দোলার কথা অনেক স্থলে বলিয়াছেন। রঘুবংশে আছে—

তাঃ স্বমঙ্কমধিরোপ্য দোলয়া
প্রেঙ্খয়ন্ পরিজনাপবিদ্ধয়া।
মুক্তরজ্জু নিবিড়ং ভয়চ্ছলাৎ
কণ্ঠবন্ধনমবাপ বাহুভিঃ॥ ১৯-৪৪

মৃচ্ছকটিকে পট্ট দোলার কথা আছে। (৪র্থ অঙ্ক)

৩

উদ্যানের কৃত্রিম শোভার কথা এতক্ষণ বলিয়াছি, এইবার উহার নৈসর্গিক শোভা "ফুলের" কথা বলিব। জগতে ফুল ভালবাসে না এমন কোনও লোকই নাই, তা সে সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক। তবে ভারতে ফুলের যে ভাবে আদর, তেমন আর কোথাও

নাই, কারণ ভারতে ফুলে দেবতার পূজা হয়। অতএব এখানে ফুলের বিষয়ে বিশেষ ভাবেই চর্চ্চা হইয়াছিল। কেবল পুষ্পের শোভা দেখিয়াই ভারতের মনীষিগণ সন্তুষ্ট থাকেন নাই, প্রত্যেক ফুলের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যেমন, একটা ফুলের বিষয় বিবেচনা করা যাউক—অপরাজিতা। বৈদ্যক গ্রন্থ খুলিলেই ইহার যত গুণ আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে—"শোথকাসনাশিত্বং কণ্ঠহিতকারিত্বঞ্চ" ইত্যাদি (রাজবল্লভ শব্দকল্পদ্রুম ধৃত)। পুরাণ খুলিলে দেখিতে পাই যে অপরাজিতা দেবীর প্রিয় পুষ্প। (কালিকা পুরাণ ৬৮-৩৪০ অধ্যায়)। এইরূপ সকল পুষ্পের সম্বন্ধেই অনুসন্ধেয়। ইহার ভিতর লক্ষ্য করিবার বিষয় এইটুকু যে, ভারতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ—ইংরাজিতে যাহাকে Psychological properties বলা যাইতে পারে,—সকল জীবে ও পদার্থে নির্দ্ধারিত করা আছে। যে গুণের যে দেবতা, সেই দেবতার পূজার জন্য তদ্‌গুণাবলম্বী পুষ্পও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দেবতা পূজার জন্য যেমন ফুল প্রয়োজন, প্রিয়জনকে মুগ্ধ করিবার জন্যও তেমনি ফুলের প্রয়োজন। ভারতে এই হিসাবেও ফুলের আদর খুব বেশীমাত্রায় ছিল, এখনও কতক আছে। এখনও ভারতে ফুল না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না, ফুলের মালা দিয়া অতিথি অভ্যাগতের আদর করা অভ্যর্থনার একটা প্রকৃষ্ট উপায় হইয়া আছে। এখনও "ফুলশয্যা" অন্ততঃ প্রত্যেক বাঙ্গালীর জীবনের একটী স্মরণীয় দিন—"খাসদখলী" ভাষায় "লোহিতাক্ষর দিন" বলিব কি? কিন্তু ফুলের পূর্ব্বের সে আদর আছে কি? তা কখনও নাই। আমি তো বলিয়াইছি যে এখন ভারতবাসীর যেমন ধর্ম্মের প্রতি টান কমিয়াছে, তেমনি ভোগের শক্তিরও প্রভূত হানি হইয়াছে। তাই ফুলের কদরও অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। মালা গাঁথা এখন আর শিল্পের অন্তর্গত নয়, আজকালকার মেয়েরা ভাল মালা গাঁথিতে পারে না, মালা বাজারে কিনিতে হয়। কিন্তু এই মালাগাঁথা ৬৪ কলার মধ্যে গণ্য ছিল, মাল্যগ্রন্থন সেকালে একটা উচ্চাঙ্গ শিল্পের অন্তর্গত ছিল। পুরুষেরা পূর্ব্বে মাল্যসংক্রান্ত অনেক অলঙ্কার ও ভূষণ ধারণ করিত, মস্তকে পুষ্পের শিরস্ত্রাণ পরিত, শেখরক আপীড়ক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিল। শেখরাপীড়ক প্রস্তুত করণও ৬৪ কলার একটী কলা ছিল। অমরকোষে বহুবিধ মাল্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রসাধনান্তর্গত বলিয়া এখানে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রমণীরা ঋতু-বিশেষে বিষয়-বিশেষে পুষ্পের সজ্জায় সজ্জিত হইতে ভালবাসিত। গ্রীষ্মকালে তাহারা শিরীষ পুষ্প ধারণ করিত, বর্ষায় অর্জ্জুন পুষ্প কর্ণে ধারণ করিত এবং কেতকী কদম্ব ও নাগকেশর পুষ্পের মালা গাঁথিয়া পরিত। শরৎকালে তাহারা নবমালিকার মালা পরিত ও কর্ণে নীলোৎপল ধারণ করিত, বসন্তে উহারা নবকর্ণিকারে কর্ণভূষণ এবং কেশপাশে নবমল্লিকার মালা দোলাইত। যে দেশে ভালবাসার দেবতার নাম পুষ্পধন্বা হইয়াছে, সে দেশে ফুলের কত আদর ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ফুলের যথেষ্ট সম্মান দৃষ্ট হয়, স্বাভাবিক বাজীকরণের মধ্যে পুষ্পমাল্যের ও পুষ্পগন্ধের উল্লেখ আছে।

প্রেমিক ও প্রেমের চরম কবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে ফুলের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যগুলির ভিতর নিম্নলিখিত ফুলগুলির বহুল উল্লেখ দেখিতে পাই—

১। কর্ণিকার (কলিকাফুল), ২। পলাশ, ৩। মাধবী, ৪। বকুল, ৫। মল্লিকা, ৬। কামিনী, ৭। তিলক (তিলফুল), ৮। কমল (পদ্ম), ৯। শিরীষ, ১০। লোধ্র, ১১। অর্জ্জুন (আজন), ১২। মধূক, ১৩। পাটল (পারুল), ১৪। কদম্ব, ১৫। কুন্দ, ১৬। তগর, ১৭। জবা, ১৮। কুরুবক (কুরণ্টক), ঝিণ্টী, ১৯। অশোক, ২০। মালতী, ২১। কুসুম, ২২। কেতকী (কেয়া), ২৩। যূথিকা (যুঁই), ২৪। শেফালিকা (শিউলি), ২৫। কুমুদ, ২৬। কহ্লার,

২৭। উৎপল, ২৮। বন্ধুক (বাঁধুলি), ২৯। কাশ, ৩০। সিন্ধুবার বা সিন্দুবার, ৩১। চম্পক (চাঁপা), ৩২। স্থলপদ্ম, ৩৩। অপরাজিত', ৩৪। নবমল্লিকা (নেয়ালী)।

ভারতীয় পুষ্পের মধ্যে এইগুলিই প্রসিদ্ধ। এখন অবশ্য আরও অনেক বিলাতী ফুল প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের উল্লেখ এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

এইবার আমরা উদ্যানবিহারের কথা বলিয়া এই নিবন্ধ সমাপ্ত করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে যুবকগণকে উদ্যানবিহার প্রাত্যহিক কার্য্যের অঙ্গীভূত করিতে বলিয়াছেন। উদ্যানে কি কি আমোদের অনুষ্ঠান হইত বাৎস্যায়ন তাহাও বলিয়াছেন। উদ্যানে কুক্কুট ও লাবক (লাওয়া) যুদ্ধ দর্শন একটা বিশেষ আমোদের মধ্যে ছিল; দ্যূতক্রীড়া ও নাটকাদির অভিনয় দর্শন উদ্যানেই হইত। উদ্যানস্থ দীর্ঘিকায় জলক্রীড়াও একটা আমোদের মধ্যে গণ্য ছিল। কালিদাস ও অন্যান্য কবিরাও বারিবিহারের কথা বরাবার বলিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায় যে বাৎস্যায়নের সময় গণিকার বিশেষ খ্যাতি ছিল। নাগরিকগণ অপরাহ্ণে সঙ্গীতাদি শ্রবণোদ্দেশে গণিকাসহযাত্রী হইয়া উদ্যানবিহারে যাইত। আজকালকার "বাগান" নামে খ্যাত সহরের যে একটা আমোদ আছে, বাৎস্যায়নের উদ্যানবিহার ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। (কলার চর্চ্চা হইত বলিয়াই এ পদ্ধতির সমর্থন করা যায় না, ইহাতে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।)

এতদ্ভিন্ন বাৎস্যায়ন অন্য কতকগুলি আমোদের কথা বলিয়াছেন, যাহা এখনও হয় সম্পূর্ণমাত্রায় বিস্মৃত, নয় এখন যে আকারে বর্ত্তমান আছে তাহাতে চিনিবার উপায় নাই। সেইগুলিই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ ক্রীড়াগুলির সাধারণ নাম সম্ভূয় ক্রীড়া বা মিলিত ক্রীড়া।

এই সকল ক্রীড়া দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম "মাহিমানী" অর্থাৎ যাহা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সর্ব্বত্র ক্রীড়নীয়। দ্বিতীয় "দেশ্য" অর্থাৎ গ্রাম প্রচলিত বা বিশেষ বিশেষ দেশে প্রচলিত। প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়ার মধ্যে বাৎস্যায়ন তিনটী ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন—যথা যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর, এবং সুবসন্তক।

যক্ষরাত্রি সম্বন্ধে টীকাকার বলিয়াছেন যে উহা সুখরাত্রি, যক্ষেরা নিকটে থাকে বলিয়া উহাকে সুখরাত্রি বা যক্ষ রাত্রি বলে; ঐ রাত্রে দ্যূত ক্রীড়া হইয়া থাকে। ইহা হইতে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঐ রাত্রি যে কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে হয় জানা গেল না। ত্রিকাণ্ডশেষ (শব্দকল্পদ্রুমধৃত) বলেন, যক্ষরাত্রি কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হইত। কিন্তু এখন কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে কোনও খেলা প্রচলিত নাই। দীপালী কালীপূজার সহিত মিশিয়া গিয়া কার্ত্তিকী অমাবস্যায় পড়িয়া গিয়াছে। কৌমুদী-জাগর যে লক্ষ্মীপূজার রাত্রি; অর্থাৎ আশ্বিন মাসের কোজাগর পূর্ণিমা, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাতেও দোলাদ্যূত ক্রীড়া হইত, অর্থাৎ দোলায় দোলা ও দ্যূতক্রীড়া এই সকল আমোদের দ্বারা রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থা ছিল। কবে ও কেন ইহা লক্ষ্মীপূজার রাত্রির সহিত মিশিয়াছে তাহা জানা যায় না।

সুবসন্তক অথবা বসন্তোৎসব এখনকার দোল বা হোলি। বসন্তোৎসব একটা বড় আমোদের দিন ছিল। পুরাণ মতে ইহাকে মদনচতুর্দ্দশী ব্রত বলিত। ইহার বর্ণনা আমরা রত্নাবলীর প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাই। রাজাদের দুঃখ হইলে অর্থাৎ Court mourning হইলে এই উৎসব নিবারিত হইত। অভিজ্ঞান শকুন্তলের ষষ্ঠ অঙ্কে দেখিতে পাই, শকুন্তলাবিরহে কাতর দুষ্মন্ত বসন্তোৎসব নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি বসন্তসময় জাত উল্লাসে উল্লসিত রাজদাসীরা আনন্দ সংযত করিতে না পারিয়া, সহকারপল্লব তুলিয়া 'নমো ভগবতে মকরধ্বজায়' বলিয়া যেমনি উৎসবোন্মুখী হইয়াছে, অমনি কঞ্চুকী আসিয়া তাহাদিগকে রাজাদেশ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বসন্তোৎসব কোনও না কোনও আকারে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। বৈজ্ঞানিক হাভেলক এলিস (Havellock Ellis) এই উৎসবের কারণ অন্বেষণে তৎপর হইয়া বলিয়াছেন যে sexual periodicity হইতেই ঐ সকল উৎসব উৎপন্ন।

আমাদের কবিরাও বসন্তকালকে বিশেষভাবে যৌন-সম্মিলন-প্রবৃত্তির বর্দ্ধক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এইবার দেশ্য ক্রীড়ার কথা বলি। দেশ্যক্রীড়াগুলির নাম ও বর্ণনা পর্য্যায়ক্রমে এই—

১। সহকার-ভঞ্জিকা—যে ক্রীড়ায় আম্রফলের ভঞ্জন ও ভোজন হয়। সদলবলে উদ্যানে গিয়া আম পাড়িয়া খাওয়া। পল্লীগ্রামে এখনও এই প্রকার আমোদ প্রচলিত আছে।

২। অভ্যূষখাদিকা—যে ক্রীড়ায় বৃক্ষস্থ ফলকে আগুনে পোড়াইয়া খাওয়া হয়। কোথাও কোথাও এখনও এইরূপ দলবদ্ধ ক্রীড়া প্রচলিত আছে।

৩। 'বিসখাদিকা—সদলবলে পদ্মের মৃণাল ভোজন। (?)

৪। নবপত্রিকা—প্রথম বর্ষণের পর বৃক্ষে নবপত্র সমুদ্গমে উদ্যানে বা বনে যে ক্রীড়া তাহাকেই নবপত্রিকা বলে। (ইহাই কি এখন দুর্গাপূজা পদ্ধতির অঙ্গ হইয়া গিয়াছে ?)

৫। উদকক্ষ্বেড়িকা—পিচ্‌কারি খেলা। এ খেলাটা এখন দোলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পশ্চিমে ইহাকে শৃঙ্গি খেলা বলে।

৬। পাঞ্চালানুযান—নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি ও আলাপ-সহ যে ক্রীড়া হয়। টীকাকারের মতে ঐ ক্রীড়া মিথিলায় তখনও প্রচলিত ছিল। এখনও পশ্চিমে এক-প্রকার হরবোলার দল আছে যাহারা নানাবিধ পশু-পক্ষীর রবের অনুকরণ করে এবং অন্যান্য হাস্যজনক কথাবার্ত্তা দ্বারা লোককে প্রীত করে।

৭। একশাল্মলী—শাল্মলী বৃক্ষের পুষ্প লইয়া ক্রীড়া, ইহা বিদর্ভ নগরের খেলা।

৮। কদম্বযুদ্ধ—দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কদম্ব পুষ্প লইয়া যুদ্ধ, অনেকটা এখানকার 'বাণ খেলা'র মত। ইহা পৌণ্ড্রদেশীয় ক্রীড়া।

প্রাচীন কালে উদ্যানের কি কি ব্যবহার হইত তাহা আমরা দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছি। নানা কারণে—তাহার মধ্যে প্রধান কারণ জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়া, অন্নাভাব ও ধর্ম্মভাবের ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান—আমরা এখন উদ্যানের সেরূপ আদর করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সকলের মনেই উদ্যান-প্রীতির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন, কারণ যতগুলি উপাদান দ্বারা ভগবানের সৃষ্টির সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, ফুল তাহাদের মধ্যে একটি প্রধানতম। পুষ্পপ্রীতি দ্বারা স্বাস্থ্যের ও মনের উন্নতি সাধিত হয় এ কথা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

কালো দাগ

(গল্প)

অন্তরের স্তরে স্তরে যে বেদনা এতদিন লুক্কাইত আছে, মজ্জায় মজ্জায় যে স্মৃতির সহস্র দাগ একটানা ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, আজ তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, কারণ বৃদ্ধ হইয়াছি,—হতভাগ্যের এই একখণ্ড অন্তহীন অবসাদ-কাহিনী শুনিয়া আপনারা হয়ত উপহাস করিবেন না,—'ভীমরতি' হইয়াছে বলিয়া অনায়াসে বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

শরতের চাঁদ উঠিয়াছে। এই রকম সে-দিনও উঠিয়াছিল, সে-দিনও সমস্ত চরাচরে এই রকম শাদা আলোর ঢেউ ছুটিয়া গিয়াছিল, প্রকৃতি পুলকে মাতিয়া উঠিয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে এই, সেই একদিন, আর এই একদিন!—সে-দিন, ভবিষ্যতের মূর্ত্তি, একটা দুর্দ্দান্ত কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যের মত দেখিয়াছিলাম; আজ আর তাহার সে বিকট আয়তন নাই, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া

আসিয়াছে, কারণ বোঝা নামাইতে পারিলেই তো এখন ছুটি!

দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করিয়া আমি যে রকম পদে-পদে নাকাল হইয়াছি, এরকম জব্দ জানিনা আর কেহ হইয়াছেন বা হইতেছেন কিনা!

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, বিস্তর তীব্র ঔদাসিন্যের পুরস্কার-স্বরূপ ৩,৪ বৎসর না ফিরিতেই যাহাকে পাইলাম, সেটি আমার সীমাহীন শূন্যহৃদয়ের স্থান পূরণকারিণী লজ্জাশীলা অরুণবালা। লোকে বলিত মেয়েটি বেশ ভালো, দেখিতে শুনিতে খাসা। ভালবাসা!! * * * কত নূতন ধরণের ভালবাসায় তাহাকে ভালবাসিতে লাগিলাম, কত নূতন ধাঁচের রঙ্গরসে প্রেমের নদীতে বান ডাকাইতে লাগিলাম—আমার জমাট্-বাঁধা প্রণয় স্তূপ অরুণের স্পর্শে গলিয়া জল হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তবু সে নিতান্ত বালিকা।

বছর কতক বেশ কাটিল। তারপর, যখন সে ডাগর হইয়া উঠিল, তখন তাহার অন্তর-বাহি-বাহিরের সবদিকটা পানেই দেখা যাইত যে সে আমার নিকটে বিস্তর খুঁটিনাটি লইয়া হাঙ্গামা বাধাইতে চায়, যেন তার সমস্ত অঙ্গের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃত প্রাণের পরিচয় আমার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেছে, তার সে সমস্ত সৎ-চেতনাটুকু আমার জন্য আর জাগিয়া থাকিতে একান্তই নারাজ, আমাকে একটা সুপ্তির আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়া তার নিজের সুখ-সুবিধার দিকে বেশ টানিয়া চলিতে থাকে। আমি যেটি তাহাকে প্রত্যাশা করিতে বলি না, সেটির আশা যেন তার না-করিলেই নয়। মোট কথা, অরুণের মন-যোগাইয়া চলা আমার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল।

একদিন অরুণের সঙ্গে একটি ব্যাপার লইয়া বেশ একটু ঝগড়াই হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে আর তার, তোয়াক্কা না-রাখিয়া ভিন্ন শয্যা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলাম, পলে-পলে এক-একটা ভাবনার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলাম। সকলের চেয়ে যে ভাবনাটি আমার প্রবল হইয়াছিল, তাহা আমার প্রথমা-স্ত্রীর কাছে আমার অজস্র-অপরাধ-স্মৃতি!—সেই যে অকৃত্রিম ভালবাসা, প্রতি-দানের অপেক্ষা না রাখিয়া সেই যে অবিরল ধারা, শয্যাত্যাগান্তে বারংবার নম্র প্রণতি, এই সব একে একে মনে পড়িতে লাগিল! * * * চোখে জল আসিল। মাথার কাছের জানালা খুলিয়া দিলাম, অমনি শরৎপূর্ণিমার চাঁদা জ্যোৎস্নায় ঘরটি ভরিয়া গেল। আঃ—সে কি স্নিগ্ধ! তাইতো বলিতেছিলাম—সেই শরতের চাঁদ আবার উঠিয়াছে।

ঘুম আসিল। সে কি ঘুম! কতদিন ঘুমাইয়াছি, প্রণয়িণীর প্রণয়ালাপে আকৃষ্ট হইয়া কতদিন তাহারই বক্ষের নিকট ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এরকম অপরূপ সুপ্তি আমি আর কখনও উপভোগ করি নাই।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি তার ঠিক নাই, এক বিচিত্র স্বপ্না-বেশ হইল। দেখিলাম শিয়রে এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। মূর্ত্তিটি খানিক দাঁড়াইয়া, আমায় তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

জানিনা কেন, বিনা দ্বিধায় আমিও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম, যেন আমি মন্ত্রমুগ্ধ। ক্রমে দুইজনে এক আড়ম্বরবিহীন গৃহস্থ-পুরীতে উপস্থিত হইলাম। সেই দিব্যকান্তি মূর্ত্তি, একটি জনহীন কক্ষে আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনিও আসন গ্রহণ করিলেন। মুখে কথা সরিল না যে জিজ্ঞাসা করি, এ-সকলের তাৎপর্য্য কি? বসিয়া আছি, দেখিলাম বাড়ীর ভিতর-কার একটি কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত একটি জানলার পশ্চাতে এক তরুণীর সুন্দর ফুলের মত ফোটা মুখখানি ঢল-ঢল করিতেছে।

একি! এ যে আমার চেনা মুখ, কোথায় দেখিয়া-ছিলাম যেন,—কতদিনের পরিচিত! মুখখানি দেখিবা-মাত্র আমার অন্তর-বীণার প্রত্যেক্ তন্ত্রীতে ঝণঝণা বাজিয়া উঠিল। আমি স্থান-কাল-পাত্রী ভুলিয়া, অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিলাম, চোখ আর নামিতে চাহিল না।

লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা! সহসা লজ্জায় আমার চমক ভাঙিল। পরস্ত্রীর পানে এরকম চাহিয়া থাকাতে, লজ্জায় ঘৃণায় যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। পাশে একজন মহাপুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন যে! অবাক কাণ্ড! চোখ নামাইয়া দেখি, সেই আশ্চর্য্য মহাপুরুষ মূর্ত্তিটী আর নাই, অন্তর্হিত হইয়াছেন।

চিত্তহারার যে লজ্জাটুকু, তাহা লোকসমাজের ভয়ে। মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধানে যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, আবার আমার সংযমের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম!

যেমন জানলার পানে চাহিতে যাইব, বুঝিতে পারিলাম, একটি নারীমূর্ত্তি আমার ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দুয়ার দিয়া অন্তঃপুরে যাইবার পথ। চোখ চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর এ জীবনে ভুলিবার নহে। আপনারা বৃদ্ধের প্রলাপ কাহিনী শুনিয়া হয়ত হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, হয়ত বলিতেছেন বেহায়া মূর্খ, এই অন্তিম সময়ে কোথায় হরিনাম করিবে, না সে-সব ছাড়িয়া ভিত্তিহীন স্বপ্নের কথা লইয়া ভাবে ভোর হইয়াছ! এখন আমার হরিনাম, শিবনাম—সব নামেরই জপমালা—সেই নাম! যে মূর্ত্তিটি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সেটি আর কেহ নহে—আমার প্রথমা-স্ত্রীর বাস্তব-কলেবর!!

আমরা উভয়েই নির্ব্বাক। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "কেমন আছ?" এত শীঘ্র তাহার কথার জবাব দিব কেমন করিয়া? মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

সে আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া লইয়া বলিল—"বিস্মিত হয়ো না, আমি সেই তোমার বীণা! এ ঘরে এই তিন বছর এসেছি; যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তিনিও ঠিক তোমারি মত দেখতে, ভালোও বাসেন ঠিক তোমারি মতন।"

এইবার মনের মধ্যে একটু শক্তি ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, "আমায় কি এখনো ভালবাস?"

সে উত্তর করিল, "কেমন করে তা বল্‌বো? কই, এত ভালবেসেও তো তোমার কাছে থাকতে পেলুম না!"

বুঝিলাম, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিল। দুইচারি মিনিট যাইতে-না-যাইতেই সহসা চাপা গলায় আবার বলিয়া উঠিল, "না গো না—আর তোমায় ভালবাসি না;—কিন্তু এই পর্য্যন্ত জেনো, তোমার স্মৃতি বুকে করেই আমার এ স্বামীকে বড় ভালবাসতে পেরেছি।"

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিল। কিন্তু আমার মন মাতাল হইয়াছিল, তাই চিত্ত সংযত করিতে না পারিয়া, টলিতে টলিতে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ছুটিয়া গেলাম।

আমার পায়ের শব্দ পাইয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়াও—ছুঁয়ো না, এ দেহ তোমায় সমর্পণ করবার অধিকার আর এ-অভাগীর নেই! কিছু মনে কোরো না; তোমার স্মৃতিটুকু মাত্র বুকে রাখবার অধিকার আছে;" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম—রমেনের সঙ্গে কাল একবার দেখা কোরো, বাবার ভারি ব্যারাম।"—তাহার স্বর যেন অস্বাভাবিক, ভারি-ভারি।

সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া দেখি, নিজের ঘরেই শুইয়া আছি। প্রভাতের আলো বিশ্বের সমস্ত অন্ধকার নাশ করিয়াছে। কিন্তু, আমার মনের অন্ধকার?

সেই অন্তহীন অন্ধকারের চাপ আর আমায় তিষ্ঠিতে দিল না। উঠিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া, আমার চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে যে একটি ঘর বাঁধা ছিল, সেই ঘরের একজন কুটুম্বের বাসায় চলিলাম। বলা বাহুল্য কুটুম্বটি রমেন—আমার মৃতা স্ত্রীর ছোট ভাই, সে কলিকাতায় কলেজে পড়িতেছিল। সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়াছে, রয়েছে স্মৃতির দাগ!

যখন রমেনের বাসায় পৌছিলাম, সে তখন বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল। আমাকে দেখিয়াই বিস্ময়ে ও

হর্ষে আমার পদধূলি গ্রহণ করিল। এতগুলা কথা কহিবার শক্তি না পাইয়া, সেই স্নেহের পাত্রটিকে শুধু হাত তুলিয়াই আশীর্ব্বাদ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে এ কথায় সেকথায় আসল কথাটি পাড়িলাম—তার পিতার সংবাদ। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার সেই বিস্ময়কর স্বপ্নের সত্যতার সম্বন্ধে কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না, শ্বশুর মহাশয় ভালই আছেন!

এতবড় একটা ছেলেমানুষী লইয়া কেমন করিয়া আপনাকে এত অপদার্থতার দিকে টানিয়া আনিয়াছি, এই কথা যখন ভাবিতেছিলাম, রমেনের নামে এক 'তার' আসিয়া উপস্থিত হইল। 'তার'টি তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া পড়িবামাত্র, তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী কাগজখানা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কি ব্যাপার জানিবার জন্য তারটি উঠাইয়া লইয়া পড়িয়া দেখি—দুর্গা, দুর্গা, রমেনের বড় ভাই (আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালক) টেলিগ্রাম করিতেছে—Father died of cholera last night come sharp. (পিতা গতরাত্রে কলেরায় মারা গেছেন, শীঘ্র এস)

সে ঘটনা অনেক দিন ঘটিয়া গিয়াছে। এ রহস্য লইয়া অনেক তোলাপাড়া করিয়াছি, কিন্তু কোনও মীমাংসায় পৌঁছিতে পারি নাই। স্থবির হৃদয়ের সব গ্রন্থিই খুলিয়া পড়িয়াছে—আর বন্ধন নাই, বাঁধিবার শক্তিও নাই। কিন্তু সহস্র শিথিলতার মাঝখানে এখনও একটি বেদনা জাগিয়া আছে। জন্মান্তরের প্রতীক্ষায় সে থাকিতে চায় কেন? তবে কি সে আবার কোনও জন্মে আমার বুকে আসিয়া বুক জুড়াইবে? আমরও কি এই আশায় আসা-যাওয়ার ভোগ কাটিবে না?

শ্রীচরণদাস ঘোষ।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা

কিছুদিন পূর্ব্বে মান্যবর শ্রীযুক্ত প্যাটেল (Patel) মহীশূর রাজ্যে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষার পরিচালকগণের বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার বিষয়। বর্ত্তমান প্রণালীতে বালক বা যুবকগণ যে ১৮ বা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে থাকে এবং সে সময়ের মধ্যে তাহারা অন্য কোনও কার্য্য শিক্ষা করে না, ইহা শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহাশয় শিক্ষা-প্রণালীর অতি গুরুতর ত্রুটী মনে করেন। ঐ সময় মধ্যে যে পুস্তক পাঠ ভিন্ন অপর কার্য্যও তাহারা শিক্ষা করিতে পারে, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এবং পুস্তক পাঠের প্রচলিত রীতিও যে বালকের মনোবৃত্তিগুলি সম্যক বিকাশের সাহায্য করে, সে বিষয়েও সন্দেহ রহিয়াছে। এখন অতি অল্পবয়স্ক বালককে যে পদ্ধতিতে সকল বিষয় শিক্ষাদানের প্রয়াস করা হয়, প্যাটেল সাহেব তাহা মূলেই ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন এবং সে পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধ হয় যে সকল বিষয় যে ভাবে এক্ষণে শিশু বা বালককে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তাহার মস্তিষ্কের উপরে অত্যধিক চাপ দেয় কিন্তু তাহার আভাস, রুচি এবং জীবনের গতিকে স্পর্শ বা নিয়ন্ত্রিত করে না। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" যেভাবে এযাবৎ কাল ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে, তাহার সহিত জীবন ধারণের ও জীবন যাপনের আদর্শের সম্বন্ধ অতি অল্পই আছে। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি দেহ-

মনের বিকাশের সম্পূর্ণ সাহায্য করিবার উপযোগী নহে, একথা, যিনি মানবকে কেবল মনোজীবি মাত্র মনে করেন তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইবে।

ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলির যথা—সুইট্‌জার-ল্যাণ্ড (Switzerland), ডেনমার্ক (Denmark), সুইডেন ও নরওয়ের (Sweden and Norway) সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সে সকল দেশে অল্পবয়স্ক বালকগণ শিক্ষা-লাভের সঙ্গে শ্রমশিল্প দ্বারা পরিবারিক আয়ের পথ প্রশস্ত করে; তাহাদের নিজ শ্রমোপার্জ্জিত অর্থে নিজের শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান হয়। প্রাচ্য ভাগে জাপান এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া গৃহ-শিল্প (Home-industry) আশ্চর্য্যভাবে বিস্তৃত করিয়াছে। জাপানের প্রত্যেক গৃহই এক-একটী ছোট ছোট কারখানা। এ দেশের অগণিত জনসংখ্যার জন্য এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী বালকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট পন্থা জাতীয় ও সামাজিক জীবনের কতটা সহায়তা করে, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন রিপোর্টের শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা প্রস্তাবে বলা হইয়াছে (২ পেরা ৮ অধ্যায়) যে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ শিক্ষাদানে বিশেষ সাহায্য ও সম্মতি প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ শিল্পশিক্ষা-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত লোকের মনের উপর অতি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিবে। কেবল ইহাই নহে। কমিশন আরও মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক শিল্প এদেশের লোকের জীবনযাত্রার নূতন পথ সকল উন্মুক্ত করিয়া দিবে এবং এ সকল পথে শিক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন যুবকগণ পরিণামে অধিক আয়কর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে (যেরূপ আয় অন্যান্য ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে হওয়া অসম্ভব)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট ১৯১৭ সনে এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন কমিশন তাহার সহিত একমত ("It is desirable and necessary that the University should take steps to develope the teaching of agriculture, technology and commerce.)। কমিশন পরোক্ষ ভাবে রিপোর্টের অন্য অংশে স্বীকার করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত এ দেশে গভর্ণমেণ্ট শিল্প শিক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা ফলদায়ক হয় নাই। আশার কথা এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী সভ্যগণের মনোযোগ এবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান মাট্রি-কুলেন পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের একটী কারণ শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা বলিয়া কমিশন প্রকাশ করিয়াছেন।

যে যে শিল্প কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আপাততঃ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তন্মধ্যে—

(1) The Leather industries.

(2) The chemical industries (including those concerned with the manufacture of dyes.)

(3) The oil and fat industries

(4) Some branches of the textile industry—

বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ভাবে অর্থকরী রসায়ন-বিদ্যার আলোচনা করেন এরূপ ইচ্ছা কমিশনরগণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির ইতিহাসে, ফলিত রসায়ন এবং তাহা দ্বারা উদ্ভাবিত অর্থকর পদার্থের স্থান অতি উচ্চ হইবে আশা করা যাইতে পারে। ভারত-বর্ষের বনজাত ও খনিজ পদার্থের বোধ হয় শতাংশের একাংশও আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অতি সামান্য অংশই বর্ত্তমানে দেশের রসা-য়নাগারে পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। রসায়ন বিদ্যার আলোচনায় ইউরোপ অর্থশালী হইয়াছে; সে দেশের শত শত Chemical works জগতের অভাব মোচন করিতেছে। এই নিমিত্ত research বা বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক; এবং সে কার্য্যের ভার বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই গ্রহণীয়। ছাত্রদিগের মধ্যে শিল্পস্পৃহা বা ভাব ("technical sense") জাগ্রত করাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ কার্য্য, যে হেতু তদ্দারা, যাহারা

কলকারখানায় কায করিতেছে তাহাদিগকেও শিক্ষাদান ও সাহায্য করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেজন্য কার্য্যকর জ্ঞান (Practical knowledge) ও বিজ্ঞানের নিয়ম (theory) গুলির সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত অধ্যক্ষগণের অধীনে শিল্পশিক্ষার এক একটী বিভাগ পরিচালনা করিতে হইবে। এ সকল বিষয়ের ডিগ্রি বা উপাধি প্রদান তত প্রয়োজন নহে, যত এসকল বিষয়ের আলোচনা দেশমধ্যে বিস্তৃত করা প্রয়োজন। যে পন্থা অবলম্বন করিয়া জার্ম্মনী বিজ্ঞানকে দেশের সাধারণের সম্পত্তি করিয়া তুলিয়াছে, সে শিক্ষার মূলে, সাধারণ শিক্ষার সহিত বিজ্ঞানকে সহজ শিক্ষার বিষয় করিবার চেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ের অভাব আংশিক ভাবে পূরণ করিতে পারেন; কারণ আদর্শ প্রতিষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়েরই কার্য্য।

বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা মত (theory) শিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে কার্য্য অসমাপ্ত ও শিক্ষা নিরর্থক হইবে সন্দেহ নাই। কত বি এস্ সি, এম্ এস্ সি, উকিল হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই ? কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা (Practical experience) লাভের উপায়-বিধান একান্ত প্রয়োজন ("Before he receives his degree or diploma at the University, a student should spend some time in a workshop and thus become inured to ordinary industrial conditions and see processes carried out upon a commercial scale".)। শিল্প ও কারবার গুলিকে এ বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিতে আহ্বান করিবার বহু বাধা আছে, কারণ তাহারা ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য তাহাদের কার্য্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় "Intermediate stage"এ শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে কলিকাতার প্রধান প্রধান ইঞ্জিয়ারিং কোম্পানীর অভিমত হইতে ইহাই সংগ্রহ করা যাইতে পারে, যে— "We think there is no doubt that there will be rapid industrial development in India after the war." কিন্তু তাঁহারা অনেকেই বলেন—'We often find ourselves in a very difficult position when the necessity arises of filling up gaps in our Indian staff in the machine shop."

প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে যে অর্থনৈতিক ও দেশের উন্নতির প্রশ্ন জড়িত ইহা শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ। কমিশন সত্যই বলিয়াছেন—"We regard the promotion of advanced technological studies in the University as one aspect of a much larger problem, namely, the adjustment technical training in all its grades to industrial policy and progress".

পাশ্চাত্য দেশসমূহের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চাঙ্গের বাণিজ্য-শিক্ষাও (Commerce) এক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের শ্রীবৃদ্ধির মূলে এই শিক্ষাপ্রণালী কার্য্য করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, যে শিক্ষায় চরিত্র ও মানসিক বৃত্তিগুলির পরিচালনা হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা, বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্র বাণিজ্যস্থল। বর্ত্তমান শিক্ষা এ উভয় পন্থীদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিতেছে। শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা যে মনুষ্যকে তাহার সকল অভাব আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ প্রদান করিতে পারে, তাহা হার্ব্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার Education নামক পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বিশাল ভারতবর্ষের জন্য এবং তাহার সকল অভাব পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক। স্পেন্সর আরও বলিয়াছেন—"Had there been no teaching but such as goes on in our public schools, England would now be what it was in Feudal times."

ভারতবর্ষের পক্ষেও এ কথা প্রযোজ্য। শিক্ষাকে গণ্ডীবদ্ধ করা যেমন অনুচিত, শিক্ষাকে একমুখী করাও তেমনি দেশের দুরবস্থার হেতুস্বরূপ ; কারণ মানব মন ও প্রকৃতি শতমুখী, তাহার বিকাশ শত দিকে। শিল্প কমিশন যে আত্মপণ্যে পূর্ণ ভারতবর্ষ গঠনের আশা করিতেছেন ("Ideal of a self-sufficing India"), তাহার জন্য বিশেষ চর্চ্চা (Specialisation) প্রয়োজন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সে চর্চ্চাও বহু ছাত্রপূর্ণ কলেজ ভিন্ন সম্ভব নহে। এ নিমিত্ত সমগ্র ভারতের কেন্দ্রস্বরূপ বৃহদাকার শিক্ষাগার-স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে। কিন্তু দেশের অভাব পূরণ করিতে হইলে জন-সাধারণের শিক্ষায়, বালকের "technical sense"কে জাগ্রত করিবার শিক্ষা ও সুযোগ প্রদান এ দেশের পক্ষে দিন দিন অধিকতররূপে আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায়।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল

শ্রীযুক্ত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত নিবেদনটি মুদ্রিত করিলে বাধিত হইব।

নিবেদন।

আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষিত সাধারণের স্বাধিকার লাভের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন শিক্ষার সুযোগ পাওয়া সকলেরই জন্মগত অধিকার। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত আমাদের উদাসীনতার জন্য, আমাদের নারী-সমাজ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। ধনবান ও হৃদয়বান যাঁহারা শিক্ষার জন্য দান করিয়া থাকেন, তাঁরা শিক্ষা বলিতে পুরুষের শিক্ষাই বোঝেন বোধ হয়—কারণ এ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কেহই উল্লেখযোগ্য দান করেন নাই। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার যাঁরা বিরোধী, তাঁরাও নারীদের জন্য, গৃহস্থালি সুচারুরূপে চালাইবার ও শিশু পুত্রকন্যাকে লালনপালন করিবার উপযোগী, এবং নিঃস্ব স্ত্রীলোকগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন এমনধারা শিল্প বা অন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না। গত নয় বৎসর যাবৎ এই উদ্দেশ্যে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আন্তরিক চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁদের চেষ্টা আংশিক সাফল্য মাত্র লাভ করিয়াছে। স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি বৎসরান্তে একটি করিয়া টাকাও এই সদুদ্দেশ্যে দান করেন তাহা হইলে স্ত্রী-মহামণ্ডলের কায যথেষ্ট সহজ ও ব্যাপক হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস ইচ্ছা করিলে এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার অনেকেই করিতে পারেন। তবে শ্রদ্ধয়া দেয়ং—এককালীন বা বাৎসরিক হিসাবে যিনি যাহা দিবেন, তা সে যত অল্পই হোক, তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলকে দিন দিন উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারিলেই স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্মৃতি প্রকৃতভাবে রক্ষিত হইবে। টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। কলিকাতার মধ্যে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হইলেও নিম্নে আবেদন করিতে হইবে।

"তারাবাদ",
৪৬ ঝাউতলা রোড,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।
সম্পাদিকা ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

(বিগত আষাঢ় সংখ্যায় আমরা খোঁপার যে চিত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কতকগুলি "বিদ্যাবিষয়ক" আখ্যাপ্রাপ্তির যোগ্য। "সেফুরি প্রাইমার"-পাঠিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারিণীগণের খোঁপার নমুনা ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু এ সমস্তই ইংরাজি বিদ্যা, তাই পণ্ডিত মহাশয়েরা বড় রাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই বলিয়া অনুযোগের স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সংস্কৃত বিদ্যাকে এভাবে 'অগ্রাহ্য' করিবার কারণ কি? সেই ত্রুটি সংশোধনার্থ, সংস্কৃতবিদ্যাপারদর্শিনী মহামহোপাধ্যায়ার কবরীর নমুনা স্বরূপ আমরা নিম্নধৃত চিত্রখান প্রকাশ করিলাম।)

মহামহোপাধ্যায় খোঁপা

(চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন)

গোয়ালিয়র

এলাহাবাদ হইয়া আগ্রা গিয়াছিলাম। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র যাইবার জন্য দুইখানি থার্ড ক্লাশের টিকিট কিনিলাম। মোটগুলি প্ল্যাটফরমে পৌছাইয়া দিতে কত লইবে কুলিকে জিজ্ঞাসা করায়, একজন আমাদের নিকট হইতে যাহা চাহিল, তাহা শুনিয়া আমার মনে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। আমার সঙ্গী শ্রীমান্—কে বলিলাম, তুমি ব্যাগ দুটা লও, আমি বিছানাটি লই।" এইভাবে আমরা যখন প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হইলাম, গাড়ী তখন ইয়ার্ড সিগ্‌ন্যল ছাড়াইয়া প্ল্যাটফরমে আসিয়া পড়িয়াছে। ভীড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে একখানা থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে উঠিলাম, কিন্তু বসিবার যে স্থান পাইব, এরূপ আশা করিতে পারিলাম না, কারণ আমাদের শুভাগমনে, পাগড়ীওয়ালা ভীষণ-দর্শন আরোহীদল এবং অসংখ্য টাকা, আধুলি প্রভৃতির মালা গলায়, ঘাগরা ও চুলি পরিহিতা আরোহিণীগণ যে মোটেই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া, বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। বাঙ্গালী বাবু দেখিয়া কোথায় তাহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইবে, তা নয়, নির্ব্বিকার চিত্তে বেঞ্চের উপর বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিতে লাগিল! দুর্গন্ধে প্রাণ যায় যায়,—ধূমে কম-পার্টমেণ্ট অন্ধকার। অসহ্য হইলেও, থার্ড ক্লাসের যাত্রী আমরা—নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গোয়ালিয়র সরাফা বাজার

পাঁচটার সময় আমরা গোয়ালিয়রে পৌঁছিলাম। এখানকার বাঙ্গালী অধিবাসিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শীতলাদাস
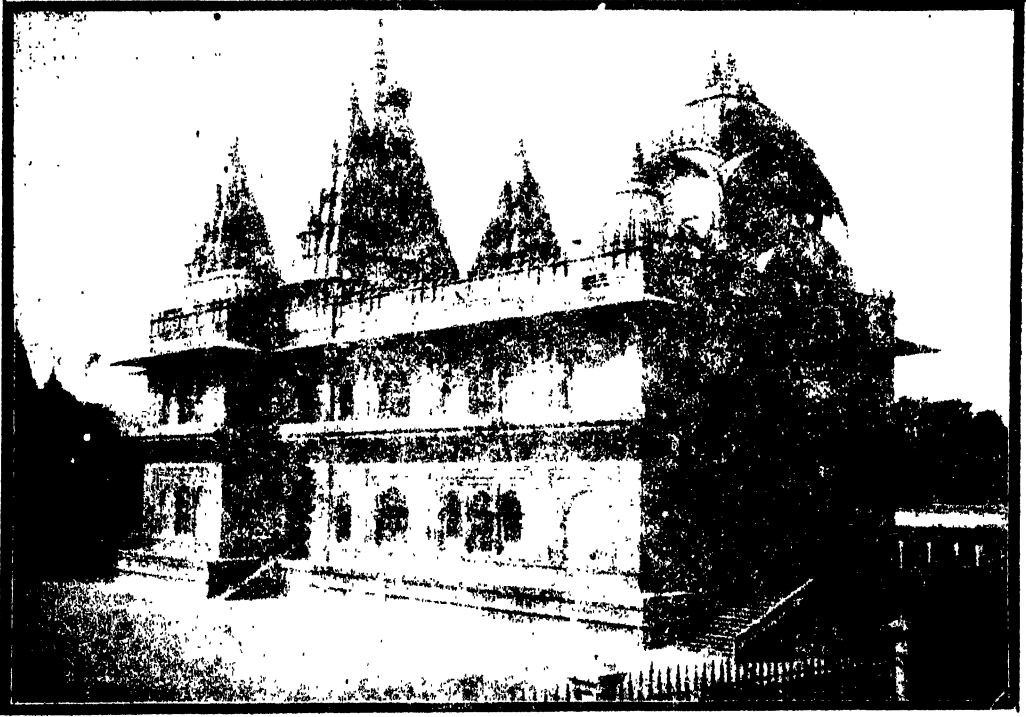
মহারাজ জিয়াজি রাওয়ের স্মৃতিসৌধ

মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমার পরিচয় ছিল, সুতরাং তাঁহার বাটী যাওয়াই স্থির হইল। জিনিষপত্র লইয়া টোঙ্গায় বসিলাম। শীতলবাবুর ঠিকানা, যতদূর জানা ছিল, গাড়োওয়ালাকে বলিলাম, চালক হাঁকাইল। কি বিপদ! কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে, এক মহারাষ্ট্র, বীরের মত আমাদের পথ রোধ করিল। চালক বলিল, ইনি গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্যতম ডিটেকৃটিভ কর্ম্মচারী। "আপ কাঁহাসে আ রহেঁ হৈঁ?" জানাইলাম, এলাহাবাদ হইতে আসিতেছি। আবার প্রশ্ন, "কিসকে মকানমে যায়েঁগে?" উত্তর করিলাম, "শীতলবাবুর বাড়ী যাইব।" অতঃপর নাম ধাম লিখিয়া লইয়া, ডিটেকৃটিভ মহাশয় তখনকার মত আমাদের রেহাই দিলেন। পরে জানিয়াছিলাম যে, এখানে নবাগত বাঙ্গালী আসিলে, তাহার নাম ধাম প্রভৃতি জানিয়া লওয়া হয়, কখনও বা কোন ভদ্রলোকের ট্রঙ্ক ইত্যাদি খুলিয়া তল্লাসি লওয়া হয়, এমন কি কেহ কেহ থানায় পর্য্যন্ত যাইতে বাধ্য হন; যদি কোন সন্দেহের কারণ না পাওয়া যায়, তবেই তিনি এখানে থাকিতে পারেন, নতুবা কিছুদিন তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, না হয় তৎক্ষণাৎ ফিরিতে হয়। দু'-এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া, অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা শীতলবাবুর বাড়ী পৌঁছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং সেদিন আর কোথাও বাহির হইলাম না, যথাসময়ে আহারাদি করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিতেই চোখে পড়িল, গোয়ালিয়রের বিশালকায় পার্ব্বত্য দুর্গ। নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণোজ্জ্বল-কিরণ-স্নাত হইয়া এই দুর্গ বড়ই মনোহর দেখাইতেছিল। ইহা আমার চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন! সেইদিন শীতলবাবুর নিকট দুর্গ দেখিতে যাইবার

প্রস্তাব করিলাম। তিনি বলিলেন, "আহারাদির পর যাইতে পার, কিন্তু রৌদ্রে কষ্ট হইবে।" বলিলাম, "রৌদ্রের ভয় করিলে ত আর কেল্লা দেখা হয় না। যখন দেখিতে হইবে তখন বিলম্ব করিয়া ফল কি?"

আহারাদির পর পদব্রজেই আমরা দুর্গাভিমুখে রওনা হইলাম। রৌদ্রে যে বিশেষ কষ্ট হইবে, সে কথা পথে বাহির হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। সূর্য্যের প্রচণ্ড রশ্মি তরল অগ্নির মত যেন গোয়ালিয়র রাজ্যকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিল। ইন্দ্রগঞ্জ ও সিন্ধিয়ার ছাউনির ভিতর দিয়া আমরা পার্ব্বত্য পথে উপস্থিত হইলাম। কি সুন্দর পথ! পর্ব্বত কাটিয়া পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে, দুইধারে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। চড়াই উঠিতে উঠিতে হাঁপাইতে লাগিলাম, পদদ্বয় অবশ হইয়া আসিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে আমরা এই গিরিসঙ্কটের পরপারে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে দুর্গ ও তৎপার্শ্বস্থ সমস্ত ঘরবাড়ী বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। পার্ব্বত্য পথ পার হইয়া সম্মুখেই গোয়ালিয়রের সেণ্ট্রাল জেল। শুনিলাম এ জেল দেখিবার যোগ্য, কাযেই এত নিকটে আসিয়া দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, সর্ব্বাগ্রে জেল দেখিতে চলিলাম। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আমাদের জেলের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

গোয়ালিয়র টাউন হল ও থিয়েটার হল

দুইজন সশস্ত্র প্রহরী-রক্ষিত হইয়া আমরা কয়েদখানার বৃহৎ ফটক পার হইলাম। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিষই এখানে প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। একদিকে শতরঞ্চি, গালিচা, পশমের সুন্দর সুন্দর বিভিন্নপ্রকারের আসন, ধুতি সার্ট কোট প্রভৃতির জন্য নানা ফ্যাসানের কাপড় ও ছিট প্রস্তুত হইতেছে। অন্যদিকে বুট, সু, দার্ব্বি, পম্প প্রভৃতি নানাপ্রকার

জুতা প্রস্তুত হইতেছে। আবার কোনস্থানে কতকগুলি কয়েদী টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। কেহ বা গম ভাঙ্গিতেছে, কেহ ঘানি ঘুরাইতেছে। জেলের এক প্রান্তে ছাপাখানা ; যে সকল লেখাপড়া জানা অপরাধীর অনেক দিনের মেয়াদ হয়, তাহাদের এই ছাপাখানায় কর্ম্ম করিতে হয়। এখানে দর্জ্জিবিভাগও আছে, ঐ স্থানে কোট-সার্ট প্রভৃতি তৈয়ারি হইয়া থাকে। কাট ছাঁট ভাল—গোয়ালিয়রের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, জেলখানা হইতে তাঁহাদের আবশ্যক পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

জেল দেখিয়া বাহিরে আসিলাম। আমাদের অন্যতম সঙ্গী দামোদর-রাও (ইনি মহারাষ্ট্র) বলিলেন,—"চলুন, ভিলসার দেবী দেখিয়া আসি, পরে দুর্গ দেখিতে যাইব।" আমরাও সম্মত হইলাম। প্রায় পনর মিনিট পদব্রজে চলিয়া, অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে দেবীর মন্দির। আমরা পর্ব্বত-গাত্রস্থ সোপান ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া, এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, শুনিলাম ইহা অত্যন্ত গভীর। সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ জলপূর্ণ, উপর হইতে দেখিলে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। নাটমন্দির অতিক্রম করিয়া, মন্দিরের সম্মুখে আসিলাম। মন্দির মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। দেবীর প্রাত্যহিক পূজার জন্য একজন পুরোহিত এখানে সকল সময় থাকেন। প্রণামান্তে তাঁহার নিকট হইতে চরণামৃত পান করিয়া ফিরিলাম। প্রতি-বৎসর শারদীয়া অমাবস্যা (আমাদের দেশে যাহাকে "কলাকাটা" অমাবস্যা বলে বা যে দিন হইতে "বোধন" বসে) হইতে দশমী পর্য্যন্ত খুব ধুমধামের সহিত দেবীর পূজা হইয়া থাকে। ঐ কয়দিন এখানে অত্যন্ত জন-

গোয়ালিয়র—জেনেরাল পোষ্ট আফিস
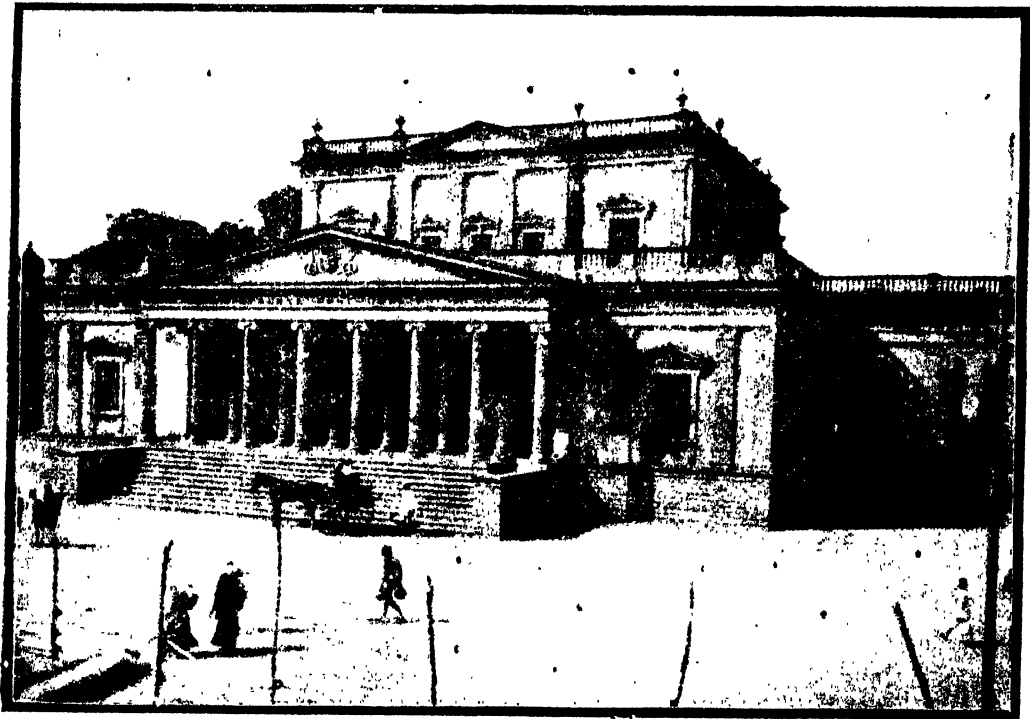
সমাগম হয় এবং নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ আসে। এই মেলাকে এখনও "নওরাত্" বলে। দেবীর প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির এবং নাটমন্দিরের ভিত্তিগাত্রে ও মেঝের উপর নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি শোভিত। মন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী ও কারুকার্য্যের শিল্পনৈপুণ্য দর্শককে বিস্মিত করিয়া দেয়। ইহা ভিলসানিবাসী কোন ধনবান ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই জন্য মন্দির মধ্যস্থ দেবীমূর্ত্তি "ভিলসার দেবী" নামে খ্যাতা।

দেবী দর্শন করিয়া পাহাড়ের নীচে যখন আসিলাম, তখন বেলা তিনটা। কেল্লায় পৌছিতে অন্ততঃ একঘণ্টা লাগিবে। ভাবিয়া দেখিলাম, কেল্লায় যাওয়াই সার হইবে, কিছু দেখিবার সময় পাইব না, কাযেই সেদিন কেল্লায় যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। দামোদর রাওকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেল্লার নীচে দেখিবার মত কিছু আছে কি না? তিনি বলিলেন, পুরাতন সহর এবং কতকগুলি দেখিবার উপযুক্ত দেবমন্দির আছে। যখন দুর্গে যাওয়া হইল না, তখন পুরাতন সহর দেখিতে চলিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা কোটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইহার নিকটেই ভূতেশ্বর দেবের মন্দির ও বাবা কর্পূর পীরের দরগাহ। কোটেশ্বর ও ভূতেশ্বরের মন্দিরের বহির্ভাগ সাধারণ ভাবে প্রস্তুত হইলেও, ইহার ভিতরদিকের কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই সকল মন্দির গোয়ালিয়রের বর্ত্তমান মহারাজের মাতার দ্বারা নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফার্গুসন তাঁহার ইতিবৃত্তে* ইহার বিশেষ প্রশংসা

গোয়ালিয়র—ভিক্টোরিয়া কলেজ

* Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture.

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মার্কেট

করিয়াছেন। প্রতিবৎসর শিবরাত্রির দিন কোটেশ্বর ও ভূতেশ্বরে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। পীর-কপূর মুসলমানের দেবতা হইলেও, হিন্দুগণ ইহাঁকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, প্রতিদিন বিস্তর হিন্দু, পীরের দরগায় সিন্নি দিয়া যায়।

এখান হইতে আমরা পুরাতন গোয়ালিয়র সহরে উপস্থিত হইলাম। নগরপ্রান্তে, দুর্গের পাদদেশে জুমা মস্‌জীদ্ অবস্থিত। ইহার গম্বুজগুলি সোণালি লতা-পাতার কারুকার্য্যমণ্ডিত, মস্‌জীদটি শ্বেত প্রস্তরে প্রস্তুত, দুইদিকে দুইটি অত্যুচ্চ মিনার আছে, উপাসনালয়ের প্রবেশদ্বারে কোরাণের পবিত্র প্রস্তাব লিখিত। মস্‌জীদটি দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা সবেমাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। স্লিমন সাহেবের (Sir W. Sleeman) মতে, "ইহা অতি সুন্দর মস্‌জীদ্।" * এই মস্‌জীদ্ ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ্ খান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অনতিদূরে মালবার পাঠান রাজগণের দ্বারা নির্ম্মিত প্রাসাদের কিয়দংশ এবং মালবার শেষ পাঠান নৃপতির সমাধিস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। এ সকল প্রাসাদের সুন্দর নির্ম্মাণ প্রণালী এবং ইহার অভ্যন্তরীণ কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাৎকালীন পাঠান শিল্পনৈপুণ্যের ইহা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এখান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা মহম্মদ ঘৌস ও ভারতের অদ্বিতীয় গায়ক তানসেনের সমাধি মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মহম্মদ ঘৌস আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। ইহাঁর সমাধি-সৌধ কতকটা দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি ভবনের অনুকরণে নির্ম্মিত। যে কক্ষে ইনি সমাহিত, উহা সাধারণ সমাধিকক্ষ হইতে

* "It is a very beautiful mosque, with one end built by Muhammad Khan, × × of the white sandstone of the rock above it. It looks as fresh as if it had not been finished a month." Rambles, Vol. I, p. 347.

কিছু বড়, মধ্যস্থলে উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের বেদীতে মহম্মদ ঘৌসের সমাধি। সমাধির নিম্নে চতুর্দ্দিকে তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ অনন্তশয্যায় শায়িত। কক্ষের বাহিরে চারিদিকে চারিটি বৃহৎ দালান, ইহার দুইদিক শ্বেত প্রস্তরের জালতি দ্বারা আবৃত, এই অংশে মহম্মদ সাহেবের আত্মীয়গণ সমাহিত আছেন। এই সমাধি সৌধের সম্মুখেই তানসেনের সমাধি-মন্দির। ইহাঁর সমাধির কোন বিশেষত্ব নাই, একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ইনি সমাহিত আছেন। সমাধিকক্ষটি লাল প্রস্তর নির্ম্মিত, চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত। ইহাঁর সমাধির চারিদিকে, প্রিয় শিষ্যগণের সমাধি। নিকটেই একটি তেতুল গাছ আছে। প্রবাদ, উহার পাতা খাইলে নাকি, কর্কশকণ্ঠ-তানলয়হীন ব্যক্তিও সুগায়ক হয়। প্রতিবৎসর এখানে দুইবার মেলা হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অনেক বিখ্যাত গায়ক গায়িকা ঐ সময় এখানে আসিয়া থাকে। * এখানকার ঐ উৎসবকে এক বিরাট সঙ্গীত-সম্মিলন বলিলেও চলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া, সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিলাম। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাহিরে আসিতেই এক ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি গোয়ালিয়র Victoria College এর প্রোফেসার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহাঁর সহিত বেশ আলাপ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ইনি বলিলেন,—"চলুন আপনাকে বান্ধব-নাট্য-সমিতিতে বেড়িয়ে আনি।" কাল বিলম্ব না করিয়া আমি ইহাঁর সহিত, বঙ্গীয় নাট্যসমাজ দেখিতে চলিলাম। গোয়ালিয়র-প্রবাসী ডাক্তার, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর উক্ত সমিতির সভ্যগণ, অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত নাটকের মহলা দিয়া থাকেন। নরেন বাবুর সহিত আমি যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহাদের মহলা চলিতেছিল, আমরাও ধীরে ধীরে গিয়া এক পাশে বসিলাম। কিছুক্ষণ শ্রবণের পর জানিলাম, বঙ্গের অমর নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গলে"র মহলা হইতেছে। Acting এর মোশন হিন্দুস্থানি বা বাঙ্গলা তাঁহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, পাগলিনী নাকি সুরে কাঁদিতেছেন, বা এক্টো করিতেছেন, তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আর পাত্রপাত্রীগণের ভাষা! তাহা ফারসীর ফোড়ন দেওয়া হিন্দী বাঙ্গালা মিশ্রিত এক অদ্ভুত খিচুড়ি বিশেষ। কেহ কাহাকেও মানিতে চায় না; সকলেরই ধারণা, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। রিহার্সল বন্ধ হইবার পর এক ভদ্রলোক হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গান ধরিলেন :—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমার রসাল নন্দনে।"

প্রাণের সব তারগুলা একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। এস্থানে যে এমন একজন সুগায়কের সাক্ষাত পাইব, সে আশা করি নাই। মুগ্ধনেত্রে গায়কের মুখের দিকে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিলাম। গান শেষ হইলে, সকলে আপন আপন বাটী যাইবার জন্য উঠিলেন। এই গায়কের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা আমার অত্যন্ত বলবতী হইল। পথে তাঁহার সহিত আলাপ হইয়া গেল। জানিলাম, গান শিখিবার জন্য তিনি এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী বীরভূমান্তর্গত রাণীপার গ্রামে। ইহাঁর নাম শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি যাঁহার নিকট গীতশিক্ষা করিতেছেন, আমায় একদিন তাঁহার গান শুনাইতে লইয়া যাইবেন বলিলেন। যথা সময়ে বাড়ী আসিয়া, আহারাদির পর শয্যাগ্রহণ করিলাম।

গোয়ালিয়রের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পরদিন আর্কিয়লজিক্যাল সোসাইটিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বদিনেই এ সম্বন্ধে সোসাইটির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত গর্দ্দে মহাশয়ের সহিত কথা-

* This is still religiously believed by all dancing girls. They stripped the original tree of its leaves till it died, and the present tree is a seedling of the original one." Lloyd's Journey to Kunawan, Vol I. p. 9. (1820.)

বার্ত্তা কহিয়া রাখিয়াছিলাম। তখন বেলা এগারটা। সোসাইটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গর্দ্দে মহাশয়, বিদিশা হইতে খননে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমায় বসিতে বলিয়া, অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁহার হস্তস্থিত মুদ্রাগুলি আমার সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন—"বাবু, কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্রে যে অগ্নিমিত্রের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, এই মুদ্রাগুলি সেই সুঙ্গ বংশীয় রাজা অগ্নিমিত্রের এবং এইগুলি উক্ত বংশের অন্ততম রাজা পুষ্পমিত্রের। আমি বিস্মিত নেত্রে মুদ্রাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলাম। খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বের এই মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া, শিক্ষিত সমাজকে আজ বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। এই মুদ্রাগুলি কোথায় কি অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, গর্দ্দে মহাশয় আনুপূর্ব্বিক তাহা আমায় শুনাইলেন, অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিছুক্ষণ পরে তিনি একে একে অনেকগুলি ইতিহাস গ্রন্থ দেখাইলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানি ইংরাজি ইতিবৃত্ত, অন্যগুলি সমস্তই সংস্কৃত এবং অন্যান্যদেশীয় ভাষায় হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি। পুস্তক দেখা শেষ হইলে লিপি দেখিতে লাগিলাম। তাম্রলিপি, শিলালিপি প্রভৃতি দেখা শেষ হইলে ভাবিলাম, গোয়ালিয়রের প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে, অন্ততঃ একমাস আমায় গোয়ালিয়রে থাকিতে হইবে এবং প্রত্যহ কমপক্ষে দুই ঘণ্টার জন্যও এখানে আসিতে হইবে। গর্দ্দে মহাশয়কে বলিলাম—"ইতিহাসের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য একমাস প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া আমায় এখানে আসিতে হইবে, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?" তিনি বলিলেন—"দশটার পর হইতে আপনার অবসর মত যে কোন সময়ে আসিতে পারেন, আমি সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করিব।" মিঃ গর্দ্দেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন ছয়টা বাজে। পরদিন হইতে প্রত্যহ সব কায ফেলিয়া, তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত "সোসাইটি"তে গিয়া নিজের কার্য্য করিতাম।

পরদিন আমরা গোয়ালিয়রের নূতন রাজধানী লস্কর সহর দেখিতে চলিলাম। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে যখন দৌলতরাও সিন্ধিয়া আসাই যুদ্ধক্ষেত্রে সসৈন্যে অগ্রসর হন, সেই সময় অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় পথ অত্যন্ত দুর্গম হয়, কাযেই সিন্ধিয়া-বাহিনী আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া গোয়ালিয়র দুর্গের দক্ষিণ দিকের সমতল ভূমিতে অবস্থান করিতে থাকে। ক্রমে ইহারা মাটির ঘর করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। কিছুদিনের মধ্যেই ইহা ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। এই গ্রামই এখন অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ সৌধমালায় পরিপূর্ণ, ইহা গোয়ালিয়রের নূতন রাজধানী।—লস্কর লইয়া মহারাজ যুদ্ধে যাইতে যাইতে, এই স্থানে থাকিয়া যান বলিয়াই, ইহা "লস্কর" নামে অভিহিত হইয়াছে।

সরফা বাজারের ভিতর দিয়া, আমরা পুরাতন রাজভবন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গোয়ালিয়রের মধ্যে সরফা বাজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাজার। রাস্তাটি খুব চওড়া, পথের দুই পার্শ্বে ধনী ব্যক্তিগণের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দণ্ডায়মান। ফার্গুসন সাহেব এই বাজারের বিশেষ প্রসংশা করিয়াছেন। * প্রায় পনর মিনিট পরে আমরা জিয়াজী চকে পৌছিলাম। একটি উদ্যানের মধ্যে উচ্চ মর্ম্মর-বেদীতে মৃত মহারাজ জিয়াজীরাও সিন্ধিয়ার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। এই উদ্যানের পূর্ব্বে গোয়ালিয়র টাউন হল। এই অত্যুচ্চ সৌধ সমস্তটা প্রস্তর নির্ম্মিত। ভিতরে প্রকাণ্ড হল, ইহা দর্শকদিগের বসিবার জন্য; উপরেও দর্শকগণের বসিবার স্থান আছে; সর্ব্বোপরি মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। প্রয়োজন হইলে ইহা রঙ্গালয় রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঠিক ইহার সম্মুখে, উদ্যানের পশ্চিমে জেনারেল পোষ্ট অফিস, ইহার এক অংশে গোয়ালিয়র মিউনিসিপাল আফিস, উপরের তলায় চেম্বার অব্ কমার্স। ইহা বৃহৎ না হইলেও, প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর ভবন। পোষ্ট

* The Sarafa, or merchants' quarter, is one of the finest Streets in India.—Fergusson.

অফিসের উত্তর দিকে হাইকোর্ট, ইহাও প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত ভবন, এখানে চীফ জষ্টিস একজন মহারাষ্ট্রী। পোষ্ট অফিসের দক্ষিণে পুরাতন প্রাসাদ; ইহার পার্শ্বেই ভিক্টোরিয়া কলেজ, এ দুইটিও প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সৌধ। ভিক্টোরিয়া কলেজের বহির্ভাগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল মার্কেট,ইহা অনেকটা কলিকাতা হগ্ সাহেবের মার্কেটের অনুকরণে নির্ম্মিত। ইহাও প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং দেখিতে সুন্দর। ইহার কিছুদূরে "অলিজাহ দরবার" প্রেস, ইহাও দেখিবার উপযুক্ত প্রকাণ্ড সৌধ। এখান হইতে দৌলতগঞ্জের ভিতর দিয়া আমরা "হুজরত পায়সা"য় উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে মহারাজ সিন্ধিয়ার খাস আস্তাবল, বৃহৎ প্রান্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। ইহার ঠিক সম্মুখে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি বৃহৎ হল, মহরমের সময় এই হলে মহারাজের তাজিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান হইতে আমরা "কম্প্"তে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে রাজমাতার বাসের জন্য প্রকাণ্ড ভবন আছে; গোয়ালিয়র মহারাজের কিছু সৈন্যও সর্ব্বদা এইস্থানে উপস্থিত থাকে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা

"মেঘনাদবধ" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় কবিবর হেমচন্দ্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তিনি যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে প্রবন্ধ-কলেবর পুষ্ট করিতেছেন তাহাতে তিনি বঙ্গবাসিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে জীবন-চরিত বড় বেশী লিখিত হয় নাই। এমন কি আমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কর্ম্মবীরের চরিতপুস্তক রচিত হইতে এখনও বাকী আছে। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা এই অভাব দূরীকরণকল্পে লেখনী ধারণ করেন তাঁহারা যে দেশের ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন তাহাতে সন্দেহ কি ?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল জীবনচরিত লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ স্থলবিশেষে এমন শোচনীয় ভ্রান্তিতে পতিত হন যে, তাহাতে তাঁহাদের গ্রন্থের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। প্রায়ই গ্রন্থবর্ণিত মনীষীর প্রতি লেখকের অন্ধ পক্ষপাতিতাই ইহার কারণ, এবং যখন তৎসহ তাঁহার বিচার শক্তির অভাব সম্মিলিত হয়, তখন অনেক অন্যায় ও অসত্য, লেখকের অজ্ঞাতসারে ন্যায় ও সত্যের মুখোস পরিয়া গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। ফলে ব্যাপারটা রীতিমত গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। তখন সমালোচকের কর্ত্তব্য লেখকের ভুল-ভ্রান্তি দেখাইয়া দেওয়া। এই কর্ত্তব্যানুরোধেই কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের "দ্বিজেন্দ্রলালের" এক অপ্রিয় সমালোচনা আমাকে লিখিতে হইয়াছিল। আজ কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'হেমচন্দ্র' এর অন্তর্ভুক্ত বৃত্রসংহার ও মেঘনাদবধের তুলনা-মূলক সমালোচনা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহাই বলিতে অগ্রসর হইতেছি।

কোন বিশিষ্ট কবি বা তাঁহার রচনা সম্বন্ধে লেখক-বিশেষের যাহা আন্তরিক ধারণা তাহা তিনি নিশ্চয়ই স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু সেই ধারণার সমর্থন জন্য যদি তিনি অপরের প্রতি অবিচার করেন, এবং এমন সব কথা বলেন যাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, তাহা হইলে পাঠক বা সমালোচক কেহই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না। 'হেমচন্দ্রে'র লেখক বৃত্রসংহার কাব্যকে, মেঘনাদবধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিপন্ন করিতে গিয়া মাইকেল মধুসূদনের প্রতি অবিচার করিয়াছেন কি না তাহার আলোচনা করিতে এখন আমি প্রবৃত্ত হইব না। স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের একটি কলমের খোঁচায় নবীন সেনকে তাঁহার উচ্চাসন হইতে নামিয়া পড়িতে হইয়াছে, এমন কি

তিনি 'হেমচন্দ্রে'র সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয় নহেন, লেখকের এই অপূর্ব্ব মন্তব্য যুক্তিহীন কি না তাহার বিচার করিবারও এখন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার মতের সমর্থক রূপে খাড়া করিয়া তাঁহার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছেন, সেই কথা বলিতেই এই ক্ষুদ্র আলোচনার অবতারণা করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ যখন ষোড়শবর্ষ বয়স্ক অপরিণত-বুদ্ধি বালক মাত্র, তখন তিনি মেঘনাদবধের একটা অতিতীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। উত্তরকালে যে তাঁহার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এই কটূক্তিপূর্ণ সমালোচনাটার জন্য যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে পাই। নিম্নে আমরা এতৎসংক্রান্ত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিতেছেন—

'আমার বয়স তখন ঠিক ষোল। কিন্তু আমি 'ভারতী'র সম্পাদক-চক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্ব্বেই আমি অল্প বয়সের স্পর্দ্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমি এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।"—জীবন-স্মৃতি, ১০৭ পৃষ্ঠা।

নিজের লেখার উপর এরূপ সুতীব্র কশাঘাত এক। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু ইহা হইতেই বোঝা যায়, নিজের দোষ স্বীকার তিনি কিরূপ একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। তিনি নিজে পরে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে তাঁহার বালকোচিত চাপল্য-প্রণোদিত সেই দাম্ভিক সমালোচনাটা সমালোচনাই হয় নাই, তাহা নিছক 'গালিগালাজ' মাত্র; এবং 'এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত' কেবল অর্ব্বাচীনেই করিয়া থাকে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও তাঁহার সেই বাল্যরচনাটাকে একেবারে বরখাস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোথাও তিনি ইহা পুনর্মুদ্রিত করেন নাই (কেবল হিতবাদী একবার ইহাকে উপহার গ্রন্থাবলী ভুক্ত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিল), তথাপি মন্মথবাবু তাঁহার হেমচন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের এই পরিত্যক্ত সমালোচনাটা প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বলাইতেছেন যে, মেঘনাদবধ একটি 'নামে মাত্র মহাকাব্য।' শুধু তাহাই নহে—তাঁহার এই উক্তিগুলি বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া সকলের দৃষ্টি সেদিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

লেখক যদি বলেন যে তিনি 'জীবন-স্মৃতি' পড়েন নাই, তাহা হইলেও তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। কারণ জীবন-চরিত রচনা রূপ দুরূহ কার্য্যে যিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ যে শুধু নিতান্ত অশোভন তাহা নহে, রীতিমত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। আর সেই অজ্ঞতার ফলে যদি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় জগন্মান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে অন্যায় ও অপ্রকৃত কথা প্রচার লাভ করে, তাহা হইলে সে অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইয়া পড়ে। আমাদের আশা আছে যে লেখক তাঁহার 'হেমচন্দ্র' পুস্তকাকারে মুদ্রণকালে আমাদের এই কথাগুলি মনে রাখিবেন এবং এই অধ্যায়টির অনেক অংশ পরিবর্জ্জিত ও সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

চির-অপরাধী

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নায়েবের কাছারী।

পরদিন যথা সময়ে দ্বারিক বাজারে গেল। আজ আর তোলার কোন উৎপাত হইল না; কিন্তু যে লোকটা নায়েবের তোলা সংগ্রহ করে সে দ্বারিককে দেখিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল। দ্বারিকের একটু রাগ হইল বটে, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

ঘণ্টা দেড়েক পরে নায়েবের একজন পাইক আসিয়া "দ্বারিক ঘোষ কে আছে দ্বারিক ঘোষ কে

আছে” বলিয়া ডাকিতে লাগিল। দ্বারিক তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—“আমার নাম দ্বারিক ঘোষ। কেন?”

পাইক তাহাকে দেখিয়া ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলিল—“নায়েব মহাশয় তোমায় ডাকিয়েছে।”

নায়েবের আহ্বানের উদ্দেশ্য দ্বারিক বুঝিল। বলিল—“আচ্ছা, বেচাকেনা শেষ হোক তারপর যাব।”

এরূপস্থলে পাইকেরা সচরাচর প্রথমে তখনি আসিবার জন্য পীড়াপিড়ি করিয়া, পরে কিছু দক্ষিণা পাইয়া সদয় হৃদয়ে খানিকটা সময় দিয়া যায়। কিন্তু দ্বারিকের বলিষ্ঠ দেহ ও নির্ভীক ভাব দেখিয়া তাহার করণীয় কার্য্য দুইটার একটিও করিতে সে সাহস করিল না। সুধু যাইবার সময় বলিয়া গেল দ্বারিক যেন ভুলিয়া না যায়।

কাছারীতে পাইয়া নায়েব হয়ত অপমান করিয়া বসিবে, ইহা ভাবিয়া দ্বারিক যাইবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু সকলে পরামর্শ দিল—কুমীরের সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না, অতএব যাওয়াই কর্ত্তব্য।

দ্বারিক কিন্তু বাজার হইতে বরাবর কাছারী গেল না। ভাবিল, কি জানি আমার ক্ষুধার সময় রাগ হইয়া পড়িলে, নায়েবের তো রাগ আছেই, শেষটা একটা কাণ্ড হইয়া যাইবে।

এই ভাবিয়া, বিক্রয়ান্তে দ্বারিক বাড়ী ফিরিল। স্থির করিল, আহারাদি করিয়া সময়ান্তে কাছারী আসিবে।

নায়েবের আহ্বান শুনিয়া দ্রৌপদী অত্যন্ত ভীত হইল। বলিল—“কেন তুমি নায়েবের লোককে চটালে বল দেখি? এখন কি হবে?”

দ্বারিক স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়া বলিল—“এতে আর কি হবে! নায়েব না হয় বড় জোর বলবে আমার বাজারে এসনা—এই ত! তা, বলে বলবে।”

দ্রৌপদীর দুর্ভাবনা কিন্তু তাহাতে গেল না। সে বিশেষ করিয়াই জানিত, তাহার স্বামী অপমান সহিতে একেবারে অশক্ত। নায়েব কড়া কথা বলিলে তাহার স্বামীও যদি উত্তর করে, শেষটা একটা ‘কুরুক্ষেত্তর’ হইয়া পড়িবে।

তাই অপরাহ্ণের দিকে দ্বারিক যখন তাহার মাঝারি গোছের পাকা বাঁশের লাঠি গাছটা লইয়া কাছারী যাইতে উদ্যত হইল, দ্রৌপদী বারবার করিয়া তাহার মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিল, যেন সে কিছুতেই কাছারীতে কোন গোলমাল না করে; নায়েব মন্দ বলিলেও যেন সে সব সহ্য করিয়া চলিয়া আসে।

দ্বারিক যখন কাছারী আসিয়া পৌছিল, নায়েব মহাশয় তখন দিবানিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া সবেমাত্র কাছারী গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন।

কাছারী বাড়ীটি নাতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা বিশেষ, বহির্বাটী কাছারী রূপে ব্যবহৃত হয়। একটা বড় হলে কাছারী বসে। পাশে দুইটা মাঝারি ঘর, তাহাতে পাইকেরা থাকে। বারান্দায় আসিয়া প্রজারা অপেক্ষা করে। কাছারী গৃহের পার্শ্বভাগে নায়েবের অন্তঃপুর। খুব উচ্চপ্রাচীর দিয়া কাছারীবাটী ও অন্তঃপুর বিভক্ত। বিশেষ চেষ্টা করিলেও ভূচর লোকের দৃষ্টি অন্তঃপুরে পাতিত করা সুকঠিন।

নায়েব মহাশয়ের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে। দেহটা নাতি উচ্চ নাতিক্ষীণ—মধ্যম প্রকারের। কিন্তু উহারি মধ্যে নিম্নোদরে বেশ একটু মাংস লাগিয়াছে, বোধ হয় সেটুকু নিশ্চিন্ত সুখভোগের ফল। এ বয়সেও তাঁহার বেশের একটু পারিপাট্যই আছে। গৌরীশঙ্করের আমদানী ভাল ফিতাপাড় বিলাতী সূক্ষ্ম ধুতী সর্ব্বদা পরিধান করেন। পাঞ্জাবীটা প্রায়ই ‘গিলা’ করা করা থাকে। জুতাযোড়া ডসনের বাড়ী হইতে প্রতিবৎসর আনয়ন করেন। গলদেশে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত একছড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা তাঁহার ভদবদ্ভক্তির পরিচয়ে প্রদান করে। মস্তকের সম্মুখভাগটা প্রায় কেশশূন্য হইয়া আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়গাছি আছে, তাহাদিগকে তিনি দিনে তিনবার এবং রাত্রে একবার এরূপ যত্নে আঁচড়ান, যাহাতে সে কয়গাছিও প্রিয়জন বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া

তাহাদিগকে অনুগমন করিতে উদ্যত হইয়াছে। নায়েব-গৃহিণী এক এক সময়ে বলেন—"ওগো থাম, আর আঁচড়ো না, মথার চামড়া যে ছিঁড়ে গেল।" ইহাতে তিনি ভ্রুকুটী করেন বটে, কিন্তু আঁচড়াইতে ক্ষান্ত হন না। নায়েব মহাশয়ের সৌভাগ্যক্রমে মাথার চুল অল্প হইলেও একটীও পাকে নাই; কিন্তু গোঁফযোড়াটী চুলের চেয়ে অনেক অল্প বয়স্ক হইলেও, তাহাতে পাক ধরিয়াছিল। তিনিও অধ্যবসায়ের সহিত নাপিতের সাহায্যে এক একটি করিয়া পাকা গোঁফগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন; ফলে গোঁফযোড়াটী কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। গোঁফ কামাইতে পূর্ব্বে অনিচ্ছা থাকিলেও ইদানীং উহা কামাইয়া ফেলা স্থির করিয়াছেন। দাড়িটীর ক্ষৌরকার্য্য প্রত্যহই অতিযত্নে সংঘটিত হয়। শুনা যায় পাঠশালার বিদ্যা সমাপনান্তেই তিনি নগদ পাঁচটাকা বেতনে দেশের রায় মহাশয়দিগের জমিদারী সেরেস্তায় প্রবেশ করেন। ক্রমে কার্য্য কুশলতা দেখাইয়া সেইখানেই বেতন ২০৲ টাকা করিয়া লন। দুইচারিটি মনিব বদলাইয়া, অবশেষে তিনি সিংহ মহাশয়দিগের বিস্তীর্ণ জমিদারীতে প্রবেশলাভ করিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত প্রজাদমনে, প্রজার উচ্ছেদ সাধনে, জটিল মোকদ্দমা করিতে ইনি সিদ্ধহস্ত বলিয়া এখানে সাদরে স্থান পাইয়াছেন। কার্য্যতঃ ইনিই এ পরগণার জমিদার বা ম্যানেজার, নামে মাত্র নায়েব। নায়েব মহাশয়ের নাম নরহরি দাস; জাতিতে কৈবর্ত্ত।

পাইক আসিয়া সংবাদ দিল—"হুজুর, দ্বারিক ঘোষ হাজির হয়েছে।"

দ্বারিক পাইকের সঙ্গে সঙ্গে নায়েবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে নায়েব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমিই দ্বারিক ঘোষ?"

দ্বারিক যথারীতি প্রণাম করিয়া উত্তর দিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।"

নায়েব খুব গম্ভীর ভাবে শিরশ্চালনা করিয়া বলিলেন—"তুমি বেটা কোন সাহসে আমার চাকরকে অপমান কর?"

দ্বারিক কঠোর বাক্য শুনিবার জন্য প্রায় এক প্রকার প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। তাই গালি শুনিয়াও নম্রভাবে উত্তর দিল—"আমার কোন দোষ নাই হুজুর। ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে যে কলার দরদাম হয়ে গিয়েছে, তাঁকে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় আপনার চাকর গিয়ে বল্লে—ঐ কলাই আমি চাই। দেবতা বামুনকে বেচে—"

সহসা উত্তেজিত হইয়া নায়েব বলিয়া উঠিলেন—"থাম্ বেটা থাম্; তোদের সয়তানি বুদ্ধি কিছু আমার অজানা নেই। এখন যদি কাণ ধরে তোকে আমার চাকর জুতোপেটা করে, তোর কোন বামুন বাবা তোকে রাখে বল দিকি?"

মুহূর্ত্তে দ্বারিকের সমস্ত শিরা উপশিরার রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া মস্তিষ্কের পানে ছুটিয়া গেল। নায়েবের মাথা লক্ষ্য করিবার জন্য সে চকিতে লাঠিগাছটা মুঠার ভিতর শক্ত করিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল দ্রৌপদীর কাতর মুখখানি—আর একটু আগের অনেক করিয়া বলা মিনতিভরা কথাগুলি—"নায়েবকে বিশ্বেস নেই, হয়ত কত গালাগাল করবে—আমার মাথার দিব্যি তুমি সব বরদাস্ত করে চলে আস্‌বে।" —হায়, এমনি করিয়া কত দরিদ্র বঙ্গবাসী যে অখ্যাতি কিনিয়া লয় তাহার সংবাদ কে রাখে!

দ্বারিকের শক্ত করিয়া ধরা লাঠিগাছটা হাতেই রহিল। কিন্তু যে শক্তি অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া প্রকাশিত হইতে চাহিতেছিল, জিহ্বার অগ্র দিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে কহিল—"গালাগাল দেবেন না নায়েব মোশাই! নিজের মান নিজের কাছে মনে রাখবেন।"

"তবে রে পাজী! কে আছিস, শালাকে ধরে লাগা তো পঁচিশ জুতো"—ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে নায়েব চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন জন পাইক ছুটিয়া আসিল। তখন আর দ্বারিকের

মোটে ধৈর্য্য রহিল না। "তোমার তো মোটে পাঁচ ছয় জন পাইক নায়েব মোশাই, এক হাতে আমি বিশটা লোকের মওড়া নিতে পারি।"—বলিয়া লাঠি তুলিয়া দ্বারিক বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

পাইক তিনজন খানিক দূর পিছাইয়া গেল। দ্বারিক ঘোষের শারীরিক বলের পরিমাণ তাহারা কয়জন বিলক্ষণই জানিত। জানিত না কেবল একটী নূতন হিন্দুস্থানী পাইক—যে দ্বারিককে ডাকিতে বাজারে গিয়াছিল। সে তখন কার্য্যান্তরে ছিল। নায়েব মহাশয়ও সন্ত্রস্ত হইয়া চকিতে তক্তপোষ হইতে নামিয়া দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইলেন। দুটা সামান্য গালি খাইয়া যে একজন গরীব প্রজা অতখানি করিতে পারে, তাঁহার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে নায়েব মহাশয় এ শিক্ষা কখন লাভ করেন নাই।

দ্বারিক তখন সেখানে আর না দাঁড়াইয়া, বিনা বাধায় কাছারী বাড়ী ধীরে ধীরে ত্যাগ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চাষার প্রেম।

দুধের পাত্রসমেত বাঁকটা নামাইয়া দ্বারিক হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"বৌ, বোঝাটা বাইরে দেতো—আজ বড্ড বেলা হয়ে গিয়েছে।"

দ্রৌপদী কটিদেশে অঞ্চল জড়াইয়া দুই হাতে তরকারীর বাজরাটা ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া দাওয়ায় নামাইল এবং স্বামীর ঘর্ম্মাক্ত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া বলিল—"ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছ যে, একটু জিরিয়ে যাবে না?"

"এখন জিরুতে গেলে কি আর বাজার পাব? শীগ্‌গির মাথায় তুলে দে।"—বলিয়া দ্বারিক ব্যস্তভাবে গামছাখানা মাথায় বিড়া করিয়া বাজরাটার একদিক ধরিল। দ্রৌপদী তখন বাজরার অপরদিক ধরিয়া স্বামীর মাথায় তুলিয়া দিল। মাথায় লইয়া দ্বারিক তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

দ্রৌপদী সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিল।

কার্য্যের মধ্যেও রহিয়া রহিয়া স্বামীর মুখমণ্ডল তাহার মনে হইতে লাগিল। বৎসরখানেকের মধ্যে তাহার সেই 'লোহার শরীর'—যৌবনের সেই অটুট স্বাস্থ্য, কি করিয়াই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

সেই যে কাছারীতে নায়েবের সহিত দ্বারিকের ঘোর বচসা হইয়াছিল, তাহার ফলে নায়েব প্রথমে দ্বারিকের নামে ফৌজদারী করাই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, তাহা হইলে অন্ততঃ একটা পাইককেও খানিকটা জখম করিতে হয়; পুলিশ ও ডাক্তারকে হাত করিতে গেলে বিলক্ষণ অর্থব্যয়ও আছে। তাহার উপর, মাত্র একটা লোক কাছারীর ভিতর আসিয়া মারধর করিয়া পলাইল, ইহাও হাকিম বিশ্বাস করিবেন কি না সন্দেহ।

শেষে নায়েব স্থির করিলেন, উহাকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে হইবে। কাযেই ফৌজদারী ছাড়িয়া দেওয়ানী ধরিলেন। পাঁচছয় মাসের মধ্যে একে একে দ্বারিকের বিঘা ৩০।৪০ ধানের ভাল জমী, দুই তিনটা বাগান, বাকী খাজনার দায়ে বিকাইয়া গেল।

কোথা দিয়া যে কি হইল দ্বারিক তাহা বুঝিতেও পারিল না। কবে নালিশ রুজু হইল তাহাও দ্বারিক জানে নাই, সমনও পায় নাই। একেবারে সংবাদ পাইল, যখন নীলামে চড়িয়াছে। সমন গোপন করিয়া ডিক্রি একতরফা করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া আপত্তি দিয়া দ্বারিক পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দ্বারিকের তিন চারিজন প্রতিবেশী রীতিমত হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিল, তাহাদের সমক্ষে দ্বারিককে সমন ধরান হইয়াছিল।

বাকী কিছু জমী জমা বেচিয়া দ্বারিক আপিল করিল, সেখানেও নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রহিল।

অপমানে, দুঃখে ও ক্ষোভে দ্বারিকের সেই দৃঢ়

শরীর ও সুন্দর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পরিশ্রমও তাহাকে খুব বেশী করিতে হয়। সেই কাছারী বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে তাহাকে সিংহদের বাজারে যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। তাহার বাড়ী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূর ঠাকুরতলার বাজারে প্রত্যহ যাইতে হয়। সকাল বেলাও দুধ যোগান দিতে ক্রোশ দুই হাঁটিতে হয়।

দ্বারিকের শরীর ও মনের অবস্থা বুঝিয়া দ্রৌপদীর চোখ ফাটিয়া জল আসে। কিন্তু সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল যখন পীড়িত হয়, তখন তাহার ভগবানকে ডাকা ছাড়া তো উপায়ান্তর থাকে না। যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয়, দরিদ্র তাহা হইলে যায় কোথায়! প্রতি সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া গলবস্ত্র হইয়া দ্রৌপদী প্রার্থনা করে—"হে হরি, হে মধুসূদন, মুখ তুলে চাও, আবার ওর আগেকার মত শরীর করে দাও।"

বেলা তিনটার সময় দ্বারিক ঠাকুরতলা হইতে বাড়ী ফিরিল। গৃহকার্য্য সমাপনান্তে দ্রৌপদী অভুক্ত অবস্থায় উদ্বিগ্নচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া ছিল। স্বামী আসিবামাত্র দ্রৌপদী অমনি তাহার মাথার বোঝাটা লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল এবং ঘর হইতে পাখাখানা আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল—"আজ যে একেবারে বড্ড বেলা গিয়েছে।"

দ্বারিক নিতান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—"যে পথ, আর পেরে উঠিনে!" স্বামীর এই নিরাশভাব দেখিয়া দ্রৌপদীর বুক আরও দমিয়া গেল। তৈলের বাটীটা স্বামীর কাছে রাখিয়া, তাহাকে শীঘ্র স্নান করিবার জন্য অনুকরিতে করিয়া দ্রৌপদী ম্লান মুখে রান্নাঘরের দিকে

দ্বারিক যথা:

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।শাপ্ত করিয়া দ্বারিক যখন দাওয়ায়

নায়েব খুব গম্ভালে পিঠ দিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক

বলিলেন—"তুমি বেটা আসিয়া বলিল—"দেখ, খেটে

অপমান কর?" ীর একেবারে যে রোগা হয়ে

গেল। কাল থেকে আমি দুধটা যোগান দিতে যাব, তোমার'তবু একটু মেহনৎ কম্‌বে।"

হুকাসুদ্ধ কলিকাটা সরোষে ছুড়িয়া ফেলিয়া দ্বারিক বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল ও সক্রোধে বলিয়া উঠিল—"দেখ্, বৌ, তোর বড্ড আস্পদ্দা হয়েছে। আমার মুখের সাম্‌নে তুই বলিস্ তুই পাড়ায় পাড়ায় দুধ দিয়ে বেড়াবি? কেন, আমি কি মরিছি? আমার কি ছেরাদ্দ করিছিস? আর যদি কোনদিন এমন কথা তোর মুখে শুনি, তাহলে আমি খুনোখুনি কর্‌ব, একথা বলে রাখ্‌লাম।"

কথা ক'টা শেষ করিয়া, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারিকের ক্রোধ শান্ত হইয়া গেল। সে পুনরায় সেখানে বসিয়া, হুঁকার অবশিষ্ট জলটুকু দিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কলিকার আগুনগুলা নিবাইয়া, হুঁকা ও কলিকা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। স্ত্রীর প্রতি এই কঠোর ভর্ৎসনা কি করিয়া লঘু করিয়া লইবে, বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। হুঁকাটি যে আকস্মিক ক্রোধের ফলে একটু ফাটিয়া গিয়াছে সেটুকু তাহার লক্ষ্যই হইল না।

মলিনাঞ্চলে উদ্গত অশ্রু মুছিতে মুছিতে দ্রৌপদী নামিয়া আসিল। এই প্রচণ্ড ক্রোধের ও কর্কশ কণ্ঠের অন্তরালে যে কতখানি গভীর স্নেহ লুকান ছিল, তাহা কৃষককজায়া হইলেও বুঝিতে দ্রৌপদীর বাকী ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বজ্রাঘাত।

সেদিন দ্বারিক যখন খুব রাগ করিয়াই বলিয়াছিল—"আমি বেঁচে থাক্‌তে তুই দুধ দিয়ে বেড়াবি একথা ফের যদি বল্‌বি তাহলে খুনোখুনি করব," সেদিন তাহার ভাগ্যবিধাতা বোধ করি সে কথা শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই দ্বারিক একদিন ঠাকুরতলা

হইতে আসিয়া, হাত পা ধুইয়া কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িল। দ্রৌপদী খোঁজ লইতে আসিলে দ্বারিক বলিল—"আজ আর কিছু খাব না, সমস্ত শরীর কিসে যেন চিবিয়ে খাচ্চে।" দ্রৌপদী পায়ে হাত দিয়া দেখিল গা একটু গরমও হইয়াছে; জিজ্ঞাসা করিল, "একেবারে উপোস্ করবে? চাট্টি মুড়ি এনে দিইনা কেন?" দ্বারিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"না, খিদে নেই, কিচ্ছ্ খাবনা। তুই শিগ্‌গির কায সেরে আমার গা হাত পা একটু টিপে দে।"

স্বামীর যে একটা কিছু অসুখ হইবে এই কথাই তাহার কয়দিন হইতে কেবলি মনে হইতেছিল। চিন্তিত মনে সে শীঘ্র শীঘ্র কায সারিয়া লইতে গেল।

তাহার পরদিন দ্রৌপদী স্বামীর নিষেধ সত্বেও পাড়ার একটা ছেলেকে দিয়া কবিরাজ ডাকাইল। তিনি আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন এবং গায়ের ব্যথার জন্য খুব করিয়া বালির পুটুলির সেক করিতে বলিয়া গেলেন।

দুই তিন দিনের মধ্যে কিছুই উপশম হইল না। চতুর্থ দিনের সকালে দ্বারিক বিছানা হইতে উঠিতে গিয়া, পায়ে বিন্দুমাত্র জোর পাইল না এবং সশব্দে বিছানার উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

দ্রৌপদী তখন বাহিরে 'বাসিপাট' সারিতেছিল। পড়িয়া যাওয়ার শব্দ শুনিয়া সেই হাতেই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল।

দ্রৌপদীকে দেখিয়াই দ্বারিক কাঁদিয়া বলিল—"ওরে আমার পা একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছে—আর আমি হাঁটতে পারব না।"

দ্রৌপদী স্বামীকে বিছানায় ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিল—"কি কথা, ও কথা বলতে আছে? দুর্ব্বল শরীর, তাই উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছ।"

"না রে, পায়ে আমার কিচ্ছ্ জোর নেই"—বলিয়া পা তুলিয়া দেখাইতে গিয়া দ্বারিক দেখিল যে, তাহার আর পা তুলিবারও ক্ষমতা নাই।

স্বামীর অসার পা দুইটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে এবার দ্রৌপদীও কাঁদিয়া ফেলিল।

কবিরাজ আসিয়া, সব লক্ষণ মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—এ পক্ষাঘাত। এখন অনেক দিন ভাল করিয়া চিকিৎসা করাইতে হইবে।—রোগের নাম শুনিয়া স্বামী স্ত্রী প্রমাদ গণিল। যাহাকে খাটিয়া খাইতে হয়, তাহার পক্ষাঘাত হইয়াছে শুনিলে শুধু পা দু'টা বা দেহটা নয়, হৃদয়টাও অবশ হইয়া যায়।

জমীজমা অর্দ্ধেক গিয়াছিল বাকী-খাজনার দায়ে, বাকী অর্দ্ধেকটুকু রোগের চিকিৎসায় গেল। সম্বল রহিল বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমী এবং গরু কয়টি। ছয়মাস চিকিৎসার পর বিশেষ কোন ফল না হওয়ায় চিকিৎসাও বন্ধ করিতে হইল। হাঁটিবার কথা দূরে থাক্, দ্বারিকের আর দাঁড়াইবারও ক্ষমতা হইল না। কোন ক্রমে একটু যাইয়া বসিতে পারিত এই পর্য্যন্ত।

জমী জমা বিক্রয়ের টাকা ক্রমে যখন ফুরাইয়া আসিল, একটু একটু করিয়া সংসার চালাইবার ভার পড়িল দ্রৌপদীর উপর। যেদিন প্রথম দ্রৌপদী দুধ যোগান দিয়া, অনভ্যস্ত কার্য্য-জনিত লজ্জা অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিল, দূর হইতে তাহা দেখিয়া একটা ব্যর্থ রোষে ও ক্ষোভে দ্বারিকের সমস্ত দেহ ও মন গলিত ধাতুগর্ভ ভূমিখণ্ডের মত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

দুগ্ধের পাত্রাদি রাখিয়া দ্রৌপদী যখন সেই ঘরে প্রবেশ করিল—দ্বারিকের চক্ষু দিয়া তখন টপ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র দ্বারিক বালকের মত আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"তোকে শেষটা সেই দুধ যোগানই দিতে হ'ল।"

প্রথমটা দ্রৌপদীর চোখের পাতাও ভিজিয়া আসিল। সে তাহা গোপন করিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল—"তুমি যে একেবারে ছেলেমানুষ হলে গো। গয়লার মেয়ে, গয়লার বউ—দুধ দিতে গিয়েছি তাতে দোষটা কি?"

তার পর ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেটা সহিয়া গেল। দ্রৌপদীকেই সব দিক চালাইতে হইল। গরুর সেবা,

দুধের যোগান, গৃহসংলগ্ন জমীটুকুতে তরীতরকারী উৎপন্ন ও তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা—এই সবই দ্রৌপদীকে করিতে হইল।

সকাল হইলেই স্বামীর প্রাতঃকৃত্য সমাধা করাইয়া দ্রৌপদী তাহাকে দাওয়ায় একটা পাটী পাতিয়া বসাইয়া দিত। সেই বিকল পা দুখানার পানে চাহিয়া সেই খানে বসিয়া বসিয়া দ্বারিক আকাশ পাতাল ভাবিত। সেই সবল কার্য্যক্ষম ও ক্ষিপ্রগতি পা দুখানা কি করিয়া এমন ক্ষীণ দুর্ব্বল ও পঙ্গু হইয়া গেল—দ্বারিক তাহা ভাবিয়াই পাইত না। হাত দুখানা, বুকটা দেখিতে তো প্রায় তেমনি আছে; কিন্তু দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সৌধের মত তাহা যে নিতান্তই ভঙ্গুর হইয়া গিয়াছে। তাহার সেই গতজীবনের নির্ভীকতা-পূর্ণ কার্য্যাবলী একে একে মনে পড়িত, আর দীর্ঘ পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত তাহার সেই পরিপূর্ণ বলিষ্ঠ প্রাণটা আজিকার এই অকর্ম্মণ্য হেয় দেহটাকে ভাঙ্গিয়া বাহির করিতে চাহিত। যে আত্মহত্যাটাকে বরাবর সে মরদের কায নয় বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে; তাহারি উপর সময়ে সময়ে লোভ হইত। দ্রৌপদীর কথা ভাবিয়া—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া—তাহার মনের ভাবনা মনেই রহিয়া যাইত।

দুঃখ, শরীরেরই হোক মনেরই হোক, এমনি করিয়াই সহিয়া যায়। আজিকার এই সুস্থ সবল পরিপুষ্ট দেহের কোন অংশ হঠাৎ একদিন ক্ষীণ কুৎসিৎ ও পঙ্গু হইয়া যাইবে এ কল্পনাও অসহ্য; এবং সেইরূপ হইলে যে, জীবনের ভার আমরা কিছুতেই বহিব না—একথা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লই। কিন্তু সত্যই যখন সেই দুঃখ আমাদের জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়ায়, কয়জন তখন তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করে? সেই ক্ষীণ পঙ্গু রোগীটা একদিন চাহিয়া দেখে, এই জীবনটাও তো তাহার বেশ সহিয়া গিয়াছে! ক্রমশঃ এমন দিনও আসে, যেদিন তাহার অতীত জীবনের গৌরব পূর্ণ ঘটনা-গুলি উপন্যাসের ঘটনার মত স্মরণ করিয়া আনিতে হয়।

ইহাদের এই দুঃসময়ে দ্রৌপদীর পিতা মাঝে মাঝে সংবাদ লইত। কিন্তু শেষ বয়সে তাহাদের একটি পুত্র হওয়ায়, তাহার দিকেই বেশী মনোযোগ দিতে হইত, কন্যা জামাতার সংবাদ সর্ব্বদা লইতে পারিত না। দ্রৌপদীকে তাহার পিতা বলিয়া গিয়াছে—অভাব অনটন হইলে সে যেন তাহাকে সংবাদ দেয়। দ্রৌপদী, স্বামীর মন বুঝিয়া আপনার পিতাকেও কোন সাহায্যের কথা বলে নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু *

বঙ্গভাষার, বঙ্গদেশের আর একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র-পতন হইল। দেবেন্দ্রবিজয় বসু স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে, আত্মীয়-স্বজনকে, বন্ধুবান্ধবকে, শোক সাগরে ভাসাইয়া সেই অক্ষয় অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হইল তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার আশা নাই। যেমনটি যায় তেমনটি আর হয় না। বঙ্গদেশে আজ অনেকে কৃতবিদ্য হইতেছেন, অনেক ধী-শক্তিসম্পন্ন লোক দেখিতেছি,—বঙ্গদেশের বাণীপুত্র

* বিগত ২১ শে কার্ত্তিক বর্দ্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য শাখা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

একনিষ্ঠ বাণী-সেবক অম্বর্গনাথা স্যর আশুতোষ সরস্বতীর উদ্যমে ও যত্নে বঙ্গদেশে, বঙ্গভাষায়, বঙ্গবিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নূতন প্রাণ, নূতন সজীবতা আনীত হইতেছে,—যাহার বৈদ্যুতিক প্রবাহ জগৎময় অনুভূত হইবে এবং বঙ্গভাষাকে বঙ্গদেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে,—বঙ্গদেশের অন্যান্য মনীষি-মহাত্মাগণের উদ্যমে,যত্নে এবং সেই সর্ব্ব বুদ্ধি ও উদ্যমের প্রণোদক সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকর্ম্মফল-দাতা জগদীশ্বরের কৃপায় আজ বঙ্গদেশে,—শুধু বঙ্গদেশ কেন,—সমগ্র ভারতবর্ষে একটা নূতন উন্মেষণা, নূতন উন্মাদনা আসিয়াছে ও আসিতেছে বটে,—কিন্তু আর কি আমরা আমাদের মধ্যে নূতন ও পুরাতনের সংযোজক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়কারী, দার্শনিক অথচ সুরসিক, ন্যায়নিষ্ঠ অথচ সুকোমল, জ্ঞানী অথচ নিরহঙ্কার, ত্যাগী অথচ শ্লাঘাশূন্য, শিশুর ন্যায় সরল, রমণীর ন্যায় কোমল-হৃদয়, বীরের ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ধীরের ন্যায় সংযতাত্মা, নিষ্কামী দেবেন্দ্রবিজয়কে পাইব ?

দেবেন্দ্রবিজয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য এই সভা আহূত হইয়াছে। তাঁহার জন্য শোক করিবার কিছুই নাই; তিনি ত সারাজীবন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিয়া, ভগবৎপাদপদ্মে কর্ম্মফল নিবেদন করিয়া, অমরধামে সেই পরম পিতার আশ্রয়ে, বিমল শান্তিলাভ করিতেছেন। শোক তাঁহার জন্য নহে;—শোক তাঁহার পরলোক গমনে,—আমাদেরই জন্য।

দেবেন্দ্রবিজয় বর্দ্ধমানের সহিত কিছু বিশেষ ভাবেই সংসৃষ্ট ও জড়িত ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনীর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ছিলেন সেই সম্মিলনীর প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী, দেবেন্দ্রবিজয় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সে সম্মিলনীর যশোগৌরব দেশ-বিদেশে বিস্তৃত। দেবেন্দ্রবিজয় বর্দ্ধমানের শাখাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় বর্দ্ধমানে অনেককাল থাকিয়া বর্দ্ধমান-বাসীদিগের মধ্যে একজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই দেবেন্দ্রবিজয়ের অভাবে বর্দ্ধমানবাসীর এত শোক, এত শূন্যতা-বোধ, এত ক্রন্দন।

দেবেন্দ্রবিজয়ের পিতামহ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রবিজয় ধনীর সন্তান ছিলেন না। তাঁহার পিতা শ্যামাচরণ বসু কুলীন কায়স্থ দরিদ্র গৃহস্থ ছিলেন মাত্র। দরিদ্র গৃহস্থ ঘরে যেমন হয়, দেবেন্দ্রবিজয়কে সময়ে সময়ে বাল্যকালে অর্থকষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল এবং অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বীয় চরিত্র-বলে সে সকল কষ্ট উপেক্ষা করিয়া, সকল অসুবিধা সত্ত্বেও, বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, নিজের উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। "Slow rises worth by poverty depressed,"—"ধীরে উচ্চে উঠে গুণিজন, অতিক্রমি দৈন্য নিষ্পীড়ন।"

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী জিরেট বলাগড়ের নিকট "বাক্‌সাগর" নামে পল্লীগ্রামে দেবেন্দ্রবিজয়ের পৈত্রিক বাস। তাঁহার পিতা শ্যামাচরণ বসু মহাশয় সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। সন ১২৬৪ সালের ২৮শে ফাল্গুন (ইংরাজী ১৮৫৮ ১০ই মার্চ) দেবেন্দ্রবিজয়ের জন্ম হয়। ষোল বৎসর কয়েক মাস বয়সে তিনি বলাগড় উচ্চবিদ্যালয় হইতে পনের টাকা বৃত্তিলাভ করিয়া সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আঠার বৎসর বয়সে কলিকাতা মেট্রপলিটন কলেজ হইতে কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়া এফ-এ এবং ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি পাইয়া সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি বিজ্ঞানে সম্মানের সহিত এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কয়েক বৎসর তিনি ৺স্যর, রমেশচন্দ্র মিত্রের পুত্রদ্বয়ের (এক্ষণে স্যার বি সি মিত্র ও মিঃ পি সি মিত্র) গৃহশিক্ষক ছিলেন। তৎপরে তিনি যথাক্রমে কিছু কালের জন্য বলাগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের, মেট্রপলিটনের, ট্রেনিং একাডেমির ও হিন্দুস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিন মাসের জন্য তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন।

কিছুদিনের জন্য তিনি "বঙ্গবাসী"র সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং মেট্রপলিটন কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপকও কিছু দিনের জন্য হইয়াছিলেন। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি আলিপুরে ওকালতী কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ১৮৮৯ সালের ১২ ই মার্চ্চ তারিখে মুন্সেফ হন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি,—তিনি কিছু কালের জন্য শ্বেত কার্পাস বস্ত্রের উপর ছিট প্রস্তুত, রং প্রস্তুত, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত সম্বন্ধে একটি লিমিটেড কোম্পানিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় সবজজের কার্য্যের প্রথম গ্রেডে উন্নীত হইয়া মাসিক এক হাজার টাকা বেতন পাইতে থাকা অবস্থায়, ১৯১৬।১৪ই মার্চ্চ তারিখে পেন্সন লইয়া সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অবসর-গ্রহণ কালে বর্দ্ধমানবাসিগণ বৰ্দ্ধমানের সুযোগ্য মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটা বিরাট বিদায় সভা আহ্বান করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে বিদায়-মাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পরে তিন বৎসরের কিছু উপর পেন্সন ভোগ করিয়া, দেবেন্দ্রবিজয় গত ২৫ শে অক্টোবর রাত্রে এই নশ্বর কলেবর ত্যাগ করিয়া সেই অমর ধামে গমন করিয়াছেন।

সেই স্বনামখ্যাত, পরিহাস-রসিক, সমাজ-সংস্কারক, করুণ হৃদয়, নীলদর্পণ লীলাবতী নবীন-তপস্বিনী সধবার একাদশী প্রভৃতি অমর গ্রন্থাবলী প্রণেতা মহাত্মা দীনবন্ধু মিত্রের নাম কে না জানে, কে না শুনিয়াছে? সেই দীনবন্ধুর একমাত্র সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী তমালিনী দাসীর সহিত দেবেন্দ্রবিজয়ের শুভক্ষণে শুভবিবাহ হইয়াছিল। সুরসিক দীনবন্ধুর প্রাণাধিকা দুহিতার সহিত দার্শনিক প্রবর দেবেন্দ্রের শুভমিলন হইল। এই উভয়ের দাম্পত্য-জীবন কি সুন্দর, কি পবিত্র, কি স্নিগ্ধ, কি রমণীয়! "হেরিলে হরে প্রাণ মন"। যেমন দেবেন্দ্রবিজয়, তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী তমালিনী। সেই পরদুঃখে সদা বিগলিত-হৃদয়া, সেই জননীরূপে সদা বিরাজমানা, সেই সরলা, সুভদ্রা, নিরহঙ্কারা, অমায়িকা, সদা প্রফুল্লমনা দেবেন্দ্রাণীকে যে দেখিয়াছে, সেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে নাই। সত্যই তিনি দেবেন্দ্রাণী ছিলেন! হায়, আজ তাঁহার দশা কি হইল! হায় বিধাতা, কি হেতু তেমন রমণীকুল-রত্নকে শেষে এই নিদারুণ শোক দিলে? দেবেন্দ্রের সহধর্ম্মিণী প্রকৃতই সহধর্ম্মিণী ছিলেন,—স্বামীর সকল কার্য্যে তিনি সহায় ছিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় সুপিতা ছিলেন। পুত্রগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিতে বিরত থাকিতেন না। তাঁহার নিজের জীবনই যে পুত্রদের নিকট পরম শিক্ষার বস্তু ছিল। এমন পিতা লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

দেবেন্দ্রবিজয় ও তাঁহার পত্নী, দাস দাসী পরিজন-বর্গের প্রতি অতিশয় স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রবধূরা শ্বশুর গৃহ হইতে পিত্রালয়ে যাইতে চাহিত না,—এতই তাঁহাদের যত্ন, ভালবাসা!

দেবেন্দ্রবিজয় সদালাপী 'সামাজিক' লোক ছিলেন। এমন নিরহঙ্কারের সহিত তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন ও কথাবার্ত্তা কহিতেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হইত। একবার যাহারা দেবেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহারা দেবেন্দ্রকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার বাড়ী প্রায় সদাসর্ব্বদা লোকজনে পরিপূর্ণ থাকিত।

দেবেন্দ্রবিজয় নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ও সঙ্গীত শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার বর্দ্ধমান বাসাবাটীতে অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের সমাবেশ হইত। অনেক সময়ে আমিও তথায় যাইয়া সঙ্গীত শুনিয়াছি। ঈশ্বরভক্তি বা ভগবৎপ্রেম-মূলক সঙ্গীত শ্রবণ করিবার সময়ে দেবেন্দ্রবিজয়ের বাহ্যজ্ঞান প্রায় তিরোহিত হইত। এরূপ অবস্থায় আমি কয়েকবার তাঁহাকে দেখিয়াছি।

দেবেন্দ্রবিজয় সুপরিচিত ছিলেন। দেশের গণ্য

মান্য ব্যক্তিগণ, দেশের সুধিবৃন্দ প্রায় সকলেই দেবেন্দ্রবিজয়কে জানিতেন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

দেবেন্দ্রবিজয় খুব বেশী বুদ্ধিমান, সদ্বিবেচক বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার বিচারশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তবে তাঁহার অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব হইতে তাঁহার চক্ষুরোগ হওয়ায় দৃষ্টিশক্তির লোপ ঘটায় এবং সেই সময়ে তিনি গীতার ব্যাখ্যা প্রণয়ণে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সকল সময়ে ঠিক সমানভাবে বিচার করিতে পারিতেন না বটে। বিচার কালে তাঁহার নির্ভীকতা কর্ত্তব্যপরায়ণতা চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। দামোদরের চরভূমি সংক্রান্ত মোকর্দ্দমায় তাঁহার রায় পাঠ করিলে, তাঁহার গভীর ব্যবহার শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রবিজয় নীরব দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। অভাবগ্রস্ত লোক দেখিলে স্বতঃই তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইত। এ বিষয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার উপযুক্ত সহায় ছিলেন। এইরূপ তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন,—শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। "আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব" তাঁহার আতিথেয়তা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। যে কেহ তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন তিনিই একথা জানেন। তাহার আর বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই—কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট যে, প্রতি বৎসর ৺পূজার অবকাশে তাঁহার কাশীস্থ বাটী এই অতিথি সৎকারের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইত।

দেবেন্দ্রবিজয় একজন উচ্চদরের দার্শনিক ছিলেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যদর্শন তিনি উত্তম করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ২৬,২৭ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্ত ভাবে সংস্কৃতদর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপনিষদ অধ্যয়নে ব্যাপৃতছিলেন। তাহার ফলে তিনি বঙ্গভাষাকে সম্পত্তিশালী করিয়া গিয়াছেন। দর্শন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বঙ্গদর্শন, নবজীবন, ভারতী নব্যভারত, প্রচার, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য নানা সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে "পঞ্চভূত" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি "সমাজ ও তাহার আদর্শ" নামক পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে তিনি নানাবিধ দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজ কাহাকে বলে, সমাজ যুক্তিমূলক না ধর্ম্মমূলক, সমাজের সহিত মানুষের সম্বন্ধ, পিতৃমাতৃ সহায়ে মানবের বিকাশ, সমাজ-সহায়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ, সমষ্টি ও ব্যষ্টি মানব সমাজ, সমষ্টি মানব-সমাজ ভগবানের বিরাট শরীর—সেই ভগবানই সমাজক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—তিনিই সমাজ-আত্মা,—এই সকল কঠিন ও জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি দেখাইয়াছেন যে সমাজ-শক্তি মাতৃ-রূপা প্রকৃতি, সর্ব্বজীব রক্ষা ও পালন কর্ম্মে সেই মহা মাতৃশক্তির বিকাশ, সর্ব্বজীবে এই মাতৃত্বের বিকাশ, সকল জীবই এই মহাপ্রকৃতির মাতৃশক্তিবশে বাধ্য হইয়া পরার্থ-কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত, এই পরার্থ কর্ম্মে ত্যাগধর্ম্মের গ্রহণ এবং এই পরার্থ কর্ম্মে ক্ষতি ও দুঃখ বোধ হয়। এই পুস্তকে তিনি দুঃখ যে অমঙ্গল নহে, দুঃখের প্রয়োজনীয়তা কি, কেমন করিয়া সুখ-দুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ হয়, কেমন করিয়া হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হয়, এবং কেমন করিয়া সেই হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণ বিকাশে মুক্তি হয় —এই সব তত্ত্ব সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন।

সর্ব্বশেষে ১৯০৯ সালে তিনি তাঁহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা প্রণয়ণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এই গীতা ব্যাখ্যার নাম,—আমরা পাঁচ. জনে জোর করিয়া "বিজয়াব্যাখ্যা" রাখাইয়াছিলাম;—"এ বিজয়া ব্যাখ্যার" ষষ্ঠখণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। অষ্টম খণ্ডে উহা সম্পূর্ণ হইবার কথা। সপ্তমখণ্ডও প্রায় লেখা শেষ হইয়াছিল, কেবল শেষ দুই অধ্যায় বাকী আছে, এমন সময়ে বঙ্গের দুর্ভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রবিজয় ধরাধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর দিন প্রাতে তিনি তাঁহার

সেজ ছেলে টোনাকে ডাকিয়া বলেন, "আয় টোনা মায়াবাদটা শেষ করিয়া দিই।" দেবেন্দ্রবিজয়ের চক্ষু নষ্ট হওয়া অবধি তাঁহার পুত্র "টোনাই" তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রধান সহায় ছিল। দেবেন্দ্রবিজয় বলিয়া যাইতেন, টোনা লিখিয়া যাইত। তাই দেবেন্দ্রবিজয় টোনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আয় টোনা মায়াবাদটা শেষ করিয়া দিই।" ডাক্তারেরা নিষেধ করায় টোনা আর সেদিন লিখিতে বসিল না। তাই আজ বাঙ্গালাভাষায় মায়াবাদ লেখা শেষ হইল না। কিন্তু দেবেন্দ্রবিজয় তাহার অনেক পূর্ব্বে জীবনের মায়াবাদ শেষ করিয়া ছিলেন এবং সেইরাত্রে মায়াবাদের সব শেষ করিয়া সকল মায়া কাটাইয়া, সেই মায়ার অতীত স্থানে মহামায়ার ক্রোড়ে যাইবার জন্য মহাযাত্রা করিলেন।

এই গীতার ব্যাখ্যায় দেবেন্দ্রবিজয় স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শঙ্করভাষ্য, রামানুজ ভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর টীকা, আনন্দগিরির টীকা প্রভৃতি নানা টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলন করিয়া গীতোক্ত প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্বের উপযুক্ত আলোচনা করিয়াছেন। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা বিভিন্ন মত অবলম্বনে বা বিভিন্ন সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা প্রচলিত আছে তৎসমুদায়ের প্রকৃত সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ গীতা-ব্যাখ্যার ভূমিকাটি অতি সুন্দর এবং সুগভীর চিন্তাশীলতার ও ভগবদ্‌ভক্তির পরিচায়ক। এমন যে সুবৃহৎ ব্যাখ্যা প্রণয়ণ করিলেন, তাহার ভূমিকায় তৎসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন একবার দেখা যাউক। দেবেন্দ্রবিজয় বলিতেছেন, "যিনি সর্ব্বহৃদিস্থিত, সর্ব্ববুদ্ধির প্রবোধক, সকলের নিয়ন্তা, তাঁহারই প্রেরণায় এই গীতাব্যাখ্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছি।… তিনি যাহাকে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, সে অজ্ঞাতে সেই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। এ ব্যাখ্যা তাঁহারই প্রেরণায় অবশ্য লিখিত হইয়াছে।……এ ব্যাখ্যার গুণ দোষ যাহাই হউক, তাহার ফল শ্রীভগবানেই অর্পিত হইয়াছে, বলিয়াছি।"

এই ধর্ম্মজ্ঞান, এই তত্ত্বজ্ঞান, এই নিষ্কাম ব্রতাবলম্বন—ইহাই দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রধান ও প্রথম গুণ। সংসারে থাকিয়া যদি নিষ্কাম নির্লিপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন সেই দেবেন্দ্রবিজয়। ভগবানে এরূপ নির্ভর করিতে, এরূপ সুখ দুঃখ, গুণ অগুণ, পাপ পুণ্য সকলই সেই শ্রীভগবানে অর্পণ করা যদি মানবসাধ্য হয়, তবে দেবেন্দ্রবিজয় সে বিষয় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যদি সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন হইলে, যদি রাগ ভয় ক্রোধ জয় করিতে পারিলে "মুনি" আখ্যালাভ করা যায়, তাহা হইলে সে "মুনি" ছিলেন দেবেন্দ্রবিজয়। অতিশয় সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিয়াছি, আবার প্রিয়তম পুত্রবিয়োগের অব্যবহিত পরেই, প্রিয়তমা কন্যার অকাল বৈধব্যের অব্যবহিত পরেই, দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিয়াছি, রোগজীর্ণ শীর্ণ অঙ্গ রোগশয্যায়ও দেবেন্দ্রবিজকে দেখিয়াছি—সেই এক দেবেন্দ্রবিজয়—সদা প্রফুল্ল, ভগবদ্‌-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ-হৃদয়, সদালাপ-পরায়ণ, সৎশিক্ষাদাতা,—সুখের সময়ে যেরূপ দেখিয়াছি অতিশয় কষ্টেও সেইরূপ দেখিয়াছি। যতদিন তাঁহার সহিত পরিচয়, কখনও তাঁহাকে ক্রোধ করিতে দেখি নাই, বা শুনি নাই। কোনও বিষয়ে কখনও আসক্তি দেখি নাই। জীবনের শেষে তিন চারি মাস—মানুষে যাহাকে কষ্টের চরম সীমা বলে—সেই সীমায় পৌছিয়াও—রোগের অসহ্য যন্ত্রণা, শুইবার ক্ষমতা নাই পৃষ্ঠে ক্ষত, দিবা রাত্রির মধ্যে চক্ষে নিদ্রা নাই, নিদারুণ আত্মীয়-বিয়োগ, জরাজীর্ণ কলেবর, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট—তথাপি সেই সংযতাত্মা প্রসন্নবদন সদালাপ-পরিপূর্ণ ভগবদ্‌ভক্তি-পরায়ণ সেই একই দেবেন্দ্রবিজয়—কোনও পার্থক্য নাই।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

দিব্যজ্ঞান

(গল্প)

ঝড় উঠিয়াছে। বৃক্ষশির ভাঙ্গিয়া, দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর উড়াইয়া, জীব জন্তু কীট পতঙ্গ মথিত করিয়া প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি, সঘন শব্দায়মান বজ্রধ্বনি, লোকালয় বন জঙ্গল পাহাড় উপত্যকা শুদ্ধ করিয়া, নিশীথ ঘনান্ধকার আলোকিত করিয়া দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। বজ্রাঘাতে দূরে ও নিকটের বৃক্ষাবলী জ্বলিয়া উঠিতেছে, জীব জন্তু প্রাণ হারাইতেছে, ঘরে ঘরে মনুষ্যগণ হাহাকার করিতেছে।

ঠিক্ এই সময়, এই দুর্যোগময়ী গভীর রজনীতে এক মুসলমান ফকীর প্রাণের দায়ে, আশ্রয় পাইবার আশায় পর্ব্বত বন জঙ্গল ভেদ করিয়া, কণ্টকে পদস্খলনে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন। তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত, মক্কাতীর্থ-প্রত্যাগত ঝঞ্ঝা পীড়িত শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত মুসলমান ফকীরের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত, গায়ের আঙরাখা ছিন্নভিন্ন, চরণ চলচ্ছক্তিহীন,—তথাপি প্রাণের দায় বড় দায়! তাই ফকীর ব্যাকুল হইয়া, পবিত্র আল্লার নাম লইয়া, এই ভীষণ মহাপ্রলয়ে জীবনরক্ষা মানসে সামান্য একটু স্থান অনুসন্ধান করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে গভীর জঙ্গল ও পর্ব্বতশ্রেণী। এখানে আশ্রয় লাভ অসম্ভব ফকীর তাহা জানেন, তথাপি আত্মপ্রাণ-রক্ষায় ব্যাকুল হইয়া, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া ছুটিতেছেন। চতুর্দ্দিকে গভীর অন্ধকার, অনন্ত আকাশে উন্মত্ত বজ্রাঘাতধ্বনি, পদতলে বিপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য-শিলাময় কণ্টকাকীর্ণ কঙ্কর পথ, পার্শ্বে পার্ব্বত্য বৃক্ষ শ্রেণী, আর হিংস্র জন্তুর ভয়প্রদ ভীষণ গর্জ্জন। তাই ফকীর জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়াছেন। একটু আশ্রয়, একটু স্থান লাভের জন্য তিনি আজ বড়ই ব্যাকুল।

সহসা বিদ্যুতালোকে পলকের জন্য ফকীর দেখিলেন, নিকটে অমল ধবল বর্ণের কি একটা বৃহৎ বস্তু। পরমুহূর্ত্তেই আবার গভীর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছাদিত হইল। ফকীর ব্যাকুল হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আবার বিদ্যুৎ চমকিল, পলকের জন্য বিশ্ব জগৎ আলোকিত হইল। ফকীর সেই আলোকে ক্ষণিক দৃষ্টে দেখিলেন, সম্মুখে হিন্দুর দেবতা-স্থান—একটি শুভ্রবর্ণ দেব মন্দির।

কিন্তু আশ্রয় চাই। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—যে কোন ধর্ম্মের দেবতা-স্থান হউক না কেন, আজ মুসলমান ফকীরের আশ্রয় চাই, প্রাণরক্ষা চাই!!

ফকীর প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইলেন। হিন্দুর দেবতা-স্থানে মুসলমান—প্রবেশ করিতে একটু ভীত একটু চিন্তিত হইলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আবার বিশ্ব-দগ্ধকারী বজ্রাঘাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া বজ্র পার্ব্বত্যদেশে এক ভয়াবহ প্রতিধ্বনি তুলিয়া ভীম গর্জ্জনে নৈশ অন্ধকারে ছুটিয়া চলিল। ফকীর স্থানা-স্থান, বৈধাবৈধ বিস্মৃত হইয়া, প্রাণের ব্যাকুলতায়, পবিত্র ঈশ্বরের নাম লইয়া সেই মন্দির-দ্বারে করাঘাত করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত ছিল, করাঘাতে খুলিয়া গেল। ফকীর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিলেন না—বা সে শক্তিও তখন তাঁহার ছিল না। অপরিণামদর্শী বিকারগ্রস্ত তৃষিত রোগীর জলপানের ন্যায়, তড়িদ্বেগে মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চাহিলেন। দীপালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—তাঁহার অনাহার ক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কটা ঘুরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একরূপ অস্ফুটধ্বনি করিয়া তাঁহার শক্তিহীন চেতনাহীন দেহ সশব্দে ভূপতিত হইল।

(২)

একটা প্রবল ধাক্কা খাইয়া মূর্চ্ছিত ফকীরের মোহ-

সুপ্তিটা যখন ভঙ্গ হইল, তখন তিনি ক্লান্ত ব্যাকুল দৃষ্টিতে একবার আঘাতকারীর প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, পূর্ব্বে জটাজাল-লম্বিত শ্মশ্রুগুল্ফ শোভিত অলক্ত-চন্দন প্রলেপিত যে হিন্দু সাধককে মহাকালীর সম্মুখে ধ্যান নিমগ্ন দেখিয়া, পথশ্রান্তি ও ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই সাধক এক্ষণে সজোরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত করিয়া বলিতেছেন—"অপবিত্র ম্লেচ্ছ! তুই হিন্দুর এই পবিত্র দেবতাস্থানে প্রবেশ করিলি কেন? শক্তিময়ী কালীমাতার দিকে পদপ্রসারণ করিয়া শয়ন করিলি কেন শয়তান?"

সেই বিশালদেহ শক্তিশালী সন্ন্যাসীর সজোর পদাঘাতে পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত দুর্ব্বল ফকীরের সর্ব্বাঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া পিষিয়া যাইতেছিল। ভীত স্তম্ভিত ব্যথিত ফকীর অতিকষ্টে উঠিয়া বসিলেন। ইচ্ছা, রাত্রের সঙ্কট অবস্থা বুঝাইয়া, কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু হিন্দু সাধক সেই মুহূর্ত্তে আবার সজোরে পদাঘাত করিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন—"অপবিত্র ম্লেচ্ছ! বল্ তোর এ স্পর্দ্ধা কেন হইল?"

তিন দিন উপবাস, তাহাতে প্রকৃতি-বিপ্লবে-ব্যথিত নিষ্পেষিত শক্তিহীন অবশদেহ ফকীর, সাধকের নির্ম্মম পদাঘাতে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার আশ্রিত, আমায় রক্ষা কর।"

ফকীরের এই কথা শুনিয়াও সন্ন্যাসীর ক্রোধ শান্তি হইল না। গভীর গর্জ্জনে মন্দির কাঁপাইয়া বলিলেন, "এখনও বল্, পবিত্র হিন্দু পীঠস্থান অপবিত্র করিলি কেন?"

উৎপীড়িত নির্জ্জিত ফকীর অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া সাধককে বলিলেন, "ঠাকুর আপনি হিন্দু, আমি আপনার আশ্রিত। প্রাণের দায়ে এই মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। দেবতার পবিত্রতা ধ্বংস হইবার নহে। যে দেবতার অক্ষয় দেবত্ব, হীন-মানব স্পর্শে কলুষিত হয়, সে দেবতা দেবতাই নয়।"

কম্পিত দেহে আরক্তনেত্রে ক্রোধান্ধ হিন্দু সাধক ফকীরের এই কথা শুনিলেন। দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া বলিলেন—"বেল্লিক মুসলমান! দোষ স্খালনের জন্য উপদেশের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বল্, হিন্দু-দেবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কি ক্ষতিপূরণ করিবি? নচেৎ আজ তোকে জাহান্নমে পাঠাইব।"

ফকীর বলিলেন, "আমি দীন হীন ফকীর, আমার তো কিছুই নাই ঠাকুর! হে হিন্দু সাধু, আমায় ক্ষমা কর। আমি পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, বড় বিপন্ন অবস্থায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া এই কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি। আমার সংস্পর্শে দেবতার কোন অনিষ্ট হয় নাই।"

হিন্দু সন্ন্যাসী, ফকীরের মর্ম্মের কথা হৃদয়ের ব্যথা বুঝিলেন না। বিশেষতঃ, বহু শিষ্য-ভক্ত-বিগলিত অজস্র অর্থে, তাঁহার নির্জ্জন সাধনার জন্য এই দেবমন্দির ও কালী বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, সেই শক্তিসাধকের জাগ্রতী ঐশী শক্তি আজ নিস্তেজ ভাবিয়াই সন্ন্যাসীর সমস্ত তেজটা ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া ফকীরের নির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর। ফকীরের কোন মিনতি কোন উপদেশ তাঁহার কাছে স্থান পাইল না, ফকীরে উপযুক্ত শাস্তির প্রতি এখন তাঁহার দৃষ্টি। সাধক উপযুক্ত প্রতিশোধ বাসনায় কক্ষ হইতে এক বিশাল যষ্টি লইয়া গভীর গর্জ্জনে বলিলেন, "পাপী ম্লেচ্ছ, তুই এমন কথা বলিস্—পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই!"

ফকীরের চক্ষু স্থির। বুঝিলেন, তাঁহার ইহধাম পরিত্যাগ করিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মর্ম্মে মর্ম্মে আর একবার প্রাণ খুলিয়া আল্লাকে ডাকিলেন। তারপর হতবুদ্ধি হইয়া কাতর দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সাধক ক্রোধে এতদূর অন্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রহার মাত্রা কত অধিক চড়াইলে ফকীরের দোষের উপযুক্ত প্রতিফল হইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। তাই তিনি ফকীরের দেহে আবার পদাঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া ফকীর মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

ফকীরের এই চরম দুর্গতিতে বুঝি হিন্দু সাধকের স্থাপিতা শোণিতাক্ত-খর্পরধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী কালী-মূর্ত্তিও কাঁপিয়া উঠিলেন।

সাধক আজ ক্রোধের বশে কতখানি নির্মম্মতা পৈশাচিকতার আশ্রয় লইয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বিজাতীয় ক্রোধ তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। ফকীরের দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুরাশি ধারণ করিয়া উন্মত্ত ভাবে টানিতে টানিতে বাহিরে আনিয়া বলিলেন—"আমার সর্ব্বনাশ করিলি? ম্লেচ্ছ! তোর কালপূর্ণ, ভগবানের নাম গ্রহণ কর।"

কঠিন নির্য্যাতনে ফকীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই নিদারুণ আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছুটিয়া চলিল। বৃক্ষে পক্ষিকুল চীৎকার করিয়া উঠিল। বড় ভীষণ অত্যাচার! ফকীরের সর্ব্বাঙ্গ ছেঁচিয়া কাটিয়া শোণিত স্রোত বহিতে লাগিল। পরিশেষে "আল্লা রক্ষা কর" বলিতে বলিতে তিনি হতচেতন হইয়া পড়িলেন।

(৩)

মস্তকে কাষ্ঠের বোঝা লইয়া, মলিন ছিন্ন বসন যথা-সংক্রস্ত করিতে করিতে, লোলচর্ম্মা পলিত-কেশা এক অশিক্ষিতা বন্য এই নৃশংস ঘটনা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অতি সন্তর্পণে নিজ মস্তক হইতে কাঠের বোঝা নামাইয়া সেই বৃদ্ধা সাধকের পাশে আসিয়া বলিল—"এ কাপালিক ঠাকুর! মানুসটা যে মরিয়ে গেল! তোহার জানে কি দয়া মায়া না আছেক্?—এত পূজা করলি, মাকে ডাকলি, তবু কি তুহার জ্ঞান না আইল? দে দে দে ফকীরকে ছাড়িয়ে দে। উহার কোন্ দোষ আছেক যে মারিয়ে ফেলবি?"

এই কাপালিক বন্য কাঠুরিয়াগণকে একটু ভাল-বাসিতেন। একটা না একটা উপকার সতত তাহাদের দ্বারা লাভ করিতেন। এই অপরিচিতা বৃদ্ধা কাঠুরিয়া রমণীর কথায় যদিচ তাঁহার ক্রোধ উপশমিত হইল না, কিন্তু তাহাকে একেবারে তাচ্ছীল্য দেখাইতেও পারিলেন না। বলিলেন—"মুসলমান ফকীর কালীর পবিত্রতা নষ্ট করেছে।"

বৃদ্ধা বিস্মিতভাবে বলিল—"কেমন করে রে?"

কাপালিক। কালীমন্দিরে ঢুকে, কালীমার দিকে পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল।

বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া হে হে হে করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার উচ্চ হাস্যধ্বনি দিক্ হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। তাহা শুনিয়া নিষ্ঠুর কাপালিক চকিতের জন্য চমকিত হইয়া, ফকীরকে ভুলিয়া বৃদ্ধার প্রতি চাহিলেন।

বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলিল—"হে রে পাগল! কিসে তুহার কালীমার ইজ্জৎ গেল রে? ফকীর মন্দিরে ঢুকে কালীমার পানে পা করেছে বলে? হে রে পাগল! দেখ্, হামি হামার পাদুটো তুহার কালীমার পানে রাখিয়ে বসি, লে তুই হামার পা দুটো যেদিকে তুহার কালীমা না আছে, সেই দিকে ফিরিয়ে দে।"

এই কথা বলিয়া কাঠুরিয়া রমণী সত্যসত্যই তাহার ধূলিধূসরিত পা দুখানি কালীবিগ্রহের দিকে ছড়াইয়া বসিল। তার পর দন্তহীন মুখে উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল—"লে লে, যেদিকে তুহার কালীমা না আছেক, সেই দিকে পাদুটো সরিয়ে দে।"

স্তম্ভিত বিস্মিত কাপালিক, কাঠুরিয়া রমণীর এই উপহাসে ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া গেলেন। ঘোর মেঘান্ধকারে বিদ্যুতালোকের ন্যায় খানিকটা সত্যজ্ঞান তাঁহার সাধারণ সঙ্কীর্ণ সংস্কারকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আজ চল্লিশ বৎসর কালী পূজায় ব্যয়িত করিয়াও তাঁহার যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ ঘটিয়া উঠে নাই, আজ ঘৃণ্য অশিক্ষিতা কাঠুরিয়া রমণীর সামান্য উপহাস্য কথায় তাহা পূর্ণ হইয়া গেল। কাপালিকের চক্ষের সম্মুখ হইতে একখানি ঘনকৃষ্ণ অজ্ঞান যবনিকা যেন উন্মোচিত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ দিয়া একটি কথাও সরিল না। শুধু স্তম্ভিত নেত্রে বিহ্বল

ভাবে কাঠুরিয়া রমণীর ধুলিধূসরিত পা দুখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধা হাসিয়া আবার বলিল—"আরে রে পাগলা! তুহার কালীমাই কি তুহার কেনা আছে, যে তুহি যে দিকে রাখিবি সেই দিকে, থাকিবে? মাই যে দুনিয়া জোড়া আছে রে। এই দুনিয়ার লোক যে কালীমাই কি ছেলিয়া রে। যেদিকে চাহিবি, কালীমাই আছেক। ছেলিয়া যেখন মাইকি কোলে ঘুমিয়ে থাকে, তেখন কি মাইকি গায়ে পা নাহি ঠেকেরে? মার কি তাতে ইজ্জৎ নষ্ট হয় রে? লে লে সাধু—ফকীরকে কোলে তুলিয়ে লে, উহাকে সন্তোষ কর, নহিলে তুহার সারা ধরম ঝুঁটা হবে। একটি কথা মনে রাখিস, এই দুনিয়া কালী মাইকি ছেলিয়া, তুহার একার মা না আছে।"

কাপালিকের মোহমুগ্ধ নয়ন এখন মোহমুক্ত। অন্ধচক্ষু দিব্য দৃষ্টিতে পূর্ণ। কৃতপাপের গুরুত্ব বুঝিয়া অনুতাপানলে অন্তর জর্জ্জরিত। কাপালিক উন্মত্ত। দুই হস্তে হতচৈতন্য মুসলমান ফকীরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন, জিহ্বায় দিলেন। অতি যত্নে অতি ভক্তিতে ফকীরকে স্কন্ধে লইয়া মন্দির মধ্যে কালীমার পাশে আনয়ন করিলেন। পরে ঘটস্থিত পবিত্র চরণামৃত লইয়া ফকীরকে পান করাইলেন, চোখে মুখে চরণামৃত সিঞ্চন করিলেন।

ক্রমে ফকীরের জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। কাপালিকের ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া, বিস্ময়ে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

কাপালিক অশ্রুপূর্ণনেত্রে চাহিয়া করযোড়ে ফকীরকে কহিলেন—"হে মুসলমান ফকীর! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিয়াছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর—দয়া কর।"

বিস্মিত মুসলমান ফকীর অতি স্নেহে কাপালিককে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের জাতিগত ধর্ম্মগত ব্যবধান দিব্যজ্ঞান প্রভাবে দূরীভূত হইল। পরে কাপালিক বৃদ্ধা কাঠুরিয়া রমণীর সমস্ত বৃত্তান্ত ফকীরের নিকট নিবেদন করিলেন।

ফকীর সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"হে হিন্দু সাধক! আমি শুনিয়াছি, তোমাদের দেবদেবীগণ কখন কখন মনুষ্যমূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীতে দেখা দেন। যে সকল কথা তুমি বলিলে, একজন নির্ব্বোধ কাঠুরিয়া রমণীর মুখে কি তাহা সম্ভব? তোমার দেবীই হয়ত তোমায় জ্ঞানদান করিবার জন্য সেই মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছিলেন।"

অন্ধকারের আরও একখানা যবনিকা যেন কাপালিকের জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। "ঠিক বলিয়াছ ফকীর সাহেব, ঠিক বলিয়াছ!" বলিয়া কাপালিক চীৎকার করিয়া, বৃদ্ধা কাঠুরিয়া রমণীর সন্ধানে বাহিরে আসিলেন—দেখিলেন কেহই নাই। মলিন ধূলিতে কোথাও বৃদ্ধার পদাঙ্ক-চিহ্নও বিদ্যমান নাই। তখন তিনি উন্মাদের মত, জঙ্গলে বাহির হইয়া পড়িলেন। সমস্ত স্থান পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; প্রত্যেক কাঠুরিয়ার বাড়ী বাড়ী গিয়া খুঁজিলেন, সেই বৃদ্ধার কোথাও কোনও সন্ধান পাইলেন না। সে বর্ণনার বৃদ্ধাকে কোনও কাঠুরিয়া কোনওদিন দেখিয়াছে এমন কথাও কেহ বলিল না।

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বনফুল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় কর্তৃক রচিত। কলিকাতা ৫১।২।৬ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাসে মুদ্রিত এবং ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বরেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৭৪ পৃষ্ঠা মূল্য।৵০

এখানি কবিতার বই। ৫০টি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রায় সকল কবিতার ভিতর দিয়াই কবির একটা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের একঘেয়ে সুর, ধারা বহিয়া গিয়াছে। এরূপ কবিতা পাঠে রস পাওয়া দূরে থাক, পাঠকের মনে বিরক্তিই উৎপাদন করে। ছন্দও স্থানে স্থানে খঞ্জতা প্রাপ্ত।

"বনফুল"এর সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু ভাল করিয়া ফোটে নাই বলিয়া গন্ধ বিস্তার করিতে পারে নাই। তবে কবিতা-গুলির ভাব ও ভাষা বেশ নির্দ্দোষ ও পবিত্র। "গোধূলি" ও "ভ্রান্ত পথিক" কবিতা দুটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বহিখানির কাগজ ও ছাপা ভাল।

অশ্রুধারা—কবিতা গ্রন্থ। শ্রীকামিনীকুমার দে প্রণীত। কলিকাতা ৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট চেরিপ্রেস লিমিটেড কোম্পানি হইতে মুদ্রিত এবং কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিং) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪৪ পৃষ্ঠা. মূল্য লেখা নাই।

কোন সতী ও ধর্ম্মপ্রাণা মুসলমান মহিলার অকাল মৃত্যুর উদ্দেশে এই শোকোচ্ছ্বাসময় ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। পাঠকগণ ভূমিকা স্বরূপ এই গ্রন্থে প্রদত্ত "পরিচয়ে" তাহার যথাযথ পরিচয় পাইবেন। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। "অশ্রুধারা" প্রকৃত অশ্রুধারারই মত। ইহার রচনার ভাষা যেমন সহজ তেমনি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। কাগজ ও ছাপাও ভাল।

রেশম শিল্পের উন্নতি কল্পে তুঁতভুক্ রেশম কীট জাতি সম্বন্ধে পরীক্ষার দ্বিতীয় বিবরণ—শ্রীমন্মথনাথ দে কর্ত্তৃক লিখিত। কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত ও পুসা এগ্রিকল্‌চারেল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ৪ পেজি ৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০

গ্রন্থের উদ্দেশ্য গ্রন্থের নামেই প্রকাশ। ইহার প্রস্তাবনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত রেশম শিল্পের ব্যবসায় ও তাহার উন্নতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি খুব বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। যাহারা রেশম শিল্প ব্যবসায়েচ্ছু তাঁহাদের এই উপদেশপূর্ণ পুস্তকখানি বিশেষ উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পুস্তকের প্রয়োজন। গ্রন্থকার পুস্তকের উপসংহারে জানাইয়াছেন—"কোন বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হইলে এবং রেশম সম্বন্ধে কোন খবর জানিতে হইলে ইম্পিরিয়াল্ এণ্টমলজিষ্ট, পুসা, বিহার এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে যতদূর সম্ভব উপদেশ দেওয়া যাইবে" ইত্যাদি। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা মহৎ।

নবস্তোত্রমালা—ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ। কলিকাতা ৩নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট উইকলি নোটস্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত এবং নওগাঁ প্যারীমোহন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীশশিকিশোর চংদার বি, এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৬৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৴০

এই ছোট বহিখানি বালক বালিকাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত। সংগ্রহকার এই পুস্তকে উপনিষদ, গীতা মহাভারত, তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে কতকগুলি সংস্কৃত স্তুতিমালা, নীতিমালা ও স্তোত্র সংক্ষিপ্ত ভাবে সংগ্রহ করিয়া সরল বাঙ্গলা পদ্যে তাহার ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাদিগের জন্য এই শ্রেণীর যে সকল স্তোত্র ও নীতিবাক্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সে সকলের পুনরুক্তি নাই। অধিকাংশই নূতন। বহিখানি বালক বালিকাদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা কল্পে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। সকল স্কুলেই ইহা পঠিত হওয়া উচিত। বহিখানি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। কাগজ ও ছাপা পরিষ্কার।

আনন্দসিক্তা—কবিতা গ্রন্থ। শ্রীহিমাংশুকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ৭০ নং মুক্তারামপুর ষ্ট্রীট বণিক প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক কীর্ত্তিপাশা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৩৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০

একখানি কবিতা পুস্তক। প্রণয়ের মিলন ও বিরহ কাহিনী-পূর্ণ পরিচ্ছেদ-বিহীন একটানা একটি সুদীর্ঘ কবিতায় বহিখানি সমাপ্ত। অধিকাংশই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, দুই একস্থলে মিত্রছন্দ লক্ষিত হয়। বহিখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ইহার বর্ণনা এবং প্রকাশ যেমন আবেগপূর্ণ তেমনই স্বচ্ছন্দগতি। দুই একস্থলে সামান্য এক আধটু ছন্দোভঙ্গ ঘটিলেও পাঠের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনা। রচনায় কবিত্ব আছে, এবং ভাষাতেও মাধুর্য্য আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

চিন্তার চাষ। সেখ ফজলল করিম প্রণীত। কলিকাতা ৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। ও ২ নং সারেং লেন, তালতলা, নূর লাইব্রেরী হইতে মঈন উদ্দীন হোসেন বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ৩২ পেজী, ৫০ পৃষ্ঠা মূল্য ।০।

গ্রন্থখানি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মচিন্তার সমষ্টি। সকল-গুলিই আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত। মাত্র একশতটি চিন্তা এই স্তবকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—সবগুলিতেই গ্রন্থকারের চিন্তা-শীলতার পরিচয় পাই। চিন্তাগুলি পুরাতন হইলেও গ্রন্থকারের লেখার নৈপুণ্য এগুলিকে অপেক্ষাকৃত নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য দান

করিয়াছে। চিন্তাগুলি ভাবে যেমন পবিত্র, আন্তরিক সৌন্দর্য্যেও তেমনি উজ্জ্বল। ভাষাও বেশ সরল এবং সুমিষ্ট। ভালর একটুও ভাল, সেই জন্য ক্ষুদ্র হইলেও বহিখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি উপভোগ করিয়াছি। পুস্তকখানি সকল শ্রেণীর পাঠকেরই আদরণীয় ও পাঠোপযোগী হইয়াছে। উর্ব্বরক্ষেত্রে এ চিন্তার চাষে সোণা ফলিবে, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া উদার মতের পরিচয় দিয়াছেন। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, দামও কম।

ধরা কি শরা (উপন্যাস)। শ্রীরমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কলিকাতা ইউনিয়ন প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং হরিমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ১৩৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যুবকগণ যৌবনসুলভ চপলতায় শিক্ষাকে কুশিক্ষায় পরিণত করিয়া কিরূপে আমাদিগের আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের সৃজন করিতে পারেন, এই গ্রন্থে তাহাই বিষদরূপে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।"—সুতরাং গ্রন্থকার সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত। অধুনা ইংরাজী শিক্ষা ও নগরবাসের ফলে যাঁহারা বাঙ্গলার পল্লীগ্রামগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন, গ্রন্থকার এই উপাখ্যানে তাহাদের প্রতি সুতীব্র উপহাস প্রয়োগ করিয়াছেন। শুধু যুবকগণ নহে, যুবতীরাও—যাঁহারা ধরাকে শরা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—তাঁহাদিগকেও লেখক ছাড়েন নাই। বহিখানির রচনাপ্রণালী ভাব ও ভাষা বেশ চিত্তাকর্ষক। আমরা পড়িয়া সুখী হইলাম। ইহা পাঠ করিলে অনেকের চক্ষু ফুটিবে এরূপ আশা করা যায়।

"কমলাকান্ত।"

সাহিত্য-সমাচার

"ভারতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "মনে মনে" নামক একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশিত হইল, মূল্য ৷৷০

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গল্পপুস্তক "জোনাকির আলো" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল প্রণীত নূতন উপন্যাস "নিয়তির গতি" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৷০

মাইকেল লাইব্রেরী খিদিরপুর:—আগামী ১২ই মাঘ ১৩২৬ বাসন্তী পঞ্চমী দিবসে কবিসম্রাট্ মধুসূদনকে স্মরণার্থ উক্ত পাঠাগারের অনুষ্ঠিত পঞ্চম বার্ষিক "মধু-মিলন" উৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত দুইটী বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখককে দুইটী রৌপ্য-পদক প্রদত্ত হইবে। প্রথম প্রবন্ধ ৮পৃষ্ঠার অনধিক গদ্যে ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ ৪০ ছত্রের অনধিক পদ্যে লিখিতে হইবে এবং আগামী ২৫শে পৌষের মধ্যে উক্ত লাইব্রেরীর সম্পাদকের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধ:— { ১ম গদ্য:—"বঙ্গসাহিত্যে রঙ্গলাল"
২য় পদ্য:—"মধু-স্মৃতি"

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

পৌষ ১৩২৬ সাল

২য় খণ্ড
৫ম সংখ্যা

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও ব্রহ্মবিদ্যা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যোগবিদ্যার উৎপত্তিস্থান, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই যোগ-রহস্য আলোচনার জন্য ধর্ম্মপ্রাণা রুস মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত আমেরিকা-নিবাসী কর্ণেল অল্‌কট্‌কে সঙ্গে লইয়া এদেশে আগমন করেন। ইংলণ্ড হইতে মিষ্টার উইন্‌ব্রিজ নামক জনৈক চিত্রশিল্পী ও. মিসেস্ বেটস্ নাম্নী জনৈকা ভদ্রমহিলা তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি প্রবর্ত্তিত যোগবিদ্যা প্রথমে আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই বিদ্যা আলোচনার জন্য প্রথমে আমেরিকায় থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ণেল অল্‌কট্ এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের ধর্ম্মতত্ত্ব মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া অনেক সময় বহু বিদেশীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় যত্নবান হইতে দেখা গিয়াছে। আলোচনার অভাবে আমাদের দেশের বহু তত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। মধুচক্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য মক্ষিকাগণ নানা জাতীয় পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহে যত্নবান হইয়া থাকে, ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসিগণ সেইরূপ আপন আপন জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য সমগ্র জগতের বিভিন্ন জাতির জ্ঞানাম্বুধি মন্থন করিয়া সার সংগ্রহে যত্নবান হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ভারতবাসীর মধ্যে যে পরিমাণ ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা জগতের বোধ হয় অন্য কোনও স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। বিদেশ হইতে নূতন কোন তথ্য সংগ্রহ করা ত দূরের কথা, ভারতবাসিগণ কর্ম্মদোষে আপনাদিগের বহু অমূল্য রত্ন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। রুস্ মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি যোগ-রহস্য আলোচনা করিতে করিতে যখন বুঝিতে পারিলেন যে যোগবিদ্যার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষে আগমন করিলে বহু নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন, তখন তিনি তাঁহার অনুচরগণসহ

এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বোম্বাইয়ে আগমনের সংবাদ তত্রত্য একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিশিরকুমার সংবাদপত্রে মাদাম ও কর্ণেলের এদেশে আগমনের সংবাদ ও তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শিশিরকুমার তাঁহাদের ভারতবর্ষে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ণেল অল্‌কটকে পত্র লিখিলে, কর্ণেল পত্রোত্তরে জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যা দানের জন্যই এদেশে আগমন করিয়াছেন। শিশিরকুমার কর্ণেল অল্‌কটকে পুনরায় পত্র লিখিলেন, "বিদ্যা অর্থে আপনারা কি বুঝিয়া থাকেন?" উত্তরে কর্ণেল বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন, "আপনি হিন্দু, অথচ বিদ্যা কাহাকে বলে তাহা জানেন না? জগতে কেবল একটি মাত্র শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে; সে বিদ্যার নাম যোগবিদ্যা।"

সাহেব যোগশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, এই কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অল্‌কটের এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য শিশিরকুমারের প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া কর্ণেলকে পত্র লিখিলে কর্ণেল প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তিনি যদি বোম্বাইয়ে আসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সকল কথার আলোচনা হইতে পারে।

শিশিরকুমার বোম্বাই যাইবেন স্থির করিয়া কর্ণেলকে পত্র লিখিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তিনি বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইলেন। কর্ণেল সাহেব তাঁহার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শিশিরকুমার কর্ণেল অল্‌কটকেই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নায়ক বলিয়া জানিতেন, কিন্তু উভয়ে ষ্টেশন হইতে বাড়ী যাইবার সময় কর্ণেল শিশিরকুমারকে বলিলেন, "আমাদের সম্প্রদায়ের কর্ত্রী মাদাম ব্লাভাৎস্কির প্রতি আপনি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন।" শিশিরকুমার মাদামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। শিশিরকুমার বোম্বাইয়ে মাদাম ও কর্ণেলের সহিত একত্রে তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মিষ্টার উইন্‌ব্রিজ ও মিসেস্ বেট্‌সের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন।

বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অল্‌কট আমেরিকার ন্যায় এদেশেও একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটি (ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতি) প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা কাহারও সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই; কেবল জনৈক পার্শী যুবক তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার ও তাঁহার ন্যায় দুই একজন শক্তিশালী পুরুষের যত্নে চেষ্টায় ও সহায়তায় মাদাম ব্লাভাৎস্কি ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, শিশিরকুমার তখন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া তিনি তাঁহার সহোদরগণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই; তিনি ব্যাকুল চিত্তে সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষেত্রে উত্তমরূপ শস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষক যেমন লাঙ্গল সংযোগে মৃত্তিকা কর্ষণ পূর্ব্বক সার দিয়া প্রথমে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে, শিশিরকুমারও সেইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় ধর্ম্মবীজ বপন করিবার পূর্ব্বে প্রেতাত্মবাদ দ্বারা স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানচক্ষুও উন্মীলিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে, এ কথায় শিশিরকুমারের আর সংশয় রহিল না। উদার-হৃদয় কর্ণেল অলকটের বালসুলভ সরলতায় শিশিরকুমার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাদাম

ব্লাভাৎস্কির চরিত্রের বিশেষত্বে তিনিও কখন বিস্মিত, কখনও চমৎকৃত কখনও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। মাদাম ও কর্ণেলের চরিত্রগুণে শিশিরকুমার তাঁহাদের উভয়েরই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বোম্বাইবাসিগণের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতি ও সহায়তা পাইবেন না বুঝিতে পারিয়া কর্ণেল অল্‌কট তাঁহাদের ভারতবর্ষে আগমনের উদ্দেশ্য শিশিরকুমারের নিকট প্রকাশ করেন। শিশিরকুমার ও কর্ণেল অলকটের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম—

কর্ণেল। যোগাভ্যাস দ্বারাই জগতে মহাত্মারা অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যেই অধিক সংখ্যক মহাত্মা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মাদাম ব্লাভাৎস্কি যোগসিদ্ধা রমণী। মহাত্মাদিগের নির্দ্দেশ-ক্রমেই তিনি ভারতবর্ষে যোগবিদ্যা আলোচনা জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছেন।

শিশির। মহাত্মারা তাঁহাদের শক্তি প্রভাবে এমন কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব ?

ক। নিশ্চয়ই পারেন। তাঁহারা তাঁহাদের শরীর পরিত্যাগ করিয়া, কিংবা সশরীরেও, ইচ্ছামত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। ইচ্ছামত তাঁহারা লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইতেও পারেন।

শি। স্বচক্ষে না দেখিলে কিরূপে বিশ্বাস করিব ? আচ্ছা, আমাদের ভাগ্যে কি এই মহাত্মাদিগের দর্শন ঘটিতে পারে না ?

ক। আপনি যদি তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনাকে তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে।

শি। তাঁহারা আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন বা নাই করুন, আমি তাঁহাদের কার্য্যে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি এই কয়েকদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু মাদাম এপর্য্যন্ত আমাকে কোন অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করান নাই।

ক। আপনি আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে, মাদাম আপনাকে কিছুই দেখাইতে পারেন না।

শি। যদি তাহাই হয়, তবে আমাকে আজই দীক্ষিত করুন।

শিশিরকুমারের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ণেল অল্‌কট তাঁহাকে মাদাম ব্লাভাৎস্কির নির্দ্দেশমত দীক্ষিত করিলেন। কর্ণেল শিশিরকুমারকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়া কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দ শিখাইয়া দিলেন।

শিশিরকুমার দশ টাকা দিয়া থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হইলেন। ভারতবর্ষে তিনিই বোধ হয় এই সমিতির সর্ব্বপ্রথম সদস্য।* শিশিরকুমার ক্রমে ক্রমে বোম্বাইয়ে মালাবারি, মুরারজি, গোকুল দাস প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকটের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। তিনি বোম্বাই হইতে বঙ্গদেশে তাঁহার কতিপয় বন্ধুকে থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যাসমিতির উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কাসিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী, যশোরের অন্তর্গত চাঁচড়ার রাজা বরদাকান্ত রায় প্রভৃতি বহু সহৃদয় ধনী ব্যক্তি সমিতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার ভারতে থিওজফিক্যাল সোসাইটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্নে কার্য্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহাকে কোনও অদ্ভুত ঘটনা দেখাইলেন না। শিশিরকুমারের ধৈর্য্য যেন ক্রমশই হ্রাস হইতে লাগিল। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল অল্‌কট একদিন তাঁহার সমক্ষে মাদামকে বলিলেন—"হিন্দুদিগের মধ্যে

* শিশিরকুমার লিখিয়াছেন—

I was, I believe, the first member of the Society. (Hindu Spiritual Magazine, Vol III, Pt II, p. 426.

যিনি সর্ব্বপ্রথমে সোসাইটিতে যোগদান করিয়াছেন, এবং তাহার উন্নতিকল্পে অর্থসংগ্রহ করিয়া দিতেছেন, তাঁহাকে এখনও কোন অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইয়া আপনি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।"

মাদাম নিরুত্তর, তিনি যেন কর্ণেলের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু শিশিরকুমার ইহার পরেই কয়েকটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঘটনা কয়টি নিম্নে বিবৃত হইল।

(১)

শিশিরকুমার যে বাংলোতে অবস্থান করিতেন, একদিন তাহার বারান্দায় শয়ন করিয়া তিনি কর্ণেল অলকটের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। কর্ণেল অনাবৃত দেহে শিশিরকুমারের ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। বাংলোটী রাস্তার উপরে, সম্মুখে একটী প্রাচীর থাকিলেও রাস্তা হইতে লোকে উভয়কেই দেখিতে পাইত। মাদাম ব্লাভাৎস্কি এই সময় নিজের বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন। শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় মাদামের প্রিয় পরিচারক বাচুলা আসিয়া একখণ্ড কাগজ কর্ণেলের হস্তে প্রদান করিল। কাগজখানি পাঠ করিয়া কর্ণেল ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় কোট পরিধান করিলেন। শিশিরকুমার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কর্ণেল, মাদাম লিখিত কাগজখণ্ড তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"অনাবৃত দেহে সাধারণের সমক্ষে থাকিবার কারণ কি? আপনার কোট পরিধান করিয়া সভ্য হউন।" শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল বলিলেন—"এইরূপেই মাদাম তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুচরগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকেন। শিশির বাবু, আপনি মাদামের নিকট গিয়া এই ঘটনার কথা অনুসন্ধান করিতে পারেন।" মাদাম ব্লাভাৎস্কি বিভিন্ন বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন; সেখান হইতে শিশিরকুমার ও কর্ণেলকে দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; এরূপ অবস্থায় কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে শয়ন করিয়া ছিলেন, তাহা তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন, এই চিন্তায় শিশিরকুমার অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মাদাম ব্লাভাৎস্কির নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই কাগজখানি তাঁহাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এ আদেশের তাৎপর্য্য কি?"

মাদাম। কর্ণেল যদি ভদ্রভাবে না থাকেন, তাহা হইলে এদেশের লোকেরা আমাদিগকে সম্মান করিবে কেন?

শিশির। কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে আমার বাংলোতে শয়ন করিয়া ছিলেন, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?

মাদাম। আপনাদের এই দেশেরই জনৈক মহাত্মার অনুগ্রহে জানিতে পারিলাম।

শিশির। তিনি কে?

মাদাম। মহাপুরুষ; আমাদের প্রভু।

শিশিরকুমার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

(২)

শিশিরকুমার একদিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় কর্ণেল অলকট, মিষ্টার উইন্‌ব্রিজ ও মিসেস্ বেটসের সহিত একত্রে আহার করিতেছেন, এমন সময় মধুর ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতরে অন্য কেহ ছিল না, অথচ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তিনি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের শব্দ?"

কর্ণেল মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—"ঘণ্টাধ্বনি।"

শিশির। কে বাজাইতেছে?

কর্ণেল। মাদাম।

শিশির। মাদাম? কৈ, তিনি ত এখানে উপস্থিত নাই।

কর্ণেল। অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব।

শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে উক্তরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় বাচুলা একখণ্ড কাগজ লইয়া শিশিরকুমারকে প্রদান করিল। শিশিরকুমার দেখিলেন, মাদাম লিখিয়াছেন—"মিষ্টার ঘোষ, তুমি কি আমার স্বর শুনিতে পাইতেছ?" মাদাম বিভিন্ন বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন, শিশিরকুমার ছুটিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মাদাম তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

(৩)

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিশিরকুমার ও কর্ণেল অলকট বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত পার্শী যুবক তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। যুবকটি মাদাম ব্লাভাৎস্কির অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কর্ণেল ও মাদামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি শিশিরকুমার ও কর্ণেলের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মাদাম সেখানে উপস্থিত হইলেন। মাদাম যুবকের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন—"উপরি উপরি ছুইটি টুপি মাথায় দেওয়া কি এ দেশের প্রথা?" ইহার পর তিনি যুবকের মস্তক হইতে একটি টুপি খুলিয়া লইলেন, আর একটি তাহার মস্তকেই রহিল। যুবক একটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিরূপে ছুইটি টুপি হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। শিশিরকুমার মাদামের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কর্ণেল অলকট্ হাসিয়া বলিলেন—"শিশির বাবু, দেখিলেন ত? যুবক একটা টুপি পরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু মাদাম তাঁহার টুপি স্পর্শ করিবামাত্রই ঠিক সেইরূপ আর একটি টুপি সৃষ্ট হইল।"

শিশিরকুমার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ছুইটি টুপিই একরূপ। স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিলেন, শিশিরকুমার কিরূপে তাহা অবিশ্বাস করিবেন? কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল;—মাদাম আসিবার সময় কি তাঁহাদের অলক্ষ্যে একটি টুপি হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে পার্শী যুবক যে টুপি পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ টুপি তিনি তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে পাইলেন? শিশিরকুমার মনের মধ্যে অনেক যুক্তি তর্ক করিয়া স্থির করিলেন যে, মাদাম টুপি লইয়া আসেন নাই। তবে কি পার্শী যুবক মাদামের নির্দ্দেশ মত একই রকমের ছুইটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন? তাহাও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ প্রতারণা দ্বারা মানবের হৃদয় অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব! মাদাম যদি পার্শী যুবকের সহিত একযোগে প্রতারণা দ্বারা শিশিরকুমারকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে যুবক কিছুতেই মাদামের অনুরক্ত সেবক হইতে পারিতেন না। তিনি যতই মাদামের অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(৪)

একদিন শিশিরকুমার ও কর্ণেল বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কর্ণেল একগুচ্ছ সুচিক্কণ কেশ শিশিরকুমারকে দেখাইলেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেশ কাহার? আপনি রাখিয়াছেন কেন?" প্রত্যুত্তরে কর্ণেল বলিলেন—"এ কেশ মাদাম আমাকে দিয়াছেন। একদিন তিনি তাঁহার মস্তক হইতে একগুচ্ছ পলিত কেশ লইয়া স্বীয় শক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা এইরূপ সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। শিশিরকুমার দেখিলেন, ইহাও এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি একদিন মাদাম ব্লাভাৎস্কিকে বলিলেন,

"আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এইরূপ কেশগুচ্ছ আপনার মস্তক হইতে দিন, আমি তাহা কলিকাতায় আমার বন্ধুবর্গকে দেখাইব।"

মাদাম বলিলেন—"আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারিব না, কারণ মহাত্মাদের অনুগ্রহ ব্যতীত আমার এই পক্বকেশ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতে পারে না।"

এইরূপ কথোপকথনের দুই একদিন পরে, একদিন রাত্রে শিশিরকুমারের শয়ন কক্ষে বসিয়া কর্ণেল, মাদাম ও শিশিরকুমার হিন্দু বিবর্ত্তনবাদ (Hindu theory of Evolution) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। মাদাম বক্তা, শিশিরকুমার ও কর্ণেল শ্রোতা। মাদাম ব্লাভাৎস্কির জ্ঞানের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমারের মনে হইতে লাগিল যে মাদাম মানবী নহেন, তিনি দেবী; এজগতের সৃষ্টি-রহস্য যেন তাঁহার কিছুই অজ্ঞাত নাই। তিনি আপনাকে মাদামের দাসানুদাস বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কোন হিন্দু মহাত্মা মাদামের শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই শিশিরকুমারের ধারণা জন্মিয়াছিল। মাদামের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শিশিরকুমার বলিয়া উঠিলেন—"আর নয়, আজ এই পর্য্যন্ত থাক; আমি আপনার গভীর তত্ত্বগুলি আর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।"

মাদাম নীরব হইলেন। তিনি স্বীয় কক্ষে গমন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে শিশিরকুমার তাঁহাকে বলিলেন—"কৈ, আমাকে ত কর্ণেলের ন্যায় কেশগুচ্ছ দিলেন না।"

"তুমি আমার কেশ চাও? আচ্ছা, এই গ্রহণ কর"—এই বলিয়া মাদাম স্বীয় মস্তক হইতে এক গুচ্ছ পক্বকেশ ছিঁড়িয়া লইয়া শিশিরকুমারের হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার দেখিলেন, সেই কেশগুচ্ছ শুভ্র নহে, তাহা সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি মাদামের অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। তিনি শেষে দেখিলেন যে মাদাম অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদাম অঙ্গুলি সঞ্চালন বন্ধ করিয়া বলিলেন—"বাস্।" সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর ঘণ্টাধ্বনিও থামিয়া গেল।

বোম্বাইয়ে 'অবস্থানকালে' শিশিরকুমার মাদামের অলৌকিক শক্তির' বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের সহিত থিওজফি বা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় মাদাম তাঁহার বিচারশক্তি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকট ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের সমিতির কার্য্য প্রচারের জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা শিশিরকুমারের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার পরামর্শ অনুসারে "থিওজফিষ্ট" (Theosophist) নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

শিশিরকুমার জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন না, একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মাদাম ব্লাভাৎস্কি কিন্তু জন্মান্তরবাদিনী ছিলেন। একদিন এই জন্মান্তর-রহস্য লইয়া উভয়ের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম।

শিশির। আপনার জন্মান্তরে বিশ্বাস, ভারতবর্ষে আপনার প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের অন্তরায় হইবে।

মাদাম। কেন?

শিশির। আপনি যদি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন, তাহা হইলে আপনাদের সমিতির উন্নতি হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

মাদাম। কি কারণে?

শিশির। মৃত্যু মানবহৃদয়ে যে ভীতি-সঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা প্রেতাত্মবাদ দ্বারা দূর হইয়া যায়। আপনার ব্রহ্মবিদ্যার সহিত যদি জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন, তাহা হইলে লোকে ব্রহ্মবিদ্যার পরিবর্ত্তে প্রেতাত্মবাদই সাদরে গ্রহণ করিবে।

মাদাম। আত্মার ধ্বংস নাই এবং মৃত্যুর পরও আত্মা বর্ত্তমান থাকে, এ কথা ত আমরা বিশ্বাস করি।

শিশির। পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস দ্বারা মানবের মৃত্যুভয় যে কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মানব যদি বুঝিতে পারে যে মৃত্যু একটা পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং এই পরিবর্ত্তনের পর তাহারা পরজগতে গমন করিয়া আত্মীয়স্বজনগণের সহিত মিলিত হইবে, তাহা হইলে তাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারিবে। কিন্তু মানব যদি জন্মান্তরবাদী হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুভয় দূর হইতে পারে না; বরং মৃত্যুর পর তাহার স্বরূপত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহার স্বজনগণের সহিত মিলন হইবে না, এই সকল চিন্তা তাহার হৃদয়ে ভীতি ও অশান্তি উৎপাদন করিবে।

শিশিরকুমারের যুক্তি তর্ক মাদাম ব্লাভাৎস্কির নিকট সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইল না; তিনি শিশিরকুমারের প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ছি ছি, তুমি হিন্দু হইয়া জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস কর না!"

শিশির। বর্ত্তমানে হিন্দুগণ জন্মান্তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত নহে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণই জন্মান্তরবাদের প্রবর্ত্তক।

মাদাম। প্রমাণ কোথায়?

শিশির। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, স্মৃতি ও পুরাণ এই দুইয়ের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষিত হইলে পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতিই গ্রহণ করিতে হইবে। আবার স্মৃতি ও বেদের মধ্যে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইলে স্মৃতি পরিত্যাগ করিয়া বেদ-নির্দ্দিষ্ট মত গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বেদই সর্ব্বপ্রধান; বৈদিক মতের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের কোনও কার্য্য করা সম্ভব নহে। মানব মৃত্যুর পর পরজগতে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বেদ-প্রচারিত এবং অধ্যাত্মবাদিগণই মত অনুসরণ করিয়া থাকে।

মাদাম। তুমি বেদ হইতে যাহা বলিলে, আমাকে তাহা দেখাইতে পার?

শিশির। বেদের শ্লোকগুলি আমার স্মরণ নাই, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

শিশিরকুমার জন্মান্তরবাদী নহেন দেখিয়া মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন।

শিশিরকুমার তিন সপ্তাহকাল বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার বোম্বাই পরিত্যাগের ঠিক দুইদিন পূর্ব্বে মাদামের সহিত তাঁহার জন্মান্তর-রহস্য লইয়া উক্তরূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। মাদাম শিশিরকুমারের উপর এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি দুইদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। নির্দ্দিষ্ট দিবসে শিশিরকুমার বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় মাদামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মাদামের সম্মুখে নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিলেন—"জননী, আমাকে ক্ষমা করুন; কেবল ক্ষমা কেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

মাদামের ক্রোধ দূর হইয়া গেল। তিনি সজলনয়নে সস্নেহে শিশিরকুমারের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

শিশিরকুমার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভারতবর্ষে থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যাসমিতি প্রতিষ্ঠার সময় মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকট শিশিরকুমারের নিকট যে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা আজীবন স্মরণ করিতেন। মাদাম ও কর্ণেল শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহারা অনেক সময় কলিকাতায় শিশিরকুমারের বাটীতেই অবস্থান করিতেন। একেশ্বরবাদী শিশিরকুমার প্রেতাত্মবাদ ও ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগবিদ্যা আলোচনা দ্বারা স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রকে ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতা

বাঙ্গালা সাহিত্যে—বাস্তবতার আবির্ভাব, অবাধ প্রচলন ও প্রচুর সমাদর দেখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রের অনেক ভাবুকের আশঙ্কা জন্মিতেছে যে, সাহিত্যের এই গতি অপ্রতিহত থাকিলে ইহার হীনতা ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। এ আশঙ্কার মূল কোথায় এবং ভিত্তি কতটা, দেখিলে ক্ষতি কি?

জগতে যাহা আমরা চোখের সামনে স্বাভাবিক অবস্থায় নিত্য চারিদিকে দেখিতে পাই, সাহিত্যের হিসাবে তাহাই Real এবং সেই প্রত্যক্ষের প্রতিকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া রসসঞ্চারী নিপুণ বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই Realism বা বাস্তব-বাদ। নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনার ভিতর দিয়া মানব চরিত্রের জটিল রহস্যের সমাধান ও হৃদয়বৃত্তির স্বরূপ চিত্রনের দ্বারা রসের সৃষ্টিই বাস্তব সাহিত্যের আর্ট। যাঁহারা Realism বলিতে যাহা কিছু কুৎসিত তাহাই ধরিয়া লন, বা কদর্য্য অশ্লীলতা বুঝেন, তাঁহারা ইহার প্রকৃত অর্থ জানেন না বা বুঝেন না। একথা ভুলিলে চলিবে কেন যে আমাদের জীবন-যাত্রার জন্য যাহা কিছু একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই কুৎসিত। কারণ তাহা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অসুন্দর অভাবের প্রতিমূর্ত্তি বৈ আর কিছুই নয়। বিচিত্র মানব-প্রকৃতির বিশাল সমগ্রতাই—উৎকৃষ্ট দেবধর্ম্ম ও নিকৃষ্ট জন্তুধর্ম্ম—বাস্তব-বাদের বিষয়ীভূত। দেবধর্ম্মী ও জন্তুধর্ম্মী এই উভয়বিধ মানবের ভাব ও ভাবনায় ব্যাপক চিত্র যিনি নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়া মানবের জ্ঞান-বুদ্ধির সহায়তা করেন, তিনিই প্রকৃত বাস্তববাদী। হইতে পারে, কোন কোন বাস্তববাদী Realismকে অশ্লীলতায় পরিণত করিয়াছেন। অস্বীকার করি না যে তাহা ঘোর পরিতাপের বিষয়; কিন্তু ইহাতে হিতোপদেশের স্থায় কোন নীতিনির্ব্বাচন নাই বলিয়া, বাস্তববাদের কোন অপরাধ আছে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। সুন্দর ও কুৎসিত, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, আলো ও ছায়া—এই লইয়াই জগৎ, কাজেই জ্ঞানবিস্তারে ও লোকশিক্ষার পক্ষে বাস্তব-সাহিত্য বিশেষ উপযোগী। আমাদের আছে কি এবং অভাব কি না জানিলে ত চলে না। আর, আমার জ্ঞান যে পরিমাণে কম, আমার জীবন সেই পরিমাণে শ্রীহীন এবং আমার কর্ম্মশক্তির ও হৃদয়বৃত্তির সম্যক্ বিকাশের অন্তরায়ও সেই পরিমাণে বেশী। বাস্তবের ভিতর দিয়াই চিত্তশুদ্ধিলাভের দ্বারা আদর্শে পৌছিবার পথ। রহস্যময় মানব-প্রকৃতির নিকৃষ্ট অংশটা কতটা নিকৃষ্ট, এবং কেন নিকৃষ্ট, ইহা না জানিলে না বুঝিলে উৎকর্ষের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয় কৈ? পুণ্যের মাহাত্ম্য, দয়ার গৌরব, শান্তির শুভ্রতা বুঝিতে হইলে পাপের চিত্র দেখা চাই। এই ব্যবহারিক জগতে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই তুলনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাস্তব সাহিত্যে হয়ত দেখিতে পাই, সমাজ, জীবনের সুখ ও দুঃখ, তুষ্টি ও তৃপ্তি, জ্ঞান ও আনন্দ স্বর্ণকারের তৌলের সাহায্যে মাপিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোথাও বা দেখি, জীবনের উদ্যম ও সাধনা, চেষ্টা ও সফলতা, মানবতা ও সৌন্দর্য্যের দিক হইতে বিচারিত না হইয়া অর্থের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। ইহাতে ভাষা ও সাহিত্যে জরা ও স্থবিরতা আসিয়া পড়ে এবং ভাবের বিস্তার ও অভিব্যঞ্জনায় আঘাত লাগে একথা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও, বাস্তব সাহিত্যের রসধারায় একটা বিপুল সার্থকতা আছে—তাহা কোন স্থিরবুদ্ধি বিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। কাব্যে বা উপন্যাসে সন্ন্যাস, আত্মত্যাগ বা আত্মার পরমার্থময় উন্মেষ বা অনন্তের ইঙ্গিত না থাকিলেই যে তাহা নিন্দনীয় নিরর্থক বা শ্রীহীন হইবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা যায় না। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে নির্জ্জলা ভোগের সাহিত্য, লালসার সাহিত্য

মানবতার পূর্ণ পরিণতির একান্ত বিরোধী। সামঞ্জস্যের অভাব হেতু তাহা আনন্দলাভেরও কতকটা পরিপন্থী। সে সাহিত্যের স্রোত অব্যাহত থাকিলে মানব পরকালের ভয় ও ভাবনা ভুলিয়া গিয়া, ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া, দুর্জ্ঞেয় অতীন্দ্রিয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া দেহের তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করে; সেবানৈপুণ্যের পরিবর্ত্তে আত্মপ্রীতি ও বিলাস-কেই—ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্য সুখের সেবাকেই—জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য করিয়া তুলে; ফলে মানুষ কেন্দ্রা-নুগ শ্রেয়ঃ ও কেন্দ্রাপগ প্রেয়ঃ অভিন্ন ভাবিয়া বিলাসী আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু সাহিত্যের বাস্তবিকতা বলিলেই ত অসংযত ভোগ, সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থপরতা ও অশান্ত শিথিলতা বুঝায় না। প্রত্যুত সর্ব্বভূতে আপ-নাকে অকাতরে বিতরণ করিবার সার্থকতায় সহজ ও গভীর বিশ্বাস হারাইয়া, নিজের কামনা ও বাসনা দ্বারা জীবনটাকে সর্ব্বতোভাবে ভরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে মনটা কিরূপ অলস হইয়া উঠে এবং জীবনটা কিরূপ ব্যর্থ, রিক্ত ও পরিণামে তিক্ত হইয়া পড়ে, তাহা আন্তরিকতা ও সমবেদনা বিরহিত নৈতিক সাহিত্য অপেক্ষা রস সাহিত্য পাঠেই অধিকতর হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রকৃতির উৎকট প্রেরণায়, ব্যক্তিগত বাসনার উচ্ছৃঙ্খল দাপাদাপিতে, আত্মসেবার ব্যাকুলতায় মানবহৃদয় কত শীঘ্র তাহার নবীনতা ও মহত্ত্ব হারাইয়া ফেলে, সে চিত্র বাস্তব সাহিত্যে যেরূপ অকপটভাবে প্রতিভাত হয়, আর কোথাও সেরূপ হয় না। মানবজীবনের প্রতিদিবসের নানা প্রকার অভাব অনটনের মূর্ত্তি দেখায় বলিয়া, শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণা পরিপূরিত এই পৃথিবীর কথা অসঙ্কোচে নির্ম্মমভাবে যথাযথ কহে বলিয়া, বাস্তব সাহিত্যে রুচির হিসাবে কিছু দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে ভাবপ্রকাশের পূর্ণতা ও চরিত্র চিত্রণের সজীবতা হিসাবে উহার অনেক অসাধারণ গুণও আছে।

বঙ্গভাষায় বস্তুতন্ত্র-সাহিত্যের মধ্যে নীতির বর্ণনা না থাকিলেও, ত্যাগের ও সংযমের, বিশ্বাস, প্রীতি ও ভক্তির উদার আদর্শ এবং সেই বৃহৎ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষার অভাব নাই। উহা মানবতার উন্মেষক সদ্ভাব-বর্জ্জিতও নহে। হইতে পারে ইহাতে শান্তি ও সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে ভোগের উদ্‌ভ্রান্ত চাঞ্চল্য এবং কঠোর সংযমের পরিবর্ত্তে শিথিল প্রেমের ও অসংযত কামের বিলাস কাহিনীই বেশী অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু অনাবৃত সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিতে ও স্বাধীনতার বিস্তৃতিতে, ভাষার ঐশ্বর্য্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষে আলোচ্য বাঙ্গালা সাহিত্য যে একটা উচ্চগৌরবের স্থান অধি-কার করিতে পারিয়াছে এ কথা এখন আর অস্বীকার করা চলে না।

বাস্তব সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে, উহা কাহারও স্বাধীন ইচ্ছায় আঘাত করে না। উহা কাহারও চোখে ঠুলি দিয়া মুখে লাগাম বাঁধিয়া সচ্চরিত্রতার দিকে, পরিপূর্ণ মানবতার দিকে চালনা করে না। নীতিবাদী সাহিত্যিকদিগের রীতি কিন্তু অন্যরূপ। মানুষের স্বাধীন সহজ শক্তির উপর তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। মানুষের দুর্জ্জয় আত্মাভিমানের কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা হঠাৎ আসিয়া বলেন, "মানব-জীবনের সাফল্য বোধ যদি চাও, লালসা ত্যাগ কর, মানবের জন্য আত্মোৎসর্গ কর, আপনাকে বিলাইয়া দাও, আপনাকে বিকাইয়া দাও।" আমার সেই চিরন্তন স্বাধীন ইচ্ছায় আঘাত লাগে, কাযেই আমার "আমি" হৃদয়ের অন্তঃ-পুর হইতে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার স্বরে বলিয়া উঠে, "কেন? কিসের জন্য? কি লাভ তাহাতে? আত্ম-তৃপ্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ ছাড়িয়া পরের সুখ শান্তির জন্য যত্নশীল হইব কেন?" তখন নীতিবাদী সাহিত্যিক-প্রবরের কোন সরল সহজ উত্তর থাকে না। কাযেই তিনি জিদের বশে যুক্তি ছাড়িয়া শাস্ত্রের জুলুম ও জবর-দস্তির আশ্রয় লইয়া বহির্হরের শাসন চালাইয়া, তাঁহার কথা চক্ষু মুদিয়া অন্ধভাবে মানিয়া লইবার জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি করেন।

স্বাবলম্বনশীল চঞ্চল মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে ইহা একটা

অবিসংবাদিত সত্য যে, মানুষকে ধরিয়া বাঁধিয়া, তাহার স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়া, জটিল স্মৃতির অনুশাসনের দ্বারা বাধ্য করিয়া কায করাইতে চাহিলে, সে সুবিধা পাইলেই বন্ধন-শৃঙ্খল কাটিবার চেষ্টা করে। অনুশাসনের খাতিরে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সকল সময় গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারা যায় না। ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে আত্মাভিমানী মানুষ স্বাধীন আত্মশক্তির আনন্দে যতটা কায করে, রাজা গুরু বা শাস্ত্রের আদেশে ততটা করে না। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে আত্মম্ভরী মানুষ ঠেকিয়া যত শিখে, দেখিয়া বা শুনিয়া তত নহে। কেবল নীতিবিজ্ঞান মানবের প্রাকৃতিক বৃত্তিনিচয়কে প্রতিরোধ করিয়া, তাহার স্থূল মাধুর্য্যের তৃষ্ণা দূর করিয়া দিয়া, তাহার ভিতরের শ্রদ্ধা ও স্বাধীনতা উদ্বোধিত করিয়া তাহাকে দেবতা করিতে পারিয়াছে, তাহার সহজাত স্থূল জীবত্ব হইতে মুক্তি দিয়া বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছে এরূপ সচরাচর দেখা যায় না। সেই সুপ্রাচীন অনৈতিহাসিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এত নীতি ও অনুশাসনের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও এখনও দুনিয়ার চারিদিকেই ঈর্ষা কলহ বিদ্বেষ মোহ ও ষড়যন্ত্রের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। নাকে দড়ি দিয়া সৎপথে চালনা করা অপেক্ষা, স্বেচ্ছায় সৎপথে চলিবার শিক্ষা ও যোগ্যতা দেওয়াই যে মহত্তর কর্ম্ম তাহা অস্বীকার করা যায় কি?

যদি বিলাসী স্বার্থপর যথেচ্ছাচারী কেহ আসিয়া বলে—"আমার বুদ্ধিমত সুখ যাহা, তৃপ্তি যাহা, আনন্দ যাহা তাহা বর্জ্জন করিয়া তোমার কথায় ধ্রুব ছাড়িয়া অধ্রুবের পশ্চাতে ছুটিব কেন?" তাহা হইলে প্রবৃত্তির তাড়নায় চঞ্চল সেই natural manকে নিরস্ত করিবার পক্ষে বুদ্ধি বিচারের অধিকার বহির্ভূত জুলুম ও জবরদস্তি ছাড়া অন্য কোনও উপায় দেখি না। কিন্তু যদি তাহাকে কেন্দ্রচ্যুত উল্কার মত তাহার নিজের পছন্দসই ধর্ম্মহীন অশিবের পশ্চাতে চলিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কালে তাহার জীবনগীতি তাহার নিজেরই কাণে বৈচিত্র্যহীন বেসুরা বাজিতে থাকিবে এবং অনতিদূর পরিণামে "ভ্রান্ত, শ্রান্ত, ক্ষতপাদ সেই পথিকের" স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পরের সুখশান্তি দলিয়া পরকে পীড়া দিয়া সুখ নাই; পরের দুঃখ ক্লেশের উপর নিজেকে নিক্ষেপ করিতে পারিলে, পরের অশ্রুতে নিজের অশ্রু মিশাইয়া রোদন করিতে পারিলে, পরের আনন্দ-বিধান করিলে নিজের আনন্দ আপনি আসিয়া পড়ে। তাহার আরও উপলব্ধি হইবে যে, সুখ উদ্দাম প্রবৃত্তির পথে নহে, সুখ শান্ত সংযমে। তখন সে বিরোধমূলক সংকীর্ণ স্বার্থ ছাড়িয়া স্বতঃই উৎসর্গময়—কাযেই আনন্দময়—পরার্থে মনোনিবেশ করিবে। যোড়শোপচারে নিবিড় বিলাসের পূজা করিতে করিতেই তাহার জীবনের অলস ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকারে ভোগের স্পন্দনে আলোক রেখা ফুটিয়া উঠে এবং সে বেশ ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করে যে বিলাসিতা গর্ব্বস্ফীত হৃদয়হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবংবিধ জীবন-আলো-করা শুভ্রোজ্জ্বল জ্ঞানের ফলে সে নিজের দেহের সুখের অতীত একটা সরস পদার্থের সন্ধান পায়, তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে অসীম আকাশের উদারতা আসিয়া পড়ে, জীবের দুঃখে করুণা ও সহানুভূতি আপনি জন্মে, পরের জন্য কাঁদিতে শিখে; সুতরাং মানবতার জন্য আত্মোৎসর্গে আর কাতর হয় না। তখন অম্লানবদনে তাহার পরিপুষ্ট আমিত্ব ভুমিত্বে ডুবাইয়া দিয়া, সে নিজেরই মতে নিজেরই নিয়মে স্বাধীন গৌরবে আত্মগ্লানিশূন্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভাল করিতে চাহিবে এবং ভাল হইতে পারিবে। এইখানেই বাস্তব সাহিত্যের উপকারিতা, উপযোগিতা ও অসাধারণ সাফল্য। ইহাতেই তাহার চরম এবং পরম গৌরব।

বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের উজ্জ্বল আলোকে তন্দ্রার জড়িমা ছুটিয়া গেলে, আমাদের আজকালকার সুবিধাবাদী সমাজের ও সভ্যতার অনাবৃত স্বরূপ দর্শনে যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ও অনু-

দারতা দেখিলে হাসিও পায়, রাগও হয়। জৈব ধর্মে জীবন সংগ্রামে, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার অনুকূল সহজ স্বাভাবিক ও সনাতন ক্রিয়াকলাপে immoral কলুষতা কিছু নাই—থাকিতে পারে না। সহজ ও সার্ব্বজনীন cosmic process কখনই immoral নয়—বড়জোর un-moral।

সাহিত্যক্ষেত্রে মিথ্যার বা ভণ্ডামির স্থান নাই। সত্যের তেজেই সাহিত্যের বিকাশ। সত্যকে না মানিলে সাহিত্যে সফলতার আশা সুদূরপরাহত। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, সজীব সাহিত্যের ধর্ম্ম—মানুষকে তাহার আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া জ্ঞানের বিমল আলোকের মাঝে মুক্তি দেওয়া। কবির চক্ষে অবজ্ঞেয় বা উপেক্ষণীয় কিছুই নাই। কাযেই বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা সজীব সাহিত্যের ধর্ম্মের বিরোধী। হৃদয়বৃত্তি-স্ফুরণোপযোগী ও সৌন্দর্য্য-সৃজনক্ষম কোন জিনিষেরই সাহিত্যমন্দিরে প্রবেশ করিতে কোন বাধা নাই বা থাকিতে পারে না। ব্যক্ত, অব্যক্ত বিশ্বব্যাপী সমগ্র সত্যকে হৃদয়ের অধিকারের মধ্যে আনিতে পারাতেই সাহিত্যের একমাত্র গৌরব ও সার্থকতা।

বাস্তব সাহিত্য হইতে ভয় পাইবার কিছু নাই এবং উহাতে ঘৃণা করিবারও কিছু নাই। ভোগ-বহুল বাস্তব সাহিত্যে মানসিক আলস্যজনক ত্রুটি অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু উহা রূপ রস গন্ধ স্পর্শের সুখ-সৌন্দর্য্য লালসা চিত্তে জাগায় বলিয়া, রুচির দুর্ব্বলতার দিক হইতে puritanism এর তৌলের দ্বারা সেই ত্রুটির বিচার করিলে সে বিচার একেবারেই অসঙ্গত ও অবিচার হইয়া পড়ে। আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে নীতিবিজ্ঞান ও সাহিত্য এক জিনিষ নহে। হইতে পারে যে উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। বাহ্যঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবেকের উদ্বোধনের দ্বারা মানবতার ক্রম-বিকাশ এবং পরিণামে পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য; সুতরাং বাস্তব সাহিত্যেরও অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। সহজ ও সতেজ মানব ধর্ম্মের অবলম্বনে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা চিত্তোৎকর্ষ সাধন ও চিত্তশুদ্ধির বিধানই হইতেছে বাস্তব সাহিত্যের মূলমন্ত্র। তাহার সাফল্য ও চরিতার্থতাও ইহাতেই। প্রভেদ কেবল রসপ্রবাহে, আলোচনার রীতিতে, ঘটনা-বলীর বর্ণনায় এবং চরিত্র-চিত্রণে। মঙ্গলের বিকাশ ও পুণ্যের সহায়তারূপ মূলগত উদ্দেশ্যে ও প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নাই এবং থাকিতে পারে না।

এক দলের বর্ণনায় ধর্ম্মের ধ্বনি, বিশ্বাসীর স্বর্গ, দুর্ব্বলের জন্য সবলের আত্মত্যাগ, প্রেমে পুণ্যে ও মঙ্গলে ধন্য স্নিগ্ধ মানবজীবন; অপর দল বর্ণনা করেন অবিশ্বাসীর সন্দেহবাদ, অকৃতকার্য্যের তীব্র আত্মাভি-যোগ, সমাজদ্রোহী দুর্নীতির ভীষণ প্লাবন, অগণিত নর-নারীর আশাহীন লক্ষ্যহীন ব্যর্থ অতৃপ্ত চির-পিপাসিত জীবন, কিংবা পতিতা নারীর শ্রী-হীন অসহিষ্ণু রূপশ্রী, তাহার সুলভ শিথিল কুণ্ঠাহীন প্রেম ও আনুসঙ্গিক চটুল মোহ, তথা নরপশুর পঙ্কিল ইন্দ্রিয়-বিলাস, হৃদয়হীন ধনীর ঐশ্বর্য্যের দর্প ও অদম্য অশুভ বুদ্ধি, নিরন্ন মানবের অশ্রুময় অভাব ও হৃদয়ভেদী কাতরতা, দুঃখ দৈন্য অভাব আর্ত্তিময় জীবন-সংগ্রামে পরাজিত পদদলিত ব্যথিতের গভীর অন্তর্বেদনা ও আর্ত্তনাদ, অথবা সুখস্বপ্নশীল ললিতবপু তরুণ-তরুণীর স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাস, মুখর রূপযৌবনের চপল হিল্লোল, বসন্তের উচ্ছ্বাসে প্রাণের প্রাচুর্য্য, লীলায়িত সৌন্দর্য্যের শীতল ছায়ায় উষ্ণ বাসনার সুখস্বপ্ন ও হৃদয়-জয়-পরাজয়ের সেই চিরনূতন বৃন্দাবন লীলা। কোথাও দেখি রসের চঞ্চলতা, লালসার উদ্বোধন, উচ্ছৃঙ্খল ভোগের প্রবল আধিপত্য, সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থের দানবিক হুঙ্কার, চিত্তের উপর বিত্তের অখণ্ড প্রাধান্য, আত্ম-বিসর্জ্জনের পরিবর্ত্তে যেন তেন প্রকারেণ অকুণ্ঠিত আত্মপ্রতিষ্ঠা জীবনের বেদ, হিংসাদ্বেষ প্রবঞ্চনায় ও সেই প্রাথমিক ক্ষুধা ক্রোধ ও কামে আজও কানায় কানায় পরিপূর্ণ তীব্র পশুপ্রকৃতি মানব জীবন। কোথাও বা দেখি, এ বিশ্ব সচ্চিদানন্দময়ের অভিব্যক্তি, অনন্তের পথে নিয়ত ধাবমান মানব আন-

ন্দের সন্তান, পুণ্যের গরিমায় অলঙ্কৃত; মানুষ দেবতার অংশ, প্রেম বিশ্বাস ও আশার বলে তাহার জীবনে অশেষ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আত্মশুদ্ধির নির্ম্মল শুভ্র আলোক, প্রীতি করুণা ও মঙ্গলের উজ্জ্বল মধুর মহিমা নানাভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠে।

এই সুখ ও দুঃখ, এই আলো ও ছায়া এই লালসা ও সংযম, এই অসামঞ্জস্য, এই লয়হীনতা, এই শ্রীহীনতা—আসলে কিন্তু ইহা একই মানব জীবনের দুইটা দিক মাত্র। ইহার আপাত-বিরোধ মধ্যেই সুশোভন সামঞ্জস্য লুক্কায়িত আছে। এই বন্ধুর সংসার পথে পুঞ্জীভূত দুঃখ দারিদ্র্যের ভিতর একটা সান্ত্বনার সুর, একটা আশার মোহন ঝঙ্কার অবিরত বাজিতেছে।

পার্থিব হিসাবে এই আলো ও আঁধার নিয়তির মত দুর্ব্বার সত্য; কাযেই আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিশ্বের পরম বরেণ্য রাজরাজেশ্বরের বিভূতি জ্ঞানকে পরিহার করিয়া জীবনাতিবাহিত করিবার চেষ্টা একটা বিষম বিড়ম্বনা মাত্র। এ কথা সাহিত্যের কল্যাণকামী কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না।

বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য বাস্তবের ও প্রকৃতের, সমাজের ও সমাজব্যাপী সভ্যতার যথাযথ চিত্রাঙ্কন, আমাদের ক্রম-পরিবর্ত্তনশীল সমাজগত জীবন সংসার-প্রবাহে কোন দিকে ভাসিয়া যাইতেছে, সমাজে কি আদর্শ, কোন চিন্তা, কি শক্তি, কি ভাবে কতটা ব্যাপকতার সহিত কার্য্য করিতেছে এবং তাহাতে সমাজের স্থিতি ও বিস্তারে, পুষ্টি ও আনন্দলীলায় কোন দিকে কি হানি হইতেছে বা হইতে পারে, আপাত-মধুর দৈহিক তুষ্টি ও পুষ্টির অসঙ্গত ঔৎসুক্যের অনিবার্য্য ফল কি, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতায়, সংযম হারাইয়া, শাসন না মানিয়া, সমাজগত সমষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া আত্মগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকিলে, সমাজ কিরূপে জরাগ্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে অনিবার্য্য বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হয়, বর্ত্তমান যুগের ইহকাল-সর্ব্বস্ব কাঞ্চন-সভ্যতার অপ্রতিহত প্রভাবে আমাদের পুণ্যময় প্রাচীন আদর্শগুলি কিরূপ কর্দ্দমাক্ত ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে—এই সমস্ত সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেশের ও দশের মনে ও প্রাণে প্রাচীন মহৎ আদর্শের জীর্ণস্মৃতি ও বিস্মৃতপ্রায় অধিকার উদ্বোধিত করিয়া, সমাজের জরা ও অবসাদ দূরীকরণ পূর্ব্বক তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উচ্চ উদ্দেশ্য ও আন্তরিক প্রয়াসই বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের জনয়িতা। বর্ত্তমান সমাজের ও তদন্তরে প্রবহমান ভাবলহরীর গতি কোন্ দিকে এবং তাহা আমাদের সমাজের স্বাস্থ্যের ও সফলতার উপযোগী কি না—ইহা বাহ্য ও মনো-জগতে নানা প্রকার নূতন পুরাতন, পরিচিত অপরিচিত ঘটনাবলীর সাহায্যে প্রাণস্পর্শিরূপে আলোচনা করিবার সাধু চেষ্টাতেই বাস্তব সাহিত্যের জন্ম। আধুনিক বিলাস-প্রপীড়িত, ইহকাল-সর্ব্বস্ব প্রকৃতিপরায়ণ জীর্ণ অথচ অতৃপ্ত এই ভোগের বিক্ষুব্ধ সমাজকে সুসংস্কৃত করিয়া, সেই সুখের ও শান্তির উপেক্ষিত উচ্চ আদর্শের পূর্ণ পরিতৃপ্ত নিবৃত্তিপরায়ণ সমাজে পরিণত করিবার পক্ষে বাস্তবিকতার উপযোগিতা এক-রূপ স্বতঃসিদ্ধ।

ইহকালের লোভনীয় নশ্বর সুখ সম্পদে নির্লিপ্ততা, পরলোকে প্রবল বিশ্বাস, স্বর্গের আশা, নরকের ভয়, পাপে ঘৃণা, কিন্তু পাপীর প্রতি সহানুভূতি, উচ্চ জীবনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, একনিষ্ঠা উগ্রসাধনা—এ সকল না থাকিলে সৃষ্টির ললামভূত মানুষ পশু হইয়া পড়ে, ভোগসর্ব্বস্ব ঘৃণ্য শূকরের, উদরসর্ব্বস্ব ক্ষুদ্র মর্কটের স্তরে নামিয়া আসে—একথা বুঝিবার ও বুঝাইবার আবশ্যকতা স্বীকার করিলে বাস্তব সাহিত্যের বিশাল শক্তি ও উপকারিতা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমাজের মঙ্গলের জন্য মানবিকতার সম্যক্ পরিপুষ্টির পক্ষে মর্ম্মর-কঠিন নৈতিক প্রবচনের উপযোগিতা একদিন ছিল; কিন্তু সেদিন আর নাই। কালের আবর্ত্তনে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে, এপ্রকার এই উৎকট অতিবর্দ্ধিত জড়বাদের দিনে নৈতিক প্রবচন একেবারেই ব্যর্থ। আজকাল ব্রহ্মচর্য্য নাই, চরিত্র গঠন নাই, সেবাব্রত নাই; কাযেই নৈতিক

প্রবচনে সামাজিক বা পারিবারিক কোন মঙ্গলই সাধিত হয় না; লাভের মধ্যে চীৎকারই সার হয়। ধর্ম্ম বা নীতির দোহাই লোকে আর সহজে মানিতে চাহে না। Moral Text-book এর যুগ যে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহা বোধ হয় এক-রূপ সর্ব্ববাদী-সম্মত। সুতরাং যাহারা ভাবপ্রবণ এবং অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, দুইদিক না দেখিয়া গতানুগতিক ভাবের বশে, নীতি বা রুচির অনুরোধে সাহিত্যে বাস্তবিকতার বিরোধী, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মশীলতা, বিলাস ব্যসন, দুর্ব্বলতা ক্ষুদ্রতা ও সামান্যতার কাহিনী জানিতে ও শুনিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের সেই মত বিরোধে কোনরূপ সরলতার অভাব না থাকিলেও, তাঁহাদের উন্নত ও পবিত্র হৃদয়ের শুভ্র চিন্তা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল হইলেও, তাঁহারা সমাজের আসুরিক অনাচার ও কদাচার, বাদ-বিতণ্ডা ও পাপ অভিনয় লোকচক্ষুর অগোচরে রাখিবার অসঙ্গত প্রয়াসে, সমাজের গঠন ও চিন্তা প্রণালী, শিক্ষা, পরীক্ষা ও কর্ম্মপ্রবাহ, হীনতা ও দীনতা, আসক্তি ও আগ্রহ এবং বিলাস ও স্বার্থ-পরতার প্রেতচিত্র গোপন করিবার উৎকট চেষ্টায় অজ্ঞাতে দেশের ও দশের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছেন। তুলনায় সমালোচনার বিরোধী হইয়া প্রাচীন পুণ্য আদর্শের ক্ষীণ ও অস্ফুট স্মৃতিকে আরও ক্ষীণতর ও অস্ফুটতর করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহারা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছেন যে যাহা সত্য, তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহার স্পষ্ট আলোচনার দ্বারা সুফলেরই আশা করা যায়। সাহিত্যের একমাত্র নিপুণ বস্তুতন্ত্রতা দ্বারা ভারতের প্রাচীন আদর্শের মলিন স্মৃতির উপর আঘাত করা ভিন্ন আমাদের লুপ্তপ্রায় আত্ম-বোধ ও শাস্ত্রগত শিক্ষা দীক্ষার প্রতি মমত্ব জ্ঞান উদ্বোধনের, আমাদের জাতীয় মনন শক্তিকে সচেতন ও সচেষ্ট করিবার, এবং সমাজ শক্তির শৈথিল্য অপনয়নের জন্য কোন সহজ সাহিত্যিক উপায় দেখা যায় না। দৃঢ়তার সহিত, অসঙ্কোচে মোহন মিথ্যার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া নির্ম্মম কঠোরতার সহিত ব্যবহারিক জগতের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে, কত ছোট ছোট বিষয় লইয়া মানুষ অশান্ত হইয়া পড়ে, মাটীর মানুষ কতটা পশু কতটা শয়তান এবং কতটা দেবধর্ম্মী তাহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাবলীর সাহায্যে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারিলে, জীবনের তমঃ অপসারিত হইয়া যাইবে। তখন সত্যের আলোকে আমরা নিজেকে ও সমাজকে ঠিক বুঝিতে পারিব এবং যত অধিক পরিমাণে বুঝিব ও চিনিব ততই আমাদের দুঃখ ক্লেশের লাঘব এবং উন্নতির চেষ্টা সফল হইবে। আর্টের হিসাবেও আলোচ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ স্বীকার করা অনিবার্য্য। হৃদয়-বৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করিতে পারাই, হৃদয়ের অন্তঃপুরে রস সঞ্চার করাই যদি সাহিত্যের—অন্ততঃ কথা-সাহিত্যের—আর্টের চরম পরিণতি হয়, তাহা হইলে বাস্তব সাহিত্যকে উপেক্ষা করা চলে না। মানব প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য আর্ট নিতান্তই আবশ্যক। অস্বীকার করি না যে ইহা অন্ন নয়, বস্ত্র নয়; কাযেই নিতান্ত প্রত্যক্ষ ভাবে স্থূল মানব জীবনে ইহার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আহার্য্য পরিধেয়ের অভাব মিটিয়া গেলেই মানুষ ইহার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে। তখন আর আর্ট না হইলে মানুষের চলিবার যো নাই। নিরবচ্ছিন্ন পশুত্বের গণ্ডী পার হইলেই, মানবজীবনের পক্ষে আর্ট জিনিষটা অন্নবস্ত্রেরই মত একান্ত আবশ্যক ব্যাপার হইয়া পড়ে। অপূর্ব্ব রূপ রসের সৃষ্টি করিয়া ক্ষুদ্র মানব জীবনকে উচ্চ প্রকৃতিতে পরিণত করাতেই আর্টের চরম সার্থকতা। কলা-জ্ঞান, সৌন্দর্য্যের সম্যক্ উপলব্ধি যদি উচ্চ মানবতার অঙ্গ হয়, তাহা হইলে মানবজীবনের সেই চির-পরিচিত অথচ চির-নূতন বৃন্দাবনলীলা অগ্রাহ্য করা চলে না—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে প্রেমার্ত্ত না হইলে—স্বামিস্ত্রীর ভাবে না মজিলে—নায়ক নায়িকার ভাবে না উদ্দীপিত হইলে—সৌন্দর্য্যের পূর্ণ উপলব্ধি একরূপ অসম্ভব।

আমরা হিন্দু, আমাদের এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের আদর্শ মানবরূপী প্রেমিক দেবতা সরস তরুণ হৃদয়ের সহজ অনুরাগের প্রথম স্ফুর্ত্তিতে প্রেমোন্মাদনার প্রেরণায় দোললীলা করিয়াছিলেন।

একটা পুরাতন পরাধীন জাতি একটা বলবীর্য্যশালী স্বাধীন জাতির সংস্পর্শে আসিলে তাহার ভাব ও চিন্তা—এক কথায় সভ্যতার প্রভাব—হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না; প্রত্যুত অভিভূত হইয়া পড়ে এবং অনুকরণ করিতে বাধ্য হয়। কাযেই যেদিন ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতা আসিয়াছে, প্রায় সেই দিনই বাঙ্গালায় অভিনব সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতায় ধীরে ধীরে উন্নতিশীল বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে একটা স্থায়ী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রথম পরিচয় "আলালের ঘরের দুলাল"-এ এবং পরে দীনবন্ধু ও বঙ্কিম বাবুর মনীষায় ইহার আত্মপ্রকাশ আরম্ভ। দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, আশা নৈরাশ্য, সাফল্য বৈফল্য অবলম্বনে ব্যক্তিগত ও সমাজগত প্রত্যক্ষীকৃত দোষগুণের সম্যক্ আলোচনা করিয়া তাঁহারা সামাজিক ব্যাধির নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মনের মধ্যে ঘা দিয়া সেই ব্যাধির আরোগ্য বিধান করিবার আকুল আগ্রহে ব্যস্ত হইয়া তাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ ও পাপ পুণ্যের, ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতার বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছিলেন।

বিদেশের আমদানী বলিয়া, প্রতীচ্যদেশের দোষগুণ, তরলতা ও প্রবলতা, ভাব ও ভক্তি, চিন্তা ও সাধনা বিজড়িত বলিয়া সাহিত্যের এই বিশেষ অঙ্গ যুগ যুগান্তরের সংস্কার-সুমণ্ডিত স্থিতিশীল মৌন শান্ত হিন্দুর উপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। ভারতীয় সাহিত্যের নিজস্ব প্রকৃতি—বিশ্বের অনুভূতি—ইহার অধীর ও চঞ্চল প্রকৃতিতে প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পায় নাই। কাযেই খাঁটী ভারতীয় ভাবের সহিত নব্য বঙ্গ-সমাজের চিন্তা ও সাধনায় মিলনোপযোগী একতা নাই, বরং বিরোধ যথেষ্টই আছে। "এই বিরোধ, এই গরমিল ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধীরবিকাশের অনিবার্য্য ফল মাত্র। এই হৃদয়ভরা বিলাস ব্যসনের, এই মধুর যাতনাময় ঐহিক কামনা বাসনা দ্বারা আত্যন্তিকভাবে পরিপুরিত জীবনযাত্রার পরিণতি কোথায় এবং কিরূপে হইবে, তাহা জাতীয়ভাবের বিশ্লেষণের সাহায্যে, বাস্তব ঘটনা পারম্পর্য্যের ব্যবচ্ছেদের দ্বারা, সমাজের কার্য্যকরী প্রেরণা শক্তির সমবায়ের আলোচনার আলোকে বুঝিতে হইবে। আলোচ্য সাহিত্যের সহায়তা ব্যতীত বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতিকে, ধর্ম্ম ও সমাজকে, চিনিয়া লওয়া, বা আমাদের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে কোন দেশীয় কতটা প্রভাব আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার অন্য কোন সহজ উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তব সাহিত্যে মর্ত্তবাসী নরনারীর প্রতিদিবসের স্থূলতার বাহুল্য থাকিলেও, ইহাতে সত্য শিব সুন্দরের নির্ম্মল চিত্র না থাকিলেও, ইহা সত্যের সমষ্টি এবং ইহাতে উপভোগের যোগ্য দ্রব্য সামগ্রী যথেষ্ট আছে। যিনি যাহাই বলুন, কুরুচির প্রচার বা কুনীতির প্রশ্রয় ইহার উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যের এই অঙ্গের একমাত্র উদ্দেশ্য পার্থিবতার দিক হইতে কাব্য সৌন্দর্য্যের সাহায্যে উচ্চ মানবিকতার উদ্দীপনা এবং সহজ ও সরল ভাবে মানবজীবনের একটা সুশৃঙ্খল মীমাংসা করা। প্রত্যক্ষবোধ্য ইন্দ্রিয়সেব্য বস্তু ইহার শেষ কথা নহে। ইহার শেষ ও সার কথা সত্য এবং আনন্দ।

যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে আধ্যাত্মিকতা-বিরহিত ধর্ম্মসম্পদ-শূন্য অথচ অপূর্ব্ব মধুরতাময় বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের বহুল প্রচারের সহিত আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের পাপ তাপ প্রভৃতি আসিয়া পড়িবে, লালসা ও চাঞ্চল্যের বেগ ও ব্যভিচার বাড়িয়া উঠিবে, তাঁহাদের সে আকুল আশঙ্কা ভিত্তিহীন ও একান্তই কাল্পনিক বলিয়া আমার মনে হয়। আমরা স্থিতিশীল প্রাচীন জাতি; আমাদের শান্তিপ্রিয় অচঞ্চল গতিহীন সমাজ বেশ আঁটাআঁটি, আমাদের পরিপুষ্ট ধর্ম্মসংস্কার আজও অক্ষুন্ন এবং 'ভাঙ্গন' সামলাইতে বেশ নিপুণ।

আমরা সাংসারিক বিফলতায় বিচলিত নহি। ব্যাস, বাল্মীকি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের পুণ্যস্মৃতি যতদিন আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে, ততদিন আমাদের কর্ম্মধারা, আমাদের জীবনযাত্রার প্রথা পদ্ধতি, আমাদের সমাজ সদাচার অনেকটা নিরাপদ। কিন্তু একথাও ঠিক যে মানুষ যতদিন পৃথিবীর মানুষ, নামের ভিখারী, স্বার্থের পূজারী, কামনার দাস, সৌন্দর্য্যের উপাসক থাকিবে, মানুষ যত দিন না পরিপূর্ণ দেবত্ব পায়, ততদিন মানুষ বিহ্বল সৌন্দর্য্যের প্রবল মাদকতার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। চিত্তের আরাম, চিন্তার বিরাম রূপটাই আগে মানুষের চোখে পড়ে, হৃদয়ের অন্তঃপুরে একটা সাড়া জাগাইয়া তুলে। রূপের প্রত্যেক ভঙ্গী, প্রত্যেক স্পন্দন, লাবণ্যের প্রতি উচ্ছ্বাস প্রতি-বারই নূতন করিয়া চোখের ভিতর দিয়া মরমের কাছে একটা বৃহৎ প্রীতির—প্রেমের রাজ্যের সংবাদ বহিয়া আনে এবং তাহার ফলে হৃদয়ের কূল উপকূল অপূর্ব্ব মধুরতায় ভরিয়া উঠে। কাযেই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সুর-বহুল বসন্তের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষার হাত হইতে মানুষের সহজে নিস্তার নাই। পৌরুষের অবতার রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুনকেও চিত্রাঙ্গদার পদতলে গাণ্ডীব রাখিয়া কর-যোড়ে কাতরভাবে প্রেমভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। চিত্রাঙ্গদার দেবতাবাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য সম্পদ তাঁহার অন্তরে সুপ্ত রূপতৃষ্ণা নিবিড় প্রণয়লিপ্সা ঘনাইয়া তুলিয়া ছিল। তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন বিশ্বের সমস্ত শোভা, সমস্ত সুষমা একাধারে পুষ্পিতা লতিকার মত অপূর্ব্ব যৌবনশ্রীমণ্ডিত সেই লীলাময়ী সুন্দরীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। এমত অবস্থায় এই কঠিন কার্য্যময় ঘটনা-রাজ্যের অভিশপ্ত মানবকে ঠিক করিয়া জানিতে হইলে, তাহার প্রতিদিনের জীবন ও বিশ্বাস, অনুরাগ ও অনুষ্ঠান সংসারের মৃত্তিকার কলঙ্কে কতটা কলঙ্কিত, তাহার হৃদয়কন্দরের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত "অথির" রসতরঙ্গ চরিতার্থতার জন্য কেন সামান্যতার দিকে, কেন মোটা বাসনার দিকে প্রবাহিত, সে তথ্য সে রহস্য বুঝিতে হইলে সাহিত্যের বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। পৌরুষগ্রাসী কোমল কল্পনাপ্রিয়তার একটা গৌরব থাকিলেও, মানুষকে সংসার হইতে ছিনাইয়া অলস স্বপ্নের রাজ্যে লইয়া যায় বলিয়া উহা স্বচ্ছন্দ ও সফল জীবনযাত্রার একটি বিশেষ অন্তরায়। সেকালে প্রাচীন সভ্যতার দিনে, খাঁটী ভারতীয় শিক্ষার যুগে, জীবন ছিল সেবায় ত্যাগে আত্মবলিতে—ভোগে নয় ভোজ্যে নয়। আর এখন, এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দিনে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ভোগসর্ব্বস্ব ও ত্যাগসর্ব্বস্ব এই দুই আত্মবিরোধী ভাবের ও সভ্যতার মিশ্রণে—জীবনটা কেবল অশন বসনে ও আদব কায়-দায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন জীবনের মূল্য শান্তি বা সান্ত্বনায় স্থানে বৈরাগ্যে নহে, বিশ্বের মঙ্গলে নহে, এখন ইহার সার্থকতা ও সফলতা আত্মতুষ্টি ও আত্মপুষ্টিতে, ধনদৌলতে ও বিলাস ব্যসনে এবং অসঙ্গত প্রত্যাশায়। কাযেই এখন তৃপ্তি আর মিলে না। শান্তি নাই, আছে কেবল আকুল অধীরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার। অবিমিশ্র ভোগে ব্যয়িত জীবনের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সকল কাযে সকল সময়ে শান্তি ও শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে একটা দারুণ অতৃপ্তি, একটা ঘোর অবসাদ মানুষের বুকের ভিতর রাতদিন অতি করুণ ও আর্ত্তস্বরে তীব্র হাহাকার করিতেছে। মানুষ লক্ষ্য হারাইয়া, দেবতার শুভ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ভোগের মধ্যে সুখের সন্ধান করিতেছে। সে এখন eats, drinks and makes love—নির্জ্জলা পশুধর্ম্মপালনেই ব্যস্ত। পরলোকের ভাবনা ভাবে না, ভগবানের চিন্তাকে মনে ঠাঁই দেয় না। অর্থোপার্জ্জনের উৎকট প্রেরণায়, স্থূল উপভোগ্যের প্রবল তাড়নায় জীবনের পূর্ণতার সন্ধান ত্যাগ করিয়া, মানবতার সরলতা মাধুর্য্য ও মহত্ত্বকে একরূপ দেশা-ন্তরিত করিয়া দিয়াছে। বিশ্বের পরম দেবতার চরণ-কমলে শান্তিলাভের প্রার্থনা ভুলিয়া গিয়া, ভোগের ভারে মানুষ বিলাসের পঙ্কে ডুবিয়া মরিতে বসিয়াছে। এ সকল নূতন কথা কিছুই নহে, এবং এই সকল নিত্য ঘটনা জানি না বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এরূপ স্থলে

প্রত্যেক চিন্তাশীল সমাজ-হিতৈষী সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য, এইরূপ ভাব-বিচ্যুত বিলাসময় অসহিষ্ণু জীবন-যাত্রার শেষ কোথায়, তাহা সার কথায় যথাযোগ্য চিত্রের দ্বারা, ভাব ও ভাষার সাহায্যে ঠিকঠাক দেখাইয়া দেওয়া, সকলের চোখ ফুটাইয়া দেওয়া।

বাস্তব-সাহিত্য বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই কঠিন কার্য্য হাতে লইয়াছে এবং নীতি বচন ছাড়িয়া দিয়া সরলভাবে খোলাখুলি মানব-জীবনের আলো ও ছায়া এবং আনুসঙ্গিক সংখ্যাতীত অকরুণ অসুন্দর অসম্পূর্ণতা চক্ষের উপর ধরিয়া দিয়া জন-সাধারণকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছে যে ভোগের অপেক্ষা ভাব বড়। ইহাতে নৈতিক বীরচরিত্র না থাকিতে পারে, ইহাতে সদসৎ সুনীতি কুনীতির তন্ন তন্ন বিচার না থাকিলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু যাহা সহজ ও স্বাভাবিক, যাহা মানব চরিত্রে ও মানবের দৈনন্দিন জীবনে আপনি প্রকৃতির বশে ফুটিয়া উঠে এবং ফুটিয়া উঠিয়া মানবের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেয় বা জ্ঞানের ও আনন্দের উত্তেজনা করে, ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে সে গুলি না থাকিলে চলে না। কথা-সাহিত্য কথনও বলে না, "পাপ করিও না; করিলে সাজা দিব।" কিন্তু পাপের, দুর্নীতির ফলাফল তাহাতে এরূপভাবে বর্ণিত হয় যে মানুষ বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, নিঃসংশয়ে তাহার উপলব্ধি হয় যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোন না কোন প্রকারে না করিয়া নিস্তার নাই। এইরূপে বাস্তব-সাহিত্য সৌন্দর্য্য-বোধের ভিতর দিয়া, মোটা আনন্দের উত্তেজনার ভিতর দিয়া, জ্ঞানের তৃপ্তিসাধন ও আমাদের মনন-বৃত্তির বিকাশের সহায়তা করে। ত্যাগ সংযম ও ইন্দ্রিয়জয়ই প্রকৃত মানবতা—জগৎ জোড়া প্রীতি ও করুণাই আমাদের পরম পুরুষার্থ—বস্তুমূল সমস্ত সাহিত্যের ভিতরেই এই মহতী শিক্ষা অবিরত ধ্বনিত হইতেছে। আবেশ-বিহ্বল বিলাস-প্রিয় তরল জীবনযাপনের বৈফল্য প্রদর্শন ও ইন্দ্রিয়-বিলাসের প্রতি বিজাতীয় বিরাগ উৎপাদন বাস্তব সাহিত্যের চরম ও পরম শিক্ষা এবং ইহাতেই বাস্তব সাহিত্যের অপূর্ব্ব গৌরব। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যদি কোন বাস্তব রচনায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্বথা নিন্দনীয় দৈহিক-বিলাসিতার বিষময় পরিণামের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র উহার কুৎসিত সাফল্য বর্ণিত হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোনরূপ মার্জ্জনা নাই।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

খলীফ আখ্যান

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে (৫৭০) অরব দেশের মক্কা নগরে হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার যখন চল্লিশ বৎসর বয়স তখন তিনি সর্ব্বশক্তিমানের প্রথম আদেশ পান। সেই আদেশ পাইয়া দেশে একেশ্বরবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। ৬২২ খৃঃ তিনি মক্কাবাসী জাতিদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তরে মদীনা নগরে পলাইয়া যান ও সেই স্থান হইতে ধর্ম্ম-প্রচার ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাকে মুসলমানেরা "হজরৎ মহম্মদ রসুল অল্লা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ৬৩২ খৃঃ যখন তিনি দেহরক্ষা করিলেন তখন ইস্‌লাম-ধর্ম্মরাজ্যের শৈশব, মুসলমানেরা হজরতের বাল্যবন্ধু হজরৎ অবুবকরকে প্রথম খলীফ বা রসুল অল্লার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিলেন। এই অবুবকর হজরৎ মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী আয়েশার পিতা। দুই বৎসর পরে অবুবকর দেহরক্ষা করিবার সময়ে হজরৎ ওমরকে খলীফ করিয়া যান। ওমরের সময়ে ইস্‌লাম

রাজ্য ইজিপ্ট ও পরশিয়া পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ওমর গুপ্ত-ঘাতকের ছুরিকাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে মুসলমানেরা ওস্‌মান্‌কে খলীফ নির্ব্বাচিত করিল। ওস্‌মান্‌ও ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ঘাতকের অসিতে প্রাণ হারাইলেন ও মুসলমানেরা হজরৎ মহম্মদের জামাতা হজরৎ অলীকে খলীফ নির্ব্বাচিত করিল। অলীও ৬৬০ খৃষ্টাব্দে ঘাতকের অসি-প্রহারে জীবন ত্যাগ করিলেন। এই প্রথম চারিজন খলীফ যদিও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন, কিন্তু ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা ব্যাত-উল-মাল (সাধারণ কোষাগার) হইতে সাধারণ লোকের খাই-খরচ ও বাৎসরিক দুইটি মাঝারি মূল্যের পোষাক ছাড়া আর কিছুই লইতেন না। ইহাদের পর খলীফেরা সম্রাটদের মত থাকিতেন। অরবী ও পার্সী সাহিত্যে এই চারিজন খলীফের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সকলগুলি সাধারণ বঙ্গপাঠকের তৃপ্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু কয়েকটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ।

এই সকল গল্প যখন সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তখন প্রত্যেক গল্পের সহিত তাহার বক্তার নাম লেখা হইয়াছে। বক্তা যদি স্বয়ং না দেখিয়া থাকেন, তবে যাহার কাছে শুনিয়াছেন, তাহার নাম লেখা হইয়াছে। এই শ্রোতাও যদি অন্যলোকের কাছে শুনিয়া থাকেন, তবে তাহারও নাম থাকে। যে গল্পের বক্তা বা শ্রোতার নামে বা স্বভাব চরিত্রে সন্দেহের কারণ থাকে, সে গল্প সন্দেহযুক্ত ধরা হয়।

হজরৎ অবুবকর সিদ্দীক
(প্রথম খলীফ—৬৩২-৬৩৪)

১। হজরৎ মহম্মদের দেহত্যাগের দিন মুসলমান-জনসাধারণ তাঁহার বাল্যবন্ধু হজরৎ অবুবকরকে খলীফ নির্ব্বাচিত করিলেন। এই অবুবকর হজরৎ মহম্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশার পিতা। নির্ব্বাচনের পরদিবস প্রাতে যখন দুইখানি মোটা চাদর লইয়া অবুবকর পথে যাইতেছিলেন, তখন প্রিয়বন্ধু ওমরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাদর ঘাড়ে করিয়া ভোর বেলা মুসলমানদের রাজা কোথায় চলিয়াছেন?"

আবু। কোথায় আর যাইব? নিত্যকর্ম্ম হাট বাজার করিতে চলিয়াছি।

ওমর। এখন তুমি মুসলমানদের রাজা। এখন এ সাংসারিক কায ছাড়িয়া দাও।

অবু। বটে? আমি খলীফা হইয়াছি বলিয়া আমার পরিবারবর্গকে অনাহারে শুকহিতে হইবে?

ওমর। কেন? ব্যাত-উল-মাল (সাধারণ কোষাগার) হইতে কি তোমার খরচের পয়সা পাইবে না?

অবু। ধর্ম্মের সেবা করিতে গিয়া কি বেতন লইতে হইবে?

ওমর। বেতন না লইলে চলিবে কেন? যে কার্য্যভার স্বীকার করিয়াছ, তাহা করিয়া ত ব্যবসা-বাণিজ্যের অবসর পাইবে না। সঞ্চিত ধন কত কাল খাইবে?

অবু। তাও ত বটে! আমি এভাবে কখন ভাবিয়া দেখি নাই। বেশ, চল একবার অবু-ওব্যাদার কাছে যাওয়া যাক। দেখি সে কি বলে, আর ব্যাত-উল-মালে কি আছে, তাহাও দেখিতে হইবে।

এই বলিয়া দুই বন্ধু ব্যাত-উল-মালের অধ্যক্ষ অবু-ওব্যাদার কাছে গিয়া সকল কথা বলিলেন। অবুবকর আপনার বেতন স্বরূপ ব্যাত-উল-মাল হইতে প্রত্যহ আধখানা ছাগীর মাংস, কিছু খেজুর ও বাৎসরিক দুইটি মাঝারি মূল্যের পোশাক লইতে স্বীকৃত হইলেন।

(বক্তা—অতা বিন সাইব)

২। হজরৎ অবুবকর মৃত্যুশয্যায় আপন কন্যা হজরতা আয়েশাকে বলিলেন, আমার মৃত্যুর পর, আমি যে উটের দুধ খাই, সেই উট, যে বড় বাটিতে আহার করি, সেই বাটি ও আমার গায়ের এই চাদর-খানা ওমরের কাছে পাঠাইয়া দিও। এই তিনটি দ্রব্য ব্যাত-উল-মালের। আমি খলীফ-রূপে ব্যবহার করিতাম। এইবার ওমর খলীফ হইলেন, তিনি ব্যবহার করিবেন।

(বক্তা—ইমাম হসন বিন অলী)

৩। হজরৎ অবুবকর মৃত্যুশয্যায় আপন কন্যা

হজরতা আয়েশাকে বলিলেন, আমি খলীফা হইয়া ব্যাত-উল-মালের এক পয়সা লই নাই। অবশ্য পেট ভরিয়া খাইয়াছি ও সাধারণের একটি হবশী গোলাম, একটি উট ও একখানি চাদর ব্যবহার করিয়াছি। এগুলি আমার মৃত্যুর পর নূতন খলীফ ওমরের কাছে পাঠাইয়া দিও।

(বক্তা—অবুবকর বিন হফ্‌স্‌)

৪। হজরৎ অবুবকর মৃত্যুশয্যায় আপন কন্যা হজরতা আয়েশাকে বলিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার পরণে যে কাপড় আছে, তাহাই পরাইয়া গোর দিও। বৃথা নূতন কাপড় নষ্ট করিও না। নূতন কাপড় মৃতকে না দিয়া কোন জীবিত দুঃখীকে দিলে কাযে লাগিবে।

(বক্তা—আয়েশা)

আমাকে নূতন কাপড় পরাইয়া গোর দিলে আমার সম্মান বাড়িবে না ও পুরাতন কাপড় পরাইয়া গোর দিলে সম্মানের লাঘব হইবে না।

(বক্তা—অবদুল্লা বিন অহমদ)

৫। লোকে কয়েকবার লক্ষ্য করিল, হজরৎ অবুবকর উটের পিঠে চড়িয়া ভ্রমণ-কালে তাঁহার চাবুক মাটিতে পড়িয়া গেলে, তিনি উট বসাইয়া, স্বয়ং নামিয়া সেটি তুলিয়া লইলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাদের আজ্ঞা করিলেন না কেন, আমরা তুলিয়া দিতাম। তিনি উত্তর করিলেন, স্বয়ং রসুলঅল্লা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, ক্ষমতা সত্ত্বে কাহারও উপকার লইও না।

৬। হজরৎ অবুবকর খলীফ হইয়া শাম (সিরিয়া Syria) দেশে সৈন্য পাঠাইলেন। সেনাপতি য়াজীদ-বিন-অবুসুফিয়ানকে উপদেশ দিলেন :—কোন স্ত্রীলোক, শিশু, অন্ধ বা খঞ্জকে আঘাত করিও না। যে গাছে ফল ফলিতেছে, তাহাকে কাটিও না; যাহাতে ফল ধরিবার আশা হইয়াছে, তাহা নষ্ট করিও না। কৃষি, ছাগল, উট নষ্ট করিও না। ক্ষুধার সময়ে খেজুরের ফল খাইতে পার; কিন্তু গাছ নষ্ট করিও না, গোড়া হইতে তুলিও না বা পোড়াইও না। ধন, রত্ন, বা খাদ্যদ্রব্য অন্যায় রূপে ব্যয় বা অপচয় করিও না; আবার, প্রয়োজন হইলে কৃপণতা করিও না।

৭। হজরৎ ওমর-বিন-খত্তাব, খলীফ হইবার পূর্ব্বে একটি অনাথা, বৃদ্ধা, অন্ধ ও খঞ্জ প্রতিবেশিনীর সেবা করিতেন। একদিন তাঁহার যাইতে একটু দেরী হইল। বৃদ্ধার কাছে গিয়া দেখিলেন, অন্য কোন লোক তাহার প্রয়োজনীয় কাযগুলি গুছাইয়া দিয়া গিয়াছে। এইরূপে প্রত্যহ তিনি অন্য লোকের সেবা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তিনি এই গুপ্ত সেবাকারীকে দেখিবার জন্য একদিন সেখানে সমস্ত দিন বসিয়া থাকিলেন। দেখিলেন, প্রত্যহ রাত্রিতে খলীফ অবুবকর আসিয়া বৃদ্ধার সেবা করিয়া থাকেন।

হজরৎ ওমর ফারূক বিন্ খত্তাব্

(দ্বিতীয় খলীফ—৬৩৪-৬৪৪)

১। হজরৎ ওমরের ইসলাম গ্রহণ। ওমর স্বয়ং বলিতেন যে, পূর্ব্বে তিনি হজরৎ মহম্মদকে ঘোর বিদ্বেষ ও ঘৃণা করিতেন। হজরৎকে তিনি বিধর্ম্মী, পৈত্রিক ধর্ম্মত্যাগী ইত্যাদি বলিতেন। সমাজে ওমরের যথেষ্ট সম্মান ছিল। তিনি যেমন ধনবান ও বলবান ছিলেন, সেইরূপ দীর্ঘকায় ও রাগী ছিলেন। একদিন তিনি হজরৎ মহম্মদের ধার্ম্মিক ও উপদেষ্টা নাম সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে যাইতেছিলেন। পথে একটি বনি জহরা (জহরা বংশীয়) পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইল। সে ওমরের উদ্ধত ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তরবারি হস্তে কোথায় চলিয়াছ ?" ওমর বলিলেন, "মহম্মদের ধৃষ্টতা আর সহ্য হয় না; সেই জন্য তাহাকে যমালয়ে পাঠাইতে যাইতেছি।" সে বলিল, "তোমার বড় সাহস দেখিতেছি। মহম্মদের ভক্তেরা দুর্ব্বল হইতে পারে; কিন্তু বনি-হাশিম (হাশিম বংশীয় অর্থাৎ যে বংশে হজরৎ মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন) ত দুর্ব্বল নহে। তাহারা কি তোমাকে ছাড়িয়া দিবে ?" ওমর উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "বড় যে মহম্মদের টান দেখিতেছি ? তুমিও ধর্ম্ম ত্যাগ

করিয়াছ নাকি ?" সে লোকটি ভয় পাইয়া বলিল, "আমার দোষ ত দেখিতেছ, কিন্তু তোমার আদুরে ভগিনী ও ভগিনীপতি যে মহম্মদের ভক্ত, সে সংবাদ রাখ কি ?" ওমর এই কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও মহম্মদের বাটী না গিয়া ভগিনীর বাটী চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ভগিনী যদি সত্য সত্যই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত। যখন তিনি ভগিনীর দ্বারে পহুঁছিলেন, তখন তাঁহার ভগিনী, ভগিনীপতি ও খত্তাব তিনজনে ঈশ্বরের পবিত্র বচন পাঠ করিতেছিলেন। সুর করিয়া পাঠের শব্দ ওমর বাহির হইতে শুনিতে পাইলেন। তাঁহার সাড়া পাইয়াই তাহারা পাঠ বন্ধ করিল। খত্তাব এক কোণে লুকাইলেন। ওমরের ভগিনী দ্বার খুলিয়া দিতেই, তিনি কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পড়া হইতেছিল ?" তাঁহার ভগিনীপতি বলিলেন, "আমরা গল্প করিতেছিলাম মাত্র।" ওমর এবার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই নাকি ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিস্ ?" তাঁহার ভগিনী ভয়ে নিরুত্তর রহিলেন; কিন্তু ভগিনীপতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমাদের ধর্ম্ম যখন অসত্য, তখন"......তাঁহার বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার গালে এক বিরাশী সিকার এমন চড় পড়িল যে, তিনি ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। ওমরের ভগিনী স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিতে পারিলেন না। তিনি স্বামীকে তুলিলেন ও রাগে বলিয়া ফেলিলেন—"তোমাদের ধর্ম্ম মিথ্যা, আমি সর্ব্ব সমক্ষে উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছি, একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ছাড়া আর ঈশ্বর নাই ও মহম্মদ তাঁহার রসুল। এই ধর্ম্মই সত্য ও পবিত্র ধর্ম্ম। সকলেরই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত।"

ওমর তাঁহার ভগিনীকে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার ভগিনীও ভাইকে বড় ভয় করিতেন। ওমর তাঁহার মুখে এরূপ উত্তর আশা করেন নাই। তিনি রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া, তাহাকে এমন ঠেলা দিলেন যে, তিনি পড়িয়া গেলেন ও কয়েকস্থানে কাটিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। রক্ত দেখিয়া ওমরের ক্রোধাগ্নিতে যেন জল পড়িল। তিনি স্থির হইয়া বিচার করিবার অবসর পাইলেন। তিনি যে রাগের মাথায় আদরের ছোট বোনটিকে এমন নির্দ্দয়ভাবে মারিলেন, তাহাতে অনুশোচনাও হইল। তিনি বলিলেন—"তোরা কি পড়িতেছিলি ? দে দেখি, আমিও পড়িয়া দেখি।"

মার খাইয়া তাঁহার ভগিনীর ভয় দূর হইয়াছিল; বলিলেন—"না দাদা, তা হয় না। সে পবিত্র বস্তু অপবিত্র অবস্থায় ছুঁতে পাবে না। যদি দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আগে স্নান করিয়া পবিত্র হও, অন্ততঃ বজু কর, পরে দেখাইব। অপবিত্র অবস্থায় আমাকে মারিয়া ফেলিলেও দিব না।"

ওমরের মন এখন কতক কোমল হইয়াছিল। তিনি আর রাগ করিতে পারিলেন না। ভগিনীর নির্দ্দেশমত বজু করিলেন। তাঁহার ভগিনী কোরাণশরীফের যে অংশ প্রকাশ হইয়াছিল, একখানি কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই কাগজখানি দিলেন। ওমর পড়িতে বসিয়া প্রথমেই "বিসমল্লা-উল-রহমান উল-রহীম" পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি সুন্দর! পরে একটি আয়ৎ পড়িতে না পড়িতে তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। কে বলিবে ঐ শব্দগুলির মধ্যে কি শক্তি লুক্কায়িত ছিল ? ওমর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন। কঠোর হৃদয়ের ঐ দোষ বা গুণ যে, তাহাতে কোন দাগ পড়ে না; কিন্তু একবার দাগ পড়িলে গভীর ক্ষত হয়। ওমর ভগিনী ও ভগিনীপতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"আমাকে তোমাদের রসুল অল্লার কাছে লইয়া চল, তিনি কি আমার মত মহাপাপীকে কৃপা করিবেন না ?" ওমরের ভগিনী ও ভগিনী-পতি প্রথমে ওমরের কথায় বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। ভাবিলেন—হয়ত তিনি বিদ্রূপ করিতেছেন। কিন্তু যখন বিশ্বাস করিলেন, তখন তাঁহাকে লইয়া রসুল আল্লার সভাতে চলিলেন।

হজরৎ মহম্মদের সভাতে সেদিন ওমরের কথা উঠিয়াছিল। হজরৎ বলিলেন, "আমি আল্লা তালার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছি যে, ওমরের মত একজন

ক্ষমতাপন্ন লোক আমাদের দলে প্রবেশ করুক, তাহা হইলে আমাদের পরিবার বৃদ্ধি হইবে।" এমন সময় দেখিলেন যে, ওমর আসিতেছেন। ওমরের বিদ্বেষ ও ঘৃণা, শারীরিক বল ও ক্রোধের বিষয় সকলেই জানিতেন। তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া সকলেই ভয় পাইলেন। হজরতের দলে তাঁহার সমবয়স্ক খুল্লতাত হমজা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ছিলেন; কিন্তু তিনিও ওমরের সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা কুটীর মধ্যে থাক, আমি দ্বার রক্ষা করিতেছি। আমার শরীরে প্রাণ থাকিতে উহাকে প্রবেশ করিতে দিব না।" সকলে দ্বার বন্ধ করিতে চাহিলেন; কিন্তু হজরৎ মহম্মদ স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যখন স্বয়ং অল্লা তালা আমাদের রক্ষক ও আশ্রয়স্থল, তখন ওমরের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসা ও অল্লাকে অবিশ্বাস ও অপমান করা একই কথা।" কিন্তু ভয়ে সকলের বুক দুরদুর করিতেছিল। ওমর কিন্তু নিকটে আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন, ও হজরতের পায়ে পড়িলেন। হজরৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কল্‌মা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। ওমর কলমা উচ্চারণ করিতেই সকলে আনন্দে তক্‌বীর ধ্বনি করিল। ইসলামের একজন বড় বলবান শত্রু ভগবদ্বচনে আকৃষ্ট হইয়া এমন মুসলমান হইলেন যে, হজরতের জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার স্থান মুসলমান-সমাজে দ্বিতীয় অর্থাৎ হজরৎ অবুবকরের পরই হইল। এই ওমর দ্বিতীয় খলীফ হইয়াছিলেন। তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইয়াই আপনার জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে জানাইয়া আসিলেন, "আমি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছি। আমার সম্মুখে ধর্ম্ম বা রসুলকে কেহ অপমান করিলে তাহাকে শাস্তি দিব। আমার বল পরীক্ষা করিবার সাধ যাহার হইয়া থাকে, সে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নরকে যাইতে পারে।"

ওমর

১। ওমরের বাটীতে একদিন কয়েকটি বন্ধু একত্র হইয়া কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন। একজন বলিলেন "ঐ দেখ! অমীর উল মওমনীনের বাঁদী কি হীনবেশে চলিয়াছে।" ওমর বলিলেন "ও অমীর-উল-মওমনীনের বাঁদী নহে, ওমর বিন খওয়াবের বাঁদী। আমার যেমন অবস্থা, আমি সেইরূপ বাঁদীকে পোষাক দিয়াছি। আমি ব্যাত-উল-মাল হইতে বাৎসরিক দুইটি মাঝারি রকম পরিচ্ছদ ও আমার পরিবারবর্গের আহারীয় পাই। আমি ইহা ছাড়া আর কিছুই পাইও না, লইও না।

২। ওমর বিদেশের আমিল (শাসন-কর্ত্তা) নিযুক্ত করিবার সময়ে উপদেশ দিতেন—আমিল ঘোড়ায় চড়িবে না, ভাল খাদ্য খাইবে না, সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করিবে না, অতিথি ভিক্ষুকের জন্য দ্বার অবারিত রাখিবে; এরূপ না করিলে শাস্তি পাইবে।

৩। ওমর খলীফের আসনে বসিবার পর প্রথম যখন নমাজ করিতে গেলেন, ঈশ্বরের কাছে তিনটি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। (১) আমার কঠোর মন কোমল কর (২) দুর্ব্বলতা দূর কর এবং (৩) কৃপণতা দূর কর।

৪। ওমরের সাংসারিক প্রয়োজন হইলে ব্যাত-উল-মাল হইতে ধার লইতেন। কোষরক্ষককে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রতিজ্ঞা-মত শোধ না করিতে পারিলে যেন জোর করিয়া আদায় করা হয়।

৫। একবার অনাবৃষ্টির সময় খাদ্যাভাব হইলে ওমর মাংস ও ঘৃত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যে দ্রব্য সাধারণ মুসলমানে খাইতে পাইতেছে না, তাহা আমি খলীফা হইয়া কিরূপে খাইব?

৬। ওমর একবার তাজা মাছ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে একজন উট সওয়ার দূর হইতে মাছ আনিল। তিনি উটের কাণের কাছে ঘাম দেখিয়া বলিলেন—"আমার রসনা তৃপ্তি করিতে সাধারণের উটের এত কষ্ট হইল, আমি অদ্যাবধি আর তাজা মাছ খাইব না।"

৭। কতাদা নামক ব্যক্তি বলেন—আমি একদিন (ওমরের খলীফের সময়ে) দেখিলাম, তিনি একটি উটের লোমের কম্বলের জামা গায়ে দিয়া নগরে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছেন। তাঁহার জামাও স্থানে স্থানে ছেঁড়া, চামড়ার তালি বসান। তিনি পথ হাঁটিবার সময়ে ছোহারা খাইতেছিলেন ও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী ঢুকিয়া তাহাদের কাষ করিয়া দিতেছিলেন।

৮। অন্‌স বলেন, আমি ওমরকে খলীফা অবস্থায় তালি-দেওয়া জামা পরিতে দেখিয়াছি।

৯। ওসমান নহদী বলেন, আমি খলীফা অবস্থায় ওমরকে তালি দেওয়া জামা পরিতে দেখিয়াছি।

১০। আবদুল্লা বিন আমর বলেন, আমি ওমরের সহিত (যখন তিনি খলীফ) হজ করিতে গিয়াছিলাম। মক্কা পহুছিয়া ওমর সামান্য যাত্রীর মত এক খানা চাদর খাটাইয়া তাহারই তলে বাস করিতেন।

১১। অবদুল্লা-বিন-অমর বলেন, একদিন দেখিলাম খলীফ ওমর এক মশ্‌ক (চামড়ার থলিয়া) জল ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছেন। আমি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে অমীর উল (১) মওমনীন, এ কি ?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার কিছু অহঙ্কার হইয়াছে, তাই তাহাকে দমন করিতেছি।"

১২। ওমর বদরাগী ছিলেন, কিন্তু যতই রাগ হউক না কেন, কোরাণ শরীফ শুনিলেই তাঁহার রাগ পড়িয়া যাইত। একদিন বলাল (২) অস্‌লম্‌কে ওমর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। অস্‌লম্‌ ওমরের অধীন এক জন প্রধান কর্ম্মচারী। অস্‌লম্‌ বলিলেন, ওমর বেশ লোক বটে ; কিন্তু যখন রাগেন, তখন ভয় করে। বলাল বলিলেন, ওমরকে রাগান্বিত দেখিলেই কোরাণ শরীফের একটা আয়ৎ (৩) শুনাইয়া দিবে, তাঁহার আর রাগ থাকিবে না।

১৩। একবার ওমর পীড়িত হইয়া পড়েন। বৈদ্যেরা মধু খাইতে বলিল। মধু সে সময়ে হাটে দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু ব্যাত-উল-মালে ছিল। ওমর সাধারণের সম্পত্তি খাইতে স্বীকৃত হইলেন না ; পরে মুসলমান-প্রধানেরা মিলিয়া অনুরোধ করাতে খাইলেন।

১৪। ওমর খলীফ্‌ হইবার পর বহুকাল ব্যাত-উল-মাল হইতে কিছুই লইতেন না। আপনার পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধনে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। যখন ধন কমিয়া আসিল, তখন মুসলমান-প্রধানদের সভাতে এক-দিন বলিলেন, "আমাকে খলীফার সকল কায করিতে হয় বলিয়া ব্যবসা করিবার অবসর পাই না, আমার সঞ্চিত ধনও শেষপ্রায়, এখন আমার কিছু বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দাও। সভাতে হজরৎ অলী (রসুল আল্লার জামাতা) বলিলেন, "তুমি ব্যাত-উল-মাল হইতে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে।" ওমর জীবনে ইহা অপেক্ষা বেশী গ্রহণ করেন নাই। কোন কোন বক্তা মতে তিনি প্রতি বৎসর দুটি সাধারণ পরিচ্ছদও পাইতেন।

১৫। ওমর একবার আপনার সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বাদশা কিম্বা খলীফা ? সলমান বলিলেন, আপনি যদি আপনার মুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে ধর্ম্মসঙ্গত কর অপেক্ষা এক পয়সাও বেশী লইয়া অপব্যয় করেন, তবে আপনি বাদশা, আর যদি কেবলমাত্র ধর্ম্মসঙ্গত কর লইয়া ধর্ম্মসঙ্গত ব্যয় করেন, তবে আপনি খলীফা।

হজরৎ অলীর উপদেশ।

একবার কতকগুলি লোক হজরৎ অলীর কাছে গিয়া বলিল, আমাদের কিছু উপদেশ করুন। অলী বলিলেন—

১। পাপ ব্যতিরেকে আর কোনও দ্রব্যকে ভয় করিও না।

২। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কাহারও কাছে আশা করিও না।

৩। যাহা জান না, তাহা স্বীকার করিতে বা শিক্ষা করিতে লজ্জিত হইও না।

(১) অমীর-উল-মওমনীন = ধার্ম্মিকদের অমীর বা রাজা।

(২) বলাল—হজরৎ মহম্মদের প্রিয়পাত্র, তাঁহার সময়ে অজান্‌ দিতেন। অজান্‌—নমাজের পূর্ব্বে উপাসকদের আহ্বান করিতে উচ্চস্বরে যাহা বলা হয়।

৩। আয়ৎ = কোরাণের এক এক পূর্ণপদ।

৪। সত্যগুণ ও ধর্ম্মে যে সম্বন্ধ, মানুষের মাথা ও শরীরে সেই সম্বন্ধ। যেমন মাথা না থাকিলে শরীর থাকিতে পারে না, সেইরূপ সত্যগুণ না থাকিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

৫। যে ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাস না হারায়, সে প্রকৃত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান।

৬। উপাসনার ভাষার অর্থ উপাসক না বুঝিতে পারিলে ঈশ্বরও বুঝিতে পারেন না। অর্থাৎ তাহার ফল হয় না।

৭। যে পাঠে পাঠককে চিন্তা ও বিবেচনা করিতে হয় না, তাহা পাঠই নহে।

নওশেরবাঁ আদিল্

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইরাণের সম্রাট্ নওশেরবাঁ যেমন দাতা, সেইরূপ ন্যায়বান ছিলেন। সেই জন্য লোকে তাঁহাকে "আদিল" অর্থাৎ "নিরপেক্ষ বিচারক" বলিত। একবার তিনি মন্ত্রিদলের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে বায়ু সেবনার্থে যাইতেছিলেন। দেখিলেন, এক বৃদ্ধ কৃষক একটি জলপাই বৃক্ষ রোপণ করিতেছে। তিনি কৃষককে গ্রাম্য মূর্খ ভাবিয়া বলিলেন, "রে মূর্খ কৃষক! তুই কি জানিস্ না, জলপাই বহুকাল পরে ফলদান করে? তুই কি এই বয়সে বৃক্ষরোপণ করিয়া তাহার ফল খাইবার আশা করিস্?" বৃদ্ধ বলিল, "না মহারাজ, পরের রোপিত বৃক্ষের ফল আমি খাইয়াছি, আমি সেই ঋণ শোধ করিলাম, আমার রোপিত বৃক্ষের ফল পরে খাইবে।"

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সঙ্গী কোষাধ্যক্ষকে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার আদেশ ছিল—ঐরূপ ইঙ্গিত করিলেই চারি সহস্র দিরম্ দিবে। কোষাধ্যক্ষ দিরম্ দিলেন। বৃদ্ধ কৃষক টাকা পাইয়া বলিল, "দেখিলেন মহারাজ! আমার রোপিত বৃক্ষ কত শীঘ্র ফলদান করিল!" রাজা এই উত্তরে তুষ্ট হইয়া আবার ইঙ্গিত করিলেন। কোষাধ্যক্ষ ইঙ্গিত-মত আবার চারি সহস্র দিরম্ দিলেন। দ্বিতীয়বার ধন লাভ করিয়া কৃষক বলিল, "দেখিলেন মহারাজ! অন্যের রোপিত বৃক্ষ বৎসরান্তে একবার ফলদান করে, কিন্তু আমার রোপিত বৃক্ষ এক মুহূর্ত্তে দুইবার ফলদান করিল।" রাজা আবার তুষ্ট হইয়া কোষাধ্যক্ষকে ইঙ্গিত করিলেন ও প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রী, এইবার চল পালাই; নতুবা যাহাকে গ্রাম্য মূর্খ ভাবিয়াছিলাম, সেই বাক্পটু বৃদ্ধ আমার রাজকোষ শূন্য করিয়া দিবে।"

হজরৎ অলী মুরতজা

[হজরৎ মহম্মদের খুল্লতাত-পুত্র, শিষ্য ও জামাতা হজরৎ অলী মুরতজা, হজরৎ মহম্মদের সাঙ্গোপাঙ্গ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান ছিলেন। তাঁহার উক্তিগুলি প্রবাদ-বচন ও উপদেশের মত অরব দেশে সম্মানিত ও প্রচলিত]

১। হে প্রিয়, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ কর, নতুবা তোমার পতিত ও হীন অবস্থাতেই তুষ্ট থাক। কেননা আমি কখনও অলস ও দীর্ঘসূত্রীকে জীবনে সফলকাম অথবা দুর্ভাগ্য হইতে সৌভাগ্যবান হইতে দেখি নাই।

২। সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ দুই কথায় বলা যাইতে পারে। সংক্ষিপ্ততাই বাক্যের সৌন্দর্য্য। কথাগুলি এই :—অল্প করিয়া আহার করিবে ও আহারের পর অত্যাচার করিও না। আহার উত্তম পরিপাক হইলে স্বাস্থ্য উত্তম থাকে।

৩। জগতে সম্মান চেষ্টা-সাপেক্ষ। অতএব যদি সম্মান চাও, তবে রাত্রি জাগরণ করিয়া (অর্থাৎ আলস্য ত্যাগ করিয়া) চেষ্টা কর। মুক্তা অন্বেষণকারীকে গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া অন্বেষণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি সম্মান চাহে, কিন্তু কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে না,—মুক্তা চাহে, কিন্তু সমুদ্রে ডুবিতে চাহে না, তাহার জীবন নিষ্ফল কামনায় অতিবাহিত হয়।

৪। যে যেরূপ চেষ্টা করে, সে সেইরূপ ফল পায়; অতএব যদি উৎকৃষ্ট ফল আশা কর, তবে রাত্রিজাগরণ করিয়া (আলস্য ত্যাগ করিয়া) চেষ্টা কর।

৫। ছয়টি জিনিষের অভাব বিদ্যালাভের ব্যাঘাত—বুদ্ধি, ইচ্ছা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা, গুরু উপদেশ ও সময়।

৬। স্বচেষ্টার অর্জ্জিত সম্মানের সম্মুখে কেবল কুলগৌরব সম্মানের মধ্যে গণনীয় নহে।

৭। সম্মানহীন ধন, ধনই নহে। (অর্থাৎ অসৎ উপায় দ্বারা অর্জ্জিত ধন দ্বারা ধনবান ব্যক্তিকে লোকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এরূপ ধন থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল।)

৮। ঈশ্বরের অনেক দয়া বুদ্ধিমানেরাও প্রথমে দয়া বলিয়া বুঝিতে পারে না।

৯। ঈশ্বরের অনেক দয়াতে লোকে প্রথম জীবনে কষ্ট পায়, কিন্তু শেষ জীবনে শান্তিলাভ করে।

১০। যদি কখনও বিপদে পড়, তখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইও না; ভরসা করিও, তোমার আশা পূর্ণ হইবে।

ইমাম্ ইদ্‌রীস্ শাফঈ

[মুসলমানদের চারিটি প্রধান শ্রেণী আছে। এই মহাত্মা একশ্রেণীর স্মৃতিশাস্ত্র-উদ্ভাবক।]

উক্তি—১। যদি বিদ্যালাভ করিতে চাও, তবে প্রথমে পাপ ত্যাগ কর; কেন না, বিদ্যা ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি; পবিত্র জ্যোতি পাপীর প্রাপ্য নহে।

২। পরিশ্রম না করিয়া তার্কিক, বিদ্বান বা ধনবান হইবার ইচ্ছা এক প্রকার উন্মাদের লক্ষণ মাত্র।

অরব দেশীয় প্রবাদ-বচন।

১। যাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবে না। না হইবার কারণ আপনিই জুটিয়া যাইবে। যাহা হইবার, তাহা যথা সময়ে অবশ্যই হইবে।

২। কোন নূতন লোকের সহিত পরিচয় হইলে, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া, তাহার বন্ধু ও সঙ্গীদের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন কর। যদি তাহারা (অর্থাৎ বন্ধু ও সঙ্গীরা) মন্দ হয়, তবে সে লোকের সঙ্গ ত্যাগ কর; কিন্তু যদি তাহারা ভাল হয়, তবে সঙ্গ কর, তুমি উপকৃত হইবে।

৩। অলসের সঙ্গ ত্যাগ কর। অনেক ভাললোক সঙ্গদোষে নষ্ট হয়। সৎ ও অসতের সঙ্গ-ফলে, সৎ অনায়াসে অসৎ হয়; কিন্তু অসৎ অতি কষ্টে সৎ হয়। ক্ষমতাবান হীনপ্রভ হইয়া যায়, যেমন ছাই গাদাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রাখিলে অগ্নির দাহিকা শক্তি লোপ পায়; কিন্তু ছাই পরিবর্ত্তিত হয় না।

৪। বিদ্বানের বিদ্যা অহঙ্কারে চাপা পড়িলে প্রকাশিত হয় না; সেইরূপ মূর্খের মূর্খতা বিনয় ও সদালাপে চাপা পড়িলে লোকে দেখিতে পায় না।

৫। স্বয়ংকাল (মৃত্যু)ই জীবনের রক্ষক। (অর্থাৎ কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মানুষ মরে না। ঠিক সময়ে মৃত্যু তাহাকে গ্রহণ করিবে বলিয়া সেই সময়ের পূর্ব্বে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে।)

৬। বিদ্যা উপার্জ্জন করা কষ্টকর; কিন্তু বিদ্যার অভাব হীনতা ও অন্ধকার। অতএব সহ্য ও কষ্ট করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন কর, কষ্টের অবসানে হীনতা ও অন্ধকার দূর হইয়া সম্মান ও আলোক পাইবে।

৭। নিষ্প্রয়োজনে পাঁচজন একত্র হইলে প্রায়ই গ্রাম্য কথা কওয়া হয়। অতএব এরূপ সঙ্গ ত্যাগ কর। কেবল জ্ঞান লাভ করিতে বা নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশে লোকের সঙ্গ করিবে।

৮। অবস্থা-বিশেষে আমার জ্ঞান (বা গুণ)ই আমার উৎকণ্ঠার কারণ হয়। অজ্ঞান থাকিলে বুঝিতাম না, চিন্তিতও হইতাম না। কর্কশ-শব্দকারী দাঁড়কাক চির স্বাধীন, কিন্তু উন্মাদকর ঝঙ্কারকারী বুলবুল তাহার গুণের জন্য মনুষ্যের বন্দী।

৯। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, বৃদ্ধাবস্থায় তুমি যুবকের মত স্বাস্থ্য ও ক্ষমতালাভ করিতে পার? তোমার যদি সে বিশ্বাস থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও যে, তোমার পাপ কাম তোমাকে কুপথে লইয়া গিয়াছে। স্মরণ রাখিও, কাপড় একবার পচিলে আর নূতনের মত কখনই হয় না।

১০। মুখে ভাই ভাই বলিলেই ভাই হয় না। আমার অনুপস্থিত অবস্থাতেও আমাকে যে ভাই বলিয়া বিবেচনা

করে, আমি বিপদে পড়িলে যে আমার সাহায্য করে ও যে বিপদে পড়িলে আমি সাহায্য করিয়া থাকি, সেই কেবল আমার ভাই।

১১। কে তোমার ভাই? তুমি যাহার সাহায্য আশা কর ও যে তোমার সাহায্য আশা করে, যাহার শত্রু তোমার শত্রু ও তোমার শত্রু যাহার শত্রু, সেই তোমার ভাই।

১২। কথা বলিবার সময়ে পাঁচটি বিষয়ে সতর্ক থাকিবে—(১) কথার কারণ (অকারণে কিছু বলা উচিত নহে); (২) কাল বা সময় (কথা বলিবার সময় হইয়াছে কি না বিবেচনা করিবে); (৩) শব্দবিন্যাস (একই কথা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে কথিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ফল দান করে); (৪) সংক্ষিপ্ততা এবং (৫) স্থান (অর্থাৎ কথা বলিবার উপযুক্ত স্থান বা শুনিবার শ্রোতা আছে কি না)।

[স্মরণ রাখিতে হইবে অরববাসীরা স্বভাব-কবি ও বাগ্মী। ভারতে "মূর্খ, গর্দ্দভ" ইত্যাদি অপেক্ষা আরবে "তুমি বাগ্মী নও" বড় গালাগালি।]

১৩। যদি তোমার শত্রুকে পরাজিত করিতে চাও, তবে আপনাকে বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ করিবার চেষ্টা কর। তোমার শত্রু হিংসায় আরও দগ্ধ হইতে থাকিবে।

[এই বচনে অরববাসীর চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে]

১৪। ভবিতব্যতার সহিত যুদ্ধ করা নিষ্ফল। যে বলে যে, সে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে, সে বাতুল। কেননা, জগৎপালক পরমেশ্বর গর্ভ-মধ্যে ভ্রূণকেও প্রতিপালন করিতেছেন।

১৫। তুমি কি দেখ নাই যে, মনুষ্য যত দীর্ঘজীবন লাভ করে, নিজকৃত কর্ম্মসূত্রে জড়াইয়া ততই দুঃখ ভোগ করে। গুটিপোকার মত আপনার ঘর বাঁধিতে গিয়া আপনাকেই জড়াইয়া ফেলে।

১৬। প্রথমার্দ্ধ রাত্রি সুখে কাটিলে আনন্দিত হইও না; কারণ, শেষার্দ্ধেও দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। রাত্রি অবসান না হইলে মত স্থাপন করিও না। (অর্থাৎ জীবনের কতক অংশ সুখে কাটিলেই আপনাকে সুখী ভাবিও না, কারণ, শেষজীবনেও দুঃখ দেখা দিতে পারে।)

১৭। তোমার সত্যবন্ধুকেও গুপ্ত কথা বলিয়া বিশ্বাস করিও না। একথা সত্য যে, সত্যবন্ধুকে এরূপ গুপ্ত কথা বলায় দোষ নাই; কিন্তু সেরূপ সত্যবন্ধু কোথায়?

১৮। সত্যবন্ধু বলিয়া একটা শব্দ শুনিয়াছি মাত্র, কিন্তু কখনও দেখি নাই। বোধ হয় শব্দবিদ্ পণ্ডিতেরা একটা কাল্পনিক শব্দ গঠন করিয়া থাকিবেন।

১৯। লোকের সহিত মধ্যে মধ্যে আলাপ করা ভাল। অধিক ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘ বিরহের কারণ হয়। [অর্থাৎ বেশী ঘনিষ্ঠতায় ঝগড়া হইয়া বহুকাল মুখ-দেখা-দেখিও থাকে না। পার্সী প্রবাদ—প্রত্যহ আসিও না, তাহা হইলে প্রীতি দৃঢ় হইবে।]

২০। সংসারে নানাপ্রকার লোক দেখিলাম; কিন্তু ভদ্র বা বন্ধুবেশধারী শত্রু অপেক্ষা অসৎ লোক দেখিলাম না। নানাপ্রকার কটু দ্রব্য আস্বাদন করিলাম; কিন্তু ভিক্ষার্থে হস্ত-প্রসারণে যে কটুতা, তাহা অন্য কোন দ্রব্যে পাইলাম না।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

গিরিশচন্দ্র

অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইয়া গেল, হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক, দেশের ও দশের হিতে অক্লান্ত কর্ম্মী, বঙ্গজননীর সুসন্তান গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি অকালে দেহত্যাগ করেন। এক সময়ে তিনি দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের শীর্ষস্থানীয়, প্রজাসাধারণের মুখপাত্র, দেশপ্রাণতার অবতার, বঙ্গীয় রাজনীতিকের আদর্শ নেতা ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের অনেকে হয়ত গিরিশচন্দ্রের নিকট তাঁহার দেশবাসিগণ কি পরিমাণে ঋণী তাহা ঠিক জানেন না। গিরিশচন্দ্র যদি সংবাদপত্র পরিচালনে তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি ব্যয়িত না করিয়া, কোনও স্থায়ী রচনায় তাঁহার লেখনী নিয়োজিত করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতিভা জনসমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিজের খ্যাতি প্রতিষ্ঠার চিন্তায় তাঁহার কর্ম্মজীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট করেন নাই, তিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার দেশাত্মবোধের উদার প্রেরণায়, দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে, দেশের

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মঙ্গল সাধনে তাঁহার প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সে পক্ষে তিনি অসাধারণ সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। সুযশ আপনা হইতে আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। সে বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনস্বিবর্গ একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "A great Indian, but a Geographical mistake" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, যদি গিরিশচন্দ্র বঙ্গদেশে জন্ম-গ্রহণ না করিয়া কোনও স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সে দেশের প্রধানতম মন্ত্রীর পদগৌরব লাভ করিতে পারিতেন। স্যর হেন্‌রী কটন সাহেব সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "Had he (Grish Chunder) lived in India at any other time than the present, he would undoubtedly have attained the very highest rank." তাৎকালীন Daily News লিখিয়াছিলেন, দেশীয় প্রজাসাধারণের প্রতি গিরিশচন্দ্র যেরূপ সহানুভূতি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাদের হিতসাধনে তিনি যেরূপ তৎপর ছিলেন, তাহার তুলনা নাই।

গিরিশচন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্দ্ধ-শতাব্দীর গতিতে সে যুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের একটা পার্থক্য আসিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সময়ে ইংরাজ পুরুষেরা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন না, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিতেন না। সেই হেতু গিরিশচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট আফিসে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সংবাদপত্র পরিচালন করিতে—অধিকন্তু নির্ভীকভাবে রাজকর্ম্মচারী সম্প্রদায়ের ভ্রম ত্রুটী নির্দ্দেশ করিয়া স্বীয় স্বাধীনমত ব্যক্ত করিতে—পারিয়াছিলেন। নীলকর-দিগের অত্যাচারের, অযোধ্যা অধিকারের এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজ সম্প্রদায়ের দেশীয় বিদ্বেষ নীতির তিনি যেরূপ তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে কোনও দেশীয় রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে সেরূপ কার্য্য শুধু নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে, উহা দণ্ডবিধি আইনে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত। কিন্তু গিরিশ-চন্দ্র সেরূপ স্বাধীনভাবে লেখনী চালনা করিয়াও, তাঁহার উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বিদ্বেষভাজন না হইয়া তাঁহাদের নিকট আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতেন। তাঁহারা গিরিশচন্দ্রকে উৎসাহ দিতেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে সহানুভূতি দেখাইতেন—তাঁহাকে বন্ধু-ভাবে ভালবাসিতেন। সে পক্ষে গিরিশচন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগ তাঁহার কার্য্যের সহায়ক হইয়াছিল। পক্ষান্তরে সে যুগে তাঁহার দেশবাসী জন-সাধারণের মনে দেশাত্মবোধ সুপরিস্ফুট হয় নাই—তিনি বর্ত্তমান যুগে আবির্ভূত হইলে তাঁহার স্বদেশবাসিগণের নিকট তাঁহার কর্ম্মে যে পরিমাণ উৎসাহ ও সহযোগিতা পাইতেন, সে কালে তাহা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সে কারণে কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জীবনের কর্ম্ম যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। তিনি তাঁহার হৃদয়ের অদম্য উৎসাহে, দেশপ্রীতির অফুরন্ত আনন্দে, পর-হিতৈষণার প্রবল প্রবৃত্তিতে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র সকল দিক হইতে তাঁহার কার্য্যের অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র যে শুধু কালের সুযোগে তাঁহার সম-সাময়িক ইংরাজগণের নিকট দেশমাতৃকার হিতসাধনায় উৎসাহ পাইয়াছিলেন তাহা নহে। গিরিশচন্দ্রের সে বিষয়ে সাফল্যলাভের প্রধান কারণ কালমাহাত্ম্য নহে, তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র-মহিমা। গিরিশচন্দ্র নিজে সরল ও সহৃদয় ছিলেন—তাঁহার লেখনীমুখে সেই সারল্য ও সহৃদয়তা এরূপ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত যে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার কাহারও উপায় থাকিত না। তিনি কখনও অন্ধ স্বার্থনীতি অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষকে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিতেন না—তিনি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও লেখনীমুখে বিষ উদ্গিরণ করিতেন না। সেই হেতু তাঁহার বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ইংরাজ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণও তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপরিচিত এবং তাঁহার

অন্যতম প্রতিযোগী তাৎকালীন Indian Daily News পত্রের সম্পাদক James Wilson সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—

"It is no secret that we held him to be at the head of his contemporaries in the Anglo-Bengalee Press Many of them were content to advocate Sectional interests. He had wider sympathies and more noble aims, and we have often read his manly and trenchant articles with undisguised admiration. There was no pettishness or double-dealing in him and with more men of his stamp, we should not despair of the future of India. It has not been difficult for some time past to trace in the *Bengalee* the master hand conspicuous by its absence. There are many men left amongst his countrymen, who are far more pretentious, but we fear there are not many more able or more conscientious than Girish Chandra Ghose. He may well be deplored by his friends, for it will be long ere they find a successor to fill his place."

গিরিশচন্দ্রের উপরিতন রাজকর্ম্মচারী, French in India প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Colonel Malleson উত্তরপাড়া সাহিত্য সভার (Ooterpara Literary Club) একটি প্রকাশ্য অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে তিনি ইটালী, জার্ম্মনী প্রভৃতি পৃথিবীর বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অপেক্ষা স্বাধীনচেতা ও ন্যায়পরায়ণ লোক কোথাও দেখেন নাই।

এরূপ সাধুচরিত্র দেশহিতৈষীর জীবনকথা ও রচনাবলী যাহাতে বঙ্গদেশে সুপ্রচারিত হইয়া তাঁহার সমস্ত স্মৃতি চিরজাগরুক থাকে, সে বিষয়ে বঙ্গসন্তান মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। গিরিশচন্দ্রের বংশধর, বঙ্গসাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয় গিরিশচন্দ্রের জীবনচরিত ও তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত করিয়া, বঙ্গীয় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রকেই চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধিয়াছেন। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সেই পুস্তকদ্বয় পাঠ করা উচিত—গ্রন্থদ্বয় আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্থায়িভাবে আসন পাইবার যোগ্য। আমরা মন্মথবাবুর প্রকাশিত সেই অমূল্য গ্রন্থ হইতে দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্রের জীবনকথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১২৩৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই আষাঢ় (১৮২৯ খ্রীঃ ২৭শে জুন) গিরিশচন্দ্র এই কলিকাতা সহরেই জন্মগ্রহণ করেন। সতীদাহ নিবারণের আইন প্রবর্ত্তনের ও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য গিরিশচন্দ্রের জন্মের বর্ষ স্মরণীয়।

বংশ পরিচয়

তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জিলার মনসাপোতা গ্রামে। ঘোষ মহাশয়েরা সেই গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। তাঁহাদের জনৈক উত্তরপুরুষ রামদেব ঘোষ নদীয়া রাজার দেওয়ান ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পিতামহ কাশীনাথ ঘোষ কলিকাতায় সিমুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। তিনি যে সুবৃহৎ ভদ্রাসনবাটী নির্ম্মাণ করেন, তাহার কিয়দংশ বিডন ষ্ট্রীটের কুক্ষিগত হইয়াছে—অবশিষ্টাংশ ও তাঁহার নির্ম্মিত যোড়ামন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। বাটীর পার্শ্বস্থ কাশীনাথ ঘোষের লেন এখনও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

পিতামহ কাশীনাথ ঘোষ

কাশীনাথ ক্রোড়পতি স্বনামধন্য রামদুলাল সরকারের প্রতিবেশী ও অন্তরঙ্গ ছিলেন। তিনি রামদুলাল সরকারের অধীনে তাৎকালীন ফেয়লি ফাগুসন কোম্পানির আপিসে মুৎসুদ্দীর কর্ম্ম করিতেন এবং রামদুলালের মতই তিনি বদান্য, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সরল ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সততার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। একবার কাশীনাথ তাঁহার অধীনস্থ চারিজন কর্ম্মচারীর নামের সহিত নিজের নাম দিয়া, তাঁহাদের অজ্ঞাতে, নিজের অর্থে একখানি লটা-

রির টিকিট কিনিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। সে টাকা সমস্তই তিনি নিজে লইতে পারিতেন, কারণ তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা টিকিট কিনিবার টাকাও দেয় নাই এবং সে বিষয় কিছু জানিতও না। কাশীনাথ কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া, নিজে দশ হাজার টাকা মাত্র লয়েন। তিনি মুৎসুদ্দীর কর্ম্মে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং মুক্ত হস্তে তাহা পূজাপার্ব্বণে ব্যয় করিতেন। একবার রামদুলালের মনিববংশীয়, হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত অখাদ্যভোজন ও অনাচারের জন্য জাতিচ্যুত হয়েন। তাঁহাকে জাতিতে উঠাইবার জন্য প্রভুভক্ত উদারচিত্ত রামদুলাল দুইলক্ষ টাকা ব্যয় করেন—কাশীনাথও সেই উপলক্ষে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। শেষ দশায় কাশীনাথ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাঁহার পুত্রগণের জন্য কেবল তাঁহার প্রাসাদতুল্য ভদ্রাসনবাটীখানি রাখিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

কাশীনাথের ছয় পুত্র। গিরিশচন্দ্র কাশীনাথের দ্বিতীয় পুত্র রামধনের সন্তান। রামধন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ সহজাতবুদ্ধি ছিল এবং তিনি রহস্যপটু, সদালাপী ও সৌখীন ছিলেন। তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। বাটীতে কোনও ভদ্র লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সকলে তাঁহাকে রামধনের বৈঠকখানায় লইয়া যাইত। গিরিশচন্দ্রের মাতা, হাটখোলার বনিয়াদি দত্ত মহাশয়দের বাটীর কন্যা ছিলেন। তিনি আদর্শ গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার পিতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিহাস-রসিকতা ও অমায়িক স্বভাব এবং মাতার ধৈর্য্য, বিনয়, নম্রতা ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন।

পিতা রামধন

রামধনের তিন পুত্র—গিরিশ সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রচন্দ্র তাৎকালীন হিন্দুকলেজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি মিলিটারী অডিটার জেনারেল আফিসে চারিশত টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। মধ্যম শ্রীনাথও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন—তিনি উত্তরকালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেন, এবং কিছুদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিন ভ্রাতাই ইংরাজী রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাদিগকে Literary triumvirate (সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ) অভিধায় ভূষিত করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রচন্দ্র ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ছাত্রবয়সে বাগ্মিতার জন্য সতীর্থ সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। ক্ষেত্রচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় চণ্ডীদাস ঘোষ বহুদিন শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথ

ভ্রাতুষ্পুত্র ৺চণ্ডীদাস ঘোষ

রামধনের অগ্রজ হরিশচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া, পিতার ইচ্ছাক্রমে রামধন তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র গিরিশকে লালন পালনের জন্য অগ্রজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার পালক পিতা হরিশচন্দ্রকে পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন না, কিন্তু হরিশচন্দ্রের পত্নীকে 'বড় মা' বলিয়া ডাকিতেন। এই রূপে দুইজন মাতার স্নেহ লাভ করিয়া, বিশেষতঃ পালক পিতামাতার আদরে গিরিশচন্দ্রের শৈশব ও বাল্য সুখে স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইয়াছিল। দুই বর্ষ মাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীনাথ এবং খুল্লতাত পুত্র তিন বর্ষের বয়ঃকনিষ্ঠ দীননাথ গিরিশচন্দ্রের খেলার সাথী ছিলেন। উত্তরকালে দীননাথ বড়লাটের দপ্তরে আয় ব্যয় বিভাগের রেজিষ্ট্রারী কর্ম্মে সুনাম ও রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি বহুগুণবান্ স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের একজন অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন।

খুল্লতাতপুত্র রায় দীননাথ ঘোষ বাহাদুর

গিরিশচন্দ্র তাঁহার অগ্রজগণের সহিত শিক্ষাহিতৈষী স্বর্গীয় গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত ওরি-

রেণ্টাল সেমেনারীতে পাঠ করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেসরকারী স্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী তাৎকালীন গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত সুবিখ্যাত হিন্দু কলেজের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সাহিত্যরথী অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনীতিক কৃষ্ণদাস পাল, দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র সেই বিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করেন। ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফরাসী হার্মানি জেফ্রয় সাহেব হিন্দুকলেজের প্রথিতনামা অধ্যাপক কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসনের সামান্য প্রতিযোগী ছিলেন না। জেফ্রয় য়ুরোপীয় সাত আটটী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন এবং যদি তাঁহার পানদোষ না থাকিত, তাহা হইলে তিনিও তাঁহার সুনাম উজ্জ্বলতরভাবে স্থায়ী করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে ইংরাজি রচনা ও আবৃত্তি শিক্ষায় আন্তরিক সহায়তা করেন এবং তাঁহাকে বক্তৃতা দানে ও ইংরাজি কবিতা লিখিতে ছাত্র বয়সেই অভ্যস্ত করেন। গিরিশচন্দ্র অপর সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও, গণিতে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতেন না—দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন।

ছাত্রজীবন

ছাত্রবয়সেই গিরিশচন্দ্রের সংবাদপত্রে লিখিবার হাতে খড়ি হয়। তিনি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের ও সতীর্থগণের সংযোগে একখানি হস্তে লিখিত সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার সতীর্থ কৈলাসচন্দ্র বসু ঐ পত্রের সম্পাদক হয়েন এবং তাঁহার হস্তলিপি সুন্দর ছিল বলিয়া তিনিই সতীর্থগণের লিখিত সন্দর্ভাদি ঐ পত্রে নকল করিয়া বন্ধু-সমাজে প্রচার করিতেন। কৈলাসচন্দ্র পরবর্ত্তী কালে ইংরাজীতে একজন সুলেখক, বাগ্মী এবং বেথুন সোসাইটির সম্পাদক বলিয়া সাধারণ্যে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। কৈলাসচন্দ্রের সহিত গিরিশচন্দ্র আজীবন সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

হস্তে লিখিত সংবাদপত্র

সতীর্থ কৈলাসচন্দ্র বসু

সে সময়ের প্রচলিত প্রথামত, গিরিশচন্দ্রের পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নী ছিলেন কোন্নগরের যাবতীয় উন্নতি-বিধাতা জনহিতৈষী ও সাধুচরিত্র স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেবের কন্যা। গিরিশচন্দ্রের ইংরাজী রচনায় অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় পাইয়া, সে সময়ে গিরিশচন্দ্রের পিতার আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল জানিয়াও, শিবচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার নয় বর্ষ বয়স্কা কন্যা দান করেন। গিরিশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী উত্তরকালে অশেষ গুণবতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইয়া গিরিশচন্দ্রের সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেন। শিবচন্দ্র তৎকালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেন। তিনি গিরিশচন্দ্রের একজন হিতৈষী অভিভাবক হইয়া, সাংসারিক বহুবিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করেন। শিবচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্র—ধর্ম্ম বিষয়ে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের একজন নেতা হয়েন এবং জনহিতে জীবন উৎসর্গ করেন। কোন্নগরের স্কুল, রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট আফিস, রাস্তা, ঘাট, চিকিৎসালয়, সমস্তই শিবচন্দ্রের লোকহিতৈষণার অক্লান্ত উদ্যমের ফল।

শ্বশুর শিবচন্দ্র দেব

বিবাহের পরবৎসরেই গিরিশচন্দ্র সাংসারিক অভাবে বাধ্য হইয়া চাকরী গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বড়লাটের দপ্তরে আয় ব্যয় বিভাগে একটি ১৫৲ পনের টাকা বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অল্পদিন পরেই তিনি কার্য্যদক্ষতাগুণে মিলিটারী অডিটার জেনারেলের আপিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে সেই আফিসেই তিনি দুই শত টাকা বেতনে অডিটারের কর্ম্ম এবং শেষে সেই বিভাগে ভারতবর্ষীয়ের প্রাপ্য উচ্চতম বেতনের রেজিষ্ট্রারের কর্ম্মে উন্নীত হয়েন। সেই কর্ম্মের বেতন তৎকালে ৫৫০৲ টাকা ছিল। সামরিক অফিসার ব্যতীত অপর কোনও কর্ম্মচারীকে সে

সংসারে প্রবেশ মিলিটারী অডিটার জেনারেল আপিসে কর্ম্ম

বিভাগে তাঁহার অধিক বেতন দেওয়া হইত না। গিরিশচন্দ্রের কার্য্যদক্ষতা, সততা, ইংরাজি লিখিবার ও বলিবার অসাধারণ শিক্ষার গুণে তাঁহার উপরিতন সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে প্রভূত শ্রদ্ধা করিতেন—তাঁহার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। সেই আফিসে কর্ম্ম করিবার সময়েই গিরিশ-চন্দ্র সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন এবং গবর্ণমেণ্টের কোনও কার্য্যের নীতি প্রজাসাধারণের অহিতকর বিবেচনা করিলে গিরিশচন্দ্র সুতীব্র ভাষায় উহার প্রতিবাদ করিতেন। সেই কারণে গিরিশচন্দ্রের উপরিতন সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার স্পষ্টভাষিতা ও সৎসাহসের জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন এবং তিনি যে তাঁহাদেরই অধীনে কর্ম্ম করিতেন সে জন্য গৌরব অনুভব করিতেন। কালের পরিবর্ত্তনে এখন এই প্রকার কথা উপকথা বলিয়া বোধ হয়।

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে মিলিটারী অডিটার জেনারেল আফিসে কর্ম্মে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে সেই আফিসে দেশাত্মবোধ মন্ত্রের অন্যতম পুরোহিত, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ম্ম করিতেন। সেই সুযোগে তাঁহার সহিত গিরিশচন্দ্রের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। হরিশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের অপেক্ষা ৫ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু এক আফিসে কর্ম্ম করিতেন এবং উভয়েরই ইংরাজী রচনায় অনুরাগ ছিল বলিয়া তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শেষে ঘনিষ্ঠতম সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হয়। উভয়েই দেশপ্রাণতায় একাত্মা ছিলেন এবং উভয়েই দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার নিবারণের জন্য জলন্ত ভাষায় লেখনী চালনায় অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজি রচনায় উভয়েই সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যদিও উভয়ের রচনাপদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য ছিল। হরিশ যুক্তিতর্কে অতুল্য ছিলেন, কিন্তু গিরিশের মত তাঁহার রচনায় লালিত্য, বর্ণনার মাধুর্য্য ও হাস্যরসপটুতা ছিল না।

দেশপ্রাণ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরন্তু জননায়কত্বে গিরিশের যোগ্যতা হরিশের অপেক্ষা অধিক ছিল,—গিরিশের অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল, হরিশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। সে পার্থক্যের জন্য দুই বন্ধুর মধ্যে কিছুমাত্র প্রতিযোগিতার ভাব ছিল না—প্রত্যুত গিরিশ হরিশ্চন্দ্রের রচনার একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। হরিশের অকাট্য যুক্তি তর্ক, রচনার গাম্ভীর্য্য, দূরদর্শিতা ও নির্ভীক স্পষ্টভাষিতা, সিপাহী বিদ্রোহের পর গবর্ণমেণ্টকে কঠোর শাসননীতি হইতে বিরত রাখিয়া দেশবাসীর যে মঙ্গল সাধন করিয়াছিল, সে জন্য হরিশের প্রতি গিরিশের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। দেশমান্য হরিশচন্দ্র ৩৭ বৎসর মাত্র বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন। পান-দোষে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে গিরিশও স্বল্পায়ু হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মদ্যপানের একান্ত বিরোধী—নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন।

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার ও কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ

বালককাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের সংবাদপত্রে লিখিবার আগ্রহ ছিল। ছাত্র বয়সে হস্তে লিখিত সংবাদপত্রে লিখিবার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি প্রথমে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদিত "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার" নামক সপ্তাহিক পত্রের একজন বিশিষ্ট লেখক হয়েন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজী কবিতা লিখিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথমে যশস্বী হয়েন। ডিএল রিচার্ডসন তাঁহার সম্পাদিত কবিতাসংগ্রহে কাশীপ্রসাদের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। হেদোর উত্তরপূর্ব্ব কোণে মোটা থাম সংযুক্ত যে পুরাতন অট্টালিকা আছে, উহাই কাশীপ্রসাদের ভদ্রাসন বাটী। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের সহপাঠী কৈলাসচন্দ্র বসু লিটারারী ক্রনিকেল নামক ইংরাজি মাসিক পত্র প্রচার করিলে গিরিশচন্দ্র সেই পত্রেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরে ১৮৫০ খৃঃ অব্দে গিরিশচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ "বেঙ্গল রেকর্ডা"র নামে এক

লিটারারি ক্রনিকেল

বেঙ্গল রেকর্ডার

খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিলে গিরিশচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতার সহযোগী হইয়া ঐ পত্রের সম্পাদন করেন। হরিশচন্দ্রও সেই পত্রের লেখক ছিলেন। বেঙ্গল রেকর্ডারের অস্তিত্ব দুই বর্ষ মাত্র ছিল।

বেঙ্গল রেকর্ডারের প্রচার বন্ধ হইবার পরবৎসর বড়বাজার নিবাসী মধুসূদন রায় নামক জনৈক মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারী একখানি সংবাদপত্র প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহায়তা প্রার্থনা করেন। সেই সুযোগে গিরিশচন্দ্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রের প্রবর্ত্তন

হিন্দু পেট্রিয়ট

করেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ৬ই জানুয়ারী হিন্দু পেট্রিয়টের প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। গিরিশচন্দ্র তিন বর্ষকাল ঐ পত্রের সম্পাদকতা করিয়া হরিশচন্দ্রের উপর উহার সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। হরিশচন্দ্র প্রথমাবধি হিন্দু পেট্রিয়টের অন্যতম লেখক ছিলেন। হরিশচন্দ্রের সম্পাদন কালে হিন্দুপেট্রিয়টের গৌরব ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়। তৎপূর্ব্বে কোনও ভারতবাসীর সম্পাদিত ইংরাজি সংবাদপত্র হিন্দু পেট্রিয়টের মত শক্তিশালী বলিয়া খ্যাতিলাভ করে নাই। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে হরিশচন্দ্রের অকাল মৃত্যু হইলে তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য গিরিশচন্দ্র পুনরায় হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় কিছুদিন ঐ পত্রের পরিচালন করেন। পরে ঐ পত্র স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের কর্ত্তৃত্বাধীনে যাইলে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের উপর হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনভার অর্পিত হয়। গিরিশচন্দ্র ও হরিশচন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে হিন্দু পেট্রিয়ট দরিদ্র প্রজাসাধারণের মুখপত্র ছিল, কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে উহা জমিদার বর্গের মুখপত্র স্বরূপ হইয়া হিন্দু পেট্রিয়ট যে প্রজাসত্ত্বের সমর্থনে নিযুক্ত ছিল, তাহার বিরুদ্ধমতেরই প্রচারক হয়। সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, হিন্দু পেট্রিয়টের মতের প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে "বেঙ্গলী" পত্রের প্রবর্ত্তন করেন।

হরিশচন্দ্রের সম্পাদকতার সময়েও গিরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিতে বিরত হয়েন নাই। বস্তুতঃ লর্ড ড্যালহাউসীর পররাজ্য গ্রাস-নীতির, সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বৈরনির্য্যাতন-নীতির ও নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রিয়টে জ্বলন্ত ভাষায় লিখিত বা বিদ্রুপবাণে কণ্টকিত যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া ঐ পত্রের অতুল্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সহায়তা করে, সেই সকল রচনার অনেকগুলিই গিরিশচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত। গিরিশচন্দ্রের সেই সকল রচনা পাঠ করিলে একদিকে যেমন তাঁহার অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, তেমনি অন্য দিকে তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়াও কি করিয়া সেই সকল সুতীব্র সমালোচনা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র বহু সভাসমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইবার দুইবর্ষ পরেই তিনি উহার সদস্য হয়েন এবং ঐ সভার প্রতিনিধিগণের অন্যতম হইয়া একাধিক বার বড়লাট ও ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ঐ সভা-গৃহেই হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামগোপাল ঘোষের মৃত্যু প্রভৃতি উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র কয়েকটী স্মরণীয় বক্তৃতা করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ড্যালহৌসী ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইলে যে দুই চারিজন বাঙ্গালী উহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন, গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। সেই সভায় ডাক্তার এ ডফ্, স্যার মর্ডণ্ট ওয়েলার প্রমুখ তাৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের বক্তৃতার মধ্যেও গিরিশচন্দ্রের বক্তৃতা সুখ্যাতি পাইত। উক্ত ইনষ্টিটিউট্ একবৎসর বড়দিনের গল্পের জন্য পারিতোষিক ঘোষণা করিলে গিরিশচন্দ্র Borrowed Shawl (ধার করা শাল) নামক একটী গল্প লিখিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের গুণগ্রাহী ও

পৃষ্ঠপোষক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন সেই উপলক্ষে একটী গল্প লিখিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের গল্পটী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মুখার্জিস্ ম্যাগেজীনে পুনর্মুদ্রণ কালে, স্বর্গীয় মনস্বী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই গল্পটী, ম্যালিসনের গল্প অপেক্ষা কোনও বিষয়ে অপকৃষ্ট নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটী স্থাপিত হইলে গিরিশচন্দ্র উহার সাহিত্য ও দর্শন বিভাগের সম্পাদক হয়েন—সংস্কৃত ভাষাবিৎ অধ্যাপক কাউয়েল সাহেব ঐ বিভাগের সভাপতি ছিলেন। সেই সভায় গিরিশচন্দ্র "On the present state of dramatic exhibitions in Bengal" (বাঙ্গালায় নাটক অভিনয়) ও "Bengalees at home" (স্বগৃহে বাঙ্গালী) বিষয়ে যে দুইটি সন্দর্ভ পাঠ করেন সেগুলি অধ্যাপক কাউয়েল, ডাক্তার ডফ্ প্রভৃতি গুণগ্রাহী পণ্ডিতগণের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। যে সময়ে Government School of Arts (আর্ট স্কুল) স্থাপিত হয়, সে সময়ে গিরিশচন্দ্র চিত্রবিদ্যার উপকারিতা ও গবর্ণমেণ্টের সেই বিদ্যা শিক্ষা দিবার অনুষ্ঠানের সদুদ্দেশ্য বুঝাইয়া, এদেশীয় ভদ্রসমাজে চিত্রবিদ্যার উপর পটুয়ার ব্যবসায় বলিয়া যে কুসংস্কার ও বিতৃষ্ণা ছিল তাহা নিরাকরণের সহায়তা করেন। বেথুন সভাতেই গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালী বালিকার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যে বাধা বিঘ্ন ঘটে তাহার সম্বন্ধে একটি সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

পুরুষ-বহুত্ব

সাংখ্য ও বেদান্ত, দুই মতেই পুরুষের স্বরূপ হইতেছে চৈতন্যমাত্র বা বিজ্ঞানময়। অতএব যেথায় যে কোন জীবের মধ্যে চৈতন্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বুঝিতে হইবে তাহাই পুরুষের লক্ষণ। কিন্তু ইহা বলিলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যায় না। পুরুষ বিষয়ে একটি তুমুল বিবাদের কথা হইতেছে, পুরুষ বাস্তবিক পক্ষে এক না বহু। সাংখ্যের সমস্ত পুঁথিতেই ইহার পরিষ্কার এক জবাব দেখিতে পাওয়া যায়,—পুরুষ বহু। কিন্তু বেদান্ত পক্ষ এ বিষয়ে একমত নহেন। অদ্বৈত বেদান্তের মতে সমস্ত পুরুষই এক ও অভিন্ন, তাহারা সংখ্যাতঃ (numerically) এক। কিন্তু রামানুজের বেদান্ত-ব্যাখ্যা অনুসারে জীবে জীবে ভেদ আছে। এতৎ প্রসঙ্গে অগ্রে অদ্বৈত পক্ষের কথাই বিবেচ্য।

(১) অদ্বৈত বেদান্ত।

শঙ্করের মতে জগৎ যেমন স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তেমনি জীবও ব্রহ্মের সহিত একাত্ম। অতএব জগতের ঘট পটাদির ভেদ যেমন মিথ্যা, তেমনি জীবে জীবে যে ভেদ তাহাও 'অবিদ্যাকৃত' মিথ্যা ভেদ। ফল কথা, অদ্বৈতবাদে প্রতি ভেদবুদ্ধিই মায়া প্রপঞ্চিত ভেদবুদ্ধি। তিনি দেখিয়াছেন ভোক্তা ও ভোগ্য, চেতন ও অচেতনের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি তাহা সাগর ও তরঙ্গের ন্যায় অলীক ভেদবুদ্ধি। নিয়ামক ঈশ্বর ও নিয়ম্য জীবের মধ্যেও যে কোন ভেদ নাই, ইহা দেখাইবার জন্য শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে বলিয়াছেন—"একই আকাশ যেমন নানা প্রকারের ঘটের মধ্যে নানাবিধ ঘটাকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তেমনি একই ব্রহ্ম নানা

দেহাদি উপাধিতে নানা বিজ্ঞানাত্ম জীব বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। ইহা অবিদ্যাকৃত মিথ্যা ভ্রান্তি মাত্র। পরমার্থতঃ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। অল্পজ্ঞ জীব হইতে অন্য কোনই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নাই। অবিদ্যা ঘুচিয়া যাইলে 'ঈশিতা' ব্রহ্ম ও 'ঈশিতব্য' জীবের মধ্যে কোনই প্রভেদ থাকে না।"

একই ঈশ্বর কি করিয়া যে বহু জীবরূপে প্রতীয়মান হইতে পারেন তাহার অন্য দৃষ্টান্ত হইতেছে—

এক এব ভূতাত্মা, ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় একধা ও বহুধা দৃষ্ট হইতেছেন।

এই যে বহুধা, ইহা শঙ্করের মতে কোন প্রকারেই সত্য হইতে পারে না। কেন না—"স্বয়ং প্রসিদ্ধং হ্যেতৎ শারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বম্ উপদিশ্যতে, ন যত্নান্তর প্রসাধ্যম্। অতশ্চ ইদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বম অভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শরীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে রজ্জ্বাদি-বুদ্ধয়ঃ ইব সর্পবুদ্ধিনাম্।" * 'শরীরের সহিত সংযুক্ত আত্মা যে ব্রহ্মাত্মক ইহা শাস্ত্রের উপদেশ ও স্বয়ং-প্রসিদ্ধ সত্য। ইহার প্রমাণের জন্য অন্য কোনই প্রমাণের বা প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। এখন বিচারে যদি জীবাত্মার শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মতা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে জীবাত্মা সম্বন্ধে যে স্বাভাবিক ভেদজ্ঞান তাহা শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বাধক জ্ঞান বলিয়া মানিতেই হইবে। যেমন সর্পজ্ঞানের রজ্জুজ্ঞান বাধক জ্ঞান।' অতএব অদ্বৈতবাদের স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে—"একত্বমেব পারমার্থিকং,—মিথ্যা-জ্ঞান-বিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম।"—'একত্বই পারমার্থিক তত্ত্ব, নানাত্ব মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত।'

কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের সহজাত দুর্দ্দৈব এই যে এই মিথ্যার "নানা" লইয়াই সারা জীবন নাড়াচাড়া করিতে হয়। লোটা কম্বল ঝাড়িলেও তাহা হইতে এই মিথ্যার 'নানা' বাহির হইয়া পড়ে। অগত্যা শঙ্কর স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"স্বপ্নের ন্যায় এ জগৎব্যবহারের এক সাময়িক সত্যতা আছে।" কিন্তু সেই ব্যবহারিক সত্যকে তাঁহার দর্শনের নিকষে কষিয়া দেখিলে, তাহাকে ঘোরতর মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

এই অদ্বৈতবাদ সমালোচনার কোনই ধৃষ্টতা আমাদের নাই। 'দৃশ্য' হিসাবে ইহা যেরূপ দেখায় তাহা দেখিতে পাইলেই আমরা খুসী হইয়া যাইব।

আমরা দেখিতে পাই, দর্শনের বীর-সাধক শঙ্কর 'তত্ত্বমসি' 'সোহম্' প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া, বিচারের যোগাসনে বসিয়াছিলেন। এবং সেই সাধনায় যখন তিনি তন্ময়সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তখন, তাঁহার প্রভাময় প্রজ্ঞানেত্র সম্মুখে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্ববিধান দেখিতে পাইয়াছিল।

সেই দুইটি বিধানের একটি অতি অবিজ্ঞেয় পারমার্থিক সত্যের বিধান,—সেখানে একমাত্র 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' নিত্য বিরাজমান। সেখানে দেশ কাল নাই, দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তর নাই, জীব হইতে জীবান্তর নাই,—তাহা "সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম।" তাহা 'একমেবাদ্বিতীয়ং'এর অক্ষুব্ধ মহার্ণব,—সেখানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চিহ্ন-রহিত ভাবে একার্ণবতা লাভ করিয়াছে। সেই ভূমা অসীমের মধ্যে বিশ্বমায়া একেবারেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহাই একমাত্র পারমার্থিক সত্য।

ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁহার এই "ব্যবহারিক জগৎ"। ইহা যেন কোনো এক মায়ারাজ্য,—কোনো এক অজানা রাক্ষসীর সাত মহল পুরী! এখানে পত্রে পুষ্পে, তৃণে কাষ্ঠে, সর্ব্বত্রই ইন্দ্রজাল লাগিয়াছে। এখানে যাহা দেখিতেছ, নিশ্চয় মনে জানিও, সেটা তাহা ছাড়াই অন্য কিছু হইবে। এখানে সবই মায়া ও ছায়া, ভেল্কি ও ভানুমতীর খেলা। অতি অদ্ভুত এ দেশের এই বিচিত্র মানুষ,—যাহারা পরস্পরকে 'আমি' 'তুমি' বলিয়া ডাকিতেছে। তাহারা মানুষ না হইলেও মানুষ;—না

* ২।১।১৪ বেদান্তসূত্রের শারীরক ভাষ্য।

থাকিলেও আছে। তাহারা এমনি বিচিত্র জীব, যে যখন তাহারা ঘুমায় তখনই তাহারা জাগিয়া থাকে, এবং যখন জাগিয়া থাকে তখন শুধু ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে। শঙ্করের জগৎ-বিধানের "ব্যবহারিক সত্যতার" ইহাই স্বরূপ।

এই মায়াবাদ যদি শঙ্করের সৃষ্টি নাই হয়, তবে ইহা যে তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার দ্বারা উজ্জীবিত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এবং এই মায়াবাদের অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতবর্ষীয় ভাবনা যে কয় শত বৎসর যাবৎ মন্ত্রাহত-বৎ হইয়াছিল,—ইহার প্রমাণ শঙ্করের পর-যুগের দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে বিশদ ভাবে পরিলক্ষিত হইবে। ভারতীয় চিন্তা আজ পর্য্যন্ত মায়াবাদের ইন্দ্রধনু-বর্ণে অল্পবিস্তর অভিরঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে—ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু এই অভিন্ন-জীবেশ্বর-বাদের নির্দ্দয় নিষ্পীড়নে একজন শুধু অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিয়াছিল,—সে ভক্ত। অদ্বৈতবাদের প্রভাবে ভক্তিই স্বাধিকার-বঞ্চিত হইয়াছিল। শঙ্কর-বিধানে ভক্তি-সাধনার—(শঙ্করের নিজের ভাষায় 'অবগতি-সাধনার')—কোনই যে স্থান ছিল না তাহা নহে। কিন্তু ভক্তির যাহা ঐকান্তিক আশ্রয়, ভক্ত ও ভগবানের দ্বৈত-ভাব,—তাহা লোপ করিয়া দিয়া, অদ্বৈতবাদ ভক্তির গোড়া কাটিয়া দিয়া শুধু আগাতেই জল ঢালিয়াছিল। অদ্বৈত-পরাহত ভক্ত, বয়স্ক বালক সাজিয়া এক পুতুল ভগবান-কেই পূজা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কারণ মায়াবাদ অকাট্য যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছিল, ভক্তবালক বড় হইলে নিজেই 'সোঽহম্' হইয়া যাইবে। সেই জন্ম ভগবানের সিংহাসনে আরোহণের বিদ্রোহী দুরভিসন্ধিকে হৃদয়ে গোপন রাখিয়া, ভক্ত তাহার কপট-পূজার আসনে বেশী দিন বসিয়া থাকিতে পারিল না। এবং শঙ্করের অভ্যুদয়ের চারি শত বৎসরের মধ্যেই, অদ্বৈতবাদের মূর্ত্তিমান প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, ভক্ত রামানুজের দ্বৈত বেদান্তব্যাখ্যা শ্রীভাষ্যে প্রকটিত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, অদ্বৈতবাদের প্রতিক্রিয়ার এই শুভ লগ্নেই, "কালার্ক-ভক্ষিত সাংখ্যশাস্ত্র"ও আপনার লুপ্ত গৌরব সমুদ্ধারে প্রযত্নশীল হইয়াছিল।

(২) দ্বৈত বেদান্ত।

রামানুজ-দর্শনের নিয়ামক-মধ্যবিন্দুর অভিসন্ধানে আমরা এই বচনে উপনীত হই—"ভক্তিস্তু নিরতিশয়-আনন্দ-প্রিয়-অনন্য-প্রয়োজন সকলেতর-বৈতৃষ্ণ্যবৎ জ্ঞান-বিশেষ এব।"*—ভক্তি নিরতিশয়-আনন্দপ্রিয়, অনন্য-প্রয়োজন, সমস্ত-অন্য বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য ও একপ্রকার জ্ঞান। অর্থাৎ যুক্তি জ্ঞানের ন্যায় ভক্তি-জ্ঞানের দ্বারাও জীব তত্ত্ব-লাভ করিতে পারে। শঙ্কর দর্শনে ঐকান্তিক ভক্তির তত্ত্ব-বিদ্যা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, রামানুজ বেদান্তের লুপ্তপ্রায় দ্বৈত ব্যাখ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ভক্তির তত্ত্ব-বিদ্যাকে অক্ষুণ্ণ করিলেন।

শঙ্কর 'তত্ত্বমসি' শ্রুতিমন্ত্রের চরম ব্যাখ্যা অবলম্বনে মায়াবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। রামানুজ যে শ্রুতি-মন্ত্রকে তাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যার পথ-প্রদর্শক করিয়া-ছিলেন তাহা এই :—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম মেতৎ॥"

ভোক্তা জীব (চেতন), ভোগ্য প্রকৃতি বা প্রধান (অচেতন), এবং প্রেরিতা (নিয়ামক ঈশ্বর) এই তিনটি বিষয় প্রণিধান করিয়া (মত্বা) তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়াছেন এই যে 'সর্ব্ব' ইহা ত্রিবিধ ব্রহ্ম।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই মন্ত্রে সাংখ্য-বিহিত ভোক্তা-পুরুষ ও ভোগ্য প্রকৃতির ভেদ স্বীকৃত হইলেও, তাহা ব্রহ্মেরই 'বিধা ভেদ' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা যে কোন কোন প্রাচীন সাংখ্য সম্প্রদায়ের মত হইতে পারে, ইহা আমরা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয়কালে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। তত্ত্বসমাস-বৃত্তি-কেই পণ্ডিতেরা সাংখ্যের সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। সে বৃত্তিতে আমরা দেখিতে পাই, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয় তত্ত্বই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হইয়াছে।

* মাধবাচার্য্যের রামানুজ দর্শন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি সাংখ্যমতাবলম্বী না হইলেও সাংখ্যের প্রতি যে পরম আস্থাবান ছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে যে তত্ত্ব-বিভাগ করিয়াছেন, তাহা সাংখ্যেরই পারিভাষিক তত্ত্ব বিভাগ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি 'প্রেরিতা ব্রহ্মের' লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তিনি 'নিত্যো নিত্যানাম্','চেতনশ্চেতনানাম্',"একো বহুনাম্', তিনিই সমস্ত কামনার বিধান করিতেছেন, তিনি বিশ্বের কারণ হইয়াছেন, তাঁহাকে জানিলে জীবের সমস্ত পাশ বন্ধের ক্ষয় হয়। ইনি সাংখ্য ও যোগের অধিগম্য।"

এই উপনিষদই রামানুজ দর্শনের প্রধান অবলম্বন। অতএব, দর্শনরাজ্যে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া মরে— তাহা কেহ বলিতে পারে না।

ব্রহ্ম হইতে জীবের, ভক্ত হইতে ভগবানের—স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য রামানুজস্বামী কিরূপে যে বিশিষ্ট অদ্বৈত দর্শন রচনা করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তাঁহার মতে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন বলিয়াই, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের প্রকার ভেদ,—ব্রহ্মের শরীর সদৃশ। তাহারা ব্রহ্মের 'সমানাধিকরণে' অবস্থিত হইয়াছে—অদ্বৈতবাদের ন্যায় ব্রহ্মে অত্যন্ত বিলীন ও ভেদ-রহিত হইয়া যায় নাই। ভেদ তাঁহার মতে সিদ্ধ হইলেও, অভেদও সিদ্ধ হইয়াছে। যেমন সাংখ্য কার্য্যকারণের স্বরূপ অবধারণ করিবার সময় বলিয়াছিলেন, বিশ্বরূপের ভেদ ও অভেদ দুই সত্য। তিনি প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছেন—"কিমত্র তত্ত্বম্ ভেদঃ অভেদঃ উভয়াত্মকং বা সর্ব্বং তত্ত্বম্?"—তত্ত্ব কি, ভেদই তত্ত্ব না অভেদই তত্ত্ব, না উভয়াত্মকই তত্ত্ব, না সমস্তই তত্ত্ব? ইহার মীমাংসা দিতেছেন—"সমস্ত প্রকার ভেদই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মে অবস্থিত, সেই জন্য অভেদ মিথ্যা নহে। আবার একই ব্রহ্ম চেতন ও অচেতন প্রকারে নানা ভাবে অবস্থিত বলিয়া ভেদাভেদও সিদ্ধ হইতেছে। এবং ঈশ্বরের যে চেতন ও অচেতন প্রকার ভেদ—সেই প্রকার ভেদের স্বরূপ ও স্বভাব পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ ও বিভিন্ন—অসঙ্কর, অতএব ভেদও সত্য।" *

বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের ইহাই সন্ধির সর্ত্ত। এবং এই সর্ত্তানুসারেই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের সর্ব্বগ্রাসী ব্রহ্মখর্পর হইতে রামানুজ স্বামী জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

(৩) সাংখ্যের পুরুষবাদ।

এই সব দর্শনের বদ্ধ বাতাস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমরা যখন সাংখ্যের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহকে জিজ্ঞাসা করি পুরুষ এক না বহু, তখন তিনি পরিষ্কার জবাব দিয়া বলেন—পুরুষ বহু। কেন বহু ইহার কারণ দেখাইবার সময়ে তিনি যে যুক্তি প্রদান করেন, তাহা ময়দানের হওয়ার মতন সমস্ত লোকের বুদ্ধিতেই অবারিত গতি। "যদি একঃ পুরুষঃ স্যাৎ একস্মিন সুখিনি সর্ব্ব এব সুখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন্ দুঃখিনি সর্ব্ব এব দুঃখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন মূঢ়ে সর্ব্ব এব মূঢ়াঃ স্যুঃ। একস্মিন জাতে সর্ব্ব এব জায়েরন্। একস্মিন মৃতে সর্ব্ব এব ম্রিয়েরন্।" † —যদি এক পুরুষ হইতেন, তবে একজন সুখী হইলে সকলেই সুখী হইতেন, একজন দুঃখী হইলে সকলেই দুঃখী হইতেন, একজন জন্মিলে সকলেই জন্মিতেন, একজন মরিলে সকলেই মরিতেন। অতএব পুরুষ বহু।

জ্ঞান-বাদের আদিম যুগের ইহাই গঙ্গাজলের মতন সাদা যুক্তি। এখানে ঘটাকাশ ও জলচন্দ্র দৃষ্টান্তিত বিরুদ্ধবাদের অঙ্কুরেও কোন আভাস নাই। 'প্রকার ভেদের' অদ্বৈতবাদের কোনই আপদ্ধর্ম্মের ব্যবস্থা নাই!

আদি বিদ্বান্ কপিলের প্রবর্ত্তিত সাংখ্যশাস্ত্র হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সাংখ্যকে অনেক "পরবাদের" সঙ্গেও সন্ধি-বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে রামানুজ দর্শন।

† তত্ত্বসমাসের প্রাচীনবৃত্তি।

সমস্ত কাল এবং সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে, সাংখ্য সেই প্রাচীন কালের বহু পুরুষবাদের সরল যুক্তি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। শঙ্কর-পূর্ব্ব-যুগের সাংখ্য-কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ এই যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন—

জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাৎ, অযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ বিপর্য্যয়াচ্চৈব॥

এবং শঙ্করের পূর্ব্বগুরু গৌড়পাদ এই কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"জন্ম, মরণ ও ইন্দ্রিয় সকলের (প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে) পৃথক ও স্বতন্ত্র বিধান হইয়াছে। সকলেই এক সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে না। ত্রিগুণের বিপর্য্যয়ে কেহ সুখী হইয়াছে, কেহ দুঃখী হইয়াছে, কেহ মূঢ় হইয়াছে। এই সমস্তই বলিয়া দিতেছে পুরুষ এক নহে, বহু।"

এবং শঙ্করের পরে সংকলিত সাংখ্যদর্শনও অবিকল এই যুক্তি গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছেন—"জন্মাদি ব্যবস্থা হইতে পুরুষ-বহুত্ব সিদ্ধ হইতেছে।" কিন্তু শঙ্করের পরে যে কোন দর্শনের সংস্করণ গ্রথিত হউক কিম্বা সঙ্কলিত হউক, তাহা কখনই শঙ্করবাদকে উপেক্ষা করিয়া 'পাদমেকম্'ও অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্য ইহার ঠিক পরের সূত্রেই সাংখ্যের দর্শনকার অদ্বৈত-বাদের বিরুদ্ধ যুক্তির খবর লইয়াছেন।

সাংখ্যের দর্শনকার অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তির অবতারণ করিয়াছিলেন, আমাদের বিশ্বাস, আধুনিক কালে যাঁহারা বেদান্তের তরফ হইতে সাংখ্যের সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকই ইচ্ছা কিম্বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক, সেই সাংখ্য যুক্তির মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অবধারণ করেন নাই। নতুবা Max Mullerএর মতন সুবিজ্ঞ সমালোচকের মুখেও আমরা এমন কথা শুনিতে পাইতাম না—"Kapila has forgotten that every plurality presupposes an original unity...and many Purushas, from the metaphysical point of view necessitate the admission of one Purush".* ইহার পরের কয়ছত্র পড়িয়া মনে হয় আচার্য্য, কপিলকে এতদূর অসঙ্গত মনে করিতে গিয়া নিজেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যথাসাধ্য সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে চেষ্টা করিব।

(৪) পুরুষের একত্ব।

গোড়াতেই মনে রাখিতে হইবে, বেদান্তের ন্যায় সাংখ্যও মানিয়া থাকেন যে, জন্ম মৃত্যু দ্বারা পুরুষের সত্তার (essenceএর) কোনই বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাস্থলে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"জন্ম ন তু পুরুষস্য পরিণামঃ, মরণং ন তু পুরুষস্য অভাবঃ"—জন্ম পুরুষের কোন পরিণাম নহে, মৃত্যু পুরুষের অভাব নহে। তবে কি ?—তাহা 'অ-পূর্ব্ব কায়ার সংযোগ'এবং 'পুরাণকায়ার বিয়োগ' মাত্র। অর্থাৎ গীতার ভাষায়,—নব বস্ত্র পরি-ধান ও জীর্ণত্যাগ মাত্র।

যাহার দ্বারা পদার্থ-সত্তার কোনও বিকার কিংবা পরিণাম না হইলেও, পদার্থের অবস্থান্তর সূচিত হয়, তাহাকে ঐ পদার্থের "অবচ্ছেদক উপাধি" বলিয়া দর্শন-শাস্ত্রে নাম দেওয়া হয়। যেমন বানর বৃক্ষে আরোহণ করিলে বৃক্ষের কোনই পরিবর্ত্তন বা পরিণাম হয় না, তথাপি সেই সলাঙ্গুল উপাধিযোগে বৃক্ষ কপি-সংযোগ উপাধি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। আবার কপি যখন লম্ফ দিয়া বৃক্ষান্তর অবলম্বন করে, তখন কপি বিয়োগই সেই বৃক্ষের 'অবচ্ছেদক উপাধি' হইয়া থাকে। বৃক্ষের পক্ষে কপির সংযোগ-বিয়োগও যাহা, পুরুষের পক্ষে দেহের সংযোগ ও বিয়োগও তাহা। অর্থাৎ উপাধি-মাত্রের সংযোগ ও বিয়োগ মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন উপাধির অতিরিক্ত, যাহা সকল উপাধির সাধারণ 'অধিকরণ' বা 'আধার', তাহার নাম 'উপাধি-বান্'। এই উপাধির অতিরিক্ত 'উপাধিবানের' স্বরূপ

* Indian Philosophy, p. 286.

পরিচিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ বা সামান্য-ভাবই 'উপাধিবানের' স্বরূপ। তাহা এক সামান্য-সত্তা (Abstract Essence) এবং প্রথম দৃষ্টিতে প্রতিপন্ন হয়, উপাধি যেমন নানা হইয়াছে, উপাধিবানের সেরূপ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্যতা (numerical distinction) নাই। জগতের সমস্ত উপাধির মধ্যে যে 'পুরুষতা' সর্ব্বত্র ও সর্ব্বনির্ব্বিশেষে বিরাজমান—তাহা 'সামান্য-পুরুষতা'। আমরা সাংখ্যের সেই সামান্য-পুরুষতার বা সাধারণ-পুরুষের, (Common noun পুরুষের) স্বরূপ অবধারণ করিবার সময় দেখিয়াছি—সেই পুরুষ বুদ্ধিবোধিত জ্ঞানের জ্ঞাতা হইয়াও নির্গুণ জ্ঞানেরও জ্ঞাতা, তাহা দেহাদি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান হইলেও অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণ জ্ঞান, তাহা জাগ্রৎ ও সুপ্ত দশাতেও বিরাজমান নিত্য ও শাশ্বৎ পুরুষ। এই সামান্য পুরুষই চৈতন্য-মাত্র। ভরসা করি, সেই চৈতন্য-মাত্রের সাধরণ একত্ব (Abstract unity) কেই লক্ষ্য করিয়া মনীষিবর Max Muller বলিয়াছিলেন—"Many Purushas necessitate the admission of one Purusha."

তবে সাংখ্য সাধারণ পুরুষের একত্ব কি মানেন নাই? ইহাই কি আচার্য্যের আপত্তি? তাহা যদি হয়, তবে উত্তরে আমরা বলিতে পারি, সাংখ্যসূত্র এতৎ প্রসঙ্গেই স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন—"উপাধি ভিদ্যতে ন তু তদ্বান।" (সং দঃ—১।১৫১)—উপাধিই ভিন্ন ভিন্ন হয়, উপাধিবান ভিন্ন ভিন্ন হয় না—তাহার একত্বই সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ উপাধির অতিরিক্ত যে পুরুষ তাহার একত্বও সর্ব্বত্র এক-রূপতা; শুধু সাংখ্যের দর্শন নহে, সাংখ্যের কারিকাও এই কথা বলিয়াছেন। কারিকার এক-দশশতম আর্য্যাতে প্রকৃতি ও পুরুষের স-রূপতা ও বিরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সরূপতা ও বিরূপতার ব্যাখ্যা স্থলে, শঙ্করের পূর্ব্বাচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—"অনেকং ব্যক্তমেকম্ অব্যক্তম্, তথা চ পুমানপি এক"—অর্থাৎ প্রকৃতির যাহা ব্যক্তরূপ তাহা অনেক, যাহা অব্যক্তরূপ তাহা এক, সেইরূপ পুরুষও এক। কেন না ভেদরহিত বৈষম্যহীন অব্যক্ত প্রকৃতির যেমন কোনই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্যতা নাই, তেমনি সামান্য পুরুষতাও সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নহে। অতএব তাহা এক (unity)। প্রকৃতির একত্ব ও বহুত্ব বিচারে ইহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, গৌড়পাদ ভুলিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন—"পুমানপি একঃ।" ইহা বলাতে গৌড়পাদের মর্য্যাদার প্রাপ্য, সুপোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শিত হয় নাই।

এমন কি, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত, সাংখ্যের নানা-পুরুষ-বাদের মধ্যেও এক-পুরুষ-বাদের স্থান থাকিতে পারে,—ইহা অদ্বৈতবাদের পূর্ব্বপক্ষ অবধারণায় স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। তিনি বলিতেছেন—"ননু অনেকাত্মকম্ ব্রহ্ম। অতঃ একত্বম্ নানাত্বঞ্চ উভয়মপি সত্যম্। যথা সমুদ্রাত্মনা একত্বম্, ফেন-তরঙ্গ-আত্মনা নানাত্বম্।"* অর্থাৎ, অদ্বৈত প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—ব্রহ্ম অনেকাত্মক। অতএব একত্ব ও নানাত্ব দুই সত্য। যেমন সাগরের সমুদ্রাত্মা বশতঃ একত্ব, ফেনা ও তরঙ্গাত্মা বশতঃ নানাত্ব।"—এই যুক্তি কি সাংখ্যের যুক্তি হইতে পারে না? গৌড়পাদ যদি "পুমান্ অপি একঃ" প্রতিজ্ঞার এই দৃষ্টান্ত দিতেন, তবে প্রতিজ্ঞা কি অসাধ্য হইয়া উঠিত? দর্শনকারের 'উপাধিভিদ্যতে ন তু তদ্বান্' এই সূত্রের ব্যাখায় ভাষ্যকার যদি এই দৃষ্টান্ত দিতেন, তবে তাঁহার ব্যাখ্যা কি কোন অংশে অসঙ্গত হইত?

মহাভারত যে সাংখ্য-বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—তাহার তুল্য প্রামাণিক সাংখ্যবিবৃতি বিরল। সেই বিবৃতিতে দেখা যায়, বহু পুরুষবাদী কপিলাদি ঋষিগণ স্পষ্টই পুরুষ-একত্বও মানিয়াছিলেন। মোক্ষ-ধর্ম্ম পর্ব্বের ৩৫০ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই পাঠক দেখিতে পাইবেন,—জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মণ্ উত অহো এক এব বা"—হে ব্রহ্মণ,

---

* তদনন্যত্বম্ ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

পুরুষ এক না বহু? বৈশম্পায়ন তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"বহবঃ পুরুষা লোকে সাংখ্য যোগ বিচারণে"—লোকে যে সাংখ্য ও যোগের বিচারণা আছে তাহাতে বহু পুরুষই কথিত হইয়াছে। কিন্তু বেদব্যাসের "স্কুল" বহুপুরুষবাদী নহেন, তাঁহারা এক-পুরুষ-বাদী। অর্থাৎ তাঁহারা পুরুষের নির্ব্বিকল্প একত্ব মানিয়া থাকেন। এই জন্য বৈশম্পায়ন তাঁহার গুরুদেব বেদব্যাসকে যথারীতি প্রণাম করিয়া, জনমেজয়কে বলিলেন—"বহু পুরুষের উৎপত্তিস্থানরূপে যে এক পুরুষ উক্ত হয়েন" আমি তোমাকে সেই একপুরুষের কথাই বলিব। কিন্তু সেই এক পুরুষবাদের ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই বলিতেছেন—

উৎসর্গেণাপবাদেন ঋষিভিঃ কপিলাদিভিঃ।
অধ্যাত্মচিন্তামাশ্রিত্য শাস্ত্রাণ্যুক্তানি ভারত॥

—কপিলাদি ঋষিরা 'উৎসর্গ' ও 'অপবাদ' ক্রমে, আত্মবিষয়ক চিন্তা আশ্রয় করিয়া শাস্ত্র সকল বলিয়াছিলেন। 'উৎসর্গ' ও 'অপবাদ' ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে যে 'সামান্য' ও 'বিশেষ'রই নামান্তর তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে।

কপিলাদি ঋষিরা উৎসর্গ বা সামান্য বিধি অনুসারে কিরূপে আত্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন?

—মম অন্তরাত্মা তব চ, যে অন্যে দেহ-সংস্থিতা।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্য কেনচিৎ ক্বচিৎ॥

* * *

নাগতিঃ ন গতিস্তস্য জ্ঞেয়া ভূতেষু কেনচিৎ।
সাংখ্যেন বিধিনা চৈব যোগেন চ যথাক্রমম্॥

৩৫১।৪—৭

অর্থাৎ সেই একপুরুষ তোমার অন্তরাত্মা, আমার অন্তরাত্মা এবং সমস্ত দেহেরই অন্তরাত্মা। তিনি সকলের সাক্ষিভূত, কেহই কোন প্রকারের তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সমস্ত ভূত সকলে তাঁহার গতিও জানা যায় না, অগতিও জানা যায় না—অর্থাৎ তিনি সমস্ত আত্মা ব্যাপিয়াই সাক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছেন। সাংখ্য ও যোগ বিধি অনুসারে এই এক (সামান্য) পুরুষ যথাক্রমে উক্ত হইয়াছেন। এবং অপবাদক্রমে বা বিশেষ বিধি সম্বন্ধে—

এবং হি পরমাত্মানং কেচিৎ ইচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।
একাত্মানং তথা আত্মানং অপার জ্ঞান-চিন্তকাঃ॥

৩৫১।১৩

—এই পরমাত্মাকে কোন কোন পণ্ডিত (নির্ব্বিকল্প ভাবে) ইচ্ছা করেন। কোন কোন জ্ঞান-চিন্তক একাত্মা ও আত্মা দুই ভাবেই ইচ্ছা করেন।—নীলকণ্ঠ দেখাইয়াছেন এই জ্ঞান-চিন্তকেরা আর কেহই নহে, সাংখ্য।

অতএব সাংখ্যের সহিত অদ্বৈতবাদের, সামান্য ও বিশেষ পুরুষের অবধারণা লইয়া কোনই গোল দাঁড়ায় নাই। গোল দাঁড়াইয়াছে অন্যত্র। শঙ্কর সৃষ্টিকে প্রবঞ্চনা বলিতেও প্রস্তুত, কিন্তু তথাপি তিনি মানিবেন না, কোনও দিক্ দিয়া, কোনক্রমে কোনও বুদ্ধিতে ভেদ সত্য হইতে পারে। সমস্ত নানাত্বই (numerical distiction) তাঁহার মতে মিথ্যা। তিনি সাক্ষাৎ বেত্রহস্ত গুরু মহাশয়ের মত বলিয়াছেন—যেহেতু শাস্ত্র বলিতেছে 'শারীর আত্মা' ব্রহ্মাত্মক, অতএব তোমাকে সেই 'স্বয়ংপ্রসিদ্ধ' কথা নির্ব্যূঢ়ভাবে ও নির্ব্বিকল্পে (absolutely) মানিয়া লইয়া, তাহাকেই বিচারের প্রথম প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। অতএব যে প্রমাণে ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে তাহা নির্ব্বিচারিত মিথ্যা প্রমাণ, যে জ্ঞানে ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহা নির্ব্বিচারতঃ মিথ্যা জ্ঞান। ইহাই অদ্বৈতবাদের খোলা তলোয়ারের যুক্তি, ইহাই অদ্বৈত সেনাপতির 'ফারমান্' ও হুকুম।

যাহা মনন শাস্ত্র (Rational Science) তাহা এ হুকুম মানিতে পারে না,—সাংখ্যও মানেন নাই। ইহাতে তাঁহার সঙ্গে মায়াবাদের যে দুস্তর্য্য মতভেদ দাঁড়াইয়াছে তাহা না বলিলেও চলে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা আছে। সাংখ্য সাধারণ (Abstract) পুরুষতা মানিয়াছেন সত্য—কিন্তু সেই সাধারণ পুরুষতার কোনই পৃথক 'অধিকরণ' বা 'আধার' বা বিশেষ স্বতন্ত্র আত্মত্ব মানেন নাই। বেদব্যাসের তন্ত্রে—সেই সাধারণ পুরুষতাই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ

করিয়া তাহাই "বহু পুরুষের উৎপত্তি কারণ বিশ্ব-পুরুষ" হইয়াছে—এবং সেই "এক পুরুষের আধার" পরিকল্পিত হইয়াছে—বলিয়াই, সেই এক পুরুষ ঈশ্বর হইয়াছেন। নিরীশ্বর সাংখ্য এক পুরুষের স্বতন্ত্র আধার কল্পনা করেন নাই। বর্ত্তমান কালের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরাও Platoর ন্যায় সামান্য সত্তামাত্রেরই পৃথক অস্তিত্ব মানেন না; সাংখ্যও মানেন নাই। সে জন্য অবশ্যই কোন পাশ্চাত্যেরই ক্ষুণ্ণ হইবার অধিকার নাই। ভারতবর্ষীয়ের থাকিতে পারে।

(৫) পুরুষ-বহুত্ব।

অতএব যে একত্ব ও বহুত্বের সত্য সিদ্ধান্তকে আমরা ব্যবহারের ও ভাষার ব্যাকরণে নিত্য মানিয়া ঘর করণা করিতেছি—সাংখ্য পুরুষবাদের মধ্যেও সেই ব্যাকরণ মানিয়াছিলেন। জাতি বা শ্রেণী (class) হিসাবে পুরুষ এক, ব্যক্তি (unit, individual) হিসাবে পুরুষ বহু। এবং জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি উপাধি মাত্র হইলেও পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেন হইয়া থাকে এইটুকু দেখিতে পারিলেই আমাদের ছুটী।

"উপাধিভেদেঽপি একস্য নানাযোগঃ, আকাশস্য ঘটাদিভিঃ।" (সাং দঃ—১।১৫০)—আকাশের ঘটাদি-যোগের ন্যায়, এক পুরুষের (=পুরুষসামান্যের) দেহাদি যোগে যে নানা-যোগ ঘটিয়াছে ইহা বলিতে হইবে। কেন না, উপাধিযোগে পদার্থের যদি নানা-যোগ হয় নাই বলা যায়, তবে কপি-সংযোগী বৃক্ষকে তৎকালেই কপি-বিয়োগী বৃক্ষ বলিতে কোন্ বাধা থাকে না। আমরা যে পুরুষকে উপাধিতঃ মুক্ত বলি, সেই পুরুষকেই উপাধিতঃ বদ্ধ বলিতে পারি না। যে, যে কালে জন্মলাভ করিতেছে, সেই সে কালে মৃত্যুলাভ করিতে পারে না।

অদ্বৈত-বাদ আকাশ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে চাহিয়া-ছিলেন—মহাকাশে একই কালে কোথাও ঘট-যোগ হইয়াছে কোথাও ঘট-বিয়োগ হইয়াছে। ইহার উত্তরে ভিক্ষু বলিতেছেন—"এক-ঘটমুক্তস্য আকাশ-প্রদেশস্য অন্য ঘটযোগাৎ ঘটাকাশ-ব্যবস্থা"—যে আকাশ-প্রদেশ এক ঘট উপাধি মুক্ত হইয়াছে—তাহাতেই অন্য ঘট-যোগবশতঃ ঘটাকাশ ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ সমস্ত আকাশ প্রদেশেই যুগপৎকালে ঘটযোগ ও বিয়োগের ব্যবস্থা হয় না—এক উপাধির বিলয় না হইলে, সেই বিশেষ আকাশপ্রদেশে দ্বিতীয় বিরুদ্ধ উপাধি সংযোগ হইতে পারে না। এবং চৈতন্যরূপে পুরুষের যে একত্ব তাহা যে উপাধি দ্বারা অবচ্ছেদ হইতে পারে না তাহা আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। সমস্ত মানুষের মধ্যে যাহা মানুষত্ব, তাহা বিশেষ বিশেষ মানুষের দ্বারা পৃথক্ অবচ্ছিন্ন হয় না। তাহা সকল মানুষের মধ্যেই সাধারণ (common) মানুষত্বরূপেই থাকিয়া যায়। এবং তাহা সত্ত্বেও, যজ্ঞদত্ত ও দেবদত্ত ভিন্ন হইয়া থাকেন।

জগৎব্যবহারে এই ভেদের পরিচায়ক চিহ্ন কি ?—যাহাদের সম্বন্ধে একই কালে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আরোপ হইতে পারে না, তাহারাই ভিন্ন। আমরা একই কালে একই পদার্থ উষ্ণ ও শীতল বলিতে পারি না, জীবিত ও মৃত বলিতে পারি না। অতএব যাহারা একই কালে জীবিত ও মৃত হইতে পারে না, তাহারাই ভিন্ন পদার্থ।

অতএব প্রত্যেক পুরুষই স্বভাবতঃ চৈতন্যমাত্র ব্রহ্ম-রূপ ও অভিন্ন স্বরূপ ও একরূপ হইলেও,—জন্মমৃত্যুর সত্য উপাধি দ্বারা ভিন্ন হইতেছেন। ইহাই সাংখ্যের বহু পুরুষ-বাদের মর্ম্ম। এবং এই মর্ম্মানুসারেই সাংখ্য-দর্শনকার বলিয়াছেন—"ন অদ্বৈত শ্রুতিবিরোধঃ, জাতি-পরত্বাৎ"—সাংখ্যের সঙ্গে অদ্বৈতশ্রুতির বিরোধ নাই,—কারণ অদ্বৈত শ্রুতি জাতিপর। অর্থাৎ সাংখ্যমতে, শ্রুতি যে পুরুষের একত্বের কথা বলিয়াছেন—তাহার দ্বারা সকল পুরুষের জাতিপর একত্বের কথাই বলিয়া-ছেন, ব্যক্তিপর একত্বের কথা বলেন নাই। ইহা অদ্বৈত শ্রুতির সঙ্গত ব্যাখ্যা না হইতে পারে, কিন্তু ইহা সাংখ্য পুরুষবাদের যে সঙ্গত ব্যাখ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা আমরা পরের প্রবন্ধে দেখিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

আলোচনা

"মেঘনাদ-বধ" সম্বন্ধে মতামত। *

এদেশে জীবনচরিত-লেখকের অসুবিধা অনেক। উপকরণের অভাব ত আছেই, তদুপরি সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাবও পদে পদে অনুভব করিতে হয়। বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে কোন ক্ষুদ্রশক্তি জীবনচরিত-লেখককে ক্ষীণ চেষ্টা করিতে দেখিয়া, যাঁহারা তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদানে অগ্রসর হন, তাঁহারা সেই লেখকের ধন্যবাদের পাত্র।

অগ্রহায়ণের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় মদ্রচিত হেমচন্দ্রের জীবনচরিত পাঠ করিয়া, হেমচন্দ্রের প্রতি আমার অন্ধ পক্ষপাতিতা এবং তৎসহ বিচারশক্তির অভাবের সম্মিলন বশতঃ অনেক অন্যায় ও অসত্য, ন্যায় ও সত্যের মুখোস পরিয়া জীবনচরিতে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া, আমাকে কিছু উপদেশ দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য প্রশংসার যোগ্য।

মাইকেল ও নবীনচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে কি না, অধ্যাপক মহাশয় এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। বোধ হয় প্রবৃত্ত না হইয়া ভালই করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যখন তিনি এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার প্রস্তাব মনোযোগ সহকারে পাঠ করিব ইহা অঙ্গীকার করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে একথা বলিয়া রাখিতে পারি যে বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রস্তাবটি যে বঙ্গ সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহা বিজ্ঞতর পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন; এবং আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা "অপূর্ব্ব" নহে, ঐ উক্তি পূর্ব্বেই একজন সুপরিচিত সাহিত্য-সেবক করিয়া গিয়াছেন।

আপাততঃ অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয় আমার উপর কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলিতেছেন যে,—

(১) রবীন্দ্রনাথ যখন ষোড়শবর্ষ বয়স্ক অপরিণতবুদ্ধি বালক মাত্র, তখন তিনি 'ভারতী'তে মেঘনাদবধের একটা অতি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই কটূক্তিপূর্ণ সমালোচনার জন্য তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তথাপি সেই পরিত্যক্ত সমালোচনাটি আমি কার্ত্তিকের 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়া বলাইয়াছি যে মেঘনাদবধ 'নামে মাত্র মহাকাব্য।'

(২) আমার উদ্ধৃত সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথ যে বরখাস্ত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, উহা তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীতে কোথাও পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কেবল হিতবাদী একবার ইহাকে উপহার গ্রন্থাবলী ভুক্ত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিল।

(৩) রবীন্দ্রনাথ উত্তর কালে তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' লিখিবার সময় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, আমার উদ্ধৃত সমালোচনাটী সমালোচনাই নয়, তাহা নিছক গালিগালাজ মাত্র এবং অমর কাব্যের উপর অর্ব্বাচীনের নখরাঘাত করা মাত্র! উক্ত সমালোচনায় তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

(৪) আমি বোধ হয় জীবনস্মৃতি পড়ি নাই। যদি না পড়িয়া থাকি, তাহা হইলেও আমি অব্যাহতি পাইতে পারি না। "কারণ "জীবনচরিত রচনারূপ দুরূহ কার্য্যে যিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ যে শুধু নিতান্ত অশোভন তাহা নহে, রীতিমত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। আর সেই অজ্ঞতার ফলে যদি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় জগন্মান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে অন্যায় ও অপ্রকৃত কথা প্রচার লাভ করে তাহা হইলে সে অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইয়া পড়ে।"

---

* নিজের লেখার সমালোচনার প্রতিবাদ করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ এবং পূর্ব্বে তাহার অবসর পাইলেও কখনও করি নাই। কিন্তু বিষয়টি কিছু গুরুতর বলিয়া অগ্রহায়ণের 'মানসী মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয়ের 'আলোচনা' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে সমালোচকগণ অভিমত প্রকাশ না করিলে আমি বাধিত হইব; কারণ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার টীকা টিপ্পনী প্রকাশ করা স্বল্পাদেশর লেখকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। প্রস্তাবটি শেষ হইলে পাঠকগণ 'তিরস্কার কিম্বা পুরস্কার', যাহা দিবেন, তাহা "বহু মানে লব শির পাতি।"

তবে যদি কেহ সমালোচকের সিংহাসন হইতে নামিয়া বন্ধুভাবে এই অক্ষম লেখককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—

(১) ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ ভারতীর প্রথম বর্ষে মেঘনাদ-বধের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কার্ত্তিকের মাঃ মঃ তে আমি তাহা উদ্ধৃত করি নাই। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে, ৬ষ্ঠ বর্ষের ভারতীতে (ভাদ্র ১২৮৯ সালে) রবীন্দ্রনাথ অপর যে একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাই আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। এই সমালোচনাটির জন্য তিনি লজ্জিত বা অনুতপ্ত হইয়াছেন সে সংবাদ আমি পাই নাই।

(২) ষষ্ঠ বর্ষের "ভারতী" হইতে যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহা "পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর করকমলে" উৎসৃষ্ট 'সমালোচনা' নামক গদ্য গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩১০ সালে হিতবাদী রবীন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমে যখন উহা পুনর্মুদ্রিত করেন, তখনও এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণের জন্য তিনি লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন নাই।

(৩) জীবনস্মৃতিতে ষোড়শ বর্ষ বয়সের রচনার কথাই আছে, দ্বিতীয় প্রস্তাবটির উল্লেখ নাই। প্রথম রচনাটিতে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মত যে উত্তরকালে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এ কথা রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতিতে' বলেন নাই। কোন মাননীয় ব্যক্তি বহুমূল্য অথচ বহুছিদ্র-যুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কোন সভায় দম্ভ প্রকাশ করিয়া বেড়াইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নীরবে তাঁহার দাম্ভিকতা সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু কোন সত্যপ্রিয় বালক সেই ছিদ্রগুলির কথা যদি প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত করে, তাহা হইলে বালকটির চপলতা নিন্দনীয় হইতে পারে, তাহার সত্যনিষ্ঠা কোন মতেই নিন্দনীয় বিবেচিত হইতে পারে না। পরিচ্ছদটি যে বহুমূল্য তাহা যেমন সত্য, তাহাতে যে অসংখ্য ছিদ্র আছে তাহাও তেমনই সত্য। মাইকেলের কাব্যের যে মূল্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ এবং সমগ্র বঙ্গবাসী পূর্ব্বেও স্বীকার করিতেন এবং এখনও স্বীকার করেন ইহা যেমন সত্য, উহার যে অসংখ্য দোষ আছে তাহা শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, মাইকেলের অন্ধ পক্ষপাতিগণ ব্যতীত সমস্ত বঙ্গবাসী পূর্ব্বেও স্বীকার করিয়াছেন এবং এখনও স্বীকার করেন। 'জীবন-স্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চপলতার জন্য লজ্জা বা অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, তাঁহার মত যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন একথা বলেন নাই।

(৪) সুবিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট আমার নানা-বিষয়িণী অজ্ঞতা কৈফিয়তের আবরণে আবৃত করিবার চেষ্টা পাইব না; কিন্তু যে সত্যের অনুরোধে তিনি আমার অজ্ঞতা, বিচারশক্তিহীনতা, ও পক্ষপাতিতার প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সত্যের অনুরোধে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, অধ্যাপক মহাশয়ের ন্যায় পড়া শুনা না থাকিলেও আমি বাঙ্গালা গ্রন্থাদির কিছু কিছু সংবাদ রাখি এবং যখন প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, যে শিক্ষিত সমাজে মানসী ও মর্ম্মবাণী পঠিত হয়, সেই সমাজের সকলেই 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করিয়াছেন এবং অধ্যাপক মহাশয় জীবনস্মৃতি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগকে কিছু নূতন সংবাদ প্রদান করেন নাই। এই সঙ্গে সত্যের অনুরোধে আর একটি অপ্রিয় সত্য কহিলে আশা করি, অধ্যাপক মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন। জীবনচরিত রচনারূপ দুরূহ কার্য্যে যিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অজ্ঞতা প্রকাশ যেরূপ অশোভন এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধ, জীবনচরিত-সমালোচনা রূপ দুরূহ কার্য্যে যিনি প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পক্ষে অজ্ঞতা প্রকাশ ততোধিক অশোভন এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অবশ্য এদেশে এরূপ অজ্ঞ সমালোচকের অভাব নাই, কিন্তু অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিকে এই শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলে যথার্থই মর্ম্মাহত হইতে হয়।

যদিও আমি "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র কার্ত্তিকের সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ষোড়শবর্ষ বয়সের রচনাটি উদ্ধৃত করি নাই, অগ্রহায়ণের সংখ্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহা করিয়াছি। সংক্ষেপে তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি :—

যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে ষোড়শবর্ষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই অপরিণতবুদ্ধি এবং অর্ব্বাচীন ছিলেন, তাহা হইলে উহাই প্রমাণিত হয় যে, নির্ব্বোধ বালকেরাও মেঘনাদবধের অসাধারণ দোষগুলি এবং বৃত্রসংহারের অসাধারণ গুণগুলি অনায়াসে দেখিতে পায়।

কিন্তু অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা থাকিলেও, আমি ষোড়শবর্ষ বয়স্ক রবীন্দ্রনাথকে অর্ব্বাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। আমাদের দেশে একটি বচন প্রচলিত আছে "বয়সেতে বৃদ্ধ নয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে।" ষোড়শ বর্ষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অনেকে জীবনে তাহা দেখাইতে পারে না। মিলের প্রতিভা বাল্যকাল হইতেই কি আত্মপ্রকাশ করে নাই? নিউটন—(জগন্মান্য কবিবরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা যদি আমাদিগকে আর একজন

অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিতের সহিত তুলনায় উত্তেজিত করে, আশা করি তাহা হইলে গুপ্ত মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন)—জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর আইজাক্ নিউটন কত বৎসর বয়সে তাঁহার আবিষ্কার সমূহ প্রচারিত করিতে আরম্ভ করেন? শিক্ষা বিভাগে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে বোধ হয় প্রমাণ না দিলেও তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এদেশে বালকগণের মানসিকবৃত্তিনিচয় প্রতীচ্য দেশীয় ছাত্রগণ অপেক্ষা শীঘ্র বিকশিত হয়। গুপ্ত মহাশয় বোধ হয় জানেন, 'ভারতীর' প্রথম বর্ষে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকৃত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বাভাবিক বিনয়প্রযুক্ত যাহাই বলুন না কেন, এই সময়ে রচিত "ভানুসিংহের কবিতা" রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ কবিতা গুলির পার্শ্বেও নিষ্প্রভ দেখাইবে না। পৌঢ় বয়সে 'জীবনস্মৃতি' লিপিবদ্ধ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বিনয় বশতঃ নিজেকে অনেকস্থলেই মূর্খ বা অর্ব্বাচীন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু পণ্ডিতগণ যে কেবলমাত্র তাঁহার এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে যথার্থই মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইবেন একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। নিজের লেখার উপর রবীন্দ্রনাথ যে কশাঘাত করিয়াছেন, অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয়ের হস্ত হইতে সেই কশাঘাতের পুনরাবৃত্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিরূপ উপভোগ করিবেন তাহা অধ্যাপক মহাশয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? নিউটনের জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, লোকোত্তর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াও তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, তাঁহার যুগান্তরকারী আবিষ্ক্রিয়াসমূহ প্রচারিত হইবার পরেও তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" আশা করি, কোন বিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার ছাত্রগণকে এরূপ বুঝাইবেন না যে, নিউটন স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি বিজ্ঞানজগতের কোন উপকারই সাধিত করেন নাই, তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াগুলির কোন মূল্যই নাই।"

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ ষোড়শবর্ষ-বয়সের যে রচনাটির জন্য ৫১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই, যখন তাহার প্রতিভাসূর্য্য সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছে তখনও যে রচনার জন্য তিনি লজ্জা প্রকাশ করেন নাই, তাহার কোন্ কোন্ অংশের জন্য তিনি জীবনস্মৃতি লিখিবার সময় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং জীবনস্মৃতি লিখিবার সময় যে অনুতাপ হইয়াছিল এখনও সেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন কিনা, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অপ্রিয় সত্য কথনের জন্য লজ্জা এক বস্তু এবং মত পরিবর্ত্তন আর এক বস্তু। রবীন্দ্রনাথ যখনই যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমর্থনে অকাট্য যুক্তি তর্ক বা উদাহরণের অবতারণা করিয়াছেন। আমার ষোড়শবর্ষবয়স্ক রবীন্দ্রনাথের রচনাটির অনেকাংশ উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, গুপ্ত মহাশয়ের ন্যায় অনেকেই হয়ত সেই রচনাটি পাঠ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি বিশ্বাস করি যে সেই সমালোচনায় যে যুক্তি তর্ক বা উদাহরণের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ কিছু সত্য নিহিত আছে। যদি এই যুক্তি তর্ক অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয় অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তবে আশা করি রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ পড়িয়া তাহার পর গুপ্ত মহাশয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। আমার ক্ষুদ্র বিচার বুদ্ধিতে মনে হইয়াছে, উহাতে কিছু সত্য নিহিত আছে কিন্তু আমি উহা উদ্ধৃত করিয়া উহা বিচারক পাঠক মণ্ডলীর সম্মুখেই উপস্থাপিত করিয়াছি। তাঁহারা উহা অসার মনে করিলে পরিত্যাগ করিতে পারেন, সারবান মনে করিলে গ্রহণ করিতে পারেন।

আমার বিচার শক্তির অভাব যে অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। আমি স্বয়ং আমার অক্ষমতা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং সেই জন্যই, যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি অসাধারণ বিচার শক্তির জন্য বিখ্যাত, তাঁহাদিগের সমালোচনার অলোকেই হেমচন্দ্রকে দেখিতে প্রয়াস পাইতেছি।

গুপ্ত মহাশয়কে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। গুপ্ত মহাশয় এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে হেমচন্দ্রের প্রতি আমার অন্ধ পক্ষপাতিতা আছে। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হেমচন্দ্রের প্রতি আমার অন্ধ পক্ষপাতিতা থাকিবার কোন কারণই বিদ্যমান নাই। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁহার রচনায় হয়ত কোনও স্থলে বন্ধুর প্রতি পক্ষপাতিতা থাকিতে পারে। আমি হেমচন্দ্রকে কখনও দেখিবার সৌভাগ্যও লাভ করি নাই। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনও আত্মীয়তা ছিল না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ আমরা কায়স্থ। তাঁহার সহিত আমাদের পরিবারস্থ কাহারও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। হেমচন্দ্রের

উত্তরাধিকারিগণের নিকট আমার কোনও প্রকার উপকার প্রাপ্তিরও আশা নাই। "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদকগণের উদারতার কথা বোধ হয় গুপ্ত মহাশয়কে বলিতে হইবে না। অধিক দিনের কথা নহে, আমার অপেক্ষা যোগ্যতর এবং প্রবীণ সাহিত্য-সেবকের লিখিত মধুসূদনের কাব্য সমালোচনাদি তাঁহারা সাদরে প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং আশা করি গুপ্ত মহাশয়েরও মাইকেল ও নবীনচন্দ্রের কাব্য সমালোচনা ভবিষ্যতে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রভাবে বা প্ররোচনায় যে আমি হেমচন্দ্রের পক্ষগ্রহণ করিয়া লিখিতে বসিয়াছি এরূপ সন্দেহ ক্ষণকালের জন্যও মনে স্থান দেওয়া অনুচিত। বাস্তবিক হেমচন্দ্রের প্রতি আমার পক্ষপাতী হইবার কোন কারণই নাই।

পক্ষান্তরে মাইকেল মধুসূদনের প্রতি আমার পক্ষপাতী হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মাইকেল আমার প্রমাতামহ ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের চিরানুগত বন্ধু ছিলেন। কুপর্দ্দকবিহীন মাইকেলকে কিশোরীচাঁদ (তখন কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট) নিজের অধীনে ইন্টারপ্রিটার পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। আশ্রয়হীন মাইকেল বহুদিন আমার মাতুলালয়ে—কিশোরীচাঁদ মিত্রের আশ্রয়ে—বাস করিয়াছিলেন। মধুসূদনের অধিকৃত আমার মাতুলালয়ের সেই কক্ষ আজিও আমার মনে তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া আনে। কিশোরীচাঁদের আলয়ে অবস্থানকালে তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য মাইকেল সময়ে সময়ে ইংরাজী কবিতা বা গান রচনা করিয়া শুনাইতেন। আমি এইরূপ একটি ইংরাজী সঙ্গীত কিশোরীচাঁদের ডায়েরি হইতে প্রাপ্ত হইয়া 'বেঙ্গলীতে' কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলাম; 'মধুস্মৃতি'তে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় তাহা পুনরুদ্ধৃত করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রথম গ্রন্থগুলি কিশোরীচাঁদ মিত্রসম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'ই সর্ব্বপ্রথম সমালোচিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। মাইকেল স্ববিরচিত গ্রন্থাদির মুখপত্রে স্বহস্তে নাম লিখিয়া কিশোরীচাঁদ মিত্রকে যে সকল গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমি বহুমূল্য সম্পত্তি জ্ঞানে সযত্নে রক্ষা করিতেছি। আমি পূর্ব্বে একাধিকবার লিখিয়াছি যে, আমি অমর কবি মাইকেলের অনুরাগী ও গুণপক্ষপাতী।

জীবনচরিত লিখিবার যোগ্যতা আমার নাই তাহা জানি; কিন্তু জীবনচরিত লেখকের দায়িত্ব কত তাহা আমি কিয়ৎ পরিমাণেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সেই জন্যই সত্যের অনুরোধে মাইকেলের গুণ পক্ষপাতী হইলেও মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের তুলনামূলক সমালোচনায় বৃত্রসংহারের উচ্চতর স্থান নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি যদি কেবলমাত্র হেমচন্দ্রের অন্ধ পক্ষপাতী হইতাম, তাহা হইলে অন্ধভাবে তাঁহার স্তব করিতাম, ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় কীটদষ্ট দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রাদির আবর্জ্জনার মধ্য হইতে আমার অপেক্ষা অধিকতর বিচারশক্তিসম্পন্ন সমালোচকগণের অভিমত সংগৃহীত করিবার প্রয়োজন হইত না।

একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে হেমচন্দ্রের বিষয় লিখিতে বসিয়া আমি মাইকেলকে টানিয়া আনিলাম কেন? তাহার কারণ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব,—

(১) প্রথমতঃ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। সুতরাং হেমচন্দ্রের সমসাময়িকগণের কথা ও সেই সময়ের সাহিত্যের অবস্থার পরিচয় কিছু কিছু দিবার আবশ্যকতা আছে।

(২) আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা প্রায় সকলেই হেমচন্দ্রের প্রসঙ্গে মাইকেলের কথার অবতারণা করিয়াছেন। কোন কোন সমালোচক হেমচন্দ্রের রচনা তাদৃশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই বলিয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণে, হেমচন্দ্রকে মাইকেলের অনুকরণকারী বা শিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাইকেলের নিকট হেমচন্দ্রের ঋণ কত তাহা বিচার করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা আছে।

(৩) হেমচন্দ্র ও মাইকেল,—সাহিত্যাগগনের এই দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পারস্পরিক স্থান নির্দ্দেশ করিতে গেলে, মাইকেলের কাব্যের কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের ক্ষুদ্র এক পরিচ্ছেদে অবশ্যই সকল কথা আলোচনা করা সম্ভব নহে। মাইকেলের যে কোন গুণ নাই একথা আমরা কখনও বলি নাই। যে যে কারণে আমরা মাইকেলকে অমর মনে করি, তাহা যদি কখনও অবসর পাই, ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বলিবার চেষ্টা করিব। হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের এক সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে আমি কেবল ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মাইকেলের অসাধারণ দোষগুলি হেমচন্দ্র সতর্ক বিচক্ষণতার সহিত পরিহার করিয়া, বঙ্গসাহিত্যে একটি নির্দ্দোষ এবং অপূর্ব্ব মহাকাব্য দান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

"মেঘনাদবধ" ও "বৃত্রসংহার"

সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিলেও দেখা যায় যে, 'বৃত্রসংহার' মেঘনাদবধের অনুরূপ উপাদান লইয়া গঠিত। যেহেতু উভয় কাব্যেই ঘটনাগত সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। উভয় কাব্যেরই বর্ণনীয় বিষয় প্রায় এক প্রকার। এক পক্ষ উৎপীড়ক, অপর পক্ষ উৎপীড়িত। উভয় কাব্যেরই প্রতিপাদ্য বিষয়, উপীৎড়কের শাস্তিবিধান। একটির নায়ক রাক্ষস, অপরটির নায়ক অসুর। উভয় পক্ষই দেবতার বরে অমর এবং অজেয়। উভয়েই আত্মীয় পরিজনে বেষ্টিত। শত্রুযুদ্ধে উভয় পক্ষই ক্রমে ক্রমে হীনবল। কাব্য দুইটির উপাখ্যান ভাগে পার্থক্য এই যে, মেঘনাদবধের কবি এমন একটি জিনিষ ধরিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে অন্যপথে নামিতে হইয়াছে, আর "বৃত্রসংহারে"র কবি বিষয়টির একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। যুদ্ধের কারণও উভয়তঃ প্রায় এক প্রকারের—এখানেও পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ঘটনাগত সাদৃশ্য ছাড়া উভয় কাব্যের পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগত সাদৃশ্যও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। 'বৃত্রসংহারের' বৃত্রের চরিত্র যেন মেঘনাদবধের রাবণ-চরিত্রের অনুরূপ। সেইপ্রকার মেঘনাদের সহিত রুদ্রপীড়ের, রামের সহিত ইন্দ্রের, মন্দোদরীর সহিত ঐন্দ্রিলার, প্রমীলার সহিত ইন্দুবালার ও বন্দিনী সীতার সহিত বন্দিনী শচীর ব্যক্তিগত সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান এবং রক্ষঃকুলবধূ সরমার সহিত দৈত্যকুলবধূ ইন্দুবালার কার্য্যগত সাদৃশ্য সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান।

সীতা-শচী এবং সরমা-ইন্দুবালার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—

সীতা-শচী

(১) সীতাও বন্দিনী, শচীও বন্দিনী।

(২) সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনা হইয়াছে, শচীকেও সেই প্রকারে আনা হইয়াছে।

(৩) সীতা লঙ্কার অশোক বনে আবদ্ধা, শচী স্বর্গপুরে মন্দাকিনী তীরে আবদ্ধা।

(৪) সীতা তাঁহার স্বামীর হস্তে মুক্তি-প্রার্থিনী—স্বামী আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিবেন এই আশায় তিনি পথ চাহিয়া আছেন; শচীরও মনোভাব অনেকাংশে সীতারই অনুরূপ।

(৫) সীতা শত্রুপুরে একজন সখী লাভ করিয়াছিলেন, তিনি রক্ষঃকুলবধূ সরমা; শচীও সেইরূপ একজনকে পাইয়াছেন, তিনি দৈত্যকুলবধূ ইন্দুবালা।

সরমা-ইন্দুবালা

(১) সরমাও কুলবধূ, ইন্দুবালাও কুলবধূ।

(২) সরমা গোপনে শত্রুপত্নীর সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন, ইন্দুবালাও তাহাই করিয়াছেন।

(৩) সরমা সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষিণী পরাধীনা, ইন্দুবালার অবস্থাও তদ্রূপ।

(৪) সরমার স্বামী অনুপস্থিত, তিনি শত্রুর পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, ইন্দুবালার স্বামীও অনুপস্থিত, তিনি শত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় মহাকবি হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয়, তিনি স্পষ্টই বলিতে চান যে, বৃত্রসংহার রচনায় হেমচন্দ্র মাইকেলের নিকট কোন অংশেই ঋণী নহেন এবং 'বৃত্রসংহার' 'মেঘনাদবধ' অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উচ্চশ্রেণীর কাব্য। কিন্তু, উপরে লিখিত অনুরূপ ঘটনা এবং সাদৃশ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৃত্রসংহারের পরিকল্পনা মেঘনাদবধের সৃষ্ট আদর্শ হইতে গৃহীত, এবং হেমচন্দ্র মাইকেলের অনুবর্ত্তী।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

অপরাজিতা

(উপন্যাস)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাজিতার সংবাদ।

অন্ধকারে, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, অবনত মস্তকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে মহাদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিরূপে তাহার সন্ধান পাইলেন ?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া, কি জানি কেন মহাদেব বাবু সহসা কিছু উত্তর প্রদান করিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হয়, কিছু ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি অপরাজিতার কে, তাহা কি তুমি কখন তাহার মুখে শুনিয়াছ ?"

আমি বলিলাম—"আজ গাড়ীতে সে আমাকে বলিয়াছিল যে ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে তাহার এক কাকা কায করেন।"

মহাদেব। আমি সেই কাকা।

আমি। আপনি কিরূপে জানিলেন যে আজ সে কাশীতে আসিবে ?

মহাদেব বাবু। আমার স্ত্রী, অর্থাৎ তোমার ভাবী খুড়শাশুড়ী, মাঝে মাঝে অপরাজিতার পত্র পাইতেন। ইতিপূর্ব্বে অপরাজিতা তাঁহাকে লিখিয়াছিল যে, সে শীঘ্র কাশীতে আসিবে। কিন্তু সে যে ঠিক আজই আসিবে তা জানিতাম না।

আমি। তবে আপনি কিরূপে তাহার সন্ধান পাইলেন ?

মহাদেব বাবু। আমি ষ্টেসনে ডিউটীতে ছিলাম। প্লাটফরমে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, একস্থানে জনতা। এই জনতার মধ্যে তোমাকে দেখিলাম। কিন্তু তখন ত তোমাকে আমার ভাবী জামাতা বলিয়া চিনিতাম না। মনে করিলাম, তুমি কোন ফেরারী আসামী, পুলিস তোমাকে পাকড়াও করিয়াছে। এরূপ ব্যাপার নূতন নহে; মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। কাযেই উহাতে তত মনোযোগ না দিয়া, অগ্রসর হইলাম। দুই পা অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলাম, গাড়ীর একটা কামরার দরজা খোলা; এবং উহার মধ্যে অপরাজিতা বসিয়া কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে আরও কাঁদিয়া উঠিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া, তাহার মুখে ঘটনা মোটামুটি বুঝিয়া লইলাম।

আমি। সে আপনাকে কি বলিল ?

মহাদেব বাবু। সে বলিল, তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া, হরিদ্বার হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছ। বুঝিলাম, বাবাজীর চরিত্রটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়।

আমি। কেন ?

মহাদেব বাবু। অন্ততঃ একটা বিষয়ে ঠিক মিল আছে।

আমি। কিসে ?

মহাদেব বাবু। রুক্মিণীহরণে।

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম, আমার খুড়শ্বশুরটি মন্দ হইবেন না, বেশ রসিক লোক। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হরণ করায়, আমার প্রতি বিরক্ত না হইয়া, বরং তাহা লইয়া আমার সহিত কৌতুক করিতেছেন। আবার মাতাল সাজিয়া হাজতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করায়, তাঁহার চতুরতাও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। অল্পকাল নীরব থাকিয়া আমি তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—"সে আর কি বলিল ?"

মহাদেব বাবু। সে আর অধিক কিছু বলে নাই। কেবল তোমার এই আকস্মিক বিপদে ব্যাকুল হইয়া, কাঁদিতে লাগিল; এবং আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'কাকা কি হইবে ?' তাঁহার কাতরতা দেখিয়া বুঝিলাম, মার আমার পতি-ভক্তিটা

বিবাহের আগেই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, মা, তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া, দিনকতক বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখ। আমরা সহজেই বাবাজীকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিব; তখন তাহাকে এখানে আনিয়া, আমি নিজেই তাহার হাতে তোমাকে সম্প্রদান করিব। তুমি কাঁদিও না।

আমি। তাহার পর?

মহাদেব বাবু। তাহার পর আর কি? একটা খালাসীকে ডাকিয়া, ট্রাঙ্কটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া বলিলাম, "যা, গাড়ীর উল্টা দিকের দরজা খুলিয়া, ইহাকে আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দে।" আরও এ ব্যাপারটা অপ্রকাশ রাখিবার জন্য, তাহাকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলাম। এবং তাহারা চলিয়া যাইলে, উল্টা দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া প্লাটফরমে পূর্ব্ববৎ পায়চারি করিতে লাগিলাম।

আমি। সে আপনার বাটীতে যাইয়া আর ক্রন্দন করে নাই ত?

মহাদেব বাবু। না; তবে, তোমার সংবাদ লইবার জন্য এবং তাহার সংবাদ তোমাকে দিবার জন্য, আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি তাহার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি যে আগামী কল্য প্রাতঃকালের মধ্যে আমি তাহাকে সমস্ত সংবাদ দিব।

আমি। তাহা কিরূপে দিবেন? মাতাল হওয়ার জন্য, আগামী কল্য দশটার পরে ত আপনাকে আদালতে হাজির করিবে।

মহাদেব বাবু। না, সেরূপ কিছু ঘটিবে না। আমার এক উকিল বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক আছে। তিনি কাল সকালেই আসিয়া, জামীন হইয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। যে দিন মকর্দ্দমা উঠিবে, সেই দিন আদালতে হাজির হইয়া, অপরাধ স্বীকার করিয়া, দুই টাকা জরিমানা দিয়া আসিলেই চলিবে।

আমি। আমাদের জন্য আপনি অকারণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন।

মহাদেব বাবু। চুপ কর। তুমি কি শুনিলে না, যে অপরাজিতা আমার ভাইঝী। আমাদের আর পুত্রকন্যা নাই; অপরাজিতাই আমাদের সব। তাহার জন্য, তোমার জন্য, আমি কি আর বেশী করিলাম! তুমি জান না। এ কার্য্যে আমি এতটুকু লাঞ্ছনা ভোগ করিব না; বরং পরম সুখ উপভোগ করিব।

আমি। অপরাজিতা যে কাশীতে আসিয়াছে এবং নির্ব্বিঘ্নে আপনার বাসাবাটীতে বাস করিতেছে, এ সংবাদ কি আপনি তার যোগে তাহার পিতাকে জানাইয়াছেন?

মহাদেব বাবু। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই; সে সব আমি ঠিক করিয়া লইয়াছি।

আমি। তাঁহার অনুমতি না লইয়া তাঁহাদের কন্যাকে গোপনে আনয়ন করিয়া, আমি কি অন্যায় কাযই করিয়াছি!

মহাদেব বাবু। বাবাজী, তুমি দুঃখ করিও না। তুমি বেশ কায করিয়াছ। তাঁহারা অত বড় মেয়েকে আইবুড় রাখিয়াছিলেন কেন? এরূপ স্থলে, হরণে কোন পাপ নাই। আর দেখ বাবাজী, এই হরণ প্রথাটা অতি সনাতন প্রথা। রাবণরাক্ষস সীতাহরণ না করিলে, বাল্মীকি মুনি রামায়ণ লিখিতেন না;—পৃথিবী রামায়ণ পাঠে বঞ্চিত হইত। আর দেখ, মহাভারতেও রুক্মিণীহরণ, সুভদ্রাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি ভাল ভাল হরণের কথা মহামুনি ব্যাসদেব লিখিয়া গিয়াছেন। এ তুমি বেশ কায করিয়াছ। এখন এই ক্ষণিক বিপদ হইতে তোমাকে কোনও গতিকে উদ্ধার করিতে পারিলেই, আমি নিজেই কন্যা কর্ত্তা হইয়া এই খানেই তোমার বিবাহ দিব। দেখে রেখ, বাবাজী, অপরাজিতার সহিত তোমার বিবাহ দিবই দিব; তবে দু দিন এ দিক্ বা দু'দিন ও দিক।

ভাবী খুড়শ্বশুরের প্রতি পূর্ব্বেই আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল; একণে তাঁহার শেষোক্ত সুমিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া, তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিতে

ইচ্ছা হইল। আমি গাড়ীতে বসিয়া ভাবিয়াছিলাম, ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ইনি আমাকে লগুড়-লাঞ্ছিত করিবেন। কৈ, ইনি ত আমাকে সামান্য একটি রূঢ় কথাও বলিলেন না; বরং বলিলেন বেশ করিয়াছ! তাঁহার মধুর কথায় আমি সমস্ত বিপদের কথা ভুলিয়া গেলাম।

তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"এখন, বাবাজী তোমার এই বিপদটুকু থেকে যাহাতে সহজে তোমাকে নির্মুক্ত করিতে পারা যায়, তাহারই উপায় ভাবিতে হইবে। তা' সে কাযটা আমরা সকলে মিলে, অতি সহজেই করিতে পারিব। সে বিষয়ে তোমার কোন ভাবনা নাই।"

আমি বলিলাম—"অপরাজিতা নিরাপদে আছে, এ সংবাদ যখন পাইয়াছি, তখন আমার নিজের জন্য কোন ভাবনা নাই। আর শ্যামপুরের বিদ্রোহিগণের সহিত যখন আমার কোন সম্বন্ধই নাই, তখন বিচারক কিরূপে দণ্ডবিধান করিবেন?"

মহাদেব বাবু কহিলেন—"বিচারক সাক্ষীর মুখে যাহা শুনেন, তাহা হইতেই তাঁহার মতামত নির্দ্ধারিত হয়। কাযেই আমাদের কতকগুলি এমন সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে, যাহাদের কথায় বিচারক সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন। এইরূপ সাক্ষী এবং একটি সুবুদ্ধি উকীল—ব্যস—তাহা হইলেই এক বারে কেল্লা ফতে। ইংরাজ বিচারকের নিকট যদি একটা ইংরাজ সাক্ষী হাজির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে।"

আমি। কোথায় আমার বিচার হইবে?

মহাদেব বাবু। আলিপুরে,—চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট।

আমি। কবে?

মহাদেব বাবু। আগামী কল্য ইহারা তোমাকে লইয়া মোগলসরাই যাইবে; সেখানে একটার গাড়ী ধরিবে। পরদিন সকালবেলা হাওড়া পৌছিবে; এবং সেইদিনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তোমাকে হাজির করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট তোমাকে হাজতে রাখিবার হুকুম দিলে উহারা তোমাকে আলিপুরের জেলখানা হাজতে রাখিবে। পরে যেদিন মোকর্দ্দমার দিনস্থির হইবে, সেইদিন তোমাকে আবার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিবে। তখন তোমার দোষাদোষ সম্বন্ধে বিচার হইবে।

আমি। আলিপুরে আমার পক্ষে কোন্ ইংরাজ সাক্ষ্য দিবে? সেখানে কোনও ইংরাজের সহিত ত আমার পরিচয় নাই।

মহাদেব বাবু। সে আমরা ঠিক করিয়া লইব। সে তোমার কিছু ভাবনা নাই। এখন ক্যান্টমেন্ট ষ্টেসনে কাল তোমার একটা কায করিতে হইবে।

আমি। আমার হাতে হাতকড়া থাকিবে বলিয়া বোধ হয়। আবদ্ধ হস্ত লইয়া আমি কি কায করিতে পারিব?

মহাদেব বাবু। অপরাজিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

আমি। তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে?

মহাদেব বাবু। আমি মহাদেব, আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারি। কাল আমার খেলাটা দেখিতে পাইবে।

আমি। কি খেলা খেলিবেন? সেখানে পুলিসের লোক আপনাকে পূর্ব্বরাত্রের মাতাল বলিয়া যে সহজেই চিনিতে পারিবে।

মহাদেব বাবু। রামচন্দ্র! একেবারেই নয়। এখানে আমি গোঁপদাড়িযুক্ত, ধুতিচাদর পরা রামলাল দত্ত; জাতি সুবর্ণ বণিক; তীর্থদর্শনে আসিয়াছি; সেই উকীল বন্ধুর বাটিতে অতিথি। ষ্টেসনে আমি গোঁপ দাড়ি শূন্য কোট প্যান্টালুন পরা মহাদেব; তাহার উপর মাথায় ষ্টেসন মাষ্টারের টুপি, চোখে চশমা;—কাহার বাবার সাধ্য যে আমাকে চিনিতে পারে? তাহার পর, যাহারা রাত্রে আমাকে ধরিয়াছিল তাহারাই যে তোমাকে লইয়া ষ্টেশনে আসিবে, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। না,

বাবাজী, এখানকার কোন ব্যক্তি সেখানে আমাকে চিনিবে না। তুমি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাও। আমিও আমার বিছানায় যাইয়া, একটু ঘুমাইবার চেষ্টা দেখি।

এই বলিয়া, মহাদেব বাবু উঠিয়া আপন বিছানায় গেলেন। আমিও অপরাজিতার পুনর্দর্শন পাইবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শিউগোলাপ সিং, রামভরত লুনিয়া ও আলুলায়িত কুন্তলা অপরাজিতা।

পরদিন সকালবেলা ছয়টার সময়, প্রহরীরা আসিয়া মহাদেব বাবু ও আমাকে মুখ হাত ধুইবার স্থানে লইয়া গেল। সেই স্থান হইতে আনীত হইয়া, আমি আবার কারারুদ্ধ হইলাম। কিন্তু মহাদেব বাবু আর কারা-কক্ষে ফিরিলেন না। তাঁহার বন্ধু আসিয়া তাঁহার কল্পিত নাম ধাম লিখাইয়া এবং নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া, তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি কারাকক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই এই ঘটনা দেখিয়া গিয়াছিলাম।

বেলা নয়টার সময় পূর্ব্বরাত্রের ব্রাহ্মণ আমার আহার সামগ্রী লইয়া আসিল। আমি বিলক্ষণ ক্ষুধিত ছিলাম, যথেষ্ট আহার করিলাম।

বেলা দশটার সময়, একজন প্রহরী আসিয়া আমার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া, আমাকে লইয়া একটা গাড়ীতে তুলিয়া দিল। কতকগুলি মোট পুটালি লইয়া, সে গাড়ীতে পূর্ব্ব হইতে দুইজন প্রহরী বসিয়াছিল। তাহারাই আমাকে কলিকাতায় পৌছাইয়া দিবে। গাড়ীতে আমার বসিবার জন্য যে সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল, তাহাতে আমি কষ্টে উপবেশন করিলাম।

ষ্টেসনে আসিয়া তাহারা প্রথমে তাহাদের পুটালিগুলি নামাইয়া দিল, পরে নিজেরা নামিল এবং আরও পরে আমাকে নামাইয়া গাড়োয়ানকে কোনও ভাড়া না দিয়া বিদায় করিল। সে সেলাম করিয়া, যুক্তকরে ভাড়া প্রার্থনা করিলে, বলিল—"এ কি আমাদের বাপ দাদার ঘরের কায? এ সরকার বাহাদুরের কায; আমরা ভাড়া দিব কেন?" প্রহরীদের যুক্তিটা গাড়োয়ান বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছিল; কেন না সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল।

তাহাদের মোট পুটালিগুলি ও আমাকে লইয়া, তাহারা প্লাটফরমের একস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার, আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন-মাষ্টারের পোষাক পরিয়া, পাদচারণা করিতেছিলেন। তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনিই আমার অপরাজিতার 'খেলোয়াড়' খুল্লতাত; নতুবা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বরাত্রের ব্যক্তি বলিয়া কখনই চিনিতে পারিতাম না।

তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জমাদার সাহেব, কেমন আছ; এই আসামী বুঝি? ইহাকে লইয়া কোথায় যাইবে?"

এ প্রশ্নের মাধুর্য্য আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তাহার মৃদু মধুর রসে প্রহরিদ্বয় চিনির পুতুলের ন্যায় গলিয়া গেল। বোধ হয় মনে করিল, এই সুসজ্জিত ষ্টেসন মাষ্টারটি সত্যই বুঝি তাহাদের চিরপরিচিত বন্ধু, পরন্তু তাহাদের আকৃতির জৌলস দেখিয়া তাহাদিগকে বার টাকা বেতনের পাহারাওয়ালা না ভাবিয়া এক বারে বাইশ টাকা বেতনের জমাদার মনে করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন মহানন্দে মুখচর্ম্ম অবর্ণনীয়রূপে আকুঞ্চিত করিয়া মহাদেব বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্যজন শুভ্র দন্তগুলি আকর্ণ বিকশিত করিয়া কহিল—"বাবুজী, আপনার ন্যায় সমজদার লোক কি আমাদের পুলিসে আছে?"

তিনি কহিলেন—"থাকিলে, কি হইত?"

সে। আপনার মত লোক থাকিলে, আমরা নিশ্চয় এতদিন জমাদার হইয়া যাইতাম।

তিনি। বল কি? তোমরা এমন ভাল লোক, এমন হুঁসিয়ার লোক, তোমরা এখনও জমাদার হও নাই? এ বড় অবিচার ত!

সে। বড় অবিচার, বাবুজী বড় অবিচার।

তিনি। কিন্তু ইহার ত একটা কিছু বিহিত করিতে হইবে। আচ্ছা, আমার মনে একটা মতলব আছে, তোমরা একটা কায কর।

সে। কি?

তিনি। এস, আমার আপিসে এস। আমি তোমাদের নাম লিখিয়া লইব। তাহার পর, তাহা আমাদের বড় সাহেবকে জানাইয়া অনুরোধ করিব, যে তিনি যেন তোমাদের জন্য পুলিস সাহেবের নিকট সুপারিস করেন। জান ত, আমাদের বড় সাহেব, তোমাদের পুলিস সাহেবের কুপুর ছেলে। দুজনে ভারি ভাব—যেন হরিহরাত্মা; এক সঙ্গে শিকারে যায়, এক সঙ্গে মদ খায়; কি বলিব—একবারে গলায় গলায়! এস, এস আমার আপিস ঘরে এস, আমি এখনই তোমাদের নাম লিখিয়া লইব। লিখিয়া না লইলে, আমার মনে থাকিবে না।

এই বলিয়া, তিনি একজন খালাসীকে ডাকিয়া, আদেশ করিলেন—"এই জমাদার সাহেবদের মালপত্র আমার আপিসঘরে লইয়া চল।"

প্রহরিদ্বয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল —"আসামী?"

মহাদেব বাবু চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"ওঃ আসামী! আসামীকেও আপিসঘরে লইয়া চল। উহাকে এখানে ছাড়িয়া গেলে কি আর রক্ষা আছে; এখনই পলাইবে।"

অতএব তাহারা আমাকে লইয়া, আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর আপিস ঘরে প্রবেশ করিল।

এই আপিস ঘরের একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। ঘরটি বেশ প্রশস্ত। প্লাটফরমের দিকে তাহার তিনটি বড় বড় দরজা ছিল। তদ্বিপরীত দিকে একটি দরজা ও দুইটি জানালা; ঐ দরজার বাহিরে, গৃহভিত্তির ধারে আসিষ্টাণ্ট মাষ্টারের কোয়ার্টারে যাইবার একটি অপ্রশস্ত পথ, দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল। আপিস ঘরের উত্তর দিকে একটি জানালা, এবং দক্ষিণ দিকে লৌহদণ্ডগঠিত এক সুদৃঢ় দ্বার ছিল। ঐ দ্বার পিতলের একটা বৃহৎ তালার দ্বারা বন্ধ ছিল। ঐ দ্বার খুলিলে পার্শেল-গুদামে যাওয়া যায়। আমি দ্বারের লৌহদণ্ডের ব্যবধানের মধ্য দিয়া দেখিলাম, যে ঐ গুদাম ঘরে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপের ও ভিন্ন ভিন্ন গঠনের অনেকগুলি পার্শেলের বাক্স গৃহতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই গুদাম ঘরে অন্য কোন দ্বার বা গবাক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল আলোক প্রবেশ জন্য ছাদের উপর একটা বড় রকম আলোধর ছিল। আপিস ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিলের উপর কয়েকখানা বড় খাতা ও পুস্তক ছিল, এবং লিখনের উপকরণ সকল সজ্জিত ছিল। টেবিলের তিন দিকে কয়েকখানা চেয়ার ও একদিকে বড় বেঞ্চ ছিল।

প্রহরিদ্বয় আমাকে তাহাদের উভয়ের মধ্যে লইয়া, ঐ বেঞ্চে উপবেশন করিল। অ্যাসিষ্টাণ্ট মাষ্টার বাবু ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজ ও একটি লেখনী লইয়া তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

একজন বলিল—"লিখুন, আমার নাম শিউগোলাম সিং।"

অন্যজন বলিল—"লিখুন, আমার নাম রামভরত মুল্লিয়া। আমরা দুইজনই কাণ্টন্মেণ্ট ফাঁড়িতে থাকি।"

আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার বাবু তাঁহার হস্তধৃত কাগজখণ্ডে সত্যই তাহাদের মধুর নাম দুইটি লিখিয়া লইলেন। তাহার পর, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তোমরা এই ফেরারী আসামীকে লইয়া কোথায় যাইবে?"

রামভরত বলিল—"আমরা মোগলসরাই হইয়া, কলিকাতায় যাইব।"

আঃ ষ্টে বাবু। ওঃ! মোগলসরাই যাইবার গাড়ী আসিতে এখনও দুই ঘণ্টা দেরী আছে; তোমরা এত আগে আসিলে কেন?

অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর প্রশ্নের উত্তরে শিউ গোলাম হাই তুলিল। অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবু তিনটি তুড়ি

দিয়া, পকেট হইতে পাণের ডিবা বাহির করিয়া নিজে একটি পাণ গ্রহণ করিলেন; পরে আর দুইটি শিউ-গোলাম ও রামভরতকে প্রদান করিলেন; এবং একটি ক্ষুদ্র শিশি হইতে কয়েকটি স্ফূর্ত্তির দানা হাতের তালুতে লইয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য উহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। তাহারা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহাদের বিকশিত দন্তের রক্তশোভা সম্যক প্রকটিত করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। সুযোগ বুঝিয়া আসিষ্টাণ্ট বাবু বলিলেন—"দেখ, এতটা সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে?"

শিউগোলাম। আর কি করিব হুজুর! সঙ্গে আসামী, নড়িবার ত যো নাই।

আঃ বাবু। তা' বটে। তা' না হ'লে—এতটা সময় রহিয়াছে—আমি একবার তোমাদিগকে বড় সাহেবের কাছে লইয়া যাইতাম। তোমরা সেলাম করিতে, আর সাহেব তোমাদিগকে চিনিয়া রাখিতেন। তাহাতে বড় ভারি কায হইতে; কলিকাতা হইতে ফিরিতে না ফিরিতে তোমরা জমাদার হইয়া যাইতে।

রামভরত। বড় সাহেব সমঝদার লোক; আমাদের দেখিলে এবং আমরা তাঁহাকে সেলাম করিলে নিশ্চয় খুসী হইতেন এবং আমাদের বড় সাহেবের কাছে সুপারিস করিতেন। এই আসামীই সব বিগাড় দিয়াছে হুজুর।

শিউগোলাম। উহাকে ছাড়িয়া গেলে এখনই পলাইয়া যাইবে।

আঃ বাবু। না না, উহাকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না। কিন্তু না;—আচ্ছা! আচ্ছা, একটা কায কর না।

রামভরত। কি?

আঃ বাবু। এই পার্শেল গুদাম দেখিতেছ,—ভাল করে দেখ; এই পার্শেল গুদামে, উহাকে চাবি বন্ধ রাখিলে কি হয়?

শিউগোলাম। গুদামের চাবি?

আঃ বাবু। এই আমার পকেটে; এই লও।

এই বলিয়া, আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসনমাষ্টার বাবু তাঁহার কোটের পকেট হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া উহা শিউগোলামের হাতে দিলেন। শিউগোলাম চাবি লইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত লৌহদণ্ডগঠিত দরজাটি খুলিল; এবং সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় গুদাম ঘরের মধ্যে সুচতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে আসামী পালাইতে পারে এরূপ অন্য দরজা উহাতে নাই। সে তখন হৃষ্টচিত্তে বলিল—"ইহা খুব ঠিক হইবে। আসামীকে উহার মধ্যে রাখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে বড় সাহেবকে সেলাম করিবার জন্য যাইতে পারিব। হুজুর আমাদের হইয়া একটু ভাল করিয়া বলিলেই, আমরা এই মাসের মধ্যেই জমাদারী পাইব। আসল কথা বড়সাহেবকে একটু ভাল করে বলা চাই।"

আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার বাবু বলিলেন—"সে তোমাদের কোন ভাবনা নাই। আমি খুব ভাল করিয়া বলিব। বলিব, তোমরা জমীদারের ছেলে; দেশে, তোমাদের ক্ষেত আছে, বাগিচা আছে, তলাও আছে মহিষগরু আছে, পাকা ইমারৎ আছে, আর খুব খাতির আছে। সামান্য পাহারাওয়ালার কায করিতে তোমাদের লজ্জা বোধ হয়; দেশের লোকের কাছে মান থাকে না। বলিব, সাহেব, উহারা আমার পুরাণ দোস্ত, উহাদের জমাদারী দিতেই হইবে। আমার এই সকল কথা শুনিলে, এবং তোমাদের এই বাবুয়ানা চেহারা দেখিলে সাহেব একেবারে গলিয়া জল হইয়া যাইবে; আজই পুলিশ সাহেবের সহিত দেখা করিয়া তোমাদের নাম দুইটি লিখিয়া দিয়া আসিবে। এখন চল, সাহেবকে সেলাম করিবে চল।"

প্রহরিদ্বয় আমাকে লইয়া পার্শেল গুদামে পুরিল; এবং উহার চাবি বন্ধ করিয়া, উহা নিজের নিকট রাখিল। পরে আসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত ত্বরিত পদে কোথায় প্রস্থান করিল।

আমি গুদাম ঘরে ঢুকিয়া মনে মনে ভাবিলাম, মহাদেব বাবু আমাকে পার্শেল গুদামে নিক্ষেপ করিলেন কেন? অকারণ তিনি এ কার্য্য করেন নাই। কাল

রাত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, ষ্টেশনে অপরাজিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তবে গুদাম ঘরেরই কোন স্থানে অপরাজিতা লুকাইত আছে কি ?

আমি বলিয়াছি যে এই ঘরের এক কোণে চারিটি বড় বড় বাক্স উপর্য্যুপরি স্থাপিত ছিল। এই বাক্সগুলির পশ্চাতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সেখানে গৃহ কোণে একটা দ্বার আছে।

আমি বাক্সগুলির পার্শ্ব দিয়া সহজেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দ্বারে একটা তালা ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ তালা উহার চাবি সহ দ্বারসংলগ্ন একটা গজালে ঝুলিতেছে। নিগড়বদ্ধ হস্ত দ্বারা আমি সেই দ্বারটির ভিতর দিকে ঠেলিলাম। উহা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, ভিতরে এক সূর্য্যালোকিত কক্ষে দাঁড়াইয়া—সদ্যস্নাতা আলুলায়িত কুন্তলা অপরাজিতা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাজিতার স্বপ্ন।

আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসনমাষ্টারের কোয়ার্টারে দুইটি শয়ন-কক্ষ এবং ঐ দুইটা শয়ন-কক্ষের সম্মুখে ছোট একটি বারান্দা ছিল। বারান্দার বাহিরে ছোট একটি অঙ্গন। অঙ্গনের এক পার্শ্বে স্নানাদি করিবার জন্য একটি ঘেরা স্থান। তদ্বিপরীত দিকে কোয়ার্টারের বাহিরে যাইবার দ্বার। শয়ন কক্ষের বারান্দার বিপরীত দিকে আরও দুইটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল—তাহার একটিতে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হইত, অন্যটিতে ভাণ্ডারের দ্রব্য সংগৃহীত থাকিত।

যে কক্ষে অপরাজিতা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা উপরোক্ত শয়ন কক্ষ-দ্বয়ের অন্যতম। তাহাতে গৃহসজ্জা প্রায় কিছু ছিল না। কেবল এক পার্শ্বে একখানি বড় তক্তপোষ এবং তদুপরি বিস্তৃত একটি বিছানা। আর, তক্তপোষের নিম্নে অপরাজিতার সেই ট্রাঙ্কটি ছিল। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে যখন আমার ছয়জন প্রহরী মহাদম্ভে এই ট্রাঙ্ক ভগ্ন করিতে গিয়াছিল, তখন উহা ঐ নিরাপদ স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিতান্ত নিঃশঙ্ক ছিল। আমি সেই নিঃশঙ্ক ট্রাঙ্কের দিকে প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিলাম।

অপরাজিতা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পাণ্ডুর গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি বলিলাম—"কাঁদিও না। তোমার কোন ভয় নাই। আমি সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে সকল গোল মিটিয়া যাইবে। তাহার পর, তোমার কাকা বলিয়াছেন যে তিনি আমাকে সহজে উদ্ধার করিয়া, কাঁথিতে আনিয়া, নিজেই তোমার সহিত বিবাহ দিবেন। তিনি যাহা আশ্বাস দিয়াছেন, আমি বিশ্বাস করি তিনি তাহা অক্লেশে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কাল রাত্রে যে কৌশলে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং আজ এখানে যে কৌশলে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছেন, তাহাতে আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।"

অপরাজিতা বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল—"কাকা ছেলেবেলা হইতে ভারি সেয়ানা; উনি ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিলে অদ্বিতীয় লোক হইতেন।"

আমি। এই কাকা কি তোমার বাবার সহোদর ভাই ?

অপরাজিতা। হাঁ, কাকা বাবার আপনার ছোট ভাই। কাকা বলিয়াছেন যে এক ঘণ্টাকাল তুমি এই ঘরে থাকিতে পার। তাহার পর পার্শ্বেল গুদামে যাইয়া একটা পার্শ্বেলের বাক্সের উপর বসিতে বলিয়াছেন। তুমি ততক্ষণ এই বিছানাটায় বস, আমি তোমার জন্য কিছু জল খাবার লইয়া আসি।

আমি। আমি সকালে আহার করিয়াছি; এখন আর কিছু খাইব না।

অপরাজিতা। কিছু খাইতে হইবে। না খাইলে খুড়ীমা দুঃখ করিবেন। তুমি আসিবে জানিয়া তিনি বাড়ীতে ক্ষীরের বরফি নিজে তৈয়ারী করিয়াছেন;

আর এখন রান্নাঘরে বসিয়া, হিং দিয়া কলায়ের ডালের কচুরি ভাজিতেছেন। তাঁহার যত্নপ্রস্তুত খাদ্য না খাইলে, তাঁহার আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।

আমি। কিছু পরে, সেই পার্শেল গুদামে যাইবার পূর্ব্বে, খাইব। এখন তুমি আমার কাছে উপবেশন কর। আমি তোমার সহিত দুই একটা কথা কহিয়া লই।

এই বলিয়া, আমি শয্যার উপর উপবেশন করিলাম। অপরাজিতাও আমার পাশে উপবেশন করিল।

উপবেশন করিয়া অপরাজিতা বলিল—"কত দিন যে তোমায় এই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে তাহা ভগবান জানেন। কি কুক্ষণে তুমি বলিয়াছিলে যে তোমার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী! বোধ হয়, ঐ রূপ বলা তোমার ভাল কায হয় নাই। বৃদ্ধ সদানন্দ সয়গাল, তোমার আকৃতি তাহার পৌত্রের আকৃতির ন্যায় দেখিয়া স্নেহ পরবশ হইয়া, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, খাইবার জন্য তোমাকে মিষ্টান্ন প্রদান করিল। তাহার কাছে, অকারণ মিথ্যা পরিচয় প্রদান করা ভাল হয় নাই।"

আমি। আমি জীবনে অনেক মিথ্যা বলিয়াছি। দেখিয়াছি, যে মিথ্যা নিতান্ত নিরীহ, তাহার জন্যও দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সদানন্দ সয়গালের নিকট যে মিথ্যা বলিয়াছি, দেখিতেছি তাহার জন্য দণ্ডটা কিছু বেশী পাইতে হইবে।

অপরাজিতা। তুমি আর কখন অকারণ এরূপ মিথ্যা বলিও না।

আমি। না, অপরাজিতা, আর কখন আমি মিথ্যা বলিব না। একবার এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেই, পূর্ব্বে যে সকল মিথ্যা বলিয়াছি, তাহার সংশোধন করিব। বাবাজীকে, তোমার পিতাকে এবং অন্যান্য সকলকে আমার সত্য পরিচয় প্রদান করিয়া পত্র লিখিব; এবং মিথ্যা-কথন জন্য তাঁহাদিগের ক্ষমা ভিক্ষা করিব। আজ হইতে এ জীবন সত্যের পথে চালিত হইবে। কিন্তু জানিও, মিথ্যাই আমার জীবনের একমাত্র পাপ নহে। আমি অন্য অপরাধে সবিশেষ অপরাধী। আমার নিতান্ত অনাচরণীয় যোগধর্ম্মের অন্বেষণে বাহির হইয়া, আমি এক প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াছি।—আমার মাতাকে অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় ফেলিয়া, তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, আমি হরিদ্বারে গিয়াছিলাম;—ভগবানের আকস্মিক করুণালাভের প্রত্যাশায়, ভগবানের মূর্ত্তিমতী করুণা—মাতৃস্নেহ—বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম।

অপরাজিতা। তুমি দুঃখ করিও না। আমি বলিতেছি, নিশ্চয় আবার তুমি তোমার মাতার সাক্ষাৎ পাইবে; এবং তিনি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবেন। তখন দুই জনে একত্রে তাঁহার সেবা করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব। এখন ও সকল কথা আর ভাবিও না। এখন কেবল ভাবিবে, যে আমাদের মাথার উপর একজন আছেন, যিনি অহরহ আমাদের কল্যাণ সাধনে তৎপর রহিয়াছেন। তিনি তোমাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

আমি। বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব; তোমাকেও লাভ করিব। কিন্তু, বোধ হয়, এ জীবনে মার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। মহা মনকষ্টে, অর্থাভাবে তিনি কি এত দিন জীবিত আছেন?

অপরাজিতা। তিনি নিশ্চয় জীবিতা আছেন।

আমি। তুমি কিরূপে তাহা জানিলে?

অপরাজিতা। শোন বলি। মানুষের মনটা বড় মজার জিনিষ,—দর্পণের ন্যায়, তাহাতে ভবিষ্যৎ ও ভালমন্দের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। কি জানি কেন, আমার মন যেন আমায় বলিয়া দিতেছে যে তোমার মা নিশ্চয় বাঁচিয়া আছেন। তোমার মনে আছে, পশু সদানন্দ সয়গালের নিকট যখন তুমি মিথ্যা পরিচয় দিয়াছিলে, তখন আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, যে উহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে; আমি সে কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিতেছ,

মানুষের মন যাহা বলিয়া দেয় তাহা প্রায় মিথ্যা হয় না।

আমি। মন্দের বেলা মিথ্যা হয় না বটে, কিন্তু ভালর বেলা মিথ্যা হয়।

অপরাজিতা। ইহা ছাড়া, কাল রাত্রে একটা স্বপ্নে, আমি তাঁহার দর্শন পাইয়াছি।

আমি। সে স্বপ্নটা কি? আমায় বল।

অপরাজিতা। কালরাত্রে বিছানায় শুইয়া, আমার ঘুম আসিল না। তোমার ভাবনায় বার বার চোখে জল আসিতে লাগিল। কতক্ষণ এইরূপে অতীত হইল, তাহা মনে নাই। তাহার পর, ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম,—তোমার সহিত যেন কোথায়, কোন এক মজার দেশে গিয়া পড়িয়াছি। সেখানে একটা রাস্তা দিয়া, তোমার পাছু পাছু চলিতে লাগিলাম। রাস্তাটা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা, তাহার উত্তর ও দক্ষিণ ধারে সারি সারি বাড়ী। রাস্তার উত্তর ধারে, একস্থানে একটা উচ্চপ্রাচীর; সেই প্রাচীরের মধ্যদেশে, পিতলের কড়া লাগান একটা সবুজ রঙের বড় দরজা ছিল। সেই দরজা খুলিয়া, আমাকে লইয়া তুমি ভিতরে ঢুকিলে। দেখিলাম, ভিতরে একটি ছোট উঠান; উঠানের পশ্চিম দিকে, দুইটি পূর্ব্বমুখী একতলা ঘর; এবং ঐ দুই ঘরের সম্মুখে অপ্রশস্ত বারান্দা। ঐ উঠানের উত্তর দিকে, নিম্নতলে ও দ্বিতলে আরও ছয়টি ঘর ছিল; কিন্তু ঐ উঠান হইতে, ঐ উত্তর দিকের ঘর গুলিতে প্রবেশ করিবার কোনও দ্বার ছিল না; কেবল দক্ষিণ বাতাস প্রবেশের জন্য কতকগুলি জানালা ছিল। ঐ ঘর গুলি ভিতর বাটীর ঘর। ভিতর বাটিতে প্রবেশ করিবার জন্য, উঠানের উত্তর পশ্চিম কোণে একটা গলি পথ ছিল।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এ ত আমাদেরই শ্যামবাজারের বাটী!—সেই সবুজ দরজা; তাহাতে পিতলের কড়া; ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিবার সেই গলিপথ। দেখিতেছি, অপরাজিতা স্বপ্নে আমাদেরই শ্যামবাজারের বাটী দেখিয়াছে।—কি অদ্ভুত স্বপ্ন! পূর্ব্বে এইরূপ অদ্ভুত স্বপ্নের কথা দুই একবার শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ইহা যেন আরও অদ্ভুত, আরও আশ্চর্য্য! আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম—"তুমি ত আমাদেরই শ্যামবাজারের বাটীর স্বপ্ন দেখিয়াছ। তুমি স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছ, আমাদের বাড়ী ঠিক সেই রূপ।"

অপরাজিতা। আমি ত সকালে উঠিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, রাত্রে স্বপ্নে যে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদেরই বাড়ী।

আমি। তোমার স্বপ্ন বড়ই অদ্ভুত। তাহার পর স্বপ্নে আর কি দেখিলে বল।

অপরাজিতা। তাহার পর সেই গলিপথ দিয়া তোমার সহিত ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত ঘর গুলির সম্মুখে, উপর দিকে একটি লম্বা বারান্দা; বারান্দার পূর্ব্বদিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি; পশ্চিমদিকে স্নানাদি করিবার স্থান। বারান্দার বাহিরে পাকা উঠান; উঠানের পরপারে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ও কাঠকয়লা রাখিবার ঘর। দেখিলাম যে বাটীর মধ্যে আর কেহ নাই, কেবল তোমার মা রান্নাঘরের দরজার নিকটে শূন্য মেঝের উপর নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি নিকটে যাইয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে, তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন,—"আয়ুষ্মতী ও পুত্রবতী হইয়া, চিরকাল চিরসুখে স্বামীর সহিত বাস কর।"

আমি। আচ্ছা, স্বপ্নে তুমি মার আকৃতি কিরূপ দেখিলে বল দেখি।

অপরাজিতা। দেখিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা কিছু উন্নতাকৃতি এবং আমার চেয়ে কিছু রোগা। তাঁহার গায়ের রং প্রায় তোমার মত ফর্সা। তাঁহার ললাট তোমার মত প্রশস্ত ও উন্নত। তাঁহার বড় বড় চক্ষু, কিন্তু উহা কিছু কোটরগত। তাঁহার নাসিকা দীর্ঘ এবং বেশ টিকাল, কিন্তু নাসারন্ধ্র দুইটি বড়

বড়। তাঁহার হাঁমুখ কিঞ্চিৎ বড় এবং মুখের মধ্যে দাঁতগুলি অসমান। তাঁহার বাম গালে একটা ক্ষতের লম্বা চিহ্ন আছে।—বল, আমি সত্যই তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি কি না।

আমি। তুমি সত্যই ঠিক আমার মাকে দেখিয়াছ। —তোমার কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! স্বপ্নে তিনি তোমার সহিত কি কিছু কথা কহিলেন?

অপরাজিতা। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'তুমি আমার গৃহত্যাগী বিরাগী পুত্রকে, সংসারী করিয়া, দেশে ফিরাইয়া আনিয়া আমাকে চিরসুখী করিয়াছ, এজন্য আমার আশীর্ব্বাদে তুমি চিরসুখিনী হইবে, দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা জীবনে কখনও জানিতে পারিবে না।

আমি। আমার মা তোমাকে যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা যাহাতে সফলতা লাভ করে, এ জীবনে তাহাই আমার সাধনা হইবে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে তোমাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিব; প্রাণপণ শক্তিতে তোমার সমস্ত দুঃখ নিবারণ করিব।

অপরাজিতা। নিত্য তোমাকে নিকটে পাইলেই আমি সকল সুখে সুখিনী হইব। বোধ হয়, তোমার এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আরও পনের দিন সময় অতিবাহিত হইবে। তাহার পর, আমি তোমার সহিত জীবনব্যাপী সুখ লাভ করিতে পারিব।

কক্ষের বাহিরে বারান্দায় চুড়ি ও বালার মৃদু টুন্ টুন্ শব্দ হইল। অপরাজিতা চকিত নেত্রে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"খুড়িমা তোমার জলখাবার লইয়া আসিয়াছেন।" এই বলিয়া সে ত্বরিত পদে কক্ষের বাহিরে যাইয়া, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যে সজ্জিত একটি কাংস্যস্থালী লইয়া আসিল; এবং উহা কক্ষতলে রাখিয়া পুনরায় বাহিরে যাইয়া ছোট একটি কম্বলাসন ও এক গ্লাস জল আনয়ন করিল। তাহার পর, আমার নিগড়বদ্ধ হস্তের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"কিরূপে আহার করিবে? এস, আমি তোমাকে খাওয়াইয়া দিব।"

সে'টা স্বপ্নে নহে;—সত্যই অপরাজিতা আমাকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল। তাহার নবনীত হস্ত হইতে আহার গ্রহণ কালে, কে জানে আমি কতবার তাহা চুম্বিত করিয়াছিলাম। কে জানে তাহাতে কতবার অপরাজিতার চক্ষু দুইটি অনুরাগভরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কতবার তাহার অমল কপোলতল অনুরাগের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল।

আমার আহার ও আচমন শেষ হইলে, অপরাজিতা আপন বসনাঞ্চলে আমার মুখ মুছাইয়া দিল। পরে একটি ডিবা হইতে একটি পাণ লইয়া আমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"পাণ খাও।"

আমি বলিলাম—"না। তোমার কাকার উপদেশানুযায়ী এখনই পার্শেল গুদামে যাইয়া বসিতে হইবে। মুখে পাণের রক্ত চিহ্ন দেখিলে, পাহারাওয়ালাদের মনে সন্দেহের উদয় হইবে, এবং ধরা পড়িয়া যাইব।"

দুই চারিটা মশলা মুখে দিয়া, অপরাজিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, আমি আবার পার্শেল গুদামে প্রবেশ করিয়া, নিরীহ ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কেরোসিন-কলঙ্ক

বাঙ্গালী মেয়ের কেরোসিনে আত্মহত্যা একটা ফ্যাসান হইয়া পড়িল দেখা যাইতেছে। প্লেগ, বসন্ত, ওলাউঠার মত এটাও একটা সংক্রামক ব্যাধি স্বরূপ দাঁড়াইয়া গেল। অল্প বয়সের মেয়েদের ভিতরই রোগটা বেশী প্রবল। ইহার কারণ কি? ইহার প্রতিকার হয় কিসে? তাহা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। কোন কোন সংবাদপত্র, কোন কোন মাসিকপত্র গুরুগম্ভীর মন্তব্যপ্রকাশ করিতেছেন। সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। আলোচনা এবং প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

কি অশুভক্ষণেই কুমারী স্নেহলতা পথ দেখাইয়াছিল। কিন্তু সে বালিকার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ; সে নিজের পিতাকে এক বিষম দায় হইতে উদ্ধার করিতে কেরোসিন সাহায্যে আত্মপ্রাণ অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিল। আত্মহত্যা মহাপাপ হইলেও, তাহার উদ্দেশ্যের দিকে চাহিয়া, অবোধ বালিকাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাহার পর, মরণের এমন সহজ উপায়ের সন্ধান পাইয়া, এই যে এতগুলি বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া পর্য্যন্ত কাপড়ে কেরোসিন লাগাইয়া আগুনে পুড়িয়া মরিল, ইহাদের বেলা কি বলা যায়? সকারণে, অকারণে, অযথা কারণবশতঃ এই যে অনেক নারী প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলা খেলিল, ইঁহাদিগকে কি বাহবা দিতে হইবে? বাহবা না দিন, দেখিতেছি ইহাদের জন্য দুঃখে সহস্রধারায় অনেকের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। দুঃখ কি? না, সে বেচারীরা শ্বশুরালয়ে এত জ্বালাযন্ত্রণা পাইয়াছে যে, সে কষ্ট এড়াইতে নিজের দুর্লভ প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেয় মনে করিল। ইঁহাদের কোমল প্রাণ, ইঁহাদের সহানুভূতি-প্রবণ হৃদয়কে তারিফ করিতে হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সহানুভূতি প্রদর্শনটা এমন ভাবে হইলে ভাল হয়, যাহাতে এই সর্ব্বনেশে প্রথাটা প্রশ্রয় না পায়। একটি কচি মেয়ে পুড়িয়া মরিল, ইহাতে দুঃখিত হয় না এমন পাষণ্ড কে আছে? কিন্তু তাহার মরিবার কারণটা একটু তলাইয়া দেখিলে, বেশী দুঃখ হয় বালিকার বিবেচনা-শক্তি, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতার একান্ত অভাব দেখিয়া—ধর্ম্মভাবের কথা নাই বলিলাম।

দোষটা পড়িতেছে সর্ব্বতোভাবে শ্বশুর শাশুড়ী এবং শ্বশুরবাটীর লোকের উপর। কিন্তু ইহাও কি সম্ভব নহে যে, গৃহকর্ম্ম করিতে নারাজ, কথার অবাধ্য এবং তজ্জন্য মুখনাড়া খাইয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর সমধিক কোপবিশিষ্টা এমন হিষ্টিরিক মেয়েও থাকিতে পারে, যে তাঁহাদিগকে সাধারণের নিকট হইতে গালি খাওয়াইবার এবং আনুসঙ্গিক কারণে জব্দ করিবার মৎলবে আত্মহত্যা করিতে সমর্থ?

দেখিতেছি সবাই দুষিতেছেন শ্বশুর-শাশুড়ী-শ্রেণীকে। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—শ্বশুরবাড়ীতে জ্বালা যন্ত্রণা পাওয়া (অবশ্য কোন কোন স্থলে) আজই কি এই অল্পদিনের ভিতর আরম্ভ হইয়াছে—না চিরকালই আছে? পূর্ব্বেও ত বধূদিগের এ অসুবিধার অভাব ছিল না; কিন্তু এমনতর পুড়িয়া মরা ত সেকালে দেখা যাইত না। এক আধটা গলায় দড়ী, এক আধটা আফিম গেলা, আগেও যে ছিল না এমন নহে, সে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়; সকল দেশে, সকল সমাজেই তেমন আছে। কিন্তু এখন এ আমাদের দেশের হইল কি? বধূর পক্ষে 'শাশুড়ী ননদী বৈরী' চিরকালই ত আছে; কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর মাত্র—এত দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৈ এ হাওয়া উঠে নাই—এই আগুন আলিঙ্গন ফ্যাসানের আবির্ভাব হয় নাই। সকল জ্বালা জুড়াইবার এমন সহজ একটা উপায়, যাহা নিজেরই আয়ত্তের ভিতর রহিয়াছে, এতদিন খেয়াল হয় নাই, এখন বুঝিতে পারা গিয়াছে—এই নিমিত্তই না এত বাড়াবাড়ি? বোধ হয় আরও সহজ, আরও কম কষ্টসাধ্য অন্য

একটা উপায় কেহ বাৎলাইয়া দিলে, দেশে এই আত্ম-হত্যার সংখ্যা আরও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

কোথাও কোথাও শ্বাশুড়ী ননদের হাতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, কিংবা স্বামীর নিকট হইতে অনাদর অবমাননা নির্য্যাতন লাভ, এখন অপেক্ষা আগেকার কালে—বেশী দিন পূর্ব্বে যাইতে হয় না, আমাদের দু' এক পুরুষ পূর্ব্বেকার সময় পর্য্যন্ত—বোধ করি বেশীই ছিল। চড়টা চাপড়টারও সংবাদ পাওয়া যায়। বহুবিবাহ-প্রথা, কৌলীন্য মর্য্যাদা এ বিষয়ের বিস্তর সাক্ষ্য দিতে পারে। এক সংসারে সপত্নীসহ বসবাস, স্বামী কর্ত্তৃক প্রথম পক্ষের স্ত্রীর প্রতি অবহেলা তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব, এমন কি সময়ে সময়ে (এখনকার চক্ষে) বর্ব্বরোচিত ব্যবহার, সেকালের সেই দুয়োরাণী সুয়োরাণীর কাহিনী মনে পড়াইয়া দেয়। অনেকেই এ সব পড়িয়াছেন; অনেকেই শুনিয়াছেন, প্রাচীন যাঁহারা তাঁহারা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈ, অত উপদ্রব অত্যাচার জ্বালা সত্ত্বেও তখনকার কালে বধূরা ত ছুটিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইত না! সাবেক সে সকল নির্ম্মম দুঃখ কষ্টের হাত হইতে হালি বধূমাতারা বরং অনেকটা অব্যাহতি পাইয়াছেন মনে হয়। যে সকল যন্ত্রণা আগেকার বধূরা সংসারে থাকিয়া সহ্য করিয়া গিয়াছেন, অন্তরের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া, সংসার মাথায় করিয়া, ঘরের কথা পরকে জানিতে না দিয়া হিন্দু ললনার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন, সে জাতীয় উৎকট দুঃখকষ্ট এখনকার কালে—এই পাণ থেকে চুণ খসিলে সর্ব্বনাশের দিনে—লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। অল্পদিন পূর্ব্বেকার কথা বলিতে গেলেও, "বউ কাঁটকি শ্বাশুড়ী"র নাম অধিক শুনা যাইত। অল্পদিন পূর্ব্বেও কোন কোন শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূকে যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়া গালি পাড়িতেন, এখনকার শ্বাশুড়ীরা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার দিনে বোধ হয় সে সকল বাক্য মুখে উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। স্বামীর হাতে কিল খাইয়া স্ত্রী সে কিল চুরি করিয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বপর্য্যন্তও এমন দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না।

কিন্তু এখন শিক্ষার গুণে হউক, ভিন্নধর্ম্মী জাতির সংস্রবে আসিবার দরুণ হউক, হিন্দু সমাজের আব-হাওয়া বদ্‌লাইয়া গেছে। শ্বাশুড়ী ননদেরও সেই আগেকার মত 'দাপ' বা প্রতাপ নাই, স্বামী বেচারাও সে 'মুরদ' আর নাই, তবুও বধূমাতাদিগের এত রাগ, এত অভিমান, এই সংসার মজাইবার প্রবৃত্তি! ইহা কি হিষ্টিরিয়া, বায়ুরোগ? *

ইহার কারণ কি? শ্বশুরবাড়ীর জ্বালাযন্ত্রণাই কি প্রকৃত কারণ ও এক মাত্র কারণ? স্থলবিশেষে তাহাও কতকটা কারণ হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র কারণ কখনই নহে! পূর্ব্বে পূর্ব্বে বালিকারা মা মাসীর চাল চলন দেখিয়া, তাঁহাদের মুখে 'কথা', সেকালের গল্প শুনিয়া রীতিনীতি শিখিত, সংবৎ শিখিত, যাহার সহিত যেমন ব্যবহার করিতে হয় শিখিয়া লইত; আর শিখিত—বিবাহের পর যে সংসারে প্রবেশ করিতে হয়, ভাল হউক মন্দ হউক, সে আমারই ঘর, আমারই সংসার; সেখানে জ্বালা থাক, যন্ত্রণা থাক, সে আমার কপাল; পূর্ব্বজন্মে যে বীজ বপন করিয়া আসিয়াছি এজন্মে তাহারই ফল ভোগ করিতেছি; দেবতা অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহার খণ্ডন নাই; যেমন করিয়া হউক সকলই আমায় সহ্য করিতে হইবে—ইহাই তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সহিতে পারিব না, ধর্ম্ম উপায়ে হউক, অধর্ম্ম উপায়ে হউক, যে করিয়া হউক সংসারের সহিত সংস্রব ঘুচাইতে হইবে—তাহার ফল যাহাই হউক না কেন, আত্মীয়স্বজনের মাথা হেঁট হয় হউক, হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া ছাগল ভেড়ার

* গবর্ণমেণ্টের শব ব্যবচ্ছেদের ডাক্তার সাহেব এই রকম পোড়া মেয়ের শব পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, কাহারও কাহারও গর্ভনাড়ী ব্যাধিগ্রস্ত ছিল এবং ঐ ব্যাধি হইতে স্ত্রীলোকের খুন আত্মহত্যা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তাহা হইলে, অনেক বালিকার আত্মহত্যা শ্বাশুড়ীর দোষে নাও হইতে পারে।

মত আমার মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করে করুক—বয়ে গেল! আমাকে ত আর দেখিতে আসিতে হইবে না! এখনকার মত এই প্রকার সব উদ্ভট ভাব তাহাদের মনে আদপেই আসিত না।

আর এখন? এখন বালিকারা মা মাসী গুরুজনের কাছে গল্প ছলে নীতিকথা শুনিয়া, ঠাকুরমা দিদিমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া নিজ নিজ চরিত্র গঠনের অবকাশ পায় না। হিন্দু স্ত্রীর ধৈর্য্য, হিন্দু স্ত্রীর সহিষ্ণুতা, হিন্দুস্ত্রীর কর্ত্তব্য জ্ঞানের আভাস পাইবে কোথা হইতে? তৎস্থলে তাহাদের হয়ত শিখিতে হয় স্কুলকলেজের পাঠ্য পুস্তকের বিদ্যা—বাঘ ভালুকের উপকথা, দেশ বিদেশের তরবেতরো আজব কথা, বড় জোর চাণক্য ও অন্যান্য নীতিশ্লোক। কিন্তু তা মুখস্থই সার, কণ্ঠস্থও বোধ হয় হয় না। এই শিক্ষার ফল এই দাঁড়ায় যে, বিবাহের পূর্ব্বেই সেই সামান্য বিদ্যার জোরে তাহাদের রাশি রাশি নাটক নভেল, ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়া হইয়া যায়। তাহাতে স্বামী স্ত্রীর প্রেম বা প্রণয়ের সম্বন্ধে, শ্বশুর বাটীর সম্পর্কীয় জনের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে আগে হইতেই তাহাদের কতকগুলা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া থাকে। প্রবাদই আছে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। সেই সব ধারণা লইয়া, অপরিস্ফুট জ্ঞানবিশিষ্টা কোন বালিকা যখন শ্বশুরঘর করিতে গমন করে, তখন আর হালে পানি মিলে না। তাহার সাধের কল্পনা-গঠন ভাসিয়া যায়; আকাশকুসুম বাতাসে মিলায়। তখন হতাশার ধাক্কায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ ছিল। ৮।৯।১০ বৎসরের বালিকার নভেল পড়াও হয় না, নভেলী আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইবার অবসর হইত না। এখন সাধারণতঃ হিন্দুর ঘরে বালিকাগণের এমন বয়সে বিবাহ হয়, যখন তাহারা গুরুজনের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নাটক নভেল ডিটেকটিভ উপন্যাস অনেকগুলি গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে; শুধু গলাধঃকরণ নহে, পল্লবগ্রাহিতা গুণে সে সমস্ত রোমন্থন করিতে করিতে তদ্ভাবে কতকটা বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। এখন অনেক স্থলে তাহারা শ্বশুরঘর করিতে গিয়া দেখে, যাহা এত দিন ধরিয়া আশা করিয়াছিল, সেখানে তাহার কিছুই নাই। না আছে সে নাটকের স্বামী, না আছে সে উপন্যাসের শাশুড়ী ননদ। তখন তাহার মন দমিয়া যায়। বহু স্থলে স্বামী হয়ত অন্নচিন্তায় ব্যস্ত, জীবন সংগ্রামে হয়ত কাবু হইয়া পড়িয়াছে, আকাঙ্ক্ষিত আদর সোহাগের অবসর হয় না, সুতরাং নববধূর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা অল্প। বিশেষতঃ তিনি যদি আবার অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহের কন্যা হন, তাহা হইলে বাপের বাড়ীর আদুরে মেয়ে হইয়া, শুইয়া বসিয়া, খোস মেজাজে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতে পড়িতে, তাস পিটিতে পিটিতে, হাসিয়া খেলিয়া তাহার যেমন সময় কাটিত, শ্বশুরবাড়ী তাহার কিছুই হইবার জো নাই। তৎস্থলে এখানে সংসারের কায কর্ম্ম করিতে হয়, খাটিতে হয়, গৃহস্থ ঘরে হয়ত দুধ জাল দিতে, রসুই করিতে হয়। এ সব কায কোন কালেই সে করে নাই, এ সবে সে অভ্যস্তই নয়। আর এত সব করিতে গেলে পশমের কুকুর বোনা হয় কৈ? একটু আধটু কবিতা রচনার সময় থাকে কৈ? নবীন নবীন গ্রন্থকারের গল্প উপন্যাস পড়িবার অবসর পাওয়া যায় কৈ? সুতরাং এমন সব বালিকার পক্ষে অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ী বিষ হইয়া উঠে, শ্বশুরালয়ের সকলকে শত্রু মনে হয়। ইহাদের বিবাহিত জীবন সুখের কি করিয়া হইতে পারে? তাহার উপর আবার শাশুড়ী ননদ যদি সংসারের কায কর্ম্ম করিবার তাড়া লাগান, এবং কায কর্ম্মে মন না দিলে ধমক টিটকারী করেন, তাহা হইলে সে শ্বশুরঘর অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। যেমন করিয়া হউক সেখান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করা শ্রেয় হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকের নিকট প্রাণের মায়া তুচ্ছ সামগ্রী—বিশেষতঃ এখনকার দিনে—যখন আত্মহত্যা—আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা অনেকের কাছে একটা নাম কিনিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সেদিন কোন প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে বর্ত্তমান প্রসঙ্গ লইয়া কোন বাঙ্গালী মহিলার লিখিত একটি

হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ দেখিতেছিলাম। তাঁহার 'প্রতিকার প্রার্থনা' মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে,

"সে (আত্মহত্যাকারিণী বালিকা) যে সংসারে প্রবেশ করিল, সেটা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র,—যাহাদের পাইল, তাহাদের সহিত সম্পর্কটা এ জন্মের মত অবলম্বন;—এ কথা সে বুঝিতে পারে নাই, ইহা কখনই যথার্থ হইতে পারে না।"

যথার্থ হইতে পারে; তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়। শ্বশুর শাশুড়ীর ভর্ৎসনা, স্বামীর উচিত তিরস্কার—এ সকলকে সে তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় এবং অনধিকার চর্চ্চা মনে করে, তাই তাহার বড় বেশী গায়ে লাগে। অসহ্য মনে হয় বলিয়াই ত অমন অকর্ম্ম করিতে ইতস্ততঃ করে না। 'জন্মের মত অবলম্বন' বুঝিতে পারিলে, সে অবলম্বন রজ্জু টানিয়া ছিঁড়িতে যাইবে কেন? 'প্রতিকার প্রার্থনা' মধ্যে আরও রহিয়াছে,—

"ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না যে, সে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে সেই সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করে নাই......।"

ইহাও সত্য হইতে পারে। আমরা নিত্যই তাহার নিদর্শন পাইতেছি। জানি না লেখিকা হিন্দুসমাজ-ভুক্তা কোন মহিলা কি না। যদি তাহা হয়, তবে তাঁহার বোধ হয় সোণার সংসার। এক ফোঁটা মেয়ে—নিতান্ত এক-গুঁয়ে, একেবারে কথার অবাধ্য, শ্বশুর শাশুড়ীকে দৃক্‌পাতের ভিতর আনে না, দাম্ভিকা—এরূপ বধূদিগের তিনি পরিচয় পান নাই। লেখিকা যদি ব্রাহ্ম-পরিবার ভুক্তা কেহ হন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ হিন্দু পরিবারের ভিতরকার খবর তিনি বেশী অবগত নহেন। যাঁহাদের ঘরে মেয়েদের বেশী বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, বেশী লেখাপড়া শেখা হইয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞান বুদ্ধি যথেষ্ট বিকাশের অবসর হইয়াছে ধরিয়া লওয়া চলে, তাঁহাদের ঘরে এমন কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। তাঁহারা ব্যথাটা ঠিক বুঝিবেন না।

এতটুকু মেয়ের এখন যা 'গ্যাদার', দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। আমি জানি, কোন গৃহস্থ ঘরে একটি অল্পবয়স্কা বধূ একদিন বায়না ধরিলেন, পাশের বাড়ীর তাহার সখীরা থিয়েটার দেখিতে যাইতে-ছেন, তিনিও যাইবেন। তাঁহাদের বাড়ী মেয়েদের থিয়েটারে যাওয়া রেওয়াজ ছিল না, শ্বশুর খাশুড়ী মত করিলেন না, তাহাতে বধূমা রাগ করিয়া করিলেন কি জানেন? ঘরে কার্ব্বলিক এসিড ছিল, তাই খানিকটা খাইয়া বসিলেন! আর এক ঘরে, একটি এখনকার নূতন বৌ ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাওয়া আসা করিতেছিলেন, শাশুড়ী বলিলেন, "অমন করিলে আপনার ঘরে মন বসিবে কেন? এবার আর ছয় মাস বউ পাঠাইব না।" এই না শুনিয়া, বধূমাতা তাঁহার 'পূজনীয় বাবা'কে চিঠি পাঠাইলেন, এখানে অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ী তাঁহার ভয়ানক কষ্ট হইতেছে, সকলেই তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতেছে, শাশুড়ী তাঁহাকে এক ঘরে পুরিয়া চাবি দিয়া রাখিয়াছে।—বাপও পরদিন পুলিশ লইয়া হাজির! এমন কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সমাজ যে আমাদের কি হইয়া যাইতেছে, আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি; যাঁহারা জানেন না, তাঁহা-দিগকে ভিতরকার খবর জানাইতে লজ্জিত হইতে হয়।

অবশ্য এখনকার সকল বধূই যে নিন্দাযোগ্য, আর সকল শাশুড়ীই যে বধূদিগের প্রতি একান্ত স্নেহবতী ইহা প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অনেক স্থলে হয়ত শাশুড়ী বাগাইয়া লইতে জানেন না বলিয়াই বউ বিগড়াইয়া যায়। কিন্তু ইহা স্থির যে অধিকাংশ স্থলে শাশুড়ী অপেক্ষা বধূর দোষেই, এখনকার এই যে সব অত্যাহিত, এ সকল ঘটিতেছে।

ইহার কারণ কি? কতকটা কারণের পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। তার পর আরও একটা প্রধান কারণ, ধর্ম্মে আস্থাহীনতা। আজকাল কি পুরুষ কি মেয়ের, ধর্ম্মে আস্থা শোচনীয়ভাবে কমিয়া যাইতেছে। পরকাল আছে কি না ঠিক নাই, ইহকালের কাযের জন্য পরকালে দুঃখ পাইতে হইবে কি না কে জানে; এই প্রকার ত ধারণা দাঁড়াইতেছে। আত্মহত্যায়

পাপ আছে, সে পাপে ভয়ঙ্কর নরক ভুগিতে হয়, এ সকল শাস্ত্রের কথা কে বা শুনায়, কে বা শুনে, শুনিলেও কেহই বা মানে? কন্যাদের, বধূদের যদি শৈশব হইতে ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিশিক্ষা হইত, যদি পরকালে বিশ্বাস থাকিত, পাপকর্ম্ম করিলে তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হয় এ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে কি এই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমাজের ললাটে এই কলঙ্কের ছায়া পড়ে? শ্বশুরালয়—স্বামীর ঘর আপন সংসার, সেই শ্বশুর বাটীর ক্ষুদ্র গঞ্জনা-ভর্ৎসনা—তবু তাড়না নহে—এতই 'অসৈরণ' যে তাহা গৃহস্থ-বধূর—ঘরের লক্ষ্মীর আত্মহত্যার কারণ!

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় না কি, বরং বলা উচিত—যে বালিকা, যে কিশোরী, এরূপে আত্মহত্যা করে, যথার্থ কথা বলিতে গেলে তাহার পিতা মাতাই হেতু—শ্বশুরশাশুড়ী অপেক্ষা পিতামাতারই দোষ অধিক। তাঁহারা কন্যাকে প্রকৃত শিক্ষা দেন নাই, দুহিতাকে পরের ঘরে গিয়া গৃহলক্ষ্মী—আদরের বউ—কি করিয়া হইতে হয় তাহা বুঝাইয়া দেন নাই; পরকে আপনার করিয়া লইতে হয় কি উপায়ে তাহা শিখাইয়া দেন নাই; সেই নিমিত্ত পিতামাতাই প্রকৃতপক্ষে অভাগিনীর মৃত্যুর কারণ; মৃত্যু—অপমৃত্যু—অপঘাত মৃত্যু যাহার ফল ইহকাল পরকালে বিষময়, সেই মৃত্যুর নিদান। এই অপঘাত-মৃত্যুজনিত পাপের তাঁহারাও অংশভাগী সন্দেহ নাই।

সমাজের এই দারুণ ক্ষত ভিতরে ভিতরে শোষ ধরিয়া যাইতেছে। ইহার চিকিৎসা করিতে হইলে ধীর স্থির ভাবে সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। আত্মহত্যাকারিণীর শ্বশুর শাশুড়ী বা স্বামী বা শ্বশুরালয়ের সকলকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিলেই কি অভীষ্ট ফল পাওয়া যাইবে? না, রাজদ্বারে প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিলে প্রকৃত কায হইবে? তাহাতে রোগ অপেক্ষা প্রতিকারই বেশী উৎকট—বেশী অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে।

কন্যার শৈশবকাল হইতে পিতামাতাকে এরূপ যত্নশীল হইতে হইবে, যাহাতে কন্যা হিন্দু ঘরের উপযুক্ত প্রকৃত শিক্ষা পায়—যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়; যাহাতে তাহারা সর্ব্বত্র সকলের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে শিখে; যাহাতে তাহারা হিন্দুরমণীর ধৈর্য্য, হিন্দুরমণীর সহিষ্ণুতা, হিন্দু রমণীর সংসার মাথায় করিয়া থাকিবার গুণ প্রকৃষ্টরূপে লাভ করে। এ রোগের ইহাই একমাত্র প্রতিকার।

মহাকবি কালিদাস কণ্বমুনির মুখ দিয়া দুহিতাকে পিতার উপদেশ শুনাইয়াছেন—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"
(অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪র্থ অঙ্ক)

বৎসে, তুমি আমার গৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে যাইয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীগণের সহিত সখীবৎ ব্যবহার করিবে, পতিকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও রাগ করিয়া তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিবে না। ভোগসুখে বিশেষ রকম রত হইবে না; পরিজনদিগের প্রতি যথেষ্ট দাক্ষিণ্য দেখাইবে। এই প্রকারেই স্ত্রীগণ গৃহিণীপদ লাভ করে। ইহার বিপরীতাচারিণীরা কুলের কলঙ্ক।

শুনিতেছিলাম, কেহ কেহ নাকি এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন যে এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন কি তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া নূতন একটি বিল বা আইন পাশ করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মাণ্যবর সুদস্য মহাশয় সম্প্রতি শাসনসংস্কার বিধি লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, এই অজুহাতে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইতে পারেন নাই। এই গুজব যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের

ভাগ্য অতিশয় শোচনীয় বিবেচনা করিতে হইবে। কোন সংবাদপত্রের পত্রলেখক-স্তম্ভে দেখিতেছিলাম, কেহ কেহ এমন প্রস্তাবও করিয়াছেন যে, শাসন সংস্কার-বিধি বরং সিকায় তোলা থাক, এই বিষয়ক আইন আগে পাশ হউক। আইন পাশ তাড়াতাড়ি হউক না হউক, ব্যবস্থাপক সভার কোন মান্যবর সদস্য দ্বারা এতৎ সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন উপস্থিত করা অসম্ভব নয়। ব্যবস্থাপক সভায় মধ্যে মধ্যে কোন কোন মাননীয় সদস্য দ্বারা এমন বেয়াড়া প্রশ্ন করা হইয়াও থাকে, এবং গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহার মুখের মত জবাবও দেওয়া হয়; লোকে দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে না। তাহার ফল যাহা হয়, তাহা কাহারও জানিতে বাকি নাই। মন্ত্রী-পরিষদে বক্ষ্যমান বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় হউক; আমরা জানি তাহার কি উত্তর মিলিবে। ফল যাহা দাঁড়াইবে, তাহাও অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু এরূপ বাতুলতা হইতে জগদীশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই সকল সৎসাহসী পরদুঃখ-কাতর মহাত্মারা কি চাহেন যে, গবর্ণমেণ্ট আত্ম-ঘাতিনী বধূর শ্বশুর খাশুড়ী স্বামীকে ধরিয়া জেলে পুরিবেন? অথবা সরকারী ইন্‌স্পেক্টার ইনস্পেক্ট্রেস নিযুক্ত করিবেন, তাহারা হিন্দুর ঘরে ঘরে যাইয়া তল্লাস করিতে থাকিবে, বউ মুখরা বা ঘরের কাযকর্ম্মে অপটু হইলে কিংবা শ্বশুর খাশুড়ী স্বামীকে গ্রাহের ভিতর না আনিলে শ্বশুর বা খাশুড়ী বা স্বামী বধূকে ধমক ধামক করেন কি না; খাশুড়ী বধূতে বেশ সম্প্রীতি আছে কি না, যদি না থাকে খাশুড়ীর বিরুদ্ধে বধূর কোন নালিশ আছে কি না; যদি থাকে, তবে খাশুড়ীর উপরে প্রথমে নোটিশ জারী হইবে, পরে ফৌজদারী আদালতে তলব হইবে—ইহাই কি তাঁহাদের অভিপ্রায়?

আত্মহত্যাকারিণীর পিতা মাতা বা নিকট আত্মীয়েরা শোকের আবেগে এই প্রকার কোন বিধান আবশ্যক মনে করিতে পারেন; তাঁহাদের তত দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু বলিতে ইচ্ছা হয়, "হে নব্য সমাজ-সংস্কারকবৃন্দ, দোহাই তোমাদের, ভাল মন্দ অনেক কায করিয়াছ, তোমরা আর আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিও না, তাহাতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।"

অনেকে বলিতেছেন, সামাজিক সমস্যা সমাজ দ্বারাই মীমাংসিত হউক; হিন্দু সমাজই উপায় নির্দ্ধারণ করুন। কিন্তু হায় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ! বড় বড় মিটিঙ করিয়া, ততোধিক বড় বড় রেজলিউসন পাশ করা ব্যতীত, এই 'ঢাল নাই খাঁড়া নাই নিধিরাম সর্দ্দার' সমাজ দ্বারা কোনও উপকার কি সম্ভব?

যদি কোন কায হয়, এই উদ্দেশ্যে জনৈক চিন্তাশীল লেখক তাঁহার বিখ্যাত মাসিক পত্রে প্রস্তাব করিয়াছেন—

"পাত্র ও পাত্রী জানিয়া বুঝিয়া পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করিতে পারে এরূপ বয়সে এবং এরূপ সুশিক্ষিত হইয়া তাহারা বিবাহ করিতে পারে, সামাজিক ব্যবস্থা এরূপ হওয়া চাই…এই দুরবস্থার প্রতিকার নারীর ব্যক্তিত্বের ও স্বাধীন জীবন যাপনের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের উপর নির্ভর করে।"

মন্দ ব্যবস্থা নয়, কিন্তু বাহির-সমাজের পাঁতি। হিন্দুসমাজে এ মত গ্রহণ করিবার এখনও বিলম্ব আছে। উপস্থিত আমাদের কাঁদা আর ভগবানকে ডাকা ভিন্ন উপায় নাই।

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।
শোভাবাজার রাজবাটী।

মুক্তি-মঙ্গল

মরণেরে আমি করেছি শরণ,
পলে পলে তাই মরিব না,
বেদনারে আজি করেছি বরণ,
আঘাতেরে আর ডরিব না;
চিরদিন আর নিখিলের মাঝে
রব না লুকায়ে দীনতার লাজে,
আপনারে সদা করি' আবরণ
ছলনার সাজ পরিব না।

কামনার নিধি মিলিল না, তাই,
কাটাব কি কাল হাহাশ্বাসে?
মাগিব কি চিরজীবনের ঠাঁই
ভুলে-থাকা গেহ-পরবাসে?
আলেয়ার পানে ছুটে ছুটে সারা
আঁধারে কোথায় হব পথহারা!
কত আর বসি' কুসুম ফুটাই,
স্বপনের ঘোরে নীলাকাশে;

আমা হতে দীন নাহি কেহ আর,
এ গরব মোর কোথা রাখি?
মরণে আমার নাহি অধিকার,
এই সুখে শুধু বেঁচে থাকি।
চলে যাই আমি রাজপথ দিয়া,
নাহি কেহ কোথা পথ নিরোধিয়া!
কোথা শেষ নীল-আকাশ-সীমার,
শিকল টুটিল বনপাখী!

পথে পথে কাঁটা বিদলিয়া পায়
পথ ভরি দিব ফুলদলে,
বহাইব সুধা নিখিল হিয়ায়
পান করি' দুখ-হলাহলে;
বেদনার দান তুলি লয়ে প্রাণে
সবাকার বুক ভরি' দিব গানে,
লাজে পরিহাসে ছলনা হেলায়
গান গাহি যাব শতছলে।

আমারে যে কারো নাহি প্রয়োজন,
আমি চাহি তাই সবাকারে,
পর হল যবে আপনার জন,
পরেরে বিলাব আপনারে;
স্নেহের পিপাসা বুকে আঁকড়িয়া
জনে জনে স্নেহ দিব বিতরিয়া,
কে মোরে মাগিবে না জানি কখন,
ফিরে ফিরে যাব দ্বারে দ্বারে।

হাসিবারে চাহি' পলকে আমার
আঁখি ওঠে যদি ছলছলি;
ফুটিবারে চাহি' কাঁটার মাঝার
ফুটিতে না পারে ফুলকলি,—
মনে রেখো তবু দুদিনের তরে
রেখেছিনু হাসি আঁকিয়া অধরে,
ঘুমায়েছে কাঁদি হৃদি-বীণা-তার
মরণের স্নেহ-কোলে ঢলি।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

দানবীর

(গল্প)

ডেলি প্যাসেঞ্জার হইতে হইলেই গার্ড সাহেবের হুইসিল দিবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠাই দস্তর। সেদিন কি কারণে হঠাৎ এ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সকল পৃথিবীর চারিদিককার উন্নতিশীল অবস্থা দেখিয়া আমার পনের বছরকার সতের টাকা দামের ঘড়িটারও মনে বোধ করি একটু উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে ২৪ ঘণ্টার অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে সে মাত্র ৩ মিনিট কাল অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। টেলিগ্রাফ্ আফিসের ঘড়ি দেখিয়াই আমার নিজের ঘড়িটাকে ৩ মিনিট পিছাইয়া দিলাম, এবং লাইন পার হইয়া কৃষ্ণনগরের গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট কামরাটিতে উঠিয়া পড়িলাম। নন্দদুলাল তখনও প্লাটফরমের দক্ষিণ প্রান্তে পায়চারি করিতে করিতে গার্ড সাহেবের বাঁশির অপেক্ষা করিতেছিল; পাঁচুগোপাল ও যতীন তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

গাড়ীতে উঠিবামাত্র, অন্য কোন চিন্তা মনে আসিবার পূর্ব্বেই একটি শিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইলাম। আমার নির্দিষ্ট কোণটিতে বসিয়া দেখিতে পাইলাম, সম্মুখের দুইখানা বেঞ্চের পরের বেঞ্চে ৩০।৩৫ বছরের একটি পুরুষের কোলে, বছর দেড়েকের একটি শিশু প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। দাঁড়াইয়া, বসিয়া, ভুলাইয়া কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যাইতেছে না। সেই ঘর্ম্মাক্ত ও ক্লান্ত শিশু এবং সান্ত্বনায় বিব্রত পুরুষটিকে দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে অনেকক্ষণ হইতেই তাহারা এই অপ্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ছেলেটির কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই জানা গেল যে, সেই দিনই সকালে ঐ লোকটি শ্বশুরবাড়ী হইতে উহার স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছিল। "আর দুটো দিন বাদে এসে নিয়ে যেও" এই কথা শাশুড়ী বলায়, রাগ করিয়া লোকটি ছেলেকে লইয়া বাড়ী যাইতেছে। ছেলেটি বাপের কিছু-মাত্র মর্য্যাদা না রাখিয়া, গাড়ীতে উঠিয়া পর্য্যন্ত মাকে না দেখিয়া এমন চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে যে কিছুতেই তাহাকে ভুলান যাইতেছে না। ছেলের চোখের জলে যে বাপের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়া আসিয়াছে, তাহা বাপের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা গেল। বাপের এই 'পলিসি' অন্য আকারে ছেলেবেলায় অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি। গরুকে যখন মাঠ হইতে ফিরান শক্ত হইয়া উঠিত, তখন কোন রকমে তার বাছুরটিকে কোলে করিয়া আনিতে পারিলেই, গরুর আসিতে আর একটুও বিলম্ব হইত না।

লোকটার রাগের কথা শুনিয়া, তাহার উপরে ক্রুদ্ধ হইলাম। তখন নির্য্যাতিত ও অবরুদ্ধ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও উপন্যাস পড়িতেছিলাম, ব্যাপারটা শুনিয়া মনে হইল এটি তাহারই একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত মাত্র। লোকটা সামান্য একটু রাগ বা অভিমানের বশে নিজেকে ও ছেলেটার মাকে কি বিপদেই ফেলিয়াছে! মা বেচারী ছেলেকে এতক্ষণ না দেখিয়া, না জানি, কি কান্নাই আরম্ভ করিয়াছে—হয়ত বা এখনি ষ্টেশনেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। কল্পনায় তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ স্মরণ করিয়া, লোকটার অনাবৃত দেহ ও অমার্জ্জিত চিত্তের উপর ঘৃণা জাগিয়া উঠিল। তখনি মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—'তোমরা তো নিজেদের মার্জ্জিতচিত্ত বলিয়া গর্ব্ব কর, রাগের বশে কি এ রকম গর্হিত আচরণ কখন করনা?' ভাবিলাম, ইহা লইয়া আর কেন বেশী মাথা ঘামাই; উহার স্ত্রীকে উহার চেয়ে যে আমি বেশী ভালবাসি না, ইহা তো ধ্রুব সত্য। শুধু রাগটা দেখিলে চলিবে না, উহার ভালবাসাটাকেও দেখিতে হইবে।

এমন সময় গার্ড সাহেবের বাঁশী শুনা গেল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, এ খাবার খেতে

পারে ?" কোন উত্তর পাইবার আগেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। খাইতে পারে কিনা দেখাই যাউক্‌না, ভাবিয়া জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া বলিলাম—"শীগ্‌গির একটা বড় সন্দেশ।" সে তাহার কাঁচ বসান বাক্‌সটা খুলিয়া পাতায় করিয়া একটা সন্দেশ লইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে আমার হাতে দিল; আমি একটা আনি প্ল্যাটফরমে ফেলিয়া দিলাম।

সম্মুখের বেঞ্চের একজন লোকের হাত দিয়া সন্দেশটা ছেলের বাপের নিকট পৌছাইয়া দিলাম। বাপ সেটি হাতে লইয়া, তাহা হইতে একটু খানি ভাঙ্গিয়া ছেলের মুখে দিয়া দিল। ছেলেটির জিহ্বা একটু ব্যস্ত হইতেই, কণ্ঠের কায একটু কমিয়া আসিল। দ্বিতীয়বার মুখে আর একটু খাবার দিয়া, হাসিয়া একটু আদর করিতেই তাহার কান্না থামিয়া গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু-মলিন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—যেন দারুণ মেঘের গর্জ্জন ও বর্ষণ মুহূর্ত্ত মধ্যে কে মন্ত্রবলে শান্ত করিয়া ধরণীর বুক স্নিগ্ধ রৌদ্রে ভরিয়া দিল।

গাড়ীশুদ্ধ লোক একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সকলেরই চোখ আমার উপরে পড়িল। "বেশ করেছ" এ কথাটা কেহ প্রকাশ করিয়া না বলিলেও, আমার মনে হইল, তাহাদের নীরব প্রশংসায় সমস্ত গাড়ীখানা ভরিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটাও যেন অনেক ফুলিয়া উঠিল। অপরে ইহাকে হয়ত বলিবেন ইহা ভাল কাযের অবশ্যম্ভাবী ফল—অর্থাৎ আত্মপ্রসাদ।' কিন্তু সব চেয়ে যাহার কথা এখানে বেশী প্রামাণ্য, তিনি—অর্থাৎ আমি—জানি, ইহা নিছক গর্ব্ব;—গাড়ীশুদ্ধ লোক যাহা পারে নাই, আমি তাহা করিয়াছি!

ছেলের অর্দ্ধেকটা সন্দেশ খাওয়া হইতেই, বাপ তাহাকে নিজের পাশে বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিল। সে নির্ভয়ে তাহার সমস্ত হাতখানা মিষ্টরসে সিক্ত করিয়া, মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

ট্রেণ বীরনগরের কাছাকছি আসিতেই, লোকটি আমার দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাবু, পয়সা কটা নি'ন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "ছোট ছেলে সামান্য পয়সার খাবার খেয়েছে—তা কি নিতে আছে?" সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫ জন লোক বলিয়া উঠিল—"উনি কি ও পয়সা নেয়, ওনার ব্যাভারে মালুম কত্তে পাল্লে না!" লোকটি সকলের কাছে লজ্জা পাইয়া, পয়সা ক'টা ট্যাকে গুজিয়া মাথা হেঁট করিল।

সকলেই অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতে লাগিল। আমার পানে প্রশংসার দৃষ্টি আমি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। মাত্র চারি পয়সার খরচে আমি দানবীর হইয়া গেলাম। এত সস্তায় কিন্তি বড় একটা কাহারও ভাগ্যে মিলে না।

প্ল্যাটফরমের ভিতর গাড়ী আসিতেই লোকটি ছেলে কোলে লইয়া দাঁড়াইল। আমি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলাম—"বাপু, আর রাগে কায নেই, ফেরৎ ট্রেণে স্ত্রীর কাছে ছেলে নিয়ে যাও।" সে আর মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিতে পারিল না, গাড়ী থামিতেই ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

আমার চারি পয়সার অধিকার আমি ছাড়ি নাই।

কৃষ্ণনগরে নামিলাম। প্রশংসার জলে স্নান করিয়াও কপালের একটা জায়গায় পঙ্কের একটু দাগ লাগিয়া রহিল—একটা কিসের গ্লানির হাত হইতে কোন মতে নিস্কৃতি পাইলাম না। লোকটির লজ্জিত মুখ আর নত মস্তক গোপন কাঁটার মত কোন একটা জায়গায় কেবলি খচ্‌ খচ্‌ করিতে লাগিল।

খাবারের পয়সা কটা ফেরৎ লইয়া লোকটিকে যদি দান গ্রহণের লজ্জা হইতে অব্যাহতি দিতাম!

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

ঘুম্-গুম্ফায়

সেথা তন্দ্রার বীণ্‌কার মঙ্গল গায় !
সেথা মেঘ-মল্লীর বন অঙ্গন ছায় !
সেথা অর্ব্বুদ পর্ব্বত অদ্ভুত ঠাম !
সে যে দুর্গম দুশ্চর যক্ষের ধাম !

সেথা ঘুম্-ডাইনীর হাই দেশ ঝাপ্‌সায়,—
যেন গুগ্‌গুল্ মশ্‌গুল্ ঢেউ আফ্‌সায় !
সেথা দিয়ে গায় কুয়াসার ভোট কম্বল
যত উদাসিন্ বাতাসের ঘোঁট মণ্ডল !

সেথা লামাদের কপালের ডমরুর সাথ—
ওঠে কঙ্কাল-বংশীর তান দিন-রাত !
সেথা চলে জপ অবিরল জপ-যন্ত্রে !
সেথা ঘোরে থাম 'মণি-পাম্-হুম্' মন্ত্রে !

সেথা দিনরাত বিশ-সাত দীপ উজ্জ্বল,
সে যে তিন রত্নের নীড়,—হেম-উৎপল !
সেথা পূজা পায় ত্রিপিটক পুষ্পে ঢাকা,—
কত অবতার-দেবতার চিত্র আঁকা !

সেথা বুদ্ধের বিগ্রহ গম্ভীর ভায়,—
যেন শান্তির আগ্রহ আশ্রয় পায়,—
যেন আত্মার মুক্তির নির্ব্বাক্ গান,—
যেন বিশ্বের ঝঙ্কার শেষ,—নির্ব্বাণ !

সে কি দৃষ্টির চন্দন-বৃষ্টি, মরি,
নিতে সৃষ্টির সন্তাপ রিষ্টি হরি'
সেকি কাঞ্চন-চম্পক-লাঞ্ছন রূপ !
সেকি সৌরভ-তন্ময় পুণ্যের ধূপ !

সেথা ঝিল্লির উল্লাস-হিল্লোল-বায়
লাগে নিত্যের নিঃশ্বাস চিত্তের গায় !
সেথা সূর্য্যের চোখ সদা ধ্যান-মগ্ন,
মহা- শান্তির কান্তিতে মন লগ্ন !

সেথা মহাপুরুষের ছায় মহামহীয়ান্
কত তৃষাতুর অমৃতের পায় সন্ধান ;
সেথা বিশ্বের বীণ্‌কার যুগ যুগ ধায়
সেই ঝুঙ্কুন-রুম্‌ঝুম্ ঘুম-গুম্ফায় !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

গোয়ালিয়র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লস্করে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অল্প। সর্ব্বশুদ্ধ ছয় ঘর বাঙ্গালীর বাস, তন্মধ্যে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধরগণই এখানকার পুরাতন বাসিন্দা।

নপাড়া মূলাজোড় নিবাসী স্বর্গীয় তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারিপুত্র ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহেশচন্দ্র অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন এবং ১০০৲ টাকা বেতনে সর্দ্দার বাবাসাহেব জিন্সিওয়ালের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষকতা করিতে থাকেন। মধ্যমপুত্র গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র হয়। মধ্যম নরেন্দ্রনাথের তিনটী কন্যা হইয়াছিল। জৈষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ধরাসুন্দরীর সহিত পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেবের

বিবাহ হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, ধরাসুন্দরীর কন্যা। ধরাসুন্দরীর কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্গীয়া ব্রজসুন্দরী দেবীর পুত্র "ভারতী"র অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। তৃতীয় পুত্র উমেশচন্দ্র ও চতুর্থ পুত্র রমেশচন্দ্র পিতার নিকটেই ছিলেন। যখন রমেশচন্দ্রের বিবাহ হয় তখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ। বিবাহের এক বৎসর পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট উপস্থিত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় অনেক নর-নারী ইংরাজ ইহাঁদের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্রোহীরা দুই ভ্রাতার প্রাণনাশের চেষ্টা করে, ইহাতে ইহাঁরা ভীত হইয়া কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হন। বিদ্রোহের শান্তি হইলে পুনরায় ইহাঁরা ফিরিয়া আসেন। দুই বৎসর পরে মহেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভ্রাতা বর্ত্তমানে রমেশচন্দ্র অর্থ উপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই করিতেন না, ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সময় আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া গোয়ালিয়রে আসেন। বাবা সাহেব, রমেশচন্দ্রকে মাসিক ৬০৲ টাকা দিতেন, কিন্তু তাহাতে সংসারের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দেবীর জন্ম হয়, এবং কিছু দিন পরে উমেশচন্দ্র সস্ত্রীক কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হন। ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু আয় বাড়িল না। অবশেষে রমেশচন্দ্র কণ্ট্রাক্টারী করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তেজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। কণ্ট্রাক্টারী আরম্ভ করিবার কিছু দিনের মধ্যেই ইনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ক্রমে ইহাঁর আরও দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হয়, তন্মধ্যে একটি কন্যা শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উমেশচন্দ্রের একটি পুত্র হয়। দশবৎসর বয়সে ইহাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দেবীর বিবাহ হয়। উত্তরপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কৃষ্ণকামিনী দেবীর বিবাহ হয়। ইনি স্বর্গীয় কবিবর হেমচন্দ্রের খুল্লতাত শিবচন্দ্রের দৌহিত্র। ইনি নানাভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দুই পুত্রের বিবাহ দিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাগণকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পরলোক গমন করেন। পঞ্চদশবর্ষ বয়সে ইনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তারপর আর দেশে আসেন নাই। উমেশচন্দ্রের মৃত্যু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর সময় তেজেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথের বয়স অল্প। উপেন্দ্রনাথ, গঙ্গাধর (ইনি উমেশবাবুর পুত্র), খগেন্দ্রনাথ তখন বালক, একটি ভগিনী অবিবাহিত। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তেজেন্দ্রবাবু ও মণীন্দ্রবাবুর উপর। পিতার মৃত্যুর পর ইহাঁরাও কণ্ট্রাক্টারি করিতে আরম্ভ করিয়া দুই ভ্রাতাই অল্পদিনের মধ্যে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে আবার মণীন্দ্রনাথের অর্থ উপার্জ্জন যেমন সার্থক হইয়াছিল, এমন বুঝি কোন ভ্রাতারই হয় নাই। ইনি যেমন উপার্জ্জন করিতেন, দানও তেমনি করিতেন। ইহাঁর ন্যায় অমায়িক সদা হাস্যময় পরোপকারী ইহাদের বংশে আর কেহ ছিলেন না। দীন দুঃখী, অসহায়ের সাহায্য করাই ইহাঁর জীবনের ব্রত ছিল। পরের দুঃখে ইহাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। মণীন্দ্রনাথের নাম শুনে নাই এমন লোক মধ্যভারতে অল্পই আছে। এই পরদুঃখকাতর মহাপ্রাণ অকালে কাল-কবলিত হন। পুত্রশোকাতুরা জননী পুণ্যশীলা নিস্তারিণী দেবীও ইহার তিনমাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রমেশচন্দ্র স্বর্গীয় বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিসতুতো ভাই ছিলেন।

মহিমচন্দ্র জেয়ার্দ্দার মহাশয়ের বংশধরগণও বহুদিন হইতে এখানে বাস করিতেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু দিন পূর্ব্বে মহিমা বাবু গোয়ালিয়রে আসেন। কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দত্তের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতে জানকী বাবু স্থায়িভাবে এখানে বসবাস করিতে থাকেন। ঐ সময় গোয়ালিয়র স্কুলের জন্য একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। মহিমা বাবুর সুপারিশে জানকী বাবু

ঐ পদ প্রাপ্ত হন। কার্য্যদক্ষতায় ক্রমে ইনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদ পাইতে থাকেন। এখন ইনি গোয়ালিয়র স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টার। মহিমা বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস জোয়ার্দ্দার মহাশয়ও রাজসরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। ইহাঁদের আদি নিবাস পাবনা জেলাস্থ খলিলপুর গ্রামে।

ভিক্টোরিয়া কলেজের অন্যতম প্রোফেসর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও অনেক দিন হইতে এখানে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে ইনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট আগ্রায় ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বেণীবাবু আগ্রার কমিসেরিয়টে কার্য্য করিতেন, উপেন্দ্রবাবু ইহাঁর নিকট থাকিয়া পড়িতেন। কিছুদিন পরে গোয়ালিয়র কমিসেরিয়টের বড় বাবু যদুনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত উপেন্দ্রবাবুর বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে ইনি বি-এ পাশ করিয়া গোয়ালিয়রে শিক্ষক হইয়া আসেন, তদবধি ইনি এই খানেই বাস করিতেছেন।

যদু বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিমলা দেবীর বিবাহ, কাশী-নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছিল। বিবাহের কিছুদিন পরে রাজকুমার বাবু এখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইনি কিছুদিন গোয়ালিয়র মহারাজের ভ্রাতা প্রিন্স বলবন্তরাও সিন্ধিয়ার গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন।

৺অভয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্রগণও প্রায় ত্রিশবৎসর হইতে গোয়ালিয়রে বাস করিতেছেন। অভয়বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত রমেশ-চন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অচলানন্দিনী দেবীর বিবাহ হইয়াছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টার গোয়ালিয়রে আসিয়াছিলেন, ইহাঁর পুত্রগণ এখন স্থায়িভাবে এখানে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি আরও কতকগুলি বাঙ্গালী নানা কার্য্য উপলক্ষে গোয়া-লিয়রে আসিয়াছেন।

গনেশ চতুর্থী, দশহরা এবং মহরম এখানকার প্রধান উৎসব। ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীর দিন হইতে গণেশ চতুর্থী উৎসব আরম্ভ হয়, ঐ দিন রাজভবনে এবং ধনী ব্যক্তিগণের বাড়ীতে গণেশদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতি-ষ্ঠিত হয়। এই গণেশ মূর্ত্তির সম্মুখে প্রত্যহ নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। মহারাজের গণেশের সম্মুখে পালা করিয়া সর্দ্দার ও সামন্তগণ গান গাহিয়া থাকেন। স্বয়ং মহারাজকে একদিন গণেশের সম্মুখে গীত গাহিতে হয়। উৎসব দেখিতে প্রতিদিন বিস্তর লোক একত্র হয়, ঐ সময়ে প্রজা-সাধারণের জন্য রাজবাটীর দ্বার অবারিত। সকলেই আপন আপন অবস্থানুযায়ী নূতন বেশভূষা করিয়া, প্রত্যহ গণেশোৎসব দেখিতে আসে। চতুর্থী হইতে এগার দিন যাবৎ এই উৎসব হইতে থাকে। পূর্ণিমার দিন মহাধুমধামের সহিত গণেশ বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। রূপার চতুর্দ্দোলে গণেশকে বসাইয়া পথে বাহির করা হয়। অগ্রে ও পশ্চাতে উন্মুক্ত তরবারি ও বন্দুক হস্তে, অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য থাকে; কয়েকটি কামানও থাকে, কয়েক দল বাদক ব্যাণ্ড বাজাইয়া গণেশের আগে চলিতে থাকে। একটি বৃহৎ পুষ্করিণীতে গণেশ বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তারপর কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিতে করিতে, এই বিরাট জনসঙ্ঘ ফিরিয়া আসে।

দশহরা এখানকার জাতীয় উৎসব। সন্ধ্যার সময় মহারাজ সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহির্গত হন। মহারাজের হাতীর আগে, প্রিন্স বলবন্তরাও এবং মহারাজের ভগিনীপতি "বড়শীতলে"র হাতী থাকে। তাঁহার দুইপার্শ্বে "কালকে" ও "ঘোড়পড়ে" উপাধিধারী দুইজন সামন্ত সর্দ্দারের হাতী থাকে। পশ্চাতে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার ও ওমরাহগণের হাতী, ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো প্রভৃতি থাকে। সর্ব্বপশ্চাতে মহারাজের পদাতিক ও অশ্বা-রোহী সৈন্য, কামান, আরোহীশূন্য সজ্জিত ঘোটক হস্তী প্রভৃতি ইহাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আসে। ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে সুদৃশ্য, এই সজ্জিত ঘোড়াগুলি। যেমন হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর দেখিতে, তেমনি ইহাদের সজ্জা।

পায়ে নববধূর মত রূপার মল, লেজের উপর রূপার বোর, পৃষ্ঠদেশে মখমলের উপর সাচ্চা জরির কায করা বহুমূল্য আসন, গলায় মতির মালা, মস্তকে স্বর্ণের মুকুট, কোন কোন ঘোটকের সর্ব্বাঙ্গে একখানি বহুমূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র। এই বিরাট মিছিল ক্রমে এক বৃহৎ ময়দানে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই একটি শমী বৃক্ষের বড় ডাল এই ময়দানে পুতিয়া রাখা হয়। মহারাজ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, এই প্রোথিত শমীবৃক্ষ পূজা করেন। পূজা শেষ হইলে, তিনি ইহা হইতে পত্র আহরণ করিয়া, পুনরায় আপন হস্তীতে আরোহণ করেন। তাহার পর সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বৃক্ষ হইতে পত্র গ্রহণ করেন। পত্র লইয়া মহারাজ হাওদাতে উপবেশন করিলে, পশ্চাতের কামান সকল হইতে অনবরত ফাঁকা আওয়াজ আরম্ভ হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের পত্র গ্রহণ শেষ হইলে, জন-সাধারণ পত্র লইবার জন্য এমন তুমুল-কাণ্ড বাধাইয়া ফেলে যে, মনে হয় দু'চার জন বুঝি বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতঃপর এই বিরাট মিছিল আবার রাজ-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এখানে পূর্ব্ব হইতে এক বৃহৎ সভামণ্ডপ করিয়া রাখা হয়। সর্ব্বপ্রথম মহারাজ গিয়া আপনার আসন গ্রহণ করেন। পরে সর্দ্দার সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্ব-স্ব আসনে উপবেশন করেন। পরে যথাযোগ্য ব্যক্তিগণ একে একে উঠিয়া, কিছু না কিছু উপঢৌকন দানে মহারাজের সম্মান প্রদর্শন করেন, মহারাজও উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনমস্কার ও মিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। সভাস্থ সকলকেই পাণ ও আতর বিতরণ করা হয়। তারপর নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণ নৃত্য গীতের পর, মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সকলে আপন-আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করেন।

পুণ্যশীলা স্বর্গীয়া নিস্তারিণী দেবী

তাজিয়া বা মহরম মুসলমানদের উৎসব হইলেও গোয়ালিয়রে যেরূপ সমারোহের সহিত ইহা সম্পন্ন হয়, সেরূপ বোধ হয় মধ্য ভারতে কোন স্থানেই হয় না। যেদিন তাজিয়া বাহির হয়, সেদিন উহার সহিত দশহরার মতই বিরাট জনসঙ্ঘ থাকে, তবে এ মিছিলে হাতী থাকে না। মহারাজ অশ্বারোহণে তাজিয়ার আগে আগে যান। হিন্দু মুসলমান সমস্ত প্রজাই এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় মহরমের সময় এখানে মারপিট বা কোন রকম গোলমাল হয় না। তাজিয়া বিসর্জ্জন হইলেই কামানের আওয়াজ হইতে আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া ফুলদোল, রথযাত্রা, হোলি, দিবালি প্রভৃতি আরও কতকগুলি উৎসব

৺মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়া থাকে। মহারাজের জন্মমহোৎসবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় এখানে নানাদেশের নরপতিগণ, সম্ভ্রান্ত ইংরাজকর্মচারিবর্গ আসিয়া থাকেন।

এ অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ মহারাষ্ট্র এবং মুসলমান, আর সমস্তই দেশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য জাতি। মহারাষ্ট্রগণের আচার ব্যবহার ভারতের অন্যান্য হিন্দু অধিবাসিগণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাঁদের মধ্যে অবরোধ প্রথা একেবারেই নাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর সহিত অসঙ্কোচে গল্প করেন এবং স্বাধীন ভাবে মিশিয়া থাকেন। বিধবা বিবাহও ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ মহারাষ্ট্র রমণীগণের বিবাহ ১৮.১৯ বৎসর বয়সের কমে হয় না, ইহার উপরেও যদি কেহ বিধবা হন, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহার বিবাহ হয়। মহারাষ্ট্র রমণীগণ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী। ইহাঁদের মধ্যে কুরূপা স্ত্রীলোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি, এবং অধিকাংশ রমণীই সুশিক্ষিতা। ইহাঁদের বিবাহের পূর্ব্বে এক ব্যক্তি স্বজাতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। এই নিমন্ত্রণ করাও এক অদ্ভুত রকমের। হলুদ মাখান

৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়

অর্দ্ধসের চাউল এবং একটি নারিকেল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে দিয়া, তাঁহাকে বিনীত ভাবে জানান হয় যে, আমার অমুকের বিবাহ, অমুকের কন্যার সহিত হইবে, অতএব মহাশয় অমুক দিবসে আমার বাটী উপস্থিত হইয়া আহারাদি এবং শুভকার্য্যে যোগদান করিলে বিশেষ বাধিত হইব। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি চাউল ও নারিকেল সহ সসম্মানে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। নিমন্ত্রণকারী যদি কোন রূপ সমাজ-গর্হিত অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবজ্ঞার সহিত সকলেই তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। সর্ব্ব প্রথমে অপরাধের দণ্ডস্বরূপ স্বজাতিগণের মধ্যে তাঁহাকে একটি রীতিমত ভোজ দিতে হয়, পরে সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। বিবাহ হইয়া গেলে, বর-বধূ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের সহিত আহারে বসেন, একই পাত্রে বর বধূ আহার করিয়া থাকেন। এই সময়ে সকলেই বরকে নানা প্রকারে বিরক্ত করিয়া থাকে। আহারাদি হইলে, বধূসহ বর যেপথে যাইবেন, সেই পথে কাপড় পাতিয়া দেওয়া হয়। তাহার উপর দিয়া দুই জনে গিয়া একটি কক্ষে বসেন, অতঃপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আপন আপন সাধ্যানুসারে বর ও বধূকে অর্থ বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া থাকেন। কেহ কেহ কেবলমাত্র আশীর্ব্বাদ করেন। এইরূপে ইহাদের বিবাহ শেষ হয়। বিবাহের পরও তিন চারি দিন ধরিয়া পানভোজন উৎসব চলিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মাতুল কন্যা ও মাতুল পুত্রের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। মহাষ্ট্র রমণীগণ ১৬ হাত শাড়ী কচ্ছ দিয়া পরিধান করেন, এবং কাঁচুলি বক্ষাবরণ রূপে ব্যবহার করেন।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

নীচ শ্রেণীর মধ্যে নামমাত্র বিবাহ হয়। বিবাহের পর কিছুদিন স্ত্রী তাহার স্বামীর নিকট থাকে, পরে স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যক্তির সহিত চলিয়া যায় এবং তাহার সহিত ঐ রমণীর পুনরায় বিবাহ হয়। এ অঞ্চলে ইহা "চুড়ী" নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীর সহিত ঐ রূপ বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহাকে এই নূতন বিবাহের দণ্ডস্বরূপ একটি ভোজ দিতে হয়। অতঃপর এই ব্যক্তি স্বজাতির সহিত অবাধে মিশিতে পারে; নতুবা মণ্ডল তাহার পুরোহিত, ধোপা, নাপিত বন্ধ করিয়া দেয়, কেহ তাহার সহিত একত্রে ভোজন করে না। ইহাদের সর্ব্বপ্রথম বিবাহের পাঁচ সাত দিন পূর্ব্ব হইতে

জয়-আরোগ্য হস্পিটাল

সিন্ধিয়া এল্‌গিন ক্লাব

গোয়ালিয়রের গ্র্যাণ্ড হোটেল
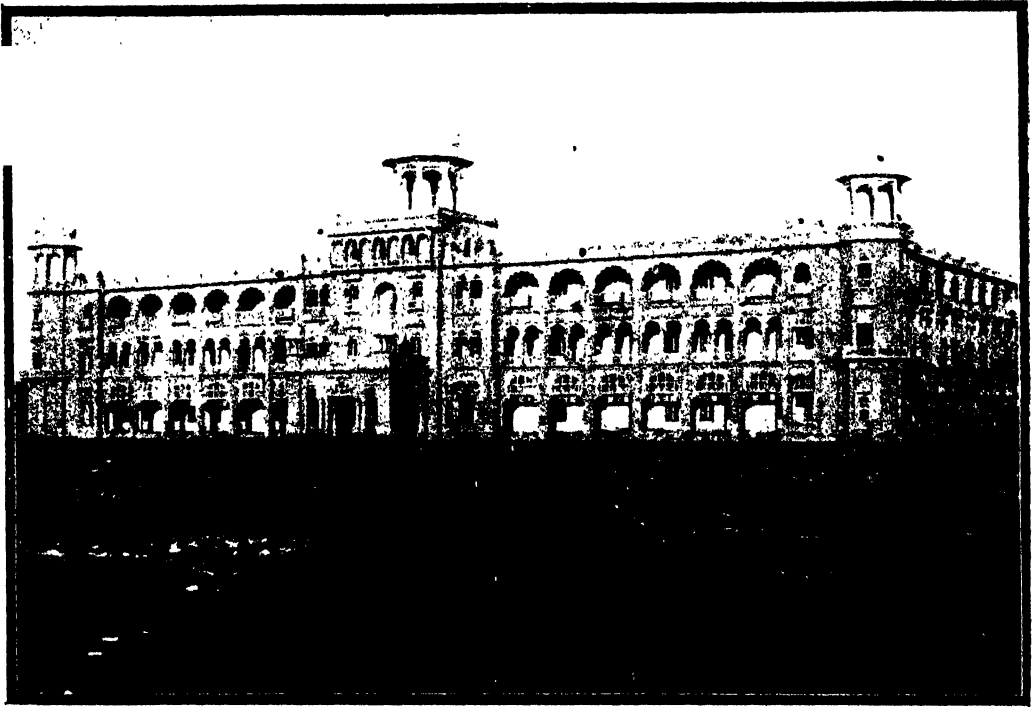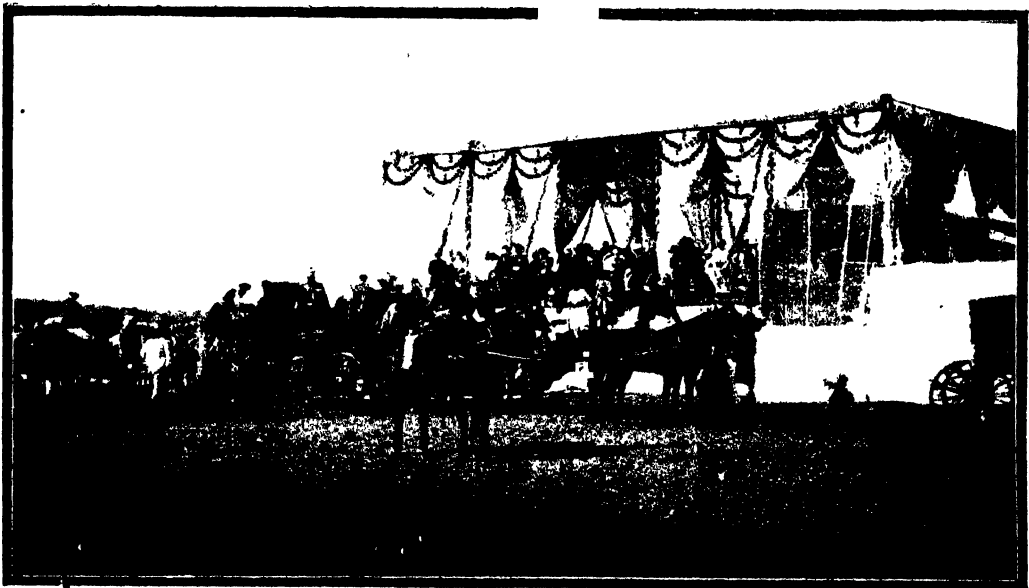
মহারাজ সিন্ধিয়ার জন্মমহোৎসব

পাত্র ও পাত্রীর বাটীস্থ স্ত্রীলোকগণ প্রায় প্রত্যহই সমস্ত রাত্রি উচ্চৈস্বরে গীত গা'হয়া থাকে। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে লাল, হলদে নানা রঙের পায়জামা এবং চাপকান পরিহিত বর, একটি মৃতপ্রায় ঘোটক আরোহণে, পাত্রীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কৃশ ঘোটকের পৃষ্ঠে পাত্র এবং একটি বালক থাকে, খুব সম্ভব ঐ বালক "মিতবর"। পাত্রের সঙ্গে পদব্রজে তাহার আত্মীয় ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ থাকে। কতকগুলি স্ত্রীলোকও উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে বরের অনুগমন করে। বর পাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যায়। ইহারা মারামারি করিতেছে বা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। বর ও কন্যাপক্ষের গায়িকা স্ত্রীবর্গ একত্রিত হইয়া, এমন চীৎকার করিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করে যে, কার সাধ্য সেখানে দাঁড়ায়। তার পর বিবাহ আরম্ভ হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই শুভকার্য্য শেষ হইয়া যায়, অতঃপর বর-কনে লইয়া স্ত্রী ও পুরুষগণ দেবতাস্থানে যান, উদ্দেশ্য, দেবতার নিকট এই দম্পতিযুগলের কল্যাণ কামনা করা। এই সময় স্ত্রীলোকগণ খেংরা মুষল ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া যায়। যথা নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইয়া ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান গাহিতে থাকে। পুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ ঢোল বাজাইয়া তাল দেয়। প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইরূপ নৃত্যগীত চলে, পরে স্ত্রীগণ খেংরা মুষল প্রভৃতি, বর ও কনের সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া ঐ স্থানে ফেলিয়া দেয়। এইরূপ করিলে নাকি নবপরিণীত যুবক যুবতী সকল বিপদ হইতে রক্ষা পায়। ইহার পর বর-কনে দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করে। বরকে লইয়া স্ত্রীলোকগণ নানারূপ বিদ্রূপ করে। এদিকে নিমন্ত্রিত স্ত্রী-পুরুষগণ, একটি করিয়া ঘটি লইয়া, ভোজন করিবার জন্য উপস্থিত হয়। প্রথমটা ইহাদের মধ্যে বসিবার জায়গা লইয়া বেশ এক হাত ঝগড়া হইয়া যায়, এই সময়ে কন্যার পিতা আসিয়া তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করে। রাজপথের উপর বেড়া দিয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে ভোজনে বসান হয়।

স্বর্গীয় মহারাজ স্যর জিয়াজিরাও সিন্ধিয়া

মহা কলরবের সহিত সকলে ভোজন করিতে থাকে। এইরূপে ইহাদের বিবাহকার্য্য শেষ হয়। এখানকার মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসিবর্গ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই অত্যন্ত অপরিষ্কার। পুরুষগণ একখানি কোরা কাপড় পরিয়া সেখানি যতদিন না ছিঁড়িয়া যায়, ততদিন উহা ছাড়ে না। রজকালয়ের সহিত ত ইহাদের সম্পর্কই নাই। স্ত্রীলোকগণ একটি "ঘাঘরা" না কাচিয়া, না বদলাইয়া, এক বৎসর কিংবা তাহারও অধিককাল ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের ঘাঘরা ঝাড়িলে, অন্ততঃ ৫।৭ শত ছারপোকা নিশ্চয় বাহির হয়।

পরদিন অপরাহ্নকালে "মুরার" দেখিতে চলিলাম। মুরার লস্কর হইতে পাঁচ মাইল, এখানে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সেনানিবাস। গোয়ালিয়রের রেসিডেণ্ট সাহেব এই স্থানে থাকেন। এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। মুরারে গোয়ালিয়র বুট এণ্ড সু ফ্যাক্টরির বৃহৎ কারখানা আছে, এইস্থানে নানাপ্রকার

সুন্দর ও মজবুত জুতা প্রস্তুত হয়। একটি কাগজ কলও এখানে আছে, উহা বামার লরি এণ্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত। এই কলে নানাপ্রকার কাগজ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখান হইতে আমরা ঘোড়দৌড়ের ময়দানের ভিতর দিয়া ফিরিলাম। ইহা কলিকাতা রেস কোর্সের অনুকরণে নির্ম্মিত। বৎসরে দুইবার এখানে ঘোড়দৌড় হয়। ইহার অনতিদূরে গোয়ালিয়র গ্রাণ্ড হোটেল। এটি বর্ত্তমান মহারাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ভবন দেখিতে অতি সুন্দর। ভ্রমণকারিগণের থাকিবার বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক কক্ষ বৈদ্যুতিক-

গোয়ালিয়রের বর্ত্তমান মহারাজ স্যর মাধবরাও সিন্ধিয়া আলিজাহ বাহাদুর

পাখা, আলো প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। এই হোটেলের সমস্ত আয় গোয়ালিয়র রাজসরকারে জমা হয়।

এখান হইতে আমরা ফুলবাগে প্রবেশ করিলাম। এইরূপ সুন্দর সুসজ্জিত বৃহৎ উদ্যান ভারতবর্ষে খুব অল্পই আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাত বর্গমাইল! ইহার চতুর্দ্দিকে কৃত্রিম ঝরণা, পর্ব্বত, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি আছে; অসংখ্য ফল ফুলের বৃক্ষে শোভিত। এই উদ্যানের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া লাইট রেলওয়ে আছে। এখানে হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি অসংখ্য সুন্দর জীবজন্তু দৃষ্ট হয়। এই উদ্যানের মধ্যে গোয়ালিয়র মহারাজের নূতন বাসভবন "জয়বিলাস" ও "নওতলা" প্রাসাদ অবস্থিত। এগুলি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত, প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য। নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সুন্দর, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় প্রধান আফিসগুলি এই উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত। চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশের জন্য দুইটি দ্বার আছে, একটী ষ্টেসন ও মুরার হইতে আসিবার পথে, অন্যটি লস্কর হইতে ষ্টেশন যাইবার পথে দৃষ্ট হয়। এই প্রবেশদ্বার দুইটি "ঝরোখা" শোভিত। "নওতলা" প্রাসাদে রাজসভাগৃহ, ইহা কারুকার্য্যখচিত খিলান ও স্তম্ভশ্রেণী পরিবেষ্টিত বৃহৎ হল, ভিত্তিগাত্রে ও মেঝেতে সুন্দর পালিশের কায করা। ফুলবাগ দেখিতে দেখিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমরাও সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা মৃত মহারাজগণের ছত্রী (সমাধিস্তম্ভ) দেখিতে চলিলাম। ইহাকে ঠিক সমাধি বলা চলে না, কারণ মৃতমহারাজকে যে স্থানে ভস্ম করা হয়, ঠিক সেইস্থানে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত এক প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করা হয়, এবং যে স্থানে চিতা সজ্জিত করা হইয়াছিল, সেই স্থানে মর্ম্মর বেদীর উপর মৃত রাজার প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। সুতরাং ইহাকে "সমাধি" না বলিয়া, "স্মৃতি মন্দির" বলাই ঠিক। এই স্মৃতি মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথের বাম পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রস্তর নির্ম্মিত

গণপৎ রাও মেহেরকারের পিতামহ ৺সুলতান রাও মেহেরকার

অষ্ট ফণাযুক্ত শেষ নাগ বিরাজ করিতেছেন। নাগ-পঞ্চমীর দিন মহা আড়ম্বরের সহিত ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে। প্রধান প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত কক্ষ পাওয়া যায়। এগুলি সিন্ধিয়া রাজবংশীয় মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতি মন্দির। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মহারাজ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার স্মৃতি-সৌধ। এই সৌধ জয়পুরের ন্যায় ঝরোখা-শোভিত। রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ভবনের ভিতর ও বাহির সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত। ইহার ভিতর মহারাজ দৌলত রাওয়ের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে, সম্মুখে মহারাণীরও প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই সৌধের পার্শ্বেই মহারাজ জনকোজী রাও সিন্ধিয়ার স্মৃতি-সৌধ। প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত প্রকাণ্ড ভবন মধ্যে মহারাজ

ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার অনতিদূরে মহারাজ জিয়াজী রাও সিন্ধিয়ার স্মৃতি-সৌধ, ইহা অন্যান্য সৌধ অপেক্ষা বৃহৎ ও দেখিতে সুন্দর। ইহার ভিত্তিগাত্রে, মেঝেতে এবং ছাদে নানা দেব দেবীর চিত্র অঙ্কিত এবং সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত। একটি মর্ম্মর-মণ্ডিত ক্ষুদ্র কক্ষে মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। মহারাণীর আসন তখন শূন্য ছিল। শুনিলাম, তখনও তিনি জীবিত থাকায় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রস্তর মূর্ত্তি ব্যতীত প্রত্যেক মহারাজের একটি করিয়া রৌপ্য-নির্ম্মিত মূর্ত্তিও আছে। ঐ মূর্ত্তি মহারাজগণের জন্ম ও মৃত্যুদিনে অত্যন্ত ধুমধামের সহিত রৌপ্য নির্ম্মিত চতুর্দ্দোলায় স্থাপিত করিয়া, রাজোচিত সম্মানে নগরে বাহির করা হয়।

ছত্রী দেখিয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম এবং শীঘ্র আহারাদি করিয়া, ভিক্টোরিয়া কলেজ, ঔষধালয় প্রভৃতি দেখিতে চলিলাম। প্রথমে আমরা জয়-আরোগ্য হস্‌পিটলে উপস্থিত হইলাম। ইহা প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ভবন। এখানে অসহায় ব্যক্তিগণের ও প্রজা-সাধারণের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। মহারাজ তাঁহার পিতার স্মৃতি-রক্ষার্থে ইহা নির্ম্মাণ করান এবং ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্জ্জন ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ইহার কিছু দূরে মাডরের দেবীর মন্দির। ভিলসার দেবীর মন্দিরের ন্যায় ইহাঁর মন্দিরও পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। মন্দির মধ্যে দেবীর অষ্টভুজা প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এখানেও মহালয়া অমাবস্যা হইতে দশমী পর্য্যন্ত দেবীর পূজা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। এখান হইতে কিছু দূর চলিয়া Victoria College। ইহা সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই কলেজে বি এ এবং বি এস্ সি পর্য্যন্ত ক্লাস আছে। এখান হইতে আমরা সিন্ধিয়া এল্‌গিন ক্লাবে উপস্থিত হইলাম। এই ক্লাব গৃহটি ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত সুন্দর। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর চিত্ত-বিনোদনার্থে মহারাজ এখানে আসিয়া থাকেন। এখান হইতে আমরা ইলেকট্রিক ওয়ার্কসের প্রকাণ্ড ভবনের ভিতর দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

গোয়ালিয়রের বর্ত্তমান অধীশ্বর স্যর মাধব রাও সিন্ধিয়া আলিজাহ বাহাদুর গোয়ালিয়র রাজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় মহারাজ জিয়াজীরাও সিন্ধিয়ার একমাত্র বংশধর। ১৮৮৬ খৃঃঅব্দে জুন মাসে জিয়াজীরাওয়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর সময় মাধবরাও দশবৎসরের বালকমাত্র। জিয়াজীরাওয়ের বড়ই ইচ্ছা ছিল যে পুত্রকে তিনি সুশিক্ষিত করিয়া, রাজসিংহাসনে বসাইয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তথাপি দশবৎসরের বালককে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। যে বৎসর পিতার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই মাধব রাও সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়, এই সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন দেওয়ান স্যর গণপত রাও। পাছে বালক মহারাজ কোন অন্যায় আজ্ঞা প্রচার করেন, এই আশঙ্কায় রাজমাতা সখিয়া রাজ * সর্ব্বদা মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত থাকিতেন। সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই, মাধব রাও প্রজাবর্গের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর রাজপথ প্রস্তুত করেন, প্রত্যেক জেলায় এবং গ্রামে গ্রামে ইস্কুল, পাঠশালা, ঔষধালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়। প্রজাবর্গের সুবিধার্থে, ইনি অনেকগুলি রেলপথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বীণা-গুনা, নাগদা-মথুরা এবং ভূপাল-উজ্জৈন রেলওয়ে গোয়ালিয়র মহারাজের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গোয়ালিয়র লাইট রেলওয়ে ইহাঁর নিজ সম্পত্তি। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, এল, ডি, এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, সি, এল, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি প্রত্যহ ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করেন। পরে ক্লাবে যান, সেস্থানে কিছুক্ষণ ক্রীড়ার পর সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন, পরে রাত্রি নয়টার

* বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর রাজমাতার মৃত্যু হইয়াছে।

সময় মহলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে দিনের বেলা গৃহের বাহির হওয়া বিপজ্জনক ছিল, পথ অত্যন্ত অল্প পরিসর—কোনস্থানে বা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ আবার কোথাও বা অত্যন্ত নীচু ছিল, তাহার উপর নানাপ্রকার অসৎলোকের ভয় ছিল। এখন আর সে ভয় নাই। চতুর্দ্দিকে সুন্দর পথ প্রস্তুত হইয়াছে, পথে বৈদ্যুতিক আলো আছে। এখানকার ডাক বিভাগ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ডাকবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র, ষ্ট্যাম্পের উপর "গোয়ালিয়র" লিখিত থাকে। আদালত সম্বন্ধীয় ষ্ট্যাম্পে মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। এখানকার মুদ্রায়ও মহারাজের মূর্ত্তি অঙ্কিত, একদিকে সূর্য্য ও সর্প চিহ্নিত। লস্করে "মাধব অর্ফ্যানেজ" নামক একটি অনাথালয় আছে, এখানে অনাথ বালক-বালিকাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়। মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত কন্যা-ধর্ম্মবিবর্দ্ধিনী নামক একটি সমিতি আছে। ইহার উদ্দেশ্য বালিকাগণকে সুশিক্ষিত করা। লস্কর হইতে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রও প্রকাশিত হইয়া থাকে। লস্করে একটি পটারি ওয়ার্কস্ আছে, এই কারখানায় চিনামাটীর নানাপ্রকার দ্রব্যাদি অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার নির্ম্মিত চায়ের পেয়ালা, বাটি, গেলাস, হুঁকা, রেকাব, নানাপ্রকার পুতুল ভারতের বিভিন্নস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। একটি নিব ফ্যাক্টরিও আছে, এখানে যে সকল নিব প্রস্তুত হয়, উহা বিলাতী নিব অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

প্রেমের ছলনা

নিভৃত হিয়ার মাঝে লভিয়া জনম,
দিনে দিনে পলে পলে কুসুমের সম
নীরবে সে আপনারে তোলে বিকশিয়া
স্নিগ্ধ সুরভিতে ধীরে ভরে' দেয় হিয়া।
একদিন অনুভবে সহসা মানব
চিত্ত-শক্তি তার আজি মানে পরাভব
প্রেমের চরণ তলে,—সে যে দুর্নিবার,
অন্তরের রাজ্য মাঝে পূর্ণ অধিকার
স্থাপন করেছে কোন শুভ অবসরে,
অজ্ঞাতে তাহার—কবে যৌবনের বরে।
নয়নের অশ্রু আর অধরের হাসি,
সার্থক হয়েছে আজ তারে ভালবাসি'।
কামনারে দেয় যদি শতবার ফাঁকি,
জীবনের প্রতি পলে মৃত্যু আনে ডাকি,
চিরদিন মুগ্ধ অন্ধ মানবের মন
তবু তারি পায়ে করে আত্ম-বিসর্জ্জন।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

চির অপরাধী

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নায়েবের লোভ।

কখনও কাযে বাহির হওয়া অভ্যাস ছিল না, তাই প্রথম প্রথম দ্রৌপদী সংকোচে মরিয়া যাইত। পিছনে কাহারও পদশব্দ শুনিলেই সে চকিতে অবগুণ্ঠনটা একটু বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া পথের একধারে সরিয়া দাঁড়াইত; লোকটী চলিয়া গেলে পুনরায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত। তার পর একটু একটু করিয়া এ কার্য্য দ্রৌপদীর অভ্যাস হইয়া গেল। যাহাদের বাড়ী সে দুধ যোগান দিত, দ্বারিকের দারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা তাহারা সবাই জানিত। তাই সকলেই দ্রৌপদীর দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইত।

নায়েব একদিন কি একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ঐ গ্রামে আসিয়া, দ্রৌপদীকে দুধ লইয়া দ্বারিকের বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিল।

দ্রৌপদীর ম্লানমুখ ও শোভন সঙ্কোচ তাহাকে ভদ্র ঘরের রমণীর বিশেষত্ব দান করিয়াছিল। তদুপরি তাহার আয়ত চক্ষু ও বন্ধ্যানারীসুলভ পরিপুষ্ট নিটোল দেহ নায়েবের লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। নায়েবের সঙ্গে ঐ গ্রামের দুই চারিজন প্রজা ছিল। নায়েব তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ বুঝি দ্বারিকের পরিবার?"

একজন উত্তর করিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।" একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া নায়েব বলিল—"বেচারীর ত কষ্ট কম নয়! এই দুধ ঘাড়ে করে' সারা গাঁ-টা ঘুরে বেড়াবে?"

ইহাদের মধ্যে দ্বারিকের একজন হিতৈষী ছিল। সে বলিল—"ওঁর অদৃষ্ট, হুজুর। তা নৈলে দ্বারিকের যতদিন ক্ষেমতা ছিল, ঠিক ভদ্দর নোকের বৌটির মত পরিবারকে ঘরে বসিয়েই রাখত, বাইরের কোন কায কত্তে দিত না।"

এই কথোপকথনের অধিকাংশই দ্রৌপদীর কাণে গিয়াছিল। তীক্ষ্ণ কণ্টকের মত লজ্জা ও সঙ্কোচ তাহাকে প্রতিপদে বিঁধিতেছিল। সম্মুখের পথটুকু অতিক্রম করিয়া দ্রৌপদী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

নায়েব পথ চলিতে চলিতে চলিতে দ্রৌপদীর কথাই ভাবিতেছিল। দ্বারিক ঘোষ—যে অসুরের মত বলশালী ছিল—সে যে শিশুর মত বলহীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা ভারি একটা শুভলক্ষণ বলিয়া তাহার মনে হইল।

ইহার পর একদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর দ্রৌপদী রান্নাঘরের নীচু দাওয়ায় বসিয়া ডাল ভাঙ্গিতেছে, এমন সময় একজন বৈষ্ণবী ভিক্ষা করিতে আসিয়া গান ধরিল

"তোমার পায়ে শিখি পাখা লুটিয়ে পড়েছে,
ও রাই ধরে রাখ কৃষ্ণ তোমার ধরা দিয়েছে।"

দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি যাঁতা ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—"গান গেয়োনা মা, আমি ভিক্ষা দিচ্ছি।"—এই বলিয়া রান্নাঘর হইতে একটা পাত্রে করিয়া মুষ্টি-দুই চাউল আনিয়া বৈষ্ণবীকে দিল।

বৈষ্ণবী দ্রৌপদীর পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"গান গাইব না কেন বাছা, দিব্যি গান, শোন না।" বলিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল—

"যমুনার পথে যেতে
তাকিয়েছিলে অপাঙ্গেতে
সেই হতে কাল শরীর অবস হয়েছে।
তোমার প্রেম পাবে বলে—"

দ্রৌপদী একটু বিরক্ত হইয়া, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বৈষ্ণবীকে বাধা দিয়া বলিল—"থামনা গা—অসুখ বিসুখ সব, বল্লাম গান কত্তে হবে না।"

অগত্যা বৈষ্ণবীকে অর্দ্ধপথেই থামিতে হইল। তাহার মন্দিরা যোড়াটি ভিক্ষাপাত্রে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার অসুখ বাছা?"

দ্রৌপদী মৃদুস্বরে বলিল—"আমার সোয়ামীর।"

বৈষ্ণবী তখন বেশ একটু আরাম করিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি অসুখ গা? শক্ত কিছু?"

দ্রৌপদী শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হ্যাঁ।"

বৈষ্ণবী কিন্তু সহজে ছাড়িতে চাহে না; বলিল—"কি অসুখ শুন্‌তে পাইনে?

"সে সব শুনে কি করবে? যেমন বরাত করে এসেছিলাম তেমনি হয়েছে।" সেই ভীষণ রোগের নামটা করিতে দ্রৌপদীর যেন আটকাইয়া যায়; তাহার পুরাতন দুঃখ নূতন হইয়া উঠে।

বৈষ্ণবী একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"কি এমন রোগ, বলই না বাছা!"

অগত্যা দ্রৌপদী ম্লানমুখে বলিল—"পক্ষাঘাত।"

"ওমা, কি সর্ব্বনাশ! একেবারে পক্ষাঘাত? যাতে একেবারে হাত পায় মাথা খেয়ে বসতে হয়?"—বলিয়া বৈষ্ণবী প্রচুর বিস্ময়ের অভিনয় করিল।

দ্রৌপদী অত্যন্ত আহত হইয়া বলিল—"ওকি কথা গা তোমার!"

বৈষ্ণবী কথাটা সামলাইয়া লইবার জন্য বলিল—"তোমার সোয়ামীর কথা কি বল্‌ছি? ষাট ষাট, ওই রোগে ওরকম হয়, তাই বল্‌ছিলাম। তা, তোমার বড্ড কষ্ট!"

দৌপদী নরম হইয়া বলিল—"তা কি করব! ভগমান্ মারলে আর মনিষ্যির কি হাত বল?"

"আহা এই অল্প বয়সে কোথায় হেসে খেলে বেড়াবে—তা নয় দিন রাত রোগীর সেবা!"—বলিয়া বৈষ্ণবী সহানুভূতিতে গলিয়া দ্রৌপদীর মুখের পানে চাহিল।

এ কথাটাও দ্রৌপদীর ভাল লাগিল না। বিরক্ত হইয়া বলিল—"তা, মেয়েমানুষ ভাতার পুতের সেবা করবে না ত কি করবে। তোমার অমন ধারা কথা কেন গা?"

"তা করবে বৈকি, তা করবে বৈকি। তাও বলি বাছা, সবাই কি করে এমন! দায়ে পড়ে গিয়েছে কত্তে। বল্‌ছিলেম কি—তোমার পদ্মফুলের মত মুখখানি, কত লোক পেলে এখন মাথায় করে রাখে।"

দ্রৌপদী এতক্ষণে বুঝিল, বৈষ্ণবী কোনও একটা মন্দ উদ্দেশ্য লইয়া তাহার নিকট আসিয়াছে। বৈষ্ণবীর পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৈষ্ণবী সত্যই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই আসিয়াছিল। সে বুঝিল, তাহার বক্তব্য এখনি না বলিলে হয়ত আর বলিবার অবকাশ ঘটিবে না। তাই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"রাগ কোরোনা গো, তোমার কপাল ফিরে গিয়েছে। আমাদের নায়েব মশাইকে এখানকার রাজা বল্লেই হয়। তিনি তোমার জন্যে পাগল। কেন আর এ খোঁড়াকে নিয়ে—"

রাগে, ভয়ে, লজ্জায় দ্রৌপদীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মূঢ়ের মত সে বাক্যাহত হইয়া রহিল।

বৈষ্ণবী ইহা শুভ-লক্ষণ মনে করিয়া চুপি চুপি বলিতে লাগিল—"কোন দুঃখ থাক্‌বে না, রাজার হালে থাক্‌বে, কত লোককে তখন পির্‌তি-পালন করতে পারবে। তা হলে, বাবুকে বল্‌ব, তুমি রাজী?"

এতক্ষণে দ্রৌপদী স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছিল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল—"আমি তার মুখে মুড়ো ঝ্যাঁটা মারি—শীগ্‌গির চলে যাও আমার বাড়ী থেকে।"—বলিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে বাটীর বাহির করিয়া খিড়কি বন্ধ করিয়া দিল।

দুয়ার দিয়াই দ্রৌপদীর ভয় হইতে লাগিল—তাহারা দুইজনে মৃদুস্বরে কথা কহিলেও, যদি তাহার কোন অংশ স্বামীর কাণে গিয়া থাকে! দ্রৌপদীর বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল। রান্নাঘরের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া, দুইহাতে তাহার আলোড়িত বক্ষটাকে কিছুক্ষণ চাপিয়া শান্ত করিল। তার পর অসমাপ্ত কার্য্য কোনগতিকে শেষ করিয়া লইল।

কায মিটিয়া গেলে সে একবার স্বামীর কাছে

আসিল। দ্বারিক দাওয়ায় মাদুরে আধ ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। দ্রৌপদীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খানিক আগে কে এসেছিল? ভিক্ষে করতে?"

দ্রৌপদী উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

"ও কি বলছিল?"

"তোমার অসুখের কথা শুনে দুঃখ করছিল।"—বলিতে বলিতে দ্রৌপদী আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। সেখানে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর বুকের উপর মুখ লুকাইল।

স্বামীর বক্ষ সকল নারীরই চিরকালের সান্ত্বনার স্থল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অবলম্বন।

পাড়ার ছিদাম ঘোষের মা অপরাহ্ণে বেড়াইতে আসিয়া দ্রৌপদীকে বলিল—"হ্যা দেখ্‌ বৌমা, এক কায করবি?"

"কি কায পিসি?"

"অনেক বাংলা ইংরাজী ওষুধ তো দ্বারিককে খাওয়ালি, রোগ তো সারাতে পারলিনে। কথায় বলে রোগ শিবের অসাদ্দি—তা সত্যিই কি শিবের অসাদ্দি, তা নয়, ও একটা কথার কথা। যদি সারে, আর এক রকম চেষ্টা করে দেখবি?"

"আর কাকে দেখাব! অত টাকাই বা কোথা পাব বল?"

"এ দেখাতে হবে না, তুই গেলেই হবে।"

দ্রৌপদী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি?"

ছিদামের মা মাথায় হাত ঠেকাইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নিম্নস্বরে কহিল—"বাবা তারকেশ্বরের ঠাঁই।"

দ্রৌপদী ঈষৎ কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"সেইখানে গেলেই কি ওষুধ পাওয়া যায় পিসি?"

"কোথাকার নেকা মেয়ে! সেখানে গিয়ে ধন্না দিবি, তারপর তোর বরাতে থাকে, বাবার দয়া হয়, তো পারি।" বলিয়া ছিদামের মা পুনরায় বাবার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

দ্রৌপদী স্বামীর অসুখের কথা ভাবিয়াই একটু উন্মনা হইয়াছিল, তাই প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারে নাই। এতক্ষণ সব বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা পিসি, বাবার দয়া হবে তো?"

"তা আমি নিচায় করে কি কোরে বল্‌বো বল্‌। তবে পেরাই তো কেউ বাবার দয়ায় বঞ্চিত হয় না। এই দেখ্‌না, ভজহরির কি রকম ব্যামো হয়েছিল; তার পিসি গিয়ে ধন্না দিলে। দুদিনের পর বাবার হুকুম হ'ল—যা, এই ওষুধ নিয়ে যা, জল দিয়ে বেঁটে রোজ একটু খাওয়াবি, তাহলেই সেরে যাবে। মাগী চোখ খুলে দেখে, হাতের মুঠোর মধ্যে কিসের মস্ত একটা শেকড় রয়েছে—বাবা, গা যেন একেবারে শিউরে উঠ্‌চে।"—কথাটা অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়াই ছিদামের মা এবার মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাহার বর্ণনার সূত্র পুনর্গ্রহণ করিল—

"তারপর চার দিনের মধ্যে ভাল হয়ে উঠ্‌ল।"

ছিদামের মা আরও দুইচারিটা শূলব্যথা, কাসরোগ, পক্ষাঘাত ও হাঁফানির রোগী কিরূপ অদ্ভুতভাবে সারিয়াছে তাহা বলিয়া, দ্রৌপদীর মুখের পানে চাহিল।

দেবতার কৃপায় স্বামীর এই দুরারোগ্য ব্যাধিও সারিয়া গিয়াছে, ইহা কল্পনা করিতে দ্রৌপদীর দেহ সত্যই বারবার শিহরিয়া উঠিতেছিল। সেও সজল চক্ষে দেবতার উদ্দেশ্যে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তা, কার সাথে যাব সেখেনে পিসি?"

"তাই বল্‌তেই তো এসেছি তোরে। ভজর পিসি, বরুণের মা, হরির বোন—তাকে তুই চিন্‌িস্‌ নে—আর আমি যাব। আমার ছিদাম সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।"

দ্রৌপদী একটু ভাবিয়া বলিল—"তা আমার তো যাবার খুবই ইচ্ছে। কিন্তু বাড়ী থেকে গেলে ওকে কে দেখ্‌বে শুনবে?"

ছিদামের মার উপস্থিত বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ। সে তখনি বলিল—"বেহানকে একটা খবর পাঠিয়ে দে—তিনি কি আর এসে দুটো দিন ভাত জল দিতে পারবে না?"

"আচ্ছা, রাতে ওকে জিজ্ঞাসা করে' কাল না হয় কাউকে পাঠাই। তোমরা কবে যাবে?"

"এই আজ বুধবার, আস্‌ছে শনিবারে আমরা যাব। খুব সকালে সকালেই বেড়িয়ে পড়্‌তে হবে। কিন্তু তুই এর মধ্যে সব ঠিক করে নে। এখন তাহলে উঠি।"—বলিয়া ছিদামের মা আপনার গৃহ-উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

ছিদামের মা চলিয়া যাইতেই, দ্রৌপদী সেখানে বসিয়া সজল নয়নে খানিকক্ষণ আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল। কেমন সুখে ও শান্তিতে তাহারা দিন কাটাইত! তাহার স্বামীর শক্তি, সাহস, সুন্দর স্বাস্থ্য ও পরোপকার-প্রবৃত্তির সবাই প্রশংসা করিত। গ্রামের কতলোকেই বলিয়াছে, তাহার কপাল ভাল, তাই এমন স্বামী পাইয়াছে। আর, সত্যই তো তাই। কত বাড়ীতে কত ঝগড়া হয়। তাহারা তো কখন ঝগড়া করে নাই। সামান্য দুই এক কথা যে কখন হয় নাই, তা নয়। তা, সে কোন্ সংসারে না হয়? যদি কখনও তাহার স্বামী রাগের মাথায় তাহাকে একটা শক্ত কথা বলিয়াছে, রাগ পড়িয়া গেলেই আবার নিজে ডাকিয়া কত করিয়া কথা কহিয়াছে। তাহার স্বামী কখনও কাহারও ভাল বই মন্দ করে নাই, তবে ভগবান তার এই বয়সে এমন দশা কেন করিলেন? তেমন 'গায়ের জোর', 'বুকের পাটা' ক'জনের থাকে? আহা, সেই মানুষ এখন কি করিয়াই বাঁচিয়া রহিয়াছে! পরের মুখ চাহিয়া থাকা সে কখন ভালবাসিত না, আর এখন নিজের জোরে কিছুই করিতে পারে না। উঃ, কি কষ্টই সে বুকের মধ্যে পুষিয়া আছে।

তারপর তারকনাথের কথা মনে হওয়ায়, মাটীতে মাথা রাখিয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া দ্রৌপদী অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে কহিল—"দোহাই বাবা তারকনাথ, আমার গতর নিয়ে ওর 'গতর' ফিরিয়ে দিও ঠাকুর।"

এমন সময়ে স্বামীর ডাক শুনিয়া দ্রৌপদী উঠিয়া স্বামীর নিকট আসিল।

দ্রৌপদীকে দেখিয়া দ্বারিক বলিল—"তোকে যে কতক্ষণ ধরে ডাক্‌ছি, কোথায় গিয়েছিলি?"

"কৈ, আমি তো কোথাও যাইনি, বাড়ীতেই ছিলাম,কি বল্‌ছিলে?"—বলিয়া স্বামীর দিকে চাহিতেই দেখিল, পশ্চিম দিক দিয়া শেষ রৌদ্রটুকু স্বামীর মুখে চোখ পড়িতেছে।

এই সময়ের একটু আগেই প্রত্যহ সে স্বামীকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে বসাইয়া আসে। আজ অন্যমনস্ক হইয়া ভুলিয়া গিয়াছে। তাই লজ্জিত হইয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল—"চল এবার ঘরের মধ্যে দিয়ে আসি।"

এই দারুণ রোগের নিষ্পেষণে দ্বারিকের পূর্ব্বের সেই পৌরুষ ভাবটুকু চলিয়া গিয়াছিল। শিশুর মত অসহায় হইয়া, শিশুসুলভ অভিমানটুকুও তাহাকে অধিকার করিয়াছিল। সে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"না, এখন আর ধরতে হবে না, আমি পুবদিক মুখ করে বস্‌ছি। তোমার কি কায আছে সারগে। আমার যেন, মরণ নেই বলে' সবারই অচ্ছেদ্দার ভাগী হয়ে বেঁচে থাকা।"

দ্রৌপদী গদ্‌গদ স্বরে বলিল—"দেখ, আমি যদি তোমাকে কখন ভুলেও অচ্ছেদ্দা করে থাকি, আমি যেন দুটী চক্ষের মাথা খাই—হাত পা দুই যেন আমার পড়ে যায়।"

অত্যন্ত কাতর হইয়া এই কথা বলিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া তাহাকে উঠিবার জন্য অনুনয় করিল। স্ত্রীর সাহায্যে ঘরের ভিতর আসিয়া ও তাহার কাতর

মুখখানি দেখিয়া দ্বারিকের অভিমান দূর হইয়াছিল। একটা বালিসে হেলান দিয়া, স্ত্রীর পানে চাহিয়া দ্বারিক বলিল—"কি দশাই হয়েছে আমার! দাওয়া থেকে ঘরের ভেতর আসবারও ক্ষমতা নেই। তোর মনে আছে বৌ, সেই যে বছর দুধের দাম বড্ড চড়া, দুর্গাপুরে এক বিয়েতে আমি ছানা দিতে যাই। অনেক টাকা তাতে লাভ হয়েছিল। এখান থেকে দশ কোশ হেঁটে সেখানে বিকেলে পৌঁছুই। তুই একলা থাকবি, তাই ভেবে আবার সন্ধে বেলাই সেখান থেকে বেরিয়ে হেঁটে রাত্তিরেই বাড়ী ফিরি। তোর মনে আছে?"

দ্রৌপদীর সেই কথা খুবই মনে ছিল। নারীর পক্ষে—তা সে শিক্ষিতাই হউক আর অশিক্ষিতাই হউক—স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ কথা কখনই ভুলিবার নয়। তাহার যে কয়টী গর্ব্ব করিবার বিষয় আছে—তন্মধ্যে এইটী সব চেয়ে বড়।

কিন্তু মনে থাকিলেও, দ্রৌপদীকে এ প্রশ্নের উত্তর ঘাড় নাড়িয়া দিতে হইল। সেই অতীত দিনের সুখময় উজ্জ্বল স্মৃতি, বর্ত্তমানের দুঃখ-মলিন কাচের ভিতর দিয়া দুঃখের মতই দেখাইতেছিল। তদুপরি তাহার স্বামীর ব্যথিত কণ্ঠস্বর নারী-চিত্ত মথিত করিয়া তাহার উত্তর দিবার শক্তি হরণ করিয়াছিল।

একটু পরে দ্রৌপদী বলিল—"ও বাড়ীর সেই রক্ষে পিসি এসেছিলেন। তারা সবহি বাবা তারকনাথের ওখেনে শনিবারে যাবে। আমিও ভাবছি তোমার জন্যে সেখেনে গিয়ে ধন্না দেব। অনেকের অনেক শক্ত অসুখ, শুনেছি বাবার দয়ায় সেরেছে।"

এই ক্ষীণ দুর্ব্বল পা দুখানা আবার পূর্ব্বের মত সবল ও কার্য্যক্ষম হইতে পারে, এ কল্পনাটুকুও দ্বারিকের নিকট মধুর লাগিল। কিন্তু তাই কি হইবে? তাই যদি হইবে, ভগবান তবে এমনই বা করিলেন কেন?

দ্বারিক জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা কারু কি পক্ষাঘাত সেরেছে?"

"হ্যাঁ, পিসি তো বল্লে, কতজনের সেরেছে। তা আমি যাব, কি বল?"

দ্বারিক সম্মতি দিল, কিন্তু পরক্ষণেই আপনার অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া ম্লান মুখে বলিল—তা হলে আমার কি হবে, একা থাক্‌তে পারব?"

"তা কি পার? সৌরভীকে দিয়ে মাকে আজ খবর দেব। যে ক'দিন দেরী হয়, মা এখানে থাক্‌বে।"

"শাশুড়ী কি আসবে? তোর সেই ছোট্ট ভাইটা আবার আছে।"

"তা থাক্‌লেই বা। সেও আসবে। বাবা বাড়ী আগ্‌লাবে।"

পরদিন সে অনেক কাকুতি মিনতি-পূর্ণ কথা বলিয়া সৌরভী নাম্নী এক বিধবা ইতর জাতীয়া রমণীকে মাতার নিকট পাঠাইল।

কন্যার দুঃখের কথা ভাবিয়া ও তাহার মিনতি শুনিয়া, দ্রৌপদীর মা বলিয়া দিল যে সে শুক্রবারে আসিবে।

শুক্রবারে আহারাদির পর দ্রৌপদীর মা গরুর গাড়ী করিয়া পুত্রকে লইয়া জামাতৃভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রে স্বামীর কোন সময়ে কি কি দরকার ইত্যাদি সব মাকে বিশদভাবে দ্রৌপদী বুঝাইয়া দিল। স্বামীকে বারবার করিয়া সাবধান করিয়া দিল, যেন সে কিছুতেই আপনি উঠিতে বা কোন কায করিবার জন্য কিছুতে চেষ্টা না করে। যা দরকার, মাকে বলিতে যেন কিছুমাত্র লজ্জা না করে, ইত্যাদি।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, মাকে আর একবার সব কথা মনে করাইয়া দিয়া, স্বামীকে বিশেষ ভাবে আর একবার সাবধান করিয়া দিয়া, দ্রৌপদী ছিদামের মায়েদের সহিত তারকেশ্বর যাত্রা করিল।

দ্রৌপদী বাড়ীর বাহির হইবামাত্র দ্বারিক নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে করিল। দ্রৌপদীকে বাদ দিয়া তাহার জীবনটা যে আর কিছুই নহে, ইহাই তাহার মনে

হইতে লাগিল। এক সময়কার সেই বলিষ্ঠ পুরুষ অকারণে হারিকের চক্ষু বারবার সজল হইয়া আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ধ্যানমগ্না।

শেওরাফুলিতে দ্রৌপদীকে যেটুকু সময় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই অনেক তারকেশ্বর-যাত্রীর সহিত তাহাদের আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। অনেক রকমের লোকই তাহাদের মধ্যে ছিল। কেহ ধন্না দিতে চলিয়াছে, কেহ মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সাধ্যমত পূজা দিবার জন্য ছুটিয়াছে। প্রচুর দাড়ি গোঁফ ও প্রকাণ্ড একমাথা চুল লইয়াও কয়েকটী প্রৌঢ় ও যুবক দেবতাকে তাহা দান করিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অগ্রসর।

এই সব দেখিয়া দ্রৌপদীর মনে হইতে লাগিল, কত জনের তো আশা পূর্ণ হইয়াছে, তাহারই কি হইবে না?

আর একপ্রকার জীবও দ্রৌপদী সেখানে দেখিল। একজন বাঙালী বাবু, বেশটা খুব আলুথালু ভাবের, চোখ দুটী ঈষৎ রক্তিম। সঙ্গে, ওড়না গায়ে, জরীর চটীজুতা পায়ে দেওয়া অবগুণ্ঠনহীনা একটী রমণী। স্ত্রীপুরুষ দুজনেই তীর্থদর্শনে চলিয়াছে। ইহাদের ব্যবহার দেখিয়া দ্রৌপদী ইহাদিগকে স্বামীস্ত্রী ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিল না; কিন্তু কি প্রকারের স্বামী-স্ত্রী তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। তবে যেটুকু তাহার সংসারের অভিজ্ঞতা, তাহার দ্বারা একটা অনুমান করিয়া সে ছিদামের মাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"পিসি, এরা কি কলকেতার খিরিষ্টান, স্বামীর সামনে এমন করে বসে রয়েছে?"

ছিদামের মা হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, ও মাগী তো ওর সাতপাকের বিয়ে করা বৌ! দেখছিস্‌নে ও কলকেতার বেশ্যে; মাতালে মিনসেটা আবার ওকে নিয়ে বাবা তারকেশ্বরের কাছে চলেছে। মরণ আর কি।"

'মাতাল' কথাটা শুনিয়াই দ্রৌপদী ছিদামের মায়ের দিকে খুব ঘেঁসিয়া বসিল। মাতালের নামে তাহার খুব একটা ভয় ছিল। মাতালদের লজ্জা ঘৃণা নাই এবং ক্ষেপা কুকুরের মত কখনও কখনও মানুষকে কামড়াইয়া পর্য্যন্ত দেয়—এসব সে শুনিয়াছিল।

আর একটু পরেই ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। পাছে শীঘ্র ছাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় ছিদামের মা গাড়ী হইতে লোক নামিতে না নামিতে মেয়েদের কামরায় উঠিয়া সকলকে এক প্রকার টানিয়া তুলিল। যাহাদের নামিবার অসুবিধা হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একটী যুবতী বলিল—"আগে আমরা নামি, গাড়ী খালি হোক্, তারপর উঠো, গাড়ীতো আর পালাচ্ছে না বাছা।"

ছিদামের মা তৎক্ষণাৎ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করিয়া উত্তর দিল—"বেশ আক্কেল তোমার বটে! তোমরা গুটীগুটী নামতে নামতে গাড়ী ছেড়ে দিক্, আর আমরা তখন এই মাঠের মাঝখানে পড়ে থাকি!"

সেই যুবতী পুনরায় বলিল—"তুমি তো বেশ আপনার কোলে ঝোল টানতে পার! গাড়ী যদি ছেড়ে যেত, তাহলে বুঝি আমাদের গাড়ীতে থাকলে ভারী সুবিধে হ'ত?"

ছিদামের মা একটু প্রাণ ভরিয়া উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া, ভিতরে ভিতরে খুব খুসী হইয়াই জবাব দিল—"আমাদের অসুবিধে আর তোমাদের অসুবিধে! আমরা বাবার ছিচরণ দর্শন করব বলে বেরিয়েচি। তা আমাদের ঘটত না। আর তোমরা না হয় সেখানেই ফিরে যেতে—সেতো ভাগ্যি!"

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"বাবা! মাগী কি কথাও!"

ছিদামের মা তখন তাহার উদ্দেশে ঝগড়া সুরু করিয়া দিল। ছিদামের মার ছিদাম এতক্ষণ সূর্য্যের নিকট ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের মত ম্লানপ্রভ হইয়া ছিল, এইবার সে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল এবং অনেক বলিয়া কহিয়া মাকে থামাইল।

আর আন্দাজ আধঘণ্টা পরে গাড়ী ছাড়িল।

ছিদামের মা ভদ্রলোকদিগের নববিবাহিতা কন্তার সহিত দাসী স্বরূপে অনেকস্থানে যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত থাকায়, তারকেশ্বর ষ্টেশনে নামিয়া, সেখান হইতে ভাল থাকিবার ঘরের সজীব বিজ্ঞাপনের ব্যূহ ভেদ করিয়া, একটা মাঝামাঝি রকমের ঘর দৈনিক ভাড়ায় ঠিক করিয়া লইল। বাড়ীওয়ালার সহিত সে পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিল যে ছিদামের শোবার জন্য কিন্তু একটা পৃথক স্থান তাহাকে দিতে হইবে।

সেদিন আর 'হত্যা' দেওয়া হইল না। সকলে মিলিয়া দেবদর্শনান্তে বাসায় ফিরিয়া, স্নানাহারের যোগাড় করিয়া লইল। 'ছিদামের মা' ইহার পূর্ব্বে দুইবার এখানে আসিয়াছিল। 'হত্যা' দিবার পূর্ব্বে কি কি করিতে হয়, কোথায় 'হত্যা' দিতে হয় ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য সংবাদ দ্রৌপদীকে জানাইয়া রাখিল।

'হত্যা' দেওয়া জিনিষটা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া, যতই সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই দ্রৌপদীর মনে এক প্রকার ভীতির উদয় হইতেছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা জাগিয়া রহিল।

সমস্ত শুনিয়া দ্রৌপদী এবার জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা পিসি, রাত্তিরেও তো এখানে একা থাকতে হবে?"

ছিদামের মা তাহাকে প্রচুর সাহস দিয়া বলিল—"একা কেন থাকতে গেলি না? কতলোক সেখানে পড়ে রয়েছে, দেখতেই তো পেলি। আর, এমনই বাবার মাহিত্ত যে ভয় ডর মনের তিরসীমেনায় আসতে পারে না।"

তারপর ছিদামের মা অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া সকলকে ঘুমাইতে পরামর্শ দিয়া, আপনি অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল। দ্রৌপদীর চক্ষে কিন্তু অত সহজে নিদ্রা আসিল না। তাহার অসহায় দুর্ভাগ্য স্বামী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিতেছে কি না, অসুখের পর আজ যে প্রথম তাহার কাছ-ছাড়া, তাহার অভাবে স্বামীর কতখানি অসুবিধা হইতেছে, এই সব ভাবিতে ভাবিতে প্রায় রাত্রি শেষ হইয়া পড়িল।

প্রভাত হইবামাত্র ছিদামের মায়ের ডাকে সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া সকাল সকাল ছিদামের মা দ্রৌপদীকে সঙ্গে করিয়া, দুধপুকুরে স্নান করাইয়া আনিল। পূর্ব্ব দিন হবিষ্যান্নের আতপ তণ্ডুল, ইত্যাদি দ্রব্য ও একখানি লালপাড় নূতন শাড়ী সব যোগাড় করা ছিল। শীঘ্র শীঘ্র হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া আহার করিয়া লইয়া, দ্রৌপদী কম্পিত বক্ষে ছিদামের মায়ের সহিত 'ধন্না' দিবার স্থানে চলিল। দেবতার চাঁদনির পাশেই মোহান্ত মহারাজের আফিস বা ডিসপেন্‌সারী। ঔষধ পাওয়া যাইবে এই আশ্বাসে ডাক্তারের 'ভিজিট' বা ঔষধের দাম স্বরূপ একটা টাকা মোহান্ত মহারাজের গোমস্তার হাতে দিয়া, নাম ও ঠিকানা লেখাইয়া দ্রৌপদী চাঁদনির ভিতর একটা নিরিবিলি স্থান বাছিয়া লইল। তারপর ভক্তিভরে দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, একখানা বিছানার চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সেখানে শুইয়া পড়িল। সর্ব্বদা তাহার খোঁজ লইবে এই ভরসা দিয়া, ছিদামের মা বাসায় ফিরিয়া আসিল।

দিন কাটিয়া সন্ধ্যা আসিল। দেবতার কথা ভাবিতে গিয়া, দ্রৌপদীর স্বামীর কথাই মনে হইতে লাগিল। হয়ত মা ঘরে এখনও আলো জ্বালে নাই; সে হয়ত এখনও অন্ধকারে মুখটী বুজিয়া বসিয়া আছে; খাওয়া দাওয়া ঠিক সময়ে হইতেছে কি না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? সব তাতেই যে এখন তাহার পরের মুখ চাহিয়া থাকা! নিজের যে তাহার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই।

এমনই করিয়া, দেবতার কথা ভাবিতে, স্বামীর কথা মনে করিয়া, নিদ্রা ও তন্দ্রার মধ্য দিয়া দুইটী দিন দুইটী রাত চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিনের প্রভাতে ছিদামের মা সংবাদ লইতে আসিলে, তাহাকে দেখিয়াই দ্রৌপদী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"কৈ পিসি, বাবার তো দয়া হল না।"

ছিদামের মা দ্রৌপদীর গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—"উতলা হোসনে মা, এমনই কি হবে যে বাবা দয়া করবেন না!, খুব একমনে আজ বাবাকে ডাকিস দিকি। সুদ্দু বাবার কথা ভাব্‌বি, আর কিছু মনে করবিনে, বাবার ছিচরণ সার করে' শুধু পড়ে থাক্।"

তরপর ছিদামের মা দেবতার সম্মুখে প্রণতা হইয়া নিম্নস্বরে বলিল—"দোহাই বাবা তারকেশ্বর, এ অভাগীর উপর মুখ তুলে চাও। তোমার দয়ার শরীল বাবা, বাবা নিদয়া হোয়ো না।"

ছিদামের মা চলিয়া গেলে দ্রৌপদী ভাবিয়া দেখিল, সত্যই তো সে 'বাবাকে' একমনে ভাবিতে পারে নাই; স্বামীর কথাই যে তাহার বেশী মনে হইয়াছে। তখন হইতে সে তাহার সমস্ত মন দেবতার চরণে প্রার্থনায় সঁপিয়া দিল। দুই দিন অনশনে অবসন্না ক্লিন্নদেহা নারীর নিদ্রা-তন্দ্রার মধ্যেও প্রার্থনার কাতর ভাবটুকু জাগিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

মেসোপোটেমিয়া

যাত্রা।

সামান্য বেতনে রেলে চাকরি করিতেছিলাম। পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া, দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়া, দেনার জ্বালায় অস্থির হইয়া চোখে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। এমন সময় ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। বাঙ্গালী পল্টন গঠিত হইতে লাগিল। মেসোপোটেমিয়াতে নানাবিধ কর্ম্ম করিবার জন্য উচ্চ বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। আমি কর্ম্মপ্রার্থী হইলাম। ১৯১৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে জামালপুরে গিয়া রেক্রুটিং অফিসারের নিকট উপস্থিত হইলাম। স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, সেই দিনই বোম্বাই যাত্রা করিলাম।

২৩শে ডিসেম্বর বোম্বাই দাদর্ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, তথায় ১০।১২ দিন থাকিয়া, ১৯১৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে, জন্মভূমিকে প্রণাম করিয়া, স্ত্রীপুত্রকন্যার মুখ স্মরণ করিতে করিতে এলিফ্যান্টা (Elephanta) নামক জাহাজে যাত্রা করিলাম। বলা বাহুল্য আমি যে এইরূপে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে—যুদ্ধস্থলে—গমন করিতেছি, ইহা আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কাহাকেও পূর্ব্বে জানাই নাই। জানাইলে, যাইতে পাইতাম কিনা ঘোর সন্দেহের বিষয়।

১২ই জানুয়ারি বাসরার নিকট মাজিল (Magil) নামক বন্দরে পৌঁছিলাম। জাহাজ পৌঁছিবামাত্র, আমাদিগকে নামাইয়া লইবার জন্য একজন ক্যাপ্টেন আসিলেন; আমাদের ছাড়-পত্র দেখিয়া, যাহার কর্ম্মস্থান যেখানে তাহাকে সেখানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ জাহাজে পীড়িত হইয়াছিলাম। আমাকে ও অন্য যাঁহারা পীড়িত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে একটি মোটর-লঞ্চে (যাহাতে লেখা ছিল Presented by H. H. the Maharaja of Kapurthala to H. M. the King Emperor) বাসরার হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময় হাঁসপাতালে পৌঁছিলাম। তখনই একজন ডাক্তার আসিয়া আমাদের পরীক্ষা করিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে যুদ্ধক্ষেত্রে রোগীর যেরূপ

ভাবে যত্ন লওয়া হয়, বোধ হয় অন্য কোথাও সেরূপ সুব্যবস্থা হয় না। একজন ক্যাপ্টেন শ্রেণীভুক্ত ডাক্তারের অধীন দুই একটি শুশ্রূষাকারিণী (nurse) ও একটি আর্দ্দালি সর্ব্বদাই রোগীদের নিকট উপস্থিত থাকে এবং রোগীর যখন যাহা আবশ্যক, যোগাইয়া দেয়।

হাঁসপাতালে ২২ দিন থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া, সেকিনা নামক স্থানে আমাদের রেলওয়ে ডিপুতে (depot) পৌছিলাম। তথায় ২।৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর আমাদের হেড অফিসর আসিলেন। তখনই সকলকে এক একখানি খোরাক-চিঠি (Ration chit) দিয়া সাহেব আমাদের বাঙ্গালী মেসে পাঠাইয়া দিলেন।

"বাঙ্গালী মেস।"

ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য আলাহিদা মেস আছে। প্রত্যেক মেসে সরকার হইতে একজন পাচক ও একজন ভৃত্য পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী মেসে পৌছিবামাত্র, মেসের ম্যানেজার ২৪ পরগণা নিবাসী জনৈক ভদ্র মহাশয়ের অভদ্র ব্যবহারে আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। তবে মেসের অন্যান্য লোকের যত্ন ও ভালবাসায় সব ভুলিয়া গেলাম।

আহারের ব্যবস্থা।

খোরাক-চিঠি (Ration chit) প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের দৈনিক বরাদ্দ এই—১২ আউন্স আটা, অথবা চাউল (বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজীদের নিমিত্ত চাউলের ব্যবস্থা), ৪ আউন্স ঘৃত, ৪ আউন্স চিনি, ৬ আউন্স মাংস। ইহা ছাড়া তরকারী—আলু, পিয়াজ বেগুণ, কপি; আঙুর, বেদানা, আকরট প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইত। আমরা ঐরূপ খোরাক পাই কিনা এবং কোন অসুবিধা ভোগ করিতেছি কি না, তাহাও আমাদের অফিসারগণ অনুসন্ধান করিতেন।

কর্ম্মস্থানের বিবরণ।

১০।১২ দিন সেকিনায় থাকিয়া বোগদাদের নিকট হিনাইদি নামক স্থানে রওনা হইলাম। তথায় পৌছিয়া দেখিলাম, পঞ্জাবীদের সংখ্যা ও প্রাদুর্ভাব বেশী—তাহার পর মান্দ্রাজী ও সর্ব্বশেষে বাঙ্গালীরা স্থান পাইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, স্বদেশবাসী বলিয়া কাহারও সহানুভূতি নাই। পঞ্জাবীরা বাঙ্গালীদের বড় প্রীতির চক্ষে দেখেন না। তবে মান্দ্রাজীরা বাঙ্গালীর সহিত মেশেন। পঞ্জাবীদের যেন ইচ্ছা যে তাঁহারাই সেখানকার চাকরি ও ব্যবসায়গুলি একচেটিয়া করিয়া লন, অন্য প্রদেশের লোক না আসে। যদি ভারতবাসীর তথায় কিছু নিন্দা হয়, তাহা হইলেই তাহা পঞ্জাবীদের দোষে। তবে ইংরাজ অফিসারগণ আমাদের খুব যত্ন করিতেন। আমাদিগকে কিসে সুখে রাখিবেন তাহাই তাঁহাদের চেষ্টা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সকল ইংরাজ অফিসার ভারত হইতে গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তত ভাল ব্যবহার পাই নাই।

আরবগণের কথা।

অরবেরা আমাদের সহিত খুব ভদ্র ব্যবহার করে। তাহাদের ধারণা ছিল, আমরা কাফের অর্থাৎ হিন্দুগণ অতি নির্দ্দয়, কারণ ইহার পূর্ব্বে তাহারা কখনও হিন্দুকে দেখে নাই। এখন তাহাদের সে ধারণা ঘুচিয়াছে। কিছু আরবী ভাষা জানা থাকিলে ও কথা বলিতে পারিলে ইহাদের সহিত খুব মিশিতে পারা যায়। আরব-পুরুষেরা বড়ই আলস্যপ্রিয়। সর্ব্বদা কাফির দোকানে বসিয়া কাফি ও আফিং খাইতেছে। কোনও কুটুম্ব বা পরিচিত লোক যাইলে তাহাকেও সেই কাফির-দোকানে লইয়া গিয়া অভ্যর্থনা করে। কারণ তাহাদের আমাদের দেশের মত বৈঠকখানা বা বসিবার স্থান নাই। সহরে যাহারা বাস করে,—কি জু কি আরব,—কাহারও ঘরে রন্ধন হয় না। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই দোকান হইতে লম্বা লম্বা রুটি ও দুম্বার মাংস কিনিয়া আনিয়া খায়। তবে পল্লীগ্রামে আরবেরা

নিজের ঘরেই রন্ধন করে। জু-জন পল্লীগ্রামে বাস করে না, সহরেই থাকে। আরব স্ত্রীলোকেরা খুব পরিশ্রমী ও বলিষ্ঠ—তিগ্রিস (Tigris) নদীতে নিজেরাই নৌকা খেওয়াইয়া পারাপার হয়,মরুভূমির উপর দিয়া অশ্বারোহণে যাতায়াত করে, কাহারও প্রতি চাহিয়া দেখে না—ভ্রুক্ষেপ নাই,—আপন মনেই যাইতেছে। আরব স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী বিলাসী ও সৌখীন। পুরুষের সহজে বিবাহ হয় না। ৪৫ শত টাকা না পাইলে কন্যার পিতা কন্যার বিবাহ দেয় না। দরিদ্রের সহজে বিবাহ হয় না। আর একটা প্রথা, সে দেশে কন্যার পিতা কন্যাকে লইয়া বরের বাড়ীতে যাইয়া বিবাহ দিয়া আসে এবং যাহা যৌতুক দিবার দেয়। বিবাহ দিতে যাইবার সময় আমাদের দেশের মত হুলুধ্বনি দেয়।

আরবেরা পূর্ব্বে কখনও রেল দেখে নাই। অবশ্য বার্লিন-বাগদাদ রেল পূর্ব্ব হইতে ছিল—তাহা একদিকে, একদিকের লোকেরাই দেখিয়াছিল। এখন যুদ্ধের জন্য চারিদিকে রেল খোলা হইয়াছে। প্রথমে দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোকরা রেলগাড়ী দেখিতে আসিত ও "খোদা সেকিনা" বলিয়া সেলাম করিত। গত ১৫ই এপ্রিল হইতে সমস্ত রেলই সর্ব্বসাধারণ যাত্রীর জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন আরবেরা ৫ মাইল পথ হাঁটিবার ভয়ে, ২।৩ ঘণ্টা ট্রেণের নিমিত্ত ষ্টেশনে বসিয়া থাকিবে তবু হাঁটিয়া যাইবে না।

ইংরাজের সুশাসনে আরবেরা বেশ সন্তুষ্ট ও সুখে আছে। তাহারা বলে যে পূর্ব্বে রাত্রিতে "বুদ্ধু" অর্থাৎ চোরের উপদ্রবে কেহ ঘুমাইত না। চোরেরা দুম্বা, ঘোড়া, উট চুরি করিতে আসিত। সন্ধ্যার সময় এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে কেহ যাইত না। আরবগণের মুখে শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে সামান্য একটা রুমালের জন্যও চোরে মানুষকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে। এখন তাহারা রাত্রিতেও চলাচল করে, কোনও ভয় নাই; ইংরাজের সুশাসনে আরবেরা তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করে।

বোগদাদ।

যেমন কোন তীর্থ স্থানে যাইলে ভিখারীর ও ভিখারিণীর উপদ্রব সহ্য করিতে হয়, তেমনি বোগদাদ সহরের ভিতর প্রবেশ করিলেই দলে দলে দরিদ্র আরব ও জু স্ত্রী পুরুষে "রফিক বকসিস" "রফিক বকসিস" বলিয়া সর্ব্বত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে। বোগদাদে দুইটি বৃহৎ বৃহৎ মসজিদ বা কারবেলা আছে। উভয় মসজিদ সোণার পাতায় মোড়া একটির নাম "আবদুল কাদির জিলানে" ও অপরটি "কাজেমন"। শেষটিতে ধনী লোকের গোর দেওয়া হয়।

বোগদাদ সহরে জুয়েদের সপ্তাহে দুইবার থিয়েটার হয়। আমরা থিয়েটারে যাইতাম, কিন্তু তাহাদের ভাষা বা গান বুঝি না দেখিয়া, আজকাল আমাদের সন্তুষ্টির নিমিত্ত ২।১টি হিন্দুস্থানী গজল তাহারা গায়। জু ও সিরিয়ান স্ত্রীলোকেদের এমন সুন্দর নাচ যে তাহা আমার বর্ণনা করিবার ক্ষমতা নাই। সিরিয়ান ও খোরাসানী স্ত্রীলোকেরা এত সুন্দরী যে আমাদের দেশের কাশ্মীরী স্ত্রীলোকেরা তাহাদের নিকট দাঁড়াইতে লজ্জা পায়। সিরিয়ানেরা খৃষ্টান ও খোরাসানীরা মুসলমান। এখন দেশটায় সব জিনিষই দুর্ম্মূল্য। পঞ্জাবীরা ৫৲ টাকা সের মিঠাই বিক্রয় করে। একটি খিলি পানের দাম ⁄৹ এক আনা। তাহাও এত ভীড় যে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া না থাকিলে পাওয়া যায় না। অবশ্য পাণ ঐ দেশে জন্মে না, বোম্বাই হতে "মবাই" পাণ রপ্তানি হয়। সে দেশের জমীও আমাদের দেশের জমী অপেক্ষা খুব উর্ব্বরা। ইংরাজ বাহাদুর এখন চারিদিকে canal খননের বন্দবস্ত করিতেছেন। স্থানে স্থানে নিজেদের ক্ষেত্র স্থাপনা করিয়াছেন এবং কাপাসতুলার ও গমের চাষ সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে বড় গুজরাটী গোরু লইয়া গিয়াছেন। বোগদাদ সহর হইতে ৩০।৩২ মাইল দূরে হিলা (Hilla) নামক রেল ষ্টেশনের নিকট হাসেন ও হুসেনের কারবালা আছে।

ইংরাজ বাহাদুরের সুবন্দবস্তে মহরমের সময় সেখানে খুব ধুম হয়। তবে অরবেরা সুন্নী-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহারা মহরমে যোগ দেয় না। মহরমের সময় পারস্যের অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দলে দলে আসে। কোন তীর্থস্থানে মুসলমান ছাড়া আর কাহারও প্রবেশ নিষেধ; দ্বারে পাহারা থাকে; কি ধর্ম্মাবলম্বী জিজ্ঞাসা করিয়া তবে ঢুকিতে দেয়।

বাঙ্গালী কি করিবে

এখন দেশে শান্তি বিরাজিত। বহু বাঙ্গালীর সেখানে অন্নসংস্থান হইতেছে, তবে ৪।৫ বৎসর পরে কোন ভারতবাসী তথায় চাকুরি পাইবে না ও থাকিবে না। কারণ জু-গণকে সমস্ত বিভাগের কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া বিলাত হইতে বাতিল সৈন্য (Invalid soldier) ও অন্যান্য লোক আসিয়া চাকুরি করিবে। আরবগণের অপেক্ষা জু-গণেরই প্রাধান্য বেশী হইবে, আমার এইরূপ ধারণা। তবে এখন যদি ভারতবাসী তথায় চাকুরী না করিয়া, কোনও ব্যবসায়ের পত্তন করে, তাহা হইলে খুব লাভবান হইবে। পঞ্জাবীরা সামান্য মিঠাইয়ের ও পাণের দোকান করিয়া যাহা লাভ করিতেছে, তাহা যিনি নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই জানেন। বোম্বাইয়ের শেঠ ও পার্শীরা গালিচা ও রত্নাদির ব্যবসা করিবার চেষ্টা করিতেছে। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তথায় যাইতে দেখি নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র।

শেষ যাত্রা

অয়ি শুভে বসুন্ধরে, জননী আমার
চির স্নেহময়ী তুহি কল্যাণ আধার।
ছাড়ি যবে অমরার মধু ফুলবন
লভিনু তোমার ক্রোড়ে নূতন জীবন,
আদরে বরিলে তুমি অভাগা সন্তানে;
ধন্য হল চিত্ত মোর স্নেহ-সুধাপানে।
অনন্ত করুণা দিলে—বিনিময়ে তার
দিয়াছি শুধুই তোমা বেদনার ভার।

অবোধ অশান্ত চিত হয়ে পথহারা
আলেয়ার আলো লাগি মিছে হল সারা।
কভু না মিটিল আশা;—জীবন তপন
আঁধারের ক্রোড়ে ধীরে করিছে গমন;
ঘনায়ে আসিছে সাঁঝ, বেলা যে গো যায়;
ক্ষম সব অপরাধ—দাও মা বিদায়।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

পতিতা

(গল্প)

আমার স্বামীকে আমার বড়ই বেশী রকম করিয়া ভাল লাগিত। ইহা অপেক্ষা একটু কম, ভাল লাগিলেও ক্ষতির কোনই কারণ ছিল না। আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তৃপ্তি হইত না। মনে হইত আরও যেন কত দিবার রহিয়া গিয়াছে। প্রবল আনন্দে অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসে আমার হৃদয়-নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে উচ্ছ্বাস আমি ক্ষুদ্র বুকে লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তাঁহার উদাস দৃষ্টির বিষণ্ণতা ঘুচাইতে পারিতাম না। আমার মনে হইত তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মুখে, এবং প্রসন্ন হাস্যময় চক্ষু দুইটির অন্তরালে, কি যেন একটু প্রচ্ছন্ন ব্যথা লুকান রহিয়াছে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি শুধু তাঁহার করুণ নয়ন দুটি আমার মুখের উপর মেলিয়া বিষাদের হাসি হাসিতেন।

দশ বারো বছর পূর্ব্বে তাঁহার একটি বিষাদের কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকটে অপ্রকাশ ছিল না। আমার স্বামী যখন সুদূর বিদেশে অধ্যয়নরত, সেই সময় তাঁহার পূর্ব্ববিবাহিতা পত্নী, পিতৃভবন হইতে প্রত্যাগমন কালে, রাস্তায় দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন। সে বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন এ গৃহের দ্বার তাঁহার নিকটে চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার স্বর্গগত শ্বশুর মহাশয় "পতিতা" বধূকে কিছুতেই গৃহে স্থান দিলেন না। পুত্রের মতামত জিজ্ঞাসা করিবার দরকার বোধ করেন নাই। আত্মীয় বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্না শ্বশুর কর্তৃক পরিত্যক্তা অভাগিনীর মৃতদেহ পরদিন প্রাতে নদীগর্ভে ভাসিয়াছিল। স্বামী একদিন ঘন-ঘোর বর্ষানিশীথে আমার নিকটে তাহার মৃত্যু-কাহিনীটুকু করুণ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সপত্নী-ঈর্ষ্যায় আমার হৃদয়খানি না জ্বলিয়া, বেদনার অশ্রু দুই চক্ষু ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তিনি যখন আমাকে বাহুবন্ধনে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"শান্তি, তোমার কাছে আমার গোপন করবার কিছুই নেই; এখনও আমার হৃদয়ের অর্দ্ধেক স্থান শচীর জন্যই রয়েছে; বাকীটুকু তোমারই। আমি তোমার মধ্যেই আমার শচীকে ফিরে পেতে চাই।" একথা শুনিয়া আমার হৃদয়খানি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী এখনও যাহাকে ভুলিতে পারেন নাই, কে বলে সে হতভাগিনী? মনে মনে বলিলাম—"দিদি, তোমার অশান্ত আত্মা শান্ত হউক। তুমি যে লোকেই থাক, তুমি তৃপ্ত হও। আশীর্ব্বাদ করিও, আমিও যেন যেন তোমারি মতন স্বামী প্রেমের অধিকারিণী হইতে পারি।"

(২)

আশ্বিন মাস। পূজার ছুটীর আর বিলম্ব নাই। আগমনীর আনন্দ-আলোকে পৃথিবীখানি ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলের হৃদয়েই আশার লহরী ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে বাতাসে যেন ধ্বনিত হইতেছে "ওরে বিদেশী, তোর বিদেশের কায সেরে নে।"

এবার ছুটীটা আমাদের কোথায় কাটান হইবে, ইহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, "দার্জ্জিলিং।" আমি বলি, "না; 'গিরির উপর গিরিশোভা'র চেয়ে, 'দেখে এলেম শ্যাম তোমার বৃন্দাবন ধাম' টাই এবার দেখতে হবে।" বৈকালবেলা সহাস্য

মুখে ঘরে ঢুকিয়া তিনি যখন বলিলেন—"শান্তি, তোমার সাধই পূর্ণ হবে; বৃন্দাবন যাওয়াই ঠিক করলাম; তুমি এখন বোচকা বিড়ে বাঁধা সুরু করে দাও।" তাঁহার কথায় আমার প্রাণের ভিতরে আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। বৃন্দাবন দেখিব—কত কবির কবিতায় যাহা অতুলনীয়, কল্পনার অফুরন্ত ভাণ্ডার, সাধকের মোক্ষতীর্থ, ভক্তের নন্দনবন—সেইখানে যাইব। আনন্দের আবেশে রাত্রে ভাল ঘুম হইল না।

সকাল বেলা শয্যা হইতে উঠিয়া জিনিষ-পত্রগুলি গুছাইতে বসিয়া গেলাম। পুত্র সুশীল-কুমারের এসব মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে আমার প্রতি-কাযেই বাধা দিয়া বলিতেছিল, "মা, মেনি বিলাল যাব, টিয়ে মন্নু যাব।" কিন্তু তাহার মায়ের মেনিবিড়াল, ভুলু কুকুর বা টিয়া মণি কাহারও প্রতি আগ্রহ নাই দেখিয়া, সে রাগ করিয়া তাঁহার বসিবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে চাহিয়া দেখি, তিনি সুশীলকে কোলে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। হাসিমুখে বলিলেন—"শান্তি, তুমি সুশীলবাবুকে কোলে করনি, মেনিবিড়াল দেখাওনি, ভুলুকুকুর দেখাওনি; এ কাযের শাস্তি কি ভেবে দেখেছ?"

আমি বলিলাম—"এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সুশীলের বাবাকে আজ বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। এইখানে বসে বসে আমার কাযের সহায়তা করতে হবে।"

তিনি বলিলেন—"কলিকাল কি না? তাই উল্টো চাপ! দোষ করেছ তুমি, শাস্তি ভোগের বেলা আমি, বেশ বিচার!"

সুশীল সহসা উচ্চ হাসি হাসিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—"বাবা তুমি ভাল, মিনু ভাল, মা বিচাল।"

সুশীলের হাসি কথার মধ্যে কোথা হইতে মোক্ষদা ঝি ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ের উপর লুটাইয়া কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে কহিল—"মা তুমি নাকি বৃন্দাবনবাসী হবেন? আমাকে নিয়ে যেতে হবেন।"

আমি বলিলাম—"তুমি গেলে এখানকার কায—"

আমার কথায় বাধা দিয়া মোক্ষদা হাঁউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যত বলি "তোকে নিয়ে যাব"—কিন্তু কার কথা কে শুনে? তাহাকে লইয়া যাইবার নিদর্শন-স্বরূপ তাহার সদ্যধৌত কাপড় দুইখানি ও হরিনামের মালাগাছটি যখন সযত্নে আমার ট্রাঙ্কে তুলিলাম, তখন সে প্রফুল্ল হৃদয়ে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

(৩)

বৃন্দাবনে আসিয়াছি। এখানকার পবিত্র সমীরণ-স্পর্শে আমাদের হৃদয় মন জুড়াইয়া গিয়াছে, নয়ন সার্থক হইয়াছে, হৃদয়ে শান্তির উৎস বহিতেছে। যমুনার কূলে তাল তমাল ঘেরা আমাদের ছোট্ট বাসাখানি শান্ত মৌন স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে মোক্ষদাকে সঙ্গে করিয়া যমুনার স্নিগ্ধ জলে স্নান করিতে যাইতাম। সন্ধ্যাবেলা যমুনার কূলে শ্যামল তৃণাসনে বসিয়া কত বর্ষের সেই চিরাগত কাহিনীগুলি ভক্তি বিমণ্ডিত হৃদয়ে স্মরণ করিতাম। উপরে উন্মুক্ত নীলাকাশের শুভ্র জ্যোৎস্না-কিরণে যমুনার নীলজলে ঘন পল্লবিত তরুশাখা প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। আকাশ আলোকিত, ধরণী পুলকিত, বাতাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। আমি যেন হৃদয়ের অন্তস্তলে কোন মুগ্ধা কিশোরীর সঙ্কোচমৃদু রিণিঝিনি নূপুরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। অনিমেষ নয়নে জ্যোৎস্নাকিরণে প্লাবিত যমুনার মুক্তিতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতাম, কখন 'রাধা নামের সাধা বাঁশী' বাজিয়া উঠিবে, আর যমুনা বহিবে উজান—ঢেউয়ে ঢেউয়ে মেশামিশি।

এখানে আসিয়া অনেকগুলি দর্শনীয় জিনিষের মধ্যে একটি দর্শনীয় জিনিষ পাইয়াছিলাম। যখন প্রভাতের প্রথম অরুণ-কিরণ-স্পর্শে যমুনাগর্ভে স্নানার্থে যাইতাম, তখন দেখিতাম, একটি তরুণী সন্ন্যাসিনীও প্রতিদিন নীরবে নতবদনে স্নান করিয়া অদূরে পর্ণকুটীরে চলিয়া যাইতেন। আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে নবীন তৃণাসনে যমুনাবক্ষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে

দেখিতাম। সন্ধ্যার স্নিগ্ধতার মধ্যে ধ্যানমগ্না সন্ন্যাসিনীর মুগ্ধ দৃষ্টিটুকু ভগবানের সন্ধ্যারতির উজ্জল আলো-শিখাটীর মত স্থির নিষ্পন্দ হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির চরণতলে ফুটিয়া উঠিত। সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন এই নারীর মুখখানি মুক্ত গগনতলে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে মানাইয়াছিল বেশ। তাঁহার গৈরিক বসনে আবৃত দেহখানির মধ্য হইতে কি যেন একটি অপার্থিব জ্যোতি বিকীর্ণ হইত। নবনীত বাহু দুইটার উপরে দুইখানি শুভ্র শাঁখা, অযত্ন রক্ষিত রুক্ষ সীমন্তে একবিন্দু সিন্দুর রেখা গোধূলি ললাটে আলোকরেখা বলিয়া মনে হইত। আমাদের প্রতিবেশিনীদের মুখে রমণীর পরিচয় জানিলাম। ইহাঁর নাম 'বনদেবী'। ইনি সন্ন্যাসী জগদানন্দ স্বামিজীর কন্যা নামেই সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিতা। ইহাঁর স্বামী বহুবর্ষ হইতে নিরুদ্দিষ্ট। রমণীর বিষাদভরা কমনীয় মুখখানির দিকে চাহিয়া, মনে মনে বলিলাম—"হায় পাষাণ! কোন প্রাণে এ স্বর্ণলতাকে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছ? কিসের আশায় কোন প্রলোভনে গিয়াছ?"

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার যখন পৃথিবীর বুকে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, গোবিন্দজীর মন্দির হইতে শঙ্খ ঘণ্টার মধুর শব্দ বাতাস বহিয়া আনিতেছিল; আমি সুশীলকে কোলে করিয়া যমুনার ছলছল কলকল শব্দময় তরঙ্গের বীচিভঙ্গের দিকে চাহিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার মৃদু সমীরণ স্পর্শে যমুনার নির্জ্জন উপকূলে মোক্ষদা তাহার অঞ্চলখানি বিছাইয়া নিদ্রাদেবীর শরণাগতা হইয়াছিল। আমার অদূরে প্রতিদিনের মত আজও সন্ন্যাসিনী জানি না কিসের ধ্যানে তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিলেন। এতক্ষণ কোলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটা শ্রীমান সুশীলকুমারের মনঃপুত হইয়া উঠিল না। সে আমার কোল হইতে নামিয়া অদূরে উপবিষ্টা সন্ন্যাসিনীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, জানি না কি মনে করিয়া তাঁহার গলদেশটি দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া মধুর কণ্ঠে ডাকিল, "মাছিমা।" সন্ন্যাসিনী সুশীলকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া তাঁহার বক্ষের মধ্যে তাহার ছোট মুখখানি জড়াইয়া ধরিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসিনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন—"আপনার খোকাটির নাম কি? আপনার খোকটী ত বড় সুন্দর!"

আমি খোকার নাম বলিলাম। তিনি আমার পরিচয় চাহিলে আমি তাঁহাকে আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি একটু চিন্তার পর মৃদুস্বরে কহিলেন—"খোকার বাবার নামটী কি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তাঁর নামটি কি করে বলি বলুন তো?"

তিনি সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খোকামণি, তোমার বাবার নামটী বল ত।"

সুশীল আধ আধ অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"বাবাল নাম পুণ্যচনন আয়।"

সন্ন্যাসিনী সুশীলের আধ আধ মধুর কথা শুনিয়া, কি অন্য কোন কারণে, আবেগভরে সুশীলকে বক্ষে জড়াইয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কতক্ষণ পরে তিনি যখন সুশীলকে আমার কোলে ফিরাইয়া দিলেন, সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার নয়ন দুইটি হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল; হায় পতিপুত্রহীনা!

(৪)

সুশীলের মাসীমা এখন আমার দিদি হইয়াছেন। এখন হইতে তাঁহাকে আমি "দিদি" বলিয়াই ডাকিব। দিদি আমাকে ও সুশীলকে অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসার উপমা হয় না। আমি মুগ্ধ হৃদয়ে ভাবি, সংসার-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ে কোথা হইতে এই বিশ্বগ্রাসী স্নেহ মমতার প্রস্রবণ আসিতেছে! এখন আমি প্রতিদিন অপরাহ্ণে দিদির কুটীরে সুশীলকে লইয়া গিয়া সেখানে বসিয়া থাকি। এই শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ মধুর গৃহটী হইতে মন আমার আর কোথাও যাইতে চাহে না। স্বামিজীর শান্ত গম্ভীর ভোলানাথের মত

মূর্ত্তিটি দেখিয়া, দিদির স্নেহবিগলিত মুখখানির পবিত্রতায় আমার মনে হয়, এ বুঝি কৈলাসে ভোলানাথের পার্শ্বে কন্যা লক্ষ্মী। স্বামিজী আমাকেও মাতৃসম্বোধনে আমার মন হইতে সমস্ত সঙ্কোচ-রেখা নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া দিয়াছেন।

সেদিন শরতের ম্লান রৌদ্রে দিদি আমার সিক্ত কেশগুলি শুকাইয়া দিতেছিলেন। আমি বলিলাম, "দিদি, তুমি একদিনও আমাদের বাড়ী যাওনা। আমি তো রোজ আসছি।" দিদি হাসিমুখে বলিলেন, "সন্ন্যাসিনীর যে অন্য গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ বোন, তাই যাই না; নইলে যেতাম বই কি?" আমি কহিলাম, "তোমার ত সব নিষিদ্ধই, দিদি। আমাদের বাড়ী যাবে না? তোমার পরিচয় দেবে না? আমার কাছেও তোমার গোপন?" দিদি মৃদুস্বরে কহিলেন, "রাগ করলে শান্তি? তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নেই। সন্ন্যাসিনীর গত জীবনের কথা বলতে নাই, তাই বলি না। গোবিন্দজী যদি দয়া করেন, তখন সবই শুন্‌তে পাবে বোন!" আমি দিদির কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "গোবিন্দজীর দয়ার কথা বোলো না; গোবিন্দজীর ভারি দয়া! তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন, এইটাই কি তাঁর মস্ত দয়ার নিদর্শন নয়?" আমার কথায় দিদি ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন, "শান্তি ভগবানে অবিশ্বাস কর্‌তে নেই; ওতে মনে শান্তি থাকে না। গোবিন্দজীর দয়ার কথা বলছো! তাঁর অসীম দয়া যে আমি হৃদয় মন দিয়ে অনুভব করছি। তিনিই আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত করেছেন। তোমার দিদি দুঃখিনী নয়, সে পরম সৌভাগ্যবতী।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া এই ভক্তি-প্লুত মধুর কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম।

অনেক চেষ্টা করিয়াও দিদির গত জীবনের একটী কথাও জানিতে পারিলাম না। এই রহস্যময়ীর সমস্ত জীবনের পুঞ্জীকৃত ঘটনাগুলি শুনিবার জন্য আমার হৃদয়ে একটী অদম্য কৌতূহল জাগিয়া উঠিতেছিল। সে কৌতূহলটাকে কিছুতেই যেন নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিলাম না।

এক দিন দিদির গলায় রুদ্রাক্ষ মালার সহিত ছোট একটী সুবর্ণের 'লকেট' দেখিলাম। লকেটের মধ্যে বোধ হয় কাহারও আলেখ্য সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। সোণার উপরে "প" অক্ষর ক্ষোদা। আমি বলিলাম, "তোমার লকেটের মধ্যে কার ফটো, সেটাকে আমাকে নিশ্চয় দেখাতে হবে। আর 'প' যুক্ত নামটা কার, তাও বলতে হবে।" দিদি কৃপণের ধনের মত 'লকেট'টি বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া, ব্যথিত বিপন্নস্বরে কহিলেন, "আজ নয় বোন, এক দিন তোমাকে আমার ইষ্টদেবের ছবিটা দেখাব। আমার ইষ্টদেবের নামের আদ্যক্ষর 'প', তাই বুকে রেখেছি বোন।" দিদির চক্ষু দুইটি কেমন যেন অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। এই একমাস কাল আমি দিদির চক্ষু দুইটি দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছিলাম না, এ চক্ষুর মধ্যে কি লুকান রহিয়াছে। দিদির চক্ষু দুইটি যেন শিশির-মণ্ডিত একটি শেফালি গাছ; একটু নাড়া দিলেই অশ্রুজল যেন ঝরিয়া পড়িতে চায়।

(৫)

শীঘ্রই আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। স্বামীর ছুটীও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদিকে ছাড়িয়া যাইব কেমন করিয়া তাহাই ভাবিতেছি। ভগবান দিদির সঙ্গে আমাকে এ কি মায়া বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন, এ বন্ধন যেন দিন দিনই আরও সুদৃঢ় হইয়া যাইতেছে! আজ কয়েক দিন হইল আমার মনের মধ্যে একটী অসম্ভব ঘটনার ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ সংশয়টুকু কিছুতেই মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিলাম না।

আজ তাঁহাকে আমার সন্দেহের কথাটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "শান্তি, তোমার একথা মনে এল কি করে? শচী যে বেঁচে নেই, ওতে আমার এতটুকু সন্দেহও নেই। তার ডুবে মরা—

ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না। হয় তাকে পাপের পঙ্কে ডুবতে হত, নয় নদীর জলে—সে জুড়িয়েছে।"

আমি কহিলাম, "তুমি কি তাঁর মৃত্যু দেখেছিলে?"

তিনি কহিলেন, "আমি আর দেখবো কোথা থেকে? তখন তো আমি বাড়ী ছিলাম না। দেশে এসে, যারা তাকে দেখেছিল তাদের মুখেই সত্য প্রমাণ পেয়েছিলাম। সে যে নেই, এ বিষয়ে আমার একবিন্দুও সন্দেহ ছিল না। এতদিনের পর কাকে দেখে তোমার সন্দেহ হচ্চে শান্তি?"

আমি কথা কহিলাম না। স্বামী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আমার হাতখানি তাঁহার হাতের মধ্যে লইয়া অশ্রুজড়িত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "শান্তি, তুমি আমাকে বড় সুখী করেছ, বড় শান্তি দিয়েছ। আমি তোমার মধ্যেই শচীকে পেয়েছি; তুমিই আমার শচী।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আনন্দের আবেগে আমি তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া বালিকার মত কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল। সেদিন প্রভাতে যমুনার কূলে যাইয়া দেখিলাম, দিদি তখনও আসেন নাই। এমন একদিনও হয় নাই। প্রতিদিনই স্নানার্থে যাইয়া দেখিতাম, তিনিই আমার জন্ত প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। আমার বিলম্ব হইবার জন্ত কোনদিন দিদির নিকট হইতে কত স্নেহপূর্ণ অনুযোগের কথাও শুনিতে হইয়াছে। আমি মনে মনে তাঁহার সেই কথাগুলির প্রতিশোধ দিবার কল্পনা করিয়া বেশ একটু আরাম পাইতেছিলাম।

স্নানার্থিগণ একে একে স্নান শেষ করিয়া, কত হাসি কৌতুকের কথা কহিতে কহিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। যমুনার নীলজলে প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। কত নৌকারোহী তাহাদের গন্তব্য পথের উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসাইয়া দিল। কিন্তু দিদি আসিলেন না। আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বিষাদের উচ্ছ্বাস উঠিল। গৃহে ফিরিয়া আজ আর কাযকর্ম্মে মনোযোগ দিতে পারিলাম না—কেবলই দিদির কথা মনে হইতে লাগিল। কখন্ দিদিকে দেখিব, এই উৎকণ্ঠাতেই যেন দিন কাটিতে চাহিতেছিল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যখন দিদির কুটীরে উপস্থিত হইলাম, তখন আকাশে আর রৌদ্র নাই। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোতে পৃথিবীখানি প্লাবিত। অঙ্গনস্থ দোপাটী ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরতের মৃদু সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছিল। স্বামিজী আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এস মা ঘরে এস, তোমার দিদির বড় অসুখ।"

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, নিদাঘ-তাপিতা শুষ্ক ফুলটির মত দিদি শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। দিদির কোলের কাছে বসিয়া আমি ডাকিলাম, "দিদি দিদি।" তাঁহার আরক্ত নয়ন দুইটি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "শান্তি, এসেছিস বোন? আমার সুশীল কৈ?"

আমি কহিলাম, "সে বড় দুষ্টামি করে; তাকে নিয়ে আসি নি; দিদি তোমার জ্বর হল কবে?"

দিদি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "কাল রাত্রে জ্বর হয়েছে শান্তি—বড় যন্ত্রণা।" একটু থামিয়া ধীরে ধীরে দিদি কহিতে লাগিলেন, "যন্ত্রণা নয়, এ আমার গোবিন্দজীর অসীম দয়া; তুই কাল সকালে সুশীলকে নিয়ে আসিস বোন।" আমি দিদির সবগুলি কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল দিদি বুঝি বিকারের ঝোঁকে প্রলাপ বকিতেছেন।

দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। দিদির অবস্থা যেন ক্রমশঃ মন্দের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল; সময়ে সময়ে জ্ঞান হয়, সময়ে অজ্ঞান অবস্থায় কি সব বলেন বোঝা যায় না। স্বামিজী অক্লান্ত ভাবে সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন। আমিও অবকাশ মত দিদির ঘরেই দিন কাটাইতেছিলাম। কিন্তু দিদির মুখের দিকে চাহিতেই কি একটি অমঙ্গল সম্ভাবনায় আমার বক্ষ কাঁপিয়া উঠে। আমি হাত দুটী যোড় করিয়া মনে মনে ভগবানকে বলি, "হে ঠাকুর, দিদিকে ভাল

করে' দাও। দুঃখিনীর জীবন প্রদীপখানি নিবিও না—তোমার স্নেহ করুণার ধারায় সজীব কর।"

(৬)

সন্ধ্যাবেলা আকাশের কোলে কয়েকটি উজ্জ্বল তারা ধরার পানে চাহিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিতেছিল। সুশীলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোক্ষদা তাহাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে, এই অন্যায় কার্য্যের শাস্তিবিধান করিবার জন্য সুশীল আমার হাত ধরিয়া টানিতেছিল। তিনি গম্ভীর মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন,"শান্তি, সুশীলকে নিয়ে শীগ্‌গির তুমি আমার সঙ্গে চল; স্বামিজী আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।"

তাঁহার কথায় বক্ষের মধ্যে কেমন যেন একটু ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। দিদির জন্য উৎকণ্ঠায় আমার সমস্ত শরীর ও মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

স্বামীর সহিত দিদির পর্ণকুটীরের অঙ্গনে যখন দাঁড়াইলাম, তখন শরতের উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশের মধ্যভাগে উঠিয়াছেন। স্বামিজী যেন আমাদেরই প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছিলেন। আমার স্বামীর সঙ্কোচনত মুখখানির দিকে চাহিয়া তিনি উৎসুক কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, ঘরে যাও, তোমার লজ্জা সঙ্কোচের কিছু নেই। একদিন দুঃখময় সংসারের পথ থেকে তোমার শচীকে কুড়িয়ে এনেছিলাম, আজ ত তাঁকে রাখতে পারছিনে। তোমার শচী, —আমার বনদেবীকে—আজ তোমাকেই দিচ্চি; বাবা, তুমি—"

স্বামিজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। এই সংসার-ত্যাগী উদার মহাপুরুষ দুই হাতে নিজ বক্ষ চাপিয়া রহিলেন।

স্বামী উন্মাদের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া দিদির জীর্ণ অবসন্ন দেহখানি বক্ষে জড়াইয়া আবেগ ভরে ডাকিলেন, "শচী, শচী আমার!" অজস্র অশ্রু-বেগে তাঁহার চক্ষু দুইটি ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে তিনি ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "শচী, তুমি এমন হয়ে ছিলে কেন? আমাকে কি একটা খবর দিতেও দোষ ছিল?"

স্বামীর অভিমান-পূরিত ব্যথিত কণ্ঠস্বরে দিদি তরল কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি যদি আমার খবর পেতে, তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তাই তোমাকে খবর দিইনি। কিন্তু গোবিন্দ ত আমার মনের আশা পূর্ণ করেছেন। আমার এতটুকুও দুঃখ নেই, এতটুকুও ক্ষোভ নেই। আমার বড় সুখ, বড় শান্তি।"

দিদি একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিলেন, "তোমার বাবা আমাকে আদেশ করেছিলেন, আমি যেন কোন দিনও তোমার জীবনের পথে না দাঁড়াই। আমিও ভেবে চিন্তে দেখেছিলাম, তোমার জীবনের পথে আমি থাকলে তোমার সুনামে তোমার সম্মানে কলঙ্ক হবে। তাই তোমাকে খবর দিই নি। আমি মনে প্রাণে দেহে একনিমেষের জন্যেও পতিতা হইনি। আজ গুরুজনের কথা অমান্য করে' আমার জীবনের পথে তোমাকে ডেকেছি, এতে কি আমার অপরাধ হয়েছে? এর জন্যে কি আমি পতিতা হব?"

স্বামী দিদির কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "সমস্ত জগৎ পতিত হলেও তুমি হবে না, শচী, আমি নিশ্চয় করেই জানি।"

প্রভাতের অরুণ-কিরণে সমস্ত পৃথিবীখানি যখন হাসিয়া উঠিতেছিল, গাছে গাছে পাখীরা প্রভাতী গানে বন উপবন মুখরিত করিতেছিল, সেই পুণ্যময় প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে দিদি,—দুঃখিনী দিদি আমার —তাঁহার নয়ন দুইটি চিরমুদ্রিত করিলেন। দিদির প্রাণহীন দেহখানি বক্ষে জড়াইয়া স্বামী কাঁদিতেছেন, দিদির মাথার শিয়রে ধ্যানমগ্ন হইয়া স্বামিজী বসিয়া আছেন। পদতলে বসিয়া সুশীল ডাকিতেছে "মাসীমা, আমাকে কোলে নাও।" আমি ভাবিতেছি, "আমারি অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য ঘটিবে কি?

শ্রীগিরিবালা দেবী।

বাঙ্গালীর ইতিহাসচর্চ্চা

ঘরে বসিয়া পুরাবৃত্ত লেখা বাঙ্গালীর স্বভাব। সরেজমীনে তদন্ত দ্বারা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা অধিকাংশ লেখকের নাই। ইঁহারা ইতিহাস লিখিবার যশঃপ্রার্থী বটেন, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানের কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। পূর্ব্বতন ইংরাজ ঐতিহাসিকের ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ ইতিহাস, বহুপরবর্ত্তীকালের কুলজী, ইতিহাসের নামে কথিত খোসগল্প, কাল্পনিক উপন্যাসের গল্পাংশ, পথ-চল্তি লোকের মিথ্যা উক্তি, উপন্যাস ও কৌতুক-মূলক জনশ্রুতি, এইগুলিকেই অভ্রান্ত ইতিহাসের ভিত্তি করিয়া অনেকে বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত ও সামাজিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গলার ইতিহাস সংগৃহীত না হইয়া ঐতিহাসিক আবর্জ্জনা সংগৃহীত হইতেছে। আমরাও তদনুরূপ পাঠক—ঐ সকল আবর্জ্জনা পাইয়াই লেখকগণকে ধন্যবাদ করিতেছি। "অন্ধেন নীয়মানান্ধেনৈব" আমাদের ইতিহাসের জ্ঞান জন্মিতেছে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই কয়েকটি জেলার ইতিহাস বাহির হইয়া গেল বটে; তন্মধ্যে "ঢাকার ইতিহাস" প্রভৃতি দুই একখানি ব্যতীত অনেকগুলি 'ইতিহাস' নাম পাইবার যোগ্য নহে। ঐগুলিকে ঐতিহাসিক এলোমেলো আবর্জ্জনার সংগ্রহ মাত্র বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের জন্য যেমন বিভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিতে হয়, যেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, যেমন নিরপেক্ষভাবে তুলাদণ্ড ধরিতে হয়—তাহার কিছুই করা হয় নাই। কাযেই ঐ সমস্ত ইতিহাসের প্রতি বিজ্ঞলোকের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। আমরা কয়েকটি জেলার ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই আমাদের মনে প্রাগুক্ত ধারণা জন্মিয়াছে। অধিকাংশ ইতিহাসেই দেখা যায়, পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ স্থানগুলির আলোচনা, স্থাপত্যকীর্ত্তি, পূর্ব্বতন জমীদার বংশের বিবরণ, পুরাতন দেববিগ্রহাদির ভগ্নমূর্ত্তি, গ্রাম, থানা প্রভৃতির তালিকা। কিন্তু দেশের অসংখ্য অধিবাসিগণ—যাহাদের লইয়া দেশ,—তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন, সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্ত্তন, তাহাদের পূর্ব্বতন সামরিক শক্তি, বর্ত্তমান নিরীহ ভাবের কারণ ইত্যাদি বিষয়ে কিছুমাত্র আলোচনা দেখা যায় না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মপরিবর্ত্তন একখানি জেলার ইতিহাসেও স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। আমরা দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া জেলার বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছি, মফস্বলে লক্ষ্মী সরস্বতী সমন্বিত শত শত চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি (বিষ্ণুমূর্ত্তি) ও শিবলিঙ্গ দেখিয়াছি। কিন্তু কোথাও প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দেখি নাই। ইহাতে মনে হয়, পূর্ব্বকালে এদেশে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের উপাসনা প্রচলিত ছিল না। এই দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির উপাসনা মহাপ্রভুর পর হইতে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দিনাজপুর অঞ্চলে যে সকল ভগ্নস্তূপ স্থানে স্থানে দেখা যায় এবং বৌদ্ধ বিহারের যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে দেশের অধিকাংশ লোকই পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ ছিল বলিয়া জানা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের ফলে সমস্ত জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়াছিল, পরে মহারাজ আদিশূরের সময়ে সেই বৌদ্ধ জাতির মধ্য হইতে নূতন করে নবশাখ আদি জাতি পরিকল্পিত হইয়াছে কিনা ইত্যাকার আলোচনা কোন ইতিহাসে দেখা যায় না। সুতরাং এই সকল ইতিহাস পাঠ করিয়া কোন তত্ত্ব শিক্ষা লাভের উপায় নাই।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জেলার ইতিহাসগুলিতে ইতিহাসের নামে কতকগুলি আবর্জ্জনা সংগৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে আলোকপাতে সেগুলির সত্যতা পরীক্ষিত হইলে ইতিহাসের আয়তনও কমিত, পাঠকের পরিশ্রমেরও লাঘব হইত। আমরা কয়েকখানি ইতিহাসের কয়েকটী স্থান প্রদর্শন করিয়া আমাদের উক্তির সমর্থন করিব।

প্রথমেই দেখুন, "যশোহর ও খুলনার ইতিহাস।" ঐ ইতিহাসকার বাঙ্গলার মাহিষ্য জাতির কোন ইতিহাস না লিখিয়া, একটি কাল্পনিক গল্পের আশ্রয়ে ঐতিহাসিক সত্যের ন্যায় লিখিয়া ফেলিলেন—"বল্লাল সেন সূর্য্য মঝিকে জল আচরণীয় করিয়াছিলেন—সেই হইতে কৈবর্ত্ত জাতি আচরণীয় হইয়াছে।" এই কথা লেখাতে গ্রন্থকারের কিছুমাত্র দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। সূর্য্যমাঝির ভায়রাভাইয়ের বংশধরগণ এখনও যশোহর জেলার অন্তর্গত হলদা মহেশপুরের নিকটস্থ জলীলপুর গ্রামে আছে। তাহারা মালো জাতীয় ধীবর। বাঙ্গলার কৈবর্ত্ত জাতি ও মালোজাতি যে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা পঞ্চম বর্ষীয় বালকও অবগত আছে। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক পল্লীগ্রাম ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার না করায় এবং প্রবাদের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আলোক প্রদান না করায়, মিথ্যা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বল্লাল-চরিতের লেখক মালো-জাতীয় ধীবরকে জালিক-বাচক কৈবর্ত্ত শব্দে নির্দ্দেশ করায় "উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে" পড়িয়াছে। ইতিহাস-লেখকের সে সকল অনুসন্ধানের সময় নাই। তাঁহার লেখা যে বাঙ্গলার একটি গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চিরন্তন সংস্কারে হস্তক্ষেপ ও মনোবেদনার কারণ হইবে, ঐতিহাসিক মহাশয়ের সে বিষয় ভাবিবার সময় নাই। তাঁহার ইতিহাসের ঐ অংশের প্রতিবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে এবং ১৩২৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা "নব্যভারতে" মুদ্রিত হইয়াছে।

তৎপরে হুগলী জেলার ইতিহাস দেখুন। গ্রন্থকার অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় তাম্রলিপ্তির বর্গ ভীমার মন্দিরের বিবরণ লিখিতে যাইয়া, মন্দিরের সম্মুখস্থ "জগমোহন" নামক মন্দিরাংশকে জগমোহন নামক কোন ব্যক্তির নির্ম্মিত বলিয়া উহার নাম জগমোহন অনুমান করিয়াছেন। * ঐ মন্দিরাংশটী জগমোহন নামক কোন ব্যক্তির নির্ম্মিত কি না তজ্জন্য তিনি কি কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন?

আমরা পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতির মন্দির স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। মূল মন্দিরের সংলগ্ন ঐ মন্দিরাংশকে সকল স্থানেই "জগমোহন" বলে। জগমোহনের পর নাটমন্দির, নাটমন্দিরের পর ভোগ মন্দির। জগমোহন একটি পারিভাষিক শব্দ। উহার অর্থ "জগমোহনের নির্ম্মিত" নহে।

গুপ্ত মহাশয় হুগলীর ইতিহাসে তমলুকের কৈবর্ত্ত রাজগণকে সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া ঐ পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"কৈবর্ত্ত সংকীর্ণ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহারা এখন সেই ক্ষত্রিয়রূপেই সমাজে গণনীয়? রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কি তাঁহাদের যাজ্য ক্রিয়া করিয়া থাকেন? দান পরিগ্রহ করেন?" এই সমস্ত প্রশ্ন দ্বারা তিনি জানাইতেছেন—কৈবর্ত্তগণ সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহারা সমাজে ঐরূপ স্থান পান নাই। এই ধারণাটী যে কিরূপ সঙ্গত আমরা তাহার আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সামরিক কৈবর্ত্তজাতির মর্য্যাদা নির্ণীত হইবে না। আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বেও কৈবর্ত্ত জাতির এমন সম্মান ছিল, যখন বরেন্দ্র দেশে মাৎস্যন্যায় বশতঃ ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র বিপ্লবে পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন সমগ্র বরেন্দ্র প্রজামণ্ডলী (ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি) সেই মাৎস্যন্যায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কৈবর্ত্তরাজ দিব্যকে নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। তখন রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী কিরূপে মহারাজ ভীমের যশোগান করিতেছিলেন, তাহা দেখিলে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ রাজা ভীমের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা প্রতিপন্ন হইবে। সন্ধ্যাকর লিখিয়াছেন, "তাঁহার

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ প্রত্নতত্ত্ববারিধি মহাশয় "ত্রিহুতের মন্দির" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ত্রিহুতের মন্দিরগুলির বিশেষত্বই এই যে তাহারা তিনভাগে বিভক্ত—মূলকক্ষ, শিখর ও জগমোহন। শেষোক্তটি মন্দির নির্ম্মাণের পর সংযোজিত এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ, ১৩২৫ অগ্রহায়ণ, ৭৪২ ও ৭৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(ভীমের) সময়ে সজ্জনগণ অযাচিতদান, উন্নতি এবং ভূমিলাভ করিতেন।" (রামচরিত ২।২৪) এখানে সজ্জন অর্থ সৎ-ব্রাহ্মণাদি নহে কি ? লেখক একটু অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিতেন, কত সদ্‌ব্রাহ্মণ তম্‌লুক রাজের প্রদত্ত ভূমি অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। ঢাকা জেলার পাটগ্রামের রায় মহাশয়দিগের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমী প্রায় ৬০ ঘর বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভোগ করিতেছেন। এ অবস্থায় সদ্‌ব্রাহ্মণ কৈবর্ত্তের দান গ্রহণ করেন নাই বলা শোভা পায় না। গুরুরূপে তাঁহারা যে কতদান গ্রহণ করিতেছেন তাহার ত ইয়ত্তা নাই।

পুরোহিত-পার্থক্য কৈবর্ত্তজাতির নীচত্বের লক্ষণ নহে। বঙ্গে যখন কৈবর্ত্তজাতির প্রাধান্য ছিল, তখন বহুযাজী গ্রামযাজী ব্রাহ্মণের যাজন ইঁহারা স্বীকার করেন নাই। তাহারই ফলে পুরোহিত পৃথক হইয়াছিল। (এতদ্বিষয়ে মল্লিখিত "বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত" নামক গ্রন্থে সবিস্তর আলোচনা আছে)। রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কণোজ হইতে আগত বলিয়া জানা যায়, কিন্তু কি উড়িষ্যা, কি মিথিলা, কি মগধ, কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সর্ব্বত্রই সমুদয় উচ্চ মধ্য নিম্ন হিন্দুজাতির একই পুরোহিত। তন্মধ্যে আচরণীয় জাতির বাটীতে ব্রাহ্মণ আহারাদি করেন। বাঙ্গালায় জাতি বিশেষের বিভিন্ন পুরোহিত বৌদ্ধ বিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলমাত্র। এখনও পূর্ণিয়া জেলা হইতে সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেখিতে পাইবেন, কৈবর্ত্ত জাতির পৃথক পুরোহিত নাই। অথচ সেই সেই প্রদেশের কৈবর্ত্তের, বঙ্গীয় মাহিষ্যাপরনামা কৈবর্ত্তের সঙ্গে তুলনাই হইতে পারে না। কি আচার কি ব্যবহার কি ধন সম্পদ—কোন্ অংশেই তাহারা বঙ্গীয় কৃষি কৈবর্ত্তের সঙ্গে তুল্য হইতে পারে না। তাহারা যদি সদ্‌ব্রাহ্মণের যাজ্য হইতে পারে, তবে বঙ্গীয় কৈবর্ত্তদিগের তাহা দুষ্প্রাপ্য নহে। মূল কথা, তাঁহারা নবাগত কণোজ ব্রাহ্মণের যাজ্যত্বই গ্রহণ করেন নাই। সময়ে সুযোগ ত্যাগ করায় এক্ষণে মাহিষ্য জাতি পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছেন মাত্র। এই সমস্ত গভীর সামাজিক ইতিহাস লিখিতে হইলে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হয়। দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমায় আটোয়ারী থানা হইতে কৈবর্ত্তের পৃথক ব্রাহ্মণ নাই। আমি লেখক মহাশয়কে স্থানীয় অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। যেখানে এই জাতি নব্য কণোজিয়া ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেইস্থানেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার পালপট্টীর মাহিষ্য চৌধুরীগণ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারা বহুকাল হইতে পৌরহিত্য কার্য্য করাইতেছেন। মেদিনীপুর জেলার তুর্কার রাজারা: মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনাদের পৌরহিত্য কার্য্য করাইতেছেন। ঐ অঞ্চলে বহু মাহিষ্যের পুরোহিত মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সুতরাং রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে যাজক পাইতে ইচ্ছা করিলে মাহিষ্যের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইত না। কেবল অতীব রক্ষণশীলতার জন্য ইঁহারা পূর্ব্বপুরোহিত ত্যাগ করেন নাই। যাহা কামার, কুমার, তেলী, মালীর পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছে, তাহা যে পরাক্রান্ত মাহিষ্য জাতির পক্ষে অসাধ্য ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। মনীষিগণ মাহিষ্যের এই ব্রাহ্মণ-পার্থক্যের কারণ সমগ্র বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা না করিলে সহজে ধরিতে পারিবেন না।

আর একখানি বিরাটকায় ইতিহাস দেখুন—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় "পৃথিবীর ইতিহাস" লিখিতেছেন। তাঁহার ইতিহাসের ২য় খণ্ডে তম্‌লুকের বিবরণ দেখিলাম। তিনি তমলুকের প্রথম রাজা ময়ূরধ্বজ হইতে নিঃশঙ্কনারায়ণ রায় পর্য্যন্ত রাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা কালুভুঞাকে তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত্ত রাজবংশের আদিপুরুষ ধরিয়া লইয়াছেন। কৈবর্ত্ত রাজবংশের পর তমলুকে কায়স্থ রাজবংশের অভ্যুদয় লিখিয়াছেন। কলুভুঞার পূর্ব্ববর্ত্তী রাঢ় বংশ বা গঙ্গাবংশ সম্বন্ধে বাক্-বিতণ্ডা আছে, কিন্তু কালুভুঞা হইতে বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় পর্য্যন্ত

একই বংশের অবিচ্ছিন্ন ধারা। এতৎ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। অথচ লাহিড়ী মহাশয় পরবর্ত্তী রাজগণকে কায়স্থ বলিয়া গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন। তমলুক রাজবংশের বংশপত্রিকা মতে ময়ূরবংশ বা রায় বংশ কালুভুঞা রায়ের মাতামহ বংশ। রাণী চন্দ্রা দেই তাঁহার মাতা। ইনিই রায় বংশের শেষ কন্যা। ইহাঁকে নিঃশঙ্করায় বিবাহ করেন। ইহার বিরুদ্ধে লাহিড়ী মহাশয় কোন প্রমাণ দেন নাই।

তমলুকের মাহিষ্য রাজগণ এখনও প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হন নাই। তাঁহারা অদ্যাপি তমলুক গড়ে ও বৈচিবেরে গড়ে রাজা উপাধিতে ভূষিত আছেন। লাহিড়ী মহাশয় পরবর্ত্তী রাজগণকে কায়স্থ বলায় ইতিহাসে অসত্য প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। উহার সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

তমলুকের যাহা কিছু দানকীর্ত্তি, জলকীর্ত্তি, স্থাপত্য-কীর্ত্তি, দেবকীর্ত্তি সমুদয়ই এই রাজবংশের। দুর্গাদাস বাবু একটু আয়াস স্বীকার করিলেই, মাত্র ১॥০ দেড় টাকা খরচে ষ্টীমার অথবা রেল-ষ্টীমার যোগে হাওড়া হইতে তমলুকে যাতায়াত করিতে পারিতেন। এবং সমস্ত ঐতিহাসিক চিহ্ন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, বর্ত্তমান রাজগণ কায়স্থ কি কৈবর্ত্ত জানিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিতেন। এরূপ করিলে তাঁহাকে এমন ভ্রমে পতিত হইতে হইত না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখক হাণ্টার, রিজলী, বেইলী প্রভৃতি ইংরাজ মহাত্মাদিগের গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াই ঐতিহাসিক গবেষণা শেষ করেন। ঐ সকল মহাত্মার গ্রন্থে অনেক নিরপেক্ষ সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বহু ভ্রান্তিও বিদ্যমান আছে। সেরূপ ভ্রান্তি বিদেশী লেখকের পক্ষে থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের স্বদেশের ইতিহাস যশঃপ্রার্থিগণও সেই ভ্রান্তিগুলি বা নূতন ভ্রান্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক বা আলস্যদোষে পোষণ করিতেছেন। ঘটনা স্থানে যাওয়া নাই, প্রকৃত অনুসন্ধান নাই—এরূপ অবস্থায় ইতিহাসের নামে গল্পগুজব প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

দুর্ঘটনা

আজকে বড়ই দুর্ঘটনা
দুর্য্যোগেরি কালে,
ঝট্‌কা হাওয়া পড়লো এসে
তেঁতুল গাছের ডালে।
বকের ছানা বাসায় ছিল,
(চরতে গেছে বক)—
বাসা থেকে বাইরে এলো
দেখতে হল সখ।
অমনি আহা ধাক্কা পেয়ে
পড়লো টুটে তক্লে,
গেল হাওয়ার হাওয়াগাড়ী
উপর দিয়ে চলে।

ভেঙ্গে গেছে পা খানি তার
কাঁদছে পড়ে' হাবা,
ডানা ধরে' নিয়ে গেল
বাসায় বকের বাবা।
দীনের বাছা বাঁচলো আজি
হরির কৃপা বলে,
—হারিয়ে যেত ধনী হাওয়ার
হাওয়াগাড়ীর তলে!
জননী তার বল্লে কেঁদে
তনয় কোলে পেয়ে—
"মরিব তোরা—চলিস বাছা
পিছন দিকে চেয়ে।"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ফৌজদার সাহেব

(গল্প)

"রমানাথ, ভাই এবার পূজার সময় কিন্তু আমি একবার মা-কে আমার বাড়ী আনব। তা কিন্তু আগেই বলে রাখ্‌ছি ভাই।"

"বেশ ভাই সাহেব, তোমার মেয়ে, তুমি নিয়ে যাবে,—যখন ইচ্ছা; আমার আবার এর উপর কথা কি?"

"জামাই নাকি আসবেন?—তা হলে, আমি মেয়ে জামাই দু-জনাকেই নিয়ে আস্‌ব; নবীন ঘোষের বাড়ীটে ঠিক করব, তা হলে?"

"বেশ কথা। জামাই আস্‌বার কথা আছে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায়; আগে তোমার ওখানেই মেয়ে-জামাই যাবে, তার পর বাড়ী আসবে এখন।"

রমানাথ ভাদুড়ী বল্লভীপুরের জমীদার। মীর মোস্তফা খাঁ—নিশ্চিন্তপুরের ফৌজদার। দু-জনে বড় ভাব,—উভয়ে ভ্রাতৃ-তুল্য। সবিতা দেবী রমানাথের একমাত্র কন্যা,—তাঁহার বড় স্নেহের ধন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন। প্রায় এক বৎসর হইল মহা সমারোহে সবিতার বিবাহ হইয়াছে। এবার রমানাথ সংবাদ পাইয়াছেন, জামাতা শেখরলাল পূজার সময় বিদেশ হইতে বাড়ী আসিবেন; শ্বশুরগৃহ হইতে ষষ্ঠীর দিন সবিতাকে লইয়া যাইবেন। মীর মোস্তাফা খাঁর কোন সন্তান নাই। সবিতাকে তিনি কন্যাতুল্য স্নেহ করেন।

তখন খৃঃ ১৭৪০ সাল। দেশে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হয় নাই। দিল্লীতে মোগল-সম্রাট-বংশীয় মহম্মদ শা বাদশাহী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত সুবা বাংলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুরে মোস্তাফা খাঁ আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ফৌজদারের কার্য্য করিতেছেন।

যে স্থানের বিষয় বলিতেছি, তাহা বর্ত্তমান পদ্মা-নদীর উত্তর ও বর্ত্তমান যমুনা নদীর পশ্চিম। যাঁহারা গোয়ালন্দ হইতে আসামের দিকে জলপথে গিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যমুনা নদীতে উজান যাইতে এই প্রদেশ বাম দিকে থাকিবে।

তখন যমুনা এত বড় নদী ছিল না; ক্ষুদ্র একটি পয়ঃপ্রণালীর মত ছিল,—আর সেদিকে আর একটি নদী ছিল,—তাহার নাম হুরা সাগর। ক্ষুদ্র যমুনা ও হুরা সাগরের প্রাচীন অংশ দিয়া ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ প্রচলিত হইয়া তদ্দেশে এখন প্রকাণ্ড যমুনা নদী সৃষ্টি করিয়াছে।

হুরা সাগরের প্রাচীন যে অংশ পদ্মাতে মিশ্রিত তাহা এখন আর নাই; পদ্মা ও যমুনার সম্মিলনে হুরা সাগরের সেই অংশ এই দুই প্রকাণ্ড নদীর জলে মিলিয়া গিয়াছে।

সে প্রদেশে সর্ব্বত্র তখন জলে ও স্থলে দস্যুভয়—ধন প্রাণ লইয়া মানুষ সদা সশঙ্কিত থাকিত।

রমানাথের জামাতা শেখরলাল ধনী-সন্তান; তাঁহার পিতা ভৈরবনাথ রায় সুলতানপুরের ধনাঢ্য বংশীয় ব্যক্তি। সুলতানপুর পদ্মার উত্তর তীরে; বল্লভীপুর হুরা সাগরের পশ্চিম অংশে—সুলতানপুর হইতে স্থলপথে প্রায় চারি ক্রোশ ব্যবধান। পথিমধ্যেই ফৌজদার সাহেবের আবাস স্থল নিশ্চিন্তপুর। হুরা সাগরের তীরস্থ আবদুলপুর গ্রাম হইতে নিশ্চিন্তপুর ও বল্লভীপুর উভয় স্থানই বিভিন্ন পথে প্রায় এক ক্রোশ। নিশ্চিন্তপুর ও সুলতানপুরের পথের প্রায় মধ্যস্থলে মসলন্দগঞ্জের হাট।

শেখরলাল অল্পদিন হইল অধ্যয়নাদি সমাপ্ত করিয়া পশ্চিম প্রদেশে উচ্চ রাজকার্য্য করিতেছেন। দূর

দেশ, সর্ব্বদা গৃহে যাতায়াত সম্ভব হইত না। সেই গত বৎসর একবার বিবাহের সময় আসিয়াছিলেন, তার পর এবার পূজার সময় বাড়ী আসিবেন স্থির করিয়াছেন। কথা ছিল তিনি বজরা নৌকায় পদ্মা ও হুরা সাগর দিয়া আবদুলপুর গ্রামে আসিবেন, তথা হইতে বল্লভীপুর গিয়া পত্নীসহ স্থলপথে নিজ গ্রাম সুলতানপুর যাইবেন। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় শ্বশুর-বাড়ী পঁহুছিয়া সেই রাত্রিতেই স্থলপথে বাড়ী যাইবেন।

তাই ফৌজদার সাহেব রমানাথকে বলিতেছিলেন, সবিতা শ্বশুরগৃহে যাইবার পথে স্বামিসহ তাঁহার গৃহে যান। নবীন ঘোষ ফৌজদার সাহেবের প্রতিবেশী, তাহারই গৃহে মীর মোস্তাফা তাঁহাদের সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিবেন।

২

ফৌজদার সাহেব ধার্ম্মিক লোক। তিনি এই সুদীর্ঘ কাল এ প্রদেশে বিচার ও শাসন কার্য্য করিতেছেন; তস্কর ও দস্যু তাঁহাকে যেরূপ ভয় করিত, সাধু-সজ্জন তাঁহাকে তেমনি শ্রদ্ধা করিতেন।

রমানাথ ও মোস্তাফা বাল্যবন্ধু হইলেও, উভয়ের মধ্যে রমানাথ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট। রমানাথের মাতা জগদম্বা দেবী উভয়কেই সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। মোস্তাফা শৈশবে মাতৃহীন। এখন রমানাথের বয়স প্রায় ৪৮ বৎসর, মোস্তাফার বয়স প্রায় ৫৪।৫৫; উভয়েই বিপত্নীক।

বিস্তীর্ণ প্রদেশের নানাস্থানে দস্যুগণের অত্যাচার—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোথায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি ধনরত্নসহ কোন দূরদেশ হইতে যাত্রা করিল, দস্যুগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহাদের সঙ্গ লইত; তারপর সুবিধামত স্থানে এই হতভাগ্যদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত; প্রায়ই তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিত। দস্যুহস্তে পড়িলে, তখন যে ব্যক্তি কোন-রূপ বাধা দিবে তাহার জীবনবধ নিশ্চিত ছিল।

দস্যুদের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে বোধ হইত, তাহাদের এক এক জন বুদ্ধিমান নেতা আছে; কিন্তু কে তাহারা, ফৌজদার শত চেষ্টাতেও তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। তাঁহারও জনবলের অভাব ছিল না।

রমানাথ ও মোস্তাফা উভয়ের মধ্যে বাস্তবিকই আন্তরিক স্নেহবন্ধন ছিল। মাঝে মাঝে রমানাথ জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্য দেখিবেন বলিয়া অন্যত্র যাইতেন; তখন মোস্তাফা তাঁহার গৃহের তত্ত্বাবধান করিতেন।

সবিতা বিবাহিতা হইলেও পূর্ব্বের মতই আজিও মোস্তাফাকে "জ্যাঠাসাহেব" বলিত এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট কত্থার আবদার করিত।

রহিমবক্স রমানাথের পিতার সময়ের পাইক; প্রভুর সংসারে এখন তাহার বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই, কিন্তু গৃহস্থালীর সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভারই তাহার উপর। রমানাথ তাহাকে বলিতেন "রহিম কাকা", আর সবিতা বলিত "রহিম দাদা।"

৩

হাজার বন্ধুতা সত্ত্বেও মোস্তাফার নিকট রমানাথ কি যেন একটা বিষয় একেবারে গোপন করিতেন।

মাঝে মাঝে যখন রমানাথ স্থানান্তরে যাইতেন, তার অল্প পরেই কোন না কোন স্থান হইতে ডাকাতীর সংবাদ আসিত; কিন্তু প্রত্যেক বারই ঘটনার দিনে, সে দিন, এমন কি ঠিক সেই ডাকাতীর সময়েই, রমানাথ কোন না কোন উপলক্ষে ফৌজদার সাহেবের সঙ্গেই ছিলেন দেখা যাইত।

ফৌজদার দেখিতেন, এমন কোন দিনের ঘটনার কথা তিনি শুনেন নাই, যে দিন এই রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে। যখনই এ কথা ভাবিতেন, তখনই তাঁহার মনে হইত, এই সব বিষয়ের সঙ্গে রমানাথের সম্বন্ধীয় চিন্তা সংশ্লিষ্ট করিয়াও তিনি বন্ধুর একান্ত নির্ভর-শীল ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের অবমাননা করিতেছেন।

তবু কিন্তু ফৌজদার কি একটা কথা দুই একদিন রমানাথকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিতেন, কিন্তু তাহা

তিনি কিছুতেই পারিতেন না। "ছিঃ, রমানাথ মনে কি ভাবিবেন! যদি ভুল বুঝিয়া থাকি, তবে তাঁহার মনে কত বড় ব্যথা দেওয়া হইবে!"

প্রকাশ্য ব্যবহারে রমানাথ উদার চরিত্র। কতদিন মোস্তাফা নিজে দেখিয়াছেন, রমানাথ রুগ্ন পথিককে স্বহস্তে ধরিয়া গৃহে আনিয়াছেন এবং তাহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন; দরিদ্রকে অকাতরে অন্নবস্ত্র দান করিয়াছেন। এখনও দরিদ্রের জন্য তাঁহার অবারিত দ্বার।—যখনই এ সব কথা মনে হইত, তখনই মোস্তাফা ভাবিতেন, "আমি রমানাথ সম্বন্ধে কি ভুলই করিতেছিলাম।" মনের প্রশ্ন মুখে উচ্চারণ করিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইত।

সবিতা এখন অনেক জিনিষ বুঝিতে শিখিয়াছে। সে দেখিত, তাহার পিতা মাঝে মাঝে গ্রামের বামনদাস ঘোষ আর জয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে কি কথা বলিতেন, তার পর বিদেশ যাত্রা করিতেন; তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিবার পর খবর শুনা যাইত, উঃ ভাবিতেও ভয় হয়! ছিঃ, পিতার উপর যে তার বড় স্নেহ ভক্তি, পিতাও যে তাহাকে বড় ভালবাসেন। কাহাকেও এ বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না, জ্যাঠা সাহেবকেও না, রহিমদাদাকেও না।

রমানাথের মাতা জগদম্বা দেবীর মনে মাঝে মাঝে একটু খটকা বাধিলেও, তিনি কখনও পুত্রকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেন না। "ছিঃ—এও কখন ভাবা যায়! এমন কথা আমি মুখ দিয়া উচ্চারণ করিলেও ছেলে কি ভাবিবে?"

এম্‌নি করিয়াই চক্ষুর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড যবনিকা রাখিয়া দিয়া, কয়টি নিতান্ত স্নেহশীল হৃদয় রমানাথকে বেষ্টন করিয়া ছিল। কোন অবস্থা-জনিত সন্দেহ কাহারও মনে উঠিলে তাহা কোন দিনই বাক্যে উচ্চারিত হইত না।

আজ ছয় মাস হইল জগদম্বা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় কিন্তু তিনি মোস্তাফাকে বলিয়াছিলেন; "তুমি বাবা আমার বড় ছেলে; রমানাথকে দেখিও, সে যে কখন কি করিয়া বসে!"—এই পর্য্যন্ত।

মোস্তাফা তখন বলিয়াছিলেন—"মা, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, রমানাথকে দেখিব।"

৪

এবার জামাতা আসিয়াছেন শুনিয়া রমানাথ স্থির করিলেন—পূজার পূর্ব্বে তিনি বিদেশেই যাইবেন না, কিছুদিন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন—তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।

তাঁহার শুনা ছিল, কোন এক ভদ্র বংশীয় দস্যু, নিজ গ্রামস্থ ঘাটে লোক চিনিতে না পারিয়া আপন জামাতাকেই নাকি নৌকামধ্যে বধ করিয়াছিল; তাহার পর সেই ব্যক্তি কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া আত্মহত্যা করিয়া স্ব-কৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। সেই হতভাগ্যের কন্যা-জামাতার কথা মনে ভাবিতেও রমানাথের গাত্র কণ্টকিত হইল!

আবার মাতার মৃত্যুকালের কথা মনে পড়িল। মা কত বুঝিতেন!

সে রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে রমানাথ জননীর অন্তিম উপদেশ মনে করিতেছিলেন।—তার পর তাঁহার মনে পড়িল মোস্তাফার কথা—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি রমানাথকে দেখিব।"

রমানাথও আপন প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিলেন।

৫

তার পর, পূজার পূর্ব্বের অমাবস্যায় রমানাথ সংবাদ পাইলেন, জামাতা কালীপূজার পূর্ব্বে এ প্রদেশে আসিবেন না।

তাহা হইলে দুর্গাপূজার পূর্ব্বের কার্য্য স্থগিত রাখিবার আবশ্যক কি? রমানাথের পূর্ব্ব সংকল্প শিথিল হইল। কি একটা উত্তেজনার উৎসাহ তাঁহাকে তাঁহার চিন্তিত গভীর দৃঢ় চিন্ত-চক্র হইতে বেগে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিল।

রমানাথ ভাবিলেন, এইবারই না হয় শেষ।

বামনদাস আর জয়চন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া রমানাথ ফৌজদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। জামাতা এখন আসিবেন না তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন—"আমি ভাই, কয়েকদিন একটু মহাল দেখে আসি; তুমি ষষ্ঠীর দিন মেয়েকে এন।" জামাতা যখন পূজার পূর্ব্বে আসিতেছেন না, তখন কন্যা-জামাতার সম্বন্ধে রমানাথ একেবারেই নিশ্চিন্ত।

ফৌজদার বলিলেন, "তা যখন জামাই আস্‌ছেন না, তখন আমি সুধু মেয়েকেই আন্‌ব। তুমি কবে ফির্‌বে? তুমি সেদিন এখানে থাক্‌তে পার না? মা আস্‌বেন, আমি নবীন ঘোষের বাড়ীতে সেদিন একটু শাস্ত্র'কথা' আলোচনার ব্যবস্থা করাব ভাবছি।"

"বেশ, আমি ষষ্ঠীর দিন রাত্রেই আসব; এক প্রহর রাত্রে যদি কথা হয়, তবে আমি ঠিক উপস্থিত থাক্‌তে পারব এখন; তুমি তার আগেই মেয়েকে আনিয়ে নিও।"

"বেশ কথা, তাই ঠিক রইল।"

মোস্তাফা জানিতেন রমানাথ সত্যবাদী, যা বলিবে তা ঠিক; সে নিশ্চয় আসিবে।

৬

আজ পূজার পূর্ব্বে পঞ্চমী তিথি। রমানাথ বিদেশে।

রহিম বক্স আসিয়া সবিতাকে বলিল—"দিদিমণি, আজ মসলন্দগঞ্জের হাটে খবর পেলাম, জামাই দাদামণি আস্‌ছেন; ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় এখানে আসবেন, তাঁর বাড়ীতে খবর দিয়েছেন।"

সবিতা জানিত পূর্ব্বে এই বন্দোবস্তই ছিল, কিন্তু মাঝে একবার তাহার স্বামী মত পরিবর্ত্তন করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, পূজার পর—কালীপূজার সময় আসিবেন। তা হইলে সেই মত আবার পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বমত অনুসারে পূজার আগেই আসিতেছেন। আজ পঞ্চমী, আগামী কল্যই তিনি আসিবেন।

একবার দম্‌কা হাওয়ার মতন একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস, রুদ্ধ হৃদয়ের অর্দ্ধোন্মুক্ত গবাক্ষগুলির উপর সজোরে আঘাত করিয়া সবিতার প্রাণের ভিতর ছোট খাট ঝড় তুলিল।

তার পরই ভয়ে তাহার গা কাঁপিয়া উঠিল—"বাবা যে বিদেশে! যদি—"

সবিতার আনন্দিত হইবারও ভরসা হইল না। তখন তাহার মনে হইল, পিতা তো আর জানেন না যে তাঁহার জামাতা মত পরিবর্ত্তন করিয়া পূজার পূর্ব্বেই আসিতেছেন; রমানাথ ষষ্ঠীর রাত্রিতে ফিরিবেন; কিন্তু তিনি ত কোনো দিনই কোন শ্রুত ঘটনার সময় উপস্থিত থাকেন নাই। তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, তারই মধ্যে তাঁহার লোকেরা যদি তাঁহারই আদেশ মত—"

সবিতা আর ভাবিতে পারিল না। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে সেই বামনদাস আর জয়চন্দ্রের সঙ্গে পিতার দেখা। সে কথা ভাবিতেও সবিতা শিহরিয়া উঠিল।

সরল-হৃদয় রহিম সবিতার চিন্তা বুঝিল কি না, কে বলিবে? তাহারও মনে কিন্তু একটা আশঙ্কা কিছুদিন হইতেই জাগিতেছিল, যদিও তাহা আজিকার কথার পূর্ব্বে তাহার মনে কোন নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত করে নাই।

সবিতা স্বামীর বিষয় চিন্তা করিতেছে, রহিমদাদা কি ভাবিবেন? একবার লজ্জা হইল, তাহার পর উভয়ে সমান আতঙ্কে বলিয়া উঠিল—"উপায় কি হবে?"

তখন উভয়েরই চিন্তাস্রোত একদিকে। প্রকাশ্যে কেহ কাহাকে মনোভাব [illegible]পন করিল না।

সবিতা এবার বলিল, "রহিম দাদা, আমি এখনই জ্যাঠার কাছে যাব।"

রহিম পাল্কী আনিল। তখন বেলা এক প্রহর আছে। সবিতা ফৌজদার সাহেবের বাড়ী গেল।

বিষয়টা সংক্ষেপেই ফৌজদার শুনিলেন। তিনিও গম্ভীর হইলেন। তাঁহারও গা কাঁপিয়া উঠিল।

একটু চিন্তা করিতেই তাঁহার মাথায় কি একটা

বুদ্ধি আসিল। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মা ভেবো না; কোন ভয় নাই তোমার। তুমি মা, আগামী কাল ষষ্ঠীতে ঠিক সময় আমার বাড়ী আসবে, যেমন কথা আছে। আমি সন্ধ্যার আগেই পাল্কী পাঠাব। রমানাথ ঠিক সময়ে আসবেন তা আমি জানি।"

তখন বৃদ্ধ ফৌজদার সবিতার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন,—"আর—জামাই বাবাজীকেও যেমন করে পারি ঠিক হাজির করব।"

সবিতা বাড়ী ফিরিয়া গেল।

৭

প্রাচীন ফৌজদার মীর মোস্তাফা খাঁ আজ সত্যই চিন্তাকুল। তিনি ভাবিলেন, "আমার এত কালের ফৌজদারী বুদ্ধির আজ বুঝি চরম পরীক্ষা; কিন্তু শেষে এমন চালও দিতে হ'বে, তা আগে জানতাম না; কি করব,—প্রাণের দায়।" আজ সন্দেহটা তাঁহারও একটু দৃঢ় হইয়াছে।

তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র মবারক আলীকে ডাকাইলেন। মবারক আসিলে তাঁহাকে বলিলেন—"দেখ, আজই রাত্রিতে একশ জন অস্ত্রধারী লোক ঠিক করবে।"

মবারক আশ্চর্য্য হইলেন—ফৌজদার তো কখন এরূপ আদেশ দেন নাই। তবে কি শেষে তিনিও —নাঃ, এরূপ ভাবিতে নাই, ফৌজদার যে তাঁহার পিতৃস্থানীয়, দেবতুল্য ব্যক্তি।

ফৌজদার দূরদর্শী, মবারকের চিন্তা প্রণালী বুঝিলেন। বলিলেন—"তুমি লোক ঠিক করতে পারবে তো?"

"নিশ্চয়, কিন্তু—"

"কোন 'কিন্তু' নাই।"

তারপর ফৌজদার সাহেব নিভৃতে মবারককে কি-কি উপদেশ দিলেন।

ফৌজদারের মুখে আজ স্থির প্রতিজ্ঞা।

৮

আজ পূজার ষষ্ঠী। বেলা তখন প্রায় দেড়প্রহর আছে। একখানি বজ্‌রা নৌকা পদ্মানদী দিয়া হুগ্না সাগরের দিকে আসিতেছে। বজরা সুলতানপুরের ঘাট ছাড়িয়া খানিকটা দূরে আসিয়াছে। আরোহী শেখরলাল নৌকার সম্মুখস্থ স্থানে দাঁড়াইয়া মাঝিদিগকে বলিলেন, "একটু জোরে বেয়ে চল, এই সন্ধ্যার মধ্যে আবদুলপুর ঘাটে গেলেই তোমাদের ছুটি।"

মাঝি বলিল, "হুজুর, আমরা কি আর কসুর করছি? যতদূর পারি টেনেই যাচ্ছি।"

এই কথা হইতেই শেখরলাল দেখিলেন, দুইখানি ছিপ্ নৌকা তাঁহার বজরার দুই দিক হইতে তীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। ক্ষিপ্রহস্তে শেখরলাল বজরার ভিতর হইতে বন্দুক বাহির করিয়া আনিয়া মুক্তস্থানে দাঁড়াইলেন। তখনই দুই দিক হইতে ছিপ আসিয়া বজরা ধরিল।

শেখরলাল সশব্দে আকাশ পথে বন্দুক ছাড়িলেন; ভীতি প্রদর্শনই তাঁহার উদ্দেশ্য; তিনি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়েন নাই!

তখন শেখরলাল দেখিলেন, দুই ছিপে প্রায় একশত লোক—সকলেই সশস্ত্র, বন্দুকধারী।

সম্মুখের নৌকা হইতে মবারক বলিলেন—"যদি একজনও নড়বে, অমনি বন্দুক ছাড়ব। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ।"

আগন্তুক দল আসিয়া শেখরলালকে বন্দী করিল। মবারকের আদেশে দশজন সশস্ত্র লোক শেখরলালকে সসম্ভ্রমে পাল্কীতে উঠাইয়া নিশ্চিন্তপুরের দিকে লইয়া গেল,—একজনও বজরার কোন জিনিষ বা কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিল না।

বজরার মাঝি-মাল্লাগণ আশ্চর্য্য হইল,—এ কেমন ডাকাতী?

মবারক এবার বজরার আরোহীর স্থান লইলেন। তাঁহার সঙ্গে রহিল দশজন সশস্ত্র লোক, অবশিষ্ট লোকজন ছিপে উঠিল। দুইখানি ছিপ কিছু দূর অগ্রপশ্চাৎ রাখিয়া বজরা আবদুলপুরের দিকে চলিল।

মবারক এখন বজরার মালিক। হিন্দু পরিচ্ছদে

সজ্জিত হইয়া বলিলেন—"সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবদুলপুর পৌছুতে হবে।"

মাঝিদের তখনও মাথা ঘুরিতেছে; বলিল,—"হুজুরের হুকুম।"

৯

তখন রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড। বজরা আবদুলপুরের ঘাটে আসিয়াছে।

নিকটেই বাজার। হিন্দুবেশধারী মবারক তীরে নামিয়া নিকটস্থ গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

দুইজন লোক তখন নিকটে আসিল। একজন বলিল, "মশায়, যাবেন কোথা?"

"এই নিকটেই, মসলন্দগঞ্জের দিকে।"

বামনদাস আর জয়চন্দ্র পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, তারপর তাহারা বাজারের দিকে চলিয়া গেল।

একটু পরে একেবারে জল ও স্থল উভয় দিক হইতে প্রায় ৭০।৮০ জন সশস্ত্র লোক বজরা আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ তীরবেগে দুইখানি ছিপ বজরার সহায়তায় আসিল। বজরা ও ছিপের লোক প্রস্তুত ভাবেই দস্যুদলকে যুদ্ধে আহ্বান করিল,—এতটা প্রস্তুত যে দস্যুদল আশ্চর্য্য ও ভীত হইল।

মবারক স্বয়ং ভীষণ বেগে অস্ত্র চালনা করিলেন। তখনও উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। জয় পরাজয় অনিশ্চিত।

ব্যর্থ গর্ব্বের সহিত বামনদাস বলিতেছে,—"যেরূপে পার বজরার আরোহীকে হত্যা কর। সর্দ্দারের আদেশ।"

১০

পঞ্চমীর রাত্রি অবসান হইতেই বৃদ্ধ ফৌজদার ষষ্ঠীর প্রভাতে নবীন ঘোষের বাড়ীতে এমন উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন, যে গ্রামের সকলেই তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া মনে ভাবিল,—এবার পূজার 'পালা' বুঝি বাস্তবিক তাঁহারই; তাঁহারই আহ্বানে যেন বিশ্বজননী এবার শারদীয় উৎসবে সজীব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জগতে আসিতেছেন।

শাস্ত্র-কথার বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছে,—দেশস্থ প্রধান পণ্ডিত গোবিন্দচরণ বিদ্যাবাগীশ "ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা" বিষয়ের আধ্যাত্মিকা বর্ণনা করিবেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় "কথা"—আরম্ভ হইবে। দিবা রাত্রিতে বহুলোকের উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা হইতেছে,—গ্রামস্থ সামাজিক ব্রাহ্মণগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নবীনের বাড়ীতে আয়োজন উদ্যোগ করিয়া লইতেছেন।

বৃদ্ধ নবীন ঘোষ ভাবিতেছে, আজ তাহার বাস্তবিকই "সুপ্রভাত"—এতগুলি ব্রাহ্মণের পদধূলি তাহার গৃহে পড়িবে, তাহার গৃহে "পুরাণ" পাঠ হইবে। নবীন ও তাহার পরিজনবর্গ উৎসাহে সমস্ত কার্য্যের সহায়তা করিতেছে।

তখনও সূর্য্যাস্তের প্রায় অর্দ্ধপ্রহর বিলম্ব আছে।

সুলতানপুরের ভৈরবীনাথ রায় মহাব্যস্ত ভাবে ফৌজদার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমার বড় বিপদ,—আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে। শুনলাম আজ পদ্মানদী দিয়ে আমার পুত্র আবদুলপুর ঘাটের দিকে বজরায় যাবার সময়, দু-খানি জলদস্যুর নৌকা তার বজরা আক্রমণ করে, তারপর না-কি দস্যুরা তাকে বন্দী করে কোথায় নিয়ে গেছে।"

—বৃদ্ধ ভৈরবীনাথের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত।

ফৌজদার বলিলেন, "সত্যি না-কি? কি দুর্ঘটনা!"

"মশায়, এর একটা যা-হয় বিচার করুন।"

"আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি ঠিক ব্যবস্থা করছি। আজ রাত্রেই আপনার পুত্র আর পুত্রবধূ বাড়ী পৌছবেন।"

ভৈরবীনাথকে আশ্বস্ত করিয়া ফৌজদার সাহেব তাঁহাকে রাত্রিতে 'পুরাণ'-প্রসঙ্গ শ্রবণের জন্য অনুরোধ করিলেন; ভৈরবীনাথ নিতান্ত অনুনয় করিয়া সেই দিনকার জন্য মাফ্ চাহিলেন,—পরদিন তাঁহার বাড়ীতে দুর্গোৎসব, কত কাষ তখনও বাকী আছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন দুর্গোৎসবের ষষ্ঠী-সায়াহ্নের

বাদ্য কলরবে সমস্ত দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন বৃদ্ধ ফৌজদার সজল নয়নে দেখিলেন, গ্রাম পথের দুই বিভিন্ন প্রান্ত হইতে, দুই খানি পাল্কী তাঁহারই তাৎকালীন আবাসস্থল নবীন ঘোষের বাড়ীর দিকে আসিতেছে।

১২

রাত্রি প্রায় একপ্রহর। বৃদ্ধ ফৌজদারের ধমনী-স্রোত দ্রুতবেগে বহিতেছে। রমানাথের আসিবার সময় প্রায় হইয়াছে। মোস্তাফা ঘন ঘন পথের দিকে তাকাইতেছেন।

"পুরাণ" প্রসঙ্গ আবৃত্তির সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, কেবল রমানাথেরই আগমন প্রতীক্ষা।

দেখিতে দেখিতে দ্রুতপদে রমানাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছে, ভাল করিয়া বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা নাই।

কম্পিত স্বরে রমানাথ বলিলেন—"দাদা, লোক আছে? লোক চাই, প্রায় ৮০।৯০ জন লোক, সশস্ত্র,—এই মুহূর্ত্তেই এখনই দরকার।"

"কেন? কি হয়েছে ভাই?"

"দাদা, আমার বুঝি আজ সমস্তই শেষ! আমি দেহাত হতে সন্ধ্যার সময় গ্রামে এসে শুন্‌লাম, আমার জামাতা পূর্ব্বের মত বদ্‌লিয়ে আজই বজরায় চড়ে'—আমি তো জানতাম না, এর মধ্যেই যদি আমার লোকজন—অন্যদল না নিয়ে গেলে, এখন তার উদ্ধারের আর কি উপায় আছে ভাই? হায় হায়,—আমি কি শেষে"—তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

রমানাথের হস্ত ধরিয়া বৃদ্ধ মীর মোস্তাফা খাঁ তাঁহাকে নবীন ঘোষের বাড়ীর ভিতর-প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে লইয়া গেলেন।

সবিতা ও শেখরলাল একত্র আসিয়া রমানাথের পাদ-বন্দনা করিল।

তখনই একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল, মবারক আলী বামনদাস আর জয়চন্দ্রকে লইয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়াছেন।

রমানাথ কন্যাজামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সাশ্রু-নয়নে বলিলেন—"দাদা, তুমি মানুষ না দেবতা! আজ আমার এ কি পরিত্রাণ!"

আনন্দাশ্রুতে রুদ্ধ কণ্ঠে মোস্তাফা বলিলেন, "আমি মানুষই ভাই, দেবতা নই। আমি মায়ের কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা কি আমি ভুলেছি?"

তখন বহিঃপ্রাঙ্গণে কথক ঠাকুর সুর করিয়া মহা-ভারত কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন—

"ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কথা করিলে শ্রবণ।
সভয়ে দেবত্ব নর না হয় মরণ॥"

সজলনেত্রে সবিতা ডাকিল—"জ্যাঠা সাহেব!"

রমানাথ তখনও অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

সেই দিন হইতে রমানাথ দস্যু-নেতৃত্ব ত্যাগ করিলেন;—সে অঞ্চলে দস্যুর প্রাদুর্ভাব বিলুপ্ত হইল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ছ'খানা ছবি—শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ প্রণীত। কলিকাতা, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত এবং কলিকাতা ৯৯।নং অপার সারকুলার রোড, ডাক্তার অনুকূল চন্দ্র দাস মিত্র, এল-এম্-এস্, দ্বারা প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী, ৭৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷৹

এখানি গল্প পুস্তক। ছোট ছোট ছয়টি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছোট হইলেও গল্পগুলি সাধাসিধে, সরল এবং সুমিষ্ট ভাষায় বেশ গুছাইয়া লেখা হইয়াছে। আখ্যানভাগ ও চরিত্র-গুলি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। কোনখানেই অস্বা-ভাবিকতা ও অতিরঞ্জন দোষ লক্ষিত হয় না। ধর্ম্মযুক্ত গল্পগুলি

শিক্ষাপ্রদ। সংসারে যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে তাহাই গল্পগুলিতে দেখান হইয়াছে। বহিখানির বিশেষ গুণ এই যে, ইহা অবাধে ও অসঙ্কোচে বালক বালিকাদের হাতে দেওয়া যায়। অল্প কথার "গ্রামের কথা" গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পল্লীগ্রামবাসীদিগের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যে আজকাল হতভাগ্য গ্রামগুলির কিরূপ দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়াছে, গ্রন্থকার গল্পচ্ছলে তাহারই দিকে সকলের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকার সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই গল্পগুলি লিখিয়াছেন তাহা বুঝা যায়। বহিখানি পড়িয়া সকলেই সুখী হইবেন, আমাদের এরূপ বিশ্বাস আছে।

বহিখানির কাগজ ও ছাপাও ভাল। গল্পগুলি যেমন ছোট ছোট, তেমনি আরও কয়েকটি গল্প ইহাতে সন্নিবেশিত হইলে ভাল হইত।

আত্মচরিত। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত। কলিকাতা, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত এবং ২১০।৩।১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী ৪৪১ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০

এখানি চরিত্র গ্রন্থ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিত। এই চরিত কাহিনীতে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার জীবনের তিন সময়কার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১ম বাল্যচরিত ও পাঠ্যকাল, ২য় ধর্ম্মজীবন অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে চেষ্টা এবং ৩য় প্রকাশ্যে স্বদেশে ও বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। "আত্ম-চরিত"এ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই তিন সময়কার জীবন কাহিনী ও ঘটনা আমরা সাগ্রহে পাঠ করিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য সংসারে একজন যশস্বী লেখক বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত আত্মচরিত কাহিনীর সমালোচনা করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাহসিকতা তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা এই আত্মচরিত পাঠ করিতে করিতে যেন উপন্যাস পাঠ করিতেছি বলিয়াই মনে হইতেছিল। পাঠে এমন কৌতূহল বৃদ্ধি হয় যে একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। এমন সুমিষ্ট, সুললিত ও চিত্তাকর্ষক ভাষা, এমন সুনিপুণ লিখনভঙ্গী এবং বিষয় বিশেষে এমন উপভোগ্য নির্দ্দোষ পরিহাসপটুতা আমরা খুব কম গ্রন্থেই পাঠ করিয়াছি। যেখানে যে কথাটি যেমন করিয়া বলিলে সাধারণের রুচিকর ও প্রীতিকর হয়, অধিকাংশ স্থলে সেইরূপ করিয়াই বলা হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় ঔপন্যাসিক, সুকবি, বক্তা এবং উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় নহে। তিনি একজন খাঁটী ধার্ম্মিক, বন্ধুবৎসল, স্বার্থত্যাগী এবং সত্য ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ পুরুষ। ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরই, ধর্ম্মপরায়ণতা, অপূর্ব্ব চরিত্রবল এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা—আমরা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ ও প্রচার ব্যাপারেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাই। যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং গ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবিচলিত ও অক্ষুন্নভাবে বীরের ন্যায় তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। সহস্র বাধা বিপত্তি ও নির্য্যাতনেও তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই—অম্লানচিত্তে সে সকল সহ্য করিয়াছেন। ইহা কম কথা নহে।

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের "আত্মচরিত"এ এমন অনেক কথা পাইলাম, যে জন্য তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয় স্বতঃই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে। বিশেষতঃ তাঁহার মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও ইংলণ্ডের ধর্ম্মপ্রচার কাহিনী পাঠ করিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয় এবং অনেক শিক্ষা লাভ হয়। এই জন্য সমুদয় আত্মচরিত কাহিনীর মধ্যে এই অংশটিই আমাদের অধিক উপভোগ্য হইয়াছে। এই প্রচার কাহিনী এক দিকে যেমন বর্ণনার নৈপুণ্যে সরস, কৌতূহলজনক ও চিত্তাকর্ষক, অপর দিকে তেমনি শিক্ষাপ্রদ এবং অতিশয় উপাদেয়। আমরা পাঠকগণকে ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ধর্ম্মপ্রচার কাহিনী পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করি।

অতঃপর "আত্মচরিত"এ বর্ণিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াই আমাদের আলোচনার উপসংহার করিব। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা হইবার পর ক্রমে যখন মত, বিশ্বাস ও কার্য্য লইয়া সভ্যগণের মধ্যে ঘোরতর অনৈক্য, বিবাদ ও বিদ্বেষ উপস্থিত হইল, তখন এই সমাজ তিন অংশে বিভক্ত হইল। এই সময়কার বিবাদ বিদ্বেষের কাহিনী শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "আত্মচরিত"এ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই বিবাদের ইতিহাসের মধ্যে এমন সকল বিষয় পাঠ করিলাম, যাহা আমাদের নিকট প্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হইল না। বলিতে সাহস হয় না, ইহাতে প্রধানতঃ নব-বিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে সাধারণের চক্ষে অনেক পরিমাণে হীন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজের সেই পুরাতন বিবাদের বিরক্তিকর কাহিনী আর আমরা কত শুনিব? লেখায় বক্তৃতায় অনেকবার অনেক বাদ-বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের

সেরূপ ক্ষীণ অবস্থা, তাহাতে এতকাল পরে সেই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি সাধারণের চক্ষে প্রীতিকর নহেই পরন্তু ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি না। আমরা ব্রাহ্ম না হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। তাই দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, সেই সকল পুরাতন কলহ, বিচ্ছেদ ও বিদ্বেষ কাহিনী শাস্ত্রী মহাশয়ের "আত্মচরিত"এ এত বিশেষ ও বিস্তৃতভাবে বিবৃত না থাকিলেই ভাল ছিল।

কুচবিহার বিবাহ-বিভ্রাট লইয়া কেশব-বিরোধীদল কেশবচন্দ্রকে আক্রমণ ও গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন। নববিধান-মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক পুস্তক এবং ঐ সময়কার "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা পাঠ করিলে, উক্ত আক্রমণ ও গালিবর্ষণ যে উদ্ধত ও অসংযত ভাবেই হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। আমরা শুনিয়াছি মিস্ পিগট্ নাম্নী জনৈক ইংরেজ মহিলা বিরোধীদলের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তারপর আভিজাত্য ও নরপূজার ঘটনা। আভিজাত্য সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের "সেবকের নিবেদন" পুস্তকে লিখিত তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে যাহা বলিয়াছেন,তাহাতে তাঁহাকে আভিজাত্যের বিরোধী বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর নরপূজাপবাদ রটনা। এই ঘটনায় যখন স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি কেশবচন্দ্র সেনকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিলেন, এবং নানা সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র এক দিন উপাসনান্তে প্রদত্ত উপদেশে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "আজ তোমরা এ কি করিলে। ভগবানের প্রাপ্য সামগ্রী কেন আমায় দিয়া অপরাধী করিলে। আমি তোমাদের সেবক হইয়া সেবা করিতে আসিয়াছি, আমাকে সেবক বিনা অন্য কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিও না।" এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলকে প্রণাম করিয়াছিলেন। (আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, ২৪২ পৃষ্ঠা)

তারপর ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নরপূজা সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রকে যে তীব্র গালিপূর্ণ একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য পরে অনুতপ্ত হইয়া সে পত্র প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। সেই সুদীর্ঘ পত্র হইতে আমরা আবশ্যকমত দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম—"আমিই অনেকটা এই আন্দোলনের মূল কারণ, এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে। বর্ত্তমান আন্দোলনে (নরপূজা) তাঁহার (কেশবচন্দ্র সেনের) অনুমাত্র অপরাধ নাই ইহা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি।" ইত্যাদি। (আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিরণ, ২৯৩।৯৪ পৃষ্ঠা)

তারপর কেশবচন্দ্র ও তৎপত্নীর উপর যদুমণি ঘোষের অভিযোগ এবং "সারস পাখীর উক্তি" এ সকল ঘৃণ্য ও তুচ্ছ কাহিনী শাস্ত্রী মহাশয়ের "আত্মচরিত"এ কেন স্থান পাইল তাহা ভাবিয়া আমরা দুঃখিত। এ সকল কুকাহিনী শাস্ত্রী মাশয়ের আত্মচরিতের উপযুক্ত উপকরণ বলিয়া আমরা মনে করিনা। শাস্ত্রী মহাশয়ও উক্ত ঘটনা অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা বোধে তাহার যথোচিত প্রতিবাদও করিয়াছেন দেখিলাম। (৩১৭।১৮।১৯ পৃষ্ঠা)

কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "আত্মচরিত"এর এক স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "এতদিন ঝগড়া করিতে ছিলাম কিন্তু ব্রহ্মানন্দ যখন চলিয়া গেলেন তখন মনটা কিছু দিন নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মসমাজ লোকচক্ষে উঠিয়াছিল, তাঁহাতে নিরাশ হইয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে পশ্চাতে পড়িল, আর সম্মুখে আসিতেছে না। কোথায় তাঁর জীবনের মহাশক্তি, আর কোথায় আমাদের মত দুর্ব্বল অসার মানুষের চেষ্টা।" (৩৩২ পৃষ্ঠা)।

পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

"কমলাকান্ত।"

কলিকাতা

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—রবীন্দ্রনাথ

The Morning of St. Valentine—by J. C. Horsley R. A.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

মাঘ ১৩২৬ সাল

২য় খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

পৌরুষেয় ব্রহ্মবাদ

আমরা দেখিয়াছি পুরুষ-বহুত্ব সাংখ্যের অবধারিত মত। এবং এই মত উপলক্ষে যাঁহারা বেদান্তের পক্ষাবলম্বনে সাংখ্যের ছল ধরিতে গিয়াছেন, তাঁহারা এটা প্রণিধান করেন নাই, যে সাংখ্য শুধু পুরুষ-বহুত্ব বলিয়াই থামিয়া যান নাই, পুরুষ একত্বের কথাও বলিয়াছেন। এবং সেই একত্বকে একটি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—তাহা 'জাতি-পর একত্ব' অর্থাৎ 'ব্যক্তি-পর একত্ব' নহে। সাংখ্যের দর্শনকারের মতে উপনিষদের অদ্বৈত-শ্রুতি সকল—(যথা,—'আত্মা ইদমেক এব অগ্র আসীৎ' 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি)—'আত্মা' বা পুরুষের এই জাতিপর একত্বের কথা বলিতেছে, ব্যক্তিপর একত্বের কথা বলিতেছে না। শ্রুতি বাস্তবিক পক্ষে আত্মার সেই একত্বের কথাই বলিয়াছেন, কিম্বা অন্যবিধ একত্বের কথা বলিয়াছেন—ইহা [illegible] ধৃষ্টতা আমাদের নাই। এবং প্রয়োজনও নাই। কিন্তু সাংখ্য এতদুপলক্ষে পুরুষের যে জাতি-পর একত্ব অঙ্গীকার করিতেছেন তাহার সম্পূর্ণ মর্ম্ম ও সঙ্গতি প্রণিধান করিতে আমরা প্রতিশ্রুত।

প্রাচীনগণ 'জাতি' ও 'ব্যক্তি'কে বড় যে সোজাসুজি ভাবেই বুঝিয়াছিলেন তাহা নহে। পরিণামশীল (mutable) পদার্থ সকলের জাতি ও ব্যক্তির এক বিচিত্র বিভাবনা লইয়া তাঁহারা যে এক তুমুল দার্শনিক হাঙ্গামা বাধাইয়াছিলেন, সেই হাঙ্গামার অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি কচিৎ নব্য দর্শনের মধ্যেও জাগরূক রহিয়াছে। সেই জন্য আমরা জড়বর্গের সম্বন্ধে, 'জাতি' ও 'ব্যক্তি' ঘটিত প্রাচীন মত অগ্রে পরীক্ষা করিয়া লইব। এবং তাহার পরে দেখিতে চেষ্টা করিব, জড়বর্গীয় সেই জাতি ও ব্যক্তির সাদৃশ্য, অবিকারী চৈতন্য-বর্গে কতদূর পর্য্যন্ত চলিবে এবং কতদূরের পর আর চলিবে না।

(১) জাতি ও ব্যক্তি ।

সাধারণতঃ 'জাতি' বলিতে কি বুঝায় তাহা ব্যাকরণের কোন পড়ুয়ারই অবিদিত নাই। সকলেই জানেন বিশেষ বিশেষ অশ্ব, গো, গর্দ্দভ প্রভৃতি হইতেছে ব্যক্তি (individual) এবং অশ্বত্ব, গোত্ব গর্দ্দভত্ব হইতেছে তাহাদের জাতি। এই জাতি এক, কিন্তু তাহার ব্যক্তি অনেক, জাতি অবিশেষ বা সাধারণ, ব্যক্তি বিশেষ ও অসাধারণ, জাতি হইতেছে Abstract noun, ব্যক্তি তাহার Concrete noun জাতি ও ব্যক্তির এই ধারণা খুব সহজ হইলেও, দার্শনিকের মাথার মধ্যে ঢুকিয়া ইহা এক তুমুল গোলমাল সৃজন করিয়াছিল। এবং সেই গোলমাল, দর্শনের শুধু প্রাচ্য "স্কুলে" নহে, পাশ্চাত্য স্কুলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আমাদের দেশের কণাদ মুনি সমগ্র পদার্থ নিচয়কে যে ছয় ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সামান্য ও বিশেষ হইতেছে দুইটি চিহ্নিত বিভাগ। এবং এই সামান্য ও বিশেষ সত্তা লইয়া তিনি বিচার করিতে করিতে এমন একপ্রকার বিশেষ পদার্থের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা যতদূর জানি তাহাতে তাহা জগতের মধ্যে তাঁহারই প্রথম আবিষ্কার—তাহা পরমাণু।

নৈয়ায়িক বৈশেষিকের স-গোত্র। নৈয়ায়িক এই জাতি ও ব্যক্তি লইয়া, তাঁহার টোলের আবহাওয়াকে কতদূর পর্য্যন্ত ঘটত্ব-পটত্ব সমাকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। ন্যায় ও বৈশষিক দর্শনে এই জাতি ও ব্যক্তির ভাবগত ও ভাষাগত (logical) বিভাব না লইয়াই প্রধানতঃ বিচার হইয়াছিল। কিন্তু সাংখ্যাদি দর্শনে জাতি ও ব্যক্তির সত্তাগত বিভাবনা (Essential aspect) লইয়া জগতের কার্য্যকারণ নিরূপণ হইয়াছিল।

সাংখ্য ও পাতঞ্জলে জাতির নামকরণ হইয়াছিল, 'বিশেষ' ও 'অবিশেষ' বলিয়া। সাংখ্যাদি দর্শনে যে কার্য্যকারণের ধারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা এই বিশেষ ও অবিশেষ সত্তার বিচিত্র ধারণার উপরই। এই সকল দর্শনে আমরা দেখিতে পাই অবিশেষ সত্তা শুধু কথার কথা, ব্যাকরণের বিশেষ্য ভেদ Abstract noun মাত্র নহে, কিন্তু তাহা অস্তিত্বশীল একটী বিষয়। অর্থাৎ দর্শনের ভাষায় অবিশেষ সত্তার এক পৃথক্ 'অধিকরণ' বা আধার এই সকলে দর্শনে স্বীকৃত হইতেছে। অবিশেষ জাতি সত্তা তাঁহাদের মতে এক জিনিস ও উপাদান। এবং তাঁহাদের কার্য্য কারণ বিচার বলিতেছে এই অবিশেষ উপাদানই কারণ সত্তা, বিশেষ তাহার কার্য্যসত্তা। "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভ (সাং দঃ ৩.১)।"—অবিশেষ সত্তাই বিশেষ সত্তার আরম্ভক কারণ—ইহাই সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদের মূলমন্ত্র। শুধু পারিভাষিক অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্রা সম্বন্ধেই এই মন্ত্র খাটে না, কিন্তু এই মন্ত্রবলেই কার্য্যকারণ ক্রমে সাংখ্য তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্বের উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি অবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন।

"তত্র আকাশাদি পঞ্চভূতানি শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রানাম্ অবিশেষানাম্ বিশেষাঃ। তথা শ্রোত্রাদি একাদশ ইন্দ্রিয়াণি অস্মিতা লক্ষণস্য অবিশেষস্য বিশেষাঃ। এতে সত্তামাত্রস্য আত্মনঃ মহতঃ ষড়্‌বিশেষাপরিণামাঃ।" (পাঃ দঃ ২।১৯ ব্যাসভাষ্য সংক্ষেপতঃ)—'আকাশাদি পঞ্চভূত বিশেষ। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা ইহাদের অবিশেষ। সেইরূপ শ্রোত্রাদি একাদশ ইন্দ্রিয় বিশেষ। অস্মিতা লক্ষণ অহংকার ইহাদের অবিশেষ। আবার (আপেক্ষিক ভাবে) অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রও বিশেষ। সত্তামাত্র লক্ষণযুক্ত মহৎ তাহাদের অবিশেষ।'

এই বিশেষ ও অবিশেষ কার্য্যকারণ-বাদের মূলে আবার সৎ-কার্য্যবাদ নিহিত। কার্য্যকারণের ক্রম অনুসারে পদার্থ হইতে যে সকল গুণ ও ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রাচীন-দার্শনিক দেখিয়াছিলেন ঐ সকল গুণ ও ধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে অত্যন্ত অভাব ছিল না, কিন্তু তাহারা পদার্থের অবিশেষ কারণ-রূপের মধ্যে

অব্যক্ত ও সূক্ষ্মভাবে লুকাইয়াছিল, উপযুক্ত ও অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাহা ব্যক্ত ও স্থূলরূপে ফুটিয়া উঠিল। ধর্ম্ম ও গুণ সকলের এইরূপ সম্ভাব্য অস্তিত্ব (potential existence) অবধারণ করিয়াই প্রাচীনেরা তিলের মধ্যে অনাগত তৈলকে তৈলিক মহাশয়ের ঘানির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, পাষাণের মধ্যে অব্যক্ত প্রতিমাকে ভাস্করের কোদক যন্ত্রের প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়াছিলেন। কারণ উপাদানের মধ্যে কার্য্যের এই যে অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—ইহাই সৎকার্য্যবাদ।

কারণ সত্তার মধ্যে কার্য্যসত্তার এই অন্তর্ভাব বুঝাইবার জন্য আমাদের দর্শনে কত যে উপমা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সকলগুলিকে গণিয়া উঠাই ভার। সাংখ্য বলিয়াছেন কারণের মধ্যে কার্য্য সামান্যতঃ বা অবিভাগতঃ (undifferentiatedly) অবস্থান করে। পাতঞ্জল বলিয়াছেন উদ্ভিদ পর্ব্বের (পাবের) ন্যায় কারণ সত্তা "বিবৃদ্ধ কাষ্ঠা অনুভব করিয়া" কার্য্যরূপে উদ্গত হয়, ও অনাগত পন্থা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানের পথে আগত হয়। বেদান্ত দর্শন বলিয়াছেন তাহা "পটবৎ চ" (বেঃ দঃ ২।১.১৮) —ভাঁজ করা কাপড়ের ন্যায়। কার্য্য-সত্তা হইতেছে কারণ সত্তার ভাঁজ খুলিয়া যাওয়া মাত্র।

কার্য্যকারণের এই বিচিত্র অবধারণা হইতেই সাংখ্য বিচার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে অবিশেষ সত্তাই বিশেষের আরম্ভক কারণ, ব্যক্তি-সত্তা, জাতি সত্তারই কার্য্য। এবং কারণ সত্তার মধ্যে কার্য্যসত্তার সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি বশতঃ বিচার উজান ধারা বহিয়া কার্য্য হইতে কারণেরও অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছিল। "কার্য্যাৎ কারণানুমানম্ তৎ সাহিত্যাৎ।" (সাং দঃ ১।১৩৫) —কার্য্য হইতে কারণের অনুমান করা যাইতে পারে, কেননা কার্য্যের সঙ্গেই কারণ সহিত-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

সেই অনুমানের ধারা এইরূপ। নানা আকার ও অবয়বাদি-বিশিষ্ট ঘট কলসাদি পদার্থ হইতেছে মৃত্তিকার কার্য্য। এখন এই সকল ঘট কলসাদি দৃষ্টে যদি তৎকারণ মৃত্তিকাকে অনুমান প্রমাণের দ্বারা নিষ্পন্ন করার প্রয়োজন হয়, তবে ঘটের ধাতুতে যে যে বিশেষ আকারাদি গুণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল আকারাদি বিশিষ্ট গুণ যে তুল্যধর্ম্মী ধাতুর মধ্যে ব্যক্ত রূপে বিদ্যমান নাই, তাহাই ঘটকারণ মৃত্তিকা বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

অতএব সমস্ত কারণ সত্তাই অবিশেষ, কার্য্যসত্তা তাহার বিশেষ। কারণ সত্তার মধ্যে যাহা অবিভাগতঃ অবস্থিত, কার্য্য সত্তার মধ্যে তাহা "বিভাগতঃ" (differentiatedly) অবস্থিত হইয়াছে। এই বিশেষ ও অবিশেষ কার্য্য-কারণ-বাদের দ্বারাই সাংখ্য তাঁহার জগৎ তত্ত্ব সকল নিরূপণ করিয়াছিলেন।

তিনি দেখিয়াছিলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেই তাঁহার ত্রিগুণবাদের তুলাদণ্ডে, 'শান্ত' 'ঘোর' ও 'মূঢ়'। অর্থাৎ তাহারা সমধিক মাত্রায় সত্ত্বগুণযুক্ত (শান্ত) ও রজঃগুণযুক্ত (ঘোর) ও তমঃগুণযুক্ত (মূঢ়)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল মাত্রা হইতেছে তাহাদের প্রত্যেকরই বিশেষ গুণ। অতএব যে বিশ্ব ধাতুতে এই বিবৃদ্ধ মাত্রায় শান্ততা, ঘোরতা ও মূঢ়তা গুণ নাই, তাহাই ভূতকারণ তন্মাত্রা। সেই সূক্ষ্ম অবিশেষ বিশ্বধাতুই এই স্থূল ও বিশেষ ধাতুর আরম্ভক কারণ। এইরূপে অবিশেষ ধাতুর জাগতিক অহংতত্ত্ব হইতে আবার বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও ভূত সকলের উৎপত্তি অবধারিত হয়। অস্মিতালক্ষণ অহংকার দ্বারা জগৎ বৈচিত্র্য এমন এক পরিণাম লাভ করিয়াছে যাহাতে জ্ঞেয় সত্তা জ্ঞান হইতে অভিন্নরূপে প্রতীতি যোগ্য হয়। সেই অস্মিতামাত্রা প্রাপ্ত-ভেদ-যোগ্য বিশ্বধাতু "বিবৃদ্ধ কাষ্ঠা অনুভব" করিয়াই বিভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক প্রতীতি, এবং ঐ প্রতীতির বিষয়রূপতা লাভ করিয়া থাকে। অতএব অহংকারই ভূতেন্দ্রিয় কারণ বিশ্বধাতু। এই রূপে শুধু ভেদযোগ্য বা সত্তামাত্রা অবিশেষ মহৎধাতু কার্য্যকারণক্রমে বিশেষরূপে ভেদযোগ্য অহংধাতুত্ব লাভ করে। এবং যে জগৎধাতু সর্ব্বথাই জ্ঞেয়

যোগ্য নহে, যাহা জ্ঞানের দ্বারা কোনরূপেই বিবেচন-ক্ষম নহে, যাহা অস্পর্শ অশব্দ ও অরূপ, তাহাই ভেদযোগ্য বিবেচনক্ষম মহৎতত্ত্বের কারণ পরা-প্রকৃতি।

অতএব সাংখ্যবিহিত কার্য্যকারণাত্মক চতুর্ব্বিংশতি অচেতন জগৎ তত্ত্ব এই অনুমান প্রমাণের বলেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল—তজ্জন্য কোনও 'আপ্তবাক্য' বা আর্ষ প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই। এবং সেই প্রমাণের মূলমন্ত্র হইতেছে—"অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ।"

জাতি ও ব্যক্তি-পর এই কার্য্য-কারণ বাদের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি আমরা গ্রীক্ দর্শনের মধ্যেও পাইয়া থাকি। সেখানেও দেখিতে পাওয়া যায়, সৎকার্য্য বাদ-পরাহত দার্শনিক পাষাণের মধ্যে অনাগত মূর্ত্তি প্রতিমা দেখিয়া ভাবে আকুল হইয়া উঠিতেছেন। Platoর Idea সত্তা এবং তাঁহার পরের দার্শনিকদের 'universals', যে আমাদেরই 'অবিশেষ', 'জাতি-সত্তা' 'সামান্য-কারণ' প্রভৃতির ছদ্মবেশ ইহা বুঝা বড় শক্ত কথা নহে। Plato তাঁহার Idea-বাদকে এমনি যেথা সেথা লাগাইয়াছিলেন যে তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, পাশ্চাত্য দার্শনিক অবিশেষ-বিশেষ-বাদের বিস্তার ও প্রসৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্য দার্শনিককেও হারাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার একটিমাত্র উদাহরণের উল্লেখ করিবার স্থান আমাদের আছে।

"The Generic Idea is something which carries its name to all individuals, that partake of it; that similars become similar because they partake of similarity, and great things become great because they partake of greatness; and just and beautiful things become just and beautiful because they partake of Justice and Beauty." *

সাংখ্যের সুপরিচিত প্রতিজ্ঞা "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ"—ইহা তাহারই বিকীর্ণ ও প্রকীর্ণ উদাহরণ। এবং শুধু প্রাচীন গ্রীক দর্শনেই নহে, আধুনিক Hegel দর্শনের বিবিক্ত রঙ্গমঞ্চে Idee নামে যে প্রধান নাট্য-পুরুষ তাহার বিচিত্র লীলা খেলা দেখাইয়াছিল,—বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া যায় সে নাকি Platoর Ideaরই বংশধর। অতএব প্রাচীনগণের জাতি ও ব্যক্তি সম্বন্ধে যে বিচিত্র কল্পনা ছিল তাহা আজও দার্শনিক জগতে 'তামাদি সূত্রে বাধিত' হইয়া যায় নাই।

(২) পৌরুষেয় জাতি ও ব্যক্তি।

জাতি ও ব্যক্তি সম্বন্ধে এই যে বিচিত্র কল্পনা ইহা অবশ্যই পরিণামশীল ও বিকারী সত্তা সম্বন্ধেই সর্ব্বথা প্রযোজ্য। কিন্তু যাহা অপরিণামী সত্তা,—যাহা সমস্ত দেশকালের মধ্যে সর্ব্বদাই একরূপ, নিত্য ও পরিণাম-বিহীন—তাহার সম্বন্ধে কোনই জাতি ও ব্যক্তি-গত কার্য্যকারণতা প্রযোজ্য নহে। সাংখ্য কোন্ যুক্তিবলে পৌরুষেয় চিৎ-শক্তিকে নিত্য ও নির্ব্বিকার শক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা পুরুষের স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে অবগত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব সবিকারী জড়বর্গের কার্য্য-কারণ-বাদ, অবিকারী চৈতন্য-বর্গেও প্রযুক্ত হইতে পারে না। পুরুষের কোন কার্য্য ও কারণ নাই—"ন তস্য কার্য্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে।" তাহা নিত্য নির্ব্বিকার, কূটস্থ সত্তা। অতএব কার্য্য কারণ ক্রমে কোনও জাতি-পুরুষ হইতে ব্যক্তি-পুরুষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা পুরুষের 'জাতি-পর একত্ব' ও 'ব্যক্তিপর বহুত্বের' অর্থ হইতে পারে না। এখানে জাতি-পর একত্ব বলিতে "সামান্য এক-রূপতা মাত্রই" বুঝিতে হইবে এবং ব্যক্তিপর বহুত্ব বলিতে বিশিষ্ট বহু-রূপতা মাত্রই বুঝাইবে। এবং জাতি-পর রূপ যখন একরূপ, তখন তাহাকে আমাদের অদ্বৈতরূপই বলিতে হইবে, সেইরূপ (aspect) কে আর আমরা দ্বৈতরূপ বলিতে পারিব

* Plato, Permi 1803, Jowett's Translation.

না। তাহা সেই দিক দিয়া ভেদ-যোগ্য রূপ হইতে পারে না।

কিন্তু অন্যভাবেও যে তাহা ভেদযোগ্য রূপ হইতে পারিবে না, এমন কোন কথা নহে। যাহা কোনভাবেই ভেদযোগ্য নহে—তাহার নাম অত্যন্ত অদ্বৈত সত্তা (Absolute unity)। সাংখ্য পুরুষের ব্যক্তি-পর বহুত্ব স্বীকার করায় পুরুষের অত্যন্ত অদ্বৈত-ভাব মাত্র প্রতিষেধ করিয়াছেন—কিন্তু সামান্য অদ্বৈত ভাব প্রতিষেধ করেন নাই। শঙ্করাচার্য্য পুরুষের অত্যন্ত অদ্বৈত-ভাবই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—এবং তাহা করিতে গিয়া পুরুষ-বহুত্বকে মায়ার অতলগর্ভে নিমজ্জিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য পৌরুষেয় ভেদবুদ্ধির মধ্যে কোনই মিথ্যা বা মায়ার প্রসঙ্গ দেখিতে পান নাই। সেই জন্য পুরুষ বিষয়ে তিনি যেমন জাতি-পর অদ্বৈতভাব মানিয়াছেন—তেমনি এক দ্বৈতভাবও মানিয়াছেন। এবং তাহাতে তাঁহার বিচারে কোনও অসঙ্গতি উপস্থিত হয় নাই। কেন হয় নাই, সাংখ্য দর্শন তাহার এইরূপ জবাবদিহি করিতেছেন :—

(১) "পুরুষ বহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ"—জন্মাদির পৃথক্ ব্যবস্থা হইতে পুরুষ-বহুত্ব সিদ্ধ হয়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সূত্র বলিতেছে 'পুরুষ বহুত্বম্' নতু 'বহু পুরুষত্বম্'। অর্থাৎ এক-পুরুষতায় বহু যোগ্যতাও সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে সামান্য পুরুষ-একত্ব যদি অত্যন্ত ভাবের একত্ব (যথা ব্যক্তি-পর একত্ব) হইত, তবে একজন জন্মিলে সকলেই জন্মিত, একজন মরিলে সকলেই মরিত।

ইহাতে প্রতিপক্ষ আপত্তি করিলেন—জন্ম ও মৃত্যু নির্ব্বিকার পুরুষের কোনই পরিণাম নহে, উপাধিভেদ বা 'কাপড় ছাড়া ও কাপড় পরা' মাত্র। উপাধি মাত্রের ভেদের দ্বারা এক পুরুষত্বে বহু যোগ্যতা হইতে পারে না। ইহার উত্তর হইতেছে :—

(২) "উপাধি ভেদেঽপি একস্য নানাযোগঃ—আকাশস্য ঘটাদিভিঃ"—উপাধি মাত্রের ভেদের দ্বারাও একের নানা যোগ্যতা হইতে পারে—যেমন ঘটাদি উপাধিযোগে একই আকাশের, সত্তাভাবে নানা-যোগ হইয়া থাকে। আকাশ এক হইয়াও ঘট-সম্বন্ধ লাভ করিয়া ঘটাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়। তাহা কোনই মিথ্যা প্রতীতি নহে ;—ঘটাকাশকে কেহই পটাকাশ বলিয়া ভ্রম করে না। অতএব আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশের দ্বৈত বুদ্ধি যেমন মিথ্যা নহে, তেমনি সামান্য পুরুষতা এক হইলেও দেহাদি উপাধিযোগে জীবরূপতাও মিথ্যা নহে। এই আকাশ দৃষ্টান্ত বলে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে, পুরুষের যে দ্বৈত-ভাব তাহা পরিচ্ছিন্ন উপাধি-গত দ্বৈত-ভাবেই পর্য্যবসান লাভ করে নাই—তাহা অপরিচ্ছিন্ন অদ্বৈত-ভাবের সহযোগী দ্বৈত-ভাব—যেমন ঘটাকাশের দ্বৈতভাব অত্যন্ত পরিচ্ছিন্ন দ্বৈতভাব নহে, তাহা অদ্বৈত আকাশের সহযোগী দ্বৈত-ভাব। কেননা

(৩) 'উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্'—উপাধিই ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহাতে উপাধিমানেরও ভেদ উপাধি সূচনা করে না। সুতরাং উপাধিবান পুরুষ অদ্বৈত হইলেও, উপাধি সকলের বিভিন্নতাও অদ্বৈত হইয়া যায় না। এক ও অদ্বৈত বৃক্ষ কপি-সংযোগীও হইতে পারে, কপি-বিয়োগীও হইতে পারে। তা' বলিয়া কপির সংযোগ ও বিয়োগ একই কথা নহে। অতএব উপাধির সংযোগ বিয়োগই ভেদ বুদ্ধির নিদান। এবং উপাধির সংযোগ বিয়োগ বশতঃ পুরুষের একত্বে ভেদবুদ্ধির অবকাশ হয় না বলিলে—

(৪) "এবম্ একত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্ম অধ্যাসঃ।"—পুরুষ যদি অত্যন্ত একত্বভাবে সর্ব্বতঃ বর্ত্তমান রহিয়াছেন ইহা সিদ্ধ হয়, তবে সেই অত্যন্ত একই পুরুষ সম্বন্ধে একই কালে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আরোপও হইতে পারে না। যেমন একই জিনিসকে একই কালে আমরা গরম ও ঠাণ্ডা বলিতে পারি না—তেমনি অত্যন্ত এক পুরুষ সম্বন্ধেও একই কালেই জন্ম মৃত্যুর আরোপ করা যায় না।

ইহাই সাংখ্যের পুরুষ একত্ব ও পুরুষ বহুত্ববাদের অতি সূক্ষ্ম যুক্তি। এবং ইহাই যে প্রাচীন সাংখ্যেরও যুক্তি তাহা আমরা মহাভারতীয় প্রাচীন সাংখ্যের

বিবৃতি হইতে জানিতে পারি। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে "কপিলাদি ঋষিরা উৎসর্গ (সামান্ত বিধি) ও অপবাদ (বিশেষ বিধি) অনুসারে পুরুষ বহুত্ব বলিয়াছিলেন"—কিন্তু অত্যন্ত ভাবে পুরুষ-বহুত্ব বলেন নাই। অর্থাৎ পুরুষের যে বহুত্ব তাহা যেমন এক পক্ষে জড়-পদার্থের ন্যায় অত্যন্ত পরিচ্ছিন্ন বহুত্বও নহে, তেমনি অপর পক্ষে তাহা জড়বর্গীয় জাতিসত্তার ন্যায় পৃথক ভাবে অত্যন্ত পরিচ্ছিন্ন—পৃথক 'অধিকরণের' একত্বও নহে।

পুরুষের অদ্বৈতভাবের মধ্যে এই যে দ্বৈত ভাব—ইহা শুধু উপাধিমাত্রে পর্য্যবসিত ভাব হইলেও, কিন্তু ইহা এক বাস্তবিক পৌরুষেয় দ্বৈতভাব,—যে দ্বৈতভাব উপাধির বিলয়েও দ্বৈত যোগ্য শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে। যেমন অদ্বৈত আকাশের ঘটাদি উপাধির বিলয়েও, ঘটাকাশরূপে প্রতীয়মান হইবার যোগ্যতার বিলয় হয় না—তেমনি মুক্ত পুরুষগণের দেহাদি উপাধির অত্যন্ত বিলয়েও পৌরুষের দ্বৈতভাবের অত্যন্ত বিলয় হয় না। সে দ্বৈতভাব তখন অব্যক্ত দ্বৈতশক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য সাংখ্যের মুক্তি অদ্বৈতে বিলীন হওয়া নহে, কিন্তু তাহা বন্ধক্ষয় ও উপাধির বিলয় মাত্র। "বামদেবাদির্মুক্তঃ, ন অদ্বৈতম্।" (সাং দঃ—১।১৫৭)।—বামদেবাদি পুরুষেরা মুক্ত, অদ্বৈত নহেন।

(৩) পৌরুষেয় ব্রহ্মরূপতা।

এই বিশিষ্ট পুরুষ-একতা-বাদের ন্যায়ানুগত (logical) ফল হইতেছে সাংখ্যের নিরীশ্বর-বাদ। কেন না সাংখ্য যে পুরুষ-একত্ব মানিয়াছে তাহা কোন 'অধিকরণের' একত্ব নহে, সে একত্ব, নিরাধার একত্ব। অর্থাৎ তিনি কোনই ব্যক্তিপর এক পুরুষ মানেন নাই, শুধু জাতি-পর এক-পুরুষতাই মানিয়াছেন মাত্র। তাঁহার মতে জীবপুরুষ হইতে অতিরিক্ত কোন ঈশ্বর পুরুষ নাই—অন্ততঃ তেমন পুরুষ তাঁহার বিচারে 'অভ্যুপগত' হয় না। আবার পৃথক ঈশ্বরপুরুষ ইহাতে অতিরিক্ত কোনই জীব-পুরুষও তাঁহার মতে নাই। এই কথা বলিতে গিয়া দৈবাৎ শঙ্কর ও সাংখ্যের মধ্যে কোলাকুলি হইয়া গিয়াছিল। কারণ এতৎ-প্রসঙ্গে শঙ্করও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন—তাঁহার মতেও জীবেশ্বর অভিন্ন। সাংখ্য বলেন, যাহা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া শ্রুতি স্মৃতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—নিত্য, নির্ব্বিকার, বিশ্বব্যাপী, শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যময় সেই স্বরূপকে হারাইয়া পরমাত্মা জীবাত্মারূপে পরিণাম লাভ করেন নাই—জীবাত্মাও সেই অখণ্ড ও অদ্বৈত শুদ্ধ, বুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন।

সাংখ্য পুরুষের যে জাতিপর একত্বের কথা বলিয়াছেন—সেই একত্বের স্বরূপ হইতেছে এই পৌরুষেয় ব্রহ্মভাব। সাংখ্যসার গ্রন্থে এই পৌরুষেয় ব্রহ্মরূপ অবধারণ করিয়া বলিতেছেন—

নিত্যশুদ্ধো, নিত্যবুদ্ধো, নিত্যমুক্তো নিরঞ্জনঃ।
স্বপ্রকাশঃ নিরাধারঃ, প্রদীপঃ সর্ব্ববস্তুন্॥

পুরুষের এই যে নিরাধার ব্রহ্ম চৈতন্য রূপ তাহা অবশ্যই বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যের রূপ নহে। "জানেঽহমিতি ধীবলাৎ"—আমি জানিতেছি এই বুদ্ধিবলে যে জীবাত্মা প্রত্যক্ষভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহা এই নিত্যশুদ্ধ বিশ্ব-চৈতন্য-রূপ পুরুষ নহে। পুরুষের সেই ব্রহ্মরূপ বুদ্ধির অগোচর রূপ। বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জীব-চৈতনাকে সাংখ্য পুরুষের এক মিথ্যারূপ না বলিয়াও, বলিতে পারিয়াছেন জীবরূপই পুরুষের পূর্ণ রূপ নহে। আমাদের প্রত্যেকের ঘটের বুদ্ধি যে ঘটাকাশকে জানিতে পারে, ও যাহার খবর রাখে,—তাহার সঙ্গেও বাহিরে যে এক বিশ্বব্যাপ্ত মহাকাশ আছে এবং সেই মহাব্যোমের অভিন্ন সহচর হইতেছে তাহার মধ্যের ঐ ক্ষুদ্র আকাশটুকু—ইহা ঘটের ধারণার অবশ্যই অতীত। কিন্তু তা বলিয়াই তথ্যতঃ এই দিগ্ব্যাপী মহাব্যোম মিথ্যা নহে।

বিচার-সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের এই 'পৌরুষেয় ব্রহ্মবাদের অবতারণায় তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তার্কিক

বলিয়াছিলেন, হে সাংখ্য! কোন্ প্রমাণের বলে তুমি পুরুষের ব্রহ্মরূপ অবধারণ করিতে পার? তুমি তোমার পরা প্রকৃতির ন্যায়, বিশেষ ও অবিশেষ মন্ত্রবলে অক্ষর ব্রহ্মরূপকে অনুমান প্রমাণের বলে সাধন করিতে পার না। তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে বাধা প্রাপ্ত হইয়া জীব চৈতন্যের ওদিকে আর চলে না। অতএব তোমার পৌরুষেয় ব্রহ্মবাদের প্রমাণ কোথায়?

কপিলদর্শনেও পৌরুষেয় ব্রহ্মরূপ যে প্রমাণে অবধারিত হইতে পারে, সেই প্রমাণের লক্ষণ হইতেছে—

সামান্যতঃ দৃষ্টাৎ অতীন্দ্রিয়াণাম্ প্রতীতিঃ
অনুমানাৎ।
তস্মাৎ অপিচ অসিদ্ধং পরোক্ষম্ আপ্ত আগমাৎ॥
—কারিকা।

—যাহা প্রত্যক্ষ নহে এবং সেই জন্য অতীন্দ্রিয় (যথা প্রকৃতি), তাহা 'সামান্যতঃ দৃষ্ট' নামক অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ হয়। যে পরোক্ষ বিষয় অনুমান প্রমাণেও সিদ্ধ হয় না (যথা পুরুষের পূর্ণরূপ) তাহা আপ্ত শ্রুতির প্রমাণে সিদ্ধ হয়। পুরুষের ব্রহ্মরূপকে সাংখ্য এই আপ্ত আগমের প্রমাণ বলে সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

সাংখ্যের এই বিচার-তন্ত্র আশ্চর্য্য উদার! নাস্তিকের ন্যায় তিনি আপ্তবাক্যে অবিশ্বাসী নহেন। অথচ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে তিনি প্রমাণের কোঠা হইতে তুলিয়া দিয়া বৈদান্তিকের ন্যায় শ্রুতির বচনকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করেন নাই। তাঁহার মতে যেখানে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অবসর নাই, সেখানে আপ্তবাক্যই প্রমাণ।

পুরুষের এই অদ্বৈত একত্ব ও ব্রহ্মরূপতা আপ্ত প্রমাণবলে সাংখ্য সাব্যস্ত করায় চটুল যুক্তি অবশ্যই সন্তোষ লাভ করে নাই। সে উদ্ধত শিখার কেশগুচ্ছ শিহরিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যাহা প্রত্যক্ষতঃ বাধিত হইয়াছে, তাহাও কি এই শ্রুতির খাতিরে মানিতে হইবে?" সাংখ্য উত্তরে বলিয়াছেন—শীলবৎ!—শ্রুত্যাসিদ্ধস্য ন অপলাপঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। (সাং দঃ—১।১৪৭)—যাহা শ্রুতির প্রমাণে সিদ্ধ হয়, তাহার প্রত্যক্ষ বাধা থাকিলেও তাহার অপলাপ হয় না।

প্রশ্ন।—কিন্তু পুরুষের এই যে অদ্বৈত-ব্রহ্মরূপ, শ্রুতি ছাড়া অন্য কেহ কখনও কি দেখিয়াছে না জানিয়াছে?

উত্তর।—"বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যা তদ্রূপম্। ১।১১৫

—যে মুক্ত পুরুষেরা বন্ধের কারণ বিদিত হইয়াছেন তাঁহারা পুরুষের সেই পূর্ণ ও অদ্বৈতরূপ জানিয়াছেন ও দেখিয়াছেন।

চটুল তর্ক নেত্র বিস্ফারিত করিয়া পুনশ্চ বলিয়াছিল, 'হাঁ,' হইতে পারে, তোমার সেই মুক্ত পুরুষেরা তাহা দেখিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু আমি কখনও দেখি নাই। 'তবে কি করিয়া জানিব কাহার দৃষ্টি সত্য, তাঁহাদের না আমার?' সাংখ্যের সকোপ উত্তর হইতেছে, "নান্ধাদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপালম্ভঃ।" (সাং দঃ—১।১৫৬) অন্ধ দেখিতে পায় না বলিয়া, যাহার চক্ষু আছে তাহার দেখাও মিথ্যা হয় না।

বর্ত্তমান যুগের সন্দেহ-তন্ত্র (Agnosticism) সাংখ্যের নিকট এই উদার তর্কবিধির উপদেশ লইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

বৌদ্ধ সঙ্ঘের কথা

ভগিনী নিবেদিতা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে ভারতে জাতীয়তার ভাব প্রবুদ্ধ করিতে ও জাগরিত রাখিতে বৌদ্ধ সঙ্ঘ যাহা করিয়াছে, তেমন আর অন্য কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই করে নাই। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে বৌদ্ধ সঙ্ঘ না থাকিলে ভারতে জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিত না; তবে বৌদ্ধ সঙ্ঘের দ্বারা যে এই চেতনা সামধিক ভাবে পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নিশ্চিত। তিনি আরও বলেন যে খ্রীষ্টধর্ম্মের যেমন Church আছে, ঠিক সেই হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন Church ছিল না—ছিল সঙ্ঘ। ভারতের সমগ্র জনসমূহের সামাজিক একতা বোধ হয় ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসে এই বৌদ্ধ সঙ্ঘেরই দ্বারা প্রথম সংসাধিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে বর্ণের দৌরাত্ম্য সমাজকে সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল। সেই বিভাগ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছিল। সামাজিক অনেক বিষয়েই ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য বর্ণকে বেশ একটু বিশিষ্ট দূরত্বেই স্থাপিত রাখিয়াছিলেন; এমন কি আত্যন্তিক দুঃখের পাশ ছিন্ন করিয়া জীব যে সংসার ত্যাগ করিয়া বিজন বনে নির্ব্বিবাদে ভগবানের আরাধনা করিয়া মোক্ষের ব্যবস্থা করিয়া লইবে তাহারও উপায় ছিল না—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের সে অধিকার ছিল না। সে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বর্দ্ধমান, আর করিয়াছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। জৈন-ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের তত বিরুদ্ধ ছিল না—যেমন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-সঙ্ঘ।

সে [illegible] প্রাকার প্রথম সংঘাতেই ছিন্ন ভিন্ন 'অধিকরণের' ল। ভারত-সম্রাট মৌর্য্য-কুল-রবি অর্থাৎ তিনি সে সঙ্গে নিবেদিতা কহিয়াছেন যে, ভার-শুধু জাতি-পর ভাবে বজ্র-কঠিন ভিত্তির উপরে তাঁহার মতে জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মূরার পরুষ নাই—অন্ততঃ তনয় স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই যে তাহার মূলে তিনি ছিলেন না, পরন্তু ছিলেন পীতকাষায়ধারী ভিক্ষুর দল, যাঁহারা পাটলিপুত্রের তোরণদ্বার দিয়া নগরে আগমন নির্গমন করিতেন, আর যাঁহারা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতি নগরে প্রতি জনপদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যে সম্প্রদায় ভারতকে এক করিতে, ভারতে জাতীয়তার উগ্রচেতনা সঞ্চারিত ও সম্প্রসারিত করিতে ব্যবসিত ছিল, যে সম্প্রদায়ের কল্যাণে নালন্দ ও তক্ষশিলার সভ্যতার রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া সারা জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহার মহিমময় ইতিহাস উপেক্ষণীয় নহে।

বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পালি ভাষায় লিখিত; নাম ত্রিপিকট। এই বৌদ্ধ সঙ্ঘের ইতিহাস, উৎপত্তি, সংগঠন, নিয়মবদ্ধ কার্য্যপ্রণালীর কথা বিনয় পিটকের অন্তর্গত। এই পিটক তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—

১। সুত্তবিভঙ্গ { পারাজিক, পাচিত্তিয় }

২। খন্ধক (স্কন্ধক) { মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ }

৩। পরিবার

সিদ্ধার্থ গৌতমের সাম্বোধিলাভ, ধর্ম্মের অববাদ, প্রথম শিষ্য সাক্ষাৎ, সারনাথে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন, গয়াশীর্ষে অগ্নি-অববাদ, রাহুলকে 'উপসম্পদা' দান এই গুলি মহাবগ্‌গের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রাবস্তীর ধনকুবের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিকের সঙ্ঘে উৎসর্গীকৃত জেতবনারামের দান, গৌতমদ্বেষী দেবদত্তের সঙ্ঘ-ভেদের প্রযত্ন, ভিক্ষুণীসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও সঙ্ঘ-সম্পর্কিত বিষয় সমূহের তথ্য চুল্লবগ্‌গে নিবদ্ধ হইয়াছে। সঙ্ঘান্তর্গত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের জীবন সংযমিত করিতে কতক

গুলি নিয়মের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহা লইয়া পাতি-মোক্‌খ—অর্থাৎ পারাজিক ও পাচিত্তিয় কণ্ড—গঠিত হইয়াছে; আবার এই দুটী মিলিয়া সুত্তবিভঙ্গ হইয়াছে।

মারের আক্রমণ গৌতম ব্যর্থ করিয়াছেন—ধ্যাননিরত সাধকের সমাধি অটুট রহিয়াছে,—ভীষণ বৃষ্টি, করকাপাত, বজ্রধ্বনি, সৃষ্টিবিধ্বংসী বায়ুর ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত, প্লাবন, বিষদিগ্ধ শরজাল এবং ভস্ম ও অঙ্গারের বর্ষণ তাঁহার বীরহৃদয়ে সামান্য ভয়েরও সঞ্চার করিতে পারে নাই, উদ্বেলিত করা তো দূরের কথা? তণ্‌হা (তৃষ্ণা) রতি ও রাগ নাম্নী মারকন্যাগণের হাবভাব বিলাসপূর্ণ ইঙ্গিতময় তরঙ্গায়িত অঙ্গসঞ্চালন সত্ত্বেও উপাসনারত ধ্যানীর হৃদয় ও মানস নিস্তরঙ্গ ছিল—ঠিক প্রশান্ত হ্রদেরই মত। বৈজয়ন্তধামে জিনের শৌর্য্যের প্রশংসা গীত হইয়া দশদিক মুখরিত করিল—বুদ্ধ জয়ী হইয়াছেন, মার পরাভূত হইয়াছে!

তাহার পর?—তাহার পর নৈরঞ্জার তটিনীকূলে বোধিরুক্‌খ (বৃক্ষ) মূলে তিনি আসন করিয়া বসিয়াছেন। যামিনী শুরু, ক্রমে ক্রমে এক এক যাম অতিক্রান্ত হইল। প্রথম যামে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি তাঁহার চিত্তমুকুরে প্রতিভাসিত হইল। দ্বিতীয় যামে সমগ্র বস্তুই তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িল—অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হইল। তৃতীয় যামে দ্বাদশ নিদান শৃঙ্খলিত হইয়া পটিচ্চসমুপ্পাদম্ (প্রতীত্য সমুৎপাদম্) রূপে তাঁহার নিকট ধরা পড়িল। আর চতুর্থ যামে, যাহার জন্য তিনি এত তপস্যা করিতেছিলেন—সেই অপবর্গ, সেই সম্বোধি, সমুদ্ধত্ব তাঁহার আয়ত্ত হইল।

তাহার পর নানাবিধ আসনে সাতটী সপ্তাহ তিনি অতিবাহিত করিলেন। এই সুদীর্ঘ ধ্যানের অন্তে ওড্র-ভূমি (ওড়িষ্যা) হইতে আগত দুই জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভোজ্য নিবেদন করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বের অধিকার দিলেন। ইঁহারাই তাঁহার প্রথম শিষ্য। তাহার পর বারাণসী অভিমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া, ইসিপত্তনে (ঋষিপত্তনে) মৃগদাবে (সারনাথে) ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। পঞ্চভিক্ষুর সহিত সাক্ষাতের পর তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেন। এই প্রথম প্রচার প্রণিধানযোগ্য। তিনি কহিলেন—দুইটী চরম (extreme) পন্থা আছে, দুইই বর্জ্জনীয়—(১) ইন্দ্রিয়সেবা জনিত সুখ (২) আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মানসে দেহের নির্য্যাতন—কোনটীতে ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না। অতএব "মধ্যপথ" অবলম্বনই শ্রেয়ঃ, সেই পথ "নিব্বাণে" পৌঁছাইয়া দেয়। তাহার জন্য কি করিতে হইবে? না, অট্‌ঠঙ্গিকমগ্‌গের (অষ্টাঙ্গিক মার্গের) অবলম্বন। সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি?

অয়ং এব অরিয়ো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো সেয্যথিদং—সম্মাদিট্‌ঠি, সম্মা সংকপ্পো, সম্মা বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীবো, সম্মা ব্যায়ামো, সম্মা সতি, সম্মা সমাধি।

অর্থাৎ—এই হইতেছে আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গঃ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ ব্যবহার, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রযত্ন, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

তাহার পর তিনি চতুরার্য্যসত্যের কথা বলিলেন—

১। দুক্‌খম্ অরিয়সচ্চম্, জাতি পি দুক্‌খা, জরাপি দুক্‌খা, ব্যাধি পি দুক্‌খা, মরণম্ পি দুক্‌খম্, অপ্পিয়েহি সম্পয়োগো দুক্‌খো, পিয়েহি বিপ্পয়োগো দুক্‌খো, যম্পি ইচ্ছম্ ন লভমি তম্পি দুক্‌খম্, সংখিত্তেন পঞ্চুপাদানক্‌খন্ধা পি দুক্‌খা।

অর্থাৎ। দুঃখ আর্য্যসত্য; জন্ম দুঃখের, জরা দুঃখের, ব্যাধি দুঃখের, মরণ দুঃখের, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ দুঃখের, প্রিয় হইতে বিচ্ছেদ দুঃখের, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দুঃখের—এক কথায় পঞ্চ উপাদানের সমবায়ই দুঃখের।

২। দুক্‌খ সমুদয়ম্ অরিয়সচ্চম্। যায়ং তণ্‌হা পোনোব্‌ভিকা নন্দিরাগ সহগতা তত্র তত্রাভিনন্দিনী সেয্যথিদং কামতণ্‌হা, ভবতণ্‌হা, বিভব তণ্‌হা।

অর্থাৎ দুঃখের মূল আর্য্যসত্য—বস্তুতঃ আকাঙ্ক্ষারূপ তৃষ্ণাই পুনঃ পুনঃ জন্মের মূলীভূত কারণ—যে জন্ম

ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী ও এখান সেখান করিয়া তৃপ্তির খোঁজ করিয়া বেড়ায়। কি সেই তৃষ্ণা? কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বৈভব-তৃষ্ণা।

৩। দুক্‌খ নিরোধম্ অরিয়সচ্চম্—যো তস্সায়েব তণ্‌হায় অসেসবিরাগনিরোধো চাগো পটিনিস্সগ্‌গো মুত্তি অনালয়ো।

এই দুঃখের নিরোধও আর্য্যসত্য—বস্তুতঃ সেই তৃষ্ণার নিঃশেষ যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র রাগের (রতির) লেশ থাকে না, তৃষ্ণার পূর্ণ ত্যাগ, বিরাগ ও মুক্তি—ইহা আর্য্য সত্য।

৪। দুক্‌খ নিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চম্ অয়মেব অরিয়ো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো।

এই তৃষ্ণা হইতে মোক্ষলাভের পন্থাও আর্য্যসত্য—কি সেই পন্থা? অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ বিচক্ষণ ভিষকের ন্যায় সংসার ব্যাধির নিদান আবিষ্কার করিয়া, সেই ব্যাধি হইতে বৈকল্য লাভের পন্থাও দেখাইয়া দিয়াছেন।

অতঃপর সেই পঞ্চভিক্ষুকে তিনি স্বীয় মত স্বীকার করাইয়া শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ সোতাপত্তি (স্রোতাপত্তি), সাকদাগামি (সকৃদাগামি) অনাগামি ও অর্হত্ব এই চারি ফলের অধিকারী হইলেন। তাহার পর যশ ও তাঁহার ৫৪ জন সহচর তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই ষাটজন ভিক্ষুই তাঁহার সঙ্ঘের কেন্দ্র হইল। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার ধর্ম্মের প্রচার করিয়া বেড়াও।" অনুজ্ঞাত হইয়া ভিক্ষুগণ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। ধর্ম্মের অববাদ ও শিক্ষা বিকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল, দলে দলে লোক প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিতে লাগিল। শিষ্যগণ তাহাদিগকে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন। সঙ্ঘের পরিধি বিস্তৃত হইতে লাগিল। প্রচারকগণ দলেদলে অনাগার গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে তাঁহার সমক্ষে লইয়া আসিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব দেখিলেন যে স্বয়ং সকলকে দীক্ষাদান করা ক্রমেই তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িতেছে। তাহার পর আর এক ভাবিবার কথা ছিল। জলবাষ্প ও তড়িৎ তখন স্বাধীন ছিল, মানুষের দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া তখনও ক্রীতদাসের ন্যায় তাহার ইচ্ছার বশ হয় নাই, রেলগাড়ী ও মোটর তখনও হয় নাই, কাযেই প্রচারকদের পদব্রজেই এখানে সেখানে গিয়া প্রচার করিতে হইত, আর মোক্ষকামী ব্যক্তিগণেরও মোটর অথবা রেলগাড়ী চড়িয়া বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা লইতে আসা হইত না। কাযেই গিরি দরী, নদ নদী, বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তর হইতে তাহাদিগকে পদব্রজেই তাঁহার নিকট আসিতে হইত। সেও এক মহা কষ্টকর ব্যাপার। তাই তাহাদের এই কষ্ট দূর করিবার জন্য বুদ্ধদেব আজ্ঞা দিলেন যে সঙ্ঘ-প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তিগণকে ভিক্ষুগণই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিতে পারিবেন। সে অধিকার অতঃপর তাঁহারা পাইলেন। এতদিন ভিক্ষুগণ নিজদিগকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; এখন আবার পরের ভাবনা ভাবিতে হইল; নূতন ভার তাহাদের উপর পড়িল। পূর্ব্বে দীক্ষা লইতে হইলে কেবল মাত্র বুদ্ধ ও ধর্ম্মেরই শরণ লইতে হইত, এখন হইতে সঙ্ঘেরও শরণ লইতে হইল। পূর্ব্বে দীক্ষার সময়ে বুদ্ধদেব দীক্ষাকামীকে বলিতেন—"সাক্‌খাতো ধম্মো চর ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুক্‌খস্‌স অন্তকিরিয়ায়।" এখন হইতে কিন্তু দীক্ষিতকে তিন তিন বার একনিষ্ঠ হইয়া গভীর স্বরে বলিতে হইত

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

অপরাজিতা

(উপন্যাস)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বেনারস হইতে কলিকাতা।

আমি দশ বা বার মিনিট্‌কাল পার্শেল গুদামে অপেক্ষা করিলে অ্যাসিষ্টান্ট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু ওরফে খুড়শ্বশুর মহাশয় হৃষ্ট প্রহরিদ্বয়কে লইয়া তাঁহার আফিসঘরে প্রত্যাগত হইলেন। আরও প্রায় দশ মিনিট পরে ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া পৌছিলে প্রহরীরা আমাকে নিতান্ত নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বাহির করিয়া, গাড়ীর একটি খালি কামরায় উঠাইল; এবং পাছে আমি পলায়ন করি তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্ব পূর্ব্বক দুইজনে আমার দুই পার্শ্বে গম্ভীর মুখে উপবেশন করিল।

যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িল।

গাড়ী গঙ্গার সেতুর উপর আসিলে আমি সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বল গঙ্গাস্রোতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিলাম; দূরে বহুতর প্রস্তর মন্দির ও প্রস্তর অবতরণিকাতে লোক সমারোহ দেখিলাম; আকাশ পটে অসংখ্য মন্দিরের উজ্জ্বল চূড়া সকল চিত্রিত রহিয়াছে দেখিলাম। দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া মনে মনে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। প্রণত হইয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে পুণ্যা বারানসীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম। অপরাজিতাকে বিবাহ করিবার আনন্দময় আশায় এই বারাণসীতে আসিয়াছিলাম; নিগড়বদ্ধ হস্তে বন্দীরূপে তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। বিদায় গ্রহণ কালে, কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণাকে মনে মনে ডাকিয়া বলিলাম —"দেবি! তুমি আমার অপরাজিতাকে নিরাপদে রাখিও।" অসংখ্য মন্দির মধ্যস্থ অসংখ্য দেবতাকে ডাকিয়া বলিলাম—"তোমরা মঙ্গলময়! তোমরা আমার অপরাজিতার মঙ্গল করিও।" দেবমন্দির চিত্রিত সূর্য্যালোকিত মধ্যাহ্ন আকাশকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"হে নীলাকাশ! তুমি অপরাজিতার মাথায় স্বর্গের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিও।"

সেতু অতিক্রম করিয়া, গাড়ী ক্রমে মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলে, আমরা কলিকাতা-অভিমুখী অন্য গাড়ীতে চড়িলাম।

তথায় অনেক বাঙ্গালী রেলযাত্রী কৌতূহলনেত্রে আমার নিগড়বদ্ধ হস্ত লক্ষ্য করিতে লাগিল, আমি লজ্জায় অধোবদন রহিলাম; তথায় শালপত্র-বিরচিত ক্ষুদ্র পাত্রে ভিজা ছোলা ভাজা এক একটি রক্তবর্ণ লঙ্কার সহিত বিক্রীত হইতেছিল,—দুইটি পয়সা দিয়া, তাহার দুই পাত্র ক্রয় করিয়া, প্রহরিদ্বয় তাহা মহানন্দে চর্ব্বণ করিতে করিতে লঙ্কার ঝালে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তথায় এলুমিনিয়ম ধাতুর নির্ম্মিত বাসনের এক বিক্রেতা একটি করঙ্কের জন্য এক বাঙ্গালী যাত্রীর নিকট অসম্ভব মূল্য প্রার্থনা করায়, তিনি অপূর্ব্ব মুখ ভঙ্গিমা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তথায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্লাটফরমে নামিয়া জুতা খুলিয়া মৃত্তিকাভাণ্ডে বরফযুক্ত লেমনেড পান করিয়া আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন এবং আপনার হিন্দুয়ানী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন; তথায় পাণওয়ালা তানসেনের অজানিত এক অপূর্ব্ব রাগিণীতে গাহিল—'পান বিড়ি সিগারেট, পাণ বিড়ী সিগারেট'; তথায় বালক চীৎকার করিল; যুবক সিগারেট খাইল; প্রবীণ হালুয়া পুরী কিনিল; এবং বৃদ্ধ লোটা ভরিয়া জল লইল; তথায় অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠন তুলিয়া দ্রব্য বিক্রেতার সহিত দ্রব্যগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইল, মুখের কাছে শালপত্রের পাত্র রাখিয়া কচুরি খাইল এবং

বিগত-যৌবনা, যুবক যাত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিল; তথায় রৌদ্রতপ্ত বালুকণা, উত্তপ্ত বায়ুতে উড়িল; তথায় হরিদ্বর্ণ পতাকাসঞ্চালনকে বৃক্ষপল্লবের সঙ্কেত মনে করিয়া ইঞ্জিন-কোকিল কুহরিয়া উঠিল।

আমি কলিকাতা অভিমুখে চলিলাম।

আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাঙ্গালার স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাইব, ইহা মনে করিয়া, সেই দুর্দ্দশাতেও আমি আনন্দিত হইলাম। আমার সেই আনন্দে, জন্মভূমি কি আদরের জিনিষ, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। হায়! এই আদরের সামগ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, কি রত্নের আশায়, আমি কোথায় গিয়াছিলাম; কোন স্বর্গলাভের আশায় 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী ও জন্মভূমিতে ত্যাগ করিয়াছিলাম!

তাহার পর আমরা দানাপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। সেখানে প্লাটফরমে ও ষ্টেশনের কক্ষগুলিতে উজ্জ্বল আলোক সকল জ্বলিতেছিল। সেখানে সাহেব যাত্রীদিগের সান্ধ্যভোজের বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া আহার করিতে লাগিলেন; আমরা বাহির হইতে কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের আহারের সুবিধার জন্য গাড়ী সেখানে চল্লিশ মিনিট দাঁড়াইল।

গাড়ী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে প্রহরীদের মধ্যে একজন কি জানি কি ভাবিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল —"কিছু খাইবে?"

অপরাজিতা নিজহস্তে, আমাকে যাহা খাওয়াইয়া দিয়াছিল, তাহাতে আমার উদর পূর্ণ ছিল; সুতরাং আমি বলিলাম—"না, আমার ক্ষুধা নাই; আমি কিছুই খাইব না।"

প্রহরী বলিল—"না খাওয়াই ভাল। এই সব ষ্টেশনে বড় খারাপ জিনিষ বিক্রয় হয়। পচা আটা; ভেজাল ঘি, খারাপ তৈল;—এ সকল জিনিষ না খাওয়াই ভাল। খাইলে ব্যারাম হয়। আমি একবার মতিহারী যাইতেছিলাম, পথে—"

কিন্তু এই সময়, একটা জলখাবারওয়ালা, তাহার পুরী, হালুয়া ও মিষ্টান্নাদি একটা পিতলের বড় পাত্রে সজ্জিত করিয়া, এবং তাহাতে মসীউদ্গিরণকারী আলোক জ্বালাইয়া, গাড়ীর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাওয়ায়, প্রহরী-প্রবরের আরব্ধ বক্তৃতা বন্ধ হইয়া গেল। সে খাদ্য-পাত্রের প্রতি তাহার ক্ষুধাতুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, খাদ্য বিক্রেতাকে অপেক্ষা করিতে বলিল এবং সঙ্গীকে ডাকিয়া কোন্ কোন্ খাদ্য ক্রয়যোগ্য, তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই বিচার ও মূল্যনির্দ্ধারণে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, তাহারা অবশেষে কিছু হালুয়া ও পুরী ক্রয় করিল, এবং পয়সা বহুবার গণনা করিয়া হালুয়া ও পুরীর মূল্য প্রদান করিল। তৎপরে তাহারা আহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের আহারের মহানন্দ দেখিয়া, আমি বুঝিতে পারিলাম না, যে ঐ আহারদ্রব্য পচা আটা ও ভেজাল ঘিয়ে প্রস্তুত এবং উহা না খাওয়াই ভাল।

আহারান্তে তাহারা তাম্বুল চর্ব্বণ করিল; এবং পিতলের ক্ষুদ্র কৌটা হইতে চূণ এবং কাপড়ের থলি হইতে তামাকের পাতা বাহির করিয়া, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও ও বাম করতালুর সংঘর্ষণে 'খৈনি' প্রস্তুত করিয়া, তাহা তাম্বুলরক্ত, বিকট অধর মধ্যে স্থাপিত করিয়া, প্রভূত নিষ্ঠীবনে গাড়ীর তলদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল।

সাহেবদিগের আহার সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা মন্থর গমনে আসিয়া গাড়ীতে চড়িলেন। সকলের আহার সমাপ্ত হইয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান লইয়া গার্ড গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত আলোক দেখাইল।

আবার গাড়ী পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল। কত মাঠ, কত বন, কত অন্ধকার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। দূরে গগন প্রান্তে কত তারা, কত নাচিল; পৃথিবীতে বৃক্ষোপরে বসিয়া কত খদ্যোৎ তাহার অনুকরণ করিল। দূরে দূরে, দ্রুতগামী এক একটা আলো, মনুষ্য নিবাসের সন্ধান বলিয়া দিল। আমি গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া কতক্ষণ তাহা দেখিলাম। তাহার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিদ্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িল। আমি নিদ্রিত হইয়া, বেঞ্চে পড়িলাম। কতক্ষণ শুইয়া ছিলাম জানি না।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম ভোর হইয়াছে ;—তারাদল সারারাত জ্বলিয়া ক্লান্ত হইয়া মিট্ মিট্ করিতেছে। পূর্ব্বদিক, দিবাকরের পদক্ষেপ জন্য গগনপ্রান্তে সম্মানজনক লাল আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। গাড়ী তখন একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল। দীপাধারে লিখিত ষ্টেশনের নাম পড়িয়া বুঝিলাম, আমরা আসানসোলে আসিয়াছি।

দেখিলাম আমার পার্শ্বে প্রহরিদ্বয় গভীর নিদ্রায় অভিভূত। দেখিয়া, আমার মনে একবার একটা দুষ্ট অভিসন্ধি জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম এখন আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে গাড়ী হইতে নামিয়া, পলায়ন করিতে পারি। কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে এরূপ পলায়নের দ্বারা আমি নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব না ; বরং সহজেই পুনর্ধৃত হইয়া অধিক দণ্ডার্হ হইব। অল্পকাল মধ্যে সূর্য্য উদিত হইবেন ; তখন এই নিগড়বদ্ধ হস্ত লইয়া, লোকালয়ে দুইপদ অগ্রসর হইতে না হইতে, লোকে আমাকে পলাতক অপরাধী বুঝিয়া, পুনরায় পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিবে। বধিরের সংগীত শুনিবার আশার ন্যায়, আমায় পলায়নের আশা মনেই বিলীন হইল।

সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌঁছিল। তথায় প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহারা চকিতনেত্রে আমাকে দেখিয়া, যেন নিশ্চিন্ত হইল। তাহারা আমাকে লইয়া মুখ হাত ধুইতে নামিল। আমার মুখ হাত ধুইবার সুবিধার জন্য, তাহারা কৃপা করিয়া ক্ষণকালের জন্য, আমার নিগড় বন্ধন খুলিয়া লইল। অল্পক্ষণ মধ্যে মুখ হাত ধুইয়া, আমরা গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। গাড়ীতে ফিরিয়া, প্রহরীরা দয়া করিয়া বলিল—"বর্দ্ধমানের জলখাবার ভাল ; এখানে তুমি কিছু খাইয়া লও।"

আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, পরন্তু কলিকাতায় পৌঁছিয়া, হঠাৎ কিছু আহার প্রাপ্ত হইব কি না তদ্বিষয়ে মনে সন্দেহও জন্মিয়াছিল। সুতরাং আমি বলিলাম —"খাইব।"

তাহারা দুইজনে কিয়ৎকাল পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে আমার আহার জন্য, তাহারা মোট দশ পয়সা খরচ করিবে। পরে আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম যে তাহারা, আমার রাস্তার খাদ্য সরবরাহ জন্য মোট দেড় টাকা খরচের একখানি ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছিল। সেই ফর্দ্দ তাহাদের কথামত, লিখিয়া দিয়াছিল কাশী ক্যান্টমেণ্ট আউট পোষ্টের বাঙ্গালী রাইটর কনেষ্টেবল। এই রহস্যটুকু জনসমাজে প্রচার করায়, পরে তাহা আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল।

দশ পয়সা খরচ করিয়া, তাহারা আমার জন্য ক্রয় করিল ছয়খানি পুরী, একটি মিহিদানা, এবং চারিখানি জিলাবী—তাহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়া, জলখাবার ক্রয় করিলে, আমি জিলাবীর পরিবর্ত্তে সীতাভোগ ক্রয় করিতে বলিতাম। এই সুস্বাদু খাদ্যটা যে কতকাল খাই নাই, তাহা, হে আমার পাঠকবর্গ, তোমরা সকলেই জান।

আমার পানাহার শেষ হইলে, প্রহরীরা পুনরায় হস্ত নিগড়বদ্ধ করিল। এই বর্দ্ধমানে, কবি ভারতচন্দ্রের সুন্দর, বিদ্যালাভ করিতে আসিয়া, রাজা বীরসিংহের আদেশে আমারই মত নিগড়বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু শেষে দেবতার কৃপায়, সুন্দর নিগড়মুক্ত হইয়া বিদ্যালাভ করিয়াছিল। দেবতার কৃপায় আমিও একদিন নিগড়মুক্ত হইয়া, অপরাজিতা লাভ করিব। এই মধুর ভবিষ্যৎ-আশায় বুক বাঁধিয়া, আমি বর্দ্ধমান ত্যাগ করিলাম।

আমাদের গাড়ী ধান্যক্ষেত্র ও আম্রকুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া, কলাবাগান ও নারিকেল বাগান পার হইয়া, ভগ্ন বাড়ী ও বৃক্ষাক্রান্ত দেবমন্দির অতিক্রম করিয়া, খাল ও অপরিষ্কার ডোবার ধার দিয়া, নদীর উপর ঝন্ ঝন্ শব্দে নৃত্য করিয়া, বেলা নয়টার পর হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল।

সেখানে আমার শুভাগমন প্রতীক্ষায় পুলিশের দুইজন লোক অপেক্ষা করিতেছিল। বোধ হয় তাহারা পূর্ব্বাহ্নে তারযোগে খবর পাইয়াছিল যে, ঐ দিন, ঐ

সময়, ওই গাড়ীতে আমার শুভাগমন ঘটিবে। প্লাটফরমের ধারে রাস্তায়, একখানা বড় জুড়িগাড়ীও আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। উহা জেলখানার গাড়ী। সেই গাড়ীতে চড়িয়া, আমরা জেলে আসিয়া পৌছিলাম।

জেলখানার দরজায় জেলদারোগা বাবু আমার অভ্যর্থনা করিলেন; হাসিয়া বলিলেন,—"এস হে! আমাদের এখানে দিন কতক থাকিয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি আমাকে এক কক্ষে লইয়া একখানা বেঞ্চে বসাইলেন। তৎপরে আমার প্রহরিদ্বয়ের নিকট হইতে কতকগুলি কাগজপত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

জেল দারোগা।

সেই দিনই ডাক্তার আসিয়া আমার দেহ পরীক্ষা করিলেন। আমাকে তুলামঞ্চে চড়াইয়া স্থির করিলেন যে আমার বরবপুর গুরুত্ব এক মণ আটাইশ সের। মাপ দণ্ডের সাহায্যে স্থির হইল যে, আমার দৈর্ঘ্য পাঁচফুট দশ ইঞ্চি। চক্ষু, জিহ্বা, বক্ষ এবং অন্যান্য অঙ্গের বহু পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইল, যে আমার দেহ সম্পূর্ণ নীরোগ। বাল্যকালে অসাবধানতাবশতঃ আমি একটা ভগ্ন বোতলের উপর পতিত হইয়াছিলাম; তাহাতে আমার বাম হস্তের তালুতে একটা ক্ষত হইয়াছিল; ঐ ক্ষতের একটা বিশ্রী চিহ্ন আমার হস্তে বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। আমার করপল্লবের শ্রীহানিকর সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমি চিরকাল মনে করিতাম যে তৎস্থানে স্থায়ীভাবে থাকিবার উহার কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ দেখিলাম, যে এই অনাবশ্যক চিহ্নটা ডাক্তারের মস্ত একটা প্রয়োজনে লাগিয়া গেল। তিনি উহা পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার রিপোর্টে লিখিলেন—"আসামীর বামহস্তের তালুতে একটা ক্ষত চিহ্ন আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। আমার অনুমান হয় যে এই ক্ষত, বারুদ বা অন্য কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের বিদারণে প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। একণে এই ক্ষত সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়াছে।"

আমার নয়নগোচরে ঐ রিপোর্ট লিখিত হওয়ায়, আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম—"না মহাশয়, এই ক্ষত চিহ্ন ঐরূপে উৎপন্ন হয় নাই। প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে আমি খেলা করিতে করিতে একটা ভাঙ্গা বোতলের উপর পড়িয়া গিয়াছিলাম; তাহাতে আমার তালু কাটিয়া যাওয়ায়, বিলক্ষণ রক্তপাত হইয়াছিল। এবং ঐ ক্ষতের ঘায়ে, একমাসের অধিককাল কষ্ট পাইয়াছিলাম। সেই ক্ষতের এই চিহ্ন এখনও আমার তালুতে রহিয়া গিয়াছে।"

ডাক্তার বিজ্ঞতায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"আমি পরীক্ষা করিয়া যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। আমি তোমার কথা শুনিতে বাধ্য নহি। তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা আদালতে বলিও।"

কাযেই আমি নীরব হইলাম।

ডাক্তার আমার করতল পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কয়েকটি কিণাঙ্ক লক্ষ্য করিলেন। ঐ কিণাঙ্কগুলি বাবাজীর কুস্তির আখড়ায় মুদ্গর সঞ্চালনে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া ডাক্তার তাঁহার ভ্রূদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া লিখিলেন—"আসামীর উভয় করতলেই কড়া আছে। সর্ব্বদা পিস্তল-চালনে এইরূপ কড়া উৎপন্ন হইতে পারে। সর্ব্বদা বংশযষ্টির চালনাদ্বারাও এরূপ কড়া পড়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, উহা পিস্তল চালনেই উৎপন্ন হইয়াছে।"

ডাক্তার তাঁহার রিপোর্ট সমাধা করিয়া প্রস্থিত হইলে, একজন ফটোগ্রাফার আসিয়া, আমাকে এক বারান্দায় লইয়া, আমার মোহন মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিল।

অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া, আমাকে এক কক্ষমধ্যস্থ এক টেবিলের পার্শ্বে লইয়া গেল। দেখিলাম, ঐ টেবিলের উপর একখানি চামড়া বাঁধা বড় বহি রহিয়াছে; এবং একটা কাষ্ঠফলকে কতকটা কজ্জল অনুলিপ্ত

রহিয়াছে। ইহা ছাড়া লেখনী ও মস্যাধার প্রভৃতি লিখন-উপকরণও ছিল। দেখিয়া আমি আমার পরিচালককে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে আমাকে কেন আনিলে? আমার কি করিতে হইবে?"

সে বলিল—"টিপ সই লইব।"

বাঙ্গলা উপন্যাসে আমি 'সই'এর কথা পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, একদিন চন্দ্রকরোজ্জ্বল গঙ্গার অগাধ জলে, প্রতাপ শৈবলিনীকে "শৈ" বলিয়াছিল। কিন্তু এরূপ অদ্ভুত 'সই'এর কথা কখন শুনি নাই। মসীচিত্রিত কাষ্ঠফলকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার মনে একবার সন্দেহ জন্মিল, যে লোকটা বুঝি কাষ্ঠফলক হইতে কজ্জল লইয়া, আমার কপালে টিপ দিয়া আমার সহিত 'টিপসই' পাতাইবে। আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "টিপ সই' কি?"

সে সেই চামড়া বাঁধা বইখানি খুলিয়া বলিল—"ইহাতে তোমার বামহাতের বুড়ো অঙ্গুলের ছাপ লইব; এস।" এই বলিয়া সে আমার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি আপন কবল মধ্যে সবলে গ্রহণ করিয়া, তাহা কাষ্ঠফলকে সংলিপ্ত ও মসীমণ্ডিত করিল। এই বিস্ময়জনক কার্য্য সমাধান্তে, সে বহি খানির উন্মুক্ত পৃষ্ঠার এক অংশে আমার মসীমণ্ডিত বৃদ্ধাঙ্গুলিটি মুদ্রিত করিল; এবং ঐ মুদ্রণের পার্শ্বে আমার নাম লিখিবার জন্য, আমাকে অনুরোধ করিল।

আমি আমার বাল্যকালের নাম লিখিলাম—"শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

লোকটি ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—"তোমার নিজের নাম লেখ।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—"আমার নিজের নাম, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; আমি সেই নামই লিখিয়াছি।"

সে বলিল—"রিপোর্টে দেখিলাম যে তুমি একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকার করিয়াছ, যে তোমার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি। আমরা সেই নামই রেজিষ্টারি করিয়াছি। এখানে তুমি সেই নামই লিখিবে। নাম বদলাইয়া, অন্য নাম লিখিলে চলিবে না।"

আমি গত কল্য অপরাজিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আর কখনও মিথ্যা পথে বিচরণ করিব না। হঠাৎ আমার মনে সেই প্রতিজ্ঞার কথা উদিত হওয়ায় আমার মনে বিলক্ষণ বল সঞ্চারিত হইল। আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "আমি আমার যথার্থ নামই লিখিয়াছি। অন্য নাম লিখিব না।"

সে কর্কশ স্বরে বলিল, "তোমার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি; উহা তুমি স্বীকারও করিয়াছ। এখানে তোমাকে ঐ নামই লিখিতে হইবে। অন্য মিথ্যা নাম লিখিলে চলিবে না।"

আমি আরও গম্ভীর হইয়া বলিলাম—"আমি যাহা লিখিয়াছি তাহার পরিবর্ত্তন করিব না।"

সে আমাকে উপদেশ দিয়া বুঝাইল—"নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিও না। এই মিথ্যা নাম লেখায় তোমার কোন ইষ্টলাভ হইবে না। সকলেই বুঝিতে পারিবে, যে ধরা পড়িয়া, পরিত্রাণ লাভের চেষ্টায় তুমি তোমার যথার্থ নাম গোপন করিতেছ। ইহাতে তোমার খুব অনিষ্ট হইবে।"

আমি বলিলাম—"তা' হউক।'

তাহার সদুপদেশ গ্রহণে আমাকে বীতরাগ দেখিয়া, সে রাগিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিল—"চল তোমাকে জেল দারোগা বাবুর কাছে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া, সে আমার হাত ধরিয়া দারোগা বাবুর নিকট লইয়া গেল; এবং উত্তেজিত কণ্ঠে আমার দুষ্টামীর কথা তাঁহাকে বলিল।

দেখিলাম, সে সকল কথা শুনিয়া, তিনি বিচলিত হইলেন না। বলিলেন—"কি করিব? কেহ মিথ্যা বলিলে তাহা নিবারণের ত কোনও উপায় নাই। প্রায় সকলেই আদালতে গিয়া আপনাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। এ ব্যক্তি তাহার আগেই সেই অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দেখ, ইহাকে

দেখিয়া অবধি আমার মনে হইতেছে, যে পুলিশ একটা কিছু ভুল করিয়াছে। কোনও পলাতক আসামীর এরূপ নধর দেহ হইতে পারে না। শিকারী কুকুরের মত পুলিশ যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে, সে বিদেশে অপরিচিত স্থানে, অসময় আহারে কখন বা অনাহারে, স্নান ও নিদ্রার অনিয়মে, এবং তাহার উপর ধরা পড়িবার ভয়ে, কখনও এইরূপ সুন্দর দেহ-সৌষ্টব রক্ষা করিতে পারে না। তাহার পর দেখ, এ ব্যক্তি কেমন যত্নে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়াছে ও চুল ছাটিয়াছে! আমি তখন ইহার নিকট দাড়াইয়া ছিলাম; উহার মস্তকে একটা সুন্দর গন্ধতৈলের সৌরভ পাইলাম। না, ন', পলাতক আসামীর এ সকল কার্য্যের অবসর নাই। তা' পুলিশ নিজের কার্য নিজে বুঝিবে। আমাদের এ সকল বিষয়ে কথা না কহাই ভাল। আমরা হুকুমের চাকর; যেমন হুকুম পাইব সেই মত কায করিয়া যাইব। ব্যস্, তাহা হইলেই আমরা দায়ে খালাস। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম পাইয়াছি—হাজত ঘরে রাখিতে; হাজত ঘরে রাখিব। তাহার পর পুলিশ আপনার কার্য্য আপনি করিবে। আমাদের পরচর্চ্চায় দরকার কি? তবে এ কথা বলিতেই হইবে, যে পুলিশ মস্ত একটা গলদ করিয়াছে। আবার দেখ, পুলিশ রিপোর্টে লিখিয়াছে যে এ ব্যক্তির সহিত একটা প্রকাণ্ড নূতন ট্রাঙ্ক ছিল। এইটা ডাহা মিথ্যা। ট্রাঙ্ক ছিল ত সেটা গেল কোথায়? সেটা কর্পূর নয় যে উবিয়া যাইবে; তাহার ডানা নাই, যে উড়িয়া যাইবে। আর দেখ, একটা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক লইয়া কি কোন পলাতক আসামী রেল গাড়ীতে আনাগোনা করে? শুনিলাম, আসল যে আসামী সে নাকি আপনার ছোট টিনের বাক্সটি আপনার মেসের বাসায় ফেলিয়া পলাইয়াছিল।"

উপরোক্ত বাক্য প্রবাহে মুখ-কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া দারোগা বাবু সেই ব্যক্তিকে একটা টুল দেখাইয়া বলিলেন—"বস হে হরেন, একটু কথা কহা যাক্।"

সেই হরেন নামক লোকটির ক্রোধ দারোগা বাবুর কথায় একেবারে প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল। সে দারোগা বাবুর নির্দ্দিষ্ট টুলে উপবেশন করিলে, তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"তুমিও না হয় ঐ টুলখানায় একটু বস। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে?"

আমি উপবেশন করিলে, দারোগা বাবু হরেনকে বলিলেন—"দেখ; একটা কথা—তোমায় ভাল—কি বলিব মনে করিয়াছিলাম। হাঁ, হাঁ এই ডাক্তার সাহেবের কথা। এই ডাক্তার সাহেব আজ একজন রোগীর সুরুয়া দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন শুনিয়াছ? আজ মোট সতের জন সুরুয়া পাইবে। আমরা যেমন হুকুম পাইব তেমনই কায করিব; ব্যস তা হইলেই আমরা দায়ে খালাস। কিন্তু কাযটা কি ডাক্তার সাহেবের ভাল হইল? সুরুয়ার এক-পোয়া মাংস ঔনীনর রাজার মত তাঁহার ত গা কাটিয়া দিতে হইত না। সরকার বাহাদুরই ত তাহা সরবরাহ করিতেন। এক পোয়া মাংস বাঁচাইয়া সরকারের কি লাভ হইবে? আজ সন্ধ্যার পর জামাই বাবাজী আসবেন বলিয়াছেন কি না—কি বলিব বল—আমি উপরওয়ালার নিন্দা করিতে পারি না—কিন্তু ডাক্তার সাহেবের আক্কেল দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি।"

হরেন। আপনার বাসায় প্রত্যহ যেমন দেড় সের মাংস যায় আজও তাহাই গিয়াছে।

দারোগা। বেশ, বেশ। আর দেখ, আমার খাইতে হয় কালিয়া, আমার কম হইলে চলে না। রোগী কয়েদীরা খায় সুরুয়া; তাহা যত পাৎলা হইবে ততই ভাল। তা' পাৎলা করিতে মাংসের আবশ্যক কি? একটু বেশী জল দিলেই ত পাৎলা হইয়া যায়।

হরেন। চৌবে ঠাকুরকে আমিও তাই বলিয়া দিয়াছি।

দারোগা। ভাল মনে করিয়া দিয়াছ। রাঁধিবার জন্য সেই নূতন বামুন কয়েদীটাকে পাঠাইয়াছ; বেটা রাঁধে ভাল। শুনিলাম সে নাকি একটা বড়লোকের বাড়ীতে রাঁধুনি বামুন ছিল;—অনেক দিন ছিল।

পোলাও, কাবাব, কোর্ম্মা, কোপ্তা—আঃ নাম করিতে করিতে জিভে জল আসিয়া গেল—এই সব ভাল ভাল রান্না রাঁধিত। তাহার পর বেটার দুর্ব্বুদ্ধি হইল; বাড়ীর গৃহিণীর গলার হার চুরি করিল। তাহার বিছানার বালিশের তলায় তাহা পাওয়া গেল। বাড়ীর কর্ত্তা তাহাকে একেবারে পুলিশের হাতে সঁপিয়া দিলেন। পুলিশ, মায় বালিশ ও হার—বেচারাকে সোপকরণ নৈবেদ্যের মত আদালতে নিবেদন করিয়া দিল। আদালত সাক্ষী সাবুত তলব করিয়া স্থির করিলেন, যে বেটা পুরাতন চোর। কেন না বাড়ীর একজন নবীনা চাকরাণী সাক্ষিণী হইয়া, আদালতের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এবং মৃদু হাসিয়া বলিল, যে সে পূর্ব্বে আর একবার গিন্নীর পায়ের চুটকি চুরি করিয়াছিল; তাহাও উহার ঘরে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু গিন্নী সেবার উহাকে মাপ করিয়াছিলেন; কিন্তু এবার বাবু জানিতে পারিয়া উহাকে চালান দিয়াছেন।

হরেন। একটা কথা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আজ জামাই বাবু আসিবেন, তাই ওয়ার্ডারকে বলিয়া বাগান হইতে বাসায় একটা ডালি পাঠাইয়াছি। পটল, বেগুন, কুমড়া, মুলা, মোচা, কাঁচকলা অম্বল রাঁধিবার জন্য বিলম্বী, কাঁচা তেতুল, আমরা এই সব পাঠাইয়াছি। আর মালী কয়েদীটাকে দিয়া, দুই গাছা বেলফুলের গোড়ে মালা গাঁথাইয়া, আর একটা ফুলের পাখা তৈরী করিয়া পাঠাইয়াছি।

দারোগা। আর এক কথা, আজ বাসায় যেন চারি সের দুধ যায়।

হরেন। বাড়ী হইতে খবর পাইয়া সে বন্দোবস্ত আমি আগেই করিয়াছি।

দারোগা। সবই হইল, কেবল ভাল চালের যোগাড় হইল না। দেখ, তুমি ত সব জান,—চালের কণ্ট্রাক্টারের সঙ্গে আমার কি কথা ছিল। সে আমাকে মাসে মাসে দেড়মণ হিসাবে বাঁকতুলসী চাল, আর আধমণ হিসাবে বাদশাভোগ আলোচাল দিবে। বাঁকতুলসীর বদলে বালাম চালাইতেছে; আর বাদশাভোগ এ পর্য্যন্ত এক দানা দেয় নাই। আচ্ছা দেখিব বাবাজীকে,—এবার নূতন কণ্ট্রাক্টের সময় দেখিয়া লইব।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বাদাম গাছে কাক নহে,
কদমগাছে কোকিল।

দারোগা বাবু কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার অভাব ও অভিযোগ বিষয়ক বাক্যপ্রবাহ সংযত করিয়া, কি এক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

অল্পক্ষণ মৌনী থাকিয়া, দারোগা বাবু বলিলেন— "দেখ হরেন, এই ছোকরা রাজদ্রোহীকে কোন 'সেলে' রাখিব আমি তাহাই ভাবিতেছিলাম। আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিতেছিলেন, যে অন্য আসামীদিগের সহিত যাহাতে ইহার কোন মতে দেখাসাক্ষাৎ না ঘটে, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপরওয়ালাদিগের কি?—তাঁহারা হুকুম দিয়া খালাস। কিন্তু সেই হুকুমটি তামিল করিতে কতটা বুদ্ধি বিবেচনা চালনা করার দরকার, তাহা আমরাই জানি।"

হরেন বলিল—"তিন নম্বর 'ব্লকে' রাখিলে ত বেশ হয়; সেখানে অপর রাজদ্রোহী আসামী আর কেহ নাই; আর সেখানে পাহারার বন্দোবস্তও ভাল।

দারোগা। সেখানে দোতলায় কি কোন 'সেল' খালি আছে?

হরেন। আমি জানি, একাত্তর নম্বর 'সেল' খালি আছে। অপর সেলও খালি থাকিতে পারে।

দারোগা। চল, আমরা এই রাজদ্রোহী আসামীকে সেই সেলে স্থাপিত করিয়া আসি।

এই বলিয়া দারোগা বাবু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হরেন উঠিল এবং উহাদের আদেশে আমিও উঠিলাম। আমরা অগ্রসর হইয়া, জেলখানার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে অতি পরিচ্ছন্ন তৃণাচ্ছাদিত ভূমির মধ্যে কয়েকটি পরিচ্ছন্ন ও

রক্তরজোময় সুন্দর রাস্তা ছিল, এবং কতকগুলি সুদৃশ্য ও সুগঠিত অট্টালিকা ছিল। সেই হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্র পার হইয়া, সেই রমণীয় পথ অতিক্রম করিয়া, সেই অট্টালিকাগুলির মধ্যে একটিতে আসিয়া আমরা পৌছিলাম। ঐ অট্টালিকাই তিন নম্বর ব্লক। আমরা তাহার দ্বিতলে উঠিলাম। সেখানে এক দীর্ঘ বারান্দার প্রান্তভাগে ছোট একটি কক্ষ ছিল। ঐ কক্ষ আমার বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইল।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দারোগা বাবু বলিলেন —"ওহে রাজদ্রোহী! তুমি এই স্থানে স্বচ্ছন্দে পনের দিন বাস করিবে, এবং নির্ভাবনায় নিয়মিত আহার করিয়া তোমার সুন্দর দেহের উন্নতি করিবে। কিন্তু দেখিও বাবাজী, এখানে যেন কোনও প্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত করিও না। আরে, কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস, যে তোমরা এখানে বন্দুক গোলাগুলি ইত্যাদি আমদানী করিয়া থাক; এ সকল কিছুই করিও না।"

হরেন। বাস্তবিক, সেই ঘটনায় আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। এই কড়াকড় পাহারা! ইহার মধ্যে লোকটা কি রকমে কোন পথ দিয়া রিভলভার আনিল? লোকটা নিশ্চয় কোন রকম যাদুবিদ্যা জানে।

দারোগা বাবু হরেনের কথার উত্তর না দিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিলেন—"দেখ, এই দক্ষিণদিকে একটা জানালা আছে; ঝুর ঝুর ফুর ফুর করে বেশ হাওয়া আসিবে; তুমি আরামে ঘুমাইবে। কিন্তু ঐ জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া যেন পলাইবার চেষ্টা করিও না; ওখান হইতে লাফাইলে তোমার সুন্দর শরীর চুরমার হইয়া যাইবে।"

আমি কারাগারে বাস করিতে লাগিলাম। সেখানে আহার বিহার ও শয়ন জন্য আমাকে কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। নিয়মিত স্বাস্থ্যকর আহার, প্রত্যহ নির্দ্ধারিত সময়ে বহির্ব্বিহার, নিত্য পরিষ্কৃত আবাস কক্ষ, সংস্কৃত শয্যা, কোন বিষয়েরই ত্রুটী ছিল না। ডাক্তার সাহেব আসিয়া হাত মুখ ও জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া, কাহারও পীড়া হইয়াছে কি না দেখিয়া যাইতেন; জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সর্ব্বদাই আমাদিগের তত্ত্ব লইতেন; এবং দারোগা বাবু সেই হরেনকে লইয়া মাঝে মাঝে গল্প শুনাইতে আসিতেন। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন অতিবাহিত হইল।

পাঁচ ছয়দিন পরে, একদিন দারোগাবাবু, হরেনকে সমভিব্যাহারী করিয়া আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"পুলিশ তোমাকে একজন পলাতক রাজদ্রোহী অনুমান করিয়া নিশ্চয়ই একটা ভুল করিয়াছে, ইহা আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি। কি বল তুমি?"

আমি। আমি বলি, যে পুলিশ সত্যই ভুল করিয়াছে।

দারোগা। বোধ হয় আদালতে তুমি প্রমাণাদি দিয়া এই ভুলটা সংশোধন করিতে পারিবে?

আমি। আমার বন্ধুদিগের সহায়তা পাইলে নিশ্চয় পারিব।

দারোগা। তাহা হইলে ভারি একটা মজা হইবে। এদিকে কি হইয়াছে, শুনিয়াছ?

আমি। এই কক্ষমধ্যে আপনারা আমাকে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়া গেলে, আমি আর কিছুই শুনিতে পাই না। কেবল ঐ বাদাম গাছের ডালে বসিয়া, একটা কাক ডাকে, তাহারই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই।

দারোগা। আজ সকালে, সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম। দেখিলাম যে যাহারা তোমার মত একজন মহাদুর্দ্দান্ত গোলাগুলি বারুদ বন্দুক কামান প্রস্তুতকারী অস্ত্রধারী পলাতক রাজদ্রোহীকে ধৃত করিয়া গুণপনা দেখাইয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। এটা ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া হইয়াছে। আদালতে যখন প্রমাণ হইবে যে তুমি মোটেই সে পলাতক আসামী নও, তখন কি মজাটাই হইবে! তখন ঐ পুরস্কারটা বাহাদুরীর পুরস্কার না হইয়া শুধু একটা ভুলের পুরস্কার হইয়া দাঁড়াইবে। যাক্, উপরওয়ালা যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন। আমাদের সে বিষয়ে কথা না

কহাই ভাল। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে দরকার কি বাপু! কিন্তু তাড়াতাড়ি পুরস্কারটা দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বেশ বিবেচনার কার্য্য করেন নাই। আদালতের নিষ্পত্তি দেখিয়া কায করিলে ভবিষ্যতে কোন গোলমালেরই আশঙ্কা থাকিত না।

কথা কহিতে কহিতে দারোগা বাবু ঘরের চারি দিক বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন; এবং মস্তক অবনত করিয়া, খট্টার তলদেশ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"না, গোলাগুলি বন্দুক কামান ধোঁয়া এখানে কিছুই নাই। ঐ সকল প্রস্তুত হইবার কারখানাও এ ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। ছাদ ফুটো করিয়া কিম্বা গরাদে ভাঙ্গিয়া এ ঘরে কেহ প্রবেশ করে নাই। চল হে হরেন, অপর ঘরগুলা দেখি। একটা কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বাগান থেকে একটা লাউ বাসায় পাঠাইয়া দিতে হইবে। মাছের কণ্ট্রাক্টার সের দুই গল্দা চিংড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল, তাই দিয়া লাউচিংড়ি রাঁধিতে হইবে।"

এই বলিয়া, কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া, বাক্যপ্রবাহে বারান্দা প্লাবিত করিয়া দারোগা বাবু সে দিনের মত প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু পরদিন বেলা দশটার পর, পুনরায় আমার কক্ষে একাকী দর্শন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার আহারাদির কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে না ত?"

'আপনি' সম্বোধনে আমি বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, হঠাৎ এ সৌজন্য কেন? যাহা হউক, আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। বলিলাম, "না মহাশয়, এখানে আমি কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করি না।"

দারোগা। কোনও রকম নয়?

আমি। না, একটুও নয়।

দারোগা। Edwards সাহেব যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে কি না, তাহা হইলেও আপনি ঐ উত্তর দিবেন?

আমি। অন্য উত্তর কেন দিব?

দারোগা। দেখিবেন, আমাকে ফ্যাসাদে ফেলিবেন না।

আমি। Edwards সাহেব কে?

দারোগা। বাবা! Edwards সাহেব কে জানেন না? তাহার নাম শুনেন নাই? বড় আশ্চর্য্য ত! তিনি হাইকোর্টের একজন খুব বড় ব্যারিষ্টার। তিনি আপনার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া, আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। বড় ভয়ানক ব্যারিষ্টার! হয়কে নয় করিতে পারেন! দেখিবেন মহাশয়, আমাকে ফ্যাসাদে ফেলিবেন না। তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবেন, এখানে আপনার কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে কি না। দেখিবেন আপনার কথায় আমি যেন কোন ফ্যাসাদে না পড়ি। আপনি এত বড় লোক, আগে তাহা জানিতাম না। তাহা জানিলে, রোগীদের দুধে একটু জল মিশাইয়া, আপনার জন্য আধসের দুধের বরাদ্দ করিয়া দিতাম।

আমি। আমি অতি দরিদ্র, ধনী নহি।

দারোগা। আর আমাকে ঠকাইতে পারিবেন না। শুনিলাম এডওয়ার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করিতে হইলে, প্রত্যহ এক হাজার কুড়ি টাকা হিসাবে ফী দিতে হয়। কুবেরের মত বড় লোক না হইলে এ কায কি অন্য কেহ পারে?

বুঝিলাম ইহা অপরাজিতার কার্য্য—সে তাহার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া আমাকে রক্ষা করিবে। এই নারী, ইহাকেই ত্যাগ করিবার জন্য আমি বাল্যকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম! অজ্ঞ বালক আমি, তখন বুঝি নাই যে, এই নারীকে ত্যাগ করিতে হইলে করুণাময়ের সমস্ত করুণা ত্যাগ করিতে হয়; ধরণীর সমস্ত মাধুর্য্য মুছিয়া ফেলিতে হয়!

আমাকে নীরব দেখিয়া দারোগা বাবু বলিলেন, "চলুন, আপনাকে নিয়ে আমার সেই আফিস ঘরে যাইতে হইবে।"

আমি দারোগা বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

আপিস কক্ষের দ্বারে পৌঁছিয়া, দারোগা আমার দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "দেখিবেন মহাশয়, কাচ্চা বাচ্চা লইয়া ঘর করি, যেন কোন ফ্যাসাদে না পড়ি।"

আমি বলিলাম—"আপনার কোন চিন্তা নাই। আমার দ্বারা আপনার কোনও প্রকার অনিষ্ট হইবেনা।"

দারোগা বলিলেন—"দেখুন, কাল সেই যে বাদাম গাছে কাক ডাকার কথা বলিতেছিলেন, সে কথাটা যেন সাহেবের কাছে বলিবেন না। সাহেব সে কথা শুনিলে, রাগিয়া যাইতে পারে। বলিবেন, যে আপনার আবাস কক্ষের দক্ষিণ দিকের জানালার কাছে কদম গাছে কোকিল ডাকে।"

আমি হাসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কোকিলের প্রতি

(Wordsworth)

হে প্রফুল্ল নবীন অতিথি!
শুনিয়াছি—শুনিতেছি মধুর সঙ্গীত তব,
শুনি প্রাণে উথলিছে প্রীতি।
কি বলিয়ে, বনপ্রিয়! সম্বোধি তোমারে, কহ;
বিহঙ্গ? অথবা শুধু সঞ্চারিণী গীতি?

শ্যাম শষ্পে করিয়া শয়ন
শুনি—ঘুম ধ্বনিময় ওই তব "কু-হু" স্বর
গ্রামে গ্রামে করিছে ভ্রমণ;
উচ্চ তার প্রতিধ্বনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন,
এই কাছে—ওই দূরে করে সঞ্চরণ।

যদি, ওরে, তব কলস্বর
আনে অধিত্যকা পাশে করোজ্জ্বল কুসুমিত
বসন্তের বার্ত্তা মনোহর,
আমারে শুনায় কিন্তু স্মৃতির স্বপন-পূর্ণ
অতীত কাহিনী কত অমল সুন্দর!

বসন্তের ওগো প্রিয়তম!
লহ এ প্রাণের প্রীতি; আজিও ভাবিতে নারি
তমু ধর তুমি বিহঙ্গম।
আজো মনে লয়—তুমি অশরীরী স্বর শুধু
অজ্ঞাত মরম যেন রহস্য বিষম।

আজিও ত ঢালিছ শ্রবণে
সেই কুহু-রব-সুধা— শুনি যাহা বাল্যে মম
চাহিতাম চকিত নয়নে,
কোথা উৎস আছে তার খুঁজিতাম পাতি পাতি
কুঞ্জে কুঞ্জে, তরু-শাখে, অসীম গগনে।

কোথা তুমি, করিতে সন্ধান,
বনে বনে মাঠে মাঠে ভ্রমিতাম কত যে রে,
কৌতুকের না ছিল বিরাম।
আছিলে তখন তুমি অ-দৃষ্ট অ-তৃপ্ত আশা
চির-আকাঙ্ক্ষিত শুধু প্রণয়-নিদান।

সেই মত এখনো আবার
শষ্পশয্যা 'পরে শুয়ে শুনিতে শুনিতে আজি
ও কুহক-সঙ্গীত তোমার,
সে স্বর্ণ-অতীত যেন আবার আসিল ফিরি,
সঙ্গে ল'য়ে সেই স্বপ্ন—সে বিস্মৃতি তার!

হে অমর বিহঙ্গ সুন্দর!
ওই তব সুরে সুরে ধরা যেন ধরে পুনঃ
সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন কলেবর—
প্রতি অঙ্গ হতে যার ক্ষরিছে আনন্দ ধার,
ঝরিছে অমিয়া কণ্ঠে তব কলস্বর!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

গিরিশচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মহাভারতের বঙ্গানুবাদক বিদ্যোৎসাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার "মুখার্জ্জির ম্যাগেজিন" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করিলে, গিরিশচন্দ্র সেই পত্রের একজন লেখক ও পৃষ্ঠপোষক হয়েন।

মুখার্জির ম্যাগেজিন

সেই পত্রে গিরিশচন্দ্র My first railway journey to Rajmahal (আমার রাজমহলে প্রথম রেলযাত্রা), এবং Omedwar (উমেদার) শীর্ষক দুইটি সন্দর্ভে তাঁহার হাস্য-রসাত্মক লিপি-কুশলতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঐ পত্র পাঁচ সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়। পঞ্চম সংখ্যায় গিরিশচন্দ্র তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মুখার্জি ম্যাগেজিন প্রচারের বন্ধ হইবার কারণ সেই জীবনকথা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে Bhowanipur Literary Society (ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি)তে উদার-হৃদয় বড়লাট লর্ড ক্যানিংএর রাজত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন তাহা স্বদেশীয় সুধীসমাজে বিশেষভাবে প্রশংসা লাভ করে। তৎপূর্ব্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দেশহিতৈষী কয়েকজন ভদ্র বঙ্গসন্তানের চেষ্টায় Calcutta Monthly Review

Calcutta Monthly Review

নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইলে, সেই পত্রে গিরিশচন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে ইংরাজ সমাজ যে জাতি-বিদ্বেষ ও জাতি-নির্য্যাতন নীতি অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাহার সুতীব্র ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপপূর্ণ 'প্রতিবাদ' করেন। সেই কারণে তাৎকালীন ইংরাজ সংবাদপত্র সম্পাদকগণ গিরিশচন্দ্রের উপর এরূপ জাতক্রোধ হইয়া উঠেন যে কেহ কেহ তাঁহাকে শারীরিক নির্য্যাতনের ভীতি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। অবশ্য গিরিশচন্দ্র সেই নীচ ভীতি প্রদর্শনে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে বেঙ্গলী পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বেঙ্গলীর অনুষ্ঠানপত্রে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, ঐ পত্র দরিদ্র ও নিঃসহায় প্রজাবর্গের মুখপত্রস্বরূপ হইবে, প্রজার

Bengalee

'মর্ম্মবেদনা' রাজাকে জানাইবে, রাজার 'শাসননীতি যথাযথভাবে প্রজাকে বুঝাইয়া দিবে এবং নির্ভয়ে ও সুস্পষ্ট ভাষায় সত্য ও সততার পক্ষ অবলম্বন করিবে। মরণান্তকাল পর্য্যন্ত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই গিরিশচন্দ্র বেঙ্গলীর পরিচালন করিয়াছিলেন। বেঙ্গলী প্রকাশিত হইলে প্রথম তিন বৎসর ব্যারিষ্টার-কুলতিলক ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাধীনে ঐ পত্রের জন্য সাপ্তাহিক সংবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পরে গিরিশচন্দ্রের সহায়তাতেই তিনি বোম্বাই সহরের কোনও পারশি ভদ্রলোক প্রদত্ত বৃত্তি লাভে ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়া আসিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ-সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র নৌকাযোগে দানাপুর, বক্সার, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া, বারাণসী দর্শন করিয়া আসেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি একবার রাজমহল অবধি ভ্রমণ করিয়া আসেন। তদ্ভিন্ন তিনি অপর কোনও দূরদেশে ভ্রমণ করিতে যাইতে পারেন নাই।

বারাণসী যাত্রা

সেই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দেই গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটীর বিভাগের মোকদ্দমায় লিপ্ত হয়েন। কাশীনাথের জ্যেষ্ঠ হরিশচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন

বলিয়া তিনি গিরিশকে পুত্রভাবে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করেন এবং তাঁহার বাটীর অংশ দানপত্রে লিখিয়া দেন। সেই সূত্রে গিরিশচন্দ্র তাঁহার সুবিশাল ভদ্রাসন বাটীর এক পঞ্চমাংশের অধিকারী হয়েন। তৎকালে কাশীনাথের পাঁচ পুত্র জীবিত ছিলেন।

বাটী বিভাগের মোকদ্দমা

কিন্তু গিরিশ একটি মাত্র কক্ষে থাকিতেন। তাঁহার কন্যার বিবাহ হওয়াতে আর একখানি শয়ন ঘরের বিশেষ অভাব হইয়াছিল। অথচ বাটীতে ব্যবহারের অতিরিক্ত ঘর থাকিতেও তাঁহার খুল্লতাত-পুত্রগণ তাঁহাকে আর একখানি ঘর দিতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া শেষে তিনি তাঁহার পিতার অনুমতিক্রমে বাটী বিভাগের জন্য আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র তাঁহার খুল্লতাত-পুত্রগণের প্রস্তাবে তাঁহাদের ভদ্রাসন বাটী বিভক্ত হইবে না এই মর্ম্মে একখানা দলিলে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সেই মোকদ্দমায় পরাস্ত হয়েন। সেই দীর্ঘস্থায়ী ব্যয়সাধ্য মোকদ্দমায় শুধু যে গিরিশচন্দ্রের অর্থহানি হয় তাহা নহে, পারিবারিক অশান্তিতে ও মোকদ্দমার উদ্বেগে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। গিরিশচন্দ্র আপীলে হারিয়া যাইবার বহুদিন পরে ঘটনাচক্রে অপর একজন ব্যক্তির চেষ্টায় সেই বাটী বিভক্ত হইবার আদেশ আদালত হইতেই হয়। কিন্তু বিধাতা গিরিশকে সেই সুযোগের ফলভোগ করিতে দেন নাই—তিনি তখন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার অংশের অধিকারী হয়েন।

বাটীবিভাগের মোকদ্দমার পরে খুল্লতাত পুত্রগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, তাঁহাদের সহিত একবাটীতে বাস করা অশান্তিকর হইবে ভাবিয়া গিরিশচন্দ্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বেলুড়ে তাঁহার স্বকৃত বাগানবাড়ীতে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সেই পুষ্পোদ্যানে পরিবেষ্টিত সুরম্য পল্লীভবনে আসিয়া, অবসরকালে তাঁহার প্রিয় উদ্যান-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া,

বেলুড়ে উদ্যান বাটিকায় বাস

মনের শান্তি ফিরিয়া পাইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বহু কষ্টে আরোগ্যলাভ করেন। সেই কঠিন পীড়ার সময় তাঁহার গুণগ্রাহী ও অকৃত্রিম বন্ধু, বহুবাজারের দত্তবংশীয় সুরেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার চিকিৎসার ও শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত অশেষ যত্ন লইয়াছিলেন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম এম্‌-ডি উপাধিপ্রাপ্ত ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে তাঁহার সুচিকিৎসা করিয়াছিলেন।

বেলুড়ে বাস করিবার সময় গিরিশচন্দ্র স্থানীয় বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করেন এবং নিজের স্বাস্থ্যের ও সময়ের ক্ষতি করিয়াও তিনি স্থানীয় জনসাধারণের উন্নতি-বিধানে তৎপর হয়েন। তিনি বেলুড়ের স্কুলের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের হিতার্থে একটী তর্কসভার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হাবড়ায় মিউনিসিপাল কমিশনার নিযুক্ত হইয়া তিনি স্থানীয় পথঘাটের উন্নতিকর বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার সেই সকল সৎকার্য্য স্মরণ করিয়া হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বাসভবনের পার্শ্বের পথটীর তাঁহার নামেই নামকরণ করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক হাবড়া গবর্ণমেণ্ট জিলাস্কুলের পরিচালক-সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়া তিনি ঐ স্কুলেরও উন্নতি বিধানে সহায়তা করেন।

বেলুড়ে গিরিশচন্দ্র রোড

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র হাবড়া ক্যানিং ইনষ্টিটিউট নামক সাহিত্য সভার সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হয়েন। এ সভায় তিনি "The Social and Domestic Life of the Hindoos" ও "The Rural Economy of Bengal" বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা করেন এবং ঐ সভায় তর্কবিতর্কে যোগদান করিতেন। ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, সিবিলিয়ান এচ্‌ এল হ্যারিসন, স্যার রিচার্ড টেম্পল, সার্ জন ফিয়ার, তাৎকালীন লর্ড বিশপ,

হাবড়া ক্যানিং সভা

পাদরী কে এস ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি মনীষিবর্গ সেই তর্কসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিচার বিতর্ক করিতেন। একবার জজ্ ফিয়ার সাহেব একটি বক্তৃতায় বাঙ্গালী স্ত্রীলোকগণের culture নাই, তাঁহারা নিতান্তই অজ্ঞ অশিক্ষিতা এই অভিমত প্রকাশ করিলে, গিরিশচন্দ্র সেই মন্তব্যের সুতীব্র ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেন। তিনি বুঝাইয়া দেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা না পাইলেও বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ গৃহে মহাভারত রামায়ণাদি পাঠে ও বয়োজ্যেষ্ঠাগণের আদর্শে ও মৌখিক উপদেশে অশিক্ষিতা থাকেন না, প্রত্যুত ভদ্ররমণীসুলভ শ্রীলতা ও সৌজন্যে তাঁহারা হীনা নহেন; মুসলমানদিগের অধীনে আসিয়া অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়া তাঁহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালেও কতকগুলি ইংরাজদিগের আচরণ দেখিয়া সেই প্রথা উঠিয়া যাওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় স্ব-সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়টে গিরিশচন্দ্রের সেই বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সমাজবিজ্ঞান সভা

কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের প্রস্তাবানুসারে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার অর্থনীতি ও বাণিজ্য শাখায় গিরিশচন্দ্র একজন আগ্রহবান্ সদস্য ছিলেন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেই সভায় তিনি Female occupations in Bengal বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা পরে ঐ সভা কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা

উত্তর পাড়া হিতকরী সভার গিরিশচন্দ্র সহকারী সভাপতি ছিলেন। ঐ সভায় তিনি "শিক্ষা" সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সভায় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর কর্ণেল ম্যালিসন সাহেব গিরিশচন্দ্রের উন্নত চরিত্রের যে সাধুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

Positivism

অধ্যাপক এস লব সাহেবের সহিত গিরিশচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। লব সাহেব Positivism সম্বন্ধে বেঙ্গলী পত্রে কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতেই বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে Positivism * সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হয় এবং অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই আলোচনায় যোগদান করেন। বেঙ্গলী পত্রে Positivism এর আলোচনা উপলক্ষেই অসামান্য প্রতিভাবান্ ও অকালে পরলোকগত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের মিত্রতা হয়।

রামদুলাল দের জীবনচরিত

লব সাহেব যখন হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন, সেই সময়ে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই অনুরোধে "রামদুলাল দের জীবনকথা" একটি সুচিন্তিত ও শ্রমসাধ্য প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া হুগলী কলেজে পাঠ করেন। সেই শিক্ষাপ্রদ জীবনচরিত পরে পুস্তকাকারে পরিবর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হইয়া রেভারেণ্ড লঙ কর্ণেল ম্যালিসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিকট অজস্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়। ঐতিহাসিক হুইলার সাহেব সেই জীবনচরিত হইতে এতদ্দেশীয় আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে কোনও কোনও অংশ স্বীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এবং

* A Brief View of Positivism নামক পুস্তকের ভূমিকায় অধ্যাপক লব্ লিখিয়াছেন :—"My contributions to his paper (the Bengalee) commenced during the life-time of the late lamented Editor Baboo Grish Chunder Ghose. This excellent man gave a ready welcome to the doctrines of Positivism, and would, I feel convinced, had he been spared, have become one of its most able, as he certainly would have been one of its most enthusiastic supporters. It was he who encouraged me to continue the work after I had commenced it; it was he who braved the hostility of the many adversaries who are prepared to rise in arms against a new creed which claims to be organic; to him belongs the chief credit of any gain which may have accrued to Positivism in consequence of its being advocated by the BENGALEE. He too first broached the idea of putting together the various articles thus contibuted, and forming them into a kind of Manual for the use of readers in this country, where the original treatises are not procurable."

কালীময় ঘটক গিরিশচন্দ্রের অনুমতিক্রমে ঐ জীবনকথা তৎপ্রণীত চরিতাষ্টক পুস্তকে বাঙ্গালায় প্রকাশিত করেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হইয়া বহুলোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করে এবং ঐ বৎসর ভীষণ ঝটিকায় অগণ্য দরিদ্র ব্যক্তি গৃহহারা হয়। সেই সকল দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে আশ্রয় পাইবার উপায় করিয়া দিবার জন্ত এবং নিরন্ন ব্যক্তিগণকে আহার দিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র বেঙ্গলী পত্রে অবিরত লেখনী চালনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ও ধনী সমাজকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করেন এবং নির্ভীকভাবে তিনি কর্তৃপক্ষগণের সে বিষয়ে ত্রুটী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ

আশ্বিনের ঝড়

সেই সময়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তৎকালে গিরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র হিন্দুসমাজের, প্রথামত অশৌচ নিয়ম যথাযথভাবে পালন করেন, সেই কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁহার ভগ্ন-স্বাস্থ্য অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব্বে যে সকল সভাসমিতির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গুলিতে যোগদান করিতে গিরিশচন্দ্রকে অবিরত শারীরিক ও মানসিক শ্রম স্বীকার করিতে হইত। আফিসের পোষাকেই তাঁহাকে কোনও কোনও দিন পনের ষোল ঘণ্টা থাকিতে হইত। হাবড়া মিউনিসিপাল সভায় কোনও কোনও দিন রাত্রি হইয়া যাইলে, পথের সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি রাত্রিতে বাটীতেই আসিতে পারিতেন না—স্থানীয় জনৈক বন্ধুর বাটীতে আহারাদি করিয়া সেইখানেই রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইতেন। কার্য্যের সুবিধা হইবে ভাবিয়া তিনি ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে বেঙ্গলীর মুদ্রাযন্ত্র বেলুড়ে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কাজের লাঘব না হইয়া বরং প্রুফ দেখা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়িয়া গিয়াছিল। পিতৃবিয়োগের পরে অতিরিক্ত শ্রমে গিরিশচন্দ্রের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা দিয়াছিল; তাঁহার মাথা ঘুরিত। ডাক্তার তাঁহাকে এককালীন বিশ্রাম লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মত কর্ম্মীর ভাগ্যে বিশ্রাম লাভ কঠিন। শেষে চিকিৎসার উপকার না পাইয়া তিনি কাটোয়া অবধি নৌকাযোগে সপরিবারে গিয়া সাংসারিক ও সামাজিক কর্ম্ম হইতে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম লইবেন স্থির করিলেন। গঙ্গার উভয় কূলের মনোরম দৃশ্য দর্শনে এবং শীকরবায়ু সেবনে সেই নৌকাযাত্রায় তাঁহার স্নায়বিক উত্তেজনার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সেই শান্তি অধিক দিন ভোগ করিতে দেন নাই। তাঁহার সন্তানগণের কাহারও এবং তাঁহার পালক পিতা হরিশচন্দ্রের জ্বর হওয়াতে তাঁহার কাটোয়া অবধি যাওয়া হইল না—তাঁহাদের সুচিকিৎসার জন্য গিরিশচন্দ্রকে কৃষ্ণনগর হইতেই ফিরিতে হইল। পথিমধ্যে শান্তিপুরে, ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত হরিশ্চন্দ্র গঙ্গালাভ করিলেন। বেলুড়ে ফিরিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের শাস্ত্রবিধিমত আদ্যশ্রাদ্ধ সমাধা করিলেন।

পিতৃবিয়োগ স্বাস্থ্যভঙ্গ

নৌকাযোগে কৃষ্ণনগর যাত্রা

সেই সময়ে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে একজন Under Secretary নিযুক্ত হইবে শুনিয়া, তাঁহার মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ বাবুর পরামর্শে গিরিশচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হইলেন। তাৎকালীন চীফ সেক্রেটারী তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাবে অনুমতি দেন নাই। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র তাঁহার শিক্ষাক্ষেত্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর নবগঠিত পরিচালন সমিতির সদস্য নিযুক্ত হয়েন। সেই নিয়োগের পূর্ব্বমাসে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। সেই শুভকর্ম্মের তিন মাসের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র সপ্তাহকাল টাইফয়েড জ্বরে ভুগিয়া, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সেই

মৃত্যু

মৃত্যুর শোকসংবাদ পাইয়া বেলুড়ের বালক বৃদ্ধ যুবা প্রায় সমস্ত লোকই তাঁহার দেহ-সৎকারস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অশেষ শ্রদ্ধার পরিচয় দেন।

গিরিশচন্দ্রের অকাল-মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে বঙ্গদেশে একটী শোকের বন্যা বহিয়াছিল। ইংরাজী ও দেশীয় প্রধান প্রধান সমস্ত সংবাদ পত্রাদি গিরিশ-চন্দ্রের গুণগান করিয়া, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে এই কথা ঘোষণা করে। পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলেন, "তিনি বহুগুণের আধার ছিলেন। তাঁহার তুল্য সাধু সদাশয় লোক সচরা-চর জন্মগ্রহণ করেন না। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্যা ছিল। তাঁহার মত সুলেখক পাওয়া ভার। তাঁহার লেখায় একটি বিশেষ গুণ এই ছিল, তিনি কোন পক্ষে পক্ষপাতী হইয়া স্বমত ব্যক্ত করিতেন না। তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিদ্বেষী হইয়া কখন কৃতঘ্নতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। যাহাতে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ হয়, তাঁহার সে অকপট চেষ্টা ছিল। অতএব এরূপ লোকের বিয়োগ যে হিন্দুসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-দিগের হৃদয়-শল্য হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।"

সংবাদপত্রাদিতে শোকপ্রকাশ

এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক মহাত্মা ভূদেব মুখো-পাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "এদেশে ইংরাজী লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যেরূপ ফল প্রসূত হইতেছে, তন্মধ্যে গিরিশ বাবু এরূপ ছিলেন যে তাঁহাকে হিন্দু এবং ইংরাজ উভয়েই আত্মগৌরবের স্থলস্বরূপে নিদর্শন করিতে পারিতেন। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু বঙ্গভূমির দুর্ভাগ্য—আমাদিগের মাতৃভূমি একটি প্রকৃত রত্ন হারা হই-লেন।"

বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের চরিত্রে কতকগুলি অনন্য-সাধারণ গুণ ছিল। তাঁহার চরিত্রে পুরুষোচিত নির্ভীক দৃঢ়তা ও শক্তি এবং রমণীসুলভ মৃদুতা ও কমনীয়তা একাধারে মিশ্রিত ছিল। তিনি যেমন ধনগর্ব্বিত প্রবলের নিকট মস্তক নত করিতে পারিতেন না, তেমনি সামান্য ভৃত্যেরও মনে আঘাত লাগিতে পারে এমন ব্যবহার তিনি কদাচ করিতেন না। এক দিকে তিনি যেমন অত্যাচারপীড়িত দুর্ব্বল প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্ভীকভাবে অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেন, অন্যায় অধর্ম্মের বিপক্ষে সুতীব্র ভাষা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিতার বা অহঙ্কার পরবশ হইয়া কখনও তাঁহার লেখনীর অপব্যবহার করিতেন না। তিনি সৌজন্য ও বিনয়ের আধার ছিলেন—তাঁহার প্রকৃতিতে কণামাত্র অহমিকা ছিল না—অমায়িক ও সরল ব্যবহারে তিনি সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।

স্বভাবমাধুর্য্য

তিনি প্রফুল্লস্বভাব এবং বিমল আমোদ-প্রিয় ও রহস্য-পটু ছিলেন। তিনি যখন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনাথ ঘোষের সহিত রাত্রিকালে বেঙ্গল রেকর্ডার আপিস হইতে সেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতে করিতে রহস্যালাপে তন্ময় হইয়া বাটীতে ফিরিতেন, তখন পথের লোক তাঁহাকে মাতাল বলিয়া ভ্রমে পড়িত—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি মাদকমাত্র বিরোধী—নিষ্কলঙ্কচরিত্র ছিলেন। তিনি এতই সরল ও অকপট ছিলেন যে সামান্য পরি-চয়েই বন্ধুতা স্থাপন করিতেন। পারিবারিক জীবনে তিনি স্নেহমমতার আধার ছিলেন; তাঁহার দাম্পত্য জীবন মধুময় ছিল—তাঁহার সহধর্ম্মিণী বঙ্গকুলস্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ সমূহে ভূষিতা ছিলেন। তাঁহার নীতিজ্ঞান অতি উচ্চ ছিল এবং তিনি বদান্য ছিলেন; তাঁহার সামান্য আয় হইতে যতদূর সাধ্য তিনি দরিদ্র ও নিঃসহায়দিগকে সাহায্য করিতেন; দুঃস্থ আত্মীয় ও অনাথা ভদ্রবংশীয়া বিধবাদিগকে মাসিক অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার বন্ধু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাস্তু-ভিটা ঋণের দায়ে নিলামে উঠিলে তিনি নিজ অর্থ দিয়া তাহা রক্ষা করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ঝটিকার বৎসর তিনি প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া বেলুড়ের নিকটবর্ত্তী

আশ্রয়হীন হতভাগ্যদিগকে স্বহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন।

আকৃতিতে গিরিশচন্দ্র "শালপ্রাংশু মহাভুজ"—বাঙ্গালী অপেক্ষা পাঞ্জাবীর সদৃশ ছিলেন। তিনি শক্তিমান ও পরিশ্রমী ছিলেন। সহজেই দশ মাইল পথ দুই ঘণ্টায় বেড়াইয়া আসিতে পারিতেন। তাঁহার আয়ত উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়ে ও শ্রীমান্ মুখে এমন একটা কমনীয় ভাব ছিল যে শিশুগণ অবধি নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। তাঁহার পোষাকে বাবুয়ানার লক্ষণ ছিল না—ঢিলা পায়জামা ও দীর্ঘ চাপকানের উপর চাদর পাকাইয়া বক্ষের উপর কোণাকুণি ভাবে ফেলিয়া তিনি সর্ব্বত্র যাইতেন। তাহাতেই তাঁহার বিশাল বরবপু সুন্দর মানাইত।

আকৃতি ও বেশভূষা

তাঁহার কোনওরূপ বিলাসিতা ছিল না। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি প্রত্যহ নিজের কর্ম্ম নিজেই করিতেন—ভৃত্যের সাহায্য লইতেন না। সখের মধ্যে ছিল তাঁহার উদ্যান চর্চা। বেলুড়ে তাঁহার শাক সবজি ও ফলের বাগান ছিল, কিন্তু ফুলের বাগানের উপরই তাঁহার অধিক যত্ন ছিল। তিনি গাছের ফুল তুলিতে ভালবাসিতেন না—গাছের ফুল গাছেই শোভা করিয়া থাকিত তাহাই তিনি দেখিতে ভালবাসিতেন।

উদ্যানসেবা

গিরিশচন্দ্রের ইংরাজী রচনার একটা স্বকীয়তা ছিল, যাহা দেখিয়া অপর কোনও বঙ্গীয় লেখকের ইংরাজী রচনার সহিত পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান হইত। সেই পার্থক্য এত সুস্পষ্ট ছিল, যেন তাঁহার প্রত্যেক রচনায় তাঁহার নামের ছাপ মারা থাকিত। গিরিশচন্দ্রের রচনার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বাল্যবন্ধু কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় বলিয়াছিলেন—

ইংরাজী রচনার বিশেষত্ব

"His style had a grace, an elegance and a force by which you could at once distinguish it from that of any of his countrymen. Run your eyes over the columns of the *Hindoo Patriot*, the *Rcorder* and the *Bengalee*, and the articles written by Grish Chunder would manifest themselves to you as if they were stamped with his own name. They are singularly idiomatic and, as such, have not yet been rivalled by the writings of any of his countrymen. But his writings were valued chiefly because they were original. He was an original thinker, and his thoughts were always brilliant and happy."

স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "A Great Indian but a Geographical Mistake" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"There is in his sentences the very rush of the mountain torrent, the hue of the setting sun and the breath of the sea breeze. One is sure to identify the writer with a lover of sport by flood and field, a young Nimrod, a Walton, a Waterton, or Mansfield Parkyns, above all, a Christopher North, *au fait* at angling, wrestling, boxing, lecturing, abusing, writing prose that passes into poetry, and poetry that passes into cloud and mist, so rich in fancy, so jubilant, so full of animal spirits, so full of broad farce—relieved by occasional touches of tenderness—were his writings."

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু-পেট্রিয়টে লিখিয়াছিলেন—

"Grish Chunder's *forte* lay in descript-

tive and sensational writing, brilliant, dashing, witty and sometimes humorous, falling on his victims like a sledge-hammer, or to be more precise, with the force of 84 pounder. *** His power of word-painting, of clothing the commonest ideas in gorgeous and glittering costume, radiant with flashes of wit and humour and occasionally of originality, was equally conspicuous in the pages of the *Calcutta Monthly Review* and the *Bengalee.*"

গিরিশচন্দ্র অবাধে ও দ্রুতভাবে রচনা করিতেন, এবং প্রথম উদ্যমে যাহা লিখিয়া যাইতেন তাহা কচিৎ পরিবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু কোনও সভাসমিতিতে পাঠ করিবার জন্য যে সকল প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা বিশেষ যত্ন সহকারে সংশোধন ও পরিমার্জ্জন করিতেন। তাঁহার যেমন দ্রুত রচনার শক্তি ছিল, তেমনি তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। এবং সে বক্তৃতা এত সুন্দর হইত যে, দেশীয় ও বিদেশীয় মহাপণ্ডিতগণও বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রের কোনও বংশধরের নিকট বলিয়াছিলেন, পঠদ্দশায় তিনি স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের মাদক নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠার দিন গিরিশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। সেই সভাস্থলে ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বাঙ্গলার তৎকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মিগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বক্তৃতাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন একবার Calcutta Review পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"The lecturer, Baboo Grish Chunder Ghose, the Editor of one of the best native papers in this part of India, is well known as a speaker for the brilliancy and fertility of his ideas which he gives utterance to with a fluency which many English speakers might well covet."

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ১৯শে নবেম্বর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ ও তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য কলিকাতা টাউনহলে একটি মহতী সভা হয়। সেই সভায় দেশের গণ্যমান্য যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, গিরিশচন্দ্র জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন— রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, (মহারাজা) নরেন্দ্রকৃষ্ণ, জজ দ্বারকানাথ মিত্র, Rev. J. Long, Rev. C. H. A. Dall, Dr. Salzar, H. Beverley, J. Wilson, S. Lobb, J. Mackenzie, J. Remfrey, (নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, ডাক্তার জগবন্ধু বসু, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ) (মহারাজা) দুর্গাচরণ লাহা, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্র দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ ঘোষ, ডাক্তার কানাইলাল দে, রমানাথ লাহা ইত্যাদি ইত্যাদি।

শোভাবাজার রাজবংশের রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, কৈলাসচন্দ্র বসু, অধ্যাপক লব সাহেব, নবাব আবদুল লতিফ, গোপালচন্দ্র দত্ত, জেমস উইলসন, সাহেব, বঙ্গসাহিত্যরথী চন্দ্রনাথ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সেই সভায় বক্তৃতা করেন। বেথুন সোসাইটীতে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্যানিং ইনষ্টিটিউটে লঙ্ সাহেব গিরিশচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করিয়া শোকসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

টাউনহলের সভায় নিযুক্ত সমিতি যে চাঁদা সংগ্রহ করেন, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষার স্থল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে গিরিশচন্দ্রের নামে একটি ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য তাহাই গিরিশচন্দ্রের মত দেশভক্ত কর্ম্মবীরের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তিনি যদি দরিদ্র

প্রজার পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তাঁহার ধনী প্রতিপক্ষের মন রাখিয়া চলিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার তৈলচিত্র টাউনহলে বিলম্বিত হইত, কিংবা তাঁহার মর্ম্মর পাষাণমূর্ত্তি কলিকাতার কোনও প্রকাণ্ড স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিত, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পক্ষে সেই স্মরণচিহ্ন যথেষ্ট হইত না। গিরিশচন্দ্র যে মহামন্ত্রের উপাসক ছিলেন, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের হিতে তাঁহার দেশভ্রাতৃগণ অবহিত হইয়া যথাশক্তি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিলে তবে তাঁহার সোণার বাঙ্লায় তাঁহার যোগ্য স্মৃতিমন্দির স্থায়ীভাবে স্থাপিত হইবে। আমরা যেন বিস্মৃত না হই, বঙ্গদেশে বর্ত্তমান যুগে যে স্বদেশীভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার লেখনীমুখে ও বক্তৃতার মুগ্ধকরী প্রতিভায় সেই শুভযোগের আবাহন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনিই দেশাত্মবোধ মন্ত্রের প্রথম পুরোহিত—বুঝি গিরিশচন্দ্রেরই পুণ্যবলে আজ তাঁহার বেঙ্গলী পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় রাজনীতিকগণের শীর্ষস্থানীয়।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

গান

(বাণী-বন্দনা)

সুর—ইমন কল্যাণ।

নমো বাণি, বীণাপাণি, জগত চিত্ত সম্মোহিনী !
নমো বাদ-সঙ্গীত মাতঃ, ভারতি, ভবতারিণী।
সৌরলোক গীত-চালিত,
দ্যুলোক ভূলোক গীত-মুখরিত,
ষড় ঋতু ষড়-রাগ-রঞ্জিত,
বন্দে চরণে বন্দিনী।

সুপ্ত স্মৃতি পুনর্জ্জীবিত,
শান্ত তৃপ্ত তাপিত চিত্ত,
সুখীজন সদা নন্দিত
তব সঙ্গীত ছন্দে।
প্রেম মুখর মুরলিরন্ধ্র,
সমরে ডমরু মরণ মন্ত্র
গীত আদি-বেদ-মন্ত্র
তব সঙ্গীত ছন্দে।
নমো ঈশ্বর নন্দিনী।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

হিমালয় দর্শনে

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।"
(কুমারসম্ভব)।

ভারতবর্ষের উত্তরভাগে হিমালয়। কত যুগ-যুগান্তর হইতে অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া, শুভ্র বিশাল দেহ লইয়া,কালের সর্ব্বগ্রাসিনী ধ্বংসশক্তিকে তুচ্ছ করিবার উদ্দেশ্যেই যেন অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ-মালা সগর্ব্বে উত্তোলন করিয়া, মহাযোগীর ন্যায় ঐ অটল "অচল" নিস্পন্দভাবে স্থিরাসনে অবস্থিত। এমন যোগী কি কখনও দেখিয়াছ! প্রভঞ্জনের প্রবল প্রতাপ তাঁহার নিকট পরাভূত। পর্জ্জন্যদেব অজস্র বারিধারা বর্ষণেও তাঁহার বিপুল বপু বিচলিত, বিশীর্ণ বা বিধ্বস্ত করিতে অসমর্থ। চঞ্চলা চপলা সতত চূড়ার চতুর্দ্দিকে চমকিত হইলেও তাঁহার ধ্যানস্তিমিত লোচনের উন্মীলন-সাধনে কদাপি সমর্থ হয় নাই। ইন্দ্রের অমোঘ বজ্রও তাঁহার সুদৃঢ় তুষার কিরীটের নিকট চিরদিনই ব্যর্থ-শক্তি। ধন্য যোগ-সাধনা! যোগী যদি হইতে হয়, তবে লোকে যেন এমন যোগীই হয়। এস, আজ আমরা এই যোগীর গুণের বিষয় আলোচনা করি।

ইঁহার পাদদেশে বিস্তীর্ণা ভারতভূমি। সেই ভারতভূমিকে বেষ্টন করিয়া বিশাল লবণাম্বুধি নীলাম্বরের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। প্রখর সৌরকর-সন্তাপে সেই নীল জলধির অম্বুকণা বাষ্পীভূত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। এই যোগী সেই সকলকে যেন যোগবলেই আকর্ষণ করিয়া অপূর্ব্ব মেঘমালার সৃষ্টি পূর্ব্বক আপনার উন্নত শীর্ষের শোভা সম্পাদন করিতেছেন; এবং লোকহিত-সাধনেচ্ছায় উহাকে সুবিমল বারিধারায় পরিণত করিতেছেন। আবার সেই অবিরল নির্ম্মল বারিধারা-নিচয় পরস্পর সংযোজিত করিয়া, আপনার অসীম স্নেহের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, কত নির্ঝর, কত নদ ও কত নদীর অতুল অমৃতস্রোত দূর দূরান্তরে প্রবাহিত করিয়া ভারতভূমিকে অভিসিক্তিত করিয়া দিতেছেন। তাই পান করিয়া আজ আমরা পরিতৃপ্ত, তাহারই সুধাবিন্দুসিক্ত হইয়া আজ আমাদের দেশ এত উর্ব্বর, এত সুন্দর লোচনাভিরাম পুষ্পমালায় পরিশোভিত, এত সুস্বাদু সুমিষ্ট ফলশস্যে পরিপূর্ণ। এই পর্ব্বতমালার অসংখ্য দুর্ভেদ্য শাখারাশি, সেই যোগীর বিশাল ও বলবান্ বাহুর ন্যায় বিস্তৃত হইয়া আমাদিগকে আবহমান কাল বিদেশীর অরাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এ সৌভাগ্য আর কাহারও কি ঘটে? তাই বলি, যোগীর অসীম দয়া; বাহিরে পাষাণ হইলেও ভিতরে কারুণ্যে পরিপূর্ণ।

আর এক যোগীর কথা আমাদের পুরাণে বর্ণিত আছে। তিনি সামান্য যোগী নহেন, যোগি-শ্রেষ্ঠ মহাদেব। তাঁহার রজতগিরিনিভ শুভ্র বিশাল কায়। নীলার্ণবে অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণের স্বেদবিন্দুসমুদ্ভূতা গঙ্গাকে তিনি মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি পঞ্চানন; তিনি ত্রিনেত্র, দিব্যদর্শী শ্মশানচারী ও অস্থিমালা-বিভূষিত। তিনি মৃত্যুঞ্জয়; কালকে উপেক্ষা করিয়া "মহাকাল" আখ্যা পাইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কে শ্যামা, শিরে মন্দাকিনী। শক্তিধর কার্ত্তিকেয় ও সিদ্ধিদাতা গণপতি তাঁহার পুত্র, সর্ব্ব-সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সর্ব্ববিদ্যা-বিধায়িনী সরস্বতী তাঁহার কন্যা। এই দেবতা আমাদের চির আরাধ্য! বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ কেবল ব্রাহ্মণবর্গের আচরণীয় হইলেও, ইঁহার পূজা সর্ব্ববর্ণের—এমন কি স্ত্রী শূদ্রেরও কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান আছে। তিনি "দেবদেব" আশুতোষ; তিনি "শিব শঙ্কর", চির নমস্য।

আজ আমরা যে হিমগিরিকে "যোগী" বলিয়া বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এস দেখি, সেই যোগীর সহিত এই যোগীশ্বর মহাদেবের কোন

তুলনা পাই কি না। ঐ "গিরীশের" চিরতুষারমণ্ডিত বিশাল বপুঃ, গিরিশের রজত-গিরিনিভ তনুর তুলনায় সদৃশ। নীল-সাগরের পয়ঃকণা, যখন নীলকলেবর নারায়ণের স্বেদলবের ন্যায় অম্বরে উত্থিত হইয়া, বৃষ্টিধারা রূপে ইহাঁর শীর্ষে পতিত হইয়া গঙ্গার উৎপত্তি, তখন ইনিও ত "গঙ্গাধর" (এবং "হিমালয়ে হরঃ শেতে, হরিঃ শেতে মহোদধৌ" এই কবিবাক্যও সার্থক।) ইঁহার পঞ্চশীর্ষ—কাশ্মীরে "নাংগা গিরি" রূপে, যুক্তপ্রদেশে "নন্দাদেবী" রূপে এবং নেপালে "কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলাগিরি ও গৌরীশঙ্কর" রূপে ঊর্দ্ধে বিরাজমান, তাই ইনি "পঞ্চানন"। ইহাঁর রবি-করোদ্ভাসিত অরুণবর্ণ মস্তক হইতে ধক্ ধক্ অগ্নিশিখা নিঃসৃত হইয়া শিব-ভালস্থিত প্রোদ্দীপ্ত বহ্নির অনুকরণ করিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে এই গিরিরাজের সুধা-ধবলিত তুঙ্গ শৃঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কে না বলিবে ইনিই সেই অপরূপ রূপ-সম্পন্ন "চন্দ্রশেখর"? রবি শশীর সহস্র কিরণ ইহাঁর মস্তকে সূর্দ্ধজের মত পতিত হইয়া, বিরূপাক্ষের পিঙ্গলবর্ণ কেশকলাপের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা একদা সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল। আজও কত শত জলজ জীবের অস্থি-কঙ্কাল তাহার নিদর্শন স্বরূপ ইহাতে অবস্থিতি করিতেছে। কত সহস্র সহস্র স্থলজ জলজ ও অন্তরীক্ষ-চারী জীবজন্তুর কঙ্কালে যাহার কলেবর সমাকীর্ণ, তাঁহার "অস্থিমালা বিভূষণ" আখ্যা কি নিরর্থক? যিনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের অতীত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া-ছেন, যিনি বর্ত্তমান যুগের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিতে-ছেন, এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলীও প্রত্যক্ষ করিবেন, তিনি কি ত্রিকালদর্শী (অতএব ত্রিনেত্র) নহেন? যিনি কালের সর্ব্বসংহারিণী শক্তি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া অনাদিকাল হইতে অচল অটল অবিকৃত ও নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কি "মৃত্যুঞ্জয়" যোগীশ্বর নহেন? ইঁহার মস্তকে কলনাদিনী গঙ্গা, বক্ষে "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" ভারতমাতা, শঙ্করের শিরস্থিতা মন্দাকিনী এবং উরস্থিতা শ্যামা মায়ের শোভা ধারণ কি করেন নাই? এই সদা তৃণ-শস্যে সুশোভিতা, সুস্বাদু ফলদ পাদপে পরিশোভিতা, "শ্যামা" ভারতমাতা অন্নপূর্ণারূপে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া দেশ বিদেশে অন্নদান করিতেছেন। আজিও পরদেশবাসিগণ ভারতের দুয়ারে দুয়ারে অন্নের ভিখারী। তাই মা আমাদের "রাজরাজেশ্বরী"। অগণিত "রত্নখনি" মাকে মণিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাই "যক্ষরাজ" কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী। ধনসম্পদে তাই তিনি "লক্ষ্মী প্রসবিনী"। যে বিশ্ববিশ্রুত মনীষিদিগের সাধনার ফলে বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির উৎপত্তি, সেই মহর্ষিগণের জননী বলিয়া মা জ্ঞান-সম্পদে "বাণী প্রসবিনী"। যাঁহার রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ সন্তানগণ ভুজবলে জগতে চিরাস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, সেই বীরপ্রসূতি বলিয়া মা আমার "শক্তিধর কার্ত্তিকেয়-জননী"। তাঁহার স্নেহের অঙ্কে লালিত পালিত হইলে লোকের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সুলভ ও সদায়ত্ত হইয়া পড়ে, তাই মা আমাদের "সিদ্ধিদাতৃ-গণেশ-জননী"। আমরা তাঁহার গর্ভে জন্মিয়া, তাঁহারই প্রদত্ত ফল শস্যাদি আহারে ও পীযূষধারারূপ স্তন্যপানে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত, তাই ভারতভূমি আমাদের "জননী"। তাঁহাকে উর্ব্বরতা বা প্রসবিনী শক্তি প্রদান করেন বলিয়া এবং অবিরত দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে সীমান্তে অবস্থান করিয়া শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করেন বলিয়াই ঐ হিমগিরি আমাদের "পিতা" (পা ধাতু পালনে), মঙ্গলদাতা বলিয়া "শিব" বা "শঙ্কর" (শম্ মঙ্গলম্), তেজঃপুঞ্জ কলেবর বলিয়া "মহাদেব" (দিব্ ধাতু দীপ্ত্যর্থে)। সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই; যে যুধিষ্ঠির নাই, সে হস্তিনা নাই; সে শ্রীকৃষ্ণ নাই, সে দ্বারাবতী নাই; সে বিক্রমাদিত্য নাই, সে উজ্জয়িনী নাই; আজ সে শিলাদিত্য শুদ্ধোধন, অশোক চন্দ্র-গুপ্ত সকলেই শ্মশানে বিলীন; কিন্তু তাঁহাদের ভগ্নস্তূপের প্রতি নির্নিমেষ নেত্রপাত করিয়া, সেই

পবনোদ্ভূত ভস্মরাশি অঙ্গে বিলেপন করিয়া ঐ গিরীশ্বর আজ যোগীশ্বরের ন্যায় শ্মশানে শব-সাধনা করিতেছেন। তাই তিনি "শ্মশানচারী ভূতভাবন"। এবং এই শ্যামলা জন্মভূমি আপনার সন্তানের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া, তিনি "নৃমুণ্ডমালিনী", "শ্মশানবাসিনী শ্যামা"। পুরাণ-বর্ণিত সেই "শিব শ্যামাকে" আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। তাঁহাদের অলৌকিক মাহাত্ম্য বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা করিবার ধীশক্তি বা সামর্থ্য আমাদের দুর্ব্বল দেহে নাই। ঈশ্বরের অনুকম্পায় বা স্বকীয় পুণ্য-প্রভাবে যদি কখনও সে সামর্থ্য আসে, স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আজ যাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা রূপে আপন সমক্ষে পাইয়াছি, তাঁহাকে উপেক্ষা করিবার অধিকার কোন্ সুবুদ্ধি বলে আমরা পাইতে পারি? যোগিগণ কেনই বা আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা ভারতমাতার আকৃতির অনুকরণে "ত্রিকোণ যন্ত্রে" শ্যামারাধনা করিয়া থাকেন,সে গূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা কে করিয়া দিবে? কোন্ কারণে উত্তরাস্য হইয়া পূজার্চ্চনার বিধিই বা ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত হইল, তাহার নিগূঢ় অর্থ বাগ্‌ধনী তার্কিকের নিকট ব্যাখ্যাত করিয়া লইয়াই বা লাভ কি? আমরা অল্পবিদ্যার অধিকারী। তাই এস, আজ আমরা শাস্ত্রানুযায়ী "উত্তরমুখী" হইয়াই, ঊর্দ্ধে ঐ পরম মঙ্গলময় জ্যোতিষ্মান শুভ্রকান্তি হিমগিরিকে লক্ষ্য করিয়া যুক্ত করে বলি—"জয় মহাদেবের জয়! জয় গঙ্গাধরের জয়!" এবং নিম্নে এই শ্যামলা রত্নগর্ভা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিনত মস্তকে বলি—"জয় অন্নদার জয়! জয় শ্যামা মায়ের জয়!" এ ভক্তি যাহার নাই, তাহার আবার কিসের সাধনা? যাহার আছে, সে ত অতুল সম্পদের অধিকারী। তাই বলি, এস, এই মায়ের পূজা করি, মায়ের পূজার জন্য গৃহ-মন্দির পবিত্র রাখি। সংসারে প্রবেশ করিয়া এরূপভাবে আপন আপন গৃহ সজ্জিত করিয়া রাখি, যেন উহা আমাদের শক্তি-সিদ্ধিদাতৃ ভ্রাতৃবর্গের লীলা-নিকেতন এবং লক্ষ্মী বিদ্যারূপিণী ভগিনীগণের প্রিয় বাসভূমি হয়। তাহা হইলেই আমাদের চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে। যেন শিক্ষা বা বুদ্ধির দোষে এমন ভাই ভগিনীদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত না করি। আমাদের আর অন্য সাধনার আবশ্যক হইবে না। তাই এস, উত্তরাস্য হইয়া আবার সম্মিলিত কণ্ঠে, স্ত্রীপুরুষ ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলে উচ্চারণ করি, "নমঃ শিবায়ৈ চ, নমঃ শিবায়।" এ শিবপূজার অধিকার শাস্ত্র সকলকেই দিয়াছেন।

শ্রীভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

চৈতন্যদেব

জননীর স্নেহডোর, প্রিয়-বাহুপাশ ছিন্ন করি,
লোকহিতব্রত নিয়ে, প্রিয়তম ইষ্টদেবে স্মরি
বাহিরিলে হে প্রেমিক, বিতরিয়া সঞ্জীবনী সুধা—
তাহারে করিতে তৃপ্ত জাগে যেই চিরন্তন ক্ষুধা
বিশ্বমানবের বুকে,—চির যুগ-যুগান্তর ধরি,
অন্তরের শূন্য পাত্র প্রেমামৃত দানে দিলে ভরি।
শুনালে আশ্বাস-বাণী দুঃখশোক দগ্ধ ধরাতলে,
মৃত হৃদে সঞ্জীবিত অভিনব মহামন্ত্র বলে।
প্রেমের সাধক ওগো, তুচ্ছ করি আঘাত বেদন,
আততায়ী পাপীজনে অকাতরে দিলে আলিঙ্গন,
আবেগ পরশে তব সুপ্ত হিয়া জাগরণ লভি
হেরিল মানসপটে নিত্য সত্য সুন্দরের ছবি।
উড়াইলে প্রেমবলে বিশ্বমাঝে বিজয় কেতন,
শ্রদ্ধার অঞ্জলি আজি মানব করিছে নিবেদন;
গেয়েছিলে মহাগীত কোন যুগে অতীতের তীরে,
পূজার দেবতা আজি জেগে আছ হৃদয় মন্দিরে।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

পরলোক

কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :—

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে,
এই বাদানুবাদ করে সকলে,
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে স্বর্গে তুই যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।

ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে একখানি আবরণ পড়িয়া আছে, তাহা ভেদ করিয়া পরপারে দৃষ্টি সঞ্চালন করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয় না, এজন্য পরলোকের বিষয় অমাবস্যার ঘন অন্ধকারময় তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে; এবং মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তাহাদের দশাতেই বা কি হয়, সে সম্বন্ধে চিরকালই নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে।

কাহারও মৃত্যু হইলে দেখি, তাহার দেহখানি মাত্র পড়িয়া আছে এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর, তাহার সেই বহুযত্ন-পালিত দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইতেছে। যে সেই দেহখানি অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছিল, সে কোন পথে কোথায় গেল, তাহার দশাতেই বা কি হইল, তাহা আমাদের জানিবার কোন উপায় হয় না। এজন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"মানুষ মরিলে আবার থাকে কি? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্তই শেষ হইয়া যায়।"

যদি কেহ বলে মানুষ মরিলে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যায়, সে তাহার মুখের কথা, তাহার অন্তরের কথা নয়। প্রাণের সঙ্গে যাহাকে ভালবাসিয়াছি, যাহাকে ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারি নাই, যাহার বিচ্ছেদে প্রাণ হুহু করিতেছে, যাহাকে হারাইয়া জীবনধারণ করা কষ্টকর বোধ হইতেছে, মৃত্যুর সঙ্গে তাহার সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, আর তাহাকে দেখিতে পাইব না, মনে প্রাণে একথা বলে না, এ কথা বিশ্বাস করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না।

মৃত্যুর পর ধ্বংস হইতে কেহই চায় না। যে মহা পাপী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বরং অনন্ত নরকে বাস করিতে চাহিবে; কিন্তু এককালে ধ্বংস হওয়ার কথা তাহার প্রাণ বলিবে না।

এই জড়জগতে কোন পদার্থই কখন এক কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। আমাদের দেহ জড়পদার্থে গঠিত, যে পঞ্চভূতে আমাদের এই দেহ গঠিত হইয়াছে, মৃত্যুর পর তাহা এক আকার হইতে অন্য আকার ধারণ করিয়া থাকে; ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্ব কখন লোপ হয় না।

জড় ও চৈতন্য লইয়া মানুষ; মৃত্যুর পর জড় পদার্থে গঠিত এই দেহের যদি ধ্বংস না হয়, তাহা হইলে কি চৈতন্যস্বরূপ আত্মার লোপ হইবে?

পরলোকে বিশ্বাস এবং মৃত্যুর পরও আমরা থাকিব, এই অবিনাশিত্বের ভাব আমাদের প্রকৃতিগত এবং সহজাত; পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে অসভ্য এবং সভ্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল জাতির মধ্যেই চলিয়া আসিতেছে; যদি বাস্তবিক পরলোক না থাকিত এবং আমাদের জীবাত্মা অমর না হইত, তাহা হইলে মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে এই বিশ্বাস এবং এই ভাব কখনও বদ্ধমূল হইয়া থাকিত না।

মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহলোক সদসৎ-নির্ব্বিশেষে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী; আজ হউক, কাল হউক, দশদিন পরে হউক, আমাদের কৃত কার্য্যের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু ইহলোকে সকল সময় কর্ম্মফল ভোগ হয়

না এজন্য মৃত্যুর পর এই সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় বলিয়া লোকে পরলোক মানিয়া থাকে।

বাস্তবিক যদি পরলোক না থাকে তাহা হইলে ধর্ম্ম থাকে না, অধর্ম্ম থাকে না, পাপ থাকে না, পুণ্যও থাকে না; যাহারা আজীবন সৎপথে থাকিয়া দুঃখের পর কেবল দুঃখভোগ করিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে, এবং যাহারা নানাপ্রকার অধর্ম্ম আচরণ করত জয় পতাকা উড়াইয়া যাইতেছে, তাহাদের কোন বিচার হয় না; যদি তাহা না হয়—আমরা ভাল করি বা মন্দ করি, পাপ করি বা পুণ্য করি, তজ্জন্য যদি আমাদের পুরস্কার বা তিরস্কার ভোগ করিতে না হয়, তাহা হইলে আর ইহাকে ভগবানের রাজ্য বলা যায় না এবং মনুষ্য-জীবনের কোন দায়িত্ব থাকে না।

জীবজগতে মানুষ তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির জন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই বৃত্তিগুলি ক্রমবিকাশশীল ও ক্রমোন্নতিশীল।

মানুষ যে পরমায়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে এই জন্মে তাহার এই বৃত্তিগুলির চরম উন্নতিসাধন করা কখন সম্ভব হয় না। কেহ ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়া, কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার জন্য যদি তাহার ফল শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সাধনা, তাহার তপস্যা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ভগবান আমাদের ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কতগুলি বৃত্তি দিয়াছেন এবং সেই বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিবার জন্য শক্তি ও প্রবৃত্তিও দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি সেই বৃত্তি অনুসারে কায করিবার জন্য আমাদের সময় না দেন, তাহা হইলে এ বৃত্তিগুলি দেওয়া অনর্থক হয়। এজন্যও মনে হয়, এখানে যে যাহা পারে করিয়া, বাকী কায শেষ করিবার জন্য তাহার পরলোক আছে।

এই স্থূল দেহখানির সাহায্যে আমরা ছদ্মবেশে কতই না দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকি; আমরা প্রতিনিয়ত কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যে সকল কুৎসিত ভাব মনে মনে পোষণ করিতেছি তাহা আমাদের এই দেহের ভিতর লুকান থাকে।

আমাদের শরীরে ধবল কুষ্ঠ প্রভৃতি কুৎসিত রোগ জন্মিলে বা কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটিলে আমরা পরিচ্ছদাদি পরিধান করত তাহা ঢাকিয়া রাখি, কিন্তু পরিচ্ছদ উন্মোচন করিলে যেমন সে রোগ বা অঙ্গহীনতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেরূপ মৃত্যু হইলে এই দেহখানি ছাড়িয়া যখন আমাদের মহাপ্রস্থান করিতে হয়, তখন আর আমাদের সে ছদ্মবেশ থাকে না; আমরা মনে মনে যে সকল ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছি, তাহা ফুটিয়া উঠিয়া, যে যে প্রকৃতির লোক তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মহানিদ্রায় নিদ্রিত হওয়ার পর পরলোকে যাইয়া যখন জাগরিত হই, তখন দেখি, আমাদের সে দেহ নাই, যে দেহ আমাদের পাপ তাপ লজ্জা ভয় কলঙ্ক লোকচক্ষুর অগোচরে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, তাহা কোথায় খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে; আমাদের ভাবময় একটি নূতন দেহ হইয়াছে এবং যে সকল বিষয় আমাদের মনের নিভৃতকক্ষে লুকান ছিল, ঈশ্বর ছাড়া যাহা কেহ কোনদিন দেখিতে পায় নাই, তাহার ছাপ আমাদের সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মৃত্যুর পর আমাদের বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না; এখানে আমরা যেমনটী ছিলাম, সেখানে যাইয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমরা তাহাই থাকি। আমাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, স্বভাব সংস্কার, বুদ্ধিবিবেচনা এখানে যেমন ছিল সেখানেও তাহাই থাকে। ভগবানে যাহাদের মতিগতি নাই, মৃত্যুর পর তাহার এই দেহের সৎকার করিলে কখন তাহার সদ্‌গতি হয় না এবং ভগবানের দিকে তাহার মতি যায় না; এ সংসারে যাহারা শারীরিক সুখের জন্য ব্যস্ত বা পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য উন্মত্ত, পরলোকে যাইয়া তাহাদের সে ব্যস্ততা বা সে উন্মত্ততা কখন দূর হয় না। পরলোকে যাইয়া তাহাদের হৃদয়ে দারুণ আকাঙ্ক্ষা মাত্র থাকে, কিন্তু স্থূল শরীর বা স্থূল ইন্দ্রিয়াদি না থাকায়

তাহাদের ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার কোন উপায় হয় না।

ইহলোক হইতে বিদায় হওয়ার পূর্ব্বে আমরা যেমন ছিলাম, বিদায় হইয়াও আমরা তাহাই থাকিব, একথা সকলে বিশ্বাস করিবে না; সাধারণের বিশ্বাস, পরলোকে স্বর্গ আছে এবং নরক আছে, মৃত্যু হইলে যমদূত আসিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট আমাদের লইয়া যায়—সেখানে চিত্রগুপ্ত খাতা খুলিয়া বসিয়া আছেন, তিনি আমাদের পাপপুণ্য লিখিয়া রাখিয়াছেন; ধর্ম্মরাজ সেই খাতা দেখিয়া বিচার করত কাহাকেও স্বর্গে পাঠাইয়া দেন, কাহারও জন্য বা নরকের অন্ধকারে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চিত্রগুপ্ত নামক কোন খাসমুন্সি ধর্ম্মরাজের থাকুন বা নাই থাকুন, মৃত্যুর দিনেই বিচার হইয়া স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তির ব্যবস্থা অন্য কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যে সমস্ত লোক দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে এমন পুণ্যবান্ কে, যাহার মনে কখন কোন পাপ-চিন্তার উদয় হয় নাই বা কোন রকম পাপ যাহাকে স্পর্শ করে নাই? পক্ষান্তরে এমন মহাপাপীই বা কে, যাহার মনে কখন কোন প্রকার দয়া দাক্ষিণ্যের ভাব উদয় হয় নাই বা যে ভুলিয়াও কখন ভগবানের নাম মুখে আনে নাই? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও নরকদর্শন করিতে হইয়াছিল। এ সংসারে অধিকাংশ লোকই পাপ পুণ্যে জড়িত। তাহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি ভগবানের কৃপা হইলে অবশ্য তাহার লঘুপাপ না ধরিয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন, এবং কোনও মহাপাপীর প্রতি ভগবানের অকৃপা হইলে তাহার যৎসামান্য পুণ্যভাগ গ্রহণ না করিয়া তাহাকে নরকে দিতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলসূত্র বিশ্বাস করিতে হইলে, ইহজীবনে আমরা যে যেমন কায করিতেছি, পরলোকে যাইয়া আমাদের সেই রকম কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, ইহাতে কাহারও প্রতি ভগবানের কৃপা বা অকৃপা হইতে পারে না, এবং হয় বলিয়াও আমরা বিশ্বাস করি না।

পরলোকে যাইয়া আমাদের কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী; এই কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যদি আমাদের স্বর্গে বা নরকে যাইতে হয়, তাহা হইলে পাপপুণ্যের ইতরবিশেষ ও তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি করিতে হয়,—তদ্ভিন্ন সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না।

পরলোকে স্বর্গ বা নরক বলিয়া বিশেষ কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই এবং বিধাতাও তাহা সৃষ্টি করেন নাই। আমরা আজীবন নিজের স্বর্গ বা নিজের নরক এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া নিজেই সৃষ্টি করিতেছি; এখানে যিনি যে রকম বীজ বপন করিবেন, পরলোকে যাইয়া তিনি তাহার ফল আহরণ করিয়া থাকিবেন। আমাদের জীবাত্মা এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে যে রকম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার স্বর্গ এবং তাহাই তাহার নরক। পরলোকে যাইয়া পুণ্যের ফলে আত্মপ্রসাদ জন্মিলে স্বর্গ ভোগ, এবং আত্মগ্লানি হইলে নরক ভোগ হয়। স্বর্গ বা নরক কোন স্থান-বিশেষের নাম না দিয়া, জীবের অবস্থা বিশেষের নাম দিলে তাহাই যেন সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

স্বর্গ বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকুক বা কোন অবস্থা-বিশেষের নাম হউক, তাহার উপযোগী হওয়া শ্রমসাধ্য এবং বহু সাধনা-সাপেক্ষ; বহুকাল ধরিয়া প্রাণপণ যত্নে এবং প্রাণপণ চেষ্টায় যদি তাহা লাভ করা যায়! তদ্ভিন্ন, ভগবানে যাহার মতিগতি নাই, মৃত্যুর পর তাহার মৃত দেহের সৎকার করিলে, আজীবন সে যে সকল মহাপাপ করিয়াছে তাহা মোচন হইয়া সে স্বর্গে যাইয়া উঠিবে ইহা সম্ভবপর নয়। বাস্তবিক আজীবন পাপকর্ম্মে রত থাকিয়া অন্তিমে মৃতদেহের সৎকার করিলে যদি জীবাত্মার সদ্গতি বা মুক্তি হয়, তাহা হইলে স্বর্গারোহণের পথ অতি সুগম ও সহজ দাঁড়ায়।

বহির্জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, সমস্তই

ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে অবিচলিত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; বীজ হইতে ক্রমে কতকালে মহীরুহটি তাহার বিশাল কায়া প্রাপ্ত হইয়াছে, ফুলটি কুঁড়ি হইতে ক্রমে বিকসিত হইতেছে, লতাটী অতি ধীরে কত দিনে তরুটিকে বেষ্টন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সকল জড়বস্তুর পরপর যে রকম পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার ভিতর শৃঙ্খলা আছে এবং দুর্লঙ্ঘনীয় নিয়মও আছে।

বহির্জ্জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের এই চরিত্র গঠিত হইতেছে। অতি শৈশবকাল হইতে আমাদের জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, এবং সেই সকল ঘটনা হইতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া আমাদের মনে যে জ্ঞান ও সংস্কার জন্মাইতেছে, তাহা হইতে আমাদের স্বভাব গড়িয়া উঠিতেছে। কে কোথায় বসিয়া কি ভাবে আমাদের স্বভাব গড়িতেছে তাহা আমরা জানি না, বুঝি না, এবং ধরিতেও পারি না। দীর্ঘকাল পরে নির্জ্জনে বসিয়া পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে তখন বুঝিতে পারি, আমরা কি ছিলাম, এবং কি হইয়াছি; অলক্ষিতে আমাদের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! আজীবন যে সকল সংস্কার জন্মিয়াছে এবং যে ভাবে আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের এই দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। মৃত্যুর পর আমাদের দেহের সৎকার করিলে জীবাত্মার সৎকার হয় না। যাহার যেমন স্বভাব, সেই স্বভাবে সে পরলোকে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং সেখানে কার্য্যের দ্বারা তাহাকে ইহলোকের কর্ম্মক্ষয় করিতে হয়। কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়।

কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কোন শা[illegible] বলেন, জলৌকা যেমন একটী তৃণ ধারণ করিয়া অন্য তৃণ ত্যাগ করে, সেইরূপ আমাদের জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য এই দেহ ত্যাগ করার পূর্ব্বে অন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকে।

কেহ অন্ধ, খঞ্জ, বা কুব্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে বা কাহারও শূল, কুষ্ঠ, প্রভৃতি মহাব্যাধি হইলে, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এই শাস্তি হইয়াছে বলিয়া লোকে তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এই জন্মে কেহ কোন অন্যায় বা অপরাধের কায করিলে রাজদ্বারে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়; চুরি করিলে বেত হয়, না হয় ফাটক হয়; চোর বেত খাইয়া বা ফাটক খাটিয়া তাহার চরিত্র সংশোধন করিতে পারে, সে আর কখন চুরি না করিতে পারে এবং চোরের শাস্তি দেখিয়া আর দশ জনে সাবধান হইতে পারে; কিন্তু আমি যে অন্ধ হইয়াছি বা আমার যে কুষ্ঠ হইয়াছে, কোন্ পাপে তাহা আমি জানি না;—পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আমার নাই। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত যে পাপে আমি বিকলাঙ্গ হইয়াছি বা আমার মহাব্যাধি জন্মিয়াছে, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত হয়ত এজন্মেও আমি সেই পাপই করিতেছি। আমার এই মহাব্যাধি যদি আমার পাপের শাস্তিজন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ শাস্তি হইতে আমার কি শিক্ষা হইল, এবং অপর দশজনেই বা কি শিক্ষা পাইল? কোন্ কার্য্যের কি ফল তাহা আমাদের জানিতে না দিয়া, আমাদের চক্ষু বাঁধিয়া ভগবান আমাদিগকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবেন ইহা বিশ্বাস করা যায় না। বাস্তবিক পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যদি আমাদের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিজন্মে পাপের বোঝা ভারি হইতেই থাকিবে; কর্ম্মক্ষয় হইয়া আমাদের উদ্ধার সাধন কখনই ঘটিবে না।

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকিলে, প্রথম যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই আদি জন্ম কোন্ জন্মের ফলে ভোগ করিয়াছিলাম? আমার কর্ম্মসূত্র যদি সেইবার প্রথম আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কিছুই না হউক, গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাই বা কেন করিলাম ইহা বুঝা যায় না।

হিন্দুরা পিতৃপুরুষদের তৃপ্তিসাধন উদ্দেশে মাসে

মাসে এবং বৎসরান্তে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন। জনসাধারণের বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণ অতিশয় তৃপ্তিবোধ করেন।

শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ তৃপ্তিলাভ করেন কি না, সে বিষয়ে যদি কাহারও মনে সন্দেহ হয় হউক, কিন্তু শ্রাদ্ধ তর্পণের উদ্দেশ্য যে অতি পবিত্র এবং অতি মহৎ, সে বিষয়ে কেহই আপত্তি করিতে পারেন না। যে তিথি নক্ষত্রে পিতা পিতামহগণ দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই তিথি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা হয়, ইহাতে যাঁহাদের প্রসাদে এই জীবন লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের জল পিণ্ড দান করিতে পারিলে নিজের মনেও আনন্দ হয়। কিন্তু জলৌকার মত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যদি সকল জীবাত্মাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আর তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকে না এবং শ্রাদ্ধ তর্পণের উদ্দেশ্যও সফল হয় না।

বৈদিক সংহিতায় পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহলোকের বাহিরে অসংখ্য লোক আছে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য দেহ গ্রহণ করার কথা যাহা উল্লেখ আছে তাহা পরলোকেই হইতেছে। অন্তরীক্ষে আমরা পিতা পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের সহিত, আমাদের পুত্র কলত্রাদির সহিত মৃত্যুর পর যে আবার মিলিত হইব, বৈদিক সংহিতায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ভৌতিক তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখাইয়াছি (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ) আমাদের এই স্থূল দেহের ভিতর একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে; মৃত্যুর পর জীবাত্মা সেই সূক্ষ্ম দেহে পরলোকে যাইয়া বাস করিয়া থাকে।

মৃত্যুর পর আমাদের আকৃতি থাকে, প্রকৃতি থাকে, স্মরণশক্তি থাকে, থাকে না কেবল এই স্থূল দেহখানি। কিন্তু মানুষ এই দেহখানি নয়। আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনকে যে ভালবাসি, ভক্তিশ্রদ্ধা করি, সে ভক্তিশ্রদ্ধা বা ভালবাসাও তাহার দেহের উপর নয়। তোমার পুত্রের হস্তপদাদি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রোগগ্রস্ত হইলে তাহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাহার সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনায়াসে ছেদন কর্ত্তন করিয়া দিবে; পুত্রের মৃত্যু হইলে তাহার দেহখানি পোড়াইয়া ফেলিবে, না হয় কবরস্থ করিবে। সেই জন্য বলিতেছি, তাহার দেহখানিকে তুমি ভালবাস না, বা তাহার জন্যও শোক দুঃখ কর না। যে সেই দেহখানি অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছিল, আমরা ভালবাসি বা ভক্তিশ্রদ্ধা করি সেই তাহাকে।

মানুষ মরিয়া গেলে আর তাহার সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে না ভাবিয়া আমরা মৃতব্যক্তিদের জন্য শোক দুঃখ করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি আসল মানুষ, তাঁহাকে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। আমরা যাহা দেখি তাহা মানুষের দেহ বা তাহার বাহিরের একখানি আবরণ মাত্র—কিন্তু এই আবরণকে মানুষ বলা যায় না; যিনি আসল মানুষ, তাঁহার সহিত আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় না। যদি কেহ কখন সূক্ষ্ম শরীরী কোন আসল মানুষকে দেখিতে পায়, তাহাকে ভূত বা অপদেবতা মনে করিয়া ভয় হয়; তাহার নিকটস্থ হইতে বা তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে কাহারও সাহস হয় না।

কেহ হয়ত বলিবেন, লোকে যে অপদেবতা দেখিয়া থাকে, সে তাহার ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতে সকল দেশে সভ্য এবং অসভ্য সকল জাতির লোকেই ভূত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। ভারতবাসিগণের সহিত ইউরোপ বা আমেরিকাবাসীদের যখন দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয় কিছুই ছিল না, তখনও এই সকল দেশের লোকে ভূতের নামে ভয় পাইয়াছে, এবং ভূত সম্বন্ধে একই ধরণের ও একই [illegible] বিশ্বাস এই সকল দেশে চলিয়া আসিয়াছে। ভূতের ভয় যদি বাস্তবিক চিত্তভ্রমই হয়, তাহা হইলে সমুদ্রের এক পার হইতে

অপর পার পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশে যুগপৎ ভূত সম্বন্ধে একই রকম বিশ্বাস উদ্ভূত হওয়া বড় কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ভূতের ভয় অলীক চিত্তবিভ্রম নয়; রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রম হয় সত্য, কিন্তু সে ভ্রম যাহার হয় তাহারই হয়—একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে ইহা কখন শুনা যায় না। কিন্তু এক সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি ভূত দেখিয়াছে; তাহার দৃষ্টান্ত "সূক্ষ্মদেহ" শীর্ষক প্রবন্ধ অনেক দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা দেখাইয়াছি—

(১) ভূত আছে, ভূতে উৎপাত করিতেছে, মানুষের উপর ভূতের আবির্ভাব হইতেছে।

(২) ভূতের অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অতীন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তি আছে এবং সেই শক্তির বলে তাহারা দেখাশুনা করিতেছে।

(৩) তাহার মনের ভাব আমাদের মনে চালনা করিতেছে।

(৪) আমাদের উপর তাহাদের প্রত্যাদেশ হইতেছে; সেই আদেশমত কায করিয়া লোক কঠিন কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে এবং কত বিপদ হইতে উদ্ধার হইতেছে।

(৫) ভূতের ইচ্ছা শক্তির বলে সে যে কোন আকার ধারণ করত আমাদের সহিত দেখা করিতেছে।

(৬) ভূতের ফটোগ্রাফ উঠিতেছে।

জীবাত্মার এই স্থূল দেহ পরিত্যাগ করার নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুর কথা মনে হইলে প্রাণের ভিতর যেন কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রতি রাত্রেই আমরা মরি, আবার প্রাতে বাঁচিয়া উঠি; রাত্রে যখন আমরা নিদ্রা যাই, সেই নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের জীবাত্মা এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করত সূক্ষ্ম শরীরে এবং লোক-চক্ষুর অগোচরে কত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ এবং পর-লোকে যাইয়া সূক্ষ্ম শরীরী জীবাত্মাগণের দর্শনলাভ করত পুনরায় এই জড় শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। জীবাত্মা যখন এই জড় শরীর হইতে বাহির হয়, তখন আমরা মৃতকল্পদেহে শয্যাশায়ী হইয়া থাকি এবং জীবাত্মা এই জড় শরীরে পুনঃ প্রবেশ করিলে তখন আবার আমরা জীবিত হইয়া উঠি। অতীন্দ্রিয় দর্শন এবং অতীন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তি প্রভাবে সূক্ষ্ম শরীরে আমরা যাহা দেখি বা শুনি, জাগরিত হইয়া আর তাহা আমাদের স্মরণ থাকে না; জাগরিত হইয়া মনে হয় যেন স্বপ্নে কোন অজানা দেশে গিয়াছি, সেখানে কত কি দেখিয়াছি, মৃতব্যক্তিগণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়াছি, তাহাদের মুখে কত কি শুনিয়াছি। নিদ্রিত অবস্থায় কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, জাগরিত হইয়া তাহা যেন মনে পড়ে না, ভাবিয়াও তাহা টানিয়া আনিতে পারি না, এজন্য নিদ্রিত অবস্থায় আমরা যাহা দেখি বা শুনি তাহা উদ্ধার করিতে না পারিয়া, স্বপ্ন দেখিয়া থাকিব ভাবিয়া সেই সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় যাহা দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহা সমস্তই স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের মধ্যে অনেক সত্য লুকায়িত আছে। আমাদের জীবাত্মা এই জড়দেহ পরিত্যাগ করত সূক্ষ্ম শরীরে বাহির হইয়া যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

আমরা জড়জগতের লোক—এজগতে জড় ভিন্ন কোন সূক্ষ্ম বস্তু আমাদের নয়নগোচর হয় না। এজন্য সূক্ষ্ম শরীরী জীবাত্মাগণকে আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার শক্তি আমাদের সকলেরই আছে; এই শক্তি অনুশীলন-সাপেক্ষ। যাঁহারা যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁহাদের এই শক্তিলাভ হইয়াছে। তাহাদের সহিত পরলোকগত ব্যক্তিগণের দেখা সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু তাঁহাদের সে কথা তোমার আমার বিশ্বাস হইবে না। কোন জন্মান্ধ ব্যক্তির নিকট এই জড়জগতের কথা বলিলে তাহার যেমন সেকথা বিশ্বাস হয় না, সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে আমরাও সেই প্রকার জন্মান্ধ। ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম বস্তু আমরা দেখিতে পাই না, এজন্য স্থূল জগতের অন্তরালে যে একটি সূক্ষ্ম জগৎ আছে এবং সে জগতে সূক্ষ্ম-শরীরী জীবাত্মাগণ বাস করিতেছে, সে সম্বন্ধে কোন কথা

আমরা ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু সহজ নিদ্রায়, বা যোগনিদ্রায়, অথবা যোগযুক্ত অবস্থায় এবং কখন কখন আমাদের যে Trance হয়, সে সময় আমাদের ভৌতিক চক্ষুর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং সে অবস্থায় আমাদের তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া পরলোকের বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন আমাদের উপর যখন কোন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়, তখন তাহার মুখে পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, এই সকল কথা বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু Sir Alfred Russel Wallace, Sir Oliver Lodge, Myers, Crooks প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সে কথা বলেন না, এবং ভূতের আবির্ভাব হইলে মিডিয়মের মুখ দিয়া যে সকল কথা বাহির হয় তাহা তাঁহার প্রলাপবাক্য বলিয়া উড়াইয়া দেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল, এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া এবং বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছে—

১। পরলোক আছে।

২। মৃত্যুর পর আত্মিকেরা সূক্ষ্মশরীরে সেখানে বাস করিতেছে।

৩। মানুষের উপর আত্মিকের আবির্ভাব হইতেছে।

মানুষ মরিয়া কোথায় যায় এবং তাহাদের দশাতেই বা কি হয়, দেবতা বা অপদেবতাগণই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মানুষ মরিয়া আপন আপন কর্ম্মদোষে ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণ মরিয়া যদি অপদেবতা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মনিষ্ঠ দয়া দাক্ষিণ্যগুণবিশিষ্ট সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিবেন ইহা সহজেই বুঝা যায়; এবং তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়।

হিন্দুরা পরলোকগত পূর্ব্ব পুরুষগণকে পিতৃদেবতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন এবং পরলোকে যাইয়া তাঁহারা সেখানে বাস করিতেছেন তাহার নাম পিতৃলোক দিয়াছেন। প্রত্যেক কার্য্যে অতি ভক্তির সহকারে তাঁহাদের আবাহন করতঃ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের পূজা করা হয়, এবং তাঁহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা হইয়া থাকে।

গ্রীস ও রোমে পিতৃদেবতাগণের তৃপ্তিসাধন জন্য নানাপ্রকার ক্রিয়াপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। চীনেরা পিতৃলোকের পূজা করিত এবং কোন কারণে তাঁহারা অসন্তুষ্ট না হন, এ জন্য সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকিত।

এই সকল আত্মিক দেবতা বা অপদেবতাগণের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ইহলোকে যেমন ছিল, পরলোকে যাইয়াও তাহাই থাকে। ইহলোকে যাহারা পরদ্বেষী ছিল, পরের অনিষ্ট করিয়া যাহারা আনন্দ পাইয়াছে, পরলোকে তাহাদের সে প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না; তাহারা সেখানে যাইয়াও অপদেবতা হইয়া পরের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষান্তরে যে সকল মহাপুরুষ পরহিত কামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা পরলোকে যাইয়াও অধঃপতিত জীবের উদ্ধার সাধনের জন্য যত্নপর হইয়া আছেন, এবং অদৃশ্য সহায় হইয়া সুযোগ পাইলেই আমাদের বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সময় সময় যে প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকি, তাহাও এই সকল পরম কারুণিক আত্মিক দেবতাগণের কার্য্য।

মৃত্যুকালে পরলোকগত আত্মীয়স্বজনগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের সূক্ষ্ম শরীর জীবাত্মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া থাকেন। আমি আমার কোন একজন বন্ধুর একটি পারিবারিক ঘটনার কথা এইখানে উল্লেখ করিতেছি :—

বন্ধুর মাতা অতি বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। শেষ বয়সে নানাপ্রকার রোগে তাঁহার শরীর অতিশয় জীর্ণ হইয়াছিল। তিনি ডাক্তারী ওষুধ সেবন করিতেন না। একজন স্বধর্ম্মানুরত বিজ্ঞ কবিরাজ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার রোগের কিছুমাত্র উপশম না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই সময় মা একদিন কাতর বাক্যে বলিলেন—তাঁর একান্ত ইচ্ছা নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু ভগবান কি তাহা করিবেন, তাঁহার ভাগ্যে কি তাহা ঘটিবে ?

মার এই কথা শুনিয়া বন্ধু প্রতিজ্ঞা করিলেন, সময় থাকিতে তিনি তাঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইবেন এবং তাঁহার মনের অভিলাষ যাহাতে পূর্ণ হয় তাহা তিনি নিশ্চয়ই করিবেন। এই কথার পর প্রায় ১৫ দিন অতীত হইয়াছে। বন্ধু প্রতি-রাত্রে আহারান্তে মাতার নিকট বসিয়া তাঁহার গায়ে পায়ে হাত বুলাইয়া তার পর যাইয়া শয়ন করিতেন এবং প্রাতে উঠিয়া, মা কেমন ছিলেন জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিরে আসিতেন। একদিন প্রাতে বন্ধু মা'র নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, কাল রাত্রে কেমন ছিলে ?"

মা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, মুখ ভার করিয়া অতি দুঃখিতভাবে বলিলেন—"তুমি যে আমাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইবে বলিয়াছিলে, সে কথা কি সত্য, না স্তোকবাক্যে আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছ ?"

বন্ধু উত্তর করিলেন, "কেন মা তুমি একথা বলিতেছ ? আমি নিশ্চয়ই তোমাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইব, তাহার কখন অন্যথা হইবে না।"

মা। তবে আর বিলম্ব করিও না, আমাকে যত শীঘ্র পার লইয়া যাও।

বন্ধু। কেন মা, আজ তুমি নবদ্বীপ যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলে ? কবিরাজ মহাশয় তোমার চিকিৎসা করিতেছেন, তোমার ব্যারাম আরোগ্য হইয়া যাইবে।

মা। নবদ্বীপে কি কবিরাজ নাই ? আমাকে না হয় সেখানে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইও; আরোগ্য হই, গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিব। কিন্তু এযাত্রা আমি কখনই রক্ষা পাইব না।

বন্ধু। হঠাৎ আজ তোমার এ ধারণা কেন হইল ?

মা। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন) কালরাত্রে আমার মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমার এই রোগের যন্ত্রণা দেখিয়া কত দুঃখ করিলেন, এবং আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, 'আর তুই এখানে থাকিস্ না আমার সঙ্গে আয়, আমি লইয়া যাই।'—আমিও তাঁর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়া গেলেন, আজ নয়, শীঘ্রই আমি আর একদিন আসিব, সেইদিন লইয়া যাইব।

মা একটি অলীক স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন, স্বপ্ন কখন সত্য হয় না, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বন্ধু যদিও মাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, তথাপি কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত অস্থির হইল। সেই দিনের উদ্যোগে পরদিন তিনি মাকে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। সেখানে যাইয়া কয়েক দিন গঙ্গাবাস করার পর, একদিন হঠাৎ মা অচেতন হইয়া পড়িলেন এবং সেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় শুনা গেল, তিনি তাঁহার স্বর্গীয়া গর্ভধারিণীর সহিত কথা বলিতেছেন। তাঁহার সে সময়ের সকল কথার অর্থ অবশ্য বুঝা যায় নাই; কিন্তু "মা তুমি এসেছ, তুমি বলিয়া গিয়াছ আমাকে সঙ্গে করিয়া তোমার কাছে লইয়া যাইবে, আজ আর আমাকে ফেলিয়া যাইও না, দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" এই কথাগুলি তাঁহার মুখে স্পষ্ট শুনা গিয়াছিল।

সে সময় অতীন্দ্রিয় দর্শন ও শ্রবণ শক্তি বিশিষ্ট কোন লোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই সেই মাকে দেখিতে পাইতেন এবং কন্যার কথার উত্তরে তিনি কি বলিয়াছিলেন তাহাও শুনিতে পাইতেন; উপস্থিত সকলে মনে করিলেন, মার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে, তিনি প্রলাপ বকিতেছেন।

অল্পক্ষণ পরে মা'র চৈতন্য হইলে, তিনি আমাদের বন্ধুকে নিকটে বসাইয়া এবং তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন—"আমার মা আমাকে লইতে আসিয়াছেন, আমি চলিলাম।"

মা চক্ষু মুদিত করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তাঁহার জীবাত্মা এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছে।

অন্তিমকালে মৃতব্যক্তিগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হওয়ার কথা অনেকই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বাক্য' ভিন্ন এ সকল কথার কোন মূল্য আছে, তাহা অনেকেই স্বীকার বা বিশ্বাস করিবেন না। এজন্য কেহ হয়ত বলিতে পারেন, এখানে এ প্রকার একটা অলীক বিষয়ের অবতারণা করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

এ জগতে সত্যই কি, মিথ্যাই বা কি, তাহা জানিতে বা বুঝিতে আমাদের কিছুই বাকী নাই, এ কথা বলিলে আমাদের অহঙ্কারের পরিচয় দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে সকল তথ্য একদিন অলীক ও অসার বলিয়া লোকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, কালে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। আমাদের জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধি অতি সঙ্কীর্ণ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উন্নতির দিকে কি রকম প্রসারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা এক যুগের বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত পরবর্ত্তী যুগের বিজ্ঞান শাস্ত্রের তুলনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যে সকল বিষয় অতি স্পর্দ্ধার সহিত অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন, কালে তাহা অন্যথা হইয়া সম্পূর্ণ অন্যভাবে দাঁড়াইয়াছে। যে সকল তথ্য পূর্ব্বে আমরা জানিতাম না বা মনে ধারণাও করিতে পারিতাম না, তাহা আমরা এক্ষণে জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি। এক্ষণে আমরা যাহা জানি না বা বুঝি না, বিজ্ঞান শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি দেখিয়া ভরসা হয়, কালে তাহা আমরা বুঝিব ও জানিব।

এক সময়ে পাশ্চাত্য দেশের খ্যাতনামা বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ঘোর জড়বাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা পরলোক মানিতেন না, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু ভৌতিক তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের মতিগতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং এই আলোচনার ফলে Psychometry নামক সে দেশে আধ্যাত্মিক বিষয়ে একটি নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিজ্ঞানের এখনও অতি শৈশব অবস্থা। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে, ইহারই মধ্যে ইহলোক হইতে পরলোকে যাওয়ার পথে যে একখানি দুর্ভেদ্য যবনিকা ছিল, তাহা যেন কথঞ্চিৎ অপসারিত হইয়া অপর পার হইতে আলোকরেখা দেখা দিয়াছে, এবং সুদূর হইতে স্বর্গের দুন্দুভি নিনাদ শুনা যাইতেছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জ্যোতিঃকণা

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণকাল। দর্জ্জিপাড়ায় একটি গলির মোড়ে একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল-গৃহের সম্মুখের বারান্দায় একটি যুবক খালি গায়ে পায়চারি করিতেছিল। যুবকের বয়স খুব বেশী হয়ত সাতাস আটাশ হইতে পারে। রং উজ্জ্বল গৌর; মুখাবয়ব অতি সুকুমার, দুই দিন কামান হয় নাই—কালো কালো দাড়ির খোঁচার জন্য মুখটি একটু কালো দেখাইতেছে; দেহের গঠনও বেশ দৃঢ় এবং এককালে যে ইনি বিশেষ প্রিয়দর্শন ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ সেই অঙ্গে বর্ত্তমান আছে। মস্তকের তরঙ্গায়িত দীর্ঘ কেশদাম তাঁহার সুরুচির ও সৌখিনতার আভাস দিতেছে। যুবকের নাম—রমাপতি সেন।

সেই গলি দিয়া ভাড়াটিয়া গাড়ীতে একটি ভদ্রলোক যাইতেছিলেন, হটাৎ রোয়াকের উপর রমাপতিকে দেখিয়া সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন—"কি হে? রমাপতি! এই ক্যোচম্যান রাখো, রাখো!"

রমাপতি রাস্তায় নামিয়া গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"শিবুদা! চিন্তেই পারিনি ভাই। যে মোটা হ'য়ে পড়েছ, আর ঐ চশমা টশমাগুলো—এগুলো ত ইস্কুলে দেখিনি কি-না।"

শিবু-দা কহিলেন—"এখনো কি আর ইস্কুলে পড়ি রে! তা হ্যাঁ ইস্কুল বৈ কি! এও এক রকম ইস্কুল ছাড়া কি! তবে যোগীন পণ্ডিতের কিলটা চড়টা নেই এই যা তফাৎ। তারপর রমা, তুই কি করছিস্—ডেপুটিগিরিটিরি পেলি নাকি? ঐ বাড়ী? বিয়ে করেছিস্?—ক'টি হল?"

রমাপতি হাসিয়া কহিল—"একটি মেয়ে।"

শিবেন্দ্রলাল পকেট হইতে চামড়ার সিগার কেস্‌টি বাহির করিয়া একটি নিজের অধরে চাপিয়া রমাপতিকে কহিলেন—"খাস টাস্?"

রমাপতি কহিল—"না, মাফ কর দাদা! অত সূক্ষ্ম দ্রব্য আমাদের জন্যে নয়।"

শিবেন্দ্রলাল কহিলেন—"সিগারেট্ খাস বুঝি? নেহাইৎ বালক।" বলিয়া তিনি দেশলাই জ্বালিয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

রমাপতি কলিল—"এস, একবার নামবে না?"

শিবেন্দ্রলাল বলিলেন—"না ভাই, আজ আর সময় হবে না। আর একদিন না হয় আস্‌ব। তুই বাড়ীতেই থাকিস্ ত? কি করিস্ তা ত বল্লি না?"

রমাপতি বলিল—"করা আর কি? এমন বিশেষ কিছুই না। তুমি?"

"দালালি"—বলিয়া শিবেন্দ্রলাল হাসিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কোচম্যানকে গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা দিল।

"তা' হ'লে এস একদিন"—বলিয়া রমাপতি বন্ধুর পানে চাহিল।"

"আসব। গুড্ নাইট্"—

রমাপতি ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"চা হয়েছে?"

"হয়েছে ত"—বলিয়া রমাপতির চার বছরের মেয়েটি আসিয়া বলিল—"তোমাল তা দে ছুলিয়ে গেল বাবা।"

রমাপতি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। এক হাতে এক পেয়ালা অন্য হাতে রেকাবিতে দুইটি ক্ষুদ্র রসগোল্লা লইয়া মেয়ের মা স্বপনা নিকটে আসিয়া বলিল—"দেখ-দেখি, চা-টা কি বড় ঠাণ্ডা হয়ে গেল? তা হলে একটু গরম করে দি।"—বলিয়া পেয়ালাটি স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

রমাপতি এক চুমুক পান করিয়া কহিল—"না, বেশী ঠাণ্ডা হয় নি। না, না—ও আর আমি খাব না। যে বেলায় আজ খাওয়া হয়েছে—কিদে হয়নি একটুও। চা খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। তুই যাবি নাকি, খুকী?"

"দাব, বাবা, দাব।"—বলিয়া খুকী নৃত্য করিয়া উঠিল।

স্বপনা স্কন্ধ হইতে ছিটের একটি ফ্রক লইয়া মেয়েকে পরাইতে পরাইতে কহিল—"ও কে এসেছিল গা?"

রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি দেখলে কোত্থেকে?"

স্বপনা হাসিয়া কহিল—"চা হয়ে গেলে কড়া নাড়লুম, তবু তুমি আসছ না দেখে আমি ঐ রান্নাঘরের জানেলাটার কাছে গিয়ে দেখলুম, একটা গাড়ীর উপর ভর দিয়ে তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ।"

রমাপতি কহিল—"ইস্কুলে পড়েছিলুম একসঙ্গে। এণ্ট্রেন্সও পাশ করতে পারে নি, ছেড়ে দিয়েছিল। এখন বোধ হয় বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, বল্লে দালালি করি। কিসের দালালি করে কে-জানে!"

স্বপনা হাসিয়া কহিল—"তা, বন্ধু কি বল্লেন?"

রমাপতি কহিল—"একদিন আসতে বল্লুম, সব খোঁজ খবর নেব।"

স্বপনা আর কিছুই বলিল না। মেয়েকে জামা

পরাইয়া, ভিজা গামছা দিয়া, তাহার মুখখানি মুছাইয়া কহিল—"বেশী রাত হয় না যেন। রাত হলে খুকী এসে আর খায় না—চিপ করে শুয়ে পড়ে।"

রমাপতি উত্তর দিল—"না, রাত হবে না। শীঘ্রই ফিরবে। তবে কি জান—হেদোর জলটা—

স্বপনা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল,—"দেখে কবিত্ব জেগে ওঠে না? মনের মধ্যে অমনি আলোক, পুলক, ঝলক, নোলক—রাশি রাশি মিল জমতে থাকে? না গো কবি মশাই, শীঘ্র করে ফিরো।"

রমাপতি কন্যার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। স্বপনা দ্বারটি বন্ধ করিয়া আসিতে আসিতে কহিল—

"এমনটি আর পড়ল না চোখে
'আমার যেমন আছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার দুই তিনদিন পরে সন্ধ্যাকালে একদিন শিবেন্দ্র আসিয়া ডাকিল—"রমা! রমাপতি আছ হে?"

রমাপতি ভিতরেই ছিল; মহাসমাদরে বন্ধুবরকে লইয়া দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে বসাইয়া কহিল, "তা হলে ভোল নি?"

শিবেন্দ্রলাল হাসিল; কহিল, "ভুলব কি রে? সেদিন বলে গেছি। কথা নিয়েই হল আমার কায, কথার এদিক ওদিক হলে কি আর রক্ষে আছে।"

এক মিনিট নীরব থাকিয়া রমাপতি বলিল—"কি করছ বল্লে?"

"দালালী!"

"দালালী! কিসের?"

"কিসের! হাঃ হাঃ—কথার রে, কথার।"

রমাপতি বুঝিতে পারিল না, বারবার এক প্রশ্ন করিতেও দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কে জানে, শিবুদা যদি বিরক্ত হইয়া বসে!

কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—"চা খাবে, শিবুদা?"

শিবেন্দ্র কহিল—"শ্রীহস্তের তৈরী? নিশ্চয়ই, নইলে অসম্মান করা হয় যে! বলে দে ভাই, এক পেয়ালা হোক্।"

রমাপতি বলিয়া আসিল, সঙ্গে তাহার কন্যাটিও আসিল।

শিবেন্দ্র কহিল—"এটি বুঝি তোর মেয়ে? এই বেটী—ইধার আও। আমি তোর জ্যেঠামশায় হই। ওর নাম কি?"

রমাপতি বলিল—"নাম ওর হেমনলিনী। আমি নলিনী বলেই ডাকি, ওর মা হেমা বলে।"

শিবেন্দ্র বলিলেন—"নলিনীই বেশ নাম। বেশ মেয়েটি। আয়"—

নলিনী শিবেন্দ্রলালের কোলে বসিল। শিবেন্দ্র পকেট হইতে দুইটি চক্‌চকে টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতেই রমাপতি বলিয়া উঠিল—"ও কি শিবুদা? না, ও ভালো নয়।"

"মন্দ কিসে! তুইও না হয় আমার মেয়েকে দেখিস্ টাকা দিয়ে!"

রমাপতি হাসিয়া কহিল—"কি ছেলে মেয়ে শিবুদা?"

শিবেন্দ্র বলিলেন—"কিছু নেই ভাই কিছু নেই—সব মারা গেছে—একেবারে ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন।"

রমাপতি বিষন্নমুখে কহিল—"স্ত্রী-ও মারা গেছে? আহা!"

শিবেন্দ্র কহিলেন—"নইলে আর বলছি কি! সব সব! কি আর করব? জন্ম মৃত্যু বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে।"

রমাপতি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শিবেন্দ্রলাল উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"দুঃখ করে আর কি হবে ভাই! 'জন্মিলে মরিতে হবে—অমর কে কোথা কবে'—এ হচ্ছে কবির উক্তি।"

দ্বারে কড়া নড়িয়া উঠিল। শিবেন্দ্র কহিল—"টেলিগ্রাফ্। বৌকে বল্ না চা-টা দিয়েই যাক্।"

রমাপতি হাসিয়া, উঠিয়া গিয়া চা লইয়া আসিল।

চা-খাইতে খাইতে শিবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"তোর সে লেখা-টেখার বাতিক গুলো এখনও আছে, না গেছে? সে সব খেয়াল ছেড়েছিস্?"

রমাপতি কহিল—"হাম ত ছোড়নে মাংতা, লেকেন্ কম্‌লি নেহি ছোড়তা!"

শিবেন্দ্র কহিলেন—"তা' হলে, চল্‌ছে? ক'খানা বই হ'ল?"

রমাপতি বলিল, "পাঁচখানা।"

"বিক্রি সিক্রি হয়?"

"তা' বছরে খান দশেক ক'রে' হয়।"

"বলিস্ কি! মোটে!"

"পাঁচ দশে পঞ্চাশখানা, মন্দ কি?"—বলিয়া সে একটু দুঃখের হাসি হাসিল।

শিবেন্দ্র বলিল—"বই বিক্রী হয় না কেন? এখন ত রেমো শেমোর বইও :কি বছরে এডিসন হয়। ঐ গোবর্দ্ধন দত্ত, বিশ বাইশখানা বই ছাপিয়ে ফেলেছে। এখন নাকি সে একজন বাঙ্গালা দেশের 'শক্তিমান সুলেখক।' সিল্কের কাপড়ে বাঁধা ঝক্‌ঝক্ করছে; কি ছাপা! তক্‌তক্ করছে! আর বিক্রীও হচ্ছে হু হু করে!"

রমাপতি চুপ করিয়া রহিল। শিবেন্দ্রলাল বলিতে লাগিল—"যেমন লেখা, তেমনি ভাবা—তেমনি সব—পড়তে পড়তে লাঠি নিয়ে তাড়া করতে ইচ্ছে করে।"

রমাপতি কহিল—"কিন্তু বিক্রী ত হচ্ছে।"

শিবেন্দ্র কহিলেন—"তা হচ্ছে বৈ কি! তোরা সব বইয়ের পেছনে অমুক বলিয়াছেন, তুমুক লিখিয়াছেন, এই সব ছাপাস ত! আর সে ওসব কিছুই করে না! শুধু লেখে—বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী সুলেখক শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দত্ত প্রণীত আবার একখানি লোমহর্ষক, মস্তক ঘূর্ণক, চমকপ্রদ উপন্যাস বাহির হইল। না পড়িলে জীবন বৃথা, জন্ম বৃথা। অবিলম্বে ক্রয় করুন, পাঠ করুন, উপহার দিন।"—বলিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতে লাগিল।

এই ভাগ্যবান সুলেখকের সৌভাগ্যের বিষয় রমাপতিও জ্ঞাত ছিল, কোন কথা না বলিয়া নীরবে রহিল।

শিবেন্দ্র বলিল—"তুই এক কায কর রমা। মাসিকপত্রের মলাটের নীচেই হাফ্ পেজ বিজ্ঞাপন দে, তা'তে লেখ—'বাহ্, বাহ্! উপন্যাস জগতে মায়াবীর আবির্ভাব। পড়িতে পড়িতে অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবেন। একবার নহে, বারবার পড়িতে হইবে। যাহা কখনও হয় নাই, তাহাই হইল!' এই সব লিখে একটা বিজ্ঞাপন দে—এই সামনের বোশেখ জ্যোষ্টিতেই দেখ্‌বি গাদাখানেক বিক্রী হয়ে গেছে। এই বেলা বিজ্ঞাপনটা বার করে দে—জানিস্ ত বই বিক্রীর Seasonই হল ঐ দু'তিন মাস। ঐ সময়ে যাদের না বিক্রী হ'ল, তাদের বড় একটা আর হল না। অগ্রহায়ণে, মাঘেও হয় দু'চারখানা বটে, তবে তার সংখ্যা খুবই কম।"

রমাপতি কহিল—"কেন বল ত?"

শিবেন্দ্র বলিল—"আঃ মূর্খ! তাই জানিস্ নে—বই ছাপাচ্ছিস্! বিয়ের উপহারেই ত বই বিক্রী! যে মাসে যত বিয়ে, সে মাসে তত কাট্‌তি। তা' বাঙ্গালা দেশে বোশেখ জ্যোষ্টিতেই বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় কি না!"

রমাপতি মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল—সত্য, তাহার বহিগুলির সামান্য যাহা বিক্রয়, সেও ঐ সময়েই হইয়া থাকে।

শিবেন্দ্রলাল কহিল—"অন্য সময়ও দু'চারখানা হয়, যেমন পূজোর সময়, নব বর্ষে, কিন্তু সে বেশী নয়। পূজার সময় প্রায়ই গন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি, তৈল, এসেন্স—আর নব-বর্ষে বিলিতি কার্ড ছবিগুলোই চলে। তাই কর, বুঝলি?"

দু'তিন মিনিট কি ভাবিয়া রমাপতি কহিল—"পারব না আমি। আমার বই বিক্রীর দরকার নেই। খাঁটী মিথ্যে কথাগুলো আমি বিজ্ঞাপনে চালাতে পারব না।"

শিবেন্দ্রলাল বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে

চাহিয়া কহিল—"কি বলছিস তুই? দোষটা কি?"

রমাপতি কহিল—"দোষ গুণ বিচার তর্কের কথা ছেড়ে দাও। ইস্কুল পালাতে তোমরা কোন দোষ দেখতে না, আমি দেখতুম; এও তেমনি।"

শিবেন্দ্রলাল হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এক রোগেই তোর চিরকালটা কাটলো।"

রমাপতিও একটুখানি হাসিল। নলিনী আসিয়া কহিল—"বাবা, মা বল্‌থে দেতামতা থাবে?"

"কি বলছিস্"—বলিয়া শিবেন্দ্র তাহার হাতটি ধরিয়া ফেলিল।

নলিনী বলিল—"তোমাকে নয়, আমাল বাবাকে বল্‌থে।"

রমাপতি অর্থ করিয়া দিল—কহিল—"ও জান্‌তে এসেছে, তুমি কি এখানে খাবে?"

শিবেন্দ্র কহিল—"না, আমার নেমন্তন্ন আছে। আমি এখনি উঠ্‌ব। যা নলিনী, তোল মাল কাথ্‌ থেকে দু'তো পান নিয়ে আয়।"

নলিনী চলিয়া গেলে শিবেন্দ্র বলিল—"কৈ, তোর বই একসেট্ আমাকে দিবি নে?"

"দেব বৈ কি! বস—আনছি"—বলিয়া রমাপতি উঠিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের ভিতর হইতে ফাউণ্টেন পেন্‌টি বাহির করিয়া লিখিতে লাগিল। তন্মধ্য হইতে একখানি তুলিয়া লইয়া শিবেন্দ্র পড়িল —"জ্যোতিঃকণা!—তা বউমার নাম কি জ্যোতির্ম্ময়ী না কি?"

"না, না—তার নাম হচ্ছে—স্বপনা। ঐ বইটিই আমার বড় যত্নের পরিশ্রমের বই। দু বছর হল বেরিয়েছে, খান পঁচিশ বিক্রী হয়েছে, ব্যস্।"

"হুঁ। তা হলে যাই আজ"—বলিয়া শিবেন্দ্রলাল উঠিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন হইতে রমাপতি চাকুরীর অন্বেষণে ঘুরিতেছে; সারা মধ্যাহ্ন ঘুরিয়া শ্রান্তদেহে বিশুষ্কবদনে যখন গৃহে ফিরিয়া আসে, স্বেদসিক্ত স্বামীকে পাখা করিতে করিতে স্বপনা প্রায়ই বলিয়া থাকে—"কায নেই তোমার চাকরী করে! এত কষ্ট করা কখনই অভ্যেস নেই, পারবে কেন? চেহারাটা কি রকম হয়ে যাচ্ছে, দেখেছ কি?"

সেদিনও এই কথা হইতেছিল, রমাপতি কহিল— "নইলে চলবে কেমন করে, স্বপনা?"

হায়! আজ যদি তাহার বহু যত্নের, পরিশ্রমের, আশা ও আকাঙ্ক্ষার অমূল্য নিধিগুলি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত! তাহার পাঁচখানি গ্রন্থ যদি পাঠক পাঠিকার স্নেহলাভে সমর্থ হইত! তাহা হইলে ত পুস্তকের আয় হইতেই সংসার চলিয়া যাইত; চাকরির উমেদারীতে ছুটাছুটি করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত না। সে দ্বিগুণ উৎসাহে বহু পুষ্প আহরণ করিয়া বঙ্গভারতীর চরণমূলে উপহার দিতে পারিত! কিছুই হইল না! তাহার বহুসাধনা ব্যর্থ হইয়া গেল; কল্পনা মিথ্যা হইয়া গেল; চেষ্টা সফল হইল না।

একদিন অপরাহ্ণে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, জনৈক পরিচিত পুস্তক বিক্রেতা হরেন্দ্র বাবু তাহাকে ডাকিয়া দোকানে বসাইয়া কহিল—"রমাপতি বাবু, আপনার খুব হিতৈষী বন্ধু কে আছেন বলুন ত?"

রমাপতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পুস্তকবিক্রেতা কহিল—"আপনার 'জ্যোতিঃকণার' সমালোচনা 'বিশ্বভুমি'তে বেরিয়েছে, দেখেছেন?"

রমাপতি দেখে নাই বলিলে সেই ব্যক্তি আলমারী হইতে একখণ্ড "বিশ্বভুমি" বাহির করিয়া রমাপতির সম্মুখে রাখিয়া কহিল—"আমার দোকানের বিজ্ঞাপন থাকে কি না; সেইটে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনার নামটা নজরে পড়ে গেল। ওঃ না, পড়ে দেখি এই কাণ্ড!"

রমাপতি কাগজটি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এক-মুহূর্ত্তে তাহার গৌর আনন একেবারে মসীলিপ্ত হইয়া গেল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

পুস্তক বিক্রেতা কহিল—"দেখ্‌লেন মশায়?

জ্যোতিঃকণা আমরাও ত পড়েছি, অবিশ্যি আমাদের বিদ্যেতে—খারাপ ত তাতে কিছুই পাই নি। আপনি কিছু বুঝতে পারলেন ?"

রমাপতি হাঁ না কিছুই বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া বসিয়া থাকিয়া ধরা গলায় কহিল—"হরেন বাবু, কাগজটা আমি একবার নিয়ে যাব ?—আবার আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

হরেন বাবু বলিলেন—"তা নিয়ে যান্। ফেরৎ আর দিতে হবে না—আমার কায হয়ে গেছে ওর।"

রমাপতি কোন গতিকে দোকানের বাহির হইয়া পড়িল। সেস্থান হইতে তাহার গৃহ অধিক দূর নহে, কিন্তু সেই অর্দ্ধঘণ্টার পথ চলিতে তাহার দেড় ঘণ্টা লাগিয়া গেল। পা যেন আর চলে না।

বাড়ীতে আসিয়া সে একেবারে শুইয়া পড়িল। স্বপনা আসিতেই অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"স্বপন, আমার কে এমন শত্রু বল্‌তে পার ?"—বলিয়া 'বিশ্ব-ভূমি' খানি তাহার সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিল।

স্বপনা পাঠ করিয়া কহিল—"এ কি! এ যে সব মিথ্যা!"

রমাপতি তাহার পানে চাহিয়া রহিল। স্বপনা বলিতে লাগিল—"ছিঃ ছিঃ—কে এমন শত্রুতা সাধলে! জ্যোতিঃকণার হিরণ্ময়ীর মত সচ্চরিত্রা আদর্শ বধূর সমালোচনা করলে কি না—কুলটার স্থান বঙ্গলক্ষ্মীর গৃহাঙ্গন নহে!"

রমাপতি উত্তেজিত-স্বরে কহিল—"পড়্‌ত স্বপনা, সবটা পড়।"

নলিনী এই স্বর শুনিয়া চমকিয়া মাতার পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইল।

স্বপনা পড়িল—

* * * "গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন। সেই ভরসায় আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করি। পরে বুঝিতেছি আমরা ভুল করিয়াছি। বঙ্গ-সাহিত্যে অনেক লেখকই এরূপ অশ্লীল গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু ছাপার অক্ষরে ছাপাইবার দুঃসাহস যে তাঁহাদের থাকিতে পারে তাহা আমাদের জানা ছিল না। গ্রন্থোক্ত নায়িকা হিরণ্ময়ী কোন্ গৃহস্থের বধূ? ছিঃ ছিঃ! বঙ্গদেশীয় মা জননী সকল! তোমরা কি হিরণ্ময়ীর মত নির্লজ্জ বিলাসিনী রমণীকে গৃহস্থ বধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে ?"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই স্বপনা কহিল—"হ্যাগা, এ-কি আমাদের 'জ্যোতিঃকণা'র সমালোচনা ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া রমাপতি বলিল—"তার পর, তার পর ?"

স্বপনা পড়িতে লাগিল—

"লেখক কি বঙ্গদেশে আদিরস পুনঃ প্রচলন মানসে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন? তাহা করিয়া থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কতকটা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। বোধ হয় 'জ্যোতিঃকণা' প্রাচীন কবির বিদ্যাসুন্দর-কেও হার মানাইয়াছে! অনেক স্থানে এমন বর্ণনা ও কথাবার্ত্তা আছে যাহা পড়িলে লজ্জায় পাঠকের মুখ কাণ লাল হইয়া উঠে। ধন্য রমাপতি বাবু! আপনিই ধন্য!"

স্বপনা বলিয়া উঠিল—"এ কি ?"—

"পড় পড়।"

"আমরা শুনিয়াছি বিলাতে বিখ্যাত 'লণ্ডন-রহস্যে'র প্রকাশ্যে ছাপা এবং প্রচার বন্ধ। আর পোড়া বাঙ্গালা দেশে এই ধরণের উপন্যাস বাহির হইতেছে, বিক্রয় হইতেছে, লোকে পাঠ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?"

স্বপনা পড়া বন্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীর মুখের দিকে সে চাহিতে পারিল না; তাহার নিজের বক্ষেই যথেষ্ট বেদনা লাগিয়াছিল। সে যে জ্যোতিঃকণা কতবার পাঠ করিয়াছে। আর—আর—তাহাকে সম্মুখে রাখিয়াই যে তাহার কবি-প্রণয়ী জ্যোতিঃকণার হিরণ্ময়ীকে আঁকিয়াছেন!

রমাপতি নির্জীবের মত স্খলিত স্বরে কহিল—"স্বপন, আমি ত কারো কোন অনিষ্ট করিনি, আমার এ সর্ব্বনাশ কে করলে ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রে রমাপতি নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিল। কক্ষে মৃদু আলোক ছিল, সেই আলোকেই দেখিল, স্বপনা গাঢ় নিদ্রামগ্না। তাহার আলুলায়িত কেশদামের নিম্নে "বিশ্বভূমি" খানি পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানি টানিয়া লইয়া, আলোক উচ্চ করিয়া পাঠ করিতে বসিল। তাহার প্রত্যেক অক্ষরটি জ্বলন্ত শলাকার মত তাহার বক্ষ ভেদ করিতেছিল।

কক্ষপ্রাচীর-বিলম্বিত ক্ষুদ্র কাঁচের আলমারি হইতে একখানি "জ্যোতিঃকণা" বাহির করিয়া লইল। স্নেহ-পরায়ণা জননী যেমন সন্তানের ত্রুটী লক্ষ্য করিতে পারেন না, রমাপতিও জ্যোতিঃকণার কোন দোষই দেখিতে পাইল না। বিশেষ করিয়া হিরন্ময়ী চরিত্রটিই সে পাঠ করিতে লাগিল। প্রথম দৃষ্টিতে কিছুই বাহির করিতে পারিল না। তাহার পর ভাবিল, তবে কি হিরণ্ময়ী বিবাহিত হইয়াও পঙ্কজকে যে বলিয়াছিল—"আমি তোমাকেই ভালবাসিয়াছি, আজীবন তোমাকেই বাসিব।"—ইহাতেই কি সমালোচক এত অপরাধ দেখিলেন? তাহাই হইবে বোধ হয়! কিন্তু এ নূতন ঘটনা নহে ত! আর বাস্তব জীবনেও এমন হইতে ঢের দেখা গিয়াছে। সমালোচক আর কি ত্রুটী পাই-লেন? আদিরস! কোথায়? আমি ত কিছুই দেখি-তেছি না! তবে নিজের রচনা বলিয়াই কি আমি দেখিতেছি না? তাহাই কি?

সে ভাবিতে লাগিল—বিশ্বভূমির মত কাগজ যখন ঐ তীব্র সমালোচনা করিয়াছে, তখন ত সারা দেশটায় টী টী পড়িয়া যাইবে। উহার বিস্তর গ্রাহক। কল্পনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে দেখিতে পাইল—কলিকাতার রাস্তায় তাহার পরিচিত ব্যক্তিরা তাহাকে দেখিয়া ঘৃণাভরে হাসিতেছে; পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকগণ রহস্য করিতেছে; মাসিকওয়ালারা তীব্র ব্যঙ্গ করিতেছে। "জ্যোতিঃকণা" হাজারের মধ্যে একশত মাত্র বাঁধাইয়া দোকানে দেওয়া হইয়াছিল, দোকানী কালই আসিয়া বইগুলি স্থানান্তরিত করিতে বলিবে। দপ্তরী আসিয়া বলিবে—মহাশয়, আমার স্থানাভাব দূর করুন।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার সেই কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে সাহিত্যচর্চ্চার প্রথম উন্মাদনার কথা মনে পড়িতে লাগিল। প্রথম তাহার রচিত একটি ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক পর্য্যন্ত অশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, নবীন লেখকদের মধ্যে এমন কবিত্বপূর্ণ রচনা আর দেখিতে পাওয়া যায় না।—তাহার সাহিত্য আরাধনার মূলে সে সব যে কি সঞ্জীবনী রসের কার্য্য করিয়াছিল, তাহা মনে করিয়াও সে পুলকবিহ্বল হইয়া পড়ে। এই সময়েই সে স্বপনাকে বিবাহ করিয়াছিল। স্বপনা আসিয়া তাহার কবিত্বের মূলে রস-সঞ্চার করিয়াছিল; সঙ্গীতের সঙ্গে বীণার মৃদু তানের মত তাহার নবীন জীবনকে গীতি মুখর করিয়া তুলিয়া-ছিল। রাত্রি জাগিয়া রমাপতি তাহাকে কত গল্প গাথা পড়িয়া শুনাইত; নিজের চেষ্টায় তাহাকে সাহিত্য-সঙ্গিনী করিয়া তুলিতে তাহার হাতের লেখাটি পর্য্যন্ত অনিন্দ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ইদানীং সে বলিয়া যাইত, স্বপনা লিখিত। তাহাদের দাম্পত্য-প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য সাধনা বাড়িয়া চলিতেছিল। নারী-চরিত্রের গম্ভীর সমস্যাগুলি স্বপনা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় মিশাইয়া এমন নিখুঁত করিয়া দিত যে রমাপতি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইত।—তাহারই ফলে যে এমন কলঙ্ক অর্জ্জন করিতে হইবে, সে কি তাহা স্বপ্নেও জানিত! আজ সেই প্রথম সাহিত্যিক নেশার অভিশপ্ত দিনটা মনে করিয়া সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দুই দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই দুইদিন যে তাহার কি করিয়া কাটিয়াছে তাহা রমাপতিই জানে; আর জানে স্বপনা। একজন ভুগি-তেছে, আর একজন নীরবে তাহার ব্যথা অনুভব

করিতেছে। নলিনী না পিতার কাছে না মাতার কাছে আদর যত্ন না পাইয়া দুদিনেই শুকাইয়া উঠিয়াছে।

সে দিন প্রাতে রমাপতি রাস্তার উপরেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে বসিয়াছিল। হাতে কোন কাযকর্ম্ম বা লেখা পড়া কিছুই নাই, চুপটি করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া ছিল। ফিরিওয়ালারা ঘন ঘন এ-ও তা চীৎকার করিয়া যাইতেছে; ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নিকটের একটা তেলেভাজার দোকান হইতে দুইহাতে শালপাতার ঠোঙ্গা চাপা দিয়া খাবার লইয়া যাইতেছে; ময়লা ফেলা গাড়ীর নগ্নকায় চালকগণ নিরন্তর অশ্বগুলিকে গালি দিতে দিতে চলিয়াছে—এই সবই সে দেখিতেছিল। হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া দ্বারটি খুলিতেই দেখিল—পুস্তকবিক্রেতা শম্ভু বাবু। তাঁহার হাতে একটি পুঁটুলি। শম্ভু বাবু "নমস্কার মশাই" বলিয়া সেইখানে উপবেশন করিলেন।

রমাপতি ক্ষুদ্র প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

শম্ভু বাবু পুঁটুলি খুলিতে খুলিতে কহিলেন—"আপনার জ্যোতিঃকণা কেতাব বাঁধান আছে কি?"

"না।"

"কিন্তু আজই যে আমার ছুশো খানি দরকার মশাই।"

"অত কি করবেন?"

"এই দেখুন"—বলিয়া শম্ভুবাবু একরাশি চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

রমাপতি দুই তিন খানি তুলিয়া দেখিল, সকলগুলিই অর্ডার—"জ্যোতিঃকণা"র অর্ডার। তখন সে অন্যগুলি দেখিতে লাগিল। দেখিল—কোন কোন অসহিষ্ণু গ্রাহিকা লিখিয়াছেন—"যদি আপনাদের দোকানে না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া অন্য দোকান হইতে এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া অতি অবশ্য ফেরৎ ডাকে ভিপি যোগে পাঠাইবেন।" একখানিতে লেখা আছে—"মহাশয়, চিঠির কাগজের উপর আমাদের ঠিকানা ছাপা রহিয়াছে, কিন্তু ঐ ঠিকানায় না পাঠাইয়া বহিখানি আমার স্কুলের ঠিকানায় (ধলাগড় এইচ ই স্কুল চতুর্থ শ্রেণী) ভি পি করিয়া পাঠাইবেন। ভিঃ পিঃ লইবার টাকা আমি প্রত্যহ পকেটে করিয়া স্কুলে যাইব।"

রমাপতি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। সে গণিয়া দেখিল, সর্ব্বশুদ্ধ সাতচল্লিশ খানি পত্র।

শম্ভু বাবু কহিলেন—"মশায়, আপনার প্রকাশকের কাছে কাল সন্ধেবেলা আমি বই চাইতে গিয়েছিলাম, তিনি বল্লেন পঁচাত্তর খানি বই ছিল, কাল বৈকালে সব শেষ হয়ে গেছে; তিনিও সকালেই বই নিতে আসবেন বলছিলেন।"

ঠিক এই সময়ে এক স্থূলকায় ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। ইনিই জগদ্বল্লভ বাবু—রমাপতির "জ্যোতিঃকণা"র প্রকাশক।

"এই যে শম্ভু বাবুও এসেছেন!"—বলিয়া তিনি বসিতেই রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর জগৎ বাবু।"

"একই খবর মশাই আর কি। দুশো বই যে আজই আমার চাই। তার কি ব্যবস্থা করবেন?"—বলিয়া তিনি স্কন্ধ বিলম্বিত চাদর দিয়া মুখের ও কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন।

রমাপতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহারা বলে কি! দুই বছরে যে পুস্তক পঁচিশ খানির অধিক বিক্রয় হয় নাই, আজ সেই গ্রন্থের জন্য দুই জন পুস্তক বিক্রেতা চারি শত কাপির জন্য উমেদার হইয়া বসিয়া আছে! সে ক্রমাগত একবার ইহার একবার উহার মুখেরই পানে চাহিতে লাগিল।

জগৎ বাবু একটু সুস্থ হইয়া কহিলেন, "আপনি যে ইতস্তত করছেন, তার কারণ আমি যে একটু আধটু বুঝতেখনা পেরেছি তা নয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণে আর সে সব কথা চলবে না। এটা ফুরুক, দ্বিতীয় সংস্করণে কমিশনটা না হয় কিছু কম করেই নেওয়া যাবে।"

রমাপতি ব্যস্ত হইয়া কহিল—"না না আমি তা, ভাবছি নে। তবে—"

জগৎ বাবু উৎকণ্ঠার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"তবে কি, তবে কি, রমাপতি বাবু চুপ করলেন কেন মশায়? বলি, আর কাউকে বইগুলি বিক্রী টিক্রি কর ফেলেছেন না কি?"

বাধা দিয়া রমাপতি কহিলেন—"না না, তাও নয় আর কাউকে বিক্রী করিনি। হাজার কপির ১৫০ বই বাঁধিয়ে ১০০ আপনাকে দিয়েছিলাম, ৫০ খানি আমি নিয়েছিলাম, বাকী ৮৫০ সমস্তই তাব্রেজ খা দপ্তরীর বাড়ীতে আছে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "তবে তাব্রেজের নামে একখানা চিঠি লিখে আমায় দিন; আমি এখনি গিয়ে তাকে ২০০ বই বাঁধতে অর্ডার দিয়ে আসি।"

রমাপতি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল।

শম্ভু বাবু বিমর্ষ মুখে কহিলেন—"ও রমাপতি বাবু, আমারও বই চাই যে!"

রমাপতি কহিল, "আপনার জন্যেও দুশো কপি বাঁধতে লিখে দিচ্চি।"—বলিয়া সে দুইখানি কাগজে কয়েক ছত্র লিখিয়া, জগৎ বাবু ও শম্ভু বাবুর হস্তে দিল।

জগৎ বাবু পত্রটি লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। রমাপতির দিকে ফিরিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আপনি সন্ধ্যেবেলা আমাদের ওদিকে বেড়াতে বেড়াতে একটিবার আসেন যদি, ত কিছু টাকা দিয়ে দেব এখন।"

তিনি প্রস্থান করিলেই শম্ভু বাবু কহিলেন—"দেখুন রমাপতি বাবু, ৮৫০ বই ছিল, তার ৪০০ গেল। আর ৪৫০ বই আর আছে বলছেন। যে রকম অর্ডারের ঠেলা—ওগুলো সমস্তই কেন আমায় বিক্রী করে ফেলুন না। আমি নগদ টাকা দিয়ে কিনে নেব—অবশ্য কমিশন বাদে। ও ৪৫০ বই আর কতদিন! বড় জোর মাসখানেক। দ্বিতীয় সংস্করণ এখনই প্রেসে দিতে হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে কপিরাইট যদি আমায় দেন, তাও আমি কিনে নিতে প্রস্তুত আছি। একটা দাম ঠিক করে বলুন।"

রমাপতির মাথা ঘুরিতেছিল। সে চুপ করিয়া রহিল। শম্ভুবাবু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন; সামান্য চাকুরী বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া এই ব্যবসায় করিতেছেন। কথাবার্ত্তা ধরণ ধারণ নেহাইৎ দোকানদারী গোছের নহে, বেশ মার্জ্জিত এবং ভাবটাও খোলাখুলি রকমের।

তাহাকে নীরব দেখিয়া শম্ভু বাবু কহিলেন—"আপনি উচিত মূল্য যা বলবেন, আমি তাতেই রাজী।"

রমাপতি বলিলেন—"আচ্ছা, এখন ঐ ২০০ বই আপনি নিয়ে যান ত, ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে পরে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রমাপতি ভিতরে আসিতেই স্বপনা কহিল—"হ্যাঁ গা, ব্যাপারটা কিছু বুঝলে?"

রমাপতি কহিল—"না। সব শুনেছ?"

স্বপনা বলিল—"শুনলুম বৈ কি! কিন্তু কিছু বুঝতে পারলুম না।"

রমাপতি কহিল—"ওরা বল্লে এক মাসেই ঐ বাকী সমস্ত বই কেটে যাবে। এখনি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রেসে দিতে হবে। আর ছাপাব কি?"

স্বপনা বলিল—"ছাপাবে না! বা রে! বেশ লোক ত তুমি!"

রমাপতি কহিল—"কিন্তু ভিতরে একটা কথা আছে যে স্বপন!"

স্বপনা বলিল—"কি বল না।"

রমাপতি বলিল—"শম্ভু বাবু যে চিঠিগুলো এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো পড়লুম। পড়তে পড়তে এই কথাটা আমার মনে হল।"—বলিয়া সে থামিল।

স্বপনা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল—"বল না।"

রমাপতি কহিল—"একটি ছেলে ফোর্থ ক্লাশে পড়ে, সে লিখছে—বইখানা আমার স্কুলের ঠিকানায়

পাঠাইবেন। বাড়ীর ঠিকানায় পাঠাইবেন না। এই দেখে আমার কি মনে হল জান?"

স্বপনা সপ্রশ্নদৃষ্টি তুলিয়া তাহার মুখের উপরে স্থাপিত করিল।

রমাপতি বলিল—"আমার মনে হচ্ছে—'বিশ্বভূমি'তে যে সমালোচনা বেরিয়েছে, তাই পড়েই লোকে বইখানার জন্যে মেতে উঠেছে। 'বিশ্বভূমি'তে যে লিখেছে কুৎসিৎ, অশ্লীল—পাছে বাড়ীর ঠিকানায় এলে গার্জেনরা অশ্লীল বই দেখতে পেয়ে তাকে সাজা দেয়, এই ভয়ে সে ইস্কুলের ঠিকানায় বই পাঠাতে লিখেছে।"

অর্দ্ধ মিনিট পরে স্বপনা কহিল—"এও হতে পারে। নাকি যে বাড়ীতে ছেলের নামে উপন্যাস এলে তার বাপ মা খুব সন্তুষ্ট হবেন না, তাই ও কথা লিখেছে?"

রমাপতি বলিল—"হ্যাঁ, তাও হতে পারে বটে।"

এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। স্বামী স্ত্রীতে ছাদে বসিয়া এই আলোচনাই হইতেছিল। নলিনী কতকগুলি মাটীর হাঁড়ি সরা লইয়া রন্ধনে ব্যাপৃতা। আজ তাহার কন্যার বিবাহ, পাঁচজনকে সে নিমন্ত্রণ করিয়াছে; পিতা মাতা ঝি চাকর ও তাহার প্রিয় 'মেনি'রও নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

সদর দরজার কড়া খট্‌ খট্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিতেই স্বপনা ঝিকে ডাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। অল্পক্ষণ পরেই "রমা কোথায় রে?" বলিতে বলিতে শিবেন্দ্রলাল আসিয়া দর্শন দিল। স্বপনা পাশের ঘরটিতে লুকাইয়া পড়িল।

রমাপতি কহিল—"এতদিন ছিলে কোথায় দাদা?"

শিবেন্দ্রলাল কহিল—"হুঁ, তোদের মত নিষ্কর্ম্মা ত নই আমরা! দস্তুরমত কায করতে হয়। কৈ, বৌমা কোথায় গেলেন?"

রমাপতি পাশের ঘরটির পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

শিবেন্দ্রলাল বলিল—"এইবার ত মুস্কিলে পড়েছ বৌমা! অভিমন্যুর মত ঢুকে ত পড়লে, বেরুবার পথ কৈ? অথচ একটু চা না খেলে তোমার ভাসুরটির প্রাণ ত বাঁচে না!"

ঘরের ভিতরে অলঙ্কার বাজিয়া উঠিল।

শিবেন্দ্র হাসিমুখে কহিল—"আজ বড় খাটুনিটাই হয়েছে রে! কাগজটা দু'দিন লেট হয়ে গেল—"

রমাপতি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কাগজ দাদা?"

শিবেন্দ্রলাল পকেট হইতে একরাশি কাগজ বাহির করিয়া সম্মুখে ফেলিতে ফেলিতে কহিল, "আর বলিস কেন ভাই? শেষের পাঁচটা ফর্ম্মা আজই অর্ডার না দিলে চলছে না। 'বিশ্বভূমি' কখনও লেট হয় না, 'উদাসী' 'মৃন্ময়ী' ওয়ালারা ভারি হাসবে।"

রমাপতি কয়েক মুহূর্ত্ত একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া বলিল—"তুমি লেখক নাকি?"

শিবেন্দ্র হাসিল, কহিল—"দূর—দালালী করি!"

কি রকম দালালী জানিতে চাহিলে, শিবেন্দ্র বুঝাইয়া দিল, "দালালীতে যেমন যেমন নিজের চাল চুলো না থাকলেও পরের জিনিষের উপর দর দাম, পছন্দ অপছন্দ করে বেড়ান যায়, আমারও তেমনি ভাঁড়ে মা ভবানী নিয়ে যা করা যায় তাই করছি। লেখকদের লেখা সংগ্রহ করে, যাচাই করে, পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্চি।"

রমাপতি মুখ তুলিয়া বলিল—"তা হলে তুমিই সম্পাদক?"

শিবেন্দ্র কহিল—"না, না, সহকারী সম্পাদক—আর, সমালোচক।"—বলিয়া হাঁকিল—"কৈ বৌমা, চা-টা হল কি?"

অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া স্বপনা ঘরের বাহিরে আসিল এবং শিবেন্দ্রলালের সম্মুখে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিয়া, নলিনীর হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

রমাপতি গম্ভীর মুখে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—"তা হলে জ্যোতিঃকণারও সমালোচনা তুমিই—"

শিবেন্দ্র বলিল—"জী হুজুর।—দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রেসে দিয়েছিস্? এডিশন ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে শুনলাম।"—বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

রমাপতি বলিল—"ঐ ফন্দী করেই তুমি বুঝি—"

শিবেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"চুপ্।"

রমাপতি শিবেন্দ্র নিক্ষিপ্ত কাগজরাশি তুলিয়া দেখিল সবগুলিই "বিশ্বভূমির" গেলিপ্রুফ্। কতকটা মাত্র সংশোধিত হইয়াছে।

শিবেন্দ্র কহিল—"প্রেসে বসেই খানিকটা দেখেছিলুম; তার পর ভাবলুম তোর এখানেই আসা যাক্—প্রুফ দেখাও হবে, বৌমার কাছে চা খাওয়াও হবে'খন। কালীকলম নিয়ে আয়।"

রমাপতি কালি কলম আনিতে গেল। তাহার মুখ এখনও অপ্রসন্ন রহিয়াছে। শিবেন্দ্র যে তাহার "জ্যোতিঃকণা"য় কেবল কুরুচি-ই দেখিয়েছে—এ ক্ষোভ তাহার কিছুতেই যাইবে না।

শিবেন্দ্র কহিল—"এতটা ত একলা হয়ে উঠবে না রমা, তুই একটা ফর্ম্মা দেখবি?"

"দাও"—বলিয়া রমাপতি হাত বাড়াইল।

শিবেন্দ্রলাল কয়েকখানি শীট তাহাকে দিয়া কহিল—"এইটে দেখ, আহার ঔষধ দুই-ই হবে।"

রমাপতি ভাঁজ খুলিয়াই দেখিল—জ্যোতিঃকণা!

বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত অর্ব্বাচীন সমালোচকের সমালোচনাটিকে কষাঘাত করিয়া "গৌরী" (লেখকের নাম :সম্ভবতঃ আসল নয়) লিখিতেছেন—সর্ব্বৈব মিথ্যা।

রমাপতি মুখ তুলিয়া কহিল—"দাদা, এ কি?"

শিবেন্দ্রলাল কহিল—"তোমার যা কায তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। এই মাত্র খবর নিয়ে আসছি—শুধু জ্যোতিঃকণার নয়, তোর সব উপন্যাসগুলিই হু হু করে বিক্রী হতে আরম্ভ হয়েছে। এখন আর মিথ্যা নিন্দাটাকে বাঁচিয়ে রেখে কি হবে? ওটার গলা টিপে মারাই মঙ্গল।"

রমাপতি চিন্তিত ভাবে কহিল—"অন্য বইগুলিকে ত গাল দাও নি, তবে সেগুলি কাটছে কেন?"

শিবেন্দ্র বলিল—"এটা আর বুঝতে পারলি নে! যারা বিশ্বভূমির সমালোচনা পড়ে জ্যোতিঃকণাকে অশ্লীল মনে করে' বইখানি কিনেছিল, তারা বই পড়ে সে বিষয়ে অবশ্য নিরাশ হয়েচে। কিন্তু দেশময় বইখানার প্রচার হয়ে পড়েছে। আগে লোকে কিনতো না, কেন না—তুই নূতন লেখক, তোর নাম কেউ জানে না—বিজ্ঞাপন নেই, সমালোচনা নেই, কোত্থেকে বিক্রী হবে! এখন জ্যোতিঃকণা পড়ে লোকে বুঝতে পারচে যে এ ব্যক্তি একজন শক্তিশালী উপন্যাস লেখক—তাই অন্য বইগুলিও পড়বার আকাঙ্ক্ষা তাদের হয়েছে।"

স্বপনা লুচি,আলুভাজা এবং চা লইয়া উভয়ের সম্মুখে সাজাইয়া দিল। শিবেন্দ্রলাল হাসিয়া বলিল—"বৌমা, কায ভাল করলে না মা। এই বিষমুখ লোকটিকে একটু বেশী করে মিষ্টি খাইয়ে দাও। ওঃ ওঃ ভুলে গেছলুম, চায়ে চিনিটা বোধ হয় যথেষ্টই দিয়েছ—" বলিয়া চুক্ করিয়া পেয়ালায় চুমুক দিল।

ঘোমটার ভিতরে স্বপনাও স্বামীর মুখপানে চাহিয়া হাস্য করিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চিত্রকরের ভারত ভ্রমণ

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, উইলিয়ম হজেস্ (William Hodges R. A.) নামক জনৈক ইংরাজ ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। নানা প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া, বিলাতে ফিরিয়া গিয়া, সংগৃহীত ও স্বহস্তাঙ্কিত অনেকগুলি চিত্রসহ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে Travels in India নামক একখানি গ্রন্থ তিনি প্রকাশিত করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম্ হইতে সেকালের কলিকাতার দৃশ্য

অদ্য আমরা সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে হজেস্ সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিয়দংশ ও কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থে প্রকাশ করিলাম।

হজেস্ সাহেব জাহাজে আসিয়া প্রথমে মান্দ্রাজ বন্দরে অবতরণ করেন। তখন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ। মান্দ্রাজ প্রদেশে একবৎসর ভ্রমণ করিয়া তিনি বঙ্গদেশ দর্শনাভিলাষী হন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জাহাজে উঠিয়া, মার্চ্চ মাসে তিনি কলিকাতা আসিয়া পৌঁছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমাদের জাহাজ কলিকাতার যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, গঙ্গার পরিসরও তত হ্রাস পাইতে লাগিল। গার্ডেন রীচে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তীরে উদ্যানবেষ্টিত বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা,—এইগুলি কলিকাতার ধনী লোকের আবাস-স্থান। আর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই, সমস্ত কলিকাতা নগরী দৃষ্টিপথে আসিল। পূর্ব্বদেশে বৃটিশ রাজ্যের এই রাজধানীতে, নদীর দক্ষিণ কূলে যে সুবিশাল দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহার মত এমন দুর্দ্ধর্ষ দুর্গ আর একটিও

মুসলমান রাজান্তঃপুরের আভ্যন্তরিক দৃশ্য
(এই চিত্রখানি হজেস এদেশে সংগ্রহ করিয়াছিলেন)

নাই। সম্মুখভাগে দুর্গের জলতোরণ (Wa er Gate)—যে এঞ্জিনিয়ার (Colonel Polier) ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার যথেষ্ট গুণপনা আছে বলিতে হইবে। দূর হইতে এস্‌প্লেনেড্‌ দেখা যায়—ইহা সুদৃশ্য অট্টালিকা সমূহে সমাকীর্ণ। নদীতে বৃহত্তম সমুদ্রপোত হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্ষুদ্রতম দেশীয় নৌকা যে কত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুর্গ হইতে কলিকাতা সহরের যে দৃশ্যটি দেখা যায়, আমি তাহা অঙ্কিত করিয়াছি।"

কলিকাতা সহরের বর্ণনা করিতে হজেস্ সাহেব ন—"ইহা দুর্গের পশ্চিম সীমা হইতে কাশী- অবধি বিস্তৃত, দৈর্ঘ্যে ইংরাজি সাড়ে চারি ণ। প্রস্থে স্থানে স্থানে খুবই সংকীর্ণ। চৌড়া, এস্‌প্লেনেডের দুই ধারে অট্টা- । বাড়ীগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেকটির চতুর্দ্দিকে অনেকখানি করিয়া খোলা জমি। এই নগরের প্রথম গৃহ, ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—ইহা নির্দ্দোষ স্থাপত্য শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ। যদিও ইহার পরে আরও অনেক বড় বড় বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে—সেগুলি শিল্পহিসাবে ইহার মত অত নির্দ্দোষ হয় নাই।"

কলিকাতায় কয়েক সপ্তাহ অবস্থানের পর, এপ্রিল মাসে সাহেব পাল্কীর ডাকে মুঙ্গের যাত্রা করেন। পথে বাঙ্গালার দৃশ্য দেখিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"সমস্ত বাঙ্গালা রাজ্যটি শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ, গো মহিষাদিও প্রচুর পরিমাণে দেখিলাম। গ্রামগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং লোকে পরিপূর্ণ।"

ক্রমে তিনি পলাশীতে পৌঁছিলেন। মুর্শিদাবাদ:

হইয়া জঙ্গিপুর ও সুতী (?) গ্রামের ভিতর দিয়া, উদয়নালা ও রাজমহলে পৌঁছিলেন। শাহ সুজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন —"রাজমহল হইতে দূরে রাজান্তঃপুরের ("জেনানা"র) ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। নানাচিত্রে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, সে সমস্তই যথার্থ। ভারতভ্রমণকালে আমি

মোসলেম-মহিলাগণ রাত্রিকালে পরলোকগত আত্মীয়গণের সমাধিস্থল প্রদীপালোকে উজ্জ্বলিত করিতেছেন

জেনানার একখানি পুরাতন চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিলিপি এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। মোগলরাজগণ যখন সমৃদ্ধির উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত, তখন সকল বড় বড় ওমরাহ তাঁহাদের জানানায় শত শত যুবতীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই স্ত্রীলোকগণ ভারতরাজ্যের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইত—কাশ্মীরী যুবতীগণই সমধিক আদরণীয়া ছিল, কারণ তাহারাই সৌন্দর্য্যে শীর্ষস্থানীয়া।"

রাজমহলের পর হইতে পান্থের পথটি গঙ্গার কূলবর্ত্তী। ক্রমে সাহেব "সক্রীগলি"তে পৌঁছিলেন। ইহাই বঙ্গ ও বিহারের সংযোগস্থল। এই "গলি" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই গিরিসঙ্কট (pass) হিন্দু ও মোগল রাজত্বের সময়, বিহার হইতে বঙ্গে প্রবেশ করিবার পথ ছিল। ইহা যে প্রাচীর ও তোরণের দ্বারা রক্ষিত ছিল তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। পাহাড়ের উপরে একজন মুসলমান পীরের ভগ্ন সমাধি আছে। স্থানটি দেখিতে বড় সুন্দর।"

কহলগাঁও (Colgong) পৌঁছিয়া সাহেব লিখিয়াছেন, "এখানকার দৃশ্য যেরূপ মনোরম, সেরূপ ভারতে আর কোথাও আমি দেখি নাই। ভূমিভাগ নতোন্নত ও বৃক্ষসমাকীর্ণ,—ঘাস গুলি সুন্দর, পাহাড়গুলি জঙ্গলে পরি-

ভাগলপুরের প্রবেশ পথে বটবৃক্ষ

পূর্ণ। গঙ্গা এখানে নদীর মত নহে—প্রায় সমুদ্রায়তন, সর্ব্বশুদ্ধ দৃশ্যটি পরম গম্ভীর ও নয়নাভিরাম।"

ক্রমে সাহেব ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সহরের বাহিরে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখিয়া তাহার চিত্র অঙ্কিত করিলেন।

ভাগলপুর হইতে মুঙ্গেরের পথে যাইতে যাইতে হজেস্ সাহেব লিখিয়াছেন—"রাস্তাগুলি ভাল; স্থানটি শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ; গ্রামগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পথের ধারে ধারে মুসলমানগণের সমাধি দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীকদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও তাঁহাদের কবর রাস্তার ধারে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। গরীব লোকের কবর—মাটীর ঢিপি মাত্র; ধনীর কবর, অট্টালিকা বিশেষ। মুসলমান রমণীগণের প্রথা, তাঁহারা সন্ধ্যাকালে আত্মীয়গণের কবরস্থান দর্শন করিতে যান। হাতে এক একটি জলন্ত প্রদীপ লইয়া তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গমন করেন; প্রত্যেক কবরে একটি করিয়া প্রদীপ রাখিয়া দেন। এইরূপ একটি দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমি একখানি চিত্র অঙ্কিত করিলাম।"

মুঙ্গের হইতে হজেস্ সাহেব নৌকাযোগে কলিকাতা ফিরিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণকে তুলনায় সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"হিন্দুগণ আশ্চর্য্যরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিজ নিজ গ্রামের পথগুলি তাহারা প্রত্যহ ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখে, জল ছিটায়। হিন্দু স্ত্রীলোকগণের সরলতা ও লজ্জাশীলতা, বিদেশীয়ের চক্ষে অত্যন্ত অভিনব বলিয়া বোধ হয়। সমান সমান পা ফেলিয়া, চোখ দুটী নীচু করিয়া, তাহারা পথে চলিয়া যায়, আশে পাশে কে আছে না আছে একবার ফিরিয়াও দেখে না। পুরুষরা অতিথেয়তার জন্য প্রসিদ্ধ—পান্থজনের অভাব ও অসুবিধা দূর করিতে তাহারা সর্ব্বদাই ব্যগ্র। সমস্ত পাল্কী-পথে, যেখানে যখন যাহাই

আমার আবশ্যক হইয়াছে,—চায়ের জন্য গরম জল, দুধ, ডিম—তাহারা তখনই যোগাইয়া দিয়াছে—কেহ কখনও বিলম্ব বা অসৌজন্য করে নাই। মুসলমানগণের চরিত্র ঠিক ইহার বিপরীত—অহঙ্কারী, অপমান করিতে উদ্যত, সহজেই চটিয়া যায় এবং মারমূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু আমি এই যাহা বলিলাম, ইহা

হলওয়েল (J. Z. Holwell)

নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সম্বন্ধেই বলিলাম; কারণ, মুসলমান ভদ্রলোকেরা ভদ্রতার আদর্শ বলিলেই হয়।"

কলিকাতায় ফিরিবার কিছু দিন পরেই উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করিবার হজেস্ সাহেবের ভারি সুবিধা হইয়া গেল। গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস্ সাহেব ঐ প্রদেশগুলি পরিদর্শন করিতে যাইতেছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হজেস্ সাহেবকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে গভর্ণর জেনারেলের নৌ-বাহিনী গঙ্গাবক্ষে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিল। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ইঁহারা কাশীতে পৌঁছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই রাজা চৈতসিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়—হজেস্ এ ব্যাপারের কিয়দংশের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। *

* চৈত্‌সিংহের বিদ্রোহ সম্বন্ধে হজেস্ সাহেব এই গ্রন্থে

সতীদাহের আয়োজন

বিদ্রোহ শান্তির পর হজেস্ সাহেব একটী সতীদাহ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। নিম্নে আমরা সেই বর্ণনার অনুবাদ প্রদান করিলাম।

"কাশীতে যখন আমি চিত্রাদি অঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন একদিন সংবাদ পাইলাম, গঙ্গাতীরে একটি সতীদাহ হইবে। ইহাতে আমার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হিন্দুগণ—যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে অত্যন্ত ভালমানুষ ও কোমলপ্রাণ বলিয়া বিখ্যাত—তাহারা যে এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ইহা আমি বহু গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম এবং লোকমুখেও শুনিয়াছিলাম। হলওয়েল সাহেব, তাঁহার "Historical events relative to India" নামক গ্রন্থে ১৭৪২খৃঃঅঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে কাশীমবাজারে একটি সতীদাহের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সে মেয়েটির বয়স তখন ১৭।১৮ বৎসর মাত্র। তাহার দুইটি ছেলে, একটি মেয়ে হইয়াছিল—বড়টির বয়স ৪ বৎসর। চিতাস্থানে পৌঁছিয়াও মেয়েটির আত্মীয়স্বজন সকলেই এ ব্যাপার হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। জীবন্তে পুড়িয়া মরা যে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সকলেই বুঝাইতে চেষ্টা করিল। মেয়েটি ইহার মৌখিক কোনও উত্তর না দিয়া, নিজের একটি অঙ্গুলি, অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া অনেকক্ষণ রাখিল! তাহার পর এক-হাতে আগুন তুলিয়া অন্য হাতের তালুতে তাহা লইয়া, তাহার উপর ধুপ ধুনা ফেলিতে লাগিল। কিছুতেই যখন মেয়েটি নিবৃত্ত হইল না, তখন তাহার আত্মীয়স্বজন অগত্যা সম্মতি দিলেন। এ মেয়েটী সর্ব্বোচ্চ জাতির কন্যা।

যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বারান্তরে তাহার সারাংশ আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।—লেখক

"কাশীতে আমি যাহাদের ব্যাপার দেখিলাম, তাহারা বৈশ্য জাতীয়। আমি গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, জলের নিকট একটা খাটুলীর উপর স্বামীর মৃতদেহ রক্ষিত আছে। তখন বেলা ১০টা—বেশী লোক তখনও জমে নাই। অনেকক্ষণ পরে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ,

দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে গৃহীত আগ্রা দুর্গের দৃশ্য

আত্মীয়স্বজন ও বাদ্যকরগণ শোভাযাত্রা করিয়া, সদ্য বিধবাটীকে লইয়া আসিল। তাহারা আসিয়া মৃতদেহের নিকট দাঁড়াইল। মেয়েটির পদক্ষেপ দৃঢ়; নিকটবর্ত্তী লোকগুলির সহিত কথা কহিল, সে স্বর অকম্পিত। তাহার হাতে একটি সিন্দুরলিপ্ত নারিকেল; দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে সেই সিন্দুর লইয়া আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের কপালে সে ফোঁটা দিতে লাগিল। এই সময় আমি তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার মুখপানে সে কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া থাকিয়া, আমার কপালেও সিন্দুর দিল। তাহার বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে—বেশ সুন্দরী; খর্ব্বকায়া, হস্ত ও বাহুর গঠনটি বিশেষভাবে সুন্দর। পরিধানে শ্বেতবর্ণ শাড়ী।

"দাহস্থান তথা হইতে অনুমান ১০০ গজ দূরে রচিত হইয়াছিল। শুষ্ক কাঠ ও তৃণ নির্ম্মিত একটি কুটীরের মত, ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য একটি দ্বারও আছে। দ্বারের নিকট জ্বলন্ত কাঠ হস্তে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল। মেয়েটি পৌঁছিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে, মৃতদেহকে সেই চিতার দিকে লইয়া যাওয়া হইল। মেয়েটি ও প্রধান ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শবদেহ চিতামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, মেয়েটি সকলকে প্রণাম করিয়া নির্ব্বাকভাবে চিতামধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হইল। আগুন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। লোকে জয় জয় শব্দ করিয়া তাহার উপর কাঠ ও তৃণাদি ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল।"

গোয়ালিয়র দুর্গ

"বাসায় ফিরিয়া, সেই দৃশ্যের একটি চিত্র আমি অঙ্কন করিলাম।"

কলিকাতায় ফিরিয়া, পরবৎসর শীতঋতুতে হজেস্ সাহেব পুনরায় উত্তর পশ্চিম ভ্রমণে বহির্গত হন। আগ্রা ও গোয়ালিয়র দুর্গের যে চিত্র তিনি সে সময় অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেগুলিও এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

শ্রীকিন্নরেশ রায়।

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

বঙ্কিমযুগের অবসান কালে বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জে যে ললিত-কবি-কাকলী ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়াল যেন কোকিল ও পাপিয়া। রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বসিত সঙ্গীতে বাঙ্গালী একটি স্বর্গীয় অনুভূতির স্বাদ পাইয়াছে; আর অক্ষয়-গ্রন্থে [illegible]র বিষাদকরুণ গীত-লহরীতে যেন একটা হারানো

যাহা লিপিবসন্ধান পাইয়াছে।

পাঠকগণকে উ

বাঙ্গালা সাহিত্যে কবির প্রথম দান "প্রদীপ" একটি নব-জাগরণ-প্রদীপ্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতি—একটি ঈষৎ আন্দোলিত প্রাণের প্রভা। প্রদীপ কবি-প্রতিভার প্রথম জাগরণ—বিহ্বল, চঞ্চল—

"ও আলোক মুগ্ধ হিয়া দিগ্বিদিক হারাইয়া
বিহ্বল পাগল কোথাকার!"

প্রথম কবিত্ব গরিমায় বিভোর ভাবোন্মত্ত কবি—এক-

বার স্নেহভালবাসায় উৎফুল্ল একটি মাধুরী বিকাশে হর্ষমগ্ন, পরক্ষণেই ভগ্নবক্ষ—"রজনীর মৃত্যুতে ম্রিয়মান, পলকের বিরহে সংসার শ্মশান দেখে।" "প্রদীপ" তাই হাসি-কান্নার দিবা-শর্ব্বরী, ভাব অভাবের বসন্ত-শীত। সৌন্দর্য্য দেখিয়া কবি তন্ময় ও "আলোক মুগ্ধ হিয়া", কিন্তু স্বস্তি নাই—যাইতে হয় ত কবে যাইবে তার স্থিরতা নাই—কবি গোড়া হইতেই কাঁদিয়া অধীর, নিরাশার আঁধারে নিমজ্জিত।

অক্ষয়কুমার নারী-সৌন্দর্য্যের উপাসক। তিনি রূপেই রমণীর সমস্ত রমণীয়তার পরিণতি মনে করেন—

"রমণী রে সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা　　জড়িত প্রকৃতি সনে
দেবপ্রাণ বেদগানে সাধা।"

এই জন্যই প্রদীপে নারী-বন্দনার বাহুল্য, কত ছন্দে কত ভঙ্গিমায় কত ললিত ভাষায় তাহার প্রকাশ। কিন্তু বিহ্বল কবির এ মধুরানুভূতি বড়ই অস্থায়ী—এই উঠে এই টুটে; কবি কি একটা আশার গান গাহিতেছিলেন, হয়ত কি অবিশ্বাস আসিল, হয়ত একটু ঈষৎ ছায়া পড়িল, কি পড়িল না, অমনি কাঁদিয়া উঠিলেন—

"ভালবাসা ভালবাসা　　ও শুধু কথার কথা
কবির কল্পনা;"

অক্ষয়কুমারের কাব্যে এই নৈরাশ্যের অতি বাহুল্য। তিনি দুঃখের কবি, বিষাদের গান গাহিয়াছেন। এই দুঃখবাদ মানবজীবনের একটা দারুণ অভিশাপ; ইহার তীব্র জ্বালাময় বিষে জীবন, জগৎ, সমস্ত জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। সংসারটা চির-অন্ধকার বিভীষিকা-ময় কারাগার হইয়া পড়ে। দুঃখবাদ বৈনাশিকতা, ইহা মানবের সর্ব্বনাশের কারণ। প্রেমকে জীর্ণ করিয়া ফেলে, নারীকে কুৎসিৎ করিয়া তোলে, জ্যোৎস্নার জ্যোতিতে কালিমা ঢালিয়া দেয়, জন্মের উৎসবে মৃত্যুর হাহাকার জাগাইয়া তোলে। দুঃখবাদের বিচারক্ষেত্র এ নয়; তবে যে দুঃখবাদের পরিণতি নাই, শুধু আঁধারই দেখে, আলোর আর ভরসা রাখে না, তাহা বৈনাশিকতা (nihilisim)।

ধূলিলুণ্ঠিত রৌদ্রদগ্ধ বকুলকে দেখিয়া বক্ষে বিষাদের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে ইহা অস্বাভাবিক নয়; এ দুঃখবাদ অতি প্রকৃত, বরং—স্নিগ্ধ না হওয়াই অনুচিত, কিন্তু ইহা শেষ নহে ইহা চরম দৃষ্টি নহে। মন যদি আর অগ্রসর না হয়, জ্ঞান যদি এইখানেই বদ্ধ হইয়া যায়, তবে সে অমঙ্গল সাহিত্যের ভিতর প্রবেশ করিলে কেবল কবির নহে, সমস্ত জাতিটার পর্য্যন্ত অকল্যাণের কারণ হইয়া উঠে।

সুখের বিষয়, অক্ষয়কুমার এই মোহকর তিমিরেই ডুবিয়া যান নাই, নবীন অমৃতময় আলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

"দাও ওই তীব্র সুরা　　দাও ওই বিষপাত্র
আজি মৃত্যু দিন।"

এই মর্ম্মান্তিক আত্মনাশের ইচ্ছা "প্রদীপের" পরতে পরতে।

পরে কবি যখন "শঙ্খ" বাজাইলেন, তখন যেন "প্রদীপের" উদ্দামতা অন্ধতা কমিয়াছে। তাহাতেও বিষাদ আছে কিন্তু বিনাশের বাসনা নাই। শঙ্খেও নৈরাশ্য আছে, কিন্তু কোন আশার আশ্রয়ে শান্তিলাভ করাই যেন তাহাতে ঐকান্তিক সাধ।

কবিত্ব উচ্ছ্বাস মাত্র নহে, ভাবুকতা এবং দার্শনিকতাও তাহার অঙ্গ। অক্ষয়কুমারের কৈশোর কাব্য "প্রদীপে" উচ্ছ্বাসের আধিক্য থাকিলেও, "শঙ্খে" তাহা পরিণতির পন্থা ধরিয়াছে—

"ক্ষুদ্র বনফুল বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমূলে দুলে প্রলয় প্লাবন;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে
চির ঊষা জেগে আছে,
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন!"

ইহা কবির ঋষিদৃষ্টিতে বিশ্বরহস্যের পরিচয় লাভ। তার পর মানব বন্দনা—

"নমি আমি প্রতিজনে আদ্বিজ চণ্ডাল
প্রভু ক্রীতদাস।"

কবির দৃষ্টি স্বপ্ন হইতে জাগ্রতে আসিয়াছে—অলীক হইতে বাস্তবে উপস্থিত হইয়াছে। 'মানুষকে লইয়াই মানুষের সব, তাই মানব-প্রীতিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব—উহাতেই মানুষের আত্মবিকাশ।

প্রদীপে কবির অতৃপ্তি ছিল

"কত ভেবেছিল কত বুঝেছিল
কিছুই হ'লনা বলা।"

তাই বুঝি "শঙ্খে" বলা শেষ করিবার আশা। আপনার ক্ষুদ্র বুকটির দুঃখ সুখের কথা বলিলে বলা হয় না, বোঝাও হয় না, ভাবাও হয় না—তৃষ্ণা জ্বালা বাড়িয়াই যায়। "শঙ্খে" কবি—

"কোথা তুমি কত দূরে
কোন্ সুর অন্তঃপুরে"

বলিয়া নিজের কথাও বলিলেন বটে, কিন্তু আর সে অব্যবস্থিত ভাব-বিভোরতা নাই। চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা আসিয়াছে, দৃষ্টির মাঝে প্রজ্ঞার আভাস দেখা দিয়াছে। এবারকার সৌন্দর্য্য শুধু কামনার রচনা নহে, "শঙ্খে" প্রীতি আছে, স্নেহ আছে, শ্রদ্ধা আছে, একটু হাস্যের রেখাও আছে। এই খানেই যেন কবি কাব্যলক্ষ্মীর দর্শন লাভ করিলেন।

"কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়—হৃদয়।"

এই মানবিকতাই কবিতার সর্ব্বস্ব, সাহিত্যের প্রাণ।

মানুষের চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে অনেকেই—কনক রত্ন, ঐশ্বর্য্য, চিক্কণ চটুল জিনিষ। কিন্তু কে তাহার প্রকৃত আত্মীয় হইতে পারিয়াছে? কে রৌদ্রে ছায়া দিয়াছে, অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়াছে, ক্লান্তিতে কোল দিয়াছে? প্রীতি। এই জন্য প্রীতির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি মানবই কাব্যের দেবতা ও উপাস্য; হৃদয়ই একান্তভাবে প্রার্থনীয়।

"কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়—হৃদয়।"

যে সত্যই কিছু চায়, জুড়াইতে চায়, মধু চায়, সে ইহা ছাড়া অন্য কিছু চাহিতে পারে না। যেদিন মনুষ্যের ভুল ভাঙ্গিবে, সেদিন তার কামনায় আবিলতা থাকিবে না—যে জৈব তৃষ্ণায় তাঁহাকে আরও পীড়িত করে, যাহা সমস্ত অতৃপ্তি অশান্তি অসন্তোষের মূলীভূত কারণ, তাহার অবসান হইয়া মানুষ তার চির-ঈপ্সিতের সন্ধান পাইবে। "প্রদীপে" কবির কামনাটি বড়ই উগ্র ছিল, "শঙ্খে" তাহা সংযত হইয়া, অসত্যকে উপেক্ষা করিয়া, যাচ্ঞা করিল—"হৃদয়—হৃদয়।"

যেখানে জীবন জাগ্রত, তপস্যা তাহা অতি শ্রদ্ধার বস্তু। শ্রদ্ধাশীলের সুদৃঢ় তপস্যা থাকে, তাই উহা বুদ্বুদের মত উঠে না, মিলায় না; শক্তিমান হইয়া, বাড়িয়া পরিণতির পথে চলে। অক্ষয়কুমারের এইটী হইয়াছিল। এজন্য "শঙ্খে" এবং "প্রদীপে" কেবল বিষয় বৈচিত্র্যে বাহ্যরূপেই প্রভেদ নয়, প্রাণেও বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। আর "এষা"র স্রষ্টা "শঙ্খ" রচয়িতার অপেক্ষা উচ্চ স্তরে উঠিয়াছেন। একটা উন্নতির ক্রম ছিল বলিয়াই শঙ্খের আত্মেই প্রীতির প্রতি মমতা

"ভালবেসে ভালবেসে পরে আপনার করে!"

কবি সত্যের আলোকেই চক্ষুষ্মান্। বিশ্বরহস্য-তত্ত্ব তাঁর মনে ধরা পড়ে। এ কারণে প্রকৃত কবির কাব্যে ভাবুকতা, দার্শনিকতা সবই স্থান পায়। "সদ্যোজাত কন্যা"য় অক্ষয়কুমার এই দার্শনিক চিন্তার ছবি ফুটাইয়াছেন

"কিম্বা আজীবন এই হৃদয় ব্রহ্মাণ্ডে
যে আকুল স্নেহ,
অণু পরমাণু মত ঘূর্ণিত রে অবিরত
ঘুরে ঘুরে এত পরে
ধরেছে ও দেহ।"

এবং—

"কিম্বা ভবিষ্যৎ গর্ভে আছে যত প্রাণ
রে উষা আলোক!
তোমারেই করে ভর আসিছে তোমার 'পর
বীজে যথা কল্পতরু, অণুতে ভূলোক।"

কতকগুলি বাহ্য অলঙ্কার—উপমা, শব্দসৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক রূপ-প্রিয়তা—এ সবও কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। অক্ষয়কুমারের তাহাতেও দৈন্য ছিল না। বঙ্গভূমির চিত্র

"সরে মেঘ ফুটে ধীরে বদন চন্দ্রমা!
বিভোর চকোর উড়ে নীরব সোহাগে!
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে!"

এ কেবল প্রতিচ্ছবি ফটো নয়, কবি-কল্পনায় ইহার আরও রমণীয়। তার পর "মাতৃহীনা"র

"ধূলায় বসে কাঁদিস কেন আয়রে বাছা বুকে আয়,
যেমন ধীরে চাঁদের হাসি, পড়ে ভাঙা প্রাসাদ গায়।"

ভাঙা প্রাসাদ—যাহাতে একদিন ঐশ্বর্য্য ছিল, প্রাণ ছিল আনন্দ ছিল, তাহার গায়ে জ্যোস্না বিকাস, আর বিপত্নীকের বুকে কন্যার আলিঙ্গন—পরস্পর যেন একই ভাবের ছবি।

অক্ষয়কুমার দুঃখের কবি। প্রথমটা শোকে বিরহে বিষাদে অহরহ দহিয়া দহিয়া দুঃখবাদ প্রচার করিলেন। কিন্তু এ দুঃখবাদ বৈনাশিকতা; ইহাতে মানুষ নষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে মোহে ক্লৈব্যে জাতিও ধ্বংস হয়। অক্ষয়কুমারের শুভাদৃষ্ট যে কাঁদিয়া পুড়িয়া নৈরাশ্যের রৌরবে ডুবিয়াও অবশেষে অমৃত লাভ করিলেন। এ অমৃত বার্ত্তা 'এষায়' উদ্ঘোষিত। সব জ্বালা সব যাতনা সব নৈরাশ্য সিদ্ধির শ্রীতে "এষা"র সুধাময় হইয়া উঠিল।

"এষা" অক্ষয়কুমারের শোকগীতি—আবার উহা সত্য ও অমৃত প্রাপ্তি। "শঙ্খে" বলিলেন—

"দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই;
বুঝেছি এ মরুভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তাই।"

এ প্রেমও তখন কল্পনার বিষয়, নহিলে "এষা"র প্রথম স্তরে ক্রন্দন থাকিত না। পরে সত্য লাভ করিলেন—

"দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই।"

সার্ব্বভৌমিকত্বই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। "এষা" ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস, তবু তাহা যেন তোমার আমার নিখিলেরই একীভূত শোক বিলাপ। "এষা" শোক পঙ্কে জন্মিয়া, আনন্দ শতদলে বিকশিত হইয়া, বাঙ্গালীর কাছে—সমস্ত মানবমণ্ডলীর কাছে—নৈরাশ্য-ক্ষতে চন্দন প্রলেপ হইয়া রহিল।

কাব্যশ্রী, আর্ট, চারুকলা—এ সব অক্ষয়কুমারের কাব্যে আছে কি নাই, তাহা লইয়া ঘোর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মতবাদ শুধু মতবাদ, শুষ্ক ধূলিরাশির আবর্ত্ত, কেবল আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। আর্ট, কলা, শিল্প এ সমস্তই মানব অন্তর লইয়া। যাহা প্রেয় নহে, কিন্তু শ্রেয় দিতে পারিয়াছে, অর্থাৎ বুকটাতে একটা স্থায়ী শান্তি দিতে পারিয়াছে—তাহাই চরম শিল্প, পরম সুন্দর। কবি আগে বলিলেন—

"কোথা হতে কি যে হয় শূন্য—সব শূন্যময়
নিষ্ঠুরতা জগৎ জুড়িয়া।
অশ্রুরোধ শ্বাসরোধ অসহ্য জীবন বোধ
ইচ্ছা হয়, মরি আছাড়িয়া।"

মানুষের নিকট মৃত্যু যেন একটা ভীম অভিশাপ, সব ভাঙিয়া দেয়, সব নৈরাশ্যের গরলে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। এই মৃত্যুর ব্যাখ্যা কি? এ সমস্যার সমাধান কোথায়?

সাধারণে কোন্ শ্রেষ্ঠ শক্তির মুখের পানে চাহিয়া থাকে? তাঁহারা দার্শনিক মহাপুরুষ, কবি, মুনি ঋষি—ইঁহারাই জনমণ্ডলীর নেতা, ভরসা, পরিচালক। শোক সবাই পায়; কবিও শোক পাইলেন; সে শোকের ফল সকলেরই মধুপ্রদ হইল, কবির ব্যথায় কবির সত্যলাভে সকলেই সত্যলাভ করিল।

প্রথমে কবি দশজনের মত কাঁদিলেন—

"একবার চীৎকারি চীৎকারি
দেখি ওই গগন বিদারি
কোথা সে আমার।"

এ ক্রন্দন কিন্তু ক্লীবের মূঢ়ের অক্ষেপের হাহাকার নয়; ইহাতে কবিকে বিমূঢ় করিল না;—জিজ্ঞাসা জাগিল

"কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস
মৃত্যু যদি শেষ?"

আরাধনা আরম্ভ হইল, এ মরণের রহস্য কি? তুমি আমি শোক পাই, আর্ত্তনাদ করি, হয়ত বা ভুলিয়া যাই। কিন্তু মৃত্যু যদি জগতের কাছে সব আশার সব শোভার সব ললিত বন্ধনের চির বিভীষিকা হইয়াই থাকে, তবে সব ব্যর্থ, সব মিথ্যা। ইহার ফলই বৈনাশিক দুঃখবাদ।

সর্ব্বের কাছে যাহা তমসাচ্ছন্ন, মনীষীর কাছে তাহা উদ্ভাসিত। তিনি অসহায় পড়িয়া থাকিতে চাহেন না, তাঁহার সঙ্কল্প ধ্যানের মাঝে সত্যকে ধারণ করা, তাঁহার কামনা জীবনের একটা সুললিত ব্যাখ্যা। "এষা"র কবি কাঁদিলেন, পরে অমৃতের জন্য যাত্রা করিলেন; শেষে ঋষিকুমারের মত গাহিলেন—

"ক্ষম এ ক্রন্দন গীতি শোক অবসাদ
সে ছিল তোমারি ছায়া
তোমারি প্রেমের মায়া
তার স্মৃতি আনে আজি তোমারি আস্বাদ।"

এবার একটি মহাগুণ, ইহাতে অস্বাভাবিকতার লেশ মাত্র নাই। কবিও মানুষ, সেই জন্য তাঁর শোকও দশজনেরই মত হইল; প্রিয়া হারাইয়াই

"এস মৃত্যু নির্ম্মম বিজয়ী
প্রতীক্ষায় শত মৃত্যু সহি!

প্রথম শোকের এই উদ্বেলতাই স্বাভাবিক।

ইহার পরেই বিশ্ব-বিধানের উপর অবিশ্বাস। কেন? কোন অপরাধে? কোন দানবের উৎপাতে এই অত্যাচার? কর্ম্মফল বিশ্বনিয়ম, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ সব মুখস্ত কথায় তখন মন মানে না; একটা প্রচণ্ড নাস্তিকতা আসে

"অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার
জড় ধরা জড় দেহ সার?"

—হাহাকার করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, নিরাশ হইয়া মানুষ যখন ক্লান্ত কাতর হইয়া পড়ে, তখন আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়। ইহাতেই ঈশ্বর-বিশ্বাসের বীজ নিহিত, সাধনার সূত্রপাত—

"কোথা দেব, কোথা তুমি!"

—এই আন্তরিকতাপূর্ণ প্রার্থনায়, এই শিশুর মত আত্মসমর্পণে শেষে সান্ত্বনা মিলে। তখনই পরম শান্তি-সঙ্গীত বাজিয়া উঠে—

"জানি, মনঃপ্রাণ দেহ
নহে আপনার কেহ
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিলাষী।"

অক্ষয়কুমারের সমগ্র কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ ও অতি প্রশংসার কথা এই যে, তাঁহার কোন কাব্যে মতবাদের কণ্টক নাই, যাহাতে তাহার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধমতের আগুন জ্বলিতে পারে। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে বাস্তব অবাস্তব বোধ্য অবোধ্য শ্লীল অশ্লীল কত মতের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, অথচ অক্ষয় কাব্যে তাহার ঈষৎ ছায়াপাতও নাই। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র যাহাকে কাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়াছেন, সেই প্রসাদগুণে "প্রদীপ", "শঙ্খ", "এষা" প্রভাতের মত প্রকাশিত, সৌরভের মত মনোরম, জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল।

আর একটা বড় কথা, নরনারীর প্রেমগীতি গাহিতে অনেক কবিই একটা প্রতিবাদ সৃষ্টির কারণ হইয়া পড়িয়াছেন—অর্থাৎ কাহারো কাহারো মতে সে সব কামনার হাহাকার, কামগীতি। অক্ষয়কুমারে অধিকাংশ

করিতাই নারীপ্রেম সম্বন্ধীয়, অথচ তাহা পবিত্র—অনাবিল।

অক্ষয়কুমারের মরজীবনের কথা আলোচনা করা হইল না; কারণ কাব্যেই তাঁর অমল করুণ হৃদয়খানির পরিচয় পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। অন্য কাহিনী না জানিলেও ক্ষতিবোধ করি না। "এষা" রচনা করিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতির কাছে অমর, চিরবরণীয়। কাঁদিব না, শোক করিব না, তাহা হইলে তাঁর শিক্ষাই ব্যর্থ হইবে! তিনি যে আমাদের অমৃত মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন,—

"অনলে কি পুড়ে দেহ
"মরণে কি মরে প্রাণ?"

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

আলোচনা

'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর মতামত।

(১)

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার কৈশোরে লিখিত 'মেঘনাদবধ' সমালোচনা সম্বন্ধে লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন সকলেই বুঝিয়াছিল যে তিনি বাল্যকালে মহাকবি মধুসূদনের প্রতি যে ঘোর অবিচার করিয়াছিলেন তাহা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিলেন। কিন্তু অন্যান্য সকলের বোঝা হইতে মন্মথ বাবুর বোঝায় একটু প্রভেদ ছিল দেখা যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন—"জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চপলতার জন্য লজ্জা বা অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, তাঁহার মত যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এ কথা বলেন নাই।" অতএব দাঁড়াইতেছে এই যে, যে সমালোচক এককালে "মেঘনাদবধ 'মহাকাব্যই নয় ইহা নামে মাত্র মহাকাব্য, এরূপ কাব্য অধিক দিন বাঁচিতে পারে না'" প্রভৃতি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যদি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে স্বীকার করেন যে বাল্যকালের ঐ সমালোচনাটি গালিগালাজ মাত্র হইয়াছিল, মেঘনাদবধ একখানি অমর কাব্য, তাহা হইলেও মন্মথ বাবু বলিবেন যে সমালোচক তাঁহার চপলতার জন্য লজ্জা বা অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এমন কথা বলেন নাই। অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বটে! এইরূপ চুলচেরা ব্যাখ্যা করিয়া কূটতর্ক তোলেন বলিলে, আইন ব্যবসায়ীরাও অবমাননা বোধ করিবেন। আর এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আরও চমৎকার। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রায়ই অল্প বয়সেই অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয় থাকেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে কবি-প্রতিভা ও সমালোচনা-শক্তি এক নহে। শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্বশক্তি খুব অল্প বয়সেই উৎকৃষ্ট কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই অসামান্য প্রতিভাশালী কবি যে নিতান্ত অপরিণত বয়সে সুসমালোচকও হইবেন, এরূপ ব্যাপার বোধ হয় অসম্ভব। তাহার কারণ এই যে, সমালোচনায় যে বিচার-শক্তির প্রয়োজন, কাব্য রচনায় তাহা অনাবশ্যক বলিলেও চলে। পক্ষান্তরে তীব্র অনুভূতি তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও অসাধারণ কল্পনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কবি কাব্যসৃষ্টি করিয়া থাকেন; এবং এই সব কবিসুলভ গুণ অল্প বয়সেই, এমন কি বিশেষ ভাবে প্রথম যৌবনেই, প্রকটিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক ও ভানুসিংহের পদাবলীর মধ্যে যে অনেক সুন্দর কবিতা আছে একথা সত্য হইলেও, তাঁহার ষোল কি বাইশ বৎসর বয়সে লিখিত সমালোচনাও যে অভ্রান্ত ও সারবান্ বলিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই, বিশেষতঃ যখন কবি নিজেই বলিতেছেন যে উহা তাঁহার সমালোচনাই হয় নাই। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকেই বা কোথায় খর্ব্ব করা হইল তাহা বুঝি না।

অবশ্য একথা সত্য বটে যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, সমালোচকও বটেন; তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেইরূপ উৎকৃষ্ট সমালোচনাও লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই

সঙ্গে ইহাও সত্য যে তিনি আগে কবি, তার পরে সমালোচক ; তাঁহার অননুকরণীয় সাহিত্যিক সমালোচনাগুলির বিশেষত্বই এই যে, সেগুলি তাঁহার কবিতারই মত সরস ও সুন্দর, তাঁহার মনীষাদীপ্ত কবিহৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবসম্ভার তিনি সমালোচনার আকারে আমাদিগকে দিয়াছেন। তাই যখন দেখি যে কবি কৈশোরে প্রথম যৌবনে সমালোচনা নাম দিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পরিণত বয়সের রচনার কোন গুণ ত নাই-ই, আছে কেবল নিছক গালিগালাজ মাত্র, তখন আমরা সেই সমালোচনাতে তাঁহার প্রকৃত মত ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে স্বতঃই সঙ্কুচিত হই। পরে যখন দেখি যে কবি নিজেই বলিতেছেন যে অল্প বয়সে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সমালোচনাই হয় নাই, তখন আর কোন সন্দেহই থাকে না।

কিন্তু মন্মথ বাবুর মনে এরূপ কোন দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মত সম্বন্ধে এমনই নিঃসন্দেহ যে, তাঁহার সমালোচনা দুইটি অকুণ্ঠিত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তর্কের খাতিরে যদিও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, যাঁহারা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পাঠ করেন তাঁহারা সকলেই 'জীবনস্মৃতি' পড়িয়াছেন (আমি নিজে মনে করি ইহা সম্ভবই নয়) তাহা হইলেও কি এ কথাটি সকলকে মনে করাইয়া দেওয়া তাঁহার উচিত ছিল না? না হয় তিনি রবিবাবুর উক্তিটা উদ্ধৃত না করিতেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ীর suppressio veri নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার এ সম্বন্ধে নীরব থাকা খুবই অন্যায় হইয়াছে। যাহাই হউক, মন্মথ বাবুর মনে যখন সন্দেহের লেশ মাত্র নাই এবং রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের প্রমাণ পান নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে আরও স্পষ্ট প্রমাণ দিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটি কথা বলিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে ছয় বৎসরের ব্যবধানে মেঘনাদবধ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে দুইটিই এক ছাঁচে ঢালা, তীব্রতায় কোনটি যে অপরটিকে পরাস্ত করিয়াছে তাহা বলা কঠিন। একটিতে যাহা বলা বাকী ছিল, তাহা অপরটিতে বলা হইয়াছে ; ফলে এই প্রবন্ধদ্বয়ের মধ্যে ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য এত বেশী রহিয়াছে যে, দুইটিকে একত্র করিয়া একটি প্রবন্ধ মনে করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে এই দুয়ের একটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা যদি অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়া থাকে, আমি তাহা স্বীকার করিয়া বলিতেছি, কিন্তু মেঘনাদবধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই দুইটি কৈশোর-রচিত সমালোচনা ব্যতীত, যদি ৪৬ বৎসর বয়সে লেখা তাঁহার আরও একটি সমালোচনা থাকে, আর যদি এই শেষোক্ত সমালোচনাটিতে কবি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা ছেলেবেলায় প্রকাশিত মন্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, তাহা হইলে 'হেমচন্দ্র' লেখকের এই তৃতীয় সমালোচনা সম্বন্ধে অজ্ঞতা কি আরও বেশী অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে? মন্মথ বাবুর যদি এই সমালোচনাটা জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রকৃত মনোভাবই স্পষ্ট ভাষায় অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "বিনয়বশতঃ নিজেকে মূর্খ বা অর্ব্বাচীন বলিয়া প্রচার" করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার এরূপ ঝুটা বিনয়ের পরিচয় মন্মথ বাবু অনেক স্থলে পাইয়াছেন লিখিয়াছেন, আমরা ত কুত্রাপি পাই নাই। 'এই প্রসঙ্গে মন্মথ বাবু নিউটনের বিনয়োক্তির তুলনা পর্য্যন্ত করিতে ছাড়েন নাই।' তিনি এই একটিমাত্র উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন? সক্রেটিস প্রভৃতি আরও যাঁহারা এইরূপ বিনয়ের অবতার ছিলেন, তাঁহাদেরও টানিয়া আনা উচিত ছিল। কারণ প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে এই শেষোক্ত উদাহরণগুলিরও মূল্য বড় কম নহে।

পূর্ব্বে আমি যে প্রমাণের কথা বলিয়াছি, তাহা উল্লিখিত তৃতীয় সমালোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমার ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্ত্তনের প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার নিজের উক্তিই যথেষ্ট। তাই আমার প্রথম আলোচনায় এই সমালোচনার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি নাই। আর এখনও যে এই নূতন প্রমাণে বিশেষ কোন ফল হইবে তাহারই বা স্থিরতা কি? কারণ যিনি রবিবাবুর ষোলবৎসরের রচনাটি সম্বন্ধে বলেন, 'এরূপ নির্ভীক ও নিরপেক্ষ কাব্য-সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল', তিনি যে কবির ৪৬ বৎসর বয়সে লেখা সমালোচনা সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া স্বীয় ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন সে আশা আমার বড় কম। তবু তাঁহাকে জানাইয়া রাখা ভাল যে, ১৩১৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' সাহিত্যসৃষ্টি শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের যে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহারই শেষের দিকে মেঘনাদবধের একটি ক্ষুদ্র অথচ চমৎকার সমালোচনা আছে। আমি তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাল্মীকির সময় হইতে রামায়ণ কথা ও রামচরিত্র কিরূপভাবে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে সেই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"রামায়ণ কথায় যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া

আসিয়াছি, তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। ঐই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

"আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি তাহা খাঁটি জিনিষ নয়ে, অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নয়।

• • • • • •

"য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, একথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু না কিছু নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিষের পুনরাবৃত্তি আর কোনো মতেই হইতে পারে না—যদি হয়, তবেই এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্ত্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রামায়ণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনের মধ্যে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্ম্মভীরুতা সর্ব্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভাল কতটুকু মন্দ তাহা কেবলি অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য; ইহার হর্ম্ম্যচূড়া মেঘের পথরোধ করিয়াছে; ইহার রথরথী অশ্বগজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্দ্ধাবারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়, অগ্নি ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র পৌত্র আত্মীয়স্বজনের একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাঁহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে; তবু যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছি না, কবি সেই ধর্ম্ম-বিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

"য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে—তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিককালে রামায়ণ কথার একটি নূতন-বাঁধা-তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্ব্বলের অভিমানে বশতঃ ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি, তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।" (গদ্য গ্রন্থাবলী, ৪র্থ ভাগ, "সাহিত্য", ১০২-১০৫ পৃষ্ঠা)।

এখন এই সমালোচনায় ব্যক্ত ভাবের সহিত রবীন্দ্রনাথের ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত প্রবন্ধদ্বয়ের মতের একটুও সাদৃশ্য আছে কি? সাদৃশ্য থাকা ত দূরের কথা! ঠিক বিপরীত মত প্রকাশিত হয় নাই কি? প্রথম দুইটি প্রবন্ধে একটা কথা খুব

জোর করিয়া বলা হইয়াছে। তাহা এই—"কবি বলেন, I despise Ram and his rabble. সেটা বড় যশের কথা নহে, তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন। দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন। এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে?" ইত্যাদি। আর, পরিণত বয়সের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বুঝাইতেছেন, 'কেন মেঘনাদবধের কবি রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন, কেন তিনি বলিয়াছিলেন, I despise Ram and his rabble but the idea of রাবণ elevates and kindles my imagination. মাইকেল যুগধর্ম্মের প্রভাব মানিয়া পুরাতন রামায়ণ কথা এই নূতন আকারে শুনাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচিত সাহিত্য মিথ্যা ও কৃত্রিম হয় নাই, "কাব্যলক্ষ্মী নিজে ব অশ্রুসিক্ত মালাখানি" রাক্ষসের গলায় পরাইয়া দিয়া এই কাব্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ যে কারণে কৈশোরে মেঘনাদবধকে নামমাত্র মহাকাব্য বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই পরবর্ত্তীকালে উহাকে মহামহিমান্বিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের প্রমাণ মন্মথবাবু এইবার পাইলেন কি? "জীবনস্মৃতি"র উক্তিতে যে কথাটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট, তাহার জন্য যে এত প্রমাণ প্রয়োগ, এত টীকা টিপ্পনী প্রয়োজন হইবে তাহা মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু এখনও মন্মথবাবুর নিকট কথাটা স্পষ্টতর হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কারণ, "জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ'কে অমর কাব্য বলিয়াছেন জানিয়াও যিনি লিখিতে পারেন, "রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের ন্যায় বৃত্রসংহারকে নামমাত্র মহাকাব্য বলিয়া মনে করেন না," (মানসী ও মর্ম্মবাণী', কার্ত্তিক, ২৯৪ পৃষ্ঠা) তাঁহার বিচারশক্তির নিকট যে কোন যুক্তি, কোন প্রমাণ খাটিবে তাহা আশা করা যায় কিরূপে?

পরিশেষে আর দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমি 'হেমচন্দ্র' সম্বন্ধে 'অভিমত প্রকাশ' করিতে একেবারেই প্রবৃত্ত হই নাই, আমি শুধু মন্মথবাবুর একটা ভুল দেখাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। ইহার জন্যও কি শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করা অন্যায় হইয়াছে? ধারাবাহিক রচনা মাসিক পত্রে শেষ হইয়া গেলেই প্রায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহার পূর্ব্বেই ভ্রম সংশোধন হইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের "সমালোচনা" নামক পুস্তক যে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত আলোচনাবলীর মধ্যে সম্ভবতঃ এক "ডি প্রোফান্ডিস্" ব্যতীত আর কিছুই যে তাঁহার গদ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান লাভ করে নাই (কাব্যের উপেক্ষিতার কথা স্বতন্ত্র) তাহাতেই কি প্রমাণ হয় না যে তিনি কালক্রমে মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সমালোচনাটিও বর্জ্জন করিয়াছিলেন?

পক্ষপাতিতার প্রসঙ্গে জাতিত্ব, জ্ঞাতিত্ব, উপকারপ্রাপ্তির আশা প্রভৃতির কথা কিরূপে উঠিতে পারে তাহা ত আমি ভাবিয়া পাই না। সাহিত্যে পক্ষপাতিতা বলিতে আমি ত বুঝি, একজন সাহিত্যিককে অপরাপর তুলনীয় সমশ্রেণীর সাহিত্যিক অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা করা। আর এই ভক্তি বা ভালবাসা যখন বিচার বা যুক্তির শাসন মানিতে না চায় তখনই তাহা অন্ধ হইয়া পড়ে। শুধু পক্ষপাতিতা দোষের হইতে পারে না। মনে করা যাক বায়রণ ও শেলীর মধ্যে তুলনা হইতেছে; একজন পাঠক বায়রণকে শেলীর চেয়ে বেশী পছন্দ করেন, সুতরাং তিনি বায়রণের পক্ষপাতী। অপর একজন শেলীকে বড় মনে করেন, সুতরাং তিনি শেলীর পক্ষপাতী। এই পক্ষপাতিতার মূল সাধারণতঃ ব্যক্তিগত রুচি ও প্রকৃতির মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে, জাতিত্ব জ্ঞাতিত্বের কথা এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। বন্ধুতা কোন কোন স্থলে পক্ষপাতিতার কারণ হয় বটে, কিন্তু সু-সমালোচক তিনিই যিনি বলিতে পারেন, My friend is dear but truth dearer. তাই দেখি, মুর বায়রণের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াও স্বরচিত বায়রণের জীবনচরিতে বন্ধুর চরিত্রদোষের নগ্ন কদর্য্যতা পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পক্ষান্তরে ডাউডেন (Prof. Edward Dowden) শেলীর মৃত্যুর একুশ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিলেও, তিনি এমনই শেলীভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তদ্রচিত শেলীর জীবন-চরিত সমালোচনায় ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁহাকে শেলীর একজন অন্ধ ভক্ত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, মন্মথবাবুর প্রদত্ত কারণগুলি যদি তর্কের খাতিরে গ্রহণ করিয়া লওয়াও যায়, তাহা হইলেও তাঁহার মাতুল পরিবারের সহিত মাইকেলের যে সম্পর্কের পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহাতে কপর্দ্দকহীন মাইকেলকে তাঁহাদের আশ্রিত ও অনুগৃহীত রূপেই দেখানো হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই আশ্রিত ও অনুগৃহীত ব্যক্তির প্রতি (তা সে

ব্যক্তি যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন) কোন্ ভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হওয়া স্বাভাবিক—ভক্তি না অনুকম্পা?

তার পরে হেমচন্দ্রের কথা। মন্মথ বাবু ভিন্নজাতিত্ব প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া, তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিতা অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি স্বীকার করিতেছি যে, যদিও আমি হেমচন্দ্রকে মাইকেলের চেয়ে বড় কবি বলিয়া মনে করি না, তথাপি আমি তাঁহার কবিতার বিলক্ষণ পক্ষপাতী, অর্থাৎ তাঁহার কবিতা আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করে। চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে আমি হেমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলী বহুবার পড়িয়া অনেকস্থলে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। বৃত্রসংহার আদ্যোপান্ত আমি অন্ততঃ তিনবার পাঠ করিয়াছি। এ সব ব্যক্তিগত কথা লিখিবার আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাছে মন্মথ বাবু স্থির করেন যে, হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমি একটা বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া, এবং বৃত্রসংহার হইতে তিনি যে লম্বা লম্বা কোটেশন দিয়া তাঁহার প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহা হইতেই আমি এই কাব্য সম্বন্ধে আমার ধারণা করিয়া লইয়াছি, তাই আমাকে ঐ কথাগুলি বলিতে হইল।

ঠিক সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় বাঙ্গালা লেখক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মন্মথ বাবুর নিশ্চয়ই পড়া আছে। শুধু স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তাহা হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিতেছি:—

"অন্যদেশ অপেক্ষা আমাদের এ দেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোন যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে, কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা প্রথম শ্রেণীর ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। * * * পাঠকেরা কেবল যতটুকু আহ্লাদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলাইয়া যায়, যতটুকু নিজের সংস্কারের সহিত মেলে ততটুকু গ্রহণ করে, বাকীটুকু চোখ চাহিয়া দেখেও না। সেই জন্য যে-সে লোক যেমন তেমন লেখা লিখিলেও চলিয়া যায়।

"অন্যত্র, যে দেশের লোকে ভাবের কার্য্যকরী অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা কেবল মাত্র সংস্কার, সুবিধা ও অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধ নহে, তাহাদের দেশে লেখক হওয়া সহজ নহে। সেখানে লেখকেরা সযত্নে লেখে, পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে। মিথ্যা দেখিলে কেহ মার্জ্জনা করে না, শৈথিল্য দেখিলে কেহ সহ্য করে না। প্রতিবাদ-যোগ্য কথা মাত্রেরই প্রতিবাদ হয়, এবং আলোচনা-যোগ্য কথামাত্রেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

"কিন্তু এদেশে লেখার প্রতি সাধারণের এমনি সুগভীর অশ্রদ্ধা যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে, তবে লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়। ভাবে, নিশ্চয়ই বাদীর সহিত প্রতিবাদীর একটা গোপন বিবাদ ছিল, এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইল।

"এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।"

সাধনা, মাঘ ১২৯৯, ১৮১-১৮৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

ভাগলপুর।

(২)

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে স্বর্গগত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে ধারাবাহিক চরিতাখ্যান লিখিতেছেন, তাহাতে তিনি হেমচন্দ্র এবং মাইকেলের সমালোচনায় হেমচন্দ্রকে উচ্চাসনে বৃত করিয়াছেন। আমার মনে হয় না যে হেমচন্দ্রকে উচ্চদরের কবি প্রতিপন্ন করিবার জন্য মাইকেলকে খর্ব্ব করিবার আবশ্যকতা আছে। রবীন্দ্রনাথকে মন্মথবাবু তাঁহার স্বদলে দাঁড় করাইয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তদ্রচিত "জীবনস্মৃতি"তে নিজ বাল্য রচনার উপর যে "তীব্র কশাঘাত" করিয়াছেন তাহা "অপ্রিয় সত্য কথনের জন্য লজ্জা" নহে, তাহা প্রকৃত "মত পরিবর্ত্তন প্রকৃত অনুতাপ।" নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি হইতে কবিবরের মাইকেল সম্বন্ধে মত বেশ জানা যাইবে।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কোনো এক সময়ে আমি হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের সহিত মেঘনাদবধের তুলনা করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে আমারই মূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল। যদি

আমার সেই লেখা উদ্ধৃত করিয়া আজ কোনো লেখক আমাকে মাইকেলের প্রতিকূলে তাঁহার স্বদলে সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করান, তবে ইহা আমার কর্ম্মফল।

১লা মাঘ, ১৩২৬.

(স্বাক্ষর) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মন্মথ বাবুর প্রতি আমার অনুরোধ, তিনি যেন তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশ কালে হেমবাবুর সহিত তুলনায় মধুসূদনকে ছোট না করেন, আর যেন তাঁহার প্রথম খণ্ডের পুনঃ সংস্করণ কালে ৺নবীন সেনের উপর হইতে শ্লেষ বাণ সংহরণ করেন। আশা করি আমার এ অনুরোধে অনেকেই সায় দিবেন।

মন্মথ বাবু যেন আমার কথাটিকে প্রতিবাদ হিসাবে গ্রহণ না করেন। তাঁহার সামান্য একটি ভুল সংশোধন করাই আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীসুবোধ সান্যাল।
শ্রীহট্ট।

“মেঘনাদবধ” ও “বৃত্রসংহার”

“মানসী ও মর্ম্মবাণী”র বর্ত্তমান বর্ষের পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীকান্ত সোম মহাশয় “মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে যামিনী বাবু বলিয়াছেন যে সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিলেও দেখা যায়, বৃত্রসংহার মেঘনাদবধের উপাদান লইয়া গঠিত। তিনি ইহার প্রমাণস্বরূপ ঘটনাগত সাদৃশ্য এবং পাত্র পাত্রীর চরিত্রগত সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সাদৃশ্য দেখাইতে গিয়া যামিনী বাবু যে বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা নিম্নের বিবরণগুলি পাঠ করিলে, পাঠক পাঠিকাগণ সম্যক অবগত হইতে পারিবেন।

প্রথম প্রমাণ ঘটনাগত সাদৃশ্য। বৃত্রসংহারের মূল ঘটনা একেবারে হেমবাবুর কল্পিত বা মেঘনাদবধের ছায়া অবলম্বনে রচিত নহে। “জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৩২ সূক্তে বৃত্রসংহারের বিবরণ পাওয়া যায়।

বৃত্রসংহারের মোটামুটি ঘটনা অর্থাৎ বৃত্রের সংহার উপাখ্যান আদিম কাল হইতে আর্য্যগণ অবগত ছিলেন। এবং একপক্ষ উৎপীড়ক অপরপক্ষ উৎপীড়িত বলিয়া যামিনী বাবু মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের যে ঘটনাগত সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহা ঠিক নহে। কারণ উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের সংগ্রাম বিষয়ক ঘটনা ঋগ্বেদে অনেক পাওয়া যায়।

বৃত্রের সহিত বৃত্রহন্তার যুদ্ধবিবরণ যে প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্তার এবং গ্রীকদিগের শাস্ত্র মধ্যেও পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ৩২ সূক্ত হইতেই পৌরাণিক বৃত্রাসুর বধ ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকগুলি পুরাণে বৃত্রাসুর বধের বর্ণনা আছে। সমস্ত পুরাণগুলির বিবরণ তুলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ বাড়াইতে চাহি না। কিন্তু মহাভারতের বনপর্ব্ব বর্ণিত বৃত্রাসুরবধ উপাখ্যানটি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে—

বৃত্রাসুর দেবতাগণকে পরাস্ত করিয়া স্বর্গ জয় করিয়াছিল। তাহার ভয়ে দেবতাগণ পলাইয়া যান। ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট তাহাদের দুঃখকাহিনী বর্ণনা করেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিবেদন শুনিয়া বলিলেন যে “লৌহ, দারু, মেরু প্রভৃতি যে সমস্ত অস্ত্র আছে তাহাতে বৃত্রের নিধন সাধন হইবে না। অতএব সর্ব্বদেবগণ মিলিয়া দধীচি মুনির নিকট বর প্রার্থনা করিলে তিনি নিজ অস্থি দিয়া পরিত্রাণ করিবেন। তাঁহার অস্থিতে বজ্র অস্ত্রের সৃজন হইবে এবং সেই বজ্র অস্ত্রের দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিতে পারিবেন।”

দেবগণ সেই উপদেশ অনুসারে দধীচিমুনির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। পরোপকারের জন্য মুনি নিজদেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অস্থিতে বজ্র অস্ত্র নির্ম্মিত হইল, তাহা লইয়া দেবগণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে বৃত্রসংহার হইয়াছিল।

এই পৌরাণিক উপাখ্যানকে মূলভিত্তি করিয়া হেমবাবু বৃত্রসংহার লিখিয়াছেন।

অসুর নায়ক লইয়া পৌরাণিক বহু উপাখ্যান আছে। সুতরাং বৃত্রসংহারে অসুর নায়ক এবং মেঘনাদবধের রাক্ষস নায়ক বলিয়া কোন প্রকার সাদৃশ্য আছে বলা যায় না। পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহে অজেয় ও অমর এবং আত্মীয়স্বজনে পরিপরিবেষ্টিত অসুরের অভাব নাই। সুতরাং ইহাতেও কোন সাদৃশ্য হয় না। বৃত্রসংহারে এবং মেঘনাদবধে যুদ্ধ-কারণ একপ্রকার নহে। কারণ সীতাহরণ রাবণ নিজের জন্য এবং বৃত্র শচীহরণ ঐন্দ্রিলার জন্য করিয়াছিলেন।

ঘটনাগত সাদৃশ্য পাইলাম না। এক্ষণে পাত্রপাত্রীর চরিত্রগত কোন সাদৃশ্য আছে কি না দেখা যাউক।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্র পাত্রীগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই।" ইহা যে ধ্রুব সত্য তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। বৃত্রের উচ্চ-হৃদয়ের নিকট রাবণ দাঁড়াইতে পারে না। বৃত্র শচীহরণে দুঃখিত, কিন্তু রাবণ নিজের জন্যই সীতাহরণ করিয়াছিলেন। সেইপ্রকার মেঘনাদের সহিত রুদ্রপীড়ের, রামের সহিত ইন্দ্রের, মন্দোদরীর সহিত ঐন্দ্রিলার, প্রমীলার সহিত ইন্দুবালার ও বন্দিনী শচীর সহিত বন্দিনী সীতার চরিত্রগত সৌসাদৃশ্য আছে বলা যায় না। ইন্দ্রকে ইংরাজী ভাষায় Hero বলা যায়। কিন্তু মাইকেলে যাহা বলিয়াছেন যে 'Ram and his rabble'কে তিনি ঘৃণা করেন, তাহা স্বতঃই পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যামিনী বাবু চরিত্রগত দোষগুণ আলোচনা না করিয়া সীতা শচী এবং সরমা ইন্দুবালার যে ব্যক্তিগত সৌসাদৃশ্য দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহা হইতে একটি কাব্যের সহিত অপর কাব্যের সাদৃশ্য আছে বলা যায় না।

মহাকবিগণের উপখ্যানাংশ অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের মহাকাব্যের সহিত ঐ সমস্ত গ্রন্থের সর্ব্ব বিষয়ের তুলনা করা যায় না। মেঘনাদবধ যে একখানি উচ্চশ্রেণীর কাব্য তাহা কেহ অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাই বলিয়ে হেম বাবুর বৃত্রসংহার মহাকাব্যকে বলপূর্ব্বক মেঘনাদবধের স্থূল আদর্শ হইতে গৃহীত বলিতে হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"গোয়ালিয়র" সম্বন্ধে দু-একটি কথা।

(১)

অগ্রহায়ণ মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে গোয়ালিয়র শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখিয়া বিমলকান্তি বাবু যে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন তাঁহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কতকগুলি ভুল সংবাদ দিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ আবশ্যক।

বিমলকান্তি বাবু আমার খুব পরিচিত। তিনি গোয়ালিয়রে অনেক দিন বাস করিয়াছেন। ষ্টেশনে ডিটেকটিভ কর্ম্মচারী থাকে বটে, তবে অমন প্রকাশ্যভাবে যাত্রীগণকে লইয়া টানা টানি করে না। তাহারা অলক্ষ্যে যাত্রীদের গতিবিধির উপর নজর রাখে; যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ হয়, ষ্টেশনেই নামধাম জিজ্ঞাসা করে, টোঙ্গাওয়ালার পশ্চাতে শীকারের পিছনে ব্যাধের মত ছুটে না। প্রত্যহ শত শত যাত্রী গোয়ালিয়রে আসিতেছে, ওরূপ হইলে তাহাদের বিলক্ষণ নাস্তানাবুদ হইতে হইত।

ভিলসা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে যে পুষ্করিণী আছে তাহার বর্ণনাটি অতিরঞ্জিত হইয়াছে। সেটা খুব বড়ও নয়, অত্যন্ত গভীরও নয়। পুষ্করিণীর মাঝখানে একটি বাড়ী আছে। ছেলেরা সাঁতার দিয়া গিয়া তাহার উপর উঠিয়া বিশ্রাম করে, আর সন্ধ্যার সময় অনেকেই তাহার উপর বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া থাকেন। দুইদিকে পাহাড় থাকায় বর্ষার জল জমিয়া এই পুষ্করিণীর সৃষ্টি। তাহার চারিদিক বেশ পাথর দিয়া মজবুত করিয়া বাঁধান।

বিমলবাবু গোয়ালিয়রে যে "বান্ধব নাট্যসমিতি"র উল্লেখ করিয়াছেন, সেটার নাম "গোয়ালিয়র বান্ধব সমিতি।" ঐ সমিতির লক্ষ্য খুব উচ্চ—পরস্পরের ভিতর একটা প্রীতি বর্দ্ধন, সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র হইয়া কোন একখানি নাট্যপুস্তক লইয়া তাহার অভিনয় শিক্ষা করা এবং একটি বঙ্গ-সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এতদিন পরে গোয়ালিয়রে একটি বঙ্গসাহিত্যসভা স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির পৃষ্ঠপোষকেরা কেহই মূর্খ নহেন। আমাদের রিহাস্যাল মাষ্টার ছিলেন শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি একজন সুগায়ক ও বাঙ্গালা ভাষায় বেশ শিক্ষিত। আমরা প্রথমে বঙ্গের অমর নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" নাটক খানি ধরিয়াছিলাম। পাগলিনীর অভিনয় করিয়াছিলেন জ্যোতিষবাবু। শ্রদ্ধাস্পদ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে আমাদের প্রত্যহ সান্ধ্যমিলন হইত। প্রত্যেক দিন বিমলকান্তি বাবুও ঐ সমিতিতে উপস্থিত থাকিতেন; তবে পাগলিনীর উক্তি কেন যে তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না তাহা আমরা বলতে পারি না। হয়ত সে সময় তিনি কল্পনা রাজ্যে ভ্রমণ করিতেন, মরজগতের কোলাহল তাহার কর্ণে প্রতিহত হইয়া আসিত, মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিত না।

বিমলকান্তি বাবু পাত্র পাত্রীগণের ভাষার উপর যে বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতেও বড়ই বিস্মিত হইলাম। আজ যদি কোন কলিকাতাবাসী সাহিত্যরথী আসিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভাষাকে "ফারসীর ফোড়ন দেওয়া হিন্দী বাঙ্গলা মিশ্রিত এক অদ্ভুত খিচুড়ী বিশেষ" বলিতেন, তাহা হইলে আমরা সেটা মানিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু যিনি আমাদের সঙ্গী ও বন্ধু, তাঁহার মুখে এ কথাটা শোভা পায় কি?

বিমলকান্তি বাবু লিখিয়াছেন যে পোষ্ট আফিসের দক্ষিণে পুরাতন প্রাসাদ, ইহার পার্শ্বেই ভিক্টোরিয়া কলেজ। কিন্তু আমরা জানি, ভিক্টোরিয়া কলেজ বর্ণিত স্থান হইতে অনেক দূরে। বিমলকান্তিবাবু হঠাৎ যদি আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য

প্রদীপপ্রান্তে তাঁহার সাহায্যে আর একটি কলেজ পোষ্ট আফিসের পার্শ্বে খাড়া করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেটা নিশ্চই একটা অদ্ভুত আবিষ্কার।

শ্রীসুশীলকুমার রায়।
গোয়ালিয়র।

(২)

প্রবাস জীবনে অবসর মত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পড়ি। অগ্রহায়ণ সংখ্যার সূচীপত্রে দৃষ্টি করিতেই শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত গোয়ালিয়র প্রবন্ধ নয়নগোচর হইল। লেখকের সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও গোয়ালিয়রের সহিত ঘটনাসূত্রে আজ পঞ্চদশ বর্ষকাল পরিচিত আছি, এবং ইহার তথ্য যৎসামান্য জ্ঞাত আছি বলিয়াই বিমলকান্তি বাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্তের দুই একটি ভ্রম প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। উপযুক্ত মনে হয় ত পত্রখানি আগামী সংখ্যায় মুদ্রিত করিবেন।

এই প্রবন্ধে গোয়ালিয়রের কয়েকটি দৃশ্য সম্বন্ধে ভুল বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বিমলকান্তিবাবু প্রবন্ধের প্রথমেই আগ্রা গোয়ালিয়রের পথে থার্ডক্লাশের "আরোহীদল" ও "আরোহিণীগণে"র গঞ্জিকাসেবনের যে উৎকট পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব আছে। তিনি যে জাতীয় আরোহীগণের বর্ণনা করিয়াছেন তাহারা যে গঞ্জিকা সেবনে অনভ্যস্ত, পশ্চিমবাসী মাত্রেই তাহা জানেন। পরে (৪১৩ পৃষ্ঠায়) সেণ্ট্রাল জেলের অবস্থিতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পার্ব্বত্যপথ পার হইয়া সম্মুখেই গোয়ালিয়রের সেণ্ট্রাল জেল।" এই উক্তিও ঠিক নয়। পার্ব্বত্যপথ বা গিরিসঙ্কট পার হইলেই সেণ্ট্রালজেল সম্মুখে পড়ে না; এখান হইতে জেলখানা প্রায় অর্দ্ধমাইল। জেলে সতরঞ্চি, গালিচা ও বস্ত্র প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু "পশমের সুন্দর সুন্দর বিভিন্নপ্রকারের আসন, ধুতি, শার্ট, কোট প্রভৃতির জন্য নানা ফ্যাসানের কাপড় ও ছিট" যে প্রস্তুত হয় তাহা জানিতাম না। আর গোয়ালিয়রের অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি যে সেণ্ট্রাল জেল হইতে পোষাক প্রস্তুত করান, তাহাও পূর্ব্বে শুনি নাই।

লেখক গোয়ালিয়রের যে বান্ধব নাট্যসমিতির পরিচয় দিয়াছেন, সেই সমিতির সভ্যগণের অধিকাংশই স্কুল কলেজের ছাত্র এবং উহা এতই অকিঞ্চিৎকর যে এপর্য্যন্ত কোন গোয়ালিয়র ভ্রমণকারীই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। লস্কর সহরের কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য সম্বন্ধে লেখক যে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন, অবিলম্বে তাহার সংশোধন করা প্রয়োজন, নতুবা অজ্ঞলোকে এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে বিশেষ ভ্রমে পতিত হইবেন। প্রথমতঃ (৪১৮পৃঃ) জিয়াজীরাওয়ের পার্ক। লেখক এই পার্কের বাঙ্গলা করিতে গিয়া ইহাকে উদ্যান বলিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহার সহিত উদ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই এবং এখানে হওয়া অসম্ভব। ইহা লৌহশৃঙ্খলিত বিদ্যুতালোকে শোভিত একটি বৃত্তাকার ভূমি, মধ্যস্থলে উচ্চ বেদীতে মৃত মহারাজের প্রস্তরমূর্ত্তি। (৪১৯ পৃঃ) গোয়ালিয়রের পাকা চীফজষ্টিস্ এক-একজন মহারাষ্ট্র নহেন; ইনি ব্যারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত নবাব সৈয়দ সুলতান আহাম্মদ বাহাদুর, সম্প্রতি ইনি লাহোর দাঙ্গা বৈঠকের অন্যতম সদস্যরূপে কার্য্য করিতেছেন। "জেনারেল পোষ্টাফিসের দক্ষিণে পুরাতন প্রাসাদ, ইহার পার্শ্বেই ভিক্টোরিয়া কলেজ"---লস্করবাসী মাত্রেরই হাস্যোদ্দীপক। ভিক্টোরিয়া কলেজ জেনারেল পোষ্টাফিসের নিকট ত নহেই, পরন্তু ঠিক বিপরীত দিকে, সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে, পোষ্টাফিস হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী। "ভিক্টোরিয়া কলেজের বহির্ভাগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মার্কেট" এই উক্তি হাস্যজনক। কেন না এই মার্কেট জেনারেল পোষ্টাপিসেরই পার্শ্বে এবং জিয়াজী পার্কের দক্ষিণে। লেখক যাহাকে "সিন্ধিয়ার খাস আস্তাবল" বলিয়াছেন, তাহা কোন প্রান্তরে অবস্থিত নহে, বস্তুতঃ তাহা একটি প্রস্তর-প্রাচীর বেষ্টিত স্থান এবং সেখানে যে সকল অশ্ব রক্ষিত হয়, তাহাই মহারাজের Irregular Forceএর Cavalry বিভাগ। পূর্ব্বে এই সৈন্যই বর্গী বলিয়া উক্ত হইত।" বিমলকান্তি বাবু প্রবন্ধের এই স্থলে খিচুড়ি পাকাইয়াছেন। যেখানে খাস আস্তাবলের কথা লিখিয়াছেন, সেই স্থলেই মহারাজের বর্ত্তমান সেনানিবাস বা ছাউনী, ইংরাজীর অনুকরণে ইহাকেই "ক্যাম্প্-কোঠী" কহে। "ক্যাম্প্"র উত্তর দিকের ময়দানে মহরমের মেলা বসে এবং তাহারই একাংশে প্রতিবৎসর তাজিয়া নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে "রাজমাতার বাসের জন্য" কোন "প্রকাণ্ড ভবন" নাই। তিনি যে ভবনের কথা লিখিয়াছেন, সেই ভবনে নর্ম্মাল ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপিত। সর্ব্বশেষে লেখক বলিয়াছেন, "গোয়ালিয়র মহারাজের কিছু সৈন্যও সর্ব্বদা এইস্থানে উপস্থিত থাকে।" এই বাক্য যে "ক্যাম্প্"র সহিত একেবারেই খাপ খায় না, তাহা বুঝিতেছেন, কারণ এই ছাউনীই মহারাজের Regular সৈন্যদলের বাসস্থান।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।
পাটনা।

চির-অপরাধী

(উপন্যাস)

দশম পরিচ্ছেদ

অদৃষ্ট চক্র।

দাওয়ায় মাদুরের উপর দ্বারিক বসিয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে তখন আর কেহই ছিল না। অপরাহ্নের আর বেশী দেরী নাই। তাহার শাশুড়ী পুকুরে কাপড় কাচিতে গিয়াছে; ছোট শ্যালকটীও মায়ের অনুসরণ করিয়াছে।

দ্বারিক বসিয়া বসিয়া দ্রৌপদীর কথাই ভাবিতেছিল। আজ লইয়া পাঁচ দিন দ্রৌপদী বাড়ী-ছাড়া। প্রিয়জন-বিরহ উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর নরনারীকে সমানভাবেই কাতর করিয়া থাকে। তবে কৃষকের বিরহ ভাষায় আকারপ্রাপ্ত হইয়া সাহিত্যের পুষ্টি করে না—এইমাত্র প্রভেদ।

এই কয়দিনে দ্বারিক মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে, দ্রৌপদী তাহার জীবনের কতখানি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ঘর হইতে বাহিরে বসাইয়া-দেওয়া, বাহির হইতে ঘরে তুলিয়া আনা, স্নান আহার সবই সময়মত হইতেছে—তবু সব কাবেই যেন কোথায় একটু ফাঁক রহিয়া যাইতেছে।

তাঁহাদের গ্রাম হইতে পাটুলির ষ্টেশন একক্রোশ দূরে। দক্ষিণ হইতে কখন্ কখন্ গাড়ী আসে, সেই সময়ের উপর আর আধঘণ্টা-খানেক যোগ দিয়া দ্রৌপদীর যাওয়ার তৃতীয় দিন হইতে সে দ্রৌপদীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

আজও বিকালের দিকে দ্রৌপদী হয়ত আসিতে পারে, দ্বারিক তাহাই ভাবিতেছিল।

দ্বারিকের শয়ন ঘরটি দক্ষিণ দুয়ারী। তাহার পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বমুখ রান্নাঘর, রান্নাঘরের উত্তরে অনেকটা ঘেরা জমী। সেইখানকার উৎপন্ন তরীতরকারী ও বাড়ীর গরুর দুধ বিক্রয় করিয়া তাহাদের দুইজনের অন্ন-সংস্থান হয়। দ্বারিকের বাড়ীর খিড়কি ঠিক রান্নাঘরের সম্মুখে। সে প্রায় পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকে। সেখান হইতে বাগানটা বেশ দেখা যায়। কিন্তু খিড়কী দিয়া কেহ প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া, বাগানের দিকে চাহিয়া দ্বারিক দেখিল, প্রতিবেশীর একটা প্রকাণ্ড গরু বাগানে ঢুকিয়া লাউগাছটী খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। লোহার সিন্দুকে চোরের হাত পড়িতে দেখিলে বড়লোকের অবস্থা যেমন হয়, গরু গাছ নষ্ট করিতেছে দেখিয়া দ্বারিকের অবস্থা তাহার চেয়েও সাংঘাতিক হইয়া উঠিল; কিন্তু উঠিবার উপায় নাই। বারকয়েক সে খুব জোরে জোরে তাড়া দিয়া দেখিল। কোনই ফল হইল না। গরুটী তাহা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া বিজ্ঞের মত আপন মনে লাউগাছের কচি কচি ডগাগুলি চিবাইতে লাগিল। তখন দ্বারিককে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। হাতের কাছেই তাহার সেই মাঝারী লাঠি গাছটা পড়িয়া ছিল। গাছটী নষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় সেই লাঠিগাছটী তুলিয়া, প্রাণপণ জোরে দ্বারিক তাহা গরুটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল।

যখন দ্বারিক চীৎকার করিয়া গরুটাকে তাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক সেই সময় দ্রৌপদী খিড়কী দিয়া বাড়ী প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামীর উদ্বিগ্ন চীৎকার শুনিয়া ও বাগানের দিকে চাহিয়াই, সে বরাবর স্বামীর নিকট না গিয়া, হাতে যে দুই একটা জিনিষ ছিল, তাহা মাটীতে রাখিয়া গরু তাড়াইতে গেল। যে সময়ে দ্বারিক লাঠিগাছটা ছুড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে সে গরুর

কাছাকাছি পৌছিয়াছিল। স্বামীর লাঠিছোড়া দ্রৌপদী দেখিতে পায় নাই। যে মুহূর্ত্তে সে গরুটা তাড়াইবার জন্য হাত তুলিয়াছে, দ্বারিকের নিক্ষিপ্ত লাঠিগাছটা সেই মুহূর্ত্তে সজোরে আসিয়া তাহার মাথার কাছটায় লাগিল। একটা ক্ষীণস্বরে 'মাগো' বলিয়াই দ্রৌপদী মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

দ্বারিকের লাঠি ছোড়া, দ্রৌপদীর গরুর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং লাঠির দ্বারা আহত হওয়া—এই তিনটি কার্য্যই নিমেষের মধ্যে ঘটিয়া গেল। লাঠি ছোড়া এবং দ্রৌপদীকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে, নিতান্ত আর্ত্তস্বরে একটা হৃদয়ভেদী চীৎকার করিয়া স্ত্রীর নিকট ছুটিয়া যাইবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিতে গিয়া, দাওয়া হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িয়া দ্বারিক সংজ্ঞা হারাইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সতী সাবিত্রী।

দ্রৌপদীর মা পুকুর হইতে ফিরিয়া, ভূলুণ্ঠিতা দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র "একি সর্ব্বনাশ গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া কন্যার নিকট ছুটিয়া আসিল। কন্যাকে তুলিতে গিয়া তাহার স্পন্দহীন শিথিল দেহ লক্ষ্য করিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। বসিতেই দূর হইতে আবার জামাতার মূর্চ্ছিত দেহ উঠানের উপর দেখিয়া, "ওগো আমার একসঙ্গে কি সর্ব্বনাশ হল গো, ওগো তোমরা কেউ এস গো" বলিয়া দ্রৌপদীর মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার শিশুপুত্রটি মায়ের আকস্মিক চীৎকারে একটুখানি হতবুদ্ধি থাকিয়া, মায়ের সহিত ক্রন্দনে যোগ দিল।

ক্রন্দন শুনিয়া প্রতিবেশীদিগের মধ্য হইতে দুই চারি জন পুরুষ ও ছিদামের মা ছুটিয়া আসিল। আর কিছু না বুঝিলেও, স্বামী স্ত্রী দুইজনেই অজ্ঞান হইয়া আছে এটুকু বুঝিয়া, সকলে মিলিয়া দুইজনের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল। দ্রৌপদীকে সচেতন করিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা করিতেই তাহারা বুঝিল, ইহার চেতনা এজগতে আর ফিরিবে না। কিসে যে মৃত্যু হইল তাহারা তাহা ভাবিয়া পাইল না। একবার ভাবিল, বোধ হয় সাপের কামড়ে মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু কোথাও তো দংশনের চিহ্ন নাই। লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কেবল রগের উপরটা একটা দড়ার মত দাগ, আর কিছু না। কাছে একগাছা লাঠি পড়িয়া।

যাহারা দ্বারিকের কাছে ছিল, তাহারা বুঝিল দ্বারিকের মূর্চ্ছা হইয়াছে। মাথায় জল দিয়া, বাতাস দিয়া তাহারা দ্বারিকের শুশ্রূষায় রত হইল। কি করিয়া কি ঘটিল কেহই বুঝিল না।

কেমন করিয়া ঘটিল না বুঝিলেও, কি ঘটিয়াছে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

দ্রৌপদীর মা যখন নিশ্চিত জানিল দ্রৌপদীর প্রাণ আর সেই দেহে ফিরিয়া আসিবে না, তখন সে মেয়ের পাশে বসিয়া মর্ম্মভেদী উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। পাড়ার দুই একটি মেয়ে আসিয়া ছেলেটিকে থামাইল।

এদিকে শুশ্রূষার গুণে দ্বারিক চক্ষু মেলিল। বাড়ীভরা এত লোক দেখিয়া এবং উচ্চ ক্রন্দনের রোল শুনিয়া প্রথমটা তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সে কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। ক্রমশঃ তাহার পূর্ব্ব কথা ধীরে ধীরে মনে আসিল। উপস্থিত সমস্ত ঘটনা মিলাইয়া এবং তাহা হইতেই যে দ্রৌপদীর মৃত্যু হইয়াছে, ইহা সে একটু একটু বুঝিল। সমস্ত বুঝিয়াও দ্বারিকের চক্ষে একবিন্দু অশ্রু আসিল না। শুধু অভিভূতের মত একদৃষ্টে দ্রৌপদীর পানে চাহিয়া রহিল। কি করিয়া এ মৃত্যু ঘটিল, এই সম্বন্ধে যখন প্রতিবেশীরা তাহারই সমক্ষে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল, তাহার যে কথা বলিবার আছে, তাহা বলিবার শক্তিটুকু তাহার কণ্ঠে আসিল না।

দ্বারিককে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে দেখিয়া ছিদামের মা নিকটে আসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল —"ওরে দ্বারিক, তোরই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল রে! এমন সতীলক্ষ্মী বৌ আর কোথাও পাবিনে রে!

আহা, মা আমার তিন দিন তিন রাত উপুসী থেকে আজ ভোর বেলাটা বাবার হুকুম পেয়ে উঠেছিল রে! আমি যে রোজ সকালে খোঁজ নিতে যাই তেমনি গিয়েছি; আমাকে দেখেই মা আমার একগাল হেসে বল্লে—পিসি, বাবার দয়া হয়েছে; বাবা স্বপনে দয়া করে ওষুধের নাম বলে দিয়েছেন। পাছে আবার ওষুধের নামটা বলে ফেলে, তাই মাকে নাম বলতে তাড়াতাড়ি বারণ করে, ধরে তুলে স্নান করিয়ে বাসায় নিয়ে গেলাম। বাসায় গিয়ে একটু গুড় মুখে দিয়ে জল খেয়েই বল্লে, পিসি, তুমি বলেছিলে আটটায় গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতেই বাড়ী যাব।' আমি কত করে বল্লাম—বৌমা, বড্ড দুর্ব্বল হয়েছিস, এ বেলাটা থাক্, চাট্টি ভাত খেয়ে জিরিয়ে দুপুরের গাড়ীতে গেলেই হবে। শেষে পথে ভিরমি যাবি! বৌমা, কিছুতেই রইল না, বল্লে—পিসি, কদ্দিন বাড়ী ছাড়া, আমার মনটা বড্ড ছট্‌ফট কচ্চে। বাড়ী গিয়ে থির হয়ে খাব দাব তখন। আহা এমন সতী সাবিত্তির কি কলিকালে জন্মায় রে বাবা!"

ছিদামের মার কথা শুনিতে শুনিতে সকলের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। কথা শেষ হইলে দ্বারিকের মনে সমস্ত চিত্রটী ফুটিয়া উঠিল। একটু একটু করিয়া তাহার অভিভূতের ভাবটা কাটিয়া গেল। যে তাহার জন্য অত কষ্ট করিয়াছে, চারি দিন অনাহারে থাকিয়া যে তাহার আরোগ্যের ঔষধ লইয়া ফিরিতেছিল, তাহাকে সে নিজ হাতে মারিয়া ফেলিয়াছে—এই নিষ্ঠুর কঠিন সত্য ধীরে ধীরে সে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারিল। তখন ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া তাহার কথা কহিবার ও ভাল করিয়া অনুভব করিবার শক্তি ফিরাইয়া দিল। চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, সে তখন কি করিয়া যে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছে তাহা সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া বলিয়া, তাহাকে একবার দ্রৌপদীর কাছে লইয়া যাইবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিল।

দ্রৌপদীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ শুনিয়া কিছুক্ষণ সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কাহারও মুখে একটা কথাও আসিল না। এ কি অদৃষ্টের উপহাস! যাহাকে নহিলে এ হতভাগ্যের এক দণ্ড চলিবে না, পৃথিবীতে যাহাকে ধরিয়া এ বাঁচিয়া আছে, যাহাকে জীবনে কখন একটা কটু কথাও বলে নাই, সেই যখন আরোগ্যের ঔষধ—দেবতার আশীর্ব্বাদ—লইয়া ফিরিল, তাহাকে ঔষধটী দিবার অবসর না দিয়া, চক্ষু মুদিয়া আপনার হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়িয়া ফেলার মত, না বুঝিয়া না দেখিয়া আপনার হাতে মারিয়া ফেলাই ইহার অদৃষ্টে ছিল!

দ্বারিকের কাতর অনুরোধ আর একবার সকলের কর্ণে প্রবেশ করিলে, তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে ধরিয়া দ্রৌপদীর কাছে আনিয়া দিল।

উপকথার সাপের মাথার মাণিক হারাইলে সাপ যেমন সেখানে আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া নিজের প্রাণটাকেও বাহির করিতে চায়, দ্বারিক তেমনি তাহার মাথার মাণিকের চেয়েও অমূল্য দ্রৌপদীকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে হারাইয়া, দ্রৌপদীর বুকের উপর পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুঃখে সান্ত্বনা।

পরদিন প্রভাতে দ্বারিক সেই ঘরের ভিতর একটা পাটীর উপরে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া ছিল। গতরাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কাটিয়াছে। মাঝে মাঝে অবসন্ন শরীর ও মনে একটু তন্দ্রার আবির্ভাব হইয়াছিল; তাহাতেও শুধু দ্রৌপদীকে স্বপ্ন দেখিয়াছে। দ্রৌপদী আসিয়া ডাকিতেছে, দ্রৌপদী তারকেশ্বর যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তারকেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে—ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড স্বপ্নে শেষ রাত্রিটুকু কাটিয়া গিয়াছে। প্রভাতে তাই স্বপ্নের মধুর স্মৃতিটুকুর উপর সত্যের কঠিন আঘাত দ্বারিকের চিত্তে তীব্রতর লাগিতেছিল।

এক রাত্রির ভীষণ ঝড় যেমন বৃক্ষের সমস্ত পুষ্প ও মুকুল নষ্ট করিয়া তাহাকে ছিন্ন ও ভগ্নশাখ করিয়া ফেলে, গত দিবসের ভীষণ ও বজ্রাঘাতের মত আচম্বিত

বিয়োগ দুঃখ দ্বারিকের সমস্ত আশা সমস্ত ভরসা নষ্ট করিয়া তাহাকে বৃদ্ধ ও জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এ কয়দিন দ্বারিক প্রতিমুহূর্ত্তে যাহার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, আজ জাগিয়া দেখিল, আজ আর কাহারও প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। সমস্ত দিন রাত্রি যদি ঐ দুয়ারটার পানে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকে, তবু সে একবার আসিবে না, সেই পরিচিত কণ্ঠে বলিবে না— 'আমি আসিয়াছি।'

হঠাৎ দ্বারিকের মনে হইল, সে কি তবে সহসা এমন কঠিন ভাবে চলিয়া যাইতে পারে? গোয়ালঘরে যাইলে হয়ত এখনই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই বক্ষ বেষ্টন করিয়া কটিদেশে বস্ত্রাঞ্চলখানি জড়াইয়া, গরুবাছুরগুলি একে একে বাহিরে বাঁধিয়া দিয়া গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিতেছে। পরক্ষণেই, তাহা যে কতখানি অসম্ভব তাহা মনে করিয়া, এই দশ বৎসর যে নামে তাহাকে ডাকিয়া আসিয়াছে, দ্রৌপদীর সেই পরিচিত নাম ধরিয়া ডাকিয়া দ্বারিক অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

হতভাগ্যকে সান্ত্বনা দিবার কিছু এবং কেহই ছিল না। তাহার শাশুড়ী সন্ধ্যার পর কন্যার মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরুর গাড়ী ডাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গিয়াছিল। ছিদামের মা ও গ্রামের একজন যুবক অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার নিকট থাকিয়া, আবার সকালে আসিবে বলিয়া আপন আপন গৃহে ফিরিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া দ্বারিক কিছু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। আর কেহ হাত ধরিয়া উঠাইবার নাই, ঘর হইতে বাহিরে আনিয়া এবং সময়মত বাহির হইতে ঘরে আনিয়া দিবার কেহ নাই; তাই অতি কষ্টে সে শুইয়া বসিয়া, অনেক করিয়া,আপনি আপনি ঘর হইতে বাহিরে আসিল। সেই দাওয়ায় বসিয়া, সেই বাগানটার পানে চাহিয়া, কি করিয়া সে আপন হাতে আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাই ভাবিতে-লাগিল। হা ভগবান! এই পক্ষাঘাত রোগে তাহার পা দুখানার সহিত হাত দুটাও কেন পড়িয়া যায় নাই। তাহা হইলে তো কিছুতেই এ কাণ্ড ঘটিত না, এমন করিয়া তাহাকে অসহায় হইতে হইত না।

কত কথাই দ্বারিক ভাবিতে লাগিল! কেন সে দ্রৌপদীকে তারকেশ্বর যাইতে দিল? সে যদি বলিত, না তোমাকে যাইতে হইবে না, এত কষ্ট তোমাকে আমি করিতে দিব না, তাহা হইলে কি দ্রৌপদী যাইতে পারিত? কিন্তু সে কি একটা কম প্রলোভন! আবার সে সুস্থ সবল হইয়া উঠিবে, আবার সেইরূপ মাটিতে হাঁটিয়া, ছুটিয়া, লাফাইয়া বেড়াইবে, তেমন অক্লান্ত ভাবে আবার কাষ করিবে—সর্ব্বোপরি দ্রৌপদীকে আর কোন কাযে বাহিরে যাইতে হইবে না —এ প্রলোভন কি জয় করা যায়!

তিন দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া, কত কষ্ট সহ্য করিয়া সে তো দেবতার নিকট ঔষধ পাইয়াছিল। তাহার নিজের ভাগ্যে সুখ ও স্বাধীনতা নাই, তা আর দ্রৌপদী কি করিবে! কিন্তু দেবতার কি এই উচিত হইল। তিনি তো তাহাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিলেই পারিতেন। দ্রৌপদীকে ঔষধ বলিয়া দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া, হতভাগ্য দ্বারিকের অদৃষ্টে তিনি এমন বজ্র হানিলেন কেন? চিরকালের জন্ম তাহাকে এমন অপরাধী করিয়া রাখিলেন কেন?

ঔষধ লইয়া কি আনন্দেই দ্রৌপদী বাড়ী ফিরিয়াছিল! কি করিয়া ঔষধ পাইল, কেমন করিয়া সেখানে কয়দিন কাটাইল, স্বামীর জন্ম কত দুর্ভাবনাই তাহার হইতেছিল—কত কথাই যে দ্রৌপদীর বলিবার ছিল! লাঠির একটা আঘাতেই যে সে তাহার সব কথার শেষ করিয়া দিয়াছে। কি ভাবিতে ভাবিতেই তাহার প্রাণটা বাহির হইয়াছে!

তখন ধীরে ধীরে আর একজনের কথা দ্বারিকের মনে পড়িল, যে এই দারুণ দুঃখ, এ দুর্ভাগ্য, তাহার অকপট স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়া সহনযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিত, আজিকার এই সর্ব্বরিক্ত নিরাশ্রয়ের

অবলম্বন হইত। কিন্তু সে এখন কতদূরে! এতদিন কোন সন্ধান না লইয়া, আজ কি করিয়া তাহাকে জানাইবে—আমি নিজের মাথায় নিজেই বজ্র হানিয়াছি, আমাকে ঔষধ দাও। না, সে এই কঠোর দুর্ভাগ্যের কথা কাহাকেও জানাইবে না; সাহায্য বা সহানুভূতির জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইবে না। তাহার আবাল্যের বন্ধু কুঞ্জধনেরও না। সমস্ত দুঃখ সহিয়া এইখানেই সে আপনাকে তিল তিল করিয়া নিঃশেষিত করিয়া দিবে।

ভাবিতে ভাবিতে দ্বারিক এমনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে,কখন্ যে দুইজন পুলিশের লোক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। একটি কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া স্থানীয় পুলিশ ইন্‌স্পেক্‌টার সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"তোমারই নাম দ্বারিক ঘোষ?" প্রশ্নে চমকিত হইয়া দ্বারিক তাহাদের দিকে ফিরিল। তাহার পূর্ব্বকার দৃঢ়তা আর ছিল না, তাই বাড়ীর ভিতর পুলিশ দেখিয়া সে ক্ষণকালের জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কি একটা কথা মনে পড়ায় তাহার সমস্ত ভয় দূরে গেল। সহজ কণ্ঠেই দ্বারিক উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম দ্বারিক ঘোষ।"

ইন্‌স্পেক্টর সেইখানে দাঁড়াইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"কাল কি আপনার স্ত্রী মারা গিয়াছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিসে মারা গেল?"

দ্বারিক ক্ষণমাত্র ভাবিয়া বলিল—"আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।"

বিস্মিত হইয়া ইন্‌স্পেক্টর দ্বারিকের পানে চাহিলেন। তাহার মুখে শুধু গভীর নৈরাশ্য ও বিষাদ অঙ্কিত দেখিলেন; অপরাধীর কোন চিহ্ন সেখানে পাইলেন না। পুনরপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিজন্য তুমি এমন কাজ করলে?"

"আমার অদৃষ্টের লেখা। আমার মতিভ্রম ঘটেছিল।"

"তুমি সমস্ত সত্য ঘটনা আমাকে নির্ভয়ে বল। আমি তোমার ভালর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

দ্বারিক এবার হাতযোড় করিয়া বলিল, "আমি সব সত্য বলছি; কিন্তু দোহাই আপনার, আমার ভালোর জন্যে চেষ্টা করবেন না। যাতে আমি খুব কঠিন শাস্তি পাই, তারই ব্যবস্থা আপনি দয়া করে করে দিন।"—বলিয়া দ্বারিক সংক্ষেপে মৃত্যু বিবরণ বিবৃত করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। এইরূপ মর্ম্মভেদী বিবরণ তিনি অতি অল্পই শুনিয়াছিলেন।

ঘটনার অব্যবহিত পরে সেখানে কে কে উপস্থিত ছিল একটু পরে ইন্‌স্পেক্টর তাহা জানিয়া লইয়া, তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে, একে একে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

দ্বারিক একদৃষ্টে সেই বাগানটার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল—"খুন করলে ফাঁসী হয়; আমি খুন করেছি। তবে আমার কেন ফাঁসী হবে না?"

মজ্জমান ব্যক্তির তৃণ-ধারণের ন্যায় দ্বারিকের শোকাকুল চিত্ত ফাঁসীর চিন্তাকে আঁকড়িয়া ধরিল। আঃ—ফাঁসী হইলে তো দ্বারিক বাঁচিয়া যায়! এই পঙ্গু অবশ দেহ, এই জীর্ণ জীবনটাকে আর বহিয়া বেড়াইতে হয় না। ফাঁসীকাষ্ঠে তুলিয়া একটামাত্র আঘাত! পরক্ষণেই সব মিটিয়া যাইবে। দ্বারিক দ্রৌপদীর উত্তোলিত ব্যগ্র বাহুর মধুর বন্ধনে গিয়া জুড়াইবে।

ইন্‌স্পেক্টর দূরে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশিগণের নিকট হইতে তথ্য গ্রহণে ব্যস্ত এবং দ্বারিক পূর্ব্বোক্ত চিন্তায় মগ্নচিত্ত, এমন সময় একটি যুবক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখে ইন্‌স্পেক্টরকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "একি পাঁচু বাবু যে!"

"কেষ্টবাবু!" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টর যুবকের পানে বিস্ময়-প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন।

যুবক দ্বারিকের বাল্যবন্ধু ও ইন্‌স্পেক্টরের সতীর্থ কৃষ্ণধন।

কৃষ্ণধন বলিল, "আপনিই তাহলে ইন্‌স্পেক্টর। ভগবান্ রক্ষা করেছেন। পুলিশ এসেছে শুনে আমি ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছিলাম—সর্ব্বনাশের উপর আবার কি সর্ব্বনাশ হয়!"

ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর, হঠাৎ কোথা থেকে? আজকাল কোথায় আছেন?"

কৃষ্ণধন বলিল, "সব কথা পরে বল্‌ছি। আগে দ্বারিকদার কাছে যাই। দ্বারিকদা আমার বন্ধু, আমার ভায়ের মত। কি করে যে দ্বারিকদার মুখের দিকে চাইব"—বলিতে বলিতে কৃষ্ণধন যেখানে দ্বারিক বসিয়াছিল সেই দিকে অগ্রসর হইল।

দাওয়ার নিকট আসিয়া কৃষ্ণধন দ্বারিককে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। যেখানে সে বিশাল পর্ব্বত দেখিয়া গিয়াছিল, আজি সেখানে আসিয়া ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপ দেখিতে পাইল।

সেই মহৎ হৃদয় ও বিপুল শক্তির এই পরিণাম! আর এতদিন সে ইহার কোন সন্ধান রাখে নাই!

"দ্বারিকদা"—বলিয়া ডাকিতে আজ আর কৃষ্ণধনের সাহস হইল না। সে নতশিরে ধীরে ধীরে দাওয়ার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দে দ্বারিক চমকিত ভাবে পিছনের দিকে ফিরিয়া কৃষ্ণধনকে দেখিতে পাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বারিকের চিত্তে বাল্য ও প্রথম যৌবনের সমস্ত সুখচিত্র ফুটিয়া উঠিয়া, তাঁহার ভগ্ন বক্ষ আলোড়িত করিয়া তুলিল। মুখ দিয়া একটা অস্পষ্ট শব্দমাত্র উচ্চারিত হইল—"কেষ্ট।"

কি করুণ স্বর! একটি মাত্র ক্ষুদ্র অর্দ্ধস্ফুট আহ্বানে এতদিনকার সকল ব্যথা কি করিয়াই প্রকাশিত হইল! এই কম্পিত আহ্বান, কৃষ্ণধনকে যেন বলিয়া দিল—"বন্ধু, বিদেশে যাইবার সময়ে আমাকে সর্ব্বসুখে সুখী দেখিয়া গিয়াছিলে, আর আজ আমি সর্ব্বরিক্ত নিরাশ্রয়। আমার মত দুঃখী আজ পৃথিবীতে কোথাও নাই।"

কৃষ্ণধনের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। একটিও ব্যর্থ সান্ত্বনার কথা না বলিয়া, কৃষ্ণধন সজলনেত্রে বন্ধুর পাশে বসিয়া প্রগাঢ় সহানুভূতি ও স্নেহভরে দ্বারিকের স্কন্ধে আপনার দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিল।

দারুণ শোকাবেগে দ্বারিকের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দ্বারিক কাঁদিয়া বলিল, "একটা দিন আগে যদি আস্‌তে ভাই।"

বলিয়া দ্বারিক বন্ধুকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বন্ধুর অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইয়া, অপরিসীম স্নেহভরে তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া নির্ব্বাক কৃষ্ণধন বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

এই শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা জগতে দুর্ল্লভ।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

মুখরা

কেন কোনো কথা শুনিব কাহারো? কেন? কোন অপরাধে?
মুখরা মুখরা কহিতেছ সবে, মুখরা হয়েছি সাধে?
সাধে কি কাহারো কথা শুনে মোর সারা দেহ যায় জ্বলে,
সবাই তোমরা হইতে মুখরা মোর মত দশা হলে।

মা-হারা হলাম বয়স যখন মাত্র বছর দেড়,
না যেতে ছ'মাস গেল বাপ মরে, কেন কপালের ফের !
কোল-হারা হয়ে রোগে ভুগে ভুগে, রোদে, পুড়ে, শীতে জমে,
গড়ায়ে গড়ায়ে কেঁদে কেঁদে কেঁদে, বড় হইলাম ক্রমে।

বড় ত হ'লাম। বড় হয়ে ওঠা লাগিল না কারো ভালো।
বেয়ারামে ভোগা দেহখানা রোগা, তাতে বড় ছিল কালো,
যত বুড় হই, দাদারো ততই মুখখানা হয় ভার,
দূরে থাক্ কোনো আদর যত্ন—কথাও ক'ন না আর।
বৌদিদি মোর উঠিতে বসিতে কেবল পাড়িত গালি
ছিলনাক খাওয়া,—ছিল দুই বেলা 'পিণ্ডি গেলাই' খালি।
রুখু কটা চুলে ময়লা কাপড়ে হয়ে উঠিলাম ধাড়ী—
দাদার গলায় লাগিলাম ফাঁস আমি এ লক্ষ্মীছাড়ী।

অল্প টাকায় তেজবরে এক বুড়ো বর খোঁজি করে
এক দিন দাদা বিদায় দিলেন—ঠিক যেন ঘাড় ধরে।
বিধবা ননদী ছিল একজন, শাশুড়ী ছিল না মোর,
উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি, বাপ্ রে! তার কি মুখের জোর,
তোমরা আমারে মুখরা বলিছ, তাহারে দেখনি বলে ;—
পাণ হতে চুণ খসিয়া পড়িলে উঠিত্ যে রাগে জ্বলে।
স্বামী থাকিতেন বিদেশে, কাজেই কেহ মোরে পুছিত না ;
ময়লা কাপড় রুখু চুল তাই সেখানেও ঘুচিল না।

বুড়ো ছিল বটে, লোক ছিল ভাল, ক'দিনে যা পরিচয় ;
মিছে বলিব না, অভাগীরে ভালবাসিত সে অতিশয়।
তা'হলে কি হয় ? কপাল কেমন ? রোগ হয়ে বাড়ী এল
না যেতে বছর ছারকপালীর সীঁথির সিঁদুর গেল।
সকলি খাইয়া দেবরের ঘরে ছিনু মাস নয় দশ,
সেথা হাড়ভাঙা খাটুনী খেটেও হলোনা একটু যশ।
ননদী যায়েরা একদিনো মোরে কথা কহিল না হেসে,
কাঁদিতে কাঁদিতে দাদারি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিনু শেষে।

এক বেলা হেথা খাই দুটো, তাই বসে বসে খাই কি ?
আসা মাত্তর দাদা বৌদিদি ছাড়ায়ে দেছেন ঝি।

গম যব পিষি, ঢেঁকী পাড় দেই, সারাদিন ধরে রাঁধি,
দিনে অবসর পাইনাক বলে রাতে বসে' বসে' কাঁদি।
তবু বৌদির টিস্‌টিস্‌ কুরা ক্রমেই বাড়িতে রয়।
আপনার হাঁড়ী খেটে খুটে খাই, বেশী কথা কিছু নয়,
এত খাটি তবু ঘৃণা অবহেলা,—এই বড় মোর দুখ!
সহিতে না পেরে ক্রমে ক্রমে বেড়ে তাই ছুটে গেল মুখ।

মাথা গুঁজে গুঁজে মুখ বুজে বুজে বলো আর কত সই?
বরাবর আমি—তোমরা ত জানো—এমন মুখরা নই।
বাপ ভাই বোন মায়ের আদর, সোয়ামীর ভালবাসা,
মা-বলিয়া ডাক জুটিল না কিছু;—এ জীবনে নাই আশা।
ভুলেও মিষ্টি কথাটি যাহারে কেহ বলেনিক ডাকি,
সে পোড়ামুখীর পোড়ামুখে শুধু অমৃত ঝরিবে নাকি?
তোমরা কি বল এতেও আমি সুভাষিণী হয়ে রবো?
মড়ার বাড়া ত গাল নাই আর,—কেন কারো কথা সবো?

শ্রীকালিদাস রায়।

সাধনার পথে

নদী যখন অন্ধকার গিরিকন্দরে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে তথা হইতে মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সে কোন মতেই নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। তাহার আবির্ভাবের অতি মৃদু আনন্দগুঞ্জন তখন প্রচণ্ড কলস্বরে পরিণত হইয়া তাহার সাগরমিলনের যাত্রা-পথটিকে নিরন্তর মুখরিত করিয়া রাখে, এবং দেশবিদেশ হইতে নবাগত পান্থ তাহার শ্যামল তটে ক্ষণেকের তরে জীবনের বোঝা নামাইয়া শরীর মন স্নিগ্ধ শীতল করিতে সমর্থ হয়। আমাদের যে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটি এতদিন সঙ্কোচে সরমে একপ্রকার আত্মগোপন করিয়া ছিল, যাহার প্রবাহ এখনও বড় বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, আজ তাহা প্রকাশ্যভাবেই সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে, আনন্দোচ্ছ্বাসের অস্পষ্ট কলরব তাহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে এমনই এক অগ্রহায়ণের দিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে আমরা কয়েকজন যখন বোলপুরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি কথাপ্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অধুনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পূর্ব্বের মত

আর মেলামেশার ভাব লক্ষিত হয় না, আমরা নিজ নিজ কাজ বা স্বার্থ লইয়াই এত বেশী ব্যস্ত ও বিব্রত যে এখন আর পাঁচজনে মিলিয়া বৈঠকী আলাপের আমোদ উপভোগ করিবার অবসর পাই না, অথবা হয়ত সে হৃদয়ই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। সেই সঙ্গে আরও একটি কথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে এই যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজ বড় বেশী গতানুগতিক, চিন্তা ও আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে নাই। এই দুইটি অভিযোগই যে সত্য তাহা আমরা তখন অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা কি করিতে পারি তাহা ভাবি নাই।

ইহার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে শুধু মনে হইত, এরূপ একটি বৈঠক গড়িয়া তুলিতে পারা যায় না কি, যাহাতে অবাধ মেলামেশার আনন্দভোগের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় মনের প্রসারতা সাধিত হইতে পারে, যাহাতে একদিকে যেমন সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি !
জগৎ আসি হেথা করিছে কোলাকুলি !

অপর দিকে তেমনই আবার মনের সঙ্গে মনের সংঘর্ষে যে স্ফুলিঙ্গরাশির উদ্ভব হইবে, তাহাতে আমাদের মানসলোক নিত্য নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, হয়ত বা তাহাতে কাহারও মনোমধ্যে পুঞ্জীভূত অনেকদিনের সঞ্চিত অবর্জ্জনা রাশি দগ্ধ হইয়াও যাইতে পারে। এই ইচ্ছা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় প্রায়ই হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া গিয়াছে ; কখনও বা দু' একজন বন্ধুর নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন জানিতাম না যে যাহা বহু আয়াসসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহার সূত্রপাত অনেক সময়ে অভাবনীয়রূপে বিনা আড়ম্বরে সংঘটিত হইয়া যাইতে পারে। তাই যখন সে দিন আমাদের একটি প্রীতি-মিলন উপলক্ষে হাস্য-কৌতুক কোলাহল মুখর একটি ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে বন্ধুবর সত্যেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে আমাদের এই "অধ্যাপক সঙ্ঘ"টি গঠিত হইয়া গেল, তখন একটা সুচিরাকাঙ্ক্ষিত সফলতার আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তখন আমরা সঙ্কোচের বাঁধ ভঙ্গ করিতে পারি নাই। যে কয়জন নবীন অধ্যাপক তাঁহাদের তরুণ হৃদয়ের অম্লান আশা-কুসুমে ও উৎসাহ উদ্দীপনার রক্তচন্দনে এই সঙ্ঘদেবের বোধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা দ্বিধাপূর্ণ হৃদয়েই অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রবীণেরাও যে এই নূতন দেবতাটিকে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইতে পারিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। তাই তাঁহারা এতদিন প্রবীণদের নিকট হইতে এই বার্ত্তাটি সযত্নে গোপন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজ একটা পুলকাকুল দখিনা বাতাসে সে ভয়ভাবনার কালো মেঘ বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে যে সঙ্ঘের পাঁচটি অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে ইহা সফলতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ; এবং যে আশঙ্কা ও সন্দেহের কুহেলিকাজাল আমাদের এই প্রচেষ্টা-নির্ঝরের আরম্ভটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা সহসা দূরীভূত হওয়ায় ইহার নৃত্যচঞ্চল গতিবেগ ও আলোকোজ্জ্বল লীলাভঙ্গী সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। আর সেদিন বোধ হয় সুদূর পরাহত নয়, যেদিন এই স্বপ্নোত্থিত নবজাগ্রত নির্ঝর আপনার প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিবে—

জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,
ওরে, উথলি উঠিছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি !

* * * * * *

মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায় !

আর একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। বৈদেশিক ভাষাতেই আমাদের চিন্তাপ্রণালী পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ভাষা ও চিন্তার দাসত্ব যে

অন্যান্য সকল প্রকার দাসত্ব হইতে কম প্রবল নহে, তাহার প্রমাণ তখনই আমরা পাই যখন মাতৃভাষায় আমরা কিছু লিখিতে বা বলিতে অগ্রসর হই। আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করি, এবং যে অধ্যাপনাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার জন্যও আমাদিগকে জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে বাস করিতে হয়। কিন্তু বৈদেশিক শিক্ষা হৃদয় মন দিয়া সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে কি আমরা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? আমাদের অধীত বিদ্যা অনুভূতির কষ্টিপাথরে কষিয়া তবে কি অপরকে বিতরণ করিতে পারিতেছি? প্রকৃতির নিয়মে ফুলটি যেমন ফুটিয়া উঠিয়া গন্ধ ও সৌন্দর্য্য চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়, আমাদের মানস উপবনের এই পুষ্পটিও কি সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হইয়া গন্ধমধু দান করিতে সমর্থ হইতেছে? আমার মনে হয়, যতদিন না আমরা ভাষা ও ভাবের দাসত্ব দূর করিতে পারিব, বিদেশের জিনিষ নিজের মত করিয়া আয়ত্ত করিতে এবং নিজের ভাষায় সাজাইয়া সম্পূর্ণ নূতন সাজে অপরের সম্মুখে বাহির করিতে পারিব, ততদিন আমাদের হৃদয়-দুয়ারের কবাট পূর্ণ উন্মুক্ত হইবে না, বাহিরের জ্ঞান বিজ্ঞান রাশি ভিতরে প্রবেশ করিবার পথে বাধা পাইয়া হয়ত অনেকটা বাহিরেই থাকিয়া যাইবে, মনের অন্তরতম কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেখানে আপনার চিরস্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়া লইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবার উপায় নাই। তাই এই অধ্যাপকসঙ্ঘ নিয়ম করিয়াছেন যে, তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্যাবলী বাঙ্গলাভাষায় পরিচালিত হইবে। প্রবন্ধপাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতি সমস্তই যতদূর সম্ভব বাঙ্গলায় করিতে হইবে; পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে যাঁহার কোন নূতন কথা শুনাইবার থাকিবে, তিনি তাহা মাতৃভাষাতেই শুনাইবেন। ইহাই হইবে সাধারণ নিয়ম; ব্যতিক্রম যে কোন মতেই হইতে পারিবে এমন কথা বলা না। শুধু মনে রাখিতে হইবে, যে উদ্দেশ্য লইয়া আমরা এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহা হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই, এবং সাধনার পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও একাগ্রতা যেন আমাদের চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। *

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

* ভাগলপুর কলেজ "অধ্যাপক সঙ্ঘের" পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত।

দৈন্য

ভারতের চিরারাধ্য মহামহোপাধ্যান,
জ্ঞানতীর্থ পুরোহিত, প্রণিপাত লহ,
কর্ম্ম পথে ধর্ম্মরথে সারথি-ধীমান
ধরে' আছে সর্ব্বেন্দ্রিয়-তুরগ-প্রগ্রহ।
কৈলাসের নন্দী, তুমি বৈকুণ্ঠ দুয়ারী,
এ ভববিভবনদে তুমি কর্ণধার,
বিশ্বপ্রেম-সিন্ধুনীরে তুমিই ডুবারী,
তুমি হবো স্বর্গপথে সর্ব্বভবভার।
গুরু তুমি ভারতের তপোদর্ভাসনে,
পথে পথে গাহ তুমি জাগরণ গীতি,
প্রাচীন কঞ্চুকী তুমি রাজার ভবনে,
ভারতের গৃহে গৃহে আরাধ্য অতিথি।
ভারতের রণক্ষেত্রে হে কবি-চারণ
যুগে-যুগে দাও শক্তি বারিতে মরণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

ভারতীয় চিত্রাবলী

(Balt-Solvyns কর্ত্তৃক অঙ্কিত)

(১) গোয়ালিনী

(২) মেছুনী

(৩) নাচওয়ালী

(৪) ভদ্রমহিলা

মাতৃহীনা

(গল্প)

ডাক্তার অসিতকুমার বসুর জীবনটা যখন ফলপুষ্পে বিকসিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই মধুর সময়টীতে নিতান্ত অকালে তাহার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী মন্দাকিনীর ডাক আসিল। শিশির-ধোয়া ফুলটীর মত বালিকা গীতা মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। সংসারে আপনার লোক না থাকায়, ভাঁড়ারের চাবি ও মাতৃহীনা কন্যার তত্ত্বাবধানের ভার বাড়ীর পুরাতন দাসী বিশুর মার হাতে অর্পণ করিয়া, পত্নীহারা অসিত নয়নপ্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

বন্ধুবান্ধব আসিয়া ধরিয়া বসিলেন, "আবার বিবাহ কর, মেয়েটার একটা হিল্লে হবে; সংসারটাও বজায় থাকবে।" ইত্যাদি।

কিন্তু অসিতের সঙ্কল্প অটল; সে প্রাণান্তেও আর বিবাহ করিবে না। মন্দাকিনীর মৃত্যুতে তাহার তরুণ হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহার বিশ্বাস, এ জীবনেও সে ক্ষতচিহ্ন মুছিবে না; কখনও নহে। ভগ্নহৃদয় অসিত পত্নীশোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিল। একবেলা নিরামিষ আহার করিয়া বিশ্ববাসীকে পত্নীপ্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহার এই অতিমাত্রায় সুতীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা মনে মনে যথেষ্ট সঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন—কি জানি কবে বা লোকটা লোটা কম্বলধারী হইয়া হিমালয়ের পথে প্রস্থান করে।

ঝি বিশুর মা সখী মহলে যে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, সংসার-ক্ষেত্রে মাতৃহীনা কন্যা অপেক্ষা পত্নীহীন পতিই বেশী সন্তাপগ্রস্ত।

অসিতের জীবনপ্রবাহ হয়ত এমনি প্রশান্তভাবেই বহিয়া যাইত, কিন্তু ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি। প্রাতঃকাল হইতেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। রহিয়া রহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছিল। প্রভাতিক চা পান করিয়া, অসিত নিবিষ্ট মনে একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিল; তাহার কোলের কাছে বসিয়া সপ্তমবর্ষীয়া গীতা তানলয় সুরে মধুর কলকণ্ঠে অ আ শব্দে গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। সেইদিনকার ডাকের কতকগুলি চিঠিপত্র অসিতের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া অসিত চিঠিগুলি হাতে লইয়া, তাহার মধ্যে একখানা লেফাফার উপর পোষ্টাফিসের ছাপের প্রতি বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল। আজ মধুপুর হইতে কে তাহাকে চিঠি লিখিতেছে? মনে মনে কৌতূহলী হইয়া চিঠিখানি খুলিয়া দেখিল, তাহার পিতৃবন্ধু কৈলাসবাবু এ চিঠি লিখিয়াছেন।

"চিরঞ্জীবেষু—

বাবা অসিত, অনেক দিনের পরে আজ তোমায় চিঠি লিখিতেছি। এত দিন সংসারের নানা ঝঞ্চাটে বড়ই বিব্রত ছিলাম। দীর্ঘ তিনটি বছর রোগশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছি, তাই এতদিন তোমার সংবাদ লইতে পারি নাই।

"বাবা, আমি বাসন্তীকে লইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমি অসমর্থ বলিয়া তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি অবশ্য অবশ্য একবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। কয়েকদিন হইল আমরা এখানে আসিয়াছি; কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। ভগবৎসমীপে তোমার ও তোমার কন্যার কুশল কামনা করিতেছি। ইতি

আশীর্ব্বাদক
শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

অসিত কৈলাস বাবুর চিঠিখানি দুই তিনবার পাঠ করিয়াও কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না, তিনি কেন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার মেয়ের নাম যে বাসন্তী একথা অসিতের জানা ছিল। কিন্তু বাসন্তীকে লইয়া তিনি বিপন্ন, সুতরাং সে ক্ষেত্রে অসিত যাইয়া কি করিতে পারে? হঠাৎ অসিতের মনে একটা অতীত ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অভিনিবিষ্ট চিত্তে সে বিচার করিতে লাগিল; শেষে সিদ্ধান্ত করিল, এ সন্দেহ অমূলক; কারণ বাসন্তী কিছুতেই এতদিন কুমারী নাই; পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে বাসন্তীকে শেষবার যখন দেখিয়া আসিয়াছে, সে তখন বার তের বছরের বালিকা। বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ হিন্দুর ঘরের—মেয়ে এতদিন কখনও কুমারী থাকে না। তবে কি বাসন্তী বিধবা? অসিত কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পিতৃবন্ধু যখন বিপন্ন হইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন তাহার একবার যাওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। হাতে বেশী কাযকর্ম্ম নাই, অসিত স্থির করিল, দুই দিনের মধ্যেই একবার মধুপুর হইতে ঘুরিয়া আসিবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, গীতাকে বক্ষে লইয়া, তাহার জন্য অনেক পুতুল ও খেলনা আনিবার প্রলোভন দেখাইয়া, গীতা সম্বন্ধে ঝিশুর মাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান হইতে বলিয়া, বন্ধু প্রফুল্ল বাবুর উপর বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া অসিত মধুপুর যাত্রা করিল।

ট্রেণ হইতে নামিয়া যখন অসিত কৈলাস বাবুর বাসায় প্রবেশ করিল, তখন মেঘনির্ম্মুক্ত রৌদ্রে ঘনবিন্যস্ত শ্যামল স্নিগ্ধ শস্যক্ষেত্র ও বনবিটপী সমূহ স্বর্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিনের পর অসিতকে দেখিয়া কৈলাস বাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন; কুশল প্রশ্নাদির পর নানা গল্পে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। অসিতের পিতার নাম করিয়া কৈলাস বাবু দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেও ভুলিলেন না।

ক্ষণকাল পরে কৈলাস বাবু উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাসন্তী, অসিতের চা দিয়ে যাও মা।"

বাহিরে পায়ের মৃদু শব্দ হইল; অসিত দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল, একটি মেয়ে চায়ের বাটী হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

প্রথমে অসিত চিনিতে পারিল না, এ কে। পরক্ষণে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বুঝিল, এ সেই বাসন্তী। পাঁচ ছয় বছর পূর্ব্বে যাহাকে যৌবনোন্মুখী বালিকা দেখিয়াছিল, আজ পূর্ণ যৌবনেও সে কুমারীই রহিয়াছে। মেয়েটী দেখিতে অনিন্দ্যসুন্দরী, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে যৌবনের কোন চপলতা নাই। হৃদয়ের সমস্ত বেগ, সমস্ত চপলতা এই মেয়েটী যেন সহজ শক্তির বলে অসীম গাম্ভীর্য্যপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বাসন্তী দিবালোকের ন্যায় বিশদ ও নির্ভীক স্থির দৃষ্টি অসিতের মুখের উপর স্থাপন করিয়া, ধীর অথচ মধুরকণ্ঠে কহিল—"আপনার চা রইল।" টেবিলের উপর চায়ের বাটীটা রাখিয়া ধীর মন্থর গমনে বাসন্তী সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

অসিত অন্যমনস্কভাবে চা পান করিতে করিতে ভাবিতেছিল, "এমন সুন্দরী মেয়েটীর আজও বিয়ে হয়নি কেন?"

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সে অনেক স্থানেই কৈলাস বাবুর কোনও কুলগত দোষের কথা শুনিয়াছে। কিন্তু সেই জন্য কি এমন মেয়েটীর বিবাহ হইতেছে না? অসিতের বেশী ক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না। কৈলাস বাবু তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া, নানা অবান্তর কথার পর, তাহারই হস্তে বাসন্তীকে অর্পণ করিবার জন্য যখন কাতর কণ্ঠে মিনতি করিতে লাগিলেন, তখন আটাশ বর্ষীয় যুবক বিপত্নীক অসিতের কণ্ঠ হইতে একটি আপত্তির কথাও উচ্চারিত হইল না।

কৈলাস বাবু বলিলেন, তাহার নিজের জন্য না

হউক, অন্ততঃ গীতার জন্তও তাহার এখন বিবাহ করা নিতান্তই দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

এ কথাটি অসিতের প্রাণে বড় লাগিল। তাহার জন্ত নহে, গীতার জন্তই যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই অসিত বাসন্তীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল। দুই বৎসর হইল মাতৃহারা কন্তাকে লইয়া অসিত কখন কখন মনে মনে চিন্তাবিহ্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আজ তাহার প্রাণ নবীন সুখের আশায় সৌন্দর্য্যের লালসায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অসিতের সেই নীরস হৃদয়-মরুতে কুলপ্লাবিনী স্বচ্ছতোয়া তটিনী রূপিণী বাসন্তী মন্দাকিনীর সলিলধারা লইয়া উপস্থিত হইল।

অসিতের ভাল মন্দ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা-শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সম্মুখে পৌষমাস, হিন্দুর বিবাহাদি এই মাসে নিষিদ্ধ। তাই অগ্রহায়ণের শেষভাগেই তাড়াতাড়ি বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। মেয়ের দিদিমা বর্ত্তমান; তিনি সেকেলে মানুষ, ধরিয়া বসিলেন, সম্মুখে পৌষ মাস, এখন মেয়েকে পাঠাইবেন না! মাঘমাসে গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে লইয়া যাইবার আশা-বক্ষে পোষণ করিয়া, হৃদয়ের সবখানি প্রায় মধুপুরে রাখিয়া, সর্ব্বস্বহীন শূন্ত চিত্তে অসিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

৪

কয়েকদিনের পিতৃবিচ্ছেদকাতরা গীতা অসিতকে দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র মৃণালতুল্য বাহু দুইটী পিতার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া আনন্দপূর্ণ গদ গদ কণ্ঠে কহিল, "বাবা, আমার পুতুল কৈ?"

অসিত ঈষৎ বিরক্তিসহকারে কন্তার হাত দুইখানি ঠেলিয়া দিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "তোমার ত ঢের পুতুল ঘরে রয়েছে, আবার পুতুল কেন?"

ব্যথিতা বালিকা পিতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। পিতা যখন প্রেমের কুহকে, সুখের প্রলোভনে, সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় দিশে-হারা হইয়া ছিলেন, সেই কয়টী দিন মাতৃহারা সদ্য পিতৃ-বিচ্ছেদকাতরা বালিকার যে কয়েকটী তুচ্ছ কাচের পুতুলের আশা বক্ষে পুরিয়া, নিরানন্দ ব্যর্থ দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তাহা এক অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু অসিত আর পূর্ব্বের মতন সাদর কণ্ঠে গীতা বলিয়া ডাকে না। অভিমানিনী গীতা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পিতার আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, না ডাকিলে কাছে আসিতে সাহস পায় না। পূর্ব্বে যেখানে স্নেহ-ভালবাসার প্রস্রবণ বহিত, কয়েকদিনের ব্যবধানে সেখানে ভয় ও আশঙ্কার ঝটিকা বহিতেছিল। পিতৃস্নেহ সলিলের বিন্দুমাত্র প্রত্যাশায় স্নেহতৃষ্ণা বালিকা যখন তৃষিত নয়নে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, পিতা তখন নব-পরিণীতা পত্নীর প্রেম-পত্রের খোরাক যোগাইতে ব্যস্ত; তাই অভিমানিনী কন্তার ব্যথিত দৃষ্টিটুকু নয়নপথে নিপতিত হইলেও সে দেখিতে পাইত না।

সেদিন দুপুর বেলা বাড়ীখানি নিস্তব্ধ। সঙ্গী-বিহীনা গীতা ধীরে ধীরে অসিতের শয়ন-গৃহের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের অর্দ্ধাবরুদ্ধ দুয়ার বাতাসে এক-একবার খুলিতেছিল ও মৃদুমন্দ আর্ত্তস্বর সহকারে আবার রুদ্ধ হইতেছিল। গীতা স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া তৃষিত নয়নে একবার ঘরের মধ্যে চাহিয়া, ত্বরিত পদে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পিতা খাটের উপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালা দিয়া খানিকটা রৌদ্ররশ্মি গৃহে প্রবেশ করিয়া শায়িত অসিতের একখানি হাতের উপর ঝিকমিক্ করিতেছিল। গীতা সন্তর্পণে জানালাটি রুদ্ধ করিয়া, ভক্তি-পূর্ণ সস্নেহ-নয়নে কিছুক্ষণ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, গৃহমধ্যস্থ টেবিলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সবিস্ময়ে দেখিল, কাগজ দিয়া জড়ান কি যেন একটি জিনিষ সেই টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। কাগজের অভ্যন্তরে কি দ্রব্যটি লুকান রহিয়াছে,

তাহা দেখিবার জন্ত বালিকার বড়ই কৌতূহল হইতেছিল। সেই জিনিষটী হাতে লইয়া ধীরে ধীরে গীতা কাগজ খুলিতে খুলিতে, হঠাৎ তাহার হাত হইতে দর্শনীয় দ্রব্যটী সশব্দে মেজেয় পড়িয়া শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। সেই শব্দে অসিত শয্যার উপর বসিয়া যাহা দেখিল, তাহা তাহার পক্ষে কেন, কোন বিপত্নীকের পক্ষেই প্রীতিকর নহে।

কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে বহুমূল্য ফ্রেমে সুন্দর করিয়া, ততোধিক সুন্দর বাসন্তীর ফটো চিত্রখানি বাঁধাইয়া আসিয়াছে; খাটের মাথার দিকের দেয়ালে সেখানি রাখা স্থির করিয়া অসিত একটু শয়ন করিয়াছে; আর এই অবকাশে হতভাগা মেয়েটা তাহার এমন সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিল! অসিতের ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ ভাঙ্গা কাঁচ খণ্ডের মত গীতার হাত দুইখানি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়। কষ্টে ক্রোধাবেগ দমন করিয়া অসিত বিহ্বল সজল লোচনা কন্যার দিকে চাহিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, "তুমি এক্ষণি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। আমি বারণ করছি, আর কখনও এ ঘরে এসনা।"

গীতা কথা কহিতে পারিল না; শুধু তাহার সেই আর্দ্র করুণ শান্ত নয়ন দুইটীতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া, সে স্থান ত্যাগ করিল। রাগে দিশেহারা অসিত দেখিতে পাইল না, সে নয়নে কি এক অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ হইতেছিল।

৫

গীতা কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না, তাহার অনিচ্ছাকৃত লঘু অপরাধে পিতা কেন তাহার প্রতি এমন গুরুদণ্ড বিধান করিলেন—তাহার স্মৃতিভরা বাল্যের সুখ নিকেতন সেই গৃহখানি হইতে তাহার চির নির্ব্বাসন কেন হইল! সেই ঘরখানির মধ্যে দাঁড়াইয়া মা'র শত স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়াছিল, তাহাতে মাতৃক্রোড় বিচ্যুত বালিকার নিরানন্দ দিনগুলি কথঞ্চিৎ শান্তিতে কাটিয়া যাইত। গীতা সভয়ে সঙ্কুচিত চিত্তে ঘরখানির আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তথায় পুনঃ প্রবেশ করিতে সাহস পায় না।

মাতৃহারা সঙ্গিবিহীনা বালিকা নিদারুণ মানসিক কষ্টে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিল। ক্রমে তাহার সেই সবল সুন্দর দেহখানি টোল খাইতে লাগিল। বিকাল বেলা একটু একটু জ্বরও দেখা দিল। বিশুর মা'র কথায় বিস্মিত অসিত চাহিয়া দেখিল, সত্যই ত, এই এক মাসের মধ্যেই গীতা কত মলিন কত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। মেয়ের জন্য যে অসিতের হৃদয়ে একটু চিন্তার ছায়াপাতও না হইল একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ডাক্তারের পর ডাক্তার আসিয়া, বটী, পুরিয়া আরক নানাবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াও গীতার রোগতপ্ত দেহটী নিরাময় করিতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু যেখানে ব্যথা সেখানকার খবর কাহারও নিকট প্রকাশিত হইল না। পিতার হৃদয়ভরা স্নেহের সুশীতল বারিধারায় মাতৃহীনার তাপদগ্ধ হৃদয়টী জুড়াইয়া গিয়াছিল; আজ সে স্নেহের সমুদ্র কঠিন সাহারায় পরিণত হইয়াছে, এখন সে বাঁচিবে কি করিয়া?

সেদিন প্রভাতে উঠিয়াই গীতা শুনিল আজ তাহার 'নূতন মা' আসিবে। ঝি মহলে তাহার 'নূতন মা' সম্বন্ধে নানাবিধ মন্তব্যে সে যতটু বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাতে 'নূতন মা'র আগমনের কথা শুনিয়া তাহার সুকুমার চিত্ত প্রসন্ন হইল না। বিস্মিত গীতা চাহিয়া দেখিল, আজ তাহার নূতন মা'র আগমন সূচনায় বাড়ীখানি ধুইয়া মুছিয়া যেন নূতন আকারে সাজানো হইয়াছে। ঝি চাকরেরা উৎকণ্ঠিত মুখে কাহার যেন আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। গীতা একবার সচকিত নয়নে তাহার মায়ের ঘরখানির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, আজ সেখানেও অনেক রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। অসিত সুবৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সদ্যঃক্ষৌরমার্জ্জিত মুখে "ভেজুয়া" মাখিতেছে।

গীতা ধীরে ধীরে সেখান হইতে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বারবার

করিয়া তাহার মার অস্পষ্ট মুখচ্ছবি জাগিয়া উঠিতেছিল। দূরাগত সঙ্গীতের মত মা'র স্নেহ মমতার দুই একটী উচ্ছ্বাসও বহুদিনের পর গীতার মনোবীণায় বাজিয়া উঠিতেছিল। গীতা মনে মনে বলিতে লাগিল, "মা গো ফিরে এস। সকলেরি মা আছে, সকলেই মার কাছে থাকে, আমারও যে তোমারি কাছে থাকতে ইচ্ছা হয়। সকলের মা যেথানে যায়, আবার ফিরে আসে; তুমি শুধু এসনা কেন? লক্ষ্মী মা আমার, তুমি ফিরে এস।"

৬

মাঘমাসের শেষে আম্রমুকুলের গন্ধ বহিয়া বসন্তের আসন্ন আগমনে উৎফুল্ল বাতাস ধীরস্পর্শে ঋতুরাজের ঘোষণা পত্র বিশ্ববাসীকে জানাইতেছে। বাসন্তী যখন গাড়ী হইতে নামিয়া, অসিতের বৃহৎ ভবনে প্রবেশ করিল, তখন আর বেলা বেশী নাই। অস্তগমনোন্মুখ ম্লান রৌদ্র ধরাবক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বিদায় লইতেছিল। প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে অসিত আগু বাড়াইয়া বাসন্তীকে গৃহে লইয়া গেল। একখানি মূল্যবান চেয়ার বাসন্তীর দিকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া তরলকণ্ঠে কহিল, "বাসন্তী, এইখানে বসো। রাস্তায় তো কোন কষ্ট হয়নি?" বাসন্তী চেয়ারের উপর একখানি হাত রাখিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল, "রাস্তায় আর কি কষ্ট হবে? গীতা কৈ? তাকে দেখছিনা কেন?" এতদিনের পর দেখা, নববধূর মুখে প্রথম কথাটি "গীতা কৈ" নবপরিণীত অসিতের কাণে যেন কেমন বেসুর লাগিতেছিল। দুটি প্রেমের কথা, দুটি ভালবাসার কথা শুনিবার জন্যই যে অসিত এতক্ষণ কত আশা করিতেছিল। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও অসিত সহজকণ্ঠেই কহিল, "গীতা এই পাশের ঘরেই আছে।"

বাসন্তী গীতার ঘরে দাঁড়াইয়া দেখিল, মলিন শয্যার উপর রোগশীর্ণ বালিকা মুদ্রিত নয়নে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার বিশুষ্ক কপোলে অশ্রুরেখাগুলি তখনও শুষ্ক হয় নাই। অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্র মুক্ত গবাক্ষ পথে গীতার কোমল মুখখানির উপর প্রতিফলিত হইয়া সে মুখখানি আরও করুণ করিয়া তুলিয়াছে। বাসন্তী ক্ষণকাল সেই বিষাদ প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সুকোমল হৃদয়খানি বালিকার কোমল-করুণ সৌন্দর্য্যে আর্দ্র হইয়া উঠিল। বাসন্তী মনে মনে বলিল, "এই মাতৃহীনার শূন্য জীবনটি পরিপূর্ণ করিবার শক্তি আমায় দিয়ো, ভগবান্।" পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল, "এর এমন অসুখ, যত্ন হচ্ছে তো?"

অসিত অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল—"হ্যাঁ—দুই তিন জন ডাক্তার দিয়ে—"

বাধা দিয়া বাসন্তী কহিল—"শুধু ওষুধ পত্রে বুঝি অসুখ ভাল হয়।"

সে কণ্ঠের সে কথাগুলি অমৃত মাখানো ছুরির মত সুষুপ্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মেষিত করিল। আজ নববধূর কথায় অসিতের অনেক দিনের অনেক স্মৃতিই মনে আসিয়া পড়িল। মন্দাকিনীর অন্তিম শয্যা, সেই শেষ মিনতি—"আমার গীতাকে আমি তোমারি হাতে দিয়ে যাচ্ছি, একে তুমি অযত্ন করো না।" অসিতের হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বালিয়া দিল।

বাসন্তী মূর্ত্তিমতী করুণার মত গীতার শয্যার নিকটে দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে ডাকিল, "গীতা, ঘুমিয়েছ?"

তন্দ্রাচ্ছন্ন গীতা শয্যার উপর বসিয়া, বিস্ফারিত নয়নে বাসন্তীর মমতাপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। ভ্রান্ত বালিকা ইঁহাকে তাহার নূতন মা বলিয়া বুঝিতে পারিল না। মনে হইল এ যে তাহার সেই হারান মা ফিরিয়া আসিয়াছেন; তেমনি সুন্দর মুখচ্ছবি, তেমনি মমতাপূর্ণ নয়নযুগল; কে বলিবে তাহার মা নহেন? কতদিনের কত দুঃখের কথা মনে পড়িতে লাগিল। অভিমানিনী বালিকার দুইটি নয়ন হইতে ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রুকণা ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে দৃশ্য দেখিয়া স্নেহময়ী বাসন্তীর নয়ন দুইটি সজল হইয়া উঠিল। সে আপনার বস্ত্রাঞ্চলে

গীতার নয়ন দুইটি মুছাইয়া আদরপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—"অসুখ হয়েছে বলে কাঁদছো গীতা? এখন আমি এসেছি; দু' দিনেই তোমার সব অসুখ ভাল করে দেব। তুমি আমার কোলে এস।"

গীতা একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে এই মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া, বাসন্তীর প্রসারিত বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া আনন্দোচ্ছল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা আমার!"

শ্রীগিরিবালা দেবী।

শিক্ষা-সমস্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা যে শিক্ষা পাইয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ নহে, একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন এবং সকল দিক হইতে তাড়া খাইয়া ভারত গভর্ণমেন্ট এক বিরাট কমিশন বসাইয়া ভারতবাসীর শিক্ষার কিরূপে সম্পূর্ণ করা যায় তাহার তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। সমগ্র রিপোর্ট পড়িবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই; তাহার সারাংশ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি মাত্র। এই রিপোর্টে অপর যাহাই থাকুক, যে শিক্ষা বাঙ্গালী চায়—যে শিক্ষা বাঙ্গালীর প্রয়োজন, তাহার কোন কথা ইহাতে নাই। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজন মনীষী বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালীর অন্নের প্রয়োজন, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। বাঙ্গালীর অন্নাভাব যাহাতে না হয়, স্বাস্থ্য অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা প্রথমতঃ করিতে হইবে; বাঁচিয়া থাকিলে তবে সে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক হইতে পারিবে; এখন প্রধান সমস্যা বাঙ্গালী মরিবে কি বাঁচিবে।

প্রশ্নটা শুনিয়া অনেক হাসিয়া উঠিবেন, কিন্তু যাঁহারা হাসিয়া উঠিবেন, তাঁহারা কলিকাতার ত্রিসীমানার বাহিরে কখন যান নাই। অন্ততঃ পক্ষে তাঁহারা বাঙ্গলার কোন পল্লীগ্রামে কুত্রাপি পক্ষাধিক কাল বাস করেন নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম জানেন তাঁহাদিগকে এ প্রশ্নের প্রয়োজনীতা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ম্যালেরিয়া নাশের জন্য আহ্বান করিতেছিনা। যদিও করিলে নিতান্ত অশোভন হইত না—আমাদের Vice Chancellor মহাশয়ের ন্যায় সুচিকিৎসক বলিয়া অতি অল্প লোকেরই খ্যাতি আছে। সে কথা যাউক, আমি বলিতেছিলাম, যে শিক্ষা-প্রণালীতে বাঙ্গালীর অন্নচিন্তা দূর হয় না, সে শিক্ষা অন্যদেশের পক্ষে যতই উপযোগী হউক না কেন, এদেশের পক্ষে আমি ইহা উপযোগী ভাবিতে পারি না।

"Education for education's sake"—শিক্ষা শিক্ষারই জন্য—চাকুরীর জন্য নহে—একথা যিনি বলিবেন তিনি ভ্রান্ত; প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই জীবন রক্ষোপোপায় শিক্ষা দেওয়া। যে শিক্ষা পশু পক্ষীতেও তাহাদের শাবকদিগকে দিয়া থাকে, দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা দেশের পিতা মাতা সে শিক্ষাও সন্তানদিগকে দিতে পারেন না, এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জাতিটা খাইয়া পরিয়া বাঁচুকই আগে, তাহার পর না হয় Newton, Faraday হইবে। Newton, Faraday প্রফুল্ল কিংবা জগদীশ—তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের তোয়াক্কা রাখে না, তাঁহারা নিজের পথ নিজেরাই করিয়া লন। নেপোলিয়নের কাছে আসম্ভব সংজ্ঞা থাকে না। তাঁহাদের প্রতি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য নাই, তাহা

বলিতেছি না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, সাধারণ বাঙ্গালী ছাত্রকে সুস্থ করিয়া তোলা, তাহাদিগকে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ করিয়া দেওয়া। ছেলেরা স্কুলে সোজা হইয়া বসিতে পারে না; অনেকে আবার সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে না। খানিকটা দৌড়াইতে হইলে কাঁপাইয়া পড়ে, একটু রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য হয় না। খাইতে দিলে খাইতে পারে না;—এগুলা কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? হাজার করা ৯৯৯ জন ত এমনই, ইহারা বাঁচিবেই বা ক'দিন আর বাঁচিয়াই বা করিবে কি? কতকগুলি ক্ষীণদৃষ্টি ক্ষীণদেহ কুব্জপৃষ্ঠ বালক বালিকার জন্ম দিবে বই ত নয়। ইহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা কমিশন কিছু করিয়াছেন কি? অথচ বাঙ্গালীর মধ্যেই ভীম ভবানী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, বাঙ্গালীর মধ্যেই সোহহং স্বামী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সদাশিব দত্ত সেদিন "লং রাণ" দৌড়ের প্রতিযোগিতায় World's record মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। যে সকল বাঙ্গালী সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহারাও এযাবৎকাল প্রশংসাই লাভ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালী উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে শুধু দৈহিক বলে বলবান হইতে পারে তাহা নহে, যথেষ্ট কার্য্যকুশলও হইতে পারে। যাঁহারা "বয় স্কাউটস্" এর সৃজন করিয়াছেন তাঁহারা নমস্য, বাস্তবিক দেখিলে আশার প্রাণ ভরিয়া উঠে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। পোষাক পরিচ্ছদটা অল্পব্যয়সাধ্য করিয়া প্রত্যেক ছাত্রকেই বয় স্কাউট্ হইতে বাধ্য করা উচিত এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহাদের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত।

দৈহিক উন্নতির ভার ছাত্রদের অভিভাবকদের উপর দিয়া রাখিলে চলিবে না। তাহা হইলে তাহারা যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। ছেলেদের শিক্ষা দিবার জন্য যে পরিমাণ শিক্ষা হওয়া উচিত, সেরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী অভিভাবকদের মধ্যে শতকরা এক জনও নাই। আর যদিও তিনি সেরূপ শিক্ষিত হন, তাঁহার হয়ত সেরূপ অবসর নাই অথবা তাঁহার শিক্ষকোচিত ধৈর্য্য নাই।

যে যাহাই বলুক না কেন, বাঙ্গালী ছেলেকে স্কুলে পাঠায় চাকুরির জন্য, অপিচ ডাক্তার উকিল বা ইঞ্জিনিয়ার হইবার জন্য। আজ যদি গভর্ণমেণ্ট এরূপ সার্কুলার করেন যে কোন বাঙ্গালী চাকুরী পাইবে না, ওকালতী বা ডাক্তারী করিতে পাইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গলার স্কুলগুলি ছাত্রশূন্য হইয়া যাইবে। ছেলের দৈহিক মানসিক নৈতিক উন্নতির জন্য মুখ্যতঃ কেহই ছেলেকে স্কুলে পাঠায় না। স্কুলে পাঠায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য। দৈহিক উন্নতির বা মানসিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা বাঙ্গালী বুঝে না, বুঝিতে চায় না। বাঙ্গালী অভিভাবক এ কথা না বুঝিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বুঝা উচিত। যদি এরূপ নিয়ম হয় যে ৩২ ইঞ্চি ছাতি না হইলে, ১ মাইল দৌড়িতে না পারিলে, সাঁতার বা অশ্বারোহণ না জানিলে কোন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না—তাহা হইলে অভিভাবকদিগের মাথায় টনক নড়িলেও নড়িতে পারে। একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলিবেন, কলাইয়ের ডাল ও ভাত খাইয়া কি এক মাইল দৌড়ান যায়? যায়। আমাদের বাসার সামনে কতকগুলি মুটে থাকে, তাহারা নৌকা হইতে কাঠ নামাইয়া গোলাজাত করে, তাহারা খায় শাকান্ন—অবশ্য পরিমাণে কিছু বেশী। তাহারা দুই চারিমণ মোট লইয়া যেরূপ দ্রুত যাইতে পারে, বোধ করি কোন হাইল্যাণ্ডার সেরূপ পারে না। কবিবর ৺নবীন সেন "আমার জীবনে" লিখিয়াছেন, তিনি ফেণীর স্কুলে ব্যায়াম বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষকগণ সকলেই ক্ষীণকায় দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহারা এ নিয়মটা মোটেই পছন্দ করিলেন না। ছেলেরা ব্যায়াম করিত না, শিক্ষকেরা তাহাদের উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে তাহারা ব্যায়াম না করে তাহারাই চেষ্টা করিতেন। নবীন বাবু ইহাতে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইলেন। ছেলেদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা শিক্ষক মহাশয়গণের উপদেশ মত বলিল,

"কলাইয়ের ডাল ও ভাত খাইয়া কি ব্যায়াম করা যায় ?" নবীনবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। মনে মনে একটা মৎলব ঠাওরাইয়া বলিলেন, "টিকটিকিতে বাঁধিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে দশঘা করিয়া বেত লাগাও।" ছেলেরা কাঁদিয়া উঠিল, উকীল মোক্তার শিক্ষক সকলেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তখন সকলে, ছাত্রেরা যাহাতে ব্যায়াম করে তজ্জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। নবীন বাবু তখন সে আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। ছেলেরা সেই কলাইয়ের ডাল ও ভাত খাইয়া ব্যায়াম করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। বাঙ্গলাদেশে আর দুধ, ঘি, মাছ মাংস পাওয়া যায় না স্বীকার করিলাম; কিন্তু এখনও দেশে ছোলা ও অড়হর ডাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়; এবং যদি উপযুক্ত ব্যায়াম করা যায়, সেগুলি জীর্ণ করিবার জন্যও ভাবিতে হয় না। যদি অভিভাবকগণ ছেলেদের এইরূপ আহার যোগাইতে অসম্মত হন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কেই এভার লইতে হইবে। অন্ততঃ যাহাতে অভিভাবকগণ ছেলেদের স্বাস্থ্যের জন্য যত্নবান হন তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

যদি বিশ্ববিদ্যালয় এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে না চান, তাহা হইলে আমি যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি সেইরূপ নিয়ম করুন—

১। ছাত্রদের জন্য অশ্বারোহণ না হয় উত্তমরূপে সাঁতার শিক্ষা করিতে হইবে।

২। অন্ততঃ একমাইল একদমে দৌড়াইতে হইবে।

৩। ছাতি ৩২ ইঃ হইবে—ইহা না হইলে সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

ইহার মধ্যে অবশ্য অবস্থাবিশেষে exception থাকিতে পারিবে; কিন্তু মোটের উপর ঐরূপ একটা নিয়ম না হইলে অভিভাবকগণ ছাত্রদের দৈহিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন না।

ইহার পর প্রশ্ন উঠিবে, বিজাতীয় ভাষায় এতগুলি পুস্তক পড়িয়া, ছেলেরা ব্যায়াম করিবে কখন? আমি তাঁহাই বলিতেছিলাম। ছাত্রদের দৈহিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ প্রথমেই দেওয়া উচিত ছিল, তাহার জন্য কয়েকখানা পুস্তক কমাইয়া দিবার যদি প্রয়োজন বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে কোনও দোষের হইত না। শরীরই যদি রক্ষা করিতে না পারিল, তাহা হইলে লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? ঐ যে গাড়োয়ান বৈশাখের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে গান গাহিতে গাহিতে শকট চালনা করিতেছে, আর ঐ যে বাবুটি বিদ্যুৎপাখার নীচে খসখসের অন্তরালে অজীর্ণ দমনের জন্য সোডা আর কি সব ছাই ভস্ম খাইতেছেন, তিনি ঐ গাড়োয়ান অপেক্ষা অনেক দুঃখী।

আর এক কথা আমি বলিতেছিলাম, বাঙ্গালীকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বাঙ্গালীর জীবিকা উপার্জ্জনের পক্ষে অনুকূল না হইয়া তাহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইতেছে। পাঠকও জানেন, লেখকও জানেন, বাঙ্গালী শুইয়া থাকিতে যেমন ভালবাসে এমন আর কিছুই নহে। যদি বিনা পরিশ্রমে অনায়াসে আকাঙ্ক্ষা লব্ধ হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী মাথা ঘামাইয়া বা কিঞ্চিৎ কায়িক পরিশ্রম করিয়া ঘি ভাত যোগাড় করিতে চাহে না। কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালী অতি অল্পেই সন্তুষ্ট; কিন্তু ইহা সত্য নহে। যদি দুইটি মিথ্যা কথা বলিলে কিংবা সামান্য খোসামদ করিলে কিছু অর্থাগম হয়, বাঙ্গালী তাহাতে কদাপি পশ্চাদপদ হয় না। দোকানদার এক টাকায় খরিদ করিয়া অনায়াসে বলিবে বাবু; আমার ১৷৷০ টাকায় খরিদ, আমি ১৷৷০ টাকায় কি করিয়া দিব? অথচ সে যদি দুই মাইল হাঁটিয়া গিয়া সে জিনিষ সংগ্রহ করিত, তাহা হইলে অনায়াসে ৷৷০ আনায় সে সে জিনিষটি পাইতে পারিত এবং দেড় টাকায় বিক্রয় করিলে তাহার যথেষ্ট লাভ থাকিত এবং মিথ্যাও বলিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু পরিশ্রম করার চেয়ে মিথ্যা বলা সহজ। ইহার মূল কারণ আলস্যপ্রিয়তা। বাঙ্গালী যে অলস, সে কথা আমি বলিতেছি না—সাহেবের চাবুকের মুখে বাঙ্গালী প্রাতঃকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খাটে, এরূপ দৃষ্টান্ত হাজার হাজার দেওয়া যায়। কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক

বাঙ্গালী দুই ঘণ্টাও একাদিক্রমে পরিশ্রম করিতে চাহে না—বিশেষতঃ শারীরিক পরিশ্রম। আমাদের দেশের জলবায়ুর গুণে বাঙ্গালী নাকি অলস হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই আলস্যপ্রিয়তার বিরুদ্ধে আমাদের দ্বিগুণ শক্তিতে আক্রমণ করা উচিত নহে কি? একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, আমি আলস্য পরিত্যাগের কথা বলিতেছি না, আমি আলস্যের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিবার কথাই বলিতেছি। আমি এইরূপ শিক্ষা দিবার কথা বলিতেছি, যাহাতে বাঙ্গালীর আলস্যের প্রতি অনুরাগ কিছুমাত্র না থাকে। রবিবার ছুটি হইলে সাহেবেরা টালিগঞ্জে golf খেলিতে যায়, বাঙ্গালী গৃহিনীর তাড়া খাইয়া বাজারে যায়—হয়ত ঘরে বসিয়া তামাক পোড়ায়। ইহাদেরই মধ্যে যাহারা খুব উদ্যমশীল, তাহারা সাধারণ বৈঠকখানায় বসিয়া ছ' তিন নয় হাঁকে। কতকগুলি উপমা দিয়া প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমার বক্তব্য এই যে, কি ধনী কি দরিদ্র, কোন বাঙ্গালীই ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কায করিতে চাহে না—বিশেষ যাহাতে শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। এই আলস্যপ্রিয়তা যাহাতে বাঙ্গালী-চরিত্র হইতে দূর হয়, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই আলস্যপ্রিয়তা যে দূর হইতে পারে, Boy scout ও স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্যকলাপ দেখিলেই বেশ বোঝা যায়। কিরূপ আনন্দের সহিত কিরূপ অক্লান্ত দেহে তাহারা পরের বোঝা বহিয়া বেড়ায়! (যাহারা পরের জন্য এমন আনন্দের সহিত পরিশ্রম করিতে পারে, তাহারা নিজেদের স্ত্রীপুত্রদের জন্য অক্লান্ত দেহে পরিশ্রম করিতে পারিবে ইহা বলা বাহুল্য)। শতকরা ৯৯জন বাঙ্গালী অভিভাবক ইহা পছন্দ করেন না, কেননা তাঁহারা ইহা পরের বোঝাই মনে করেন, ইহা মানবকে যে কি শিক্ষা দেয় তাহা বুঝেন না। তাঁহারা শিক্ষা অর্থে পরীক্ষা পাশ করাই বুঝিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী যদি সভ্যজগতে উচ্চস্থান গ্রহণ করিতে পারে, তাহা ইহাদিগের দ্বারাই পারিবে, এবং যদি অভিভাবকদিগের বিরুদ্ধে কেহ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে, তাহা হইলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই পারিবে—কেননা বাঙ্গালী পিতা জানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র না হইলে চাকুরীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা বাঙ্গালীকে desk work মাত্র শিখায়। আরও যে সহস্র উপায়ে বাঙ্গালী জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার মন্ত্র বলিয়া দেয় না। অপরন্তু বাঙ্গালী desk workএ এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, অপর কোন কায করিতে বলিলেই তাহার বিভীষিকা লাগে, এমন কি ঘৃণা বোধ হয়। বাঙ্গালী সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ৩০৲ টাকা মাহিনায় আফিসের খাতাপত্রের ধূলা ঝাড়িবে, তথাপি একশত টাকা মাহিনায় মোটর মেকানিকের কার্য্য করিবেনা, মোটর ত চালাইবেই না। একটি মুসলমান আমার নিকট কোন কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিল। কতকগুলি কাগজপত্রে তাহাকে নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য দিলে, তাহাতে সে অতিকষ্টে তাহার নাম স্বাক্ষর করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি কর?" সে বলিল, "আমি এঞ্জিন ড্রাইভার; মাসিক ১২৫৲ টাকা মাহিনা পাই।" কায তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হয় না। জাহাজে থাকিতে হয়; যদি দৈবাৎ জাহাজে কোন কল খারাপ হইয়া যায়, তাহা মেরামত করিতে হয়। খিদিরপুরের অনেক মুসলমান এই কার্য্য এবং এইরূপ জাহাজের এবং কারখানায় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা ৪০।৫০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা পাইয়া থাকে। ইহারা অধিকাংশ নিরক্ষর—কিন্তু তাহারা মসীজীবী কেরাণী অপেক্ষা অনেকগুণে বেশী উপার্জ্জন করে।

এই কার্য্য আবার যখন সাহেবরা করেন, তখন তাঁহাদের মাহিনা তাহাদের অপেক্ষা দুই তিনগুণ অধিক হয় এবং হেড অফিসের বাবুরা তাঁহাদিগকে আভূমি অবনত হইয়া সেলাম করিতে

কুণ্ঠা বোধ করেন না। বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান কেন এ কায করে না, প্রথমতঃ সে এইরূপ কার্য্য করিবার উপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু প্রধানতঃ এইরূপ কার্য্যে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমি প্রত্যেক বিদ্যালয়কে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পরিণত করিতে বলিতেছি না। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঙ্গালীর যাহাতে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অন্ততঃ অপ্রবৃত্তি না হয়, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। তাহাতে বাঙ্গালীর জীবন সংগ্রাম অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিবে,—বাঙ্গালী চাকুরী ছাড়িয়া ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি ও শিল্প জীবনোপায় স্বরূপ সন্ধান করিবে। Honest labour বা honest work যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, তাহা বরেণ্য এবং যে প্রকার কার্য্যে সে যদি মুটিয়াও হয়, তাহা হইলে সে ঘৃণ্য নহে। ইহা বাঙ্গালীর অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। এবং এ শিক্ষা কেবল পুঁথিগত শিক্ষা হইলেই হইবে না, এ শিক্ষা যাহাতে বাঙ্গালীর মজ্জাগত হয় তাহার আয়োজন এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই করিতে হইবে।

বাঙ্গালী বৈদিক সভ্যতার যুগে ফিরিয়া যাইবে কিংবা ষোল আনা সাহেব হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি দিবার প্রয়োজন নাই। বোধ করি এখন আর কেহই অস্বীকার করেন না যে দুইয়ের কোনটাই বর্ত্তমান যুগে সম্ভবপর নহে। জাতিভেদ থাকিবে কি উঠিয়া যাইবে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলা অভিপ্রেত নহে। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতিটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কতটুকু সাহায্য করিতে পারেন, আমি এই প্রবন্ধে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কালে দেশের অন্যবিধ অবস্থা হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যবিধ সংস্কার প্রয়োজন হইতে পারে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে, বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রাম যাহাতে সহজ হয় তাহার উপায় বলিয়া দেওয়া; ভারতে যত প্রকার কল কারখানা আছে তাহা বাঙ্গালীর সম্মুখে খুলিয়া ধরা, প্রত্যেক স্কুলে অন্ততঃ প্রত্যেক জেলায় একটী ছোট খাট প্রদর্শনী Industrial বা Commercial Exhibition স্থাপন করা। এবং প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক ছাত্র যাহাতে তাহার কোন বিভাগে কার্য্য করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে কোন না কোন প্রকার দৈহিক পরিশ্রম-সাধ্য শিল্পকার্য্য করে, তাহার জন্য নিয়ম করা। কোনও শিল্প কার্য্যে তাহার দক্ষ হইবার প্রয়োজন তথাকথিত হাইস্কুলের ছাত্রদের প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কিন্তু শিক্ষা অন্ততঃ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে সে কৃষিকার্য্য শিল্পকার্য্য বা কলকারখানার কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ না করে; বা ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য যেটুকু দৈহিক পরিশ্রম বা অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তাহাতে কাতর না হয়। ইহার জন্য যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা হইতে দুই চারিটী পুস্তক ছাঁটিয়া দিতে হয়, তাহা কর্ত্তব্য। ইংরাজী ভাষাতে যাহাতে মাতৃভাষাবৎ কথোপকথন করিতে পারে এরূপ চেষ্টা করাও অকর্ত্তব্য। দেড়শত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ইংরাজ ভারতবর্ষে থাকিয়া বাঙ্গালায় বিশুদ্ধরূপে কথা কহিতে পারেন না, তাহাতে তাঁহারা লজ্জা বোধ করেন না; আমরা যদি ইংরাজের ন্যায় ইংরাজী না বলিতে পারি, তাহা হইলে লজ্জিত হইবার কোন কারণ দেখি না। ইহা ঠিক যে ইংরাজ যেরূপ বাঙ্গালা বলে, বাঙ্গালী তদপেক্ষা অনেক গুণে ভাল ইংরাজী বলিতে পারে এবং ভবিষ্যতে বলিতে পারিবে। এতৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় অনেক কথা বলিয়াছেন, পুনরুক্তি ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ না হইয়া সাধারণ ছাত্রের পক্ষে অন্যান্য 'ব্যবহারিক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ' হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। 'নর' শব্দরূপ অভ্যাস করা অপেক্ষা, সেই সময় মধ্যে অতগুল রাসায়নিক দ্রব্যের নাম অভ্যাস করা বা কোন যন্ত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করা, অপিচ ঐ সময়টা জ্যামিতির অনুশীলন করাও ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর।

আমি যাহা বলিতেছি তাহা সাধারণ ছাত্রের পক্ষে। যদি কোন ছাত্র ভাষায় বিশেষজ্ঞ হইতে চাহে, তাহার জন্ম তদ্রূপ শিক্ষার যে কোন ব্যবস্থা থাকিবে না ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। বরং আমি বলিতে চাই, যাবতীয় য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। কেবল এইটাই প্রার্থনা, শিক্ষা যেন কেবল মাত্র ভাষা শিক্ষায় পর্য্যবসিত না হয়; এবং শিক্ষার খাতিরে স্বাস্থ্য যেন নষ্ট না হয়।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের দারিদ্র্য

ভারতে দারিদ্র্য সমস্যা বহুদিন হইতে দেশী ও বিদেশী রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদ্‌গণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এই দারিদ্র্যের দুই-দিক—এক ব্যক্তিগত অপর জাতিগত—পরস্পর সংবদ্ধ। অর্থনীতিকের হিসাবের বহি হইতে একবার দেশের ক্ষেত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে বিস্ময় আসে—এত শস্যশ্যামল ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে যে দেশে শোভা পায় সে দেশের দারিদ্র্যের কারণ কি? ভূমির উর্ব্বরতাও এক শতাব্দীর মধ্যে কমে নাই, বরং দেশের পণ্য বিদেশে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী রপ্তানি হইতেছে —তবুও এত দারিদ্র্য কেন? আমরা ১৯১১ সালে ১৩৪ কোটী টাকার জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়াছি, আর ২১০ কোটি টাকার জিনিষ রপ্তানি করিয়াছি, ৭৬ কোটী টাকা আমাদের হাতে থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে টাকার চিহ্ন দেশে কোথায়? এক বাঙ্গলা দেশে বৎসরে ৬ কোটী টাকার পাট বিক্রী হয়, বাঙ্গালার চাষার ঘরের অধিকাংশ অর্থ এখন পাটের অর্থ, কিন্তু তথাপি বাঙ্গালার কৃষকের অবস্থাও তেমন উন্নত হয় নাই। কারণ এই যে, প্রায় ৩১২ কোটী ভারতের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৭৫ জন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। এত লোকের মধ্যে যেখানে জমির আয় বিভক্ত হইয়া যাইতেছে, সেখানে ব্যক্তিগত আয়ের অংশ অতি সামান্য। এই কৃষি ভিন্ন ভারতবাসী প্রজাসাধারণের অন্যান্য সকল পন্থাই এখন প্রায় বন্ধ। এবং এ দেশের কৃষকও কেবল কাঁচা মাল রপ্তানি করিয়াই যাহা কিছু পারিশ্রমিক পায়, কারণ আবার রপ্তানির কার্য্যটাও বিদেশীর দ্বারাই চলিতেছে। এ কাঁচা মাল বিদেশে অল্পমূল্যে রাশি রাশি পাঠাইয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্যাদি বেশী মূল্যে তাহাকে প্রতিদিন কিনিতে হইতেছে। যে অর্থ কৃষক উপার্জ্জন করে, তাহার চতুর্গুণ অর্থ অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য আবশ্যক। দেশের কাঁচা মালগুলি এ দেশে শিল্পজাতে পরিণত করিতে পারিলে দশগুণ অর্থ দেশে আসিত, ভারতের খাদ্যাভাবও দূরীভূত হইত। ফলে প্রত্যেক ভারতবাসী পরিবারের এখন দৈনিক আয় তিন আনা মাত্র। যদি গড়ে ৫ জন করিয়া লোক প্রতি পরিবারে ধরা যায়, তবে এই তিন আনায় একদিনও ত একজনের আহার চলে না। ভারতে তাই একাংশ—এবং সে একি বৃহদংশ—অভুক্ত রহিয়া যাইতেছে। বিগত ১৯শ শতাব্দীতে ভারতে ২ কোটী লোক দুর্ভিক্ষের তাড়নে প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার উপরে অর্দ্ধাহার, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার নিমিত্ত যে মহামারী উপস্থিত হয়, তাহার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত লইলেই হৃৎকম্প হয়—১৯০৮ সনে জ্বরে উত্তর ভারতে ২০ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই ভারতের কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে কয়জন সুস্থদেহ,

কয়জন অর্থশালী, কয়জন পারিব সুখসাচ্ছন্দ্য ভোগের অধিকারী তাহা বলা কঠিন।

দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বক্ষণে—রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের প্রাক্কালে একবার দুই দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে দেশের চিন্তা নিয়োজিত হইলে শাসন সংস্কারে বাণিজ্য সংস্থানের আলোচনার প্রাধান্য লাভ করিবে। এই সমস্যার আংশিক সমাধানে কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত করা যাইতে পারে।

১। দুর্ভিক্ষ নিবারণ।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এবং যাহাতে প্রাকৃতিক কারণে বৃষ্টির অল্পতা বা আধিক্যহেতু শস্য নষ্ট না হয়, তাহার উপায় বিধান আবশ্যক। অল্পবৃষ্টির পূরণের নিমিত্ত পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্য (irrigation) আরও বিস্তৃত করা আবশ্যক। মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, উড়িষ্যা এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই এই irrigation আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। যদিও এই বিভাগের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ৪২ কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তথাপি দেশের ও জনসংখ্যার হিসাবে ইহা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যে দেশের আয়তন ১২ লক্ষ বর্গমাইলের উপরে, যে দেশ সমগ্র ইউরোপখণ্ডের তুল্য (কেবল রুষিয়া ব্যতীত), সে দেশের জন্য আরও বহুবিস্তৃত জলপ্রণালী সকল নিতান্তই আবশ্যক তাহা অস্বীকার করা যায় না। স্থানীয় লোকসংখ্যা ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিশেষ বিশেষ অংশের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ভারতের উপর দিয়া যে দুইটি বিপরীত বায়ুপ্রবাহ বৎসরের দুই সময়ে উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া বৃষ্টির সৃষ্টি করে, তাহার উপরেই দেশের শস্যের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। এক দক্ষিণ পশ্চিমের monsoon জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া দেশের ⅘ অংশের জল সরবরাহ করে। দুই বিভিন্ন দিক্‌গামী বায়ুর সজ্ঘর্ষণে যে বৃষ্টি পতিত হয় (যাহাকে norwester বলে) তাহা বাঙ্গালার ক্ষেত্রগুলিকে জলসিক্তিত করিয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই যে দুর্ভিক্ষ দেশকে আক্রমণ করে, এ অবস্থার প্রতীকার আবশ্যক। প্রাকৃতিক ইহা অপেক্ষা অধিক প্রতিকূল অবস্থা সকল অতিক্রম করিয়া বহুদেশ এখন শস্য উৎপন্ন করিতেছে, এবং জমির উর্ব্বরতাও বৃদ্ধি করিয়াছে। অত্যধিক বৃষ্টির অপকার নিবারণের জন্যও জল নিকাসের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পাম্প দ্বারা জলসিঞ্চন এবং জল নিকাস এ দুই এখন পাশ্চাত্য কৃষক করিতেছে।

২। ফার্ম্ম স্থাপন।

কৃষিকার্য্য হইতে একাংশ লোককে কৃষিজাত দ্রব্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সামান্য যন্ত্রাদির সাহায্যে খাদ্য-দ্রব্যে পরিণত করিতে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ গ্রামে পরীক্ষাগার স্থাপন করা আবশ্যক। যব হইতে বার্লি, সরিষা হইতে মাষ্টার্ড, ওটমিল, কলের সাহায্যে ধান, ডাল প্রভৃতি চালান দিবার যোগ্য করা, তুলা পরিষ্কার করা, চর্ব্বি সংগ্রহ করিয়া তাহা ব্যবহার-যোগ্য করা, বিভিন্ন তৈলের বীজ হইতে তৈল বাহির করা, ফল রক্ষা করিয়া চালান দেওয়া, ডিম তাজা রাখা এবং পাখীর পালক, পশুর লোম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পরিষ্কার করা, এ সকলই এখন পাশ্চাত্য কৃষক শ্রেণী তাহাদের গোলায় করিতেছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য farm এর অনুরূপ কিছু নাই বলিলেও হয়। ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশ গুলিতে একটী ফার্ম্মে গাভী রক্ষা, ফলের ও সব্জীর চাষ দ্বারা যথেষ্ট লাভ হয়। ফার্ম্মগুলির গাভীর দুগ্ধ প্রত্যুষে গাড়ীতে করিয়া কেন্দ্রস্থ দুগ্ধাগারে প্রেরিত হয়, সেখানে সমস্ত সহরের বা গ্রামের দুগ্ধ কলের সাহায্যে আলোড়িত ও টাট্‌কা হয় এবং উৎপন্ন মাখন টিনের কৌটাজাত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। প্রত্যেক ফার্ম্মের উৎপন্ন ফল ও শাকসব্জী এইরূপ একস্থানে একত্র করা হয় এবং তৎপরে বিক্রীত হয়। আমাদের

দেশে কলাদি সংরক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় এবং এই প্রকার গ্রামে যৌথসম্মিলন দ্বারা গ্রামোৎপন্ন জিনিষ একটী কেন্দ্রে একত্র করিবার শিক্ষার অভাবে, এক ধান চালের গোলা ভিন্ন অন্যপ্রকার গোলার সৃষ্টি এখনও হইতেছে না। এ প্রকার কার্য্যের কর্ত্তা বা পরিচালক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে গৃহীত হইলে কার্য্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। ছোট ছোট কলের ব্যবহার সম্পূর্ণ অশিক্ষিত কৃষকের পক্ষে অসম্ভব। পাশ্চাত্য দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহুলোক এইরূপ কার্য্যের কর্ত্তারূপে ব্যক্তিগত ও দেশের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে।

৩। নষ্ট-শিল্পের উদ্ধার সাধন।

মৃতকল্প শিল্পের উন্নতি সাধন আবশ্যক। ভারত-শিল্পের অবনতির ইতিহাস আলোচনায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের Industrial Commission Report এর প্রতিবাদ হইতে দুই একটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি স্বর্গীয় রানাডের ssays on Indian Economics, pp 159—160 হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এদেশে এক সময়ে ইস্পাত-প্রস্তুত প্রণালী এত উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে, প্রসিদ্ধ ডামাস্কাসের ছুরি ও ছোরা ভারতের ইস্পাতে তৈয়ার হইত; আসামে বৃহৎ কামান প্রস্তুত হইত; দিল্লীর নিকটস্থ লৌহস্তম্ভও তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। মোগল ভারতেও বারনিয়ার এবং টেভারনিয়ার বিবিধ শিল্পের অতি উন্নত অবস্থার বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধিই পাশ্চাত্য বণিক্ সম্প্রদায়কে ভারতে আকৃষ্ট করে; তাহারা ভারতের বহুমূল্য ও আশ্চর্য্য কারুকার্য্য সম্পন্ন সূক্ষ্ম বস্ত্রের নিমিত্ত বহু বিপদ ও ক্লেশ সহ্য করিয়া ভারতে আসিত। ফিনিসিয়দিগের পরে পর্ত্তুগিজ ও ওলন্দাজ জাতি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। লেকি (Lecky) বলিয়াছেন—১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতের সুন্দর ও সুদৃশ্য রেশম, কেলিকো ও মসলিন এত অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানি হইত যে সে দেশের পশম ও রেশম ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। পার্লামেণ্ট ইহার প্রতীকারের নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭০০ ও ১৭২১ সনে এই সকল আইন ইংলণ্ডে পাশ হইলে ভারতের কেলিকো ও রঙ্গিন বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করা হয়। পণ্ডিত মালবীয় স্যর হেনরী কটানের নিউ ইণ্ডিয়া পুস্তক হইতে তাৎকালিক মুর্শিদাবাদের (১৭৫৭ সনে) সহিত লণ্ডনের সমৃদ্ধির তুলনা স্যর হেনরি যেরূপ করিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্যর হেনরি বলিয়াছেন যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে (১৭৮৭ সনে) ইংলণ্ডে ঢাকার প্রসিদ্ধ মসলিন ৩০ লক্ষ টাকা পরিমাণ প্রেরিত হয়, ১৮১৭ সনে সে ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে ঢাকার তৎকালে অধিবাসী সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ, তাহার বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যা মাত্র ৮০,০০০। সে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা আর নাই। এরূপ অবস্থান্তর বঙ্গের অনেক স্থানেই ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের পুস্তক হইতেও পণ্ডিতজী উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বর্গীয় রমেশ দত্তের পুস্তকে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে এবং এ দেশের শিল্প অবনতির এক প্রকট ইতিহাস তাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। বণিক্‌রাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্যলাভ করিয়া ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন যে, বর্ত্তমান কালে উহা অনেক সময় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—A deliberate endeavour was now made to use the political power obtained by the East India Company to discourage the manufactures of India—এবং তাহার সমর্থনে কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণের ১৭৬৯ সালের একখানি পত্রও তিনি উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের এই পৃষ্ঠা পুনরুদ্ঘাটন করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমানে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে শিল্পোন্নতি সাধনের মহাব্রত উপেক্ষিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত কোন্ শিল্প কোথায় প্রচার লাভ করিয়াছিল

সে ইতিহাস অবগত হওয়া প্রয়োজন। এক বয়ন-শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে ভবিষ্যতের পন্থা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, এইরূপ আশা হয়। পরলোকগত দাদাভাই নৌরোজি, মহামতি রানাডে, মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত এ বিষয়ে দেশের দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বিস্তীর্ণ ভূমিতে অনুকূল অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। বহুদিন পূর্ব্বে স্যর জন্ ষ্ট্রেচী লিখিয়াছেন, "India is capable of producing every article required for the use of man। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁহার লিখিত Poverty problem in India গ্রন্থে দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসায় ভারত ইতিহাসের এ অধ্যায়ের আলোচনা করিয়াছেন। কেবল ভারতবাসী কেন, স্যর জন বার্ডউড তাঁহার Industrial Arts of India গ্রন্থে, স্যর আলেকজেণ্ডার কানিংহাম, মিঃ ফারগুসন্, ডাঃ ওয়াট প্রভৃতি ইংরেজগণও ভারতীয় শিল্পের অবনতি ও বিলোপের জন্য স্পষ্টাক্ষরে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ওয়াট তাঁহার Economic products of India গ্রন্থে এদেশে উৎপন্ন বহুবিধ তুলার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। আমেরিকার নিউ অলিন্স বাদ দিলে তুলার শ্রেষ্ঠ বন্দর বোম্বাই নগর। ভারতে স্মরণাতীত কালে যে সূতাকাটা ও কাপড় বোনার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা গ্রিয়ার্সন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। বয়ন শিল্পে স্যর জন্ বার্ডউডের মতে ভারতবর্ষ জগতের গুরু। ১৮৬২ সন হইতে ভারতে তুলার মহার্ঘতা ঘটে এবং সেই সূত্রে লাঙ্কসায়ার সস্তা কাপড় প্রস্তুত করিয়া বাজার একচেটিয়া করিয়া লয়। তথাপি পঞ্জাব, রাজপুতনায় আহাম্মদাবাদ, সুরাট, পুনা, নাগপুর, মসলিপটম, বাঙ্গালায় ঢাকা শান্তিপুর ও নদীয়া প্রভৃতিতে কুশলে শিল্পীর হাতের গুণে সূক্ষ্মবস্ত্রে বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছে। মেকলে সাহেব বেনারসের রেশম সেণ্ট জেম্‌সের গৃহ-শোভায় স্থানলাভের উপযুক্ত বলিয়াছেন। কিন্তু আজ মাত্র বেনারস, মুর্শিদাবাদ, আহাম্মদাবাদ ও ত্রিচিনাপলিতে রেশম শিল্পের ব্যবসা ক্ষীণভাবে চলিতেছে। অনেকেই জানেন ফ্রাঙ্কো প্রাসীয়ান যুদ্ধের পূর্ব্বে (১৮৭০ সনে) ফরাসী দেশে কাশ্মীর শালের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রেতা ছিল। তখন ৩০০০ শাল বুনিবার তাঁত সকল দেশ বিদেশের অভাব পূরণ করিয়া উঠিতে পারিত না। আর সে যুগে দ্বাদশ জন তেমন সূক্ষ্ম শিল্পী পাওয়া কঠিন।

বয়ন শিল্প ভিন্ন অন্যান্য শত শত শিল্প এই ব্যবসায়ের সংগ্রামে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভিজিগাপটাম, ত্রিচিনপলি, মহীশূর, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের বস্ত্র, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার সোণা ও রূপার দ্রব্যাদি, জয়পুরের এনামেল, নাগপুরের ইস্পাতের দ্রব্যাদি, বর্দ্ধমান, উজীরপুর ও পেশোয়ারের ছুরি কাঁচি, দিল্লী ও আগ্রার চুম্‌কি ও পাথরের কায, সোনারূপার লতার কায, কাঁসার উৎকৃষ্ট বাসন, এ সকল শিল্প ক্রমে ক্রমে দেশ বিদেশের সস্তা ও খেলো পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের কারিকরের হাতের নৈপুণ্য জগতের শিল্প সাধনার একটি অমূল্যধন; কিন্তু উৎসাহ অভাবে সে সম্পদ নষ্টপ্রায়। ডাঃ ওয়াটসন ঢাকাই মসলিনের সমতুল্য বস্ত্র কলে প্রস্তুত হইতে পারে না ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ১৮ শতাব্দী ধরিয়া ভারতের ঐ শিল্প-কুশলতা ইউরোপের ঐশ্বর্য্যকে ভারতে টানিয়া আনিয়াছে। এক শতাব্দী হইল সে চিত্রখানির বিপরীত চিত্র ভারতের সম্মুখে উপস্থিত। ভারতবর্ষ এখন শতকরা ৮০ জন কৃষীজীবিতে পূর্ণ। ভারতের শিল্পদ্রব্য এখন সকলই বিদেশী। ভারতবর্ষ, ক্ষেত্রের শস্যের সহিত জমীর সারাংশও রপ্তানী করিয়া দিতেছে। সস্তার বাজারে কিনিতে গিয়া ভারতবর্ষ অর্থহীনতার অগাধ সমুদ্রে ডুবিতেছে।

৪। রসায়ন চর্চ্চা।

এ দেশে রসায়ন বিদ্যার যে বিস্তৃত চর্চ্চা এক সময়ে হইয়াছিল, তাঁহার ইতিহাস ডাঃ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়

লিপিবদ্ধ করিয়া দেশের আশা বৃদ্ধি করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি স্বয়ং সে পথে গমন করিয়া ভারতে রসায়ন চর্চ্চার নবযুগের সূচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কলিকাতা গেজেটে অল্পদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। সমগ্র দেশের রাসায়নিক দ্রব্যাদির তথ্য সংগ্রহ এবং পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটী কেন্দ্রীভূত বিভাগ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ দেশের কাননে কান্তারে ভূগহ্বরে প্রচুর বনজাত, খনিজ পদার্থ অব্যবহৃত রহিয়াছে, তাহার একাংশ ব্যবহারে আসিলে শত শত রসায়নশালাকে আবশ্যক দ্রব্য যোগাইবে। কেবল ভারতের কেন, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভাব পূরণ করিতে পারিবে এমন আশা করা অস্বাভাবিক নহে। ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিল্পোন্নতি চেষ্টার সহিত ফলিত রসায়নের বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার নিমিত্ত আরও বহু সংখ্যক রসায়নাগার স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের দৃষ্টি সে দিকে কথঞ্চিৎ ফিরিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

৫। শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার দায়িত্ব।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত দেশের দারিদ্র্য সমস্যার সম্বন্ধ প্রকাশতঃ তেমন ঘনিষ্ঠ না হইলেও, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে দেশের সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস করা উচিত। বাণিজ্য ব্যবসায় হইতে দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। চাকুরী ও লেখাপড়ার ব্যবসায়ে বহু লোকের অন্নসংস্থান অসম্ভব হওয়ায়, এবং সমুদয় দ্রব্যের অত্যধিক মহার্ঘতার হেতু দেশের শক্তির আধার মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ এ সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা হীনবল। যে দেশে টাকায় ৮ মণ চাউলও বিক্রীত হইত, সে দেশে যখন ৮৲ টাকায় ১ মণ চাউল পাওয়া যায় না, তখন কৃষিজীবী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় যে অবস্থান্তরে পতিত হইয়াছে, তাহার চিত্র প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট বড়ই ভীষণ। কিন্তু সমবায় ও ব্যবসা বাণিজ্যে সততা রক্ষার নীতি অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশের দারিদ্র্য নিবারণে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে পারে, অন্য সম্প্রদায় এ কার্য্যের জন্য সেরূপ উপযুক্ত নহে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

সাম-সন্ধ্যা-গাথা।—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ দ্বারা অনূদিত। কলিকাতা, ৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী, ২ নং নাথুসাহ ব্রহ্মপুরী, বারাণসী। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী, ৬২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০

এই পুস্তকে সামবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যাবিধির মূল শ্লোকগুলি ও সম্ভবমত সহজ পদ্যে তাহার ভাবানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থে প্রদত্ত ভূমিকাটি সন্ধ্যার্থিগণের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে বেদোক্ত যাবতীয় সন্ধ্যা মন্ত্রের আবশ্যক ব্যাখ্যা ধারাক্রমে সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা (ব্রাহ্মণ সন্তান) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যথারীতি ত্রিসন্ধ্যাবিধি পালন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইবে। স্থানে স্থানে পদ্যানুবাদ গুলি মন্দ হয় নাই। পুস্তক খানির কাগজ ও ছাপা ভাল, মূল্যও কম।

ইহুদীয় ধর্ম্ম।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক সংকলিত। কলিকাতা, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, দেবকীনন্দন প্রেস্ এবং ১ এ নং রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ বসু, এম্, বি; পাণিনি কার্য্যালয়, এলাহাবাদ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০

এখানি ইহুদীয় ধর্ম্মের ইতিহাস। পুরাতন ধর্ম্মনিয়ম-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, ভাব-বাদীদিগের পরবর্ত্তী ইহুদীয় ধর্ম্ম, এবং বিবিধ সম্প্রদায়, ইহুদীয় আচার নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহুদীয় তন্ত্র ও দর্শন, প্রধানতঃ এই চারিটিই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও বর্ণিত বিষয়।

সংকলনকার গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "ইস্লামীয় ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বর্ণিত বিষয় সৃষ্টির আদি হইতে বল্লালসেনের ক্রম নষ্ট না করিয়া ধারাবাহিক ভাবে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে ও মূলের অনুযায়ী রাখিবার জন্য বাইবেলের ভাষ্য প্রস্তুত হইয়াছে, এবং যাহাতে তাহার মধ্য দিয়া ইহুদীয়দিগের ধর্ম্ম, সমাজ, চরিত্র নীতি, রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন প্রভৃতি আভাসিত হয় তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে।" জ্ঞানেন্দ্র বাবু সাহিত্যসেবী এবং সুলেখক। তিনি "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" এবং "বাঙ্গলা ভাষার অভিধান" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি ইহুদীয় ধর্ম্মের অনেক জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ইতিহাস সংকলনে তাঁহার উদ্দেশ্য ও অধ্যবসায় প্রশংসার্হ। আমরা ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। গ্রন্থখানি "জগৎ-তারণ গ্রন্থাবলী"র ২য় গ্রন্থ। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

সচিত্র প্রেমপত্রাবলী।—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত। কলিকাতা, ৬৭।১ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, "দি ইউ নিয়ান" প্রেসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, "মাতৃভূমি কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুপার রয়াল, ২৪ পেজী, ৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲

এখানি কবিতায় লেখা ২০ খানি পত্রের সমষ্টি, তাহার মধ্যে দুই খানি গদ্যে লিখিত। গ্রন্থকার 'নিবেদন" পত্রে বলিয়াছেন, "প্রণয় প্রসঙ্গে পতি-পত্নীর পরস্পরের মনোভাব বিনিময়ই এই সকল পত্রাবলীর বর্ণনীয় বিষয়।" বিষয় এবং গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ভাল। কাগজ, ছাপা এবং সোনার জলে নাম লেখা বাঁধাই খুব মনোরম। মূল্য আরও কম হওয়া উচিত ছিল।

নীতিরত্নমালা।—শ্রীমোহিনীমোহন দাস কর্ত্তৃক সংকলিত। চট্টগ্রাম, কোহিনুর প্রেসে মুদ্রিত এবং শ্রীমেদিনীমোহন দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই, ৮ পেজী, ৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০

ইহা একখানি ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ মূলক উপাদেয় পুস্তক। সংগ্রহকার অল্পের মধ্যে আমাদের দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় প্রাতঃস্মরণীয় বিখ্যাত মহাপুরুষের কথিত বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কতকগুলি মহামূল্য নীতিবাক্য অতি নিপুণতার সহিত নির্ব্বাচন করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ নীতিকথা এবং চাণক্য, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, রামকৃষ্ণপরমহংস, মোহাম্মদ, যীশুখৃষ্ট এবং বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা ও বাইবেলের জ্ঞান, ভক্তি ও নীতিমূলক মহামূল্য সারগর্ভ উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই পাঠকগণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির মূল্য ও উপযোগিতা অবধারণ করিবেন। সংগ্রহকার এই নীতিরত্ন চয়নে যথেষ্ট গুণাপণার পরিচয় দিয়াছেন। স্থান বিশেষে পদ্যানুবাদ গুলিও বেশ সরল ও সুন্দর হইয়াছে। বহিখানি সকলেরই পাঠোপযোগী, বিশেষ বালকবালিকাদিগের। আমরা ইহা পাঠ করিয়া যারপর নাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আবশ্যক। পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা ভাল। মূল্য খুব কম।

জয়ন্তী।—শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, ৩৩৩নং অপার চিৎপুর রোড, শীল প্রেসে মুদ্রিত ও ১১৮নং নিমু গোঁসাইর লেন, ক্রাউন লাইব্রেরী হইতে শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ২৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।৵০ আনা।

ইহা একখানি বিবিধ চরিত্র এবং বহু বিস্ময়াবহ ঘটনাপূর্ণ সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজে যুদ্ধ, নবাব বাদসাহ বেগম মহলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং দারুণ প্রলোভন ও অত্যাচারের মধ্যে চরিত্রবতী বিধবা হিন্দু মহিলার ধর্ম্মরক্ষা বিবৃত হইয়াছে।

উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে "জয়ন্তী"র চরিত্র অনেক অংশে ভাল ফুটিয়াছে। কাসিম আলি এবং ইংরাজ হার্ব্বার্টের চরিত্র মহৎ, নিপুণ লেখক তাহা আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। জয়ন্তীর সহিত গ্রন্থোল্লিখিত জনৈক সাধু মহাপুরুষের প্রশ্নোত্তর ভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি অতিশয় শিক্ষাপ্রদ ও মধুর হইয়াছে। (১৮৩ হইতে ১৮৭ পৃষ্ঠা) লেখকের ভাব, ভাষা এবং রচনা-সৌষ্ঠব থাকিলেও সর্ব্বত্র সমতা রক্ষিত হয় নাই, দুই এক স্থলে সামান্য ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।

"কমলাকান্ত।"

ভ্রমসংশোধন—এই সংখ্যায় প্রকাশিত "জ্যোতিঃকণা" গল্পে লেখকের নাম ভুলক্রমে শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ছাপা হইয়াছে—ইহা শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার হইবে।

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড সমাপ্ত।

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।